সহজ সরল গদ্যে সম্পূর্ণ

চৈতন্যভাগবত

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

গদ্যরূপ ও সম্পাদনা

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

নবপত্র প্রকাশন/কলিকাতা-৭০০০৭৩

ISBN 81-85325-17-0

☐ প্রথম প্রকাশ : কলিকতা পুস্তকমেলা ১৯৬০
২৫শে জানুয়ারি ১৯৬০

☐ প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

☐ কম্পোজ : রঘুনাথ প্রেস
৮৩ বি বিবেকানন্দ রোড / কলিকাতা-৬

মুদ্রণে :
☐ মুদ্রক : লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

☐ প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

☐ দাম : ৬০ টাকা

পিতৃদেব ও শ্রীগুরু আদিত্যকুমার গোস্বামী
(১৮৯৭-১৯৫০)
এবং মাতৃদেবী পদ্মবামা গোস্বামিনীর
(১৯০৪-১৯৫২)
পরমপূণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

আদিখণ্ড

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় : ... ১

মঙ্গলাচরণ, শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা, বলরামের রাস, শ্রীচৈতন্যলীলা-আদি, মধ্য, অন্ত খণ্ড।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ... ৬

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, অবতার, নবদ্বীপের সমাজ, অদ্বৈতের প্রেমহুঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্ভাবনা, কৃষ্ণ-বলরামের গৌর-নিতাই রূপে অবতার, নীলাম্বর চক্রবর্তীর ভবিষ্যদ্বাণী, গৌর-নিতাইয়ের জন্মতিথি মাহাত্ম্য।

তৃতীয় অধ্যায় : ... ১৫

শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা, কান্নার ছলে হরিনাম, ষষ্ঠীপূজা, নামকরণ, হামাগুড়ি, সাপের কাহিনী, চোরের কথা, নূপুরের আওয়াজ, পরিব্রাজক ব্রাহ্মণকে গৌরহরির কৃপা।

চতুর্থ অধ্যায় : ... ২২

শ্রীচৈতন্যের 'হাতেখড়ি', বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন, শিশুদের সঙ্গে খেলা, গঙ্গায় উপদ্রব, পিতার সঙ্গে চাতুরি।

পঞ্চম অধ্যায় : ... ২৬

বিশ্বরূপের পরিচয়, বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভরকে দেখে অদ্বৈত ও তাঁর সভাসদ্‌গণ আত্মহারা, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, চৈতন্যের মূর্ছা, অদ্বৈতাদির কান্না, জগন্নাথ মিশ্রকে প্রবোধ, চৈতন্যের পাঠে অনুরাগ, পিতার আদেশে পাঠ বন্ধ, পুনরায় চৈতন্যের ঔদ্ধত্য, তত্ত্বোপদেশ, পাঠ পুনরারম্ভ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ... ৩১

শ্রীচৈতন্যের উপনয়ন, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল, সহপাঠীদের সঙ্গে ঝগড়া, চৈতন্যের ধর্মানুরাগ, পিতার স্বপ্নদর্শন, পিতার তিরোধান, জননীকে প্রবোধ, মাতৃহস্তে সুবর্ণদান, শচীদেবীর বিস্ময় ও ভয়, শ্রীচৈতন্যের বিদ্যাবিলাস, শ্রীনিত্যানন্দের জন্ম, কৃষ্ণলীলার অনুকরণ, তীর্থযাত্রা, মাধবেন্দ্রপুরী, নিত্যানন্দ মহিমা।

সপ্তম অধ্যায় : ... ৪১

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মুরারি গুপ্তের রসিকতা, মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপ, শ্রীচৈতন্যের প্রথম বিবাহ, মুকুন্দের কীর্তন, ঈশ্বরপুরী, ভক্তবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ।

অষ্টম অধ্যায় : ... ৪৮

মুকুন্দ ও গদাধরের সঙ্গে প্রভুর শাস্ত্রালোচনা, শ্রীবাস, প্রভুর নগরভ্রমণ, শ্রীধরের বাড়িতে, গঙ্গাতীরে প্রভুর শাস্ত্রব্যাখ্যা।

নবম অধ্যায় : ... ৫৫

ছাত্রবৃদ্ধি, দিগ্বিজয়ীর পরাভব, নদীয়ার উল্লাস, চৈতন্যের সম্মান।

দশম অধ্যায় : ... ৬০

শ্রীচৈতন্যের অতিথিসেবা, লক্ষ্মীদেবী, চৈতন্যের পূর্ববঙ্গে গমন, বিদ্যাবিলাস, লক্ষ্মীদেবীর স্বধামগমন, শচীর দুঃখ, উপহার, তপন মিশ্র, মাতাকে প্রবোধ, অধ্যাপনারম্ভ, প্রভুর দ্বিতীয় বিবাহ।

একাদশ অধ্যায় : ... ৭০

ভক্তগণের প্রতি পাষণ্ডীদের কটূক্তি, শ্রীহরিদাসঠাকুরের চরিত্র, অদ্বৈতের সঙ্গে মিলন, হরিদাসের কীর্তন, কাজীর গাত্রদাহ, হরিদাসের গ্রেপ্তার, হরিদাসের স্বধর্মনিষ্ঠা, বাইশবাজারে বেত্রাঘাত, গঙ্গায় নিক্ষেপ, মুলুকপতির সম্ভ্রম, ব্রাহ্মণসভায় হরিদাস, গোফায় অবস্থান, তিনলক্ষ হরিনাম গ্রহণ, মহানাগ, ঢঙ্গী ব্রাহ্মণ, দুর্বচন, হরিদাসের নবদ্বীপে আগমন ও ভক্তবৃন্দের আনন্দ।

দ্বাদশ অধ্যায় : ... ৭৮

প্রভুর গয়াধামে গমন, জ্বর, বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন, ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তীর্থশ্রাদ্ধ, ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা, কৃষ্ণবিরহ, নবদ্বীপগমন।

মধ্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায় : ... ৮২

মঙ্গলাচরণ, প্রভুর তীর্থকথা, প্রেমের প্রথম প্রকাশ, শ্রীবাসের বাড়ি, শ্রীমান্‌পণ্ডিত, ভাগবতবৃন্দের আনন্দ, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শচীমাতার দুশ্চিন্তা, প্রভুর সর্বশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণব্যাখ্যা, জীবগতিবর্ণন, গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে প্রবোধ বাক্য, ভাগবত শ্রবণে প্রেমাবেশ, বিদ্যাবিলাসের উপসংহার, সঙ্কীর্তন আরম্ভ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ... ৯৩

অদ্বৈত সমীপে ভক্তবৃন্দ, অদ্বৈতের স্বপ্ন, ভক্তবৃন্দের আশীর্বাদ, প্রভুর বৈষ্ণব-আবেশ, শচীমাতাকে শ্রীবাসেব প্রবোধ-প্রদান, অদ্বৈতের চৈতন্যপূজা, প্রভুর দুঃখ, গদাধর, পাষণ্ডীদের রাগ, শ্রীবাস-অঙ্গনে ঐশ্বর্য-প্রকাশ, শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর কৃপা, নারায়ণী, শ্রীবাসের উৎসাহ।

তৃতীয় অধ্যায় : ... ১০২

প্রভুর ভাবাবেশ, বরাহমূর্তি দেখে মুরারির স্তুতি, শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপ-আগমন, প্রভুর স্বপ্নবৃত্তান্ত, হলধরভাব, নিত্যানন্দ-মিলন।

চতুর্থ অধ্যায় : ... ১০৬

শ্রীনিত্যানন্দকে জানবার কৌশল, নিত্যানন্দের কৃষ্ণোন্মাদ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের ইঙ্গিতে কথোপকথন, শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব।

পঞ্চম অধ্যায় : ... ১০৯

শ্রীবাস-অঙ্গনে ব্যাসপূজা, প্রভুর বলরাম-ভাব, শ্রীনিত্যানন্দের নিজ দণ্ড-কমণ্ডলু ভঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজা, প্রভুর ষড়্‌ভূজা মূর্তির প্রকটন, বৈষ্ণবনিন্দার পাপ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ... ১১৪

অদ্বৈতাচার্য সমীপে রামাই, অদ্বৈতাচার্যের মিলন ও ঐশ্বর্যদর্শন, অদ্বৈতের

পূজন, স্তবন ও প্রেমাবেশ-নৃত্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের প্রীতি, অদ্বৈতের বরপ্রার্থনা।

সপ্তম অধ্যায় : ... ১১৮

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নবদ্বীপ আগমন, ভক্ততত্ত্ব, গদাধরের সন্দেহ, ভাগবত শ্রবণে পুণ্ডরীকের প্রেম, গদাধরের দীক্ষাপ্রস্তাব, প্রভুর সঙ্গে পুণ্ডরীকের মিলন, গদাধরের দীক্ষা।

অষ্টম অধ্যায় : ... ১২২

শ্রীনিত্যানন্দের বাল্যভাব, শ্রীবাসের প্রীতি, স্বপ্নবৃত্তান্ত, শচীমাতার ঐশ্বর্য-দর্শন, শিব, কীর্তন-বিলাস, পাষণ্ডীর কোপ, শ্রীবাসের বাড়িতে প্রভুর প্রকাশ ও আনন্দভোজন।

নবম অধ্যায় : ... ১৩২

প্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাব অর্থাৎ মহাপ্রকাশ, অভিষেক, বিবিধ উপচারে পূজা ও স্তুতি, ভক্তসামগ্রী স্বীকার, ভক্তবৃন্দের পূর্ববৃত্তান্ত, শ্রীধরের চৈতন্য-স্তুতি।

দশম অধ্যায় : ... ১৩৯

মুরারি গুপ্তকে প্রভুর রামরূপ প্রদর্শন, হরিদাস ঠাকুর, অদ্বৈতের মহত্ত্ব, অদ্বৈত-ভক্ত, মুকুন্দ দত্ত, ভগবানের ভক্তবশ্যতা, শ্রীচৈতন্যলীলার নিত্যতা, অবশেষপাত্র নারায়ণী।

একাদশ অধ্যায় : ... ১৪৮

মালিনী, নিত্যানন্দের শিশুভাব, রহস্যকথা, শ্রীবাসের ঘৃতপাত্র, মালিনীর স্তুতি, নিত্যানন্দে শচীমাতার অপত্যস্নেহ, শচীমাতার সন্দেশ।

দ্বাদশ অধ্যায় : ... ১৫১

নিত্যানন্দ-মহিমা ও নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : ... ১৫২

নিত্যানন্দ ও হরিদাসের হরিনাম প্রচার, জগাই-মাধাই উদ্ধার, প্রভুর জলকেলি, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের আনন্দকলহ, দেবগণের আগমন।

চতুর্দশ অধ্যায় : ... ১৬৪

জগাই-মাধাই উদ্ধারে যমরাজের প্রশ্ন, চিত্রগুপ্তের উত্তর, যমরাজের মূর্ছা ও পরে নৃত্য, অন্যান্য দেবগণেরও আনন্দনৃত্য।

পঞ্চদশ অধ্যায় : ... ১৬৬

জগাই-মাধাইর নিত্যকৃত্য, মাধাইর প্রতি নিত্যানন্দের গঙ্গা-সেবার উপদেশ, জগাই-মাধাইর উদ্ধারে সর্বলোকের বিস্ময়, মাধাইর 'ব্রহ্মচারী' ভাব।

ষোড়শ অধ্যায় : ... ১৬৮

শ্রীবাসের শাশুড়ী, শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বের অচিন্ত্যভাব, অদ্বৈত মহিমা, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, প্রভুর ভোজন, ভক্তের প্রভাব।

সপ্তদশ অধ্যায় : ... ১৭৩

প্রভুর নগরভ্রমণ, পাষণ্ডীর বাক্য, অদ্বৈতের নৃত্য, নন্দন আচার্যের বাড়িতে প্রভুর গোপন অবস্থান, অদ্বৈতাচার্যের দুঃখ ও উপবাস, আচার্য সমীপে প্রভুর গমন ও কৃপা প্রকাশ, মুক্তগণের শ্রীকৃষ্ণভজন।

অষ্টাদশ অধ্যায় : ... ১৭৬

প্রভুর নাট্যলীলা, বুদ্ধিমন্তখান, হরিদাস, শ্রীবাস, রুক্মিনী-আবেশ, আদ্যাশক্তির স্তুতি, মাতৃভাবে স্তন্যদান, চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে আশ্চর্য তেজের প্রকাশ।

ঊনবিংশ অধ্যায় : ... ১৮২

অদ্বৈতাচার্যের জ্ঞানচর্চা, প্রভুর অদ্বৈত-ভবনে গমন, পথে বামাচারী সন্ন্যাসীর গৃহ, গঙ্গায় ঝাঁপ, নিন্দক, অদ্বৈতকে প্রহার, নিজতত্ত্ব-প্রকাশ, সুদক্ষিণ রাজা, অদ্বৈতগৃহে আনন্দ-ভোজন, শ্রীনিত্যানন্দের বাল্যভাব, অদ্বৈতাচার্যের ক্রোধ, নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাসের সঙ্গে প্রভুর নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তন এবং সকলের মহানন্দ।

বিংশ অধ্যায় : ... ১৯০

মুরারিগুপ্তের স্বপ্ন, নিত্যানন্দতত্ত্ব, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, সেবক ও লীলাস্থানের নিত্যতা, মুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশে অন্নদান, শ্রীচৈতন্যের অজীর্ণতা, মুরারির গরুড়ভাব, মুরারিগুপ্তের মৃত্যু-সঙ্কল্প ও নিবৃত্তি, নিত্যানন্দের শ্রীমুখে গ্রন্থকারের বৈষ্ণবতত্ত্ব শ্রবণ।

একবিংশ অধ্যায় : ... ১৯৪

ভাগবত-তত্ত্ব, ভাগবতের প্রকৃত অর্থজ্ঞ, প্রভুর বলরামভাব, শ্রীবাসের প্রতি দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ, প্রভুর বাক্যদণ্ড।

দ্বাবিংশ অধ্যায় : ... ১৯৭

শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ, অপরাধ খণ্ডন, শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাদান।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় : ... ২০১

প্রভুর নৃত্য দেখার জন্য এক ব্রহ্মচারীর লুকিয়ে থাকা, শ্রীচৈতন্যের ক্রোধ, ব্রহ্মচারীকে শ্রীচৈতন্যের কৃপা, মহামন্ত্র, কীর্তনশিক্ষা, কাজী ও পাষণ্ডীদের গাত্রদাহ, কাজীর প্রতি প্রভুর ক্রোধ প্রকাশ, ভক্তের প্রার্থনায় ক্রোধ নিবৃত্তি, শ্রীধরের লৌহপাত্রে প্রভুর জলপান, ভক্তের প্রার্থনায় ক্রোধ নিবৃত্তি, ভক্তের মাহাত্ম্য, শ্রীচৈতন্যলীলার নিত্যতা, ভক্তসেবায় ভক্তিলাভ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় : ... ২১৬

শ্রীচৈতন্যের প্রেমাবেশ, অদ্বৈতাচার্যের গোপীভাবে নৃত্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের বিশ্বরূপ দর্শন, প্রকৃত ভক্তি, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের প্রণয়-কলহ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় : ... ২১৯

'দুঃখী'র ভক্তি, কৃষ্ণভক্তি লাভের উপায়, শ্রীবাসের পুত্রের পরলোক, পরিজনবর্গকে কাঁদতে শ্রীবাসের নিষেধ, শ্রীচৈতন্য এ কথা জানলেন, প্রভুর সন্ন্যাসের পূর্বাভাস, মৃতশিশুর সঙ্গে প্রভুর কথাবার্তা, শ্রীবাস-পরিবারের শোক-জয়, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর অন্নগ্রহণ, আঁখরিয়া বিজয় দাস কর্তৃক বৈভব দর্শন, শ্রীচৈতন্যের বলরাম ভাব, গোপীভাব, শ্রীচৈতন্যের মুখে সন্ন্যাসের কথা।

ষড়্বিংশ অধ্যায় : ... ২২৬

ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রবোধবাক্য, শচীমাতার কান্না, মাতাকে শ্রীচৈতন্যের গোপন

কথা, কৃষ্ণভজনের উপদেশ, শ্রীধরের লাউ, মায়ের কাছে প্রভুর বিদায় প্রার্থনা, ভক্তবৃন্দের দুঃখ, প্রভুর গৃহত্যাগ, কেশব ভারতীর আশ্রমে প্রভু, সকলের শোক, বহুলোকের ভীড়, হরিধ্বনি, মস্তকমুণ্ডন, শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব সন্ন্যাসী রূপ, ভারতী কর্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামকরণ, নামের তাৎপর্য, শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা, মধ্যখণ্ডের সমাপ্তি

অন্ত্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায় : ... ২৩২

মঙ্গলাচরণ, প্রেমোন্মত্ত প্রভু—কেশব ভারতীকে আলিঙ্গন, প্রভুর বনগমন, চন্দ্রশেখর আচার্য নবদ্বীপে এসে খবর দিলেন, ভক্তবৃন্দের শোক, দৈববাণীর প্রবোধ, রাঢ়দেশে প্রভুর প্রবেশ, প্রান্তরে প্রভুর ক্রন্দন ও নৃত্য, গঙ্গার মহিমা, প্রভুর কৃপাদৃষ্টি, শান্তিপুরে আচার্যগৃহে প্রভুর আগমন, অচ্যুতের মধুর বচন, সদলবলে প্রভুর নৃত্য, নিজ-মুখে স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ, অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে আনন্দ ভোজন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ... ২৪০

প্রভুর নীলাচল যাত্রা, আটিসার অনন্ত আচার্যের গৃহে, ছত্রভোগ অম্বুলিঘাট, রামচন্দ্রখান, নৌকায় কীর্তন, মাঝির ভয়, সুদর্শন চক্র, প্রভুর উৎকলদেশে প্রবেশ, দানীর উপদ্রব, সুবর্ণরেখায় প্রভুর স্নান, শ্রীনিত্যানন্দ কর্তৃক প্রভুর দণ্ডভঙ্গ, জলেশ্বর, রেমুণা, গোপীনাথ, যাজপুর, বৈতরনীর মাহাত্ম্য, দশাশ্বমেধঘাট, আদিবরাহ দর্শন, কটক-মহানদীতে স্নান, সাক্ষীগোপাল দর্শন, ভুবনেশ্বর, স্কন্দপুরাণের উপাখ্যান, শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য, শিবপূজা প্রসঙ্গে শিক্ষাদান, আঠারোনালা, পুরীধামে পৌঁছে প্রভুর আনন্দমূর্ছা, ভক্তবৃন্দের জগন্নাথ দর্শন ও প্রভুর সঙ্গে মিলন, সার্বভৌমের বাড়ি।

তৃতীয় অধ্যায় : ... ২৫২

সার্বভৌমের সঙ্গে আলাপ, 'আত্মারামশ্চ'-শ্লোকের ব্যাখ্যা, ভক্তমহিমা কীর্তন, ষড়ভুজমূর্তি, সার্বভৌমের চৈতন্যস্তব, শ্রীপরমানন্দ পুরী ও শ্রী স্বরূপদামোদর, উৎকলের ভক্তবৃন্দ, শ্রীনিত্যানন্দের বাল্যভাব, শ্রীগদাধরের ভাগবত পাঠ, পুরীজীর কুয়ো, রাজা প্রতাপরুদ্র, প্রভুর গৌড়দেশে প্রত্যাগমন, বিদ্যাবাচস্পতির বাড়ি, লোকের ভীড়, কুলিয়ানগর, বাচস্পতি কর্তৃক প্রভুর স্তুতি, সকলকে প্রভুর দর্শনদান, সঙ্কীর্তনানন্দ, দেবানন্দ পণ্ডিত, বিষ্ণুসেবার চেয়ে বৈষ্ণবসেবার শ্রেষ্ঠত্ব, দেবানন্দ পণ্ডিতকে প্রভুর উপদেশ।

চতুর্থ অধ্যায় : ... ২৬৬

রামকেলি গ্রাম, প্রভুর প্রতি যবনরাজার অনুরাগ, ভক্তবৃন্দের দুশ্চিন্তা, প্রভুকর্তৃক প্রবোধদান, অদ্বৈতভবন, অচ্যুতানন্দের মুখে চৈতন্যতত্ত্ব, শান্তিপুরে শচীমাতা, প্রভুর মাতৃস্তব, শচীমাতার রান্না, মুরারি গুপ্তকে প্রভুর বরদান, কুষ্ঠরোগী, বৈষ্ণবনিন্দার ফল, নিস্তারের উপায়, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শিবপূজা, সপরিকরে প্রভুর আনন্দনৃত্য ও ভোজন।

পঞ্চম অধ্যায় : ... ২৭৮

কুমার হট্টে শ্রীবাসের বাড়িতে প্রভুর আগমন, শ্রীবাসকে বরদান, শ্রীবাস পণ্ডিতকে অগ্রজসেবার উপদেশ, পানিহাটিতে রাঘবপণ্ডিতের বাড়িতে প্রভুর আগমন, নিত্যানন্দ তত্ত্ব, বরাহনগর, ভাগবত পাঠ শ্রবণ, ভাগবতাচার্য, প্রভুর নীলাচলে আগমন, কাশী মিশ্রের বাড়ি, প্রতাপ রুদ্রের আর্তি, শ্রীঅঙ্গদর্শনে প্রতাপ রুদ্রের সন্দেহ, স্বপ্নদর্শন, প্রভুর কাছে প্রতাপরুদ্রের উপস্থিতি ও আনন্দমূর্ছা, প্রভুর শ্রীহস্তস্পর্শলাভ, প্রভুর শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেরণ, পথে পার্ষদগণের ভাবাবেশ, পানিহাটি গ্রামে নিত্যানন্দের আগমন, অভিষেক, জম্বরীবৃক্ষ কদম্বফুল, রাঘবগৃহে নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দের অলঙ্কার-ধারণ, গ্রামে গ্রামে পর্যটন ও কীর্তন প্রচার, গদাধরদাসের মন্দিরে আগামন, মাধবানন্দ ঘোষের 'দানখণ্ড' গান, গদাধরদাসের কাজীর ভবনে গমন, চৈতন্যদাস, সপ্তগ্রামে ত্রিবেনীতীরে নিত্যানন্দের আগমন ও উদ্ধারণ দত্তের উদ্ধার, শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আগমন, নবদ্বীপে শচীমাতা সমীপে, নবদ্বীপে নিত্যানন্দের কীর্তন, নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ-ডাকাত-সর্দারের দ্বারা নিত্যানন্দের অলঙ্কারাদি হরণের চেষ্টা এবং তার পরিণতি।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ... ২৯২

শ্রীপাদনিত্যানন্দ কর্তৃক ডাকাতগণকে উদ্ধার, নিত্যানন্দের সপার্ষদ গ্রাম পরিক্রমা ও কীর্তন প্রচার, নিত্যানন্দের পার্ষদবৃন্দের নাম-ধাম গুণাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সপ্তম অধ্যায় : ... ২৯৫

জনৈক সন্দিগ্ধ ব্রাহ্মণের নীলাচল গমন, নিত্যানন্দ বিষয়ে প্রভুকে প্রশ্ন, প্রভুর সদুত্তর, ভক্তপূজার মাহাত্ম্য, প্রভুর কাছে নিত্যানন্দ তত্ত্ব জেনে নবদ্বীপে ফিরে নিত্যানন্দ সমীপে বিপ্রের ক্ষমা প্রার্থনা, বিপ্রের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহ।

অষ্টম অধ্যায় : ... ২৯৯

শ্রীনিত্যানন্দের নীলাচলে আগমন, উভয়ের পরস্পর প্রীতি, দুর্লভ গোকুলভক্তি, ঈশ্বর ও ভক্তের অভেদত্ব, নিত্যানন্দের জগন্নাথ দর্শন, গদাধরগৃহে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের আনন্দভোজন।

নবম অধ্যায় : ... ৩০৩

নীলাচলে রথযাত্রা, সমাগত বৈষ্ণবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কটকে অদ্বৈতাচার্যের জন্য মহাপ্রসাদ প্রেরণ, আঠার নালায় উভয় দলের মিলন, নরেন্দ্র সরোবরের কূলে, সরোবরে জলকেলি, বৈষ্ণব ও তুলসীর প্রতি ভক্তি।

দশম অধ্যায় : ... ৩০৭

প্রভুকে অদ্বৈতের নিমন্ত্রণ, ঝড়বৃষ্টি, অদ্বৈভবনে প্রভুর একেশ্বর আগমন, অদ্বৈতের মনোবাঞ্ছা পূরণ, অদ্বৈতমহিমা, প্রভুর প্রশ্নে দামোদরের কোপ, তার উত্তর, মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তিই শচীমাতা, লক্ষেশ্বর, কেশবভারতী সমীপে জ্ঞান-ভক্ত বিষয়ে প্রশ্ন, অদ্বৈতচরিত, শ্রীচৈতন্যগীতি, ভক্তবৃন্দের শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন, প্রভুর বিরাগ, বৈষ্ণবগণকে তিরস্কার, অকস্মাৎ শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্তন

করতে করতে সহস্র লোকের আগমন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভগবত্তা, রূপ ও সনাতনের চরিত্র, অদ্বৈতের কৃপায় রূপ-সনাতনের প্রেমভক্তি লাভ, রূপ-সনাতনের প্রতি প্রভুর আদেশ, শ্রীবাস-অদ্বৈততত্ত্ব—প্রভুর কোপ-অদ্বৈত মহিমা-শ্রীবাসের অদ্বৈতভক্তি-প্রভুব সন্তোষ, শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণই কীর্তনবিহারী শ্রীচৈতন্য, সিদ্ধ বৈষ্ণবের আচার-আচরণ দুর্জ্ঞেয়।

একাদশ অধ্যায় : ... ৩১৬

প্রসঙ্গ-জগন্নাথ প্রদক্ষিণ, প্রভু ও অদ্বৈতের কথোপকথন, গদাধরের দীক্ষা বিষযক জিজ্ঞাসা, প্রভু-বাণীঃ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিব আগমন, গদাধরের ভাগবত পাঠ, স্বরূপের উচ্চসঙ্কীর্তন, প্রভুর ভাবাবেশে কূপে পতন, গদাধরের পুনর্দীক্ষা, পুণ্ডরীক-মহমা, জগন্নাথদেবের ওডনষষ্ঠী, মাড়ের কাপড়, জগন্নাথের চড়, দামোদব সমীপে বিদ্যানিধির স্বপ্নবর্ণনা, দামোদরের উল্লাস, অন্ত্যখণ্ডেব সমাপ্তি।

দ্বাদশ অধ্যায় : ... ৩২১

পবিশিষ্ট ও পুনঃকথন, তিন কর্ম, কমল বনে নৌকা, মধপদ, প্রযাগের ঘাট, কাশীশ্বব, নীলাচল, নিত্যানন্দপ্রভু, শেষখণ্ড সম্পূর্ণ।

বর্ণানুক্রমিক পাত্রপরিচয় : ... ৩২৫

লেখকের নিবেদন

সহজ সরল গদ্যে গীতা লেখার পরে চারদিক থেকে প্রচুর উৎসাহ পেয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের গদ্যরূপ শুরু করি। প্রায় এগারো বছরে সেই লেখা পরিমার্জনাদির পর সমাপ্ত হয়। এ কাজটি বলতে গেলে নির্জনে স্ব-ইচ্ছাতেই শুরু করি। পরে নবপত্র প্রকাশনের কর্ণধার শ্রীযুত প্রসূন বসুর আগ্রহে এবং এ প্রতিষ্ঠানেরই শ্রীযুত প্রদীপ দাশগুপ্তের উৎসাহে শ্রীচৈতন্যভাগবতের গদ্যরূপে হাত দিই। এক বছর লেগেছে তা সমাধা করতে।

পিতৃ-পিতামহের আশীর্বাদে এই গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করা গেল। তাঁরা ছিলেন নিতাই-গৌরের পরম ভক্ত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত নিত্য আলোচনা করতে তাঁদের আমি শিশুকাল থেকে প্রত্যক্ষ করেছি। বিদেশী শিক্ষা ধারায় এগিয়ে যৌবনকাল পর্যন্ত তার কোন স্বাদই গ্রহণ করতে পারি নি। আমাদের পিতৃদেব দেশ-সেবক, পরমউদার, বৈষ্ণবাচার্য, মহাভাগবত, সাধক-কবি আদিত্যকুমার গোস্বামীপ্রভু কখনো এ বিষয়ে জোর করে কোন মতবাদ চাপাতে চান নি। যখনই তাঁর সঙ্গে ভারতীয় বৈদিক সমাজ, ভারতীয় ঐতিহ্য বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন নিয়ে অন্যায়-যুক্তি স্থাপন করেছি, তিনি স্মিতহাস্যে যথাযথ উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। আমি তখনো বিদেশী সাম্যবাদে মুগ্ধ, স্বদেশী সাম্যবাদের ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়েও দেখি নি। তিনি হয়তো মনে মনে জানতেন যে সময়মতো সবই হবে। তাই তাঁব আচরণে কখনো হতাশার ভাব লক্ষ্য করি নি।

কালের গতিতে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ-অরবিন্দ হয়ে সেই পারিবারিক ঐতিহ্যে ফিরে আসা গেছে। এভাবেই ঘরের ছেলের ঘরে ফেরা ঘটেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর [খৃঃ ১৪৮৬-১৫৩৩] অন্তর্ধানের ৪৩ বছর পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং আরো ৪১ বছর পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়েছে। অথবা এক কথায় বলা যায়, মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের চার দশক পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং আরো চার দশক পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অর্ধসহস্র বৎসর পবে এই দুই গ্রন্থের গদ্যরূপ প্রকাশিত হল।

এই মহান গ্রন্থ সহজ গদ্যে রূপান্তর করে পৃথিবীর সমস্ত বঙ্গভাষীদের করকমলে অর্পণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ভাষার ব্যাপারে 'বলল-বললে- বললেন' অথবা 'স্নান-চান' ইত্যাদি নানারূপ অনেকটা ভাবানুযায়ী এবং পারিপার্শ্বিক বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে। আশাকরি রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকা-সমাজের তা অনুভব করতে অসুবিধা হবে না।

গদ্যরূপ প্রস্তুত করতে আমি প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ নারায়ণচন্দ্র গোস্বামীর লেখা থেকে অনেক সাহায্য নিয়েছি। আমার সহোদর শ্রীমান বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী পুরাণরত্ন হুগলী মগরা নতুন গ্রাম নিবাসী শ্রীবৈদ্যনাথ ঢক মহাশয়ের কাছ থেকে গ্রন্থাদি এনে দিয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এঁদের কাছে আমায় ঋণের কথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র।

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণ মস্তু।

১৩৫ হাজরা রোড, কলকাতা-২৬

শ্রীপ্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জীবনী লিখতে গিয়ে একটি কথাই বারবার মনে হচ্ছে যে সেকালে লেখকগণ মনের আনন্দে লিখে যেতেন। কে পড়বে, পড়ে কি মনে করবে, লেখকের কতটা সুনাম হবে, লোক-সমাজে কি পরিমাণ খাতির-যত্ন পাওয়া যাবে—এইসব বিষয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা করতেন না। নামের জন্য, যশের জন্য তাঁরা কলম ধরতেন না। তাই নিজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করার বিষয়েও ছিল তাঁদের যথেষ্ট ঔদাসিন্য। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ক্ষেত্রেও তার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যায় না। পূর্ববর্তী একাধিক আচার্য তাঁর বিষয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা করেছেন। আমরা তা থেকে যা পেয়েছি সেই নির্যাস সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিম পারে মামগাছি গ্রাম। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই গ্রামের নাম উল্লেখ আছে,—মোদদ্রুমদ্বীপ। এই মোদদ্রুমদ্বীপ বা মামগাছিতে শ্রীগৌরাঙ্গ-পারিষদ বাসুদেব দত্তের একটি সেবা আছে। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাইঝি নারায়ণী দেবী ঐ সেবানির্বাহের ভারগ্রহণ করে মামগাছিতে বহুদিন বাস করেছেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতেরা পাঁচ ভাই। নলীন পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। নারায়ণী নলীন পণ্ডিতের কন্যা। শ্রীরামের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নলীন পণ্ডিত দীর্ঘজীবন পান নি। অল্প বয়সেই মারা যান। তাই তাঁর বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

মামগাছির বিগ্রহ সেবাটির নাম 'নারায়ণীর সেবা'। এখনও ঐ নামেই লোকে জানে। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শ্রীবাস ও শ্রীরাম কুমারহট্টে সপরিবারে বাস করেন। নারায়ণীকে মামগাছির কাছে কোন গ্রামে বিয়ে দেওয়া হয়। নারায়ণীর স্বামীর নাম বৈকুণ্ঠনাথ মিশ্র। নারায়ণী প্রথম-গর্ভাবস্থায় বিধবা হন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে আর্থিক অসুবিধার কারণেই বাসুদেব দত্তের ঠাকুরবাড়িতে তিনি পূজারিণীর কাজে নিযুক্ত হন। শিশুকালে বৃন্দাবনদাস মায়ের সঙ্গে মামগাছির ঠাকুরবাড়িতেই বাস করতেন। সেই গ্রামেরই চতুষ্পাঠীতে তিনি সংস্কৃত বিদ্যা আয়ত্ত্ব করেন। মামগাছি নবদ্বীপের কাছে ছিল বলেই সেখানেও যথেষ্ট টোল-চতুষ্পাঠী ছিল, অনেক অধ্যাপকও বাস করতেন। এই বর্ধিষ্ণু গ্রামেই বৃন্দাবনদাসের শৈশব অতিবাহিত হয়। শ্রীধাম নবদ্বীপে থেকে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যখন প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন তার শেষের দিকে কবিবর বৃন্দাবনদাস তাঁর সঙ্গলাভ করে পরমানন্দ লাভ করেন।

পরে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁর শ্রীপাট স্থাপন করেন বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে। দেনুড় থেকে নবদ্বীপ আট মাইল পূর্বে অবস্থিত। বৃন্দাবনদাস দেনুড় গ্রামে শ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শেষ বয়সে তিনি রামহরি নামক তাঁর একজন কায়স্থ-শিষ্যের উপরে বিগ্রহ-সেবার ভার দিয়ে বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ছিলেন পরমভাগবত। তাঁর রচনায় সর্বত্রই তিনি গৌরনিত্যানন্দের মহিমা এবং শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। চৈতন্যচরিতের ব্যাসদেব এই বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অনুমানিক ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে প্রায় ৭০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আজীবন ব্রহ্মচারী।

১/১ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভুজযুগল আজানুলম্বিত, কান্তি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, নয়নদুটি পদ্মপাপড়ির মত দীঘল; সঙ্কীর্তনের একমাত্র পিতা, বিশ্বসংসারের ভরণপোষণকারী, যুগধর্মপালক, জগতের প্রিয়কারী দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দয়ার অবতার এই দু জনকে আমি বন্দনা করি।

তুমি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে সত্য, তুমি জগন্নাথ-তনয়; তোমাকে পুত্র কলত্র ভৃত্য সহ নমস্কার করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ নিজ-করুণাবশেই অবতীর্ণ, আলাদা মনে হলেও তাঁরা নিত্য এবং সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর। জগতে অবতীর্ণ এই দুই ভাইকে আমি ভজনা করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জয়যুক্ত হোন, তাঁর পবিত্র অবিনশ্বর কীর্তি জয়যুক্ত হোক, সেই বিশ্বেশ্বর মূর্তির ভৃত্য জয়যুক্ত হোন, তাঁর প্রিয়বর্গের নৃত্যগীতাদি জয়যুক্ত হোক।

সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়গোষ্ঠীর চরণে অশেষ প্রকার দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করছি। বিশ্বম্ভর নাম নিয়ে নবদ্বীপে মহা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, তারপরে তাঁকে বন্দনা করি। তিনি বৈদিক সাহিত্যে ভাগবতে বলেছেন - আমার ভক্তের পূজা আমার পূজার চেয়েও বড়। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন --আমার ভক্তের পূজা আমার পূজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবার কারণ হচ্ছে, আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত আছি। এই ভক্তপূজা প্রেমলাভের সহজ উপায়।

কার্যসিদ্ধি কামনায় সর্বাগ্রে ভক্তের বন্দনা করছি। আমার ইষ্টদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা করি, তাঁর কৃপাতেই শ্রীচৈতন্যকীর্তন স্ফূর্তিত হয়। হাজার মুখে প্রভু বলরামকে বন্দনা করি। তাঁরই সহস্রমুখ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। যেমন খুব প্রিয় স্থানে মহারত্ন রাখা হয় তেমনি শ্রীঅনন্তের বদনে যশোরত্ন রাখা আছে। তাই আগে বলরামের স্তব করলে তবে মুখে চৈতন্যকীর্তন স্ফূর্তিত হবে। সহস্র ফণাধর প্রভু বলরাম মহা উদ্দাম নৃত্য করছেন, প্রকাণ্ড শরীরধারী প্রভু হলধর শ্রীচৈতন্য রসে মহা মত্ত। তাঁর চেয়ে প্রিয় আর কেউ নেই, তাই সেই দেহে চৈতন্য সর্বদা বিহার করেন। যে তাঁর চারত্রকীর্তন করে শ্রীচৈতন্য তার পরম সহায় হন। পার্বতীপরমেশ্বর তার প্রতি প্রীত হন, এবং তার জিহ্বায় সরস্বতী বিরাজ করেন। অসংখ্য দেবীগণকে নিয়ে পার্বতী ও শিব সঙ্কর্ষণকে পূজা করেন। পঞ্চম স্কন্ধের এই ভাগবতকথা বলরামগাথা সকল বৈষ্ণবের প্রিয়। বৃন্দাবনে গোপীগণের সঙ্গে যে বিহার করেছেন সেই রাসক্রীড়া কথা বড়ই চমৎকার। বসন্ত কালের মাধব ও মধু দুই মাস বলরাম রাসক্রীড়া করেছেন। ভাগবত কাহিনীতে তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিতকে শুনিয়েছেন।

ভগবান বলরাম নিশাকালে গোপীগণের সঙ্গে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বৃন্দাবনে রাসক্রীড়া করেছিলেন। পূর্ণিমার আলোতে তাঁকে আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, হাওয়াতে পদ্মগন্ধ ভেসে আসছিল, তখন তিনি যমুনার উপবনে রমণীমণ্ডলে পরিবৃত হয়ে রমণ করছিলেন। ইন্দ্রের হাতি ঐরাবতকে যেমন হস্তিনীগণ ঘিরে থাকে তেমনি তিনিও রমণীগণে পরিবৃত হয়ে রমণ করছিলেন আর গন্ধর্বগণ তার স্তুতি করছিলেন। আকাশে দুন্দুভি বাজছিল, গন্ধর্বগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন, মুনিরা তখন বলরামের বীরত্বগাথা গেয়ে তাঁর স্তব আরম্ভ করলেন।

মুনিরা সাধারণত স্ত্রীসঙ্গকে নিন্দাই করে থাকেন কিন্তু তখন তাঁরাও বলরামের রাসক্রীড়ার প্রশংসা করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যে অভেদ তা দেবগণ জানেন বলেই রাসস্থলীতে তাঁরা এসে পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন। বেদে গুপ্ত থাকলেও পুরাণে এর বর্ণনা রয়েছে। পুরাণ আলোচনা না করার জন্যই অনেকে বলরামের রাসক্রীড়ার কথা জানে না। বৃন্দাবনে দুই ভাই এক সঙ্গেই গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করেছিলেন।

শঙ্খচূড়-বধ প্রসঙ্গে ভাগবতে বলা হয়েছে—একদা রজনীতে অলৌকিক বিক্রমশালী গোবিন্দ ও বলরাম ব্রজধামের উপবনে গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে বিহার করেছিলেন। দুজনেরই দিব্যদেহে চন্দন মাল্য ভূষিত ছিল, পরিধানে সুনির্মল বস্ত্র। সান্ধ্যগগনে তারকাগণ সহ চন্দ্র উদিত হয়েছেন। অলিকুল মল্লিকার মধুগন্ধে মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাওয়াতে পদ্মগন্ধ বইছে। সেই সন্ধ্যাকে তাঁরা সম্বর্ধনা জানালেন, তাঁদের প্রেয়সীগণ বিশুদ্ধ তান-লয়ে সঙ্গীত আরম্ভ করেছেন, তাঁরা দুজনেও তখন মনমাতানো সুশ্রাব্য গান গাইতে শুরু করে দিলেন।

ভাগবতে এই বলরামের রাসের কথা যাদের ভাল লাগবে না বৈষ্ণবগণ তাদের এড়িয়েই চলবেন। যে ভাগবত মানে না সে তো যবনসদৃশ, জন্মে জন্মান্তরে সে যমের হাতে শাস্তি ভোগ করে। বলরামের রাসের কথা কোথায় আছে—বলে তারা অযথা লাফালাফি করে। পাপীরা শাস্ত্র দেখেও মানতে চায় না, একটাকে আরেকটা বলে। চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলরামকে না মেনে অপরাধের ভাগী হয় তারা। মূর্তিভেদে প্রভু নিজে ভক্তরূপ ধরেন, অবতারে সে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রভু নিজেই বন্ধু, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন, গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, নানা ভূষণ আসন ইত্যাদি রূপ গ্রহণ করে নিজেকে সেবা করেন। তাঁর অনুগ্রহ পেলেই এসব বুঝতে পারা যায়।

যামুনমুনি বিরচিত স্তোত্ররত্নে আছে—হে ভগবান বিষ্ণু, তুমি লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে যে অনন্তনাগের উপরে বিরাজিত রয়েছ সেই অনন্তনাগকে সাধারণ লোকেরা বলে 'শেষ'। তিনিই তোমার নিবাস- বাসস্থান, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপাধান, ছত্র ইত্যাদি সেবার দ্রব্যাদি নিজের শরীর দিয়েই করে থাকেন। এসব কাজ তিনি করেন কোন ফলের আশা না করেই, তোমার যাতে সুখ হয় এই তাঁর অভিলাষ।

শ্রীগরুড় পাখী এই অনন্তেরই অংশ। লীলার কারণে তিনি আনন্দে নারায়ণ-শ্রীকৃষ্ণকে বহন করেন। প্রভুর ভক্ত শ্রীঅনন্তকে ব্রহ্মা, শিব, সনকাদি কুমার, ব্যাসদেব, শুকদেব, নারদমুনি প্রমুখ সকলেই পূজা করেন। তিনি সহস্রবদন এবং ভক্তিরসে আপ্লুত। এঁর সব মহিমা দেবাদিদেবও জানেন না। তাঁর সেবার কথা বলা হল, এবারে তাঁর ঠাকুরালির কথা বলা হচ্ছে। তিনি আত্মতন্ত্রে পাতালে বাস করেন। শ্রীনারদমুনি তম্বুরু বাজিয়ে ব্রহ্মার কাছে তাঁর গুণকীর্তন করে থাকেন।

ভাগবত বলেন—ভগবান অনন্তদেবের ঈক্ষণ-প্রভাবে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণ প্রাকৃত এবং জড় হলেও নিজেদের কাজ করতে পারছে। এই গুণ তিনটিই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। ভগবান অনন্তদেব এক হয়েও নিজেতেই দৃশ্যমান কার্যপ্রপঞ্চরূপে বহু সৃষ্ট পদার্থ আবির্ভূত করেছেন, তাঁর স্বরূপ অনন্ত ও অনাদি, সকলেই এঁর তত্ত্ব কি করে জানবে ? সেবাপরায়ণ আমাদের প্রতি অতীব অনুগ্রহে তিনি কার্যকারণাত্মক সৎ-অসৎ নিখিল বস্তু প্রকাশক বিশুদ্ধসত্ত্বরূপে স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হন। তিনি বহু প্রভাববান। ভক্তদের হৃদয় আকর্ষণের ইচ্ছায় তিনি পরম পবিত্র লীলা অলৌকিক ভাবে

অনুষ্ঠান করছেন। বনের রাজা সিংহও স্বজনের মনোরঞ্জনের জন্য এই লীলাই তাঁর কাছ থেকে শিখেছে।

হঠাৎ, অন্যের কাছে শুনে, রোগে পড়ে, পরিহাস করে অথবা পতিত হয়ে কেউ তাঁর নামকীর্তন করলেই সে পাপ থেকে মুক্তি পায়। এই অনন্তদেব যথাশীঘ্র মানুষের সমস্ত পাপ দূর করে দেন। মুক্তিকামী লোক তাই এই শেষদেব অনন্তকেই ভজনা করে। এই সহস্রশীর্ষ পুরুষের মাথায় গিরি, নদী, সমুদ্র ও সহস্র প্রাণীসহ পুরো ভূমণ্ডল অণুর মত অবস্থান করছে। সহস্রজিহ্বা পেলেও কোন লোক অসীম প্রভাবশালী বিভুর বর্ণনা করতে পারে না। ভগবান অনন্তদেবের প্রভাব এই রকমই। তাঁর বল, গুণ, প্রভাব অপরিসীম। তিনি রসাতলের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে লীলা করে এই ভূমণ্ডলকে ধারণ করে আছেন। তিনি কোন কিছুর উপর নির্ভর করে নেই, তিনি নিজেই নিজের আধার।

অনন্তদেবের দৃষ্টিপাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সত্ত্ব ইত্যাদি গুণ পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করে। সত্য অনাদি মহত্ত্ব রূপে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর তত্ত্ব কেউ বুঝতে পারে না। তিনি করুণাবশে শুদ্ধসত্ত্ব রূপ ধারণ করেন। তাঁর কাছ থেকে শিখেই পশুরাজ সিংহ নিজ-জনকে স্নেহ প্রকাশ করে। যে কোন লোক যে কোন প্রকারে তাঁর নাম শ্রবণ-কীর্তন করলেই বহু জন্মের বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পারে। তাই বৈষ্ণবগণ তাঁকে ধরে আছেন। এই শেষদেব ছাড়া কারো কোন গতি নেই। এই নামেই সকলে উদ্ধার পাবে। তাঁর সহস্র ফণার এক ফণাতে একটি বিন্দুর মত পর্বত সমুদ্র সহ ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি ধারণ করে আছেন। তাঁর অনন্ত বিক্রমের কথা সকলেই কি আর জানে? তিনি সর্বদা সহস্রবদনে কৃষ্ণগুণগান কীর্তন করছেন।

কৃষ্ণ-বলরামে কোন ভেদ নেই। ব্রহ্মা রুদ্র দেবগণ শ্রেষ্ঠমুনিগণ আনন্দে সব দর্শন করছেন। দুজনই বলবন্ত। অন্ত না পেয়ে আজও সহস্রদেব সহস্রশ্রীমুখে চৈতন্য-যশ কীর্তন করছেন। এই কীর্তন করে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করছেন।

ভাগবতে ব্রহ্মা পুত্র-নারদকে বলছেন— সেই পুরুষের মায়ার প্রভাব-পরিমাণ আমি আজও জানতে পারি নি, তোমার অগ্রজ সনকাদি মুনিগণও তা জানে না। সহস্রবদন আদিদেব-শেষ তাঁর অশেষ গুণগান করতে করতে এখনো তাঁর সীমা পান নি, অন্যের কথা আর কি বলব?

সৃষ্টি পালনের জন্য তিনি সানন্দে রসাতলে রয়েছেন, নারদ ব্রহ্মার সভাতে গিয়ে বীণা বাজিয়ে এই সংবাদ দিয়ে এসেছেন। এই যশোকীর্তন শুনে ব্রহ্মাদি দেবগণ আকুল হয়েছেন, নারদমুনি এই গুণকীর্তন করেই সর্বত্র পূজিত হচ্ছেন।

ভগবান শ্রীঅনন্তনাগের প্রতি যাতে সকলের শ্রদ্ধা জন্মে সেইজন্য তার অনন্ত প্রভাবের কথা কিছু বলা হল। ভক্তিবলে যে সংসার পার হতে চায় সে অবশ্যই নিতাইচাঁদকে ভজনা করবে। বৈষ্ণবগণের চরণে এই মনস্কামনা জানাই যে চিরজন্ম যেন প্রভু বলরামকে ভজন করতে পারি। দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণ এই বিভিন্ন শব্দের যেমন একই অর্থ তেমনি অনন্ত, বলদেব, নিত্যানন্দ একই কথা।

অন্তর্যামী নিত্যানন্দের আদেশেই চৈতন্যচরিতকথা লেখা হচ্ছে। শেষ-অনন্তের জিহ্বা যশের ভাণ্ডার। তাঁরই কৃপায় চৈতন্যকীর্তন স্ফুরিত হচ্ছে। তাই যশোময় বিগ্রহ অনন্তদেবের পদবন্দনা করা হল। একমাত্র ভক্তগণের কৃপা হলেই চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য-চরিত-কথা কীর্তন করা যায়। বেদগুহ্য চৈতন্যকথা জানা তো সম্ভব নয়, ভক্তদের মুখে যেমন শুনেছি

তেমনি লিখছি। এই চৈতন্যচরিতের আদি-অন্তও কিছু নেই, তিনি কৃপা করে যা লেখাচ্ছেন তাই লিখছি। পুতুলনাচের মত গৌরচন্দ্র আমাকে দিয়ে বলাচ্ছেন। এতে আমার যেন কিছু অপরাধ না হয়, আমি সর্ববৈষ্ণবের চরণে নমস্কার নিবেদন করে কাজ শুরু করছি। ভক্তসঙ্গে যে সব লীলা করেছেন সেই শ্রীচৈতন্যকথা যথাযথ সকলে মন দিয়ে শুনুন। আদি, মধ্য, অন্ত এই তিন খণ্ডে আনন্দধাম চৈতন্যলীলা কীর্তন করা হবে।

আদিতে বিদ্যাবিলাস, মধ্যে কীর্তনাদি এবং শেষ খণ্ডে সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে অবস্থান, গৌড়মণ্ডলকে নিত্যানন্দের কাছে সমর্পণ। এই ক্রমে গ্রন্থবর্ণনা করা হচ্ছে। বসুদেবের মত স্বধর্মনিষ্ঠ জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে বসবাস করছেন। জগন্মাতা দেবকীর মতই মহাপতিব্রতা শচী দেবী তাঁর স্ত্রী। এঁরই গর্ভে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ কালে চারদিকে হরিনাম-মঙ্গলের শব্দে প্রভু জন্মগ্রহণ করলেন। শিশুকালে তিনি পিতামাতাকে অনেক গুপ্ত চিহ্ন দেখালেন। ঘরের মেঝেতে তাঁর পায়ের ছাপে ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ পতাকার চিহ্ন পাওয়া গেল। শিশুবেলায় প্রভুকে একবার চোরে নিয়ে গিয়েছিল। প্রভু সেই চোরকেই ভুলিয়ে আবার নিজের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। শ্রীহরিবাসরে জগদীশ হিরণ্যের ঘরে প্রভু নৈবেদ্য খেয়েছিলেন। শিশুকালেই কান্নার ছলে প্রতিবেশী সকলের মুখে হরিনাম বলিয়ে ছেড়েছেন। অস্পৃশ্য আবর্জনার উপরে বসে মাকে তত্ত্বকথা শুনিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবিহারের মতই প্রভু শিশুকালে বহু চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছেন। গৌরাঙ্গ পড়তে আরম্ভ করে অল্পেতেই মহাপণ্ডিত-অধ্যাপক হয়ে গেলেন। এর পর জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করলেন, বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন, শচীদেবী দুটি বড় শোক পেলেন। বিদ্যাবিলাসের প্রারম্ভেই নিমাই পাষণ্ডীদের কাছে মূর্তিমান অহংকারের মত হয়ে পড়লেন। সহপাঠীদের সঙ্গে তিনি গঙ্গার ঘাটে জলকেলি করেন, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের কাছে কেউ এগোতে পারছে না। এই সময়ে বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে পুত্রের বিয়ে হওয়াতে শচীদেবীর মনে আর আনন্দ ধরে না। এর পর তিনি পূর্ববঙ্গে গেলেন, তাঁর চরণ স্পর্শে পূর্বখণ্ড তীর্থ হয়ে গেল। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুতে রাজপণ্ডিতের কন্যার সঙ্গে দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। বায়ুরোগের অছিলায় তিনি প্রেমভক্তির চিহ্নসকল প্রকাশ করলেন। মহাপণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি হল, ভক্তগণও দেখে খুশি, পোশাকে পরিচ্ছদে বেশ সুখে আছেন, শচীদেবীও চাঁদমুখ দেখে আনন্দে ভাসেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করে তাঁর সব বন্ধন মোচন করলেন। বিশ্বম্ভর-নিমাই গয়া গিয়ে পিতৃতর্পণ করলেন, ঈশ্বরপুরীকে কৃপা করলেন। এই সকল ঘটনা সবই আদি খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

মধ্যখণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে যে ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে চিনতে পেরেছেন। অদ্বৈত এবং শ্রীবাসের বাড়িতে প্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসেছেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা হল, দুই প্রভু এক সঙ্গে কীর্তন করছেন। নিত্যানন্দ ষড়ভুজ রূপ দেখালেন, অদ্বৈত দেখলেন বিশ্বরূপ। নিত্যানন্দ-ব্যাস-পূজা হল, পাপিষ্ঠগণ নিন্দায় পঞ্চমুখ, নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের হাতে হল মুষল দিলেন। জগাই মাধাই নামের দুই পাষণ্ডকে উদ্ধার করা হল। শচীমাতা চৈতন্যকে কৃষ্ণরূপে শ্যামবর্ণ এবং নিত্যানন্দকে বলরামরূপে শুক্লবর্ণ দেখতে পেলেন। প্রভু সাতপ্রহরিয়া ভাবে ঐশ্বর্যবিলাসের মহাপ্রকাশ দেখালেন। কোন্ ভক্ত কোথায় জন্মেছেন তাও প্রভু বিশদ ভাবে বলতে লাগলেন। তিনি নগরকীর্তনে বেরোলেন। কাজীর ঘর ভেঙ্গে নিজশক্তি প্রকাশ করলেন, প্রভুর ভয়ে কাজী পালাল, পরে স্বচ্ছন্দে নগরকীর্তন

হল। বরাহরূপ ধরে গর্জন করে তিনি নিজতত্ত্ব মুরারিকে বললেন। মুরারি গুপ্তের কাঁধে চড়ে চতুর্ভুজ রূপে উঠোনে ঘুরে বেড়ালেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে ভোজন করলেন। প্রভু রুক্মিনীর বেশে নৃত্য করলেন, ভক্তগণ স্তনপান করলেন। সঙ্গদোষের জন্য মুকুন্দকে দণ্ড দিয়ে শেষে আবার অনুগ্রহ করলেন। এভাবে নবদ্বীপে এক বৎসর কাল কীর্তনাদি চলল। আবার অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে মহাপ্রভুর যে কৌতুকাদি হয় সাধারণ লোকে তাকে মনে করে ঝগড়া। জননীর বৈষ্ণব অপরাধ মোচন করলেন। বৈষ্ণব ভক্তগণ সকলেই প্রভুকে স্তব করে বর লাভ করলেন। হরিদাস প্রসাদ পেলেন, কারুণ্য প্রকাশ করে শ্রীধরের ভাঙ্গাপাত্রে জলপান করলেন। ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান করেন। নিত্যানন্দকে নিয়ে এক বার অদ্বৈতের ঘরে গিয়েছিলেন, অদ্বৈতকে দণ্ডদান করে আবার পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করলেন। মহা[illegible] গুপ্ত জানতে পারলেন চৈতন্য নিত্যানন্দই কৃষ্ণ বলরাম। দুই ভাই এক সঙ্গে শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্য করলেন। শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে জীবতত্ত্ব বলিয়ে শ্রীবাসের দুঃখ মোচন করলেন, চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাসের পুত্রশোক নিবারিত হল। মাঝে মধ্যে প্রভু রাগ করে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতেন আর নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁকে তুলে আনতেন। ব্রহ্মার পক্ষেও যা দুর্লভ সেই প্রসাদ লাভ করলেন। আরো কত সহস্র সহস্র লীলা আছে, সব কি বর্ণনা করা সম্ভব? পরবর্তী কালে বেদব্যাস তা বর্ণনা করবেন।

শেষ খণ্ডে আছে, বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস নিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম প্রকাশ করলেন। তাঁর মুণ্ডিত মস্তক দেখে অদ্বৈতাচার্য কেঁদে ফেললেন। শচীমাতার অবর্ণনীয় দুঃখ, ভক্তগণের বিলাপ। নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড ভেঙ্গে ফেললেন। প্রভু নীলাচলে গিয়ে থাকলেন। ক্রমান্বয়ে সার্বভৌমকে ষড়ভুজ রূপ দেখালেন। কাশী মিশ্রের ঘরে থাকলেন, রাজা প্রতাপরুদ্রকে পরিত্রাণ করলেন। এই সময় স্বরূপদামোদর এবং পরমানন্দপুরী প্রভুর খুব কাছাকাছি ছিলেন। মথুরা যাওয়ার জন্য মহাপ্রভু গৌড়ে এসেছিলেন, সে সময় বিদ্যাবাচস্পতির ঘরে ছিলেন। হাজার হাজার লোক এসে ভীড় করল প্রভুকে দেখার জন্য। সকলকে উদ্ধার করে প্রভু কুলিয়া নগরে এলেন। কিছু দূর এগিয়ে আবার ফিরে এলেন, নীলাচলে চলে গেলেন। সর্বদা ভক্তগণসঙ্গে কীর্তন করে চলেছেন। দু চার জনকে নিয়ে তিনি নীলাচলে থাকলেন এবং নিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়ে পাঠিয়ে দিলেন। রথযাত্রায় জগন্নাথ বিগ্রহের সামনে নৃত্য করলেন। ভক্তগণকে নিয়ে তিনি নিজেই বিগ্রহের সামনে নেচে চলেছেন। পরে সেতুবন্ধ গেলেন। ফিরে এসে ঝাড়িখণ্ডের পথ ধরে মথুরায় গেলেন। রামানন্দ রায়ের উদ্ধার, মথুরা ভ্রমণ, দবিরখাসদের দুই ভাইকে উদ্ধার এবং তাদের 'রূপ সনাতন' নাম রাখা, বারানসী গমন, [illegible] সন্ন্যাসিদের সঙ্গ, পুনরায় নীলাচলে এসে দিবানিশি হরিসঙ্কীর্তন — এই সব চলল। কিছুদিন পরে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, [illegible] নাম রসে সমস্ত মথুরা পূর্ণ করলেন, তারপর মহাপ্রভুর আজ্ঞাতে পানিহাটি থেকে ভক্তিধর্ম প্রচার শুরু করলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রকাশ করে বণিক শ্রেণীকে উদ্ধার করলেন। আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আঠার বৎসর নীলাচলে বাস করলেন। চৈতন্যের অনন্ত বিলাস বেদব্যাস বর্ণনা করবেন।

যে কোন প্রকারেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বড় প্রীত হন। নিতাই গৌরের কৃপায় সংক্ষেপ সূত্র বলা হল। এই ভাবে তিনটি খণ্ড

বর্ণনা করা হবে। এখন প্রথম খণ্ড চলছে। শ্রীচৈতন্য কি ভাবে অবতীর্ণ হলেন তাই এবার বলা হচ্ছে।

১/২ জগন্নাথপুত্র মহামহেশ্বর মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের জয়। নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন, অদ্বৈতাদি ভক্তগণের আশ্রয় শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দ সহ জয়গান করছি। চৈতন্যকথা শুনলেও ভক্তি লাভ করা যায়। ভক্তবৃন্দ সহ প্রভুপদে প্রণাম নিবেদন করছি, জিহ্বায় গৌরচন্দ্র স্ফুরিত হোন। শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র ও শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দের জয়। প্রভু ও ভক্তের তত্ত্ব জানা বড়ই দুরূহ তথাপি তাঁদেরই কৃপাতে তা ব্যক্ত হয়। বেদে ভাগবতে সর্বশাস্ত্রে বলে যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই ব্রহ্মাদির হৃদযে তা স্ফূর্তি হয়।

ভগবতে আছে—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদাতা শ্রীভগবান কল্পারম্ভকালে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিবিষযে স্মৃতিশক্তি বিস্তার করেছিলেন এবং তাঁরই প্রেরণায় ব্রহ্মার বদন থেকে ভগবৎ-ধর্ম-প্রকাশক শিক্ষা-লক্ষণের বেদবাণী আবির্ভূত হয়েছিল। সেই শ্রীভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

পূর্বকালে নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তখন সর্বপ্রকারে প্রভুর শরণ নিলেন এবং তিনি কৃপা করে দর্শন দান করলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায সরস্বতী স্ফুরিত হলেন, ব্রহ্মা তবে সর্ব অবতার বিষয়ে জানতে পারলেন। এমন শ্রীকৃষ্ণের দুর্জ্ঞেয় অবতার কথা তাঁর কৃপা ছাড়া কি করে জানা যাবে? ভাগবতে ব্রহ্মা নিজেই বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণের অবতার কাহিনী অজ্ঞেয় এবং অচিন্ত্য।

ভাগবতেই—অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা যোগেশ্বর ভগবান নিজশক্তি যোগমায়াকে নানাভাবে বিস্তারিত করে লীলা করেন, তাঁর সেই লীলা কত রূপে, কোথায, কেন আর কখন অনুষ্ঠিত হয তা ত্রিভুবনে কেউ জানতে পারে না।

কি কারণে শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করেন তা কেউ জানে না, তথাপি গীতা এবং ভাগবতে যা বলা হয়েছে সেভাবেই লেখা হচ্ছে।

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে অর্জুনকে বলেছেন—যে যে সময়ে ধর্মের পতন আর পাপের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি জন্ম গ্রহণ করি। সাধুলোকদের পবিত্রাণের জন্যে ও পাপীদের বিনাশের জন্যে এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

যখন ধর্ম পরাভূত হয়ে অধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে তখন সাধুজনের রক্ষা ও দুষ্টদমনের জন্য ব্রহ্মা-আদি দেবগণ প্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা জানান। প্রভু যুগধর্ম স্থাপনের জন্য সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। কলিযুগের ধর্ম 'হরিসংকীর্তন' প্রচার করার জন্য শ্রীশচী নন্দন অবতীর্ণ হয়েছেন। এই সর্বতত্ত্বের সারকথা বলেছেন শ্রীমদ্‌ভাগবত।

দ্বাপরযুগেও সকলে শ্রীভগবানের স্তব করেছেন, কলিযুগেও নানাবিধ তন্ত্রের বিধানে তাঁর স্তব করা হয়। যথা, তিনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ, বাইরে গৌরাঙ্গ। সৌভাগ্যশালী জ্ঞানীগণ প্রবল সঙ্কীর্তন যজ্ঞ দ্বারা তাঁর পূজা করে থাকেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর অঙ্গ উপাঙ্গ ও অস্ত্র এবং পার্ষদগণেরও অর্চনা করেন।

কলিযুগে হরিসংকীর্তনই সর্বসাধারণের ধর্ম। এই ধর্ম পালন করবার জন্যই শ্রীচৈতন্য পরিকরবৃন্দ সহ আবির্ভূত হযেছেন। যার যেই অংশ সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অনন্তদেব, শিব, বিরিঞ্চি, ঋষিগণ সকলে অবতারের পার্ষদ ও ভক্তরূপে মনুষ্যসমাজে জন্মলাভ

কবেছেন। কেউ নবদ্বীপে, কেউ চট্টগ্রামে, কেউ বাঢ অঞ্চলে, কেউবা শ্রীহট্টে অথবা পশ্চিমে নানা স্থানে জন্মগ্রহণ কবেও নবদ্বীপে এসে সকলে প্রভুব সঙ্গে মিলিত হযেছেন। নবদ্বীপেব মত গ্রাম ত্রিভুবনে নেই, এখানেই শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হলেন। অনেক বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ কবেছেন নবদ্বীপে, আবাব অনেক বড বড ভক্ত অন্য স্থানেও জন্মেছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীবাম পণ্ডিত এবং শ্রীচন্দ্রশেখব ছিলেন সর্বপূজ্য। শ্রীমুবাবি গুপ্ত ছিলেন বড কবিবাজ। এঁবা সকলেই জন্মেছেন শ্রীহট্টে। বৈষ্ণবপ্রধান পুণ্ডবীক বিদ্যানিধি, চৈতন্যেব প্রিয সেবক বাসুদেব দত্ত— এঁদেব জন্ম হযেছে চট্টগ্রামে। বুঢন গ্রামে অবতীর্ণ হযেছেন ভক্ত হবিদাস। বাঢ অঞ্চলে একচাকা নামক গ্রামে অবতীর্ণ হযেছেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা বলবাম- নিত্যানন্দ সর্বলোকেব পিতা হযেও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হাডাই পণ্ডিতকে পিতৃৰূপে গ্রহণ কবলেন। তাঁব জন্মসমযে দেবগণ সঙ্গোপনে পুষ্পবৃষ্টি কবে জযধ্বনি কবলেন, সেদিন থেকে বাঢ অঞ্চলে নানাবিধ মঙ্গলচিহ্ন দেখা দিতে লাগল। ত্রিহুতে পবমানন্দ পুবী প্রকাশিত হলেন, নীলাচলে তিনি প্রভুব সহচব ছিলেন।

গঙ্গাতীবে পুণ্যস্থান ছেডে বৈষ্ণবগণ অন্যস্থানে জন্মগ্রহণ কবেন কেন ? প্রভু নিজে গঙ্গাতীবে অবতীর্ণ হলেন কিন্তু পার্ষদগণ দূবে জন্ম নিলেন কেন ? যে সব স্থানে গঙ্গা নেই, হবিনাম নেই, সেসব স্থান তো পাণ্ডববর্জিত। জীবেব প্রতি বাৎসল্যবশত শ্রীকৃষ্ণ পার্ষদগণকে নানা জাযগায ছিটিযে দিযেছেন। তিনি নিজমুখেই বলেছেন -সংসাবকে উদ্ধাব কবাব জন্যই শ্রীচৈতন্য অবতাব। অনুন্নত দেশে কুলে নিজেব সমান বৈষ্ণবগণকে অবতীর্ণ কবিযে তিনি সমগ্র মানব সমাজকে উদ্ধাব কববেন। যে স্থানে যে বংশে ভক্তেব জন্ম হয তাব পাবপার্শ্বিক বহু দব পর্যন্ত সকলেই উদ্ধাব লাভ কবেন। বৈষ্ণবগণেব লীলাস্থান অতি পণ্য তীর্থ হয, তাই শ্রীচৈতন্যপ্রভু নানা স্থানে ভক্তগণকে অবতীর্ণ কবালেন। নবদ্বীপে প্রভুব অবতাব আসছেন বলেই সকলে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন। নবদ্বীপেব মত স্থান ত্রিভবনে নেই। নবদ্বীপে প্রভু অবতীর্ণ হবেন বলেই তাকে স্বযংসম্পূর্ণ কবে সৃষ্টি কবা হযেছে।

নবদ্বীপেব ঐশ্বর্য বর্ণনা কবা বড সহজ কথা নয। এখানে একেকটি ঘাটে লক্ষ লোক স্নান কবে, নানা বযসেব অগণিত লোক, তাদেব মধ্যে অনেকেই মহামহোপাধ্যায পণ্ডিত। সকলেই নিজেকে বড অধ্যাপক বলে মনে কবে, বালকেও পণ্ডিতেব সঙ্গে তর্ক জুডে দেয। নানা স্থান থেকে লোকে বিদ্যালাভেব জন্য নবদ্বীপে আসে। ছাত্রও অসংখ্য, এখানে অধ্যাপকও অনেক। স্ত্রীপুত্র নিযে সকলেই সুখে সংসাবজীবন যাপন কবছে। কিন্তু ধর্মেকর্মে মতিগতি নেই বললেই চলে। বাতজেগে মঙ্গলচণ্ডীব গীতকেই ধর্মকাজ বলে মনে কবে, অনেক টাকা খবচ কবে ধুমধামেব সঙ্গে বিষহাব পূজা কবে। ছেলে মেযেব বিযেতে অনেক টাকা খবচ কবে। এসব নিযেই ব্যস্ত, এব বাইবে কিছু আছে বলে জানে না। ব্রাহ্মণগণও শাস্ত্র তত্ত্ব অনুধাবন কবেন না। শাস্ত্রেব অপব্যাখ্যা কবে শ্রোতা পাঠক দুজনেই পাপে ডুবে মবে। ধর্মেব নানা বকম ব্যাখ্যা কবে, কিন্তু কেউ কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা কবে না। বৈবাগী সন্ন্যাসীবও মনে ধর্মেব অহংকাব আছে, কিন্তু মুখে হবিনাম নেই। অতি ভাগ্য বশে স্নানেব সময 'গোবিন্দ পুণ্ডবীকাক্ষ' উচ্চাবণ কবে। গীতা ভাগবত যাবা পডে তাবাও ভক্তিব্যাখ্যা কবে না। বিষ্ণুমাযা মোহিত সংসাবেব এই অবস্থা দেখে ভক্তগণ মনে মনে বড দুঃখ অনুভব কবেন। তাঁবা সর্বদা ভাবেন.—বিষযসুখে সংসাবে মত্ত হযে আছে, এসব জীব কি কবে উদ্ধাব পাবে ? সব সময কেবল উপাধি আব বংশেব অহংকাব

কবে, বললেও কেউ কৃষ্ণনাম নেয না। তাই বৈষ্ণবগণ গঙ্গাস্নান কবে কৃষ্ণপূজা কবে জগতেব কল্যাণ কবেন, প্রার্থনা জানান,——ভগবান যেন সকলেব মঙ্গল কবেন।

তখন নবদ্বীপে স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব অদ্বৈতাচার্য বাস কবতেন। তিনি জ্ঞান-ভক্তি-বৈবাগ্যেব গুরুস্থানীয। কৃষ্ণভক্তি প্রচাবেও তিনি শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি সর্বদা তুলসী মঞ্জবী দিয়ে গঙ্গাজলে হুঙ্কাব কবে কৃষ্ণকে আহ্বান কবেন। তাঁব সেই হুঙ্কাব যেন ব্রহ্মাণ্ড ভেদ কবে বৈকুণ্ঠে পৌঁছে গেল। তাঁব সেই প্রেমহুঙ্কাবেব ভক্তিব জোবে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হলেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে এই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অদ্বৈতেব ভক্তিযোগেব তুলনা নেই। অদ্বৈতাচার্য মনে দুঃখ পাচ্ছেন যে লোকেবা সংসাব নিযে মত্ত, সংসাবে কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নেই। কেউ নানা উপচাবে বাশুলীপূজা কবে, কেউ মদ্য-মাংস সহযোগে যক্ষ পূজা কবে, নাচ গান বাজনায মত্ত, পবম-মঙ্গল কৃষ্ণনাম কেউ শুনতে চায না। কৃষ্ণশূন্য পূজাতে দেবতাবাও তুষ্ট হন না, — এই সব কথা ভেবে অদ্বৈতাচার্য মনে বড়ই দুঃখ পান। অদ্বৈতেব চিত্ত করুণায পূর্ণ, তাই তিনি সর্বদা জীবেব উদ্ধাবেব কথা চিন্তা কবেন। ভাবেন, ——যদি প্রভু নিজে অবতীর্ণ হন কেবল মাত্র তাহলেই এবা উদ্ধাব পেতে পাবে। বৈকুণ্ঠ থেকে ভগবানকে এখানে টেনে আনতে পাবলে তবেই তো আমাব আচার্য নাম সার্থক হতে পাবে, ভগবানকে নিযে এখানে নেচে গেযে জীবকে উদ্ধাব কবব। এই সংকল্প কবে তিনি সবসময একাগ্র চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকছেন। প্রভু নিজেও বলেছেন যে তিনি অদ্বৈতেব কাবণেই অবতীর্ণ হযেছেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতও নবদ্বীপেই বাস কবেন, তাঁব গৃহেই শ্রীচৈতন্য কীর্তনাদি কবেছেন। তাঁবা চাব ভাই সকলেই কৃষ্ণনাম কীর্তন কবেন। গঙ্গাস্নান কবে ত্রিসন্ধ্যা কৃষ্ণপূজা কবেন। [illegible] কেই নবদ্বীপে আছেন, সকলেই শ্রীচৈতন্যেব আবির্ভাব আগেই [illegible] হচ্ছেন শ্রীচন্দ্রশেখব, জগদীশ, গোপীনাথ, মুবাবি গুপ্ত, গরুড়, গঙ্গাদাস [illegible]। [illegible] এঁদের সকলেব বিষযেই আলোচনা হবে। এবা সবাই [illegible] ছাড়া আব কিছু জানেন না। সকলেই সকলেব সঙ্গে [illegible] কবছেন। কেউ কাবো নিজ অবতাব বিষযে যেন কিছুই জানেন না। চাব দিকে কৃষ্ণভক্তিব অভাব দেখে এবা সকলেই মনে বড় কষ্ট পাচ্ছেন। কাব কাছে কৃষ্ণকথা শুনবেন এমন লোক পাচ্ছেন না, তাই তাঁবা নিজেবাই মিলে কীর্তন কবেন। অদ্বৈতাচার্যেব কাছে গিযে কিছু সময কৃষ্ণকথা শুনে তাঁদেব মনেব দুঃখ দূব হয। সকল সংসাব দুঃখে যেন পুড়ছে, বৈষ্ণবগণ যে মিলে এবিষযে আলাপ কববেন তেমন স্থানও পাচ্ছেন না। কষ্টেব কথা কেউ কাউকে বোঝাতে পাবছেন না, দুঃখ দেখে অদ্বৈতাচার্য উপবাস কবেন। বৈষ্ণবগণেব মনে তাতে আবো কষ্ট হয। কৃষ্ণনাম কবে কেনই বা কীর্তন কববে নৃত্য কববে, কে বা বৈষ্ণব, সংকীর্তনই বা কি— এসব কথা কেউ চিন্তা কবে না, ভাবে না। স্ত্রীপুত্র ধনজন নিযে সংসাবে মত্ত আছে। পাষণ্ডেবা বৈষ্ণবগণকে উপহাস কবে। শ্রীবাস চাব ভাইকে নিযে বাত্রে ঘবে বসে উচ্চস্ববে হবিনাম গান কবেন। কীর্তন শুনে পাষণ্ডীবা বলে——এই ব্রাহ্মণেব জন্য তো আমাদেব গ্রামেব মহা ক্ষতি হবে। আমাদেব কপালে যবনবাজ, এই সব কথা শুনতে পেলে মহা ভযেব বিষয হবে। আবাব কেউ বলে ঃ এই বামুনেব ঘব ভেঙ্গে ধবে নিযে সব নদীব স্রোতেব মুখে ফেলে দাও, একে তাড়ালে তবে গ্রাম বক্ষা পাবে, না হলে যবনে গ্রাম দখল কবে নেবে। পাষণ্ডীগণ এই সব কথা বলাবলি কবছে। শুনে ভক্তগণ কৃষ্ণকে ডেকে কাঁদেন।

খবর পেয়ে অদ্বৈত রাগে জ্বলে ওঠেন, তাঁর কাপড়চোপড় পর্যন্ত ঠিক থাকে না। তিনি বলেন—শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর, তোমরা সকলে শোন, আমি কৃষ্ণকে তোমাদের সকলের সামনে এনে উপস্থিত করব। শ্রীকৃষ্ণ নিজে সকলকে উদ্ধার করবেন, তোমাদের সকলকে নিয়ে তিনি কৃষ্ণভক্তি প্রচার করবেন। না পারলে এই দেহ থেকেই চারটি হাত প্রকাশ করে নিজহস্তে চক্র নিয়ে পাষণ্ডী বিনাশ করব। তবেই বুঝতে পারবে কৃষ্ণ আমার প্রভু এবং আমি তাঁর দাস। অদ্বৈত সর্বদা এই কথা বলেন এবং সংকল্প করে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পূজা করেন। ভক্তগণও একনিষ্ঠ ভাবে সপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকছেন। তাঁরা নবদ্বীপের কোথাও একটু ভক্তির কথা শোনেন না, শুনতে পান না। মনের দুঃখে কোন কোন ভক্ত দেহত্যাগ করতে চান, কেউবা 'কৃষ্ণ' বলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাঁদেন। জগতের অবস্থা দেখে তাঁরা এতই দুঃখ পাচ্ছেন যে তাঁদের ঠিক মত খাওয়াতে পর্যন্ত আর রুচি নেই। ভক্তগণ ক্রমান্বয়ে সমস্ত ভোগসুখ ত্যাগ করলেন এবং কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। ঈশ্বরের আজ্ঞায় শ্রীঅনন্তধাম বলরাম নিত্যানন্দ আগে রাঢ় অঞ্চলে অবতীর্ণ হলেন। মাঘ মাসে শুভ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে একচক্রা গ্রামে পদ্মাবতী দেবীর গর্ভে, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে তাঁরই পুত্ররূপে পৃথিবীর পিতা, ভক্তপ্রাণ কৃপাসিন্ধু বলরাম নিত্যানন্দ নাম নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। দেবতারা সঙ্গোপনে জয়ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। সেই দিন থেকে রাঢ় অঞ্চলে নানা ভাবে মঙ্গলবর্ষণ হতে থাকল। ইনি অবধূত বেশ ধারণ করে পতিতজনকে উদ্ধারের জন্য দেশদেশান্তর ভ্রমণ করেছিলেন। এই ভাবে অনন্তদেব প্রকাশিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে অবতীর্ণ হলেন সে কথা এখন বলা হচ্ছে।

দ্বাপর যুগের বাসুদেবের মত স্বধর্মনিষ্ঠ পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপধামে বাস করতেন। ইনি অপরিসীম ব্রাহ্মণ্যগুণসম্পন্ন ও উদারচরিত্র ছিলেন। জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন কশ্যপ, দশরথ, বসুদেব ও নন্দ মহারাজের তত্ত্বসমন্বিত। তার পত্নী শচী দেবী ছিলেন মহা পতিব্রতা, মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি এবং জগতের মাতার মত। বহু ছেলেমেয়ে মারা গিয়ে সবে বিশ্বরূপ নামে একটি পুত্র আছে। পুত্রের অত্যন্ত সুন্দর মুখপানে তাকিয়ে পিতা-মাতা আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু জন্ম থেকেই বিশ্বরূপ বৈরাগ্যবান এবং সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। কলিকালের শেষ অবস্থার লক্ষণ চার দিকে দেখা যাচ্ছে, সকলেই বিষ্ণুভক্তিশূন্য হয়ে পড়েছে। ধর্ম অন্তর্হিত হলে ভক্তগণ দুঃখ পাচ্ছেন ভেবে প্রভু অবতীর্ণ হন। তাই ভগবান গৌরচন্দ্র শচী জগন্নাথের দেহে অধিষ্ঠিত হলেন। শচী জগন্নাথ প্রায়ই শুনতে পান যেন দৈববাণীর মত জয়ধ্বনি হচ্ছে। তারা দুজনেই অত্যন্ত জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছেন কিন্তু অন্য লোকেরা তা লক্ষ্য করতে পারে নি। ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করছেন জেনে ব্রহ্মা শিব আদি দেবগণ এসে স্তুতি করছেন। এই সকল বৈদিক তত্ত্ব অতীব গোপনীয় এবং নিঃসন্দেহ। ভক্তি নিয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণের গোপনীয় স্তব শুনলে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়।

মহাপ্রভুর জয়। সর্বপিতা সংকীর্তনের জন্য অবতার গ্রহণ করেছেন। বেদ ও সাধু ব্রাহ্মণগণের জয় হবে, মহাকাল অভক্ত দমন করবেন। শুদ্ধসত্ত্বময় কলেবর, ইচ্ছাময় মহামহেশ্বরের জয়। তুমিই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বাস কর, তুমিই শচীগর্ভে প্রকাশিত হয়েছ। তোমার ইচ্ছা কে বলতে পারে? সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমারই লীলামাত্র। যার ইচ্ছায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়, তিনি কি মুখের কথায় কংসকে রাবণকে বধ করতে পারেন না? তবু দশরথ এবং বসুদেবের ঘরে জন্ম নিয়ে তবে তাদের সংহার করলেন।

কাজেই তোমার সব কাজের কারণ কে বুঝতে পারে? তুমি নিজেই নিজের মনের কথা জান, আর কেউ জানে না। তোমার আজ্ঞা পেলে তোমার একজন সেবকই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করতে পারেন। তবু তুমি নিজে অবতীর্ণ হয়ে যুগধর্ম সর্বধর্ম মানুষকে বুঝিয়ে দাও এবং পৃথিবীকে কৃতার্থ কর। সত্যযুগে তুমি শুভ্রবর্ণ ধারণ করে নিজে তপস্যা করে তপোধর্ম বুঝিয়ে দিলে। ব্রহ্মচারী রূপে অবতীর্ণ হয়ে কৃষ্ণাজিন, দণ্ড-কমণ্ডলু জটা ধারণ করে ধর্ম স্থাপন করেছ। ত্রেতাযুগে সুন্দর রক্তবর্ণ ধারণ করে যাজ্ঞিক হয়ে সকলকে যজ্ঞে প্রবৃত্ত করেছ। দ্বাপর যুগে মেঘের মত দিব্য শ্যামবর্ণ নিয়ে মহারাজ রূপে জন্মগ্রহণ করে শ্রীবৎসাদি চিহ্ন ধারণ করে পীতবাস পরিধান করে ঘরে ঘরে পূজাধর্ম প্রচাব করেছ। কলিকালে তুমি বেদগোপ্য সঙ্কীর্তন-ধর্ম প্রচারের জন্য পীতবর্ণ নিয়ে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছ। তোমার অনন্ত অবতারের সংখ্যা করাও কঠিন। প্রলয়কালে তুমি মৎস্যরূপে জলে বিহার কর, কূর্মরূপে আবার জীবগণকে পিঠে বহন কর, ঘোটকরূপে তুমিই বেদ উদ্ধার,করেছ, আদি দৈত্য মধু-কৈটভ দুজনকে সংহার করেছ, বরাহ রূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছ, নৃসিংহমূর্তিতে হিরণ্যকশিপুকে শিক্ষা দিয়েছ, অপূর্ব বামনরূপে মহারাজা বলিকে ছলনা করেছ, পরশুরাম অবতারে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছ, রাম অবতারে রাবণকে সংহার করেছ, হলধর রূপে আবার অনন্তে বিহার করলে। বুদ্ধ অবতারে দয়াধর্ম প্রকাশ করেছ, কল্কীরূপে আবার ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করবে। ধন্বন্তরি হয়ে অমৃত প্রদান কর, হংসরূপে ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণকে তত্ত্বজ্ঞান দান কর, শ্রীনারদ মুনি হয়ে তুমিই বীণা নিয়ে হরিনাম গেয়ে বেড়াও, ব্যাসদেব হয়ে তুমি আবার নিজের তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। সর্বপ্রকার লীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী এক সঙ্গে করে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে কত কাণ্ড করেছ, এই অবতারে আবার ভক্তভাবে এসে সর্বতোভাবে সংকীর্তন প্রচার করবে। ঘরে ঘরে প্রেমভক্তি এবং পৃথিবীর সবত্র সংকীর্তন প্রচারিত হবে। পৃথিবী আনন্দে ভরে উঠবে, তুমি সব ভক্তকে নিয়ে নৃত্য করবে। তোমার পাদপদ্ম যাঁরা নিত্য ধ্যান করেন তাঁদের প্রভাবে অমঙ্গল বিদূরিত হয। নৃত্যের তালে পৃথিবীর অমঙ্গল দূরে যায। তাঁদের দৃষ্টিমাত্রে দশ দিক বিশুদ্ধ হয়। তুমি ভক্তগণ সঙ্গে বাহু তুলে যখন নাচবে তার ফলে সমস্ত বিঘ্ন তো বিনাশ হবেই, এর যশের ফলে চতুর্দিক আমোদিত হয়ে উঠবে।

পদ্মপুরাণ বলেছেন - -কৃষ্ণভক্তের সভক্তি নৃত্যে জগতের সর্ববিধ অমঙ্গল বিনষ্ট হয। তাঁর দুটি পায়ের দ্বারা পৃথিবীর, দৃষ্টির ফলে সমস্ত দিকের আর বাহু দুটির ইঙ্গিতে স্বর্গের অমঙ্গল ধ্বংস হয।

তুমি নিজে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তবৃন্দকে নিয়ে এই ভাবে কীর্তন করবে। তোমার মহিমার কথা বর্ণনা করবার কারো শক্তি নেই, বেদ-গুপ্ত বিষ্ণুভক্তি তুমি বিলিয়ে দেবে। তুমি জীবকে মুক্তি দাও কিন্তু এই ভক্তি গোপন করে রাখ, আমরাও যার জন্য প্রার্থনা জানাই তুমি জগতকে এবারে সেই পরম ধন দান করবে, এই কারণেই তোমার এত করুণা। তোমার নামে সর্ববস্তু পরিপূর্ণ, সেই তুমি এখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হতে চলেছ। তুমি দয়া করে আমাদের কৃপা কর যেন আমরা সে সব দেখবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি। এতদিনে বুঝি গঙ্গাদেবীর মনোরথ পূর্ণ হল, তুমি তাঁর ইচ্ছামত গঙ্গার বুকে ক্রীড়া করবে। যোগেশ্বরগণ ধ্যানের দ্বারা তোমার দর্শন পান, তুমি এখন নবদ্বীপে প্রকাশিত হবে। নবদ্বীপ তাই সকলের নমস্য, কারণ তুমি শচী-জগন্নাথের গৃহে আসছ। ব্রহ্মা-আদি দেবগণ এভাবে গুপ্তভাবে থেকে প্রতি দিন ঈশ্বরের স্তব করছেন। সর্বভুবন শচীগর্ভে বাস করে ফাল্গুনী

পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বসুমঙ্গল সেই পূর্ণিমাতে এসে মিলিত হয়েছে। গ্রহণের ছলে সঙ্কীর্তন প্রচার করতে করতে প্রভু এসে উপস্থিত হলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় রাহু চন্দ্রকে আড়াল করল, তাঁর কাজের ধারা কে বুঝতে পারে? গ্রহণ দেখে সমস্ত নবদ্বীপে শ্রীহরিসঙ্কীর্তনের মঙ্গলধ্বনিতে ভরে গেল। দলে দলে লোক 'হরিবোল হরিবোল' বলে গঙ্গাস্নান করতে ধেয়ে চলেছে। হরিধ্বনির সুউচ্চ শব্দে আকাশ-বাতাস ভরে গেল। ভক্তগণ সেই ধ্বনিতে আনন্দিত হযে বললেন—এমন গ্রহণ সব সময় হলেও ভাল। আজ মনে বড আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন শ্রীকৃষ্ণ এসে উপস্থিত হযেছেন। ভক্তগণ গঙ্গাস্নানে চলেছেন, চারিদিকে কেবলই হরিসঙ্কীর্তন হচ্ছে। গ্রহণ বলে সবাই হরিনাম করছে, শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জন সব একাকাব হযে গেছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হরিনামে ভরে গেছে। জযধ্বনি দিযে দুন্দুভি বেজে উঠেছে, দেবতারা চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি কবছেন। এমন সময়ে সর্ব-জগত-জীবন শ্রীশচীনন্দন অবতীর্ণ হলেন।

শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হলে চারিদিক গানে গানে ছেযে যায।

১। ধানশী

রাহু-কবল ইন্দু   পরকাশ নাম-সিন্ধু
কলি-মর্দন বান্ধে বাণা,
পহুঁ ভেল প্রকাশ   ভুবন চতুর্দশ
জয জয পড়িল ঘোষণা।
হে মাই হে মাই, দেখত গৌবাঙ্গচন্দ্র,
নদীযাক লোক   শোক সব নাশল
দিনে দিনে বাঢ়ল আনন্দ।
দুন্দুভি বাজে   শত শঙ্খ বাজে
বাজাযে বেণু-বিষণা,
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র   নিত্যানন্দ ঠাকুব
বৃন্দাবন দাস রস (গুণ) গানা।

২। ধানশী

জিনিযা রবি কর   অঙ্গ মনোহব
নযনে হেরই না পারি,
আযত লোচন   ঈষত বঙ্কিম
উপমা নাহিক বিচারি।
(আজু) বিজযে গৌবাঙ্গ অবনী মণ্ডলে
চৌদিকে শুনিএগা উল্লাস,
এক হবিধ্বনি   আব্রহ্ম ভরি শুনি
গৌরাঙ্গ চাঁদেব পবকাশ।
চন্দনে উজ্জ্বল   বক্ষ পবিসর
দোলয়ে তাঁহা বনমাল,
চাঁদ-সুশীতল   শ্রীমুখমণ্ডল।
আজানু বাহু বিশাল।

দেখিয়া চৈতন্য ভুবনে ধন্য ধন্য
উঠয়ে জয় জয় নাদ,
কোই নাচত আনন্দে গায়ত
কলি হৈলা হরি যে বিষাদ।
চারি বেদাগ্রণ্য মুকুট চৈতন্য
পামর মূঢ় নাহি জানে,
শ্রীচৈতন্য নিতাই ঠাকুর দু ভাই
বৃন্দাবন দাস (তছু পদে) গান॥

৩। পঠমঞ্জরী

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র, দশ দিকে উ
রূপে কোটি মদন জিনিঞা, হাসে নিজ কী
অতি সুমধুর মুখ আঁখি, মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি।
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে, সব অঙ্গে জগ-মন-লোভে।
দূরে গেল সকল আপদ, ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান, বৃন্দাবন দাস গুণ গান॥

৪। নটমঙ্গল

চৈতন্য অবতার শুনিঞা দেবগণরে
উঠিল পরম মঙ্গল রে
সকল তাপ হর শ্রীমুখচন্দ্র দেখি
আনন্দে হইলা বিহ্বল রে।
অনন্ত ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেব
সভেই নররূপ ধরি রে
গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছল করি
লখিতে কেহ নাহি পারি রে।
দশ দিকে ধায় লোক নদীয়ায়
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে,
মানুষ দেব মিলি এক সাঁঞে কেলি
আনন্দে নবদ্বীপ পরি রে।
শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে,
গ্রহণ-অন্ধকারে লখিত কেহ নারে
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে।
কেহ পড়ে স্তুতি কাহারো হাতে ছাতি
কেহ চামর ঢুলায় রে,
পরম হরিষে কুসুম বরিষে
কেহ নাচে গায় বায় রে।

সকল শকতি সঙ্গ আইলা গৌরচন্দ্র
পাষণ্ড কিছুই না জান রে,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস (রস) গান রে॥

৫। মঙ্গল রাগ

দুন্দুভি ডিণ্ডিম মঙ্গল জয় ধ্বনি
গায় মধুর রসাল রে
বেদের অগোচব আজু ভেটব
বিলম্বে নাহিক কাজ রে।
আনন্দে ইন্দ্রপুব মঙ্গল কোলাহল
সাজ সাজ বলি সাজ বে,
বহুত পুণ্য-ভাগ্যে চৈতন্য পরকাশ
পাওল নবদ্বীপ মাঝ বে।
অন্যোহন্যে আলিঙ্গন চুম্বন ঘনে ঘন
লাজ কেহ নাহি মান বে,
নদীযা পুবন্দব জনম-উল্লাসে
আপন পব-নাহি জান বে॥

৬। গৌবাঙ্গ সুন্দর

ঐছন কৌতুকে আইলা নবদ্বীপে
চৌদিকে শুনি হবিনাম রে,
পাইযা গোরা-বস বিহ্বল-পরবশ
চৈতন্য জয জয গান রে।
দেখিল শচীগৃহে গৌরাঙ্গ সুন্দরে
একত্র যৈছে কোটি চান্দ রে।
সকল শক্তিসঙ্গে আইলা গৌরচন্দ্র
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে,
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ- চান্দ প্রভু জান
বৃন্দাবন দাস রস গান বে॥

৭। একপদী

প্রেম-ধন বত্ন পসার,
দেখ গোরাচাঁদের বাজার।
হেন মত প্রভুর হইল অবতার,
আগে হরিসঙ্কীর্তন করিয়া প্রচার।
চতুর্দিকে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া,
গঙ্গাস্নানে 'হরি বলি' যায়েন ধাইয়া।

যার মুখে এ জন্মেও নাহিক হরিনাম,
সেহো 'হরি' বলি ধায় করি গঙ্গাস্নান।
দশদিকে পূর্ণ হই উঠে হরিধ্বনি,
অবতীর্ণ হই শুনি হাসে দ্বিজমণি॥

পুত্রমুখ দেখে শচী-জগন্নাথ দুজনেই আনন্দিত হলেন। তাঁরা এখন কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারছেন না, পাড়ার মেয়েরা তাড়াতাড়ি উলুধ্বনি দিয়ে চারিদিক মাতিয়ে তুললেন। খবর পেয়ে আত্মীয়-বান্ধবগণ সকলেই ছুটে এলেন। আনন্দে জগন্নাথের ঘর ভরে গেল। শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী জন্মলগ্ন বিচার করে দেখেন, নবজাতকের মহারাজ-লক্ষণ রয়েছে। মাতামহ নাতির রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। প্রবাদ আছে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে, সেই এল কিনা কে জানে? মহা জ্যোতিষী নীলাম্বব চক্রবর্তী ঠিকুজি অনুসারে জাতকের ফল বলতে লাগলেন—এর লগ্নকালে যে বাজলক্ষণসকল দেখছি তা বলে শেষ করা যায় না, এই ছেলে বৃহস্পতির চেয়েও বড় বিদ্বান হবে, অল্প বয়সেই সর্ব বিষয়ে গুণবান হযে উঠবে। সেখানে একজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়ে প্রভুর বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী বলতে লাগলেন—এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ, এ সর্বধর্ম স্থাপন করবে। অপূর্ব প্রচারের দ্বারা এ সর্বজগৎ উদ্ধার করবে। ব্রহ্মা শিব শুক সর্বদা যা পেতে চান, এঁর কাছ থেকে সাধাবণ মানুষ তাই পাবে। ইনি সর্বজীবে দযালু হবেন, এঁকে দেখলেই মানুষের সংসারতৃষ্ণা কেটে যাবে, এঁর দ্বারা ভূমণ্ডলের মঙ্গল সাধিত হবে। ইনি দেবদ্বিজ-গুরু-মাতৃপিতৃ-ভক্ত হবেন, এঁর শবীব জগতধর্মময়। বিষ্ণু নিজে অবতীর্ণ হয়ে যেমন ধর্ম স্থাপন করেন এই শিশু তেমনি সব কাজ করবেন। এঁর লগ্নে যে সব শুভ লক্ষণ বয়েছে তা বলে শেষ কবা যাবে না। পুবন্দর মিশ্র, তুমি ভাগ্যবান। এই শিশুর পিতা সর্বপ্রণম্য। আমার সৌভাগ্য যে আমি এর লগ্নবিচাব করার সুযোগ পেলাম। এর নাম হল বিশ্বম্ভর। এ বালক বহু লোকের আনন্দের কারণ হবে, লোকেরা একে 'নবদ্বীপচন্দ্র' নামেও ডাকবে। পিতামাতা মনে দুঃখ পাবেন বলে ব্রাহ্মণ জাতকের সন্ন্যাসের বিষয় কিছু বললেন না।

জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের জন্মপত্রিকার ফলাফল শুনে খুশি হয়ে ব্রাহ্মণকে দ্রব্যাদি দান করতে চাইলেন। ঘরে তেমন কিছু নেই। আনন্দে বিপ্রের পায়ে পড়ে তিনি কাঁদছেন, বিপ্রও আবার কেঁদে জগন্নাথ মিশ্রের পায়ে পড়ছেন। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলেই আনন্দে হরিধ্বনি করে উঠলেন। কোষ্ঠীর দিব্য ফলাফল শুনে আত্মীয়গণ সকলেই মঙ্গলধ্বনি করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বাদ্যকরেরা এসে মৃদঙ্গ সানাই বাঁশী বাজাতে লাগল। পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে স্বর্গের দেবীরাও এসে যোগ দিলেন, দেবগণ ও মনুষ্যগণ এক সঙ্গে মিলিত হলেন। দেবমাতারা আনন্দে প্রভুর শিরে ধান্যদূর্বা দিয়ে 'চিরায়ু হও' বলে আশীর্বাদ জানালেন। তুমি চিরকাল পৃথিবীতে প্রকাশিত আছ—এই জন্য তাঁরা হেসে 'চিরায়ু' বললেন। এই সব অপূর্ব সুন্দরীগণকে দেখে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতেও শচী দেবীর মুখে কথা আসে না। তিনি সানন্দে নির্বাক, দেবীগণ শচীর চরণধূলি নিচ্ছেন। জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আজ যে আনন্দ বয়ে যাচ্ছে তা স্বয়ং অনন্তদেবও বর্ণনা করে উঠতে পারছেন না। শুধু শচীগৃহেই নয়, সমস্ত নবদ্বীপ জুড়েই আজ অপার আনন্দ। নগরের চত্বরে, গঙ্গাতীরে সর্বত্র শুধু হরিধ্বনি। চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষেই জন্মযাত্রা মহোৎসব হল, তাই কেউ মূল ব্যাপারটি জানতে পারল না। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে চৈতন্যের জন্ম। তাই ব্রহ্মা-আদি

দেবগণও এ তিথিকে আরাধনা করেন। ভক্তিমুক্তি স্বরূপ এই তিথিতে দ্বিজমণি-শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হলেন। নিত্যানন্দের জন্মতিথি মাঘের শুক্লা ত্রয়োদশী, গৌরচন্দ্রের ফাল্গুনী পূর্ণিমা। এই দুই তিথিকে মান্য করলে সর্ব অবিদ্যা খণ্ডন হয়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বৈষ্ণবগণ এই তিথিকে জন্মাষ্টমীর মতই পবিত্র জেনে পালন করেন। গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব কাহিনী যে শুনবে তার জন্মমৃত্যুতে কিছু দুঃখ থাকবে না। চৈতন্যচরিত-কথা শুনলে ভক্তি লাভ হয় এবং প্রতি জন্মে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে জন্মলাভ করা যায়। আদিখণ্ডে গৌরচন্দ্রের অবতরণ-কথা বড়ই মধুর। এই সব লীলাকথার আরম্ভও নেই, শেষও নেই। তিনি কখনো লোকচক্ষুর গোচরে আসেন, কখনো অগোচরে থাকেন, তাঁর সমস্ত লীলাই নিত্য। শ্রীচৈতন্যচরিতের আদি অন্ত কিছু নেই, তিনি যেমন চালাচ্ছেন, তাঁর কৃপায় তাই লিখছি। শ্রীগৌরচন্দ্রকে তাঁর ভক্তবৃন্দ সহ আমি দণ্ডবৎ করি, আমার আর কোন অপরাধ নেই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ বৃন্দাবনদাসের প্রাণস্বরূপ, তিনি তাঁদের পদপ্রান্তে এই চরিত কীর্তন করছেন।

১/৩ কমলনয়ন প্রভু গৌরচন্দ্র এবং প্রেমের ভক্তবৃন্দের জয়। প্রভু, তুমি আমার প্রতি এমন শুভ দৃষ্টি কর যেন তোমার প্রতি দিবানিশি আমার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে।

গৌরচন্দ্র প্রকাশিত হবার পর থেকেই শচীগৃহে আনন্দ বেড়ে চলেছে। পুত্রের মুখশ্রী দেখে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সর্বদা আনন্দসাগরে ভাসছেন। বিশ্বরূপ ভাইকে দেখে হেসে কোলে নিয়ে আনন্দিত হন। চারিদিকে যত আত্মীয়স্বজন আছেন সকলেই সর্বদা বালককে ঘিরে রয়েছেন। ঘরের চারদিকে ঘুরে, কেউ কেউ বিষ্ণুরক্ষা ও দেবীরক্ষা মন্ত্র পড়েন। হরিনাম শুনলেই প্রভুর কান্না থেমে যায়। এই সঙ্কেত বুঝে সকলেই হরিনাম নিচ্ছেন। সব সময় চারদিকে লোকজন ঘিরে রয়েছে দেখে দেবতারাও মজা করেন। কোন দেবতা অলক্ষ্যে ঘরে প্রবেশ করেন, ছায়া দেখে কেউ হয়ত বলে ওঠে, ঘরে চোর এসেছে। কেউ 'নরসিংহ নরসিংহ' বলে ধ্বনি দিয়ে ওঠেন, কেউবা অপরাজিতা স্তোত্র পাঠ করেন। নানা মন্ত্রে কেউ আবার দশ দিক বন্ধ করে। প্রভুকে দেখে দেবতা চলে যাচ্ছেন, কেউ হয়ত চীৎকার করে ওঠে, এই ছেলেধরা পালাচ্ছে। তখন সকলেই আরো চেঁচিয়ে ওঠে, পালাচ্ছে, চোর ধর। লোকে 'নৃসিংহ'নাম স্মরণ করে। ওঝা এসে বলে—নৃসিংহের কৃপায় আজ বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেলে। প্রভু কিন্তু চুপচাপ শুয়ে শুয়ে হাসছেন। এই ভাবে এক মাস কেটে গেল। বালকোত্থান পর্বদিনে পাড়ার মেয়েরা শচীর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গেল। শচী মহাসমারোহে গঙ্গাস্নান করে গঙ্গা পূজা সেরে ষষ্ঠীতলায় গেলেন। সব দেবতার পূজা সেরে তিনি ঘরে এলেন, অথচ ঘরেই পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রয়েছেন। মাতা উপস্থিত সব নারীগণকে খৈ কলা তেল সিন্দুর পান সুপুরি দিয়ে আদর করে সম্মান জানালেন। তাঁরা মাকে প্রণাম করে বালককে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। এইভাবে প্রভু লীলা করছেন কিন্তু তাঁর কৃপা ভিন্ন তো এসব বুঝতে পারা যাবে না। প্রভু হরিনাম শুনবার জন্য কেঁদে ওঠেন। মেয়েরা থামাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেও তিনি কিছুতেই থামেন না। সব মেয়েরা যখন 'হরি' বলে ওঠে তখন শিশু হেসে তাদের দিকে তাকায়। বালকের মনের অবস্থা জেনে সকলেই করতালি দিয়ে 'হরি হরি' বলে। সকলেই আনন্দ করে হরিনাম করে, এভাবে শচী-জগন্নাথের ঘর হরিনামে ভরে যায়। গুপ্তভাবে শিশু গোপালের মত ক্রীড়া করে। কেউ ঘরে না থাকলে সেই অবসরে শিশু জিনিসপত্র সব টেনেটুনে

ছড়িয়ে রাখে। ঘরে মেঝেতে তেল দুধ নুন ঘি পড়ে থাকে। মায়ের আসার শব্দ পেলেই বিছানায় এসে শুয়ে কাঁদতে থাকে। মা 'হরি হরি' বলে ছেলেকে থামাতে গিয়ে দেখেন ঘরের মধ্যে চার দিকে সব জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ধান চাল মুগ দধি সব ছড়িয়ে আছে, ভাণ্ড ভেঙ্গে গড়াচ্ছে। ঘরে চার মাসের ছেলে রয়েছে, কে এসব করল? সকলেই খোঁজাখুঁজি করে, দেখল কেউ তো আসে নি ঘরে। কেউ বলে—ঘরে দানব ঢুকেছিল। রক্ষামন্ত্র দিয়ে ঘেরা আছে বলে শিশুর ক্ষতি করতে পারে নি তাই রেগে গিয়ে জিনিসপত্র নষ্ট করে রেখে গেছে। পিতা জগন্নাথেরও মনে সন্দেহ, কিন্তু দৈব বলে মেনে নিলেন। জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে রয়েছে তবু শিশুর দিকে তাকিয়ে আর তাঁদের মনে কোন দুঃখ থাকছে না। এই ভাবে প্রভু শিশুরূপে কৌতুক করে চলেছেন।

নামকরণের দিন এল। নীলাম্বর চক্রবর্তী এলেন, আত্মীয বন্ধু অনেকেই এলেন। সিঁদুরে অলংকৃত পতিব্রতা এয়োগণ অনেকে এসেছেন। কি নাম রাখা যায তাই সবাই চিন্তা করছেন। মেয়েরা একটা নাম বললে অন্য কেউ আরেকটা নাম বলছে। এর আগে এঁদের অনেক শিশু জন্মে মারা গেছে, তাই এর নাম নিমাই রাখা যাক। জ্ঞানী লোকেরা আবার বিচার কর বলেন—এই শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া ঠাণ্ডা হযেছে, তাই কুলজী অনুসারে এর নাম রাখা হোক 'বিশ্বম্ভর'। মেযেরা যে 'নিমাই' নাম রেখেছে সে নামেও বাড়িতে ডাকা হবে। নামকরণেব শুভক্ষণে ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ, গীতা-ভাগবত পাঠ করতে লাগলেন। দেবগণ নবগণ সকলে মিলে একত্রে মাঙ্গলিক শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনি ও হরিনাম করতে লাগলেন। বালকের সামনে ধববার জন্য ধান, খড়ি, সোনা, রূপা বই এসব রাখা হল। জগন্নাথ পুত্রকে উদ্দেশ করে বললেন—বাপু তোমার যা ভাল লাগে তাই ধর। সব ছেড়ে দিয়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন 'ভাগবত' গ্রন্থ তুলে বুকে ঠেকালেন। এয়োগণ উলুধ্বনি করে উঠলে আর সকলেই বললেন যে ছেলে বড পণ্ডিত হবে। প্রভু বিশ্বম্ভর যে দিকে তাকান সেদিকে দেখেই তিনি আনন্দিত হন। যেই কোলে নেয সে-ই আর তাকে কোল থেকে রাখতে পারে না। এই দেবদুর্লভকে কোলে নিয়ে নারীগণও আনন্দ পান। প্রভু কাঁদলেই তাঁরা হাতে তালি দিযে হরিনাম করেন। এভাবে প্রভু ছল করে সকলকে নামসঙ্কীর্তন করিয়ে আস্তে আস্তে বড হচ্ছেন। বিশেষ করে নারীগণ যখন হরিধ্বনি করেন তখন প্রভু কোলের উপর নাচতে থাকেন। তাঁব ইচ্ছা, তাই তিনি ছল করে সর্বদা সকলের মুখে হরিনাম উচ্চারণ করাচ্ছেন। বেদশাস্ত্র ভাগবতাদিতে বলে যে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন কাজ হতে পারে না।

এভাবে নিজকীর্তন প্রচার করে প্রভু শচীনন্দন ক্রমান্বযে বড় হচ্ছেন। প্রভু হামাগুড়ি দিয়ে চলছেন আর কোমরে কিঙ্কিনীর সুন্দর শব্দ হচ্ছে। ভয-ডর নেই। সারা উঠোনময় হামাগুড়ি দিচ্ছেন, আগুন সাপ যা পাচ্ছেন তাই ধরছেন। একদিন উঠোনে একটা সাপ এসেছিল প্রভু তাকে ধরলেন। সাপ তাকে ঘিবে কুণ্ডলী পাকিযে রইল আর তিনি সাপের উপরে শুযে থাকলেন। লোকেরা দেখতে পেয়ে হায় হায় করে উঠল, তিনি সাপের পরে বসে থেকে হাসছেন। সকলে গরুড়কে স্মরণ করল, মা-বাবা ভয়ে কাঁদতে লাগলেন। প্রভুকে ছেড়ে সাপ তখন চলে যাচ্ছে। নিমাই তাকে ধরতে চাইছে। পাড়ার মেয়েরা তাকে ধরে এনে কোলে নিয়ে বললেন—চিরজীবী হও। কেউ মন্ত্র পড়ছেন, কেউ কবচ বেঁধে দিচ্ছেন হাতে, কেউবা বিষ্ণুর চরণামৃত গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন। কেউ বললেন, বালকের পুনর্জন্ম হল। কেউ বলছেন, জাতিসাপ ছিল বলেই রক্ষা। প্রভু বার বার যাচ্ছেন

আর সকলে বার বার ধরে আনছেন। প্রভু সকলের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। ভক্তিভরে যে এসব বেদগোপ্য কথাদি শোনে তাকে সংসারভুজঙ্গ লঙ্ঘন করতে পারে না।

এবারে প্রভু আস্তে আস্তে উঠোনে হাঁটতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর রূপ যেন কন্দর্পকেও হার মানায়, চাঁদ নিজেই সেই মুখখানি দেখতে ইচ্ছা করে। সুন্দর মাথার কোঁকড়ানো চুল আর পদ্ম-আঁখি দেখে মনে হচ্ছে যেন গোপাল ঠাকুর। হাত হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, রাঙা ঠোঁট, সুলক্ষণ যুক্ত বিস্তৃত বক্ষ। দুধে আলতায় গায়ের রং, বিশেষ করে হাত পা আঙুল খুবই সুন্দর। শিশু-স্বভাবে তিনি যখন থপ্‌থপ্ করে হাঁটছেন, মায়ের মনে হচ্ছে যেন পা-ফেটে রক্ত পড়বে। গরীবের সংসারেও শচী-জগন্নাথ পুত্রকে নিয়ে মহা আনন্দে আছেন। প্রায়ই দুজনে নির্জনে বসে আলাপ করেন, বোধহয় কোন মহাপুরুষ এসে জন্ম নিয়েছেন। এমন ছেলে যখন আমাদের ঘরে জন্মেছে তখন নিশ্চয়ই আর কোন দুঃখ থাকবে না। কোন শিশুর এমন কাণ্ড কখনো দেখি নি যে হরিধ্বনি শুনলেই হেসে হেসে নাচতে থাকে। বড় করে হরিধ্বনি না দেওয়া পর্যন্ত সে কিছুতেই থামবে না—কেবল কাঁদবে। তাই সকাল থেকে পাড়ার মেয়েরা এসে তাকে ঘিরে সঙ্কীর্তন করে। মেয়েরা 'হরি' বলে করতালি দেয় আর নিমাইও তাদের সঙ্গে নাচতে থাকে। প্রভু ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে এসে মায়ের কোলে উঠে বসেন। তিনি এমন অঙ্গভঙ্গি করে নাচেন যে সবাই দেখে আনন্দ পায়। কেউ বুঝতে পারেন না কিন্তু এভাবে প্রভু শৈশবলীলায় সকলকে হরিসঙ্কীর্তন করিয়ে নিচ্ছেন। প্রভু পরম চঞ্চল, সব সময় ঘরে-বাইরে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছেন। কেউ তাঁকে ধরতে পারছে না। প্রভু একা একাই বাড়ির বাইরে গিয়ে লোকের কাছে খৈ কলা সন্দেশ—যা দেখেন তাই চান। অপরূপ সুন্দর এই ছেলেটিকে দেখে যে চেনে না সেও চাওয়ামাত্র দিয়ে দেয়। সকলেই তার হাতে সন্দেশ কলা এসব দেয়, প্রভু তা নিয়ে ঘরে আসেন। যে সব মেয়েরা হরিনাম করছে, তিনি তাদেরই সব দিয়ে দেন। বালকের বুদ্ধি দেখে সকলেই হাসে আর হাতে তালি দিয়ে কেবল হরিধ্বনি দিতে থাকে। সকাল দুপুর সন্ধ্যে কিছু নেই, সুযোগ পেলেই শিশু বাড়ির বাইরে চলে যায়। পাড়ার আত্মীয়দের বাড়িতে রোজই শিশু কিছু-না-কিছু চুরি করে। কারো ঘরে ভাত খায়, কোথাও দুধ খায়, কিছু না পেলে হাঁড়িকুড়ি ভেঙে রাখে। ঐসব বাড়ির শিশুদের খেপিয়ে কাঁদায়, কেউ দেখতে পেলেই দৌড়ে পালায়। হঠাৎ কেউ ধরতে পারলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে—আর কক্ষনো চুরি করতে আসব না, এবার আমাকে ছেড়ে দাও। কেউ রাগ করে না, শিশুর বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য হয়ে ভালবাসে। তাকে দেখলে সকলেরই মনটা যেন কেমন হয়ে যায়, নিজের ছেলের চেয়েও তাকেই তারা ভালবাসে। এক দণ্ড কোথাও স্থির থাকে না, সব জায়গায় খালি ঘুরে বেড়ায়।

একদিন দুজন চোর শিশুকে দেখে তার গায়ের সোনার গয়না নেবার জন্য যুক্তি করল। চোরেরা বললে—বাছা আমার, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? চল, শিগ্‌গির বাড়ি যাই। শিশু হেসে বলছে—ঘরেই চল। আস্তে আস্তে তাকে কোলে করে চোরেরা চলেছে। লোকেরা ভাবছে, যার ছেলে সেই নিচ্ছে। বহু লোকের মধ্যে কে কাকে চেনে। গয়না দেখে চোরেরা মহা খুশি। দুই চোরে প্রত্যেকেই মনে মনে ভাগ করছে যে সেই বড় গয়না তাড়বালাটা নেবে। চোরেরা নিজেদের জায়গায় যেতে লাগল, কাঁধে চড়ে শিশু হাসছে। একজন শিশুর হাতে সন্দেশ দিচ্ছে আর একজন বলছে—এই তো ঘরে এসে গেলাম। এভাবে শিশুকে ভুলিয়ে তারা বহু দূরে নিয়ে গেছে। এদিকে আত্মীয়স্বজনেরা

তাকে খুঁজে হন্যে হচ্ছে। কেউ বিশ্বম্ভর বলে, কেউ নিমাই বলে জোরে জোরে ডাকছে। ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত তারা সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। চোরেরা তাদের বাড়িতে শিশুকে নিয়ে যাচ্ছে, এদিকে সকলেই সর্বতোভাবে গোবিন্দের শরণ নিয়েছেন। চোরেরা ততক্ষণে নিজেদের ঘর না চিনতে পেরে বৈষ্ণবী মায়ার প্রভাবে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির সামনেই এসে হাজির হয়েছে। চোরেরা এটাই নিজেদের বাড়ি মনে করে সাবধানে গয়না খুলে নেবে ভাবল। শিশু বললে, ঠিক আছে, শিগগির নামাও। জগন্নাথ মিশ্রের আত্মীয়স্বজনগণ যেখানে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছিলেন, মায়ামুগ্ধ চোরেরা সেখানেই এনে শিশুকে কাঁধের উপর থেকে নামাল। নেমেই শিশু বাপের কোলে গিয়ে উঠল, সকলে মহা আনন্দে হরিধ্বনি করল। সকলের দেহে প্রাণ এল, তাঁরা ভাবি মজা পেলেন যেন। চোরেরা দেখল, এ তাদের নিজেদের ঘর নয়, কোথায় এসেছে তা চিনতেও পারছে না। গণ্ডগোলে কে কার কথা শোনে, চারিদিকে তাকিয়ে চোরেরা শেষে পালিয়ে গেল। তারা তখন ভাবছে, কি আশ্চর্য ভেলকি, মা চণ্ডী আজ আমাদের রক্ষা করেছে—বলে দুজনে কোলাকুলি করতে লাগল। পরমার্থ চিন্তা করলে এই দুই চোরকে মহা ভাগ্যবান বলতে হয়—কারণ নারায়ণ স্বয়ং এদের কাঁধে উঠেছেন। এদিকে সকলে বলাবলি করতে লাগল, কে মাথায় কাপড় বেঁধে একে নিয়ে এল? একজন বললে, দেখলাম দুটো লোক একে রেখে চলে গেল। কেউ কিন্তু বলছে না যে আমি এনেছি। কাণ্ড-কারখানা দেখে সকলেই বিহ্বল হয়ে পড়ল। সকলেই শিশুকে জিজ্ঞাসা করছে, বাছা নিমাই, বলতো তোমাকে কে এখানে নিয়ে এল? তোমাকে কোথা থেকে এখানে আনল? প্রভু বললেন—আমি গঙ্গাতীরে গিয়েছিলাম। পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। দুজন লোক আমাকে কোলে করে নিয়ে এসে এখানে রেখে গেল। তখন সকলেই বলাবলি করতে লাগল—শাস্ত্রের কথা কখনো মিথ্যে হতে পারে না। বৃদ্ধ বা অনাথ বা শিশুদের ভগবানই রক্ষা করেন। এইভাবে সকলে ভাবনাচিন্তা করছে কিন্তু বিষ্ণুমায়াতে কেউ আসল তত্ত্ব জানতে পারছে না। ভগবান নিজে না জানালে কে জানতে পারে? বেদগোপ্য এসব কাহিনী যে শোনে, চৈতন্যচরণে তার ভক্তি দৃঢ় হয়। এই ভাবে প্রভু জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে থেকে নানা প্রকারে নিজেকে প্রকাশ করছেন।

একদিন জগন্নাথ মিশ্র ছেলেকে ডেকে বলেন—বাপু, আমার বইখানা নিয়ে এসো তো। পিতার কথা মত পুত্র দৌড়ে ঘরে চলে গেল। রুনুঝুনু করে পায়ে নূপুর বাজছে, তার শব্দ শোনা গেল। জগন্নাথ চার দিকে তাকাতে লাগলেন। আমাদের ছেলের পায়ে তো নূপুর নেই, নূপুরের শব্দ আসছে কোত্থেকে? দু জনই বিস্মিত হচ্ছেন, তাঁদের মুখে কোন কথা নেই। বালক বইখানা দিয়ে খেলতে চলে গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই লক্ষ্য করলেন, আশ্চর্য পায়ের চিহ্ন রয়েছে ঘরের মেঝেতে। ধ্বজ, বজ্র, পতাকা, অঙ্কুশ ইত্যাদি দেখে দুজনেই আনন্দিত হলেন এবং তাঁদের চোখে জল এল। পাদপদ্মের দিকে তাকিয়ে দু জনেই নমস্কার করে বললেন, নিস্তার লাভ করে গেলাম, আর সংসারে জন্ম নিতে হবে না। জগন্নাথ স্ত্রীকে বললেন, শীঘ্র গিয়ে পরমান্ন প্রস্তুত কর। ঘরের শালগ্রাম-শিলাকে আমি পঞ্চগব্য দিয়ে সকালে স্নান করাব, বুঝলাম যে তিনিই নিজে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছেন, তাই নূপুরের শব্দ শুনতে পেলাম। এভাবে দুজনে মিলে শালগ্রাম পূজা করছেন আর প্রভু মনে মনে হাসছেন।

জগন্নাথ-খ্যাটার আরো মজার কাহিনী শোন। পরম ভাগ্যবান এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ

শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে তীর্থভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। ছয় অক্ষর গোপাল-মন্ত্রে তিনি উপাসনা করেন এবং গোপালকে ভোগ দিয়ে তবে নিজে প্রসাদ পান। সৌভাগ্যবশে হঠাৎ এই ব্রাহ্মণ ঘুরতে ঘুরতে প্রভুর বাড়িতে এসে গেলেন। এই তেজোময় ব্রাহ্মণের গলায় বালগোপাল-শালগ্রাম ঝোলানো রয়েছে। তিনি মুখে কৃষ্ণনাম নিচ্ছেন আর অন্তর ভক্তিতে আপ্লুত। জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে দেখেই নমস্কার করে সম্মান জানিয়ে তাঁর যথার্থ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। নিজেই তাঁকে পা ধুইয়ে দিয়ে বসবার জন্য সুন্দর আসন দিলেন। বিপ্রবর বিশ্রাম করলেন। তারপর জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর ঘর কোথায়। তিনি বললেন, আমি উদাসীন দেশান্তরী, কেবল চিত্তের বিক্ষেপে ঘুরে বেড়াই। জগন্নাথ তাঁকে প্রণাম করে বললেন, জগতের মঙ্গলের জন্যই তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ। বিশেষ করে আমি তো আজ খুবই নিজের সৌভাগ্য মনে করছি। তোমার আদেশ পেলে রান্নার জোগাড় করে দিতে পারি। বিপ্র বললেন—তোমার যা ইচ্ছা কর। মিশ্র সানন্দে রান্নার জন্য সব কিছু জোগাড় করে দিলেন। ব্রাহ্মণও সন্তুষ্ট হয়ে রান্না শেষ করে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতে বসলেন। সর্বভূতের অন্তর্যামী শচীনন্দনের ইচ্ছা ব্রাহ্মণকে দর্শন দান করবেন। ব্রাহ্মণ ধ্যানে বসা মাত্র শ্রীগৌরসুন্দর সামনে এসে উপস্থিত হলেন। পরনে কাপড় নেই, সারা গায়ে ধুলো, অরুণ নয়ন, হাত পা সবই সুন্দর। ব্রাহ্মণ দেখলেন বালকটি এক গ্রাস অন্ন তুলে মুখে দিচ্ছে। তিনি 'হায় হায়' বলে চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, এই দুরন্ত ছেলে অন্ন ছুঁয়ে দিয়েছে। জগন্নাথ মিশ্র এসে দেখলেন, ছেলে হেসে হেসে ভাত খাচ্ছে। তিনি ক্রোধে বালককে মারতে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ উঠে তাঁকে ধরলেন। বললেন, পণ্ডিত হয়ে তুমি বুঝতে পারছ না, ছেলেমানুষকে মেরে কি লাভ? এ কি বোঝে কিছু? একে কক্ষনো মারবে না। জগন্নাথ মনের কষ্টে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন নিচের দিকে তাকিয়ে, মুখে কোন কথা নেই। বিপ্র বললেন, মিশ্র, তুমি দুঃখ করো না, কোন্ দিন কি হবে তা কে বলতে পারে? সবই ভগবানের ইচ্ছা। তোমার ঘরে যা ফলমূল আছে তাই দাও, আজ তাই খাব। জগন্নাথ বললেন, আমাকে তুমি আশীর্বাদ কর, আমি আবার রান্নার জোগাড় করে দিই, তুমি রান্না কর। ঘরে সবই রয়েছে, তুমি রান্না করলেই আমরা সবাই খুশি হব। সকলেই এই একই কথা বলতে লাগলেন। বিপ্র বললেন, ঠিক আছে, তোমাদের সকলেরই যখন ইচ্ছা তখন আবার রান্নাই করব। খুশি হয়ে সকলে মিলে জায়গা পরিষ্কার করে দিলেন। তাড়াতাড়ি রান্নার জিনিসপত্র এসে গেল। বিপ্র রান্না আরম্ভ করলেন। সকলেই বললেন, শিশু বড়ই চঞ্চল, যতক্ষণ রান্না খাওয়া হচ্ছে, সেই সময়টা একে অন্য বাড়িতে নিয়ে রাখ। শচীদেবী তখন ছেলেকে নিয়ে অন্য বাড়িতে চলে গেলেন। মেয়েরা সকলে তাকে বলছে, কেন রে নিমাই, তুই এরকম ভাবে ব্রাহ্মণের ভাত খেয়ে নিলি কেন? তখন হেসে প্রভু শ্রীমুখে বললেন, আমার কি দোষ? ব্রাহ্মণ নিজেই তো আমাকে ডাকলেন। সবাই বলছে—নিমাই, তোমার যে এখন জাত চলে গেল। কোথাকার ব্রাহ্মণ, কেমন ব্রাহ্মণ, কে বা তাকে চেনে, তার ভাত খেলে কখনো জাত থাকে? প্রভু হেসে বললেন, আমি তো জাতে গয়লা, আমি সব সময় ব্রাহ্মণের ঘরে খাই। ব্রাহ্মণের রান্না খেলে গয়লার জাত যায় না। এই কথা বলে প্রভু সকলের দিকে তাকাচ্ছেন। প্রকারান্তরে প্রভু নিজতত্ত্ব ব্যক্ত করলেন কিন্তু মায়াবদ্ধ লোকেরা তা বুঝতে পারল না। প্রভুর কথা শুনে সকলেই হাসছে কেউ বালককে কোল থেকে নামাতে চায় না। প্রভু হেসে হাত বাড়িয়ে যারই কোলে

যান তিনিই আনন্দসাগরে ভাসেন। সেই বিপ্র আবার রান্না করে বসে নিবেদন করতে লাগলেন। তিনি বালগোপালকে ধ্যান করছেন। অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র তা জানতে পেরেছেন। সকলকে কোন মতে ভুলিয়ে তিনি বিপ্রের কাছে চলে এলেন। দেখতে না দেখতে প্রভু এক মুঠো ভাত নিয়ে খেতে লাগলেন। প্রভু খেয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় বিপ্র দেখতে পেয়ে 'হায় হায়' করে উঠলেন। প্রভু খেয়ে বিপ্রকেও একটু দিলেন। জগন্নাথ রেগে গিয়ে লাঠি নিয়ে প্রভুকে তাড়া করলেন। প্রভু যেন ভয় পেয়েই এক ঘরে ঢুকে গেলেন। জগন্নাথ এসব দেখে ভীষণ রেগে গিয়েছেন। তিনি বললেন—আজ দেখব, তুই আর কি করে এসব কাজ করিস, এমন মহাচোর ছেলে কার ঘরে আছে? এই বলতে বলতে তিনি বলছেন—তোমরা রাখ, আজ আমি ওকে মারবই। সকলে বললেন, তুমি তো বড়, তুমি বুঝতে পারছ না, ওকে মেরে কি হবে? এর শরীরে কি এখনো ভাল মন্দ জ্ঞান হয়েছে? এই শিশুকে মারা বোকামি মাত্র। মারলেই কি ওকে শেখানো যাবে? বাচ্চারা দুষ্টুমি করবেই। এদিকে তৈর্থিক ব্রাহ্মণ এসে জগন্নাথ মিশ্রকে হাতে ধরে বললেন, বালকের কোন দোষ নেই। যেদিন যা হবার তা হবেই। আমি তোমাকে সার কথা বলছি, আজ কৃষ্ণ আমার অন্ন মাপায় নি। দুঃখে জগন্নাথ মাথা নিচু করে রয়েছেন। এমন সময় মহাজ্যোতির্ময় ভগবান বিশ্বরূপ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সর্ব অঙ্গে অপূর্ব লাবণ্য। কাঁধে পৈতে, ব্রহ্মতেজের মূর্তি, নিত্যানন্দেরই যেন অন্য এক স্বরূপ। সমস্ত শাস্ত্রের সমর্থন নিয়ে তিনি কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা করে চলেছেন। এই অপূর্ব প্রতিমা দেখে তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণ একদৃষ্টে বারেবারে তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কার ছেলে? সকলেই বললেন জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। শুনে খুশি হয়ে বিপ্র আলিঙ্গন করে বললেন, এমন যাঁদের ছেলে সেই পিতামাতা ধন্য। বিশ্বরূপ বিপ্রকে নমস্কার করে মধুর বাক্যে বললেন, তোমার মত অতিথি যাঁর ঘরে যাবে তাঁর পক্ষে অবশ্যই সৌভাগ্যের দিন বলতে হবে। জগতকে বিশুদ্ধ করবার জন্যই তুমি আনন্দে পূর্ণ হয়ে ভ্রমণ করছ। তোমার মত অতিথি পেয়ে আমরা সৌভাগ্য মনে করছি, আবার উপোস আছ এর জন্য দুর্ভাগ্য মনে করছি। তোমার মত অতিথি যার ঘরে উপোস করবে তার তো অমঙ্গল হবে। তোমার দর্শনে আনন্দ হলেও আবার এসব কথা ভেবে দুঃখ পাচ্ছি। বিপ্র বললেন—দুঃখ করবার কিছু নেই। আমি বনবাসী, সব সময় তো আমার অন্ন জোটেনা, প্রায়ই ফলমূল খেয়ে থাকি। অনায়াসে পাওয়া গেলে কোন কোন দিন ভাত খাই মাত্র। [illegible] আমি যে আনন্দ পেলাম তাতেই আমার কোটি কোটি বার ভোজন হয়ে গেছে। ফল, [illegible], নিবেদ্য যা কিছু ঘরে আছে, আমাকে দাও, আমি আজ তাই আহার করব। জগন্নাথ মিশ্র দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, কোন কথা বলছেন না। বিশ্বরূপ বিপ্রকে বললেন—বলতে ভয় পাচ্ছি, তোমার তো দয়ার শরীর, পরের দুঃখে তুমি দুঃখিত হও, পরের সুখে সুখী মনে কর। যদি আলস্য ত্যাগ করে আর একবার রেঁধে কৃষ্ণকে ভোগ দাও তাহলে আমাদের সকলের দুঃখ দূর হয়, আমরা খুশি হই। বিপ্র বললেন, দু [illegible] রেঁধেছি, তবু কৃষ্ণ প্রসাদ পেতে দিলেন না। তাই বুঝলাম কৃষ্ণের ইচ্ছা নয়, তুমি কেন শুধু শুধু অনুরোধ করছ? প্রচুর খাবার ঘরে থাকলেও কৃষ্ণের [illegible] তবে খেতে পারে। কৃষ্ণ যদি কপালে না লেখেন তাহলে হাজার চেষ্টা করলেও হবে না। এখন রাতও হয়ে গেছে, আর রান্না করার ইচ্ছে নেই। যা হোক কিছু খেয়ে নেব, আজ আর অনুরোধ করো না। বিশ্বরূপ বললেন, তাতে কিছু দোষ

নেই, তুমি রান্না করলেই সকলে খুশি হবেন। এই কথা বলে বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণের পায়ে ধরে রান্নার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। বিপ্র বিশ্বরূপকে দেখে মোহিত হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, রান্না করব। সকলে তখন সন্তুষ্ট হয়ে হরিধ্বনি দিয়ে পরিষ্কার ভাবে জায়গা করে দিলেন। রান্নার জিনিসপত্র সব আনা হল। ব্রাহ্মণ রান্না চাপাতে যাচ্ছেন। শিশুকে সকলে মিলে ঘিরে থাকল। বিশ্বম্ভর যে ঘরে পালিয়ে ছিলেন জগন্নাথ সে ঘরেরই দরজার মাঝখানে বসলেন। সকলেই বললেন, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দাও যাতে ও আর না বেরতে পারে। জগন্নাথ মিশ্রও তাই করলেন, দরজা বন্ধ করে দিয়ে সকলে বাইরে রইলেন। তখন ঘরের ভেতর থেকে মেয়েরা বললেন—আর চিন্তা নেই, নিমাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সে এখন আর কিছু জানে না। এই ভাবে শিশুকে সকলে দেখছেন। ব্রাহ্মণেরও রান্না হয়ে গেছে। তিনি শুদ্ধভাবে ভোগ দিয়ে ধ্যানে নিবেদন করছেন। জানতে পারলেন, অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন চিত্তেই রয়েছেন এবং তাঁকে দর্শন দান করবেন। নিদ্রাদেবী সকলকেই ঈশ্বর-ইচ্ছায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখলেন। বিশ্বম্ভর ব্রাহ্মণের অন্ন নিবেদনের স্থানে এসে গেছেন। বালককে দেখে বিপ্র 'হায় হায' করে উঠেছেন। সবাই ঘোর নিদ্রায় রযেছেন, কেউ শুনতে পেলেন না। তখন প্রভু বললেন—ওহে বিপ্র, তুমিই তো আমাকে ডেকে এনেছ, আমার কি দোষ? মন্ত্র জপ করে তুমি আমাকে ডাকলে আমি না এসে থাকি কি করে? তুমি সব সময় আমাকে দেখতে চাও, তাই তোমাকে দেখা দিলাম। তৎক্ষণাৎ বিপ্র অপরূপ রূপ দেখতে পেলো, অষ্টভুজ মূর্তি, চার হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, এক হাতে মাখন—আর এক হাতে খাচ্ছেন, দুই হাতে মুরলী বাজাচ্ছেন। শ্রীবৎসকৌস্তুভ চিহ্নিত বুকে মণিহার শোভা পাচ্ছে। সারা শরীরে মণিময অলঙ্কার। মাথায় ময়ূরপুচ্ছকে নবগুঞ্জা দিযে ঘিরে বাখা হযেছে। চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা পাচ্ছে। হেসে হেসে নয়নপদ্ম দুটিকে দোলাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে মকরমণ্ডল এবং বৈজয়ন্তী মালাও দুলছে। পাদপদ্মে রত্নখচিত নূপুব শোভা পাচ্ছে। নখমণির কিরণে অন্ধকার চলে গেল। দেখা গেল সেখানে বৃন্দাবনের কদম্ববৃক্ষ এবং তাতে পাখীরা ডাকছে। ব্রাহ্মণ যতই ধ্যান করছেন ততই প্রত্যক্ষ ভাবে চার দিকে গাভীগণকে এবং গোপ, গোপীগণকে দেখতে পাচ্ছেন। এই অপূর্ব ঐশ্বর্য দেখে ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ আনন্দে মূর্ছিত হযে পড়লেন। করুণাসমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রের দেহের উপরে শ্রীহস্ত স্থাপন করলেন। স্পর্শ পেযেই বিপ্রের জ্ঞান হল, আনন্দে তিনি জড়বৎ হয়ে পড়লেন, মুখে কথা নেই। তিনি আনন্দে বারংবার মূর্ছিত হতে লাগলেন। কম্প- স্বেদ-পুলকে শরীব অস্থিব। নদীর স্রোতের মত চোখের জল বযে চলেছে। তখনও তিনি প্রভুর চবণ ধবে জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। বিপ্রের আর্তি দেখে প্রভু তাঁকে বললেন—বহু জন্ম পূর্ব থেকেই তুমি আমার পরম ভক্ত, সর্বদা তুমি আমাব দর্শন কামনা করছ, তাই তোমাকে আমি দেখা দিলাম। গত জন্মে আমি নন্দগৃহেও তোমাকে দেখা দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি এখন তা মনে করতে পারছ না। আমি যখন গোকুলে অবতীর্ণ হয়েছিলাম তখনও তুমি মনেব আনন্দে তীর্থ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলে। হঠাৎ তুমি নন্দ মহারাজের ঘরে অতিথি হযে এভাবেই আমাকে অন্ন নিবেদন করেছিলে। তখনও আমি এভাবে মজা করে তোমার দেওয়া ভোগ খেয়ে তোমাকে আমার এই রূপ দেখিয়েছিলাম। তুমি জন্মে জন্মে আমাব ভক্ত হযে রয়েছ, তাই তোমাকে দেখা দিলাম। আমার ভক্ত ছাড়া কেউ আমাকে দেখতে পায় না। তোমাকে বললাম, এসব গোপন কথা তুমি কাউকে বলবে না। আমার এ অবতার থাকা অবস্থায কেউ

এ কথা প্রকাশ করলে তাকে আমি সংহার করব। সঙ্কীর্তনের ভেতর দিয়েই আমি জন্ম নিয়েছি, আমি সর্বদেশে কীর্তনই প্রচার করে যাব। যে প্রেমভক্তি-যোগ ব্রহ্মার পর্যন্ত বাঞ্ছিত, আমি তা ঘরে ঘরে বিলিয়ে দেব। তুমি অনেক দিন বেঁচে থেকে এসব দেখতে পাবে কিন্তু কাউকে বলবে না। এভাবে শ্রীগৌরসুন্দর ব্রাহ্মণকে ভরসা দিয়ে কৃপা করে নিজের জায়গায় চলে গেলেন। গিয়ে আবার আগের মত শিশুভাবে শুয়ে রইলেন। যোগনিদ্রার প্রভাবে কেউ কিছু জানতে পারলেন না। এই অপূর্ব প্রকাশ দেখে আনন্দে ব্রাহ্মণের সমস্ত শরীর পূর্ণ হয়ে গেল। তিনি আনন্দে সেই অন্ন সারা গায়ে মেখে কাঁদতে কাঁদতে ভোজন করতে লাগলেন। বিপ্র নেচে গেয়ে হেসে বারেবারে 'জয় বাল-গোপাল' বলে হুঙ্কার দিতে লাগলেন। ব্রাহ্মণের হুঙ্কারের শব্দে সকলে জেগে গেলেন, তিনি তখন নিজেকে সামলে নিয়ে আচমন করলেন। তিনি নির্বিঘ্নে ভোজন করছেন দেখে সকলে সন্তুষ্ট হলেন। ব্রাহ্মণ ভাবলেন সকলকেই তিনি বলে দেবেন, ঈশ্বরকে চিনে সকলে মুক্তি পেয়ে যাবে। ব্রহ্মা শিব যাঁকে পাবার জন্য কামনা করেন সেই প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়ে রয়েছেন, তাঁকে সকলে শিশু বলে ভাবছে। আমি বলে দিই, সকলে উদ্ধার পেয়ে যাবে। কিন্তু প্রভু বারণ করে দিয়েছেন। আজ্ঞা ভঙ্গ হবে। বিপ্র তাই বললেন না। তিনি ঈশ্বরকে চিনতে পেরে সেই নবদ্বীপেই গুপ্তভাবে রয়ে গেলেন। ঘুরে ঘুরে তিনি নানা জায়গায় ভিক্ষা করেন আর এসে ঈশ্বরকে দেখে যান। বেদ-গোপ্য এ সকল মহৎ-দৃশ্য কাহিনী শুনলেও কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করা যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ডের কথা অমৃতের ধারার মত, নারায়ণের শিশুরূপের লীলা কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বলোকচূড়ামণি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর লক্ষ্মীকান্ত সীতাকান্তই হচ্ছেন শ্রীগৌরসুন্দর। ত্রেতাযুগে তিনি শ্রীরাম লক্ষ্মণ রূপে নানাবিধ লীলা করে রাবণকে বধ করেছেন। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ-বলরাম হয়ে পৃথিবীর ভার হরণ করেছেন। সমস্ত বেদে যাঁকে মুকুন্দ ও অনন্ত অর্থাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম বলা হয় সেই তিনিই এই লীলায় শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ। বৃন্দাবনদাসের প্রাণের প্রাণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ, তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের কাছে তিনি এই পদ কীর্তন করছেন।

১/৪ এবারে শ্রীগৌরাঙ্গ-গোপালের হাতেখড়ি দেবার সময় হয়েছে। শুভদিনে শুভক্ষণে তা সুসম্পন্ন হল। এর কিছু দিন পরে হল কর্ণবেধ আর চূড়াকরণ। লেখাপড়ার শুরুতেই নিমাই একবার দেখেই সব অক্ষর লিখে ফেলছে। আশ্চর্য হয়ে সকলে তা দেখছে। দু-তিন দিনের মধ্যেই সব ফলা বানান শিখে সব সময় কৃষ্ণ রাম মুরারি মুকুন্দ বনমালী লিখছে আর পড়াশোনা নিয়েই সারা দিন ব্যস্ত আছে। নদীয়ার লোকদের পরম সৌভাগ্য, তাঁদের চোখের সামনে প্রভু শিশুদের সঙ্গে পড়ালেখা করছেন। তাঁর মধুর কণ্ঠে 'ক খ গ ঘ' বলা শুনেই সবাই আত্মহারা হয়ে যাচ্ছে। শ্রীগৌরসুন্দর দুষ্প্রাপ্য জিনিস চেয়ে চেয়ে অদ্ভুত খেলা করছেন। আকাশে পাখী উড়ে যাচ্ছে, তা না পেলে কেঁদে লুটোপুটি করছে। কখনো চাঁদ তারা চেয়ে না পেয়ে হাত-পা ছুঁড়ে কান্নাকাটি করে। সকলেই কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দেয় কিন্তু সে অনবরত 'দাও দাও' বলে চলেছে। একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে, হরিনাম শুনলে কান্না বন্ধ হয়। হাতে তালি দিয়ে যখন সকলে 'হরি হরি' বলে, কেবলমাত্র তখনই সে দুষ্টুমি ছেড়ে শান্ত হয়। শিশুকে খুশি করতে গিয়ে সবাই হরিনাম করে, জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি এখন যেন একটি বৈকুণ্ঠে-পরিণত হয়েছে।

একদিন হল কি, সবাই হবিনাম কবলেও প্রভু বাবে বাবে কাঁদছেন। সকলে বলছেন, বাপু, আমবা হবিনাম কবছি, তুমি আচ্ছা কবে নাচো না। কাবো কথা শুনছে না, সে কেঁদেই চলেছে। তখন সকলে জিজ্ঞাসা কবছে—কেন কাঁদছ? কি চাই বল, যা চাও তাই এনে দেব। প্রভু বললেন—যদি আমাকে প্রাণে বাঁচাতে চাও তাহলে শীঘ্র জগদীশ পণ্ডিত আব হিবণ্য ভাগবতেব বাড়ি গিয়ে তাদেব একাদশী উপবাস দিনেব সমস্ত বিষ্ণুনৈবেদ্য এনে আমাকে দাও। সে সব খেয়ে আমি সুস্থ হয়ে হেঁটে বেড়াব। ছেলেব মুখে এ কথা শুনে শচীমাতা বললেন, এমন অন্যায় কথা যেন কেউ না শোনে। চুপ কবে যাও। শিশুব কথায় সকলেই হেসে বললেন, কান্না থামাও তাই দেব।

পবমবৈষ্ণব সেই ব্রাহ্মণ দুজন জগন্নাথ মিশ্রেব খুব বন্ধু। তাবা শিশুব এই কথা শুনে খুবই খুশি হয়ে বললেন, অতি অদ্ভুত কথা, শিশুব মুখে এমন কথা তো কখনো শুনি নি, সে কি কবে জানল যে আজকে হবিবাসবে অনেক বকমেব নৈবেদ্য দেওয়া হয়েছে? এই অপরূপ ছেলেতে গোপাল আধিষ্ঠান কবছেন, এতে আব কোন সন্দেহ নেই। নাবায়ণই হৃদয়ে থেকে এসব কথা বলাচ্ছেন। এসব ভেবে দুই বিপ্র সব সামগ্রী এনে বালককে দিয়ে বললেন, নিমাই তুমি এসব গ্রহণ কব, তোমাব মধ্যেই আমবা ভগবানকে সাক্ষাৎ কবেছি। সত্যিকাবেব ভক্ত না হলে, কৃষ্ণেব কৃপা না হলে এমন বুদ্ধি কখনো হতে পাবে না। চৈতন্য মহাপ্রভুব লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান, ভক্তি ছাড়া তাঁকে জানবাব উপায় নেই। সেই প্রভু এখন ব্রাহ্মণসন্তান রূপে লীলা কবছেন এবং জন্মজন্মান্তবেব ভক্তকে ভাল কবে দেখছেন। উপহাব পেয়ে খুশি হয়ে অল্প অল্প কবে সবই খেলেন। সানন্দে ভক্তেব উপহাব খেয়ে তাব সব শিশুচাপল্য চলে গেল। সকলে তখন হবিধ্বনি দিচ্ছে, প্রভুও নেচে নেচে কীর্তন কবছেন আব খাচ্ছেন, কিছু মাটিতে পড়ছে, কিছু লোকেব গায়ে ছুঁড়ে মাবছেন, এভাবেই ভগবান লীলা কবে চলেছেন। বেদে পুবাণে ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা কবেছে, আব সেই ভগবান এখন শচীদেবীব উঠোনে খেলা কবছেন।

দুষ্টু ছেলেদেব নিয়ে বিশ্বম্ভব আবাব দুষ্টুমিতে মেতে উঠল। এসব ছেলেবা সকলেই ব্রাহ্মণসন্তান। সকলকে জড়িয়ে একেক জায়গায় হাজিব হয়, কেউ আটকাতে পাবে না। অন্য ছেলেকে দেখলেই ঠাট্টা তামাশা কবে আব অমনি ঝগড়া লেগে যায়। নিমাইয়েব দলেব ছেলেবা জিতে যায় আব অন্য দলেব ছেলেবা হাবে। সকলেই গায়ে ধুলো বালি, হাতে মুখে কালি। পড়াশোনা শেষ কবে দুপুবে তাবা সবাই মিলে গঙ্গায় চান কবতে যায়। গঙ্গায় ডুব দিয়ে সবাই মজায় জল ছোড়াছুড়ি কবে খেলা কবে। নদীপাবে বহু লোক একই ঘাটে স্নান কবছে, সকলে সকলকে চেনেও না। এব মধ্যে কেউ বা ভদ্র গৃহস্থ আছে, কেউবা সন্ন্যাসী। এভাবে অনেক ছেলে এসে জোটে, নিমাই সকলকে নিয়ে গঙ্গায় সাঁতাব কাটছে, কখনো ডুবছে, কখনো ভাসছে, নানা বকম খেলা কবছে। এই সুন্দব ছেলেটিব পায়েব জল ছিটিয়ে সকলেব গায়ে লাগছে। সবাই মানা কবছে, সে শুনছে না। তাকে কেউ ধবতেও পাবছে না। কাউকে ছুঁয়ে দিচ্ছে, কাবো গায়ে কুলকুচি ছিটোচ্ছে। তাদেব বাববাব মানা কবতে হচ্ছে। ব্রাহ্মণেবা তাকে ধবতেও পাবছে না। তাই তাবা বেগেমেগে জগন্নাথেব কাছে গিয়ে বললেন— তুমি আমাদেব বন্ধু অথচ তোমাব ছেলেব কথা কী বলব, তাব দুষ্টুমিব জন্যে আমাদেব ভাল কবে চান কবা পর্যন্ত হয় না। কেউ বলছেন— তোমাব পুত্র আমাব গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে আমাব ধ্যান-পূজা সব নষ্ট কবে দিয়েছে। আব একজন নালিশ জানালেন— তোমাব ছেলে কি বলছে জান?

বলছে, কাব ধ্যান কবছ? কলিযুগে আমিই প্রত্যক্ষ নাবাযণ। কেউ বলেন, আমাব শিবলিঙ্গটি চুবি কবে নিযে পালিযেছে। কেউ বললেন—আমাব চাদব নিযে গেছে। আব এক জন বলছেন ফুল দুর্বা, চন্দন, আসন, পূজাব সব সবঞ্জাম নিযে পালিযেছে। নৈবেদ্যেব জিনিসও সব খেয়ে নিযেছে। আমি চান কবছিলাম, এই অবসবে সে এসব কবেছে। আবাব বলে কিনা, যাব জন্য পূজা কবছ সেই খেযেছে, শুধু শুধু মনে দুঃখ কবছ কেন? আব একজনেব নালিশ—জলে নেমে সন্ধ্যা কবছি, সে ডুব দিযে এসে পাযে ধবে টানছে। কেউ বলছেন—আমাব ফুলেব সাজি, ধুতি সব নিযে গেছে। আবাব কেউ বলেন—অন্য ছেলেকে দিযে আমাব গীতা পুঁথি ফেলে দিযেছে। আব এক জন বলে—আমাব ছেলে খুবই ছোট, তাব কানে জল দিযে তাকে কাঁদাচ্ছে। কেউ বলে—আমাব পিছন দিযে এসে কাঁধে চেপে জলে ঝাঁপিযে পডছে আব বলছে, আমিই মহেশ্বব। আব একজন নালিশ জানায—আমাব পূজাব আসনে বসে নিজেই নৈবেদ্য খেযে বিষ্ণুপূজা কবছে। যত দুষ্টুবদমাশ ছেলে সবাই তাব দোস্ত। ছেলেদেব কাপডেব সঙ্গে মেযেদেব শাডি পালটিযে বাখে, পবতে গিযে সবাই লজ্জায মবছে। জগন্নাথ, তুমি আমাদেব বন্ধুলোক, কি বলব, তোমাব ছেলে বোজ বোজ এসব কাণ্ড কবছে। দুপুব গডিযে গেলেও জল থেকে ওঠে না, এবকম কবলে কি শবীবই ভাল থাকবে?

এমন সময পাডাব মেযেবা সব বেগেমেগে এল। তাবা বলল এসে শচীদেবীকে,— আমাদেব কাপড-চোপড নিযে পালায তোমাব ছেলে, কিছু বললে গাযে জল ছিটিযে দেয, ঝগডা কবে। আমাদেব ব্রত কববাব ফল সব জোব কবে নিযে ফেলে দেয। যত বদমাশ ছেলেদেব সঙ্গে জুটিযেছে। আমবা চান কবে উঠলে আমাদেব গাযে বালি ছডিযে দেয। হঠাৎ এসে কানেব কাছে মুখ নিযে চেঁচিযে কুউ কবে ওঠে। আব একজন বললে, —আমাব মুখে কলকুচো কবে ছিটিযে দিযেছে। চুলে ছাগলেব বীচি লাগিযে দিযেছে। কেউ বলছে—তোমাব ছেলে আমাকে বিযে কবতে চায, সেজন্যই এসব কবছে। সেকালেব সেই নন্দবাজেব ব্যাটা কানাইব মতই কবছে তোমাব ছেলে। আমাব বাবা-মাকে বলে দিলে তোমাব সঙ্গে খুব ঝগডা হবে কিন্তু, তোমাব ছেলেকে সামলাও। নদীযাতে এসব চলবে না।

সকলেব নালিশ শুনে শচীমাতা হেসে সকলকে কাছে ডেকে আদব কবে বসিযে বললেন—আজ নিমাই বাডি এলে তাকে আমি বেঁধে বাখব তাহলে আব গিযে তোমাদেব উৎপাত কবতে পাববে না। তখন শচীকে প্রণাম কবে সব মেযেবা চান কবতে চলে গেল। প্রভু যাব সঙ্গে যত দুষ্টুমি কবে সে কিন্তু আসলে মনে মনে খুশিই হয। অনেকে মজা কবাব জন্যই জগন্নাথ মিশ্রকে বলতে আসে, কিন্তু তিনি শুনে খুবই বাগ কবে বলে ওঠেন—সব সময লোককে বিবক্ত কবে মাবে। ভাল মত গঙ্গাস্নান কবতে দেয না। এক্ষুনি গিযে তাকে শাস্তি দেব। কেউ তাঁকে ধবে বাখতে পাবল না। তিনি বাগ কবে চলেছেন। ঈশ্বব গৌবাঙ্গ কিন্তু তা জানতে পেবেছেন। সমস্ত ছেলেদেব মধ্যে অতি মনোহব শ্রীগৌবাঙ্গও জলকেলি কবে চলেছেন। কুমাবী মেযেবা বিশ্বম্ভবকে ডেকে বললে—তোমাব বাবা আসছেন, শিগগিব পালাও। ছেলেদেব নিযে প্রভু ধবতে আসছেন দেখে মেযেবা ভযে পালিযে গেল। প্রভু ছেলেদেব শিখিযে দিলেন—তোমবা বাবাকে বলবে, সে পডাশোনা কবে ঘবে চলে গেছে, চান কবতে আসে নি, আমবাও তো তাব জন্যেই বসে আছি। প্রভু অন্য পথ দিযে ঘবে চলে গেলেন। জগন্নাথ গঙ্গাব ঘাটে

এসে পুত্রকে দেখতে না পেয়ে ছেলেদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—বিশ্বম্ভর কোথায় গেল। ছেলেরা বললে—আজ তো সে চান করতে আসে নি। প'ড়ে ঘরে চলে গেছে। আমরা সকলে তার জন্যই অপেক্ষা করছি। জগন্নাথ মিশ্র হাতে লাঠি নিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছেন। যে সব ব্রাহ্মণগণ নালিশ করেছিলেন তারাই বলতে লাগলেন—ভয় পেয়ে বিশ্বম্ভর ঘরে পালিয়ে গেছে। তুমি তাকে কিছু বলো না। আবার যদি এসে দুষ্টুমি করে তাহলে আমরাই তাকে তোমার কাছে ধরে নিয়ে যাব। আর একটা কথা বলছি, তোমার মত ভাগ্যবান ত্রিভুবনে কেউ নেই। যার ঘরে এমন ছেলে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভোগ-রোগ-শোক কি করবে? তুমি সত্যি শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করেছ, তাই ভাগ্য করে এমন ছেলে পেয়েছ। বিশ্বম্ভর হাজার অপরাধ করলেও তাকে হৃদয়ে রাখব। —এরা জন্মেজন্মে কৃষ্ণভক্ত। তাই তাঁদের এমন বুদ্ধি। প্রভু এই সকল সেবকগণের সঙ্গে নানাবিধ ক্রীড়া করছেন, অন্য লোকেরা তা বুঝতে পারছে না। জগন্নাথ মিশ্র তখন সেই সব ব্রাহ্মণদের বললেন—সে তো তোমাদেরও ছেলের মতই, তার অপরাধ নিও না। জগন্নাথ তখন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কোলাকুলি করে ঘরে ফিরে গেলেন।

ততক্ষণে অন্য পথ দিয়ে বিশ্বম্ভর ঘরে গিয়ে পৌঁছেছে। তার হাতে পুঁথি রয়েছে। চাঁপা ফুলের উপরে ভোমরা বসলে যেমন দেখায়, তারও গায়ে লেখার কালি লেগে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। প্রভু মাকে ডেকে বললেন—তেল দাও, চান করতে যাব। পুত্রের কথা শুনে শচীদেবী তাকিয়ে দেখলেন— সত্যি তো, ও তো চান করে নি। মেয়েরা, ব্রাহ্মণেরা তাহলে কি বলে গেল? এতো গায়ে কালির দাগ, হাতে বইপত্র, সেই কাপড়ই পরে আছে। তিনি স্নানের জন্য তেল রেখে চলে গেলেন। জগন্নাথ মিশ্র ফিরে আসতেই নিমাই তার কোলে চড়ে বসলেন। তার স্পর্শে জগন্নাথ সব কিছু ভুলে গেলেন, ছেলেকে দেখে তার মন আনন্দে ভরে গেল। ছেলের সারা গায়ে ধুলো মাখা দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। জগন্নাথ ছেলেকে বললেন—তোমার কেমন বুদ্ধি? লোকদের চান করতে দাও না কেন? পজোর জিনিসপত্র তুমি নিয়ে যাও কেন? তুমি কি বিষ্ণুকেও ভয় পাও না? প্রভু বললেন—আমি আজ চান করতে যাই নি। আমার বন্ধুরা সব আগে চলে গেছে। তারাই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে অথচ সকলে আমার নামেই দোষ দিচ্ছে। আমি কিছু না করেও যখন আমার নামে দোষ পড়েছে তবে আমি এখন থেকে কাউকেই ছাড়ব না। —এই বলে প্রভু গঙ্গার ঘাটে গিয়ে আবার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হলেন। বিশ্বম্ভরকে পেয়ে এবং চালাকির কথা শুনে সকলে তাকে জড়িয়ে ধরে প্রশংসা করে বলে—আজ খুব মার খেতে, বড় বাঁচা বেঁচে গেছ। প্রভু ছেলেদের সঙ্গে গঙ্গায় জল ছিটিয়ে চান করছেন। এদিকে শচী জগন্নাথ ভাবছেন—ব্রাহ্মণেরা মিথ্যে কথা বলেন নি, তবে ছেলের গায়ে চানের চিহ্ন দেখলাম না কেন? গায়ে ধুলো, শুকনো চুল, হাতে বইপত্র, শুকনো কাপড়, তাহলে কি বুঝব? বিশ্বম্ভর কি মানুষ নয়? শ্রীকৃষ্ণই কি আমাদের ঘরে জন্মেছেন, না কি অন্য কোনো মহাপুরুষ? —পুত্রকে দেখে শচী-জগন্নাথের এসব চিন্তা চলে গেল, আনন্দে সব ভুলে গেলেন। প্রভু যত সময় পড়তে যান তখন বাপমায়ের যেন আর সময় কাটে না। সহস্র মুখে সহস্র বার বললেও এ দুজনের সৌভাগ্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। শচী-জগন্নাথের চরণে অজস্র নমস্কার জানাই, তাঁরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথকে পুত্ররূপে পেয়েছেন। সকলে মায়াতে আচ্ছন্ন, বৈকুণ্ঠনাথের লীলাখেলা কেউ বুঝতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং নিত্যানন্দ চাঁদ জানেন, তাঁদেব পদপ্রান্তেই বৃন্দাবনদাস ঠাকুব এই পদ গেয়ে চলেছেন।

১/৫ শ্রীগৌবসুন্দব নবদ্বীপে বাল্যলীলা ছলে নানাবিধ ভাবে প্রকাশিত হচ্ছেন। মা যত শেখাচ্ছেন, কিছুই শুনছেন না। সব সময় সকলেব সঙ্গে দুষ্টুমি কবে চলেছেন। বাধা দিলে দুষ্টুমি আবো বাড়ে, ঘবেব জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলছে। ভয়ে তাই বাবা মা আব কিছু বলেন না। তিনি স্বচ্ছন্দে পবমানন্দে লীলাখেলা কবছেন। ভগবান শিশুরূপে ক্রীড়া কবছেন, তাই এই আদি খণ্ডেব কথা অমৃতেব মত। বাবা-মা কাউকেই প্রভু ভয় পান না। কেবল মাত্র বিশ্বরূপকে দেখলে একটু নবম হন। বিশ্বরূপ হচ্ছেন প্রভুব বড় ভাই। তিনি সর্বগুণসম্পন্ন কিন্তু আজন্ম বৈবাগ্য তাব। তিনি সকল শাস্ত্রেব বিষ্ণুভক্তি ব্যাখ্যা কবেন, তাব যুক্তি কেউ খণ্ডন কবতে পাবেন না। কান মুখ মন সকল ইন্দ্রিয় দিয়েই তিনি কৃষ্ণভক্তি আস্বাদন কবেন। তিনিও ছোট্ট ভাইয়েব অপূর্ব লক্ষণাদি দেখে বিস্মিত হন। ভাবেন, – এই শিশু সাধাবণ ছেলে নয়, রূপে এবং আচবণে ঠিক যেন বালগোপাল। শ্রীকৃষ্ণই হয়তো এব শবীবে থেকে সব সময় অলৌকিক কাজ কবে চলেছেন। বিশ্বরূপ মনে মনে এসব কথা ভাবেন কিন্তু কাবো কাছে কিছু প্রকাশ কবেন না। সর্বদা বৈষ্ণবদেব সঙ্গে কৃষ্ণকথা কৃষ্ণপূজো কৃষ্ণভক্তি নিয়েই আছেন। সমাজে সকলেই মিথ্যা বিত্ত পত্র নিয়ে ব্যস্ত আছে, বৈষ্ণবদেব দেখে উপহাস কবে। বৈষ্ণবগণকে শুনিয়ে ছড়া কাটে। – যতি সতী তপস্বীও মবেই যায়। যে দোলায় চড়ে, ঘোড়ায় চড়ে তাদেবই সক্কাত আব যাদেব আগে পিছে দশবিশজন লোক থাকে। এত যে ভগবানেব নাম কবছ কই গবিবই তো থাকছ, দুঃখ কষ্ট তো দূব হচ্ছে না। ঘনঘন হবিহবি ডাক ছাড়ে, এদেব এসব শুনলে আবো বাগ হয়। —অভক্তদেব এই সব কথা শুনে ভক্তবা মনে বড় দুঃখ পান। সাধাবণ লোক কেউ কখনো কৃষ্ণকথা শুনতে চায় না। যাবাও বা গীতা ভাগবত ব্যাখ্যা কবে কিন্তু কৃষ্ণভক্তি বিষয়ে কিছু বলে না। ভক্তিব ব্যাখ্যা তাদেব মুখে আসে না। পণ্ডিতেবা কুতর্ক কবে সময় কাটায়, কেউ ভক্তিব ধাব ধাবে না। অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ ভগবদভক্তগণ জীবেব কুমতি দেখে কেবল কাঁদেন। বিশ্বরূপ তাই স্থিব কবলেন, তিনি আব মনুষ্যসমাজে থাকবেন না, বনে চলে যাবেন।

বিশ্বরূপ তাই ভোবে গঙ্গাস্নান কবে অদ্বৈতেব সভায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা কবছেন, শুনে অদ্বৈতপ্রভুও খুশি হয়ে হুঙ্কাব কবে উঠলেন। তিনি পূজা ছেড়ে উঠে এসে বিশ্বরূপকে কোলে তুলে নিলেন। বৈষ্ণবগণ সিংহনাদ কবছেন, কাবো মনে আব কোনো দুঃখ নেই। বিশ্বরূপকে ছেড়ে কেউ ঘবে যেতে পাবছেন না, বিশ্বরূপও ঘবে আসছেন না। দেবি দেখে শচীদেবী দুপুবেব খাওয়াব জন্যে নিমাইকে বললেন তাকে ডেকে আনতে। মায়েব আদেশ উপলক্ষ কবে প্রভু অদ্বৈতেব সভাতে এসে উপস্থিত হলেন তাঁব দাদাকে ডাকবাব জন্য। এসে দেখেন বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকথা আলাপে বত। নিজেব বিষয় আলোচনা হচ্ছে দেখে শ্রীগৌবসুন্দব সকলেব প্রতি মনোহব শুভদৃষ্টিতে তাকালেন। প্রভুব প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকেই যেন লাবণ্য ঝবে পড়ছে। তাঁব নখেব সঙ্গেও কোটি চন্দ্রেব উপমা চলে না। কাপড় পবেন নি প্রভু, সাবা গায়ে ধুলো। তিনি দাদাকে বললেন—মা ডাকছেন, খেতে চল। দাদাব সঙ্গে তাঁব ধুতিব খুঁট ধবে চললেন প্রভু। সমস্ত ভক্তগণ দাঁড়িয়ে সেই মোহন রূপ দেখলেন। ভক্তগণ প্রায় সমাধি-ভাবে

তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, কারো মুখে আর ভগবদ্ আলোচনাও আসছে না। প্রভুকে দেখে স্বাভাবিক ভাবেই ভক্তগণের মন সেদিকে যায়, কিছু না জেনেও তাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। প্রভুও নিজের ভক্তগণের চিত্ত হরণ করছেন কিন্তু সাধারণ লোকেরা তার কিছুই জানতে পারে না। এসব রহস্য ভাগবত গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে তা রাজা পরীক্ষিত শুনেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে ভাগবতের কাহিনী একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

এই গৌরচন্দ্র যখন গোকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি শিশুদের সঙ্গে ঘরে ঘরে অনেক লীলা করেছিলেন। জন্ম থেকেই গোপীগণ প্রভুকে নিজেদের সন্তানের চেয়েও বেশি স্নেহ করছেন। কারণ, তাঁরা তো কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে জানেন না। এসব শুনে পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, — এমন অদ্ভুত কথা তো কোথাও শুনি নি। নিজেদের সন্তানের চেয়েও কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের বেশি স্নেহ হল কেন? তখন শ্রীশুকদেব রাজাকে বললেন, — পরমাত্মাই সমস্ত দেহের স্বামী। শরীরে আত্মা না থাকলে স্ত্রী পুত্র-আত্মীয়গণ তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। অতএব পরমাত্মাই সকলের জীবন, আর সেই পরমাত্মা হচ্ছেন এই শ্রীনন্দের নন্দন। তাই পরমাত্মার স্বভাবের কারণেই গোপীগণ কৃষ্ণকে অধিক স্নেহ করেন। এবং একথাও ভক্তদের জন্যই, সকলের জন্য নয়। সকলেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান নয়। কংস প্রমুখ অসুরদেরও আত্মা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তারা তাকে হিংসা করে কেন? এর কারণ হল তাদের পূর্বজন্মের অপরাধ ছিল। চিনি সকলের কাছে মিষ্টি লাগে কিন্তু জিহ্বার দোষে কারো কারো কাছে চিনিও তেতো মনে হয় কিন্তু সে দোষ তো আর চিনির নয়। এই রকমই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলেরই প্রাণের ধন। নবদ্বীপে তিনি জন্মেছেন, সকলেই তাকে দেখছে কিন্তু ভক্তগণ ছাড়া অন্যেরা তার কিছুই জানে না। প্রভু ভক্তের চিত্ত আকর্ষণ করে নবদ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সকলকে আকর্ষণ করে প্রভু তার দাদাকে নিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। অদ্বৈতাচার্য মনে মনে ভাবছেন, —এই বালক কখনো প্রাকৃত মানুষ নয়। উপস্থিত সকল বৈষ্ণবগণকেও অদ্বৈত বললেন, — তোমরা জানবে যে এ বালক সাধারণ লোক নয়। ভক্তবৃন্দ ও সবাই বালকের অপূর্ব রূপ লাবণ্যের বিষয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন। বিশ্বরূপও কোন মতে খেয়েই আবার অদ্বৈতের গৃহে চলে এলেন। বিশ্বরূপের সংসার ভাল লাগে না, সর্বদা কৃষ্ণকথা আলোচনা করেই তিনি আনন্দে সময় কাটান। বাড়িতে এসেও সংসারের কাজে মন দেন না, সব সময় বিগ্রহের সেবাতেই ব্যস্ত থাকেন, বিগ্রহের কাছেই থাকেন।

পিতামাতা তার বিয়ের কথা বলছেন শুনে বিশ্বরূপ মনে বড় কষ্ট পেলেন। তিনি সর্বদা সংসার ত্যাগের কথাই মনে মনে ভাবছেন। ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তির মনের কথা অন্যেরা কি করে জানবে? বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে 'শঙ্করারণ্য' নাম নিলেন এবং অনন্তের পথে চললেন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ চলে গেছেন। পিতামাতার হৃদয় পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তারা কাঁদছেন। আত্মীয়স্বজনগণ সকলেই বিলাপ করে কাঁদছেন। দাদার বিরহে গৌরচন্দ্র মূর্ছা গেলেন। জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। সেই শোকের দৃশ্য অবর্ণনীয়। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে অদ্বৈত প্রমুখ সকলেরই চোখে জল। ছোট বড় নদীয়ার সকলেই এই খবর শুনে মনে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। শচী জগন্নাথ হৃদয়বিদারক চীৎকার করে বিশ্বরূপকে ডাকতে লাগলেন। পুত্রশোকে পিতা বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। বন্ধুবান্ধবগণ তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন— দুঃখ করো না। শান্ত হও। তোমার পুত্র মহাজনের কাজ

করেছে, বংশকে উদ্ধার করেছে। বংশে যদি একজন সন্ন্যাসী হয় তাহলে তাদের তিনকুল বৈকুণ্ঠবাসী হয়। আমরা তো বলি, তোমার ছেলের জ্ঞানচর্চা সার্থক হয়েছে। তোমার তো এ সব কথা ভেবে আর দুঃখ পাওয়া উচিত নয়। —এই কথা বলে সকলে জগন্নাথ মিশ্রের হাতেপায়ে ধরে বলছেন, —বিশ্বম্ভর রয়েছে, সেই তোমার বংশ রক্ষা করবে। এই ছেলেই তোমার সব দুঃখ ঘোচাবে। অনেক ছেলের কি দরকার, এ রকম একটি থাকলেই যথেষ্ট। —এই ভাবে বান্ধবগণ সকলে জগন্নাথকে প্রবোধ দিচ্ছেন কিন্তু তবু তাঁর দুঃখ কিছুতেই যাচ্ছে না।

জগন্নাথ যত ভাবেই মনকে বোঝাতে চান, মন কিছুতেই মানে না, কেবলই বিশ্বরূপের নানা রকম গুণের কথা তাঁর মনে পড়ে। তিনি বলছেন —এই ছেলে যে আমার ঘরে থাকবে তাও আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ভগবান আমাকে ছেলে দিয়ে আবার নিয়ে গেলেন, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। জীবের কি সাধ্য আছে, ভগবান, তাই তোমাকেই সব্ব সমর্পণ করলাম। —এই বলে জগন্নাথ মিশ্র জ্ঞানযোগের দ্বারা আস্তে আস্তে স্থির হলেন।

নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদশরীর বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেলেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথা শুনলে কর্মফল কেটে যায়, কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। ভক্তগণ বিশ্বরূপের কথা শুনে আনন্দে ও দুঃখে মগ্ন হয়ে গেলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, —আমাদের যে একটু কৃষ্ণকথা আলোচনা করবার জয়গা ছিল তাও গেল। আমবাও আর ঘরে থাকব না, বনে চলে যাব, পাপীদেব মুখ আর দেখতে চাই না। পাষণ্ডীদের কথার জ্বালায় টিকতে পারছি না, সমস্ত লোকই অসৎ পথে চলেছে। কারো মুখে একটু কৃষ্ণনাম শুনি না, সকলেই মিথ্যা সুখে সংসারে ডুবে মরছে। বললেও কেউ কৃষ্ণকথা মুখে আনে না ববং উলটে আবো ঠাট্টা করে। বলে, কৃষ্ণকে ভজন করে তোমাদেরই বা কি সুখ হয়েছে? ভিক্ষা করে খাচ্ছ, তাতে দুঃখই বাড়ছে। এসব লোকেব সঙ্গে না থেকে বনে যাওয়াই ভাল। এই বলে সকলেই দুঃখ করছেন। অদ্বৈতাচার্য সকলকেই প্রবোধ দিয়ে বলেন, সকলেই পরম আনন্দ পাবে, আমি কিন্তু মনে বড আনন্দ বোধ করছি। মনে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হয়েছেন। তোমরা সবাই আনন্দ করে কৃষ্ণনাম কব, এখানেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তোমাদের নিয়ে কৃষ্ণ বিলাস করবেন। তবেই তো আমি যথার্থ কৃষ্ণদাস অদ্বৈত। শুকদেব বা প্রহ্লাদ যা পেয়েছেন তোমাদেব ভৃত্যরাও তা পাবে। অদ্বৈতপ্রভুর মধুর বাক্য শুনে সমস্ত ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করে উঠলেন।

বালকদের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ খেলাধুলা করছিলেন, হরিধ্বনি শুনে তিনি বাড়ির ভেতরে গেলেন। ভক্তগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, কেন এসেছ বাপু? প্রভু বললেন, তোমরাই তো আমাকে ডেকেছ। এই কথা বলে তিনি আবার ছেলেদের সঙ্গে খেলা কবতে ছুটে গেলেন। তথাপি প্রভুর মায়াতেই মূল বিষয় কেউ জানতে পারেনি। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পর থেকেই নিমাই যেন কিছু শান্ত হয়েছে মনে হচ্ছে, সর্বদা বাবা-মায়ের কাছে থেকে তাঁদের মনের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করেন প্রভু। খেলা ছেড়ে তিনি পড়ায় যত্ন নিয়েছেন। বই ছেড়ে একটুও কোথাও যান না। প্রভু একবার মাত্র যে সূত্রটি পড়েন অমনি তা আয়ত্ত করেন এবং পাশের ছাত্রটিকে সেবিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তাকে পরাজিত করেন। তাঁর এমন অপূর্ব বুদ্ধি দেখে সকলেই প্রশংসা করে বলেন, যে বংশে এমন ছেলে জন্মেছে তার মাতা-পিতার সার্থক জীবন। সবাই সন্তুষ্ট হয়ে জগন্নাথ মিশ্রকে বলেন,

তুমি তো এমন ছেলে পেয়ে অবশ্যই কৃতার্থ হয়েছ। এমন শিশু খুব কমই দেখা যায়, এ বিদ্যায় বৃহস্পতি হবে। কিছু শুনলেই তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারে, এর প্রশ্নেরও কেউ উত্তর দিতে পারে না। পুত্রের প্রশংসা শুনে মা খুব খুশি হচ্ছেন কিন্তু পিতা বিমর্ষ। স্বামী স্ত্রীকে বললেন, এ ছেলেও সংসারে থাকবে না। বিশ্বরূপও শাস্ত্রপাঠ করে জানতে পেরেছিল, সংসার অনিত্য। শাস্ত্রমর্ম জানতে পেরেই তো সন্ন্যাস নিয়েছে। এ ছেলেও শাস্ত্রপাঠ করে জ্ঞানী হয়ে সংসারসুখ ত্যাগ করে চলে যাবে। আমরা দুজন তো এখন এই ছেলের মুখ দেখেই বেঁচে আছি, এও চলে গেলে আমরা বাঁচব কি করে? তাই বলছি এই ছেলের আর পড়াশোনা করার দরকার নেই। নিমাই মূর্খ হয়ে তবু তো ঘরে থাকুক। শচীমাতা বললেন, মূর্খ হলে জীবিকা চলবে কি করে? তার কাছে মেয়েই বা বিয়ে দেবে কে? মিশ্র বললেন,—তুমি তো অবোধ ব্রাহ্মণকন্যা, কিছুই বুঝ না। ভগবানই সকলকে রক্ষা করেন। পাণ্ডিত্য করেই সংসার চালান যায় একথা তোমায় কে বললে? পণ্ডিত-মূর্খ বলে কোন কথা নেই, ভগবান যা কপালে লিখেছেন সে ভাবেই তার বৌ জুটবে। কুল, বিদ্যা এসব উপলক্ষ মাত্র, ভগবান যা করবেন তাই হবে। আমাকে দিয়েই দেখ না, পড়াশোনা করেও সংসারের ভাল হল কই? এমনও আছে যে, —ভালমত একটা অক্ষর উচ্চারণ করতে পারে না, অথচ তার কাছে কত কত পণ্ডিত কাজ করে। তাই বলছি বিদ্যা দিয়েই সব হয় না, কৃষ্ণই সকলকে পালন করেন। গোবিন্দ আরাধনা না করলে সুখে জীবনধারণ করা এবং সুখে মৃত্যু হওয়া সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণসেবা দ্বারাই একমাত্র অনায়াস মৃত্যু হয় ও বিনা দৈন্যে জীবন অতিবাহিত করা যায়, বিদ্যা ও ধনে তা হয় না। বিদ্যা, কুল, অজস্র ধনসম্পদ থাকুক না, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত দুঃখ মোচন হবে না। এমন লোক আছে যার ঘরে অর্থ প্রাচুর্যের অভাব নেই, অথচ ভগবান একটা বড় রকমের রোগ দিয়ে রেখেছেন, সে ভোগ করতে পারছে না, দুঃখের জ্বালায় পড়ে মরছে। যার কিছু নেই তার চাইতে এই লোককেই বেশি দুঃখী বলতে হয়। তাই জানবে যে সম্পদ থাকলেই হয় না, ভগবানের ইচ্ছাতেই সব হয়। তুমি ছেলের জন্য কোন চিন্তা করো না, আমি তোমাকে বলছি, শ্রীকৃষ্ণই ছেলেকে রক্ষা করবেন। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ছেলের কোন চিন্তার কারণ নেই। তোমার মত পতিব্রতা রমণী যার মা তার ভাবনা কি? শ্রীকৃষ্ণই আমাদের রক্ষাকর্তা। আমি তোমাকে বলছি, পড়াশোনা করার কোন দরকার নেই, মূর্খ হোক তবু ছেলে ঘরে থাকুক। এই কথার পর জগন্নাথ পুত্রকে ডেকে বললেন, বাপু, শোন। আজ থেকে তোমার আর পড়ালেখার দরকার নেই। আমি দিব্যি করে বলছি, আমার এই কথা অবশ্য শুনবে। তুমি যা চাও তাই দেব, ঘরে থেকেই সুখে কাটাও। এই বলে জগন্নাথ নিজের কাজে চলে গেলেন। বিশ্বম্ভরের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্য সনাতন ধর্ম রক্ষা করেই চললেন, পিতার বাক্য অমান্য করলেন না, পড়া বন্ধ করে দিলেন।

পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে প্রভুর মনে দুঃখ হল। তিনি আবার পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে দুষ্টুমি আরম্ভ করে দিলেন। নিজের বাড়িতে পরের বাড়িতে কোন বাছ-বিচার না করে যা পায় তাই ভাঙচুর করে রাখে। সন্ধ্যার পরেও ঘরে ফেরে না, সারা রাত ধরে ছেলেদের দলে চুটিয়ে নানা রকমে খেলা করে। দু জনে মিলে কম্বলে গা ঢেকে ষাঁড়ের মত চলে। দিনের বেলা দেখে রাখে, কার বাড়িতে কলাবাগান আছে, রাত্রে ষাঁড়ের মত গুঁতিয়ে তা ভেঙ্গে রেখে আসে। গরু ঢুকছে মনে করে গৃহস্থ তাড়িয়ে দেয়

আর গৃহস্থ জেগে বেরিয়ে এলে ছেলের দল দৌড়ে পালায়। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ এভাবে সব সময় ছেলেদের নিয়ে খেলা করছেন। বিশ্বম্ভর নানা রকম দুষ্টুমি করলেও জগন্নাথ মিশ্র আর কিছু বলেন না।

প্রভু পড়তে না পেয়ে রেগে আছেন। একদিন পিতা বাড়িতে ছিলেন না। পুজোর যে সব হাঁড়িকুড়ি ফেলে দেওয়া হয়েছে, প্রভু সেইসব নোংরার উপরে গিয়ে বসে রইলেন। এ কাহিনীর মধ্যে একটি নিগূঢ় কথা আছে, মন দিয়ে শোনা প্রয়োজন, তাতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। ফেলে দেওয়া ওসব নোংরা হাঁড়ির একটি আসন তৈরি করে প্রভু সেখানে বসে হাসছেন। ছেলেরা গিয়ে শচীমাতাকে বললে,—নিমাই হাঁড়ির উপরে বসে আছে। মা এসে দেখে বললেন,—বাপ্, ওখানে বসতে নেই। ছি ছি। এঁটো হাঁড়িকুড়ি ছুঁলে চান করতে হয় তাও তুমি জান না? প্রভু বললেন,—তোমরা আমাকে পড়তে দিচ্ছ না, আমি খারাপ-ভাল বুঝব কি করে? আমি তো ভালোমন্দ কিছুই জানি না, সব জায়গাকেই আমি এক মনে করি। এই বলে প্রভু ঐ ফেলে দেওয়া হাঁড়িকুঁড়ির উপরে বসেই মিটিমিটি হাসছেন। প্রভুর তখন দত্তাত্রেয়-ভাব। মা বলছেন,—তুমি যে অপবিত্র স্থানে বসেছ, এখন কি করে পবিত্র হবে? প্রভু উত্তর দিলেন, মা তোমার যেমন ছেলেমানুষি বুদ্ধি, আমি কখনো অপবিত্র স্থানে বসি না। আমি যেখানে থাকি সেখানেই পুণ্য স্থান, গঙ্গা আদি সর্বতীর্থ সেখানেই উপস্থিত থাকে। আমরাই শুচি অশুচি বলে মনে করি। স্রষ্টার কাছে সবই সমান। শাস্ত্রের মতে বা সামাজিক মতে যদি অশুচিও হয়, আমি স্পর্শ করলে আর অশুদ্ধ থাকে না। তুমি যেসব হাঁড়িতে বিষ্ণুর জন্য ভোগ রান্না করেছ তাতে আবার দোষ কি? বিষ্ণুর ভোগ রান্নার পাত্র কখনও অশুচি হয় না, সেই পাত্রের স্পর্শে বরং অন্য স্থান শুদ্ধ হয়। তাই বলছি, আমি কখনো অশুদ্ধ স্থানে বসি না, বরং আমার স্পর্শেই সব কিছু শুদ্ধ হয়ে যায়। প্রভু শিশুভাবে হেসে হেসে সব তত্ত্ব বললেন কিন্তু মায়াবশে কেউ তা বুঝতে পারলেন না। সকলেই শিশুর কথা শুনে হাসছেন। শচী বললেন, চান করে এসো। প্রভু কিন্তু কিছুতেই আসছেন না। সেখানেই বসে আছেন। মা বললেন,—শিগগির চলে এস, তোমার বাবা জানতে পারলে মুস্কিল আছে। প্রভু বললেন,—আমাকে যদি পড়াশোনা করতে না দাও তাহলে আমি কিছুতেই যাচ্ছি না।

তখন উপস্থিত সকলেই শচীদেবীকে ভর্ৎসনা করে বললেন,—সত্যি তো, ওর পড়াশোনা তোমরা বন্ধ করে দিলে কেন? সবাই ছেলেপুলেকে পড়াবার জন্য কত চেষ্টা করে আর তোমার ছেলে নিজেই পড়তে চাইছে। ছেলেকে মূর্খ করে ঘরে রাখতে কোন্ শত্রু এমন পরামর্শ দিল? সত্যি তো, এতে তো ছেলের কোনই দোষ নেই। সকলেই বললেন, বাপ নিমাই, চলে এস। আমরা বলছি, তুমি যদি আজ থেকে পড়তে না পাও তবে যা ইচ্ছা দুষ্টুমি করবে। প্রভু উঠে আসেন না, সেখানে বসেই হাসেন। ভাগ্যবানগণ তা দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। তখন শচীদেবী ছেলেকে ধরে নিয়ে এলেন। প্রভু দত্তাত্রেয় ভাবে তত্ত্বকথা বললেন কিন্তু বিষ্ণুমায়ার প্রভাবে তা কেউ বুঝতে পারলেন না। শচী পুত্রকে চান করালেন তখন মিশ্র বাড়িতে এলেন। শচীদেবী স্বামীকে বললেন,—ছেলেকে চতুষ্পাঠীতে পাঠানো বন্ধ করে দেওয়ায় তার মনে কষ্ট হয়েছে। উপস্থিত সকলেই বলেন,—তুমি উদারমনা লোক, তুমি কার কথায় ছেলেকে পড়ানো বন্ধ করে দিলে? ভগবান যা করবেন তাই হবে। তুমি কিছু চিন্তা করো না, ছেলেকে

পডতে পাঠিযে দাও। ভালই বলতে হবে যে ছেলে নিজেব থেকেই পডতে চাইছে। তবপব ভাল দিন দেখে উপনযন দিযে দাও। জগন্নাথ বললেন,—তোমবা আমাব পবম বান্ধব, তোমাদেব কথা মানতেই হয। শিশুব অলৌকিক সব কাজ দেখে সকলে বিস্মিত হচ্ছেন কিন্তু মূল কথা কেউ জানতে পাবেন না।

এক আধ জন অতি ভাগ্যবান লোক জগন্নাথ মিশ্রকে প্রিযরূপে আভাসে ইঙ্গিত দিযেছিলেন, এই বালক সাধাবণ নয, একে যত্ন কবে প্রতিপালন কবরে। ভগবান এভাবেই ব্রাহ্মণেব ঘবে গুপ্তলীলা কবছেন। পিতাব আদেশে পডতে পেযে মহাপ্রভু মনে বিশেষ আনন্দ লাভ কবলেন।

১/৬ পৈতে দেবাব সময হয়ে এসেছে। জগন্নাথ মিশ্র আত্মীযদেব নিযে পণ্ডিত ডেকে এনে পুত্রকে উপনযন দেবাব কথা আলোচনা কবলেন। সকলেই আনন্দ করে এলেন এবং যাব যাব উপযুক্ত কাজে তাবা লেগে গেলেন। মেযেবা উলুধ্বনি দিচ্ছে, নানা মৃদঙ্গ, সানাই ও বাঁশি বাজছে। ব্রাহ্মণেবা বেদপাঠ কবছেন, ভাটেবা মঙ্গলগান কবছে। শচীদেবীব বাডি আনন্দে পূর্ণ হযে গেছে। শুভ দিন দেখে শ্রীগৌবহবিব উপনযন হযে গেল। প্রভুব দেহে যজ্ঞসূত্র শোভা পেল যেন শেষ অনন্তনাগই তাঁব দেহ জুডে বযেছেন সূক্ষ্মরূপে। প্রভু গৌবচন্দ্রেব বামনরূপ দেখে সকলেই আনন্দিত। তাঁব অপূর্ব ব্রহ্মণ্য তেজ দেখে অনেকে তাঁকে আব সাধাবণ মানব বলে ভাবছেন না। তাঁব হাতে দণ্ড কাঁধে ঝুলি, তিনি সমস্ত ভক্তদেব ঘবে ভিক্ষা করছেন। যাব যা শক্তি সেইভাবেই সকলে আনন্দেব সঙ্গে প্রভুকে ভিক্ষা দিলেন। ব্রাহ্মণী বা নাবী এবং পতিব্রতা মাতৃগণ ব্রাহ্মণীরূপে বালকগৌবকে ভিক্ষা দিযে আনন্দিত হচ্ছেন। প্রভু সকলেব উদ্ধাবেব জন্যই এই বাল্যলীলা কবছেন। হে বামনরূপী গৌবচন্দ্র, ভক্তেব হৃদযে তোমাব পাদপদ্ম স্থাপন কব। তোমাব জয হোক। প্রভুব উপনযন সংবাদ মন দিযে শুনলে চৈতন্যচবণে আশ্রয লাভ কবা যায।

এই ভগবান শচীগৃহে নানাবিধ ক্রীডা কবছেন। ঘবে বসে সবশাস্ত্র অধ্যযন কবে প্রভুব ইচ্ছা হল চতুষ্পাঠীতে গিযে পডতে। সান্দীপনি মানব মতই নবদ্বীপে আছেন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত। তিনি ব্যাকবণশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, তাঁব কাছেই প্রভুব পডবাব ইচ্ছা। পুত্রেব ইচ্ছা জেনে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে নিযে গঙ্গাদাস পণ্ডিতেব কাছে গেলেন। মিশ্রকে দেখে গঙ্গাদাস পণ্ডিত আপ্যাযন কবে বসতে দিলেন। জগন্নাথ বললেন,—আমি ছেলেকে তোমাব কাছে দিলাম, তুমি নিজেব মনে কবে তাকে পডিযে শিখিযে তুলবে। গঙ্গাদাস বললেন,—এতো আমাব পক্ষে সৌভাগ্য, আমি অবশ্যই যথাশক্তি শিক্ষা দিব। ছাত্রকে পেযে গঙ্গাদাস নিজেব পুত্রেব মত তাকে কাছে বেখে দিলেন। শিক্ষক যা পডাচ্ছেন ছাত্র তা একটু শুনেই শিখে ফেলেন। গুরুব ব্যাখ্যা খণ্ডন কবে আবাব তিনি নতুন ব্যাখ্যা স্থাপন কবেন। বহু শিষ্য পডছে কিন্তু কেউ তাঁব ভুল ধবতে পাবছে না। গুরু শিষ্যেব অবস্থা দেখে তাঁকে সকলেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মান্য কবেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতেব কাছে যত ছাত্র পডছেন প্রভু সকলেব মধ্যে নেতৃস্থানীয। মুবাবি গুপ্ত, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ যত ছাত্র আছেন সকলকেই প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসা কবেন। প্রভুকে ছেলেমানুষ দেখে হেসে সবাই মেনে নেয। বোজই পডা হলে সদলবলে তাঁবা দুপুবে গঙ্গাস্নান কবতে যান। এক অধ্যাপকেব ছাত্রদেব সঙ্গে অন্য অধ্যাপকেব ছাত্রদেব ঝগডা হয। প্রভুও বযসে বালক,

তিনিও অন্য ছাত্রদের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে নেমে পড়েন। কেউ বলে, —তোমার গুরুর কি বুদ্ধি? কেউ বলে, —আমি তাঁর ছাত্র। এই ভাবে অল্পে অল্পে শুরু হয়ে গালাগালি, জল ছোঁড়াছুড়ি, বালি ছোঁড়া, কাদা ছোঁড়া এবং শেষে মারামারিও হয়। কেউ বা রাজার ভয় দেখায় আবার কেউ মেরে গঙ্গা পার হয়ে চলে যায়। ছাত্রদের দৌরাত্ম্যে গঙ্গার জল ঘোলা হয়ে যায়। মেয়েরা খাবার জল তুলতে পান না, ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা চান করতে পারেন না। নিমাই গিয়েই তাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে। একেক ঘাটে খানিক সময় থেকেই আবার চলে আসে। তাদের মধ্যে যারা পড়াশোনায় ভাল সেই সব ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করে, —অকারণ ঝগড়া করছ কেন? বরং এস, বৃত্তি-পঞ্জী-টীকা কে কেমন জানে আলোচনা করে দেখি। প্রভু বললেন, —ভাল কথা, যার যা ইচ্ছা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পার। কেউ বলছে, —এত অহঙ্কার করছ কেন? প্রভু বলছেন, —তোমার যা মনে আসে জিজ্ঞাসা কর। সেই ছাত্রটি বললে, —ধাতুসূত্র ব্যাখ্যা কবে বল দেখি। প্রভু বললেন, —মন দিয়ে শোন। সর্বশক্তিমান প্রভু প্রমাণ দিয়ে সূত্র ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর ব্যাখ্যা শুনে সকলেই খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। তখন প্রভু আবার বলছেন, —যা বলেছি এবারে তার খণ্ডন করছি, তাও শোন। প্রভু আগে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন পরে তা সবাইকে ভুল বলে দেখালেন। তারপর বললেন, —এখন কার কী বলার আছে বল। এসব শুনে সকলেই বিস্মিত হচ্ছেন। প্রভু বললেন, —শোন, এবারে আবার বলছি। প্রভু এরপর যা ব্যাখ্যা করলেন তাও সর্ববিষয়ে যুক্তিপূর্ণ, কোথাও কোন প্রমাণের অভাব নেই। ভালছাত্ররা শুনে খুশি হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁরা বললেন, —আজ বাড়ি চলে যাও, কাল আবার হবে। এভাবে ভগবান গৌরচন্দ্র প্রতি দিন গঙ্গায় স্নান করছেন আর বিদ্যার খেলা দেখাচ্ছেন।

এই জলক্রীড়ার জন্যই ভগবান নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছেন। কখনো প্রভু ছেলেদের সঙ্গে সাঁতার কেটে গঙ্গার ওপারে চলে যাচ্ছেন। যমুনা নদীতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জলবিহার করেছেন, তা দেখে গঙ্গার মনে খুব দুঃখ ছিল। গঙ্গা মনে মনে ভাবতেন, কবে আমার তেমন ভাগ্য হবে। যদিও অজ ভব আদি দেবগণ গঙ্গার স্তব করেন তথাপি গঙ্গা যমুনার পদ বাঞ্ছা করতেন। শ্রীগৌরসুন্দর হচ্ছেন বাঞ্ছাকল্পতরু, তাই তিনি গঙ্গার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। গঙ্গায় জলক্রীড়া করে তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন। যথাবিধি তুলসীকে জল দিয়ে বিষ্ণু পূজা করে তিনি ভোজনে বসেন। খাওয়া হলেই বই নিয়ে গিয়ে চুপচাপ পড়তে বসেন। নিজেই সূত্রের টিপ্পনী করছেন, পড়তে পড়তে চারদিকের কথা সবই ভুলে গেলেন। পুত্রের গভীর মনোযোগ দেখে পিতা অত্যন্ত আনন্দিত। পুত্রের রূপে মুগ্ধ হয়ে জগন্নাথ যেন সাযুজ্য লাভ করলেন। বস্তুত ভাগ্যবান মিশ্রের কাছে সাযুজ্য এমন কিছু কাম্য নয়। অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ তাঁর পুত্র, তিনি প্রচুর সম্মানও পাচ্ছেন। তাই পুত্রকে দেখেই তিনি আনন্দসাগরে ভাসছেন। কামদেবকে পরাজিত করবার মত প্রভুর রূপ, প্রতি অঙ্গে অনুপম লাবণ্য। এসব দেখে জগন্নাথ মিশ্র মনে মনে ভাবেন, ডাকিনী কিম্বা দানবে এর কোন ক্ষতি করবে না তো? পিতা ভয়ে পুত্রকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করেন, আড়াল থেকে শুনে প্রভু গৌরচন্দ্র হাসেন। পিতা বলছেন,—কৃষ্ণ, তুমিই সকলের রক্ষক। আমার পুত্রের দিকে শুভ দৃষ্টি দিও। তোমার পাদপদ্ম মনে রাখলে তার তো কখনো বিঘ্ন হয় না। যে সব পাপস্থানে তোমার কথা মনে করা হয় না সেখানেই কেবল ভূত-প্রেত-ডাকিনীরা রাজত্ব করতে পারে। ভাগবতে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতকে

বলেছেন,—যেখানকার লোকেরা কাজকর্মে শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষসনাশক নামকীর্তন না করে সেখানেই রাক্ষসীরা তাণ্ডব করতে পারে। তাঁর নামেরই এই প্রভাব, আর তিনি নিজে উপস্থিত থাকলে তো কথাই নেই। জগন্নাথ মিশ্র দুই হাত তুলেই প্রার্থনা জানাচ্ছেন,—প্রভু, আমি তোমার দাস, আমার যা কিছু আছে তা তোমাকেই রক্ষা করতে হবে, কারণ এ সবই তোমার। আমার পুত্রের কাছে যেন কখনো কোনো বিঘ্ন বা সঙ্কট না আসে, তুমি তা দেখবে।

দৈবাৎ একদিন স্বপ্ন দেখে মিশ্রের মনে একই সঙ্গে সুখ এবং দুঃখ উপস্থিত হল। তিনি স্তব পাঠ করে প্রণাম জানিয়ে বলতে লাগলেন,—হে গোবিন্দ, তোমার কাছে শুধু এই বর চাই যে নিমাই যেন ঘরে থাকে, সে যেন গৃহস্থ-জীবন যাপন করে। আশ্চর্য হযে শচীদেবী জিজ্ঞাসা করলেন,—হঠাৎ এসব বর চাইছ কেন? জগন্নাথ মিশ্র বললেন,—আমি স্বপ্ন দেখলাম যেন নিমাই মস্তকমুণ্ডন করেছে। অদ্ভুত এক সন্ন্যাসী বেশ, কেমন যে দেখেছি তা ঠিকমত বলতেও পারব না। সব সময় যেন 'কৃষ্ণ' বলে হাসে নাচে কাঁদে। অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ ভক্তগণ তাঁকে ঘিরে কীর্তন কবছেন। নিমাই এসে কখনো বিষ্ণুখট্টায় বসছে আর সকলের মাথায় পা তুলে দিচ্ছে। ব্রহ্মা শিব অনন্তদেব সকলেই জয় 'শ্রীশচীনন্দন' গাইছেন। সবাই ভয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে স্তুতি করছেন, দেখে আমার গলা শুকিয়ে যায়। তারপর দেখলাম, নিমাই সহস্র সহস্র লোক নিযে নগরে নগরে নেচে নেচে কীর্তন করছে। অজস্র লোক নিমাইযের পেছনে পেছনে ছুটছে এবং তাঁদের হরিনামের শব্দে ব্রহ্মাণ্ড ভরে যাচ্ছে। চারদিকে কেবলই নিমাইযেব প্রশংসা হচ্ছে এবং ভক্তগণ দলবেঁধে নীলাচলে যাচ্ছেন। এই স্বপ্ন দেখে আমাব দুশ্চিন্তা হলো যে নিমাই সন্ন্যাসী হযে না বেরিযে যায।

শচীদেবী বললেন,—চিন্তা কবো না, তুমি তো স্বপ্নই দেখেছ। নিমাই ঘবসংসাবই কববে। বই ছাড়া সে আর কিছু জানে না। সে এখন একমাত্র বিদ্যাচর্চাতেই মগ্ন। এভাবে তাঁবা দুজন পুত্রস্নেহে নানা কথা আলোচনা করছেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই জগন্নাথ মিশ্র নিত্যসিদ্ধ কলেবরে অ৹ ান কবলেন। পিতার মৃত্যুতে প্রভুর কান্নাকাটি দেখে ঠিক দশবথের দেহত্যাগে শ্রীরা৴মর বিলাপেব কথা মনে পড়ে। নিমাইযেব স্নেহে শচীমাতাব জীবন বক্ষা পেযে গেল। এই দুঃখজনক কাহিনী বিস্তারিত বলতেও দুঃখ লাগে, তাই সংক্ষেপেই বলা হল। জননীর সঙ্গে গৌরহবি নিজেকে সম্বরণ করে নিগূঢ রূপে অবস্থান করছেন। পিতৃহীন বালকেব পরিচর্যা কবা ছাড়া শচীর এখন আর অন্য কোন কাজ নেই। একদণ্ড ছেলেকে না দেখলে তিনি চোখে অন্ধকাব দেখেন, মূর্ছিত হয়ে পড়েন। প্রভুও মাকে খুবই ভালবাসেন, তাঁকে আশ্বাস দেন। প্রবোধ দিয়ে বলেন,—আমি তো আছি, তোমাব চিন্তা কী? যে-বস্তুকে লোকে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের পক্ষেও দুর্লভ মনে কবে, আমি অনাযাসে তোমাকে তা এনে দেব। শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখের দিকে তাকালেই শচীদেবীব দেহেব স্মৃতি পর্যন্ত লোপ পায়। যাঁকে স্মরণ করলেই সমস্ত দুঃখ চলে যায়, তিনি যাঁর পুত্ররূপে বর্তমান তাঁব আবাব দুঃখ কি? মাতাকেও তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিলেন এবং নিজেও স্বরূপগত অনুভবের সুখে নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ বালকের শরীর নিয়ে লীলা কবছেন। প্রভুর ঘরে সর্বদা গরীবানা তবু মার কাছে তাঁর দাবি যেন মহামহেশ্বরের বিলাসের মত। ঘরে কি আছে, না আছে, কিছুই জানে না। চাইলেই তখনই তাকে তা দিতে হবে। নইলে রক্ষা নেই। না পেলে

তখনই ঘর-দুয়ার ভেঙ্গে এক কাণ্ড করবে। তাতে যে নিজেদেরই ক্ষতি তাও বুঝতে চায় না। শচীদেবী যতদূর সম্ভব চাওয়া মাত্রই স্নেহের পুত্তলির দাবি পূরণ করেন।

একদিন প্রভু গঙ্গায় চান করতে যাবেন, মাকে বললেন—তেল, আমলকী, দিব্যমালা, সুগন্ধি চন্দন এসব দাও। আমি চান করে উঠে গঙ্গার পূজা করব। মা বললেন—একটু দাঁড়াও, আমি গিয়ে মালা এনে দিচ্ছি। 'গিয়ে মালা আনছি' শুনেই তো ছেলে রেগে একেবারে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। ঘরে ঢুকে বললেন—এক্ষুনি গিয়ে মালা আনো। ঘরে যত গঙ্গাজলের কলস ছিল সব ভেঙ্গে ফেললেন। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তেল ঘি নুনের ভাণ্ড সব চূর্ণবিচূর্ণ করলেন। ছোট বড় ঘট যা ছিল ঘরে সব ভেঙ্গে শেষ করা হল। সারা ঘ ' তেল ঘি দুধ চাল তুলো ধান, নুন বড়ি মুগ সব গড়াগড়ি যাচ্ছে। সমস্ত সিঁকে টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হল। কাপড়-চোপড় যা সামনে পেয়েছেন প্রভু সবই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন। সব যখন ভেঙ্গে শেষ করা হয়েছে তখন রাগ পড়ল গিয়ে ঘরের উপরে। দুহাতে লাঠি দিয়ে ঘরের চালে বাড়ি মারতে লাগলেন। কারো সাধ্য নেই যে তাঁকে বারণ করে। ঘর-দরজা ভেঙ্গে শেষ করে তার গাছ-গাছালির উপরে দুহাতে লাঠি দিয়ে পেটাতে লাগলেন। তাতে রাগ কমল না, তখন লাঠি দিয়ে মাটির উপরে পেটাতে শুরু করলেন। শচীদেবী ঘরের এক কোণে মহাভয়ে লুকিয়ে রয়েছেন। সনাতন ধর্ম সংস্থাপক প্রভু কিন্তু জননীর উপরে হাত তোলেন নি। এ রকম রাগ আরো করেছেন কিন্তু কখনো মাকে মারেন নি। সব ভেঙ্গে শেষ করে তবে উঠোনে গিয়ে রাগে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। সোনার দেহে ধুলোবালি লেগেছে, তাও দেখতে যেন অপূর্ব সুন্দর লাগছে। কিছু সময় গড়াগড়ি করে তারপর স্থির হয়ে শুয়ে রইলেন। ঠিক যেন বৈকুণ্ঠপতি যোগনিদ্রায় শুয়ে আছেন। অনন্তদেবের উপরে যিনি শয়ন করেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যাঁর পাদপদ্ম সেবা করেন, চার বেদে যাঁর তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে সেই প্রভু শচীমাতার উঠোনে শুয়ে আছেন। যাঁর লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান, যাঁর সেবকেরা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্যাদি করেন, ব্রহ্মা-শিব আদি যাঁর গুণাবলী ধ্যানে নিরত সেই প্রভু শচীর উঠোনে ঘুমুচ্ছেন। এইভাবে মহাপ্রভু বাল্যলীলার আস্বাদনে ঘুমুচ্ছেন দেখে সমস্ত দেবগণ হাসছেন, কাঁদছেন। কিছু পরে শচীদেবী গঙ্গাপূজার দ্রব্যাদি এনে ধীরে ধীরে পুত্রের গায়ে হাত দিয়ে ধুলো ঝেড়ে জাগাতে লাগলেন—বাপু, দেখ মালা এনেছি। ওঠ, গিয়ে গঙ্গাপূজা কর। এইসব জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলে ভালই করেছ, এতে তোমার যদি আপদ-বিপদ কেটে যায় তাই ভাল। মায়ের কথা শুনে নিমাই লজ্জা পেয়ে চান করতে চলে গেল। শচীদেবী সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রান্নার জোগাড় করতে লাগলেন। প্রভু এতকিছু নষ্ট করলেও শচীদেবীর মনে তার জন্য একটুও দুঃখ নেই। গোকুলে কৃষ্ণের চপলতা যেভাবে যশোদা সহ্য করেছেন এও যেন ঠিক তেমনি। শচীমাতাও গৌরাঙ্গের সমস্ত চঞ্চলতাই হাসি মুখে সহ্য করছেন। ঈশ্বরের লীলাকথা কতই বা আর বলা যায়। এরপর মহাপ্রভু গঙ্গায় চান করে বাড়িতে এসে তুলসীকে জল দিয়ে, বিষ্ণুপূজা করে গিয়ে ভোজন করতে বসলেন। ভোজন করে প্রভু খুশি মনে পান খেলেন। তখন শচীমাতা এসে বললেন—তোমারই এসব জিনিসপত্র। তুমি অকারণে সব নষ্ট করলে কেন? আমার কি দায় পড়েছে, বল! তুমি বলছ পড়তে যাবে আর কাল কি খাবে তার তো কোনোই ব্যবস্থা নেই। জননীর কথা শুনে প্রভু হেসে বললেন—কৃষ্ণ

পালন-পোষণ-কর্তা, তিনিই যা করবার করবেন। এই কথা বলে সরস্বতী-পতি বই নিয়ে পড়তে চললেন।

পড়ালেখা করে সন্ধ্যায় গঙ্গা তীরে খানিক সময় থেকে ঘরে ফিরলেন। জননীকে ডেকে এনে গোপনে তাঁর হাতে দুই তোলা সোনা দিলেন। —মা, কৃষ্ণ দিয়েছেন, এটা ভাঙ্গিয়ে সংসার খরচ চালাও।—এই কথা বলে মহাপ্রভু ঘুমুতে চলে গেলেন। আশ্চর্য হয়ে মা ভাবছেন—যখনই দরকার তখনই কোথা থেকে সোনা নিয়ে আসে? ধার করে না কি কোন মন্ত্রটন্ত্র জানে? কি করে কার সোনা নিয়ে আসে কে জানে? উদার প্রকৃতি, অত্যন্ত সরল শচীমাতা সোনার পরিবর্তে টাকা-পয়সা নিতেও ভয় পান। কোন লোককে দিয়ে বলেন—আগে দু-চার জায়গায় দেখিয়ে তবে ভাঙ্গাবে। এই ভাবে সর্বসিদ্ধেশ্বর মহাপ্রভু নবদ্বীপে গুপ্ত আছেন। তিনি পড়ুয়াদের মধ্যে বসে সর্বদা পুস্তক পাঠ করছেন। প্রত্যক্ষ মদনেব মতই তাকে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, ললাটে ঊর্ধ্ব তিলক, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, কাঁধে পৈতে, ব্রহ্মতেজে মূর্তিমান, দিব্য দাঁত, পদ্ম-আঁখি, মুখে প্রসন্ন হাসি। তেকাছা দিয়ে কাপড পরা, যে দেখে সেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সকলেই একবার দেখে ধন্য ধন্য বলে। পড়ার বিষয়ে নিমাইয়ের ব্যাখ্যা শুনে শিক্ষকও খুব খুশি হন। অধ্যাপক তাঁকেই ছাত্রদের মধ্যে প্রধান নির্বাচন করেন এবং বলেন—তুমি মন দিয়ে পড়, বাপু। তুমি পাণ্ডিত হবে, বড় পণ্ডিত হবে, এ আমি নিশ্চয় করে বলে দিলাম। প্রভু বলেন—অধ্যাপকের আশীর্বাদ লাভ করলে পণ্ডিত হওয়া কঠিন কি? শ্রীগৌরাঙ্গ যাকেই যা জিজ্ঞাসা করেন, কেউ তার উত্তর দিতে পারে না। তারপব নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিযে দেন। কোন ছাত্র কোন সূত্রের সমাধান করতে না পারলে প্রভুই তা করে দেন। স্নানে, ভোজনে, পর্যটনে সব সময়েই তিনি শাস্ত্রচর্চা করে চলেছেন। তিনি বিদ্যাচর্চায় মগ্ন রয়েছেন। সময হয়নি বলে তিনি এখনো আত্মপ্রকাশ করছেন না। সমস্ত সমাজ হরিভক্তি-শূন্য হয়ে পড়েছে, অসৎসঙ্গ অসৎপথ ছাড়া আর কিছু লোকে জানে না। সন্তানদের নিয়ে নানা রকমের উৎসব করে, শরীর সংসার ছাড়া আর কিছুই জানে না। অনিত্য সুখ নিয়েই লোকেরা খুশি আছে দেখে বৈষ্ণবগণ দুঃখ মনে আছেন। তাঁরা কৃষ্ণের কাছে কেঁদে বলছেন—নারায়ণ, এদের প্রতি কৃপা কর, মনুষ্যদেহ পেয়েও তারা ভগবানে ভক্তি করতে শিখল না। আব কতকাল এই দুর্গতি ভোগ কবতে হবে? দেবতারাও যে শরীর পাওয়ার জন্য কামনা করেন, তাই এরা মিথ্যা-সুখে অপচয় করল। বিয়েসাদীর আনন্দে মত্ত হয়ে আছে, কৃষ্ণযাত্রা-মহোৎসবের নামগন্ধ নেই। প্রভু, তোমার জীব, তুমিই রক্ষা করছ, আমরা আর কি বলব?—ভক্তবৃন্দ এভাবে সকল জগৎবাসীর মঙ্গলকামনা করেন আর কৃষ্ণনাম কীর্তনাদি করেন।

মহাপ্রভুর বিদ্যারসের কথা বলা হল, এবারে নিত্যানন্দের আখ্যান বলছি। শ্রীচৈতন্যেব আজ্ঞায় আগেই শ্রীঅনন্তপ্রভু রাঢ় অঞ্চলে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করছেন। মৌড়েশ্বর শিবলিঙ্গের কাছে একচক্রা গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা হাড়াই ওঝা, মাতা পদ্মাবতী। শিশুকাল থেকেই দেখতে অত্যন্ত সুন্দর লাবণ্যময় শরীর, গুণবান, বুদ্ধিমান ও স্থিরমতি। তাঁর জন্ম থেকেই রাঢ় দেশের দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ গিয়ে সব রকমের মঙ্গল হতে আরম্ভ করেছে। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মের দিন নিত্যানন্দ রাঢ়ে থেকেই হুঙ্কার করে উঠেছিলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী সেই হুঙ্কারে যেন সকলে মূর্ছা পেয়ে গেল। কেউ কেউ বলল—বজ্রপাত হয়েছে। কেউ কেউ এটা কোন বিপদের সঙ্কেত মনে করল। আবার

কেউ বললেন—এ হচ্ছে মৌড়েশ্বর শিবের গর্জন। নানা লোক নানা কথা বলছে কিন্তু সাধারণ লোক নিত্যানন্দের পরিচয় জানতে পারল না। নিত্যানন্দ স্বরূপ গোপন করে শিশুগণের সঙ্গে খেলা করছেন। খেলার মধ্যেও কৃষ্ণলীলাই প্রকাশ পাচ্ছে। শিশুরা দেবসভা করেছে, সেখানে পৃথিবী সেজে একজন তার দুঃখ জানাচ্ছে। সকলে মিলে নদীর ধারে গিয়ে চীৎকার করে স্তবস্তুতি করতে লাগল। কোন শিশু লুকিয়ে থেকে বলে ওঠে—আমি মথুরা-গোকুল গিয়ে জন্মগ্রহণ করব। আবার কোন দিন নিত্যানন্দ ছেলেদের নিয়ে বসুদেব ও দেবকীর বিয়ের অভিনয় করেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে যেন রাত্রিতে কৃষ্ণের জন্ম হল—এসব খেলাও হয়। গোকুল তৈরি করে সেখানে কৃষ্ণকে নিয়ে আসা হয়। মহামায়া তখন কংসকে প্রতারণা করলেন। একটি শিশুকে আবার পুতনা সাজানো হয়। আরেকটি শিশু তার বুকে উঠে স্তন পান করে। কোনদিন আবার পাট কাঠি দিয়ে গাড়ি তৈরি করে তা ভেঙ্গে ফেলেন। কাছাকাছি গোয়ালাদের ঘরে গিয়ে ছেলেদের নিয়ে চুরি করেন। ছেলের দল নিত্যানন্দকে ছেড়ে যেতে চায় না। এভাবে তাঁর দল বেড়েই চলেছে। ছেলেদের বাবা-মায়েরা এতে আপত্তি করেন না, বরং নিত্যানন্দকে তাঁরা কোলে নিয়ে আদর করেন। সকলেই বলাবলি করে যে—এমন খেলা তো কখনো তাঁরা দেখেন নি, ছেলেমানুষ এত কৃষ্ণলীলা জানল কি করে? কোন দিন ছেলেরা পাতা দিয়ে সাপ তৈরি করে জলে ভাসিয়ে দেয়। জলে ঝাঁপ দিয়ে ছেলেরা অচৈতন্য হয়ে পড়ে, তখন নিত্যানন্দ এসে তাদের সুস্থ করে তোলেন। আবার একদিন তাল বনে গিয়ে ধেনুকাসুরকে বধ করে তাল খায়। ছেলেরা এক সঙ্গে মিলে বনের ধারে গিয়ে বক, অঘ, বৎসক অসুরদের হত্যা করে। বিকেলের দিকে সকলে মিলে শিঙ্গা বাজাতে বাজাতে ঘরে ফেরে।

কোন দিন বৃন্দাবন তৈরি করে গোবর্ধন ধারণ লীলার মত করে খেলা করে। আবার কোন দিন গোপীগণের বস্ত্রহরণ এবং ব্রাহ্মণপত্নীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার খেলা করে। একটি ছেলে আবার দাড়ি লাগিয়ে নারদমুনি সাজে এবং গোপনে গিয়ে কংসকে উপদেশ দান করে। এক দিন আবার অক্রূর সেজে কৃষ্ণ-বলরামকে কংসের আদেশে তার কাছে ধরে নিয়ে যায়। এই অবস্থায় নিত্যানন্দ নিজেই গোপীভাবে কাঁদতে থাকেন, সঙ্গীরা তা দেখে কিন্তু বিষ্ণুমায়াতে আবৃত অন্যান্য সাধারণ লোকেরা তা দেখতে পায় না। তারা দেখে নিত্যানন্দের সঙ্গে ছেলেরা খেলা করছে মাত্র। মথুরাপুরী তৈরি করে নিত্যানন্দ ছেলেদের সঙ্গে আনন্দে ঘুরে বেড়ান, সঙ্গীরা কেউ মালী হয়, কেউ মালা পরে। কুব্জার অভিনয় করে কোন এক জন কৃষ্ণ-বলরামের গায়ে সুগন্ধি অনুলেপন দান করেন, তারপর তারা কংসের ধনুর্যজ্ঞের স্থানে গিয়ে মহা শব্দ করে ধনুক ভেঙ্গে ফেলেন। কুবলয়, চামূর, মুষ্টিক—এদের হত্যা করা হয়। একজনকে কংস সাজিয়ে তাকে চুল ধরে ঘুরিয়ে মেরে ফেলে তারা নাচতে থাকে। লোকেরা ছেলেদের খেলা দেখে মজা পায়। এইভাবে সব অবতার-লীলা অনুকরণ করে ছেলেরা খেলা করে। কখনো নিত্যানন্দ বামন সেজে বলিরাজাকে ছলনা করে সমস্ত পৃথিবী দান গ্রহণ করেন। একটি ছেলে বৃদ্ধ সেজে শুক্রাচার্য হয়ে তাকে বারণ করে। ভিক্ষা গ্রহণ করে নিত্যানন্দ বলিরাজা রূপী ছেলেটির মাথায় উঠে বসেন।

কোন দিন আবার নিত্যানন্দ ছেলেদের বানর সাজিয়ে সেতুবন্ধ খেলা করেন। ভেরেণ্ডা গাছ কেটে জলে ফেলা হয় আর ছেলেরা 'জয় রঘুনাথ' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। নিত্যানন্দ

আবার লক্ষ্মণ সেজে ধনুর্বান নিয়ে রেগে গিয়ে সুগ্রীবের কাছে চললেন। গিয়ে বললেন—আরে বানর, আমার প্রভু দুঃখ পাচ্ছেন, তাড়াতাড়ি আমার কাছে আয়, তা না হলে প্রাণে মারব। সুবেল পর্বতে রামচন্দ্র মনের দুঃখে রয়েছেন আর তুই এখানে মেয়েদের নিয়ে উল্লাস করছিস্! কোনদিন রাগ করে পরশুরামকে বলেন—ব্রাহ্মণ, আমার কোন দোষ নেই, তুমি শীঘ্র পালিয়ে যাও। প্রভু লক্ষ্মণের ভাব নিয়ে এসব কথা বলেন, ছেলেরা তা ধরতে পারে না। এরপর আবার ছেলেরা পাঁচটি বানরের অভিনয় করে এবং নিত্যানন্দ লক্ষ্মণ হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করেন—আমি শ্রীরামচন্দ্রের সেবক, তোরা কারা আমাকে বল। তারা তখন উত্তর করে—আমরা বালির ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। শ্রীরামকে দেখাও, তাঁর পদধূলি নেব। তাদের সকলকে তুলে নিয়ে এসে শ্রীরামের চরণে দণ্ডবৎ জানায়। কোন দিন তিনি লক্ষ্মণের অভিনয় করে হার মানেন, কোন দিন ইন্দ্রজিৎ বধ পালা অনুষ্ঠিত হয়। আবার বিভীষণকে কোন দিন রামচন্দ্র লঙ্কার সিংহাসনে অভিষেক করে বসিযে দেন। কোন ছেলে আবার বলে—আমি রাবণ এসেছি, লক্ষ্মণ তুমি ঠেকাও দেখি, আমি তোমাকে শক্তিশেল বাণ ছুঁড়ছি। এই কথা বলে একটি পদ্মফুল ছুঁড়ে মারলে প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে ঢলে পড়লেন। ছেলেরা মূর্ছিত লক্ষ্মণকে জাগাতে চাইলেও তিনি জাগছেন না। তিনি মরার মত পড়ে আছেন, ছেলেরা ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল। শুনে মা-বাবা সকলে ছুটে এলেন, দেখেন পুত্র মৃতের মত পড়ে রয়েছে। তা দেখে পিতা-মাতা দুজনেই শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। লোকেরা তা দেখে বিস্ময় মানল। ছেলেরা সব বৃত্তান্ত খুলে বলল। একজন বললে—আমি জানি, এরকম হয়। একজন দশরথ সেজে অভিনয় করতে গিয়ে রামবনবাসের সংবাদে মারা গিয়েছিল। অন্য একজন বললে—ছেলেতো অভিনয় করছে, তাই হনুমান ওষুধ এনে দিলে তবে ভাল হয়ে উঠবে। নিত্যানন্দ আগেই ছেলেদের বলে রেখেছিলেন যে তিনি পড়ে গেলে যেন সকলে তাঁকে নিয়ে কাঁদে। একটু পরে হনুমানকে পাঠিযে ওযুধ আনিয়ে নাকে দিলে তিনি বেঁচে উঠবেন। প্রভু নিজভাবে অচেতন হয়ে পড়াতে ছেলেরা অস্থির হযে পড়ল। প্রভু যে তাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন তা এরা ভুলে গিয়েছে। ওঠ ভাই বলে তারা চীৎকার করে কাঁদতে লেগেছে। লোকেদের কথায় তাদের মনে পড়ল। যে ছেলেটি হনুমান সেজেছিল সে তখন দৌড়ে ছুটল। আর একটি ছেলে মুনি হয়ে পথে ফল মূল দিয়ে হনুমানকে আপ্যায়ন করছে। মুনি বলছে—বড ভাগ্যে তোমার দর্শন পাওয়া যায়। তুমি আমার আশ্রমে এক দিন থাক। হনুমান বললে—বিশেষ কাজে যাচ্ছি, শীঘ্র ফিরে যেতে হবে। দেরি করা চলবে না। শুনেছ বোধ হয় রামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণকে রাবণ শক্তিশেল মেরে মূর্ছিত করে ফেলেছে। তাই আমি গন্ধমাদন আনতে যাচ্ছি, ওষুধ দিলে লক্ষ্মণ বেঁচে উঠবেন। মুনি বলছে—যদি যাবেই ঠিক করে থাক তবে চান করে কিছু খেয়ে নাও। নিত্যানন্দ যেমন শিখিযে দিয়েছিলেন ছেলেরা সেভাবেই অভিনয করছে। লোকেরা বিস্মিত হয়ে তা দেখছে। তপস্বীর কথায় সে চান করতে গেল। জলে থেকে আর একটি ছেলে তার পা টেনে ধরল। কুমীরের অভিনয় করে সে পা ধরে টেনে নিয়ে যায়। হনুমান তাকে কূলে টেনে নিয়ে এল। যুদ্ধে জিতে এসে বীর হনুমান দেখল, আর একটি ছেলে রাক্ষসের সাজে সেজে তাকে খেতে চায়। রাক্ষস বললে—কুমীরকে হারিয়েছ যুদ্ধে, আমাকে কি করে হারাবে? তোমাকেই আমি খেয়ে ফেলব, লক্ষ্মণকে তবে আর কি বাঁচাবে? হনুমান বললেন—তোর রাবণ তো একটা অপদার্থ, আমি তাকে কুকুর বলে মনে করি। তুই আমার সামনে

থেকে সরে যা। এই বলে দুজনে গালাগালি, চুলোচুলি এবং শেষে মারামারি হতে থাকল। এভাবে রাক্ষসকে যুদ্ধে পরাজিত করে হনুমান গন্ধমাদনে গিয়ে প্রবেশ করলেন। গন্ধমাদন পর্বতে গন্ধর্বদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হল। গন্ধর্বগণকে যুদ্ধে পরাজিত করে হনুমান গন্ধমাদন পর্বতটাকে তুলে নিয়ে চলে এলেন। আর একটি ছেলে বৈদ্যরূপে শ্রীরামকে স্মরণ করে লক্ষ্মণের নাকে ওষুধ দিয়ে দিলেন। তখন নিত্যানন্দ-প্রভু উঠলেন এবং তা দেখে মাতা-পিতা সকলের মুখে হাসি ফুটল। হাড়াই পণ্ডিত গিয়ে ছেলেকে কোলে নিলেন, সব ছেলেরা তখন বেশ খুশি। লোকেরা বললেন—বাছা, এসব কোথায় শিখলে? প্রভু হেসে উত্তর দিলেন—এসব আমার খেলা। প্রভুর কচি বয়স, অতি সুন্দর রূপ, সকলেই তাঁকে আদর করে কোলে নেন। নিজের সন্তানের চেয়েও তাঁকেই সকলে ভালবাসেন কিন্তু বিষ্ণুমায়াবশে কেউ তাঁর মূল পরিচয় জানতে পারেন না। নিত্যানন্দ ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণলীলা ছাড়া অন্য কিছু খেলা করেন নি। পাড়া-প্রতিবেশী ছেলেরাও ঘর-বাড়ি বাবা-মা ছেড়ে সব সময় নিত্যানন্দের সঙ্গেই থাকতেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে যাঁরা খেলতেন তাঁদের চরণে নমস্কার জানাই। নিত্যানন্দ শিশুকাল থেকেই কৃষ্ণলীলা ছাড়া অন্য খেলায় আনন্দ পান না। অনন্তের লীলা কে বলতে পারে? তাঁর কৃপায় যার যেমন ক্ষমতা সেভাবেই প্রকাশিত হচ্ছে।

এভাবে বারো বৎসর বাড়িতে থেকে তিনি তীর্থ করতে চললেন। কুড়ি বৎসর যাবৎ তীর্থভ্রমণ করে তবে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। আদিখণ্ডে নিত্যানন্দের তীর্থযাত্রা বর্ণনা করা হল। দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাষণ্ডেরা নিত্যানন্দকে নিন্দা করতে ছাড়ে না। প্রভুর শরীরে করুণা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি সমস্ত জগৎ উদ্ধার করলেন। নিত্যানন্দের কৃপা হলেই চৈতন্যতত্ত্ব জানা যায়। নিত্যানন্দ-প্রভুর দ্বারাই শ্রীচৈতন্যের মহত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ কাহিনী শোনানো হচ্ছে। তিনি প্রথমে বক্রেশ্বরে গেলেন, তারপর একা একাই বৈদ্যনাথধামে চলে গেলেন। গয়া হয়ে পরে শিবস্থান কাশীতে গেলেন, গঙ্গা সেখানে উত্তরবাহিনী। গঙ্গা দেখে খুশি হয়ে নিত্যানন্দ চান করলেন, গঙ্গাজল পান করলেন, তবু যেন তৃষ্ণা মিটছে না। মাঘ মাসে প্রয়াগে চান করে তবে দ্বাপর যুগের জন্মস্থান মথুরায় গেলেন। যমুনার বিশ্রামঘাটে জলকেলি করে আনন্দিত মনে গোবর্ধন পর্বতে গেলেন। শ্রীবৃন্দাবন-আদি দ্বাদশ বন প্রভু একে একে সবই ঘুরে ঘুরে দেখলেন। গোকুলে নন্দ মহারাজের ঘরসংসারের কথা ভেবে প্রভু বিস্তর কাঁদলেন। মদনগোপালকে প্রণাম জানিয়ে তারপরে পাণ্ডবদের রাজধানী হস্তিনাপুরে গেলেন। ভক্ত পাণ্ডবগণের জায়গা দেখে প্রভু কাঁদছেন কিন্তু ভক্তিহীন তীর্থযাত্রীরা তার কিছুই ধরতে পারল না। হস্তিনাপুরে বলরামের কীর্তি দেখে 'বলরাম, রক্ষা কর' বলে তিনি নমস্কার জানালেন। তারপর দ্বারকায় এসে আনন্দ করে সমুদ্রে চান করলেন। সেখান থেকে সিদ্ধপুরে গিয়ে মৎস্যতীর্থে অন্নদান উৎসব করলেন। শিবকাঞ্চি এবং বিষ্ণুকাঞ্চি দুই তীর্থেই নিত্যানন্দ গিয়েছিলেন। শৈব ও বৈষ্ণবগণের বিবাদ দেখে প্রভু মনে মনে হাসেন। তারপর প্রভু কুরুক্ষেত্র, পৃথুদক, বিন্দুসরোবর, প্রভাস, সুদর্শনতীর্থ, ত্রিতকূপ, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রতিস্রোতা, প্রাচীসরস্বতী, নৈমিষারণ্য ইত্যাদি তীর্থস্থান পর্যটন করে অযোধ্যায় গিয়ে রামজন্মভূমি দেখে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁদলেন। এরপর গুহক চণ্ডালের রাজ্য চূণারে গিয়ে নিত্যানন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। গুহক চণ্ডালের কথা স্মরণ করে তিন দিন তিনি আনন্দে অচেতন ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যে যে বনে

গিয়েছিলেন নিত্যানন্দও সে সকল স্থানে গেলেন এবং তাঁব কথা মনে কবে ভূমিতে গড়াগড়ি দিলেন। তাব পব সবযূ ও কুশী নদীতে চান কবে হবিক্ষেত্র পুলহ-আশ্রমে শালগ্রামে গেলেন। সেখান থেকে গোমতী, গণ্ডকী ও শোন নদীতে গিয়ে চান কবে পূর্বঘাটেব মহেন্দ্রপর্বতেব চূড়া দর্শন কবলেন। সেখানে পবশুবামকে প্রণাম জানিয়ে গঙ্গাজন্মভূমি হবিদ্বাবে গেলেন। পম্পা, ভীমা, সপ্তগোদাববী, বেন্বাতীর্থ ও পাঞ্জাবেব বিপাশা নদীতে চান কবে কার্ত্তিক বিগ্রহ দেখে শ্রীপর্বতে মহেশ-পার্বতীকে দর্শন কবলেন। এখানে শিবদুর্গা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী রূপে বাস কবেন। তাঁবা ইষ্টদেবকে দেখে চিনতে পাবলেন। তিনি অবধূত রূপে তীর্থ পর্যটন কবে বেড়ালেও দেবী খুশি হযে বান্না কবলেন এবং দুজনেই অতিথিকে দেখে সন্তুষ্ট হযে পবম সমাদবে ভোজন কবালেন। নিত্যানন্দও দুজনকে নমস্কাব জানালেন। মনেব কথা শ্রীকৃষ্ণই জানেন।

তিনি সেখান থেকে দাক্ষিণাত্যে চললেন। বেঙ্কটাচল, মাদুবা, কাঞ্চিভবম্, সবিদ্বাবা, কাবেবী হযে শ্রীবঙ্গনাথ গিযে পবে হবিক্ষেত্রে গমন কবলেন। ঋষভ পর্বত, দক্ষিণ মথুবা, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, যমুনা-উত্তব হযে মলয পর্বতে অগস্ত্য আশ্রমে গেলেন নিত্যানন্দ। স্থানীয লোকেবা তাঁকে পেযে খুশি হযেছিলেন। এদিকে বহু লোকেব আতিথ্য গ্রহণ কবে পবে তিনি বদবিকাশ্রমে গেলেন। এখানে নবনাবাযণেব আশ্রমে নিত্যানন্দ কিছুদিন নির্জনে কাটিযে দিলেন। তাবপব তিনি ব্যাসদেবেব আশ্রমে গেলেন, ব্যাসদেব বলবামকে চিনতে পাবলেন। দেখা পেযে ব্যাসদেব তাঁকে আপ্যাযন কবলেন, তিনিও ব্যাসদেবকে প্রণাম নিবেদন কবলেন। এবপব নিত্যানন্দ বৌদ্ধমঠে গিযেছিলেন। অনেক বৌদ্ধ সেখানে বসে আছেন। প্রভু জিজ্ঞাসা কবলেও তাবা কোন কথা না বলে চুপ কবে ছিল। উত্তব না পেযে তিনি সেখান থেকে বাগ কবে চলে এলেন। বৌদ্ধগণ সেখান থেকে চলে গেলে নিত্যানন্দ নির্ভযে বনে বনে ভ্রমণ কবলেন।

সেখান থেকে তিনি আবাব কন্যাকুমাবী চলে এলেন। দক্ষিণসাগবে দুর্গাদেবীকে দর্শন কবলেন। শ্রীঅনন্তপুব, পঞ্চ অপ্সবা-সবোবব, গোকর্ণে শিবেব মন্দিবে গিযে স্নান কবলে ত্রিগর্তে নানা স্থানে বহু লোকেব ঘবে ঘবে ঘুবলেন। নিত্যানন্দ দ্বৈপাযনী আর্যা, নির্বিন্ধ্যা, পাযোষ্ণী, তাপ্তী, বেবা, মাহিষ্মতীপুবী, মনতীর্থ, সূর্পাবক ইত্যাদি স্থান হযে পশ্চিম দিকে গেলেন। এইভাবে তিনি নির্ভযে সাবা ভাবত ঘুবতে লাগলেন। সবদা কৃষ্ণ-আবেশে তাঁব শবীব অবশ, তিনি কখন কাঁদেন কখন হাসেন, তাঁব মনেব কথা কে বুঝতে পাবে?

এভাবে ঘবতে ঘুবতে প্রভুব সঙ্গে শ্রীমৎমাধবেন্দ্র পুবীব দেখা হযে গেল। মাধবেন্দ্রেব প্রেমেব শবীব, তাঁব সঙ্গী শিষ্যগণও ছিলেন প্রেমময। কৃষ্ণলীলা আস্বাদন ভিন্ন তিনি অন্য কিছু আহাব কবেন না, শ্রীকৃষ্ণ তাঁব দেহে সবদা বিহাব কবছেন। অদ্বৈতাচার্য এঁব শিষ্য, কাজেই তাঁব প্রেমেব কথা আব বেশি কবে বলাব কি আছে? মাধবেন্দ্র পুবীকে দেখেই নিত্যানন্দ প্রেমে মূর্ছিত হলেন। মাধবেন্দ্রও নিত্যানন্দকে দেখেই মূর্ছিত হযেছেন। শ্রীগৌবাঙ্গই বলেছেন যে মাধবেন্দ্র পুবীই হচ্ছেন ভক্তিবসেব আদি সূত্রধাব। দুজন দুজনকে দেখে মূর্ছিত হযে পড়েছেন, ঈশ্বব পুবী এবং অন্যান্য শিষ্যগণ তা দেখে কাঁদছেন। জ্ঞান হতেই দুজন দুজনকে ধবে কোলাকুলি কবতে লাগলেন। দুই প্রভু বনেব ধাবেই পড়ে প্রেমবসে গড়াগড়ি কবছেন আব কৃষ্ণপ্রেমেব আবেশে হুঙ্কাব দিযে উঠছেন। দুই প্রভুব চোখ দিযে প্রেমনদী বযে চলেছে, পৃথিবী তাতে ভিজে গিযে নিজেকে ধন্য

মনে করছে। কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অন্ত নেই। দুই দেহেই শ্রীচৈতন্য বিরাজ করছেন। নিত্যানন্দ বললেন—সমস্ত তীর্থ করার ফল আজ পেলাম। শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রের শ্রীচরণ দর্শন করে প্রেমের স্পর্শে জীবন ধন্য হল। নিত্যানন্দকে কোলে নিয়ে মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেমজলে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, মুখে আর কোন কথা বেরুচ্ছে না। তিনি এমনই আনন্দ পেলেন যে নিত্যানন্দকে আর কোল থেকে নামাতে চান না। ঈশ্বরপুরী, ব্রহ্মানন্দ পুরী প্রমুখ সকল শিষ্যগণ নিত্যানন্দের আপ্যায়নে রত হলেন। যত সাধু মহাজন সে অঞ্চলে ছিলেন তাঁদের কারোই কৃষ্ণ প্রেম ছিল না। তাই সকলেই শুধু বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। এখন দুজন দুজনকে দেখে উভয়েরই কৃষ্ণপ্রেমের যেন জোয়ার এসে গেল। তাই নিত্যানন্দ কিছুদিন মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে থেকে পরম আনন্দে কৃষ্ণকথা আলাপ করতে থাকেন। মাধবেন্দ্রের অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার যে তিনি মেঘ দেখলেই অচেতন হয়ে পড়তেন। মাতালের মত তিনি সারা দিনরাত কৃষ্ণপ্রেমে হেসে কেঁদে হৈ হৈ করে কাটান। নিত্যানন্দ গোবিন্দ প্রেমে মহামত্ত, ঢুলে ঢুলে পড়ছেন আর অট্টহাস্য করছেন। দুজনের এরকম অদ্ভুত ভাব দেখে শিষ্যগণ সর্বদা হরিধ্বনি দিয়ে কেবল কীর্তন করছেন। সকলেই প্রেমরসে মত্ত। কোথা দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে, কেউ টেরও পাচ্ছেন না। মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দের যে কী সব কথাবার্তা হল তা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই জানেন। মাধবেন্দ্র যেন নিত্যানন্দকে কিছুতেই ছাড়তে পারছেন না, সব সময় দুজন এক সঙ্গে কাটাচ্ছেন। শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র বললেন—এমন প্রেম আর কোথাও দেখিনি। যাঁর এমন প্রেম আছে তিনি সমস্ত তীর্থ-স্বরূপ। বুঝতে পারলাম যে আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা আছে তাই নিত্যানন্দের মত বান্ধবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। নিত্যানন্দেব সঙ্গে যেখানেই দেখা হোক সে স্থানই বৈকুণ্ঠাদি সর্বতীর্থময়। নিত্যানন্দের কথা শুনলেও শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। নিত্যানন্দের প্রতি যার বিদ্বেষ সে ভক্ত হলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হতে পারে না। এইভাবে শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র সর্বদা নিত্যানন্দের গুণকীর্তন কবে চলেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ অবশ্য মাধবেন্দ্রকে গুরু বলেই মান্য করেন। এই ভাবে দুই মহাত্মা কৃষ্ণ প্রেমে আপ্লুত আছেন, কোথা দিয়ে যে রাত-দিন কেটে গেল তা তাঁবা টেরও পেলেন না। নিত্যানন্দ কিছুদিন মাধবেন্দ্রের সঙ্গে কাটিয়ে সেতুবন্ধের দিকে চললেন। মাধবেন্দ্র চললেন সরযূ নদী দেখতে, কৃষ্ণভাবে তাঁরা নিজেদের দেহের কথাও ভুলে গেছেন। তাঁদের দেহবোধ ছিল না বলেই পরস্পরের বিরহ সহ্য করতে পেরেছিলেন। নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র মিলন ও দর্শনের কথা শুনলেও কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করা যায়। এইভাবে প্রেমানন্দে ভ্রমণ করতে করতে নিত্যানন্দ কিছুদিনের মধ্যেই সেতুবন্ধে পৌঁছে গেলেন। ধনুতীর্থে স্নান করে তিনি রামেশ্বর গেলেন তারপর বিজয়ানগরে এলেন। মায়াপুরী, অবন্তী, গোদাবরী দেখে তিনি জিওড়-নৃসিংহপুরীতে এলেন। তিরুমল, কূর্মক্ষেত্র দেখে তিনি শ্রীজগন্নাথ দর্শন মানসে পুরীধামে আসছেন। পথেই মন্দিরের ধ্বজা দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মন্দিরে এসে দেখলেন চতুর্ব্যূহরূপ জগন্নাথ ভক্ত পরিবারগণ সহ প্রকট হয়েছেন। দেখেই আনন্দে আবার মূর্ছিত হলেন। শরীরে কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড, হুঙ্কার নানাবিধ ভক্তিবিকার দেখা দিল। কিছুদিন নীলাচলে থেকে তারপর তিনি গঙ্গাসাগরে চলে এলেন। নিত্যানন্দের তীর্থযাত্রা কাহিনী সব বলা অসম্ভব। তাঁর কৃপাতে কিছু কিছু মাত্র লেখা গেল।

এইভাবে নানা তীর্থ ভ্রমণ করে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আবার মথুরায় এসে উপস্থিত হলেন।

বৃন্দাবনে বাস করছেন, কৃষ্ণের আবেশে আছেন, দিন বাত কখন আসছে কখন যাচ্ছে কিছুই হুঁশ নেই। খাওযাব দিকেও নজব নেই। কেউ সেধে দিলে একটু দুধ খান—এই মাত্র। নবদ্বীপে শ্রীগৌবচন্দ্র গুপ্তভাবে আছেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মনে মনে ভাবলেন—প্রভু যখন আপন ঐশ্বর্য প্রকাশ কববেন তখনই আমি গিযে তাঁব সেবাব কাজে যোগ দেব।—এই কথা ভেবেই তিনি নবদ্বীপে না গিযে মথুবায থেকে গেলেন। কালিন্দীব জলে জলক্রীডা কবেন আব ছেলেদেব সঙ্গে বৃন্দাবনে খেলাধূলা কবেন। যদিও নিত্যানন্দ সমস্ত শক্তি ধাবণ কবেন তথাপি কাউকে কিন্তু বিষ্ণুভক্তি প্রদান কবলেন না। যখন প্রভু-গৌবচন্দ্র প্রকাশ কববেন কেবল তখনই তিনি তাঁব আজ্ঞায ভক্তি দানেব লীলা কববেন। শ্রীচৈতন্যেব আজ্ঞা ছাডা কেউ কিছু কবছেন না, তাতে পবিকবভুক্ত ভক্তগণেব হেযতা প্রতিপন্ন হয না। অনন্তদেব, মহাদেব, ব্রহ্মা—এঁবা সকলেই শ্রীচৈতন্যেব আজ্ঞায হর্তা-কর্তা-পালযিতা। এই তত্ত্ব জেনে যাব মনে দুঃখ হবে, বৈষ্ণবগণ তাব সঙ্গে কোন সম্পর্ক বাখবেন না। সকলেই চোখেব সামনে দেখতে পেলেন যে শ্রীপাদ নিত্যানন্দেব কাছ থেকেই প্রেমধন পাওযা গেল। নিত্যানন্দই শ্রীচৈতন্যেব প্রথম ভক্ত, তাঁব মুখে সর্বদা চৈতন্য-গুণকীর্তন। সর্বদা তিনি চৈতন্যকথা বলছেন, তাঁকে ভজনা কবলেই চৈতন্যভক্তি লাভ কবা যায। নিত্যানন্দই হচ্ছেন আদিদেব, তাঁব কৃপাতেই চৈতন্যমহিমা স্ফুবিত হচ্ছে, তাই তাব নামে জযধ্বনি কবছি। চৈতন্যেব কৃপাতেই নিত্যানন্দেব প্রতি ভক্তি হয, নিত্যানন্দকে জানতে পাবলে আব কোন আপদ-বিপদেব ভয থাকে না। সংসাব সমুদ্র পাব হযে যিনি ভক্তি সাগবে ডুব দিতে চান তিনি অবশ্যই নিতাইচাঁদকে ভজনা কববেন। কেউ বলেন—নিত্যানন্দই বলবাম। আবাব কেউ বলেন—নিত্যানন্দ চৈতন্যেব বড প্রিযপাত্র। নিত্যানন্দকে কেউ বলেন যতি, কেউ বলেন জ্ঞানী। তাতে কিছু আসে যায না। চৈতন্যেব সঙ্গে নিত্যানন্দেব যাই সম্পর্ক হোক, আমি তাব পাদপদ্ম হৃদযে ধাবণ কবি। এত কবে অনুবোধ কবাব পবেও যে পাপী তাব নিন্দা কবে তাকে উপেক্ষা কবেই ত্যাগ কবা দবকাব। যদি দেখা যায কোন চৈতন্যভক্ত নিত্যানন্দেব নিন্দা কবছে তাহলে বুঝতে হবে আসলে তিনি স্তুতিই কবছেন। তবে যে নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানী বৈষ্ণবগণেব মধ্যে কলহ দেখা যায, তা কেবল মাত্র মজা কবাব জন্য। এই সব দেখে কোন সাধাবণ লোক যদি একজনেব পক্ষ নিযে আব এক জনকে নিন্দা কবে তাহলে তাব অবশ্যই অমঙ্গল হবে। গৌবাঙ্গেব প্রকৃত ভক্তেব মুখে কখনো নিত্যানন্দেব নিন্দা শোনা যায না। নিতাইচাঁদকে অনুসবণ কবেই শ্রীগৌবাঙ্গকে পাওযা যায। এমন সৌভাগ্যেব দিন কবে হবে যে গৌবনিতাইকে ভক্তবৃন্দ-পবিবেষ্টিত দেখতে পাব। নিত্যানন্দেব পবিচালনায যেন গৌবচন্দ্রকে ভজনা কবাব সৌভাগ্য হয। নিতাইচাঁদেব আশ্রযে থেকে যেন জন্মজন্মান্তবে ভাগবত বহস্য হৃদযঙ্গম কবতে পাবি। গৌবচন্দ্রেব কৃপাতেই নিতাইচাঁদকে গুরুরূপে পেযেছি আবাব তাবই লীলায গুরু দেহবক্ষাও কবেছেন। তবে এমন কৃপা কব যেন তোমাদেব দুজনেব প্রতিই আমাব মনেব টান থাকে। নিতাইচাঁদ তোমাবই ভক্ত, তুমি না দিলে তাঁকে কি কবে পাওযা যাবে? গৌবচন্দ্রেব প্রকাশ না হওযা পর্যন্ত নিত্যানন্দ বৃন্দাবনাদি নানাতীর্থ ভ্রমণ কবে বেডাচ্ছেন। নিতাইচাঁদেব তীর্থ পর্যটন কাহিনী শুনলেও প্রেমধন লাভ কবা যায।

১/৭ নিত্যানন্দপ্রিয, নিত্যকলেবব, মহামহেশ্বব গৌবচন্দ্রেব জয হোক। গম্ভীবাব দ্বাবী

গোবিন্দের কর্তা শ্রীচৈতন্যের জীবের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত হোক। বিপ্ররাজ জগন্নাথপুত্রের ভক্তবৃন্দের জয় হোক। কৃপাসিন্ধু কমললোচনের গুণকীর্তনে যেন মন থাকে, সেই কৃপা চাই।

আদিখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের বিদ্যাবিলাসের কথা বলা হচ্ছে। নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর অনবরত বিদ্যাচর্চায় নিমগ্ন আছেন। ভোরে আহ্নিকাদি করে প্রভু সহপাঠীদের সঙ্গে পড়তে যান। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে এসেই তিনি কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক-বিচার আরম্ভ করে দেন। যারা প্রভুর কথা মানেন না প্রভু তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন। প্রভু তাঁর বিষয় নিয়ে পড়ছেন, সকলেই দলবল নিয়ে একেক দিকে বসে পড়ছে। মুরারি গুপ্ত প্রভুকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। প্রভু তাঁকে ঠিক পথেই চালাচ্ছেন। প্রভু সভার মধ্যে যোগপট্ট রীতিতে কাপড় পরে বীরাসন করে বসেছেন। তাঁর কপালে চন্দনের ঊর্ধ্বতিলক। তাঁর দাঁতের জ্যোতি যেন মুক্তাকেও হার মানায়। তাঁর ষোল বছরের প্রথম যৌবন, মদনমোহন গৌর কান্তি। বৃহস্পতির চেয়েও যেন বেশি তাঁর পাণ্ডিত্য। তাঁব আনুগত্য স্বীকার না করে যে অন্য বকম ব্যাখ্যা করে তাকে তিনি পরিহাস করেন। বলেন—কে বড় পণ্ডিত আছে, দেখি এসে তার কথা প্রমাণ করুক। সন্ধি পর্যন্ত না শিখে কেউ কেউ নিজেই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। অহঙ্কার করে নিজের মূর্খতা প্রকাশ করে,যে জানে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে না। মুবারি গুপ্ত এসবের মধ্যে নেই, তিনি চুপচাপ থাকেন। তথাপি প্রভু তাঁকে চালনা কবেন। নিজের ভক্তকে পেয়ে তিনি খুব খুশি। প্রভু তাঁকে বলেন—তুমি এসব কেন পডছ ? তুমি দ্রব্যগুণে রোগীর চিকিৎসা কব। ব্যাকবণ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এতে কফ-পিত্ত-অজীর্ণের কোন ব্যবস্থা নেই। তুমি এসব শিখে কি কববে? তমি ববং রোগীকে চিকিৎসা কর, তাতেই কাজ হবে। মুবাবি হচ্ছেন রুদ্র-অংশ, কোপন-স্বভাব, তবু কিন্তু বিশ্বম্ভরকে দেখে আর রাগ করলেন না। তিনি উত্তর করলেন--তুমি এসব কথা কেন বলছ? আজ তোমার গর্ব চূর্ণ হবে। সূত্র, বৃত্তি, পাঁজী, টীকা যাই জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর দেব। আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই বলছ—'তুমি কি জান?' তুমি ব্রাহ্মণেব ছেলে, তোমাকে আর কি বলব? প্রভু তখন বললেন---আচ্ছা, আজ যা পড়েছ তাই ব্যাখ্যা কব দেখি। মুরারি গুপ্ত ব্যাখ্যা করছেন, প্রভু তা খণ্ডন করছেন। মুরারি এক অর্থ বলেন, প্রভু অন্য কথা বলছেন। প্রভু ও সেবক, কেউ কাউকে হাবাতে পারছেন না। প্রভুর আশীর্বাদে মুরারি বড় পণ্ডিত হয়েছেন, প্রভু তাই তাঁর ব্যাখ্যা শুনে খুশি হচ্ছেন। প্রভু খুশি হয়ে মুরারির গায়ে হাত দিলেন, মুবারির সমস্ত দেহ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি মনে মনে ভাবছেন—ইনি কখনো প্রাকৃত মনুষ্য নন্। এমন পাণ্ডিত্য কখনো মানুষে সম্ভবে না। তাঁর হাতের ছোঁয়াতেই আমার সমস্ত দেহ পুলকিত হয়ে গেল। এঁর কাছে কিছু চাইতেও লজ্জা নেই। এমন পণ্ডিত নবদ্বীপে নেই। মুরাবি খুশি হয়ে বলেন—তোমার কাছে কিছু চাইব। এভাবে ভক্ত ও ভগবানে মজা করছেন এবং সকলকে নিয়ে পরে গঙ্গাস্নানে চললেন। চান করে প্রভু বাড়িতে চলে গেলেন। এমনি ভাবেই বিদ্যাচর্চা করে তাঁর সময় কাটছে।

মুকুন্দ-সঞ্জয়কে বড়ই ভাগ্যবান বলতে হয় কারণ তাঁদেরই নাটমন্দিরে প্রভুব চতুষ্পাঠী চলছে। প্রভু তাঁর ছেলেকে পড়াচ্ছেন। ছেলেরও প্রভুর প্রতি খুব ভক্তি। তাঁদের বড় চণ্ডীমণ্ডপ, সেখানে অনেক ছাত্রের বসবারও সুবিধে হয়। সেখানেই তিনি দলে দলে ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। সেখানেই তাঁর চতুষ্পাঠী। বিভিন্ন পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনায় প্রভু

কিছু কিছু ব্যাখ্যা করেন, অনেক আবার খণ্ডন করেন। কারো প্রতি তিরস্কার বচনও নিক্ষেপ করেন। প্রভু বলেন—সন্ধি-সমাস না জেনেও কলিকালে ভট্টাচার্য পদবী ব্যবহার করছে অনেকে। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে আমি বুঝব যে তাঁদের ভট্ট বা মিশ্র পদবী সার্থক। এইভাবে বৈকুণ্ঠ-নায়ক বিদ্যারসে ক্রীড়া করছেন, ভক্তরা তাঁকে এখনো সঠিক চিনতে পারছেন না।

পুত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে দেখে মাতা তার বিয়ের কথা ভাবছেন। রাজা জনকের তুল্য জ্ঞানী একজন সুব্রাহ্মণ নবদ্বীপে ছিলেন, তাঁর নাম বল্লভাচার্য। তাঁর একটি কন্যা আছে যেন স্বয়ং লক্ষ্মী। বল্লভাচার্য তাঁকে পাত্রস্থ করার কথা ভাবছেন। লক্ষ্মী একদিন গঙ্গাস্নানে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে গৌরচন্দ্রকে দেখতে পেলেন। গৌরচন্দ্র নিজশক্তিকে দেখে চিনতে পেরে হাসলেন, লক্ষ্মী মনে মনে তাঁর পদবন্দনা করলেন। এভাবে দুজনে দুজনকে চিনতে পেরে যে যার ঘরে চলে গেলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাখেলা কে বুঝতে পারে? বনমালী আচার্য সেদিন শচীদেবীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। শচীমাতা যত্ন করে বসতে দিলে তিনি বললেন—পুত্রের বিয়ের কথা কিছু ভাবছেন কি? নবদ্বীপেরই বল্লভাচার্য কুলে-শীলে-সদাচারে সুখ্যাত। যদি মত দেন তাহলে তাঁর মেয়ের জন্য দেখতে পারি। মেয়েটি রূপে গুণে ব্যবহারে লক্ষ্মীতুল্য। শচীদেবী বললেন—আমার ছেলে ছোট, পিতৃহীন। বেঁচে থাকুক, বড় হোক, তারপর সব কথা। শচীমাতার মত না পেয়ে ব্রাহ্মণ দুঃখিত মনে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ ফিরবার পথে গৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁব দেখা হলে প্রভু মজা করে তার সঙ্গে আলিঙ্গন করে বললেন—কোথায় গিযেছিলেন? বিপ্র বললেন—তোমার বিয়েব প্রস্তাব নিয়ে তোমার মায়ের কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। এই কথা শুনে প্রভু একটু চুপ করে থেকে তারপর হেসে তাঁর সঙ্গে কথা বলে বাড়িতে এলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বনমালী আচার্যকে সমাদব করলে না কেন? পুত্রের মনোভাব বুঝতে পেবে শচীমাতা আর একদিন ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে বললেন—তুমি যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলে তা তাড়াতাড়ি দেখ। কথামাত্র ব্রাহ্মণ শচীদেবীকে প্রণাম করে বল্লভাচার্যেব বাড়িতে চলে গেলেন। বল্লভাচার্য তাঁকে দেখে সম্মান জানিয়ে বসতে দিলেন। বনমালী বললেন—পুরন্দর মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভব পরম পণ্ডিত, [illegible] গুণবান। তোমার মেয়ের উপযুক্ত পাত্র। আমার মনে হয তোমাবও পছন্দ হবে। তাহলে দিন ঠিক করে ফেল। শুনে বল্লভাচার্য আনন্দ করে বললেন—ভাগ্য ভাল হলেই আমার মেয়ের এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি খুশি হন অথবা লক্ষ্মীদেবী যদি আমার মেযের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তবেই এমন জামাই মিলতে পারে। তুমি শীগগিব গিয়ে কথা পাকা করে ফেল। আবো একটা কথা, আমি তো গরীব, আমি তো কিছু দিতে পারব না। আমি মাত্র পাঁচটি হরতুকি দিয়ে কন্যা দান করে দেব, তুমি এই আস্তা নিয়ে আসবে তাঁদের কাছ থেকে। বল্লভাচার্যের কথা শুনে বনমালী শচীমাতার কাছে সব জানিয়ে বললেন—সবাই রাজি আছে। এবারে শুভক্ষণে কাজ শুরু করে দাও। আত্মীয় স্বজনেরা সকলেই একথা শুনে খুশি হয়ে কাজের আযোজন আরম্ভ করে দিলেন।

অধিবাস আরম্ভ হল। নট্টরা নাচ গান করছে, ব্রাহ্মণদের বেদধ্বনি হচ্ছে, মাঝখানে চাঁদের মত শোভা পাচ্ছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁকে গন্ধমাল্যাদি দিয়ে আত্মীয় ব্রাহ্মণেরা অধিবাস করলেন। ব্রাহ্মণগণকে সাদরে গন্ধ চন্দন তাম্বুল দিয়ে আপ্যায়ন করা হল। বল্লভ আচার্য এসে নিয়ম মত অধিবাস কবিয়ে গেলেন। প্রভু ভোরে উঠে স্নান সেরে পূর্বপুরুষের

পূজাদি করলেন। চারদিকে নাচ গান বাজনার মঙ্গলধ্বনি আর কেবল 'দিয়তাং ভোজ্যতাং' রব। এয়ো নারীগণ, ব্রাহ্মণ-সজ্জন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব অনেকে এসেছেন। শচীমাতা এয়োগণকে খই কলা সিঁদুর পান তেল দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। স্বর্গের দেবদেবীরা মনুষ্যরূপ ধরে আনন্দ করে প্রভুর বিবাহ দেখলেন। বল্লভ আচার্যও বিধিমতে পিতৃকার্য দেবকার্য সমাধা করলেন। প্রভু ঠিক গোধূলিতে যাত্রা করে বল্লভাচার্যের বাড়িতে এলেন। বরযাত্রীরা এসে গেলে বাড়িতে আনন্দ ধ্বনি উঠল। যত্ন করে আসন দিয়ে জামাতাকে বরণ করা হল। তারপর সর্ব অলঙ্কারে সাজিয়ে লক্ষ্মী মেয়েকে প্রভুর সামনে আনা হল। সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করে প্রভুকে উপরে ধরে তুললেন, লক্ষ্মী তাঁকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং হাত জোড় করে প্রণাম করে থাকলেন। তারপর ফুল, ফুলের মালা ছোঁড়াছুঁড়ি হতে লাগল। লক্ষ্মী নারায়ণ দুজনেই তখন মহা খুশি। লক্ষ্মী প্রভুর চরণে মালা দিয়ে আত্মসমর্পণ করে প্রণাম করলেন। চারদিকে কেবল মহা আনন্দের জয় জয় ধ্বনি, আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। এভাবে মুখচন্দ্রিকা করে প্রভু লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বাম পাশে নিয়ে বসলেন। প্রথম যৌবনে প্রভু মদনকে জয় করে বসে আছেন। আজ বল্লভাচার্যের ঘরে যে কী আনন্দ তরঙ্গ বইছে তা কে বর্ণনা কবতে পারে? রুক্মিণীদেবীর পিতা ভীষ্মকের মত বল্লভাচার্য কন্যাদান করতে বসে গেলেন। শঙ্কর-ব্রহ্মা যে চরণে পাদ্য অর্ঘ দিয়ে জগতকে জয় করতে পেরেছেন সেই পাদপদ্মে আজ বল্লভাচার্য বস্ত্র-মাল্য-চন্দন দিয়ে সাজিয়ে কন্যা দান করে আনন্দে মগ্ন হলেন। এয়োগণ সমস্ত রকমের কুলাচার করলেন।

রাত শেষ হলে পরদিন মহাপ্রভু লক্ষ্মীকে নিযে বাড়িতে চলে এলেন। দোলায় চড়ে তাঁরা এসেছেন, তাঁদের দেখবার জন্য পাড়ার লোকেরা ভীড করেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ দুজনকেই কাজল, গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, মুকুট, চন্দন ইত্যাদি দিয়ে সাজান হয়েছে। দেখে সকলেই 'ধন্য ধন্য' বলছে। বিশেষ করে মহিলারা বিস্ময়ে বিহ্বল হযে পড়েছেন। এমন স্বামী লাভ করা কম ভাগ্যের কথা নয। এই মেয়েটি কতকাল হরগৌরীব পূজা করেছে কে জানে? কেউ বলে—এঁরাই হরগৌবীর মত। কেউ বলছে—যেন শচী আব ইন্দ্র। আবার কেউ বলছে—ঠিক যেন লক্ষ্মীনারাযণ। কোন কোন মহিলা বলছেন—একেবারে যেন রামসীতা দোলায শোভা পাচ্ছে। এই ভাবে মেযেরা কত কথা বলছে। সকলেই আনন্দে দেখছে যেন তাঁরা লক্ষ্মীনারায়ণ। প্রভু সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে আসতেই নাচ গান বাজনায় অঙ্গন ভরে গেল। শচীদেবী আনন্দিত মনে বিপ্রপত্নীগণকে নিয়ে পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে তুললেন। ব্রাহ্মণ নট্ট ইত্যাদি সকলকে শচীদেবী ধুতি দিয়ে, টাকা দিয়ে, সমাদর জানিয়ে আপ্যাযন করলেন। প্রভুর পুণ্য-বিবাহ-কথা শুনলে আর সংসার-কষ্ট ভোগ করতে হয় না।

প্রভুর পাশে লক্ষ্মী রয়েছেন। শচীদেবীর গৃহ এখন জ্যোতির্ময় ধাম হয়েছে। ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই শচীমাতা এক আশ্চর্য জ্যোতি দেখতে পাচ্ছেন। কখনো পুত্রের পাশে জ্যোতি দেখছেন, ফিরে তাকাতেই আবার দেখতে পাচ্ছেন না। মাঝে মাঝে পদ্মফুলের সুগন্ধ পেয়ে তিনি ভাবেন—বৌমার মধ্যে নিশ্চয় লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠান আছে তাই পদ্মগন্ধ পাই এবং জ্যোতি দেখি। আগের মত অভাবও আর নেই এখন সংসারে। বৌমা ঘরে আসার পর থেকেই কোথা থেকে যেন সবই পেয়ে যাচ্ছি। শচীমাতা এইসব কথা মনে মনে ভাবেন। প্রভু ব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত হচ্ছেন না। তিনি কখন কেমন ব্যবহার করেন তা সাধারণের বুঝবার উপায় নেই। ঈশ্বর নিজে না জানালে স্বয়ং লক্ষ্মীও তাঁকে জানতে

পারেন না। তিনি যাঁকে কৃপা করেন তিনিই তা জানতে পারেন, অন্যে পারে না। সমস্ত শাস্ত্রে বেদে পুরাণে তাই বলে।

বিপ্ররাজ এখনও গুপ্তভাবেই আছেন, তিনি অধ্যয়ন ছাড়া আর কিছুই জানেন না। কন্দর্পের চেয়েও অপরূপ মনোহর রূপ, প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য বর্ষিত হচ্ছে। ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত, পদ্মলোচন, অধরে তাম্বুল, পরিধানে দিব্য বসন। বিদ্যাচর্চার মধ্যেও সর্বদা পরিহাসরত। তিনি যখন চলেন তখন হাজার হাজার ছাত্র তার সঙ্গে থাকে। ভগবৎ-প্রেয়সী দেবী সরস্বতীই যেন পুস্তকরূপে প্রভুর পাশে বিদ্যমান। রাজার মত তিনি নবদ্বীপে ঘুরে বেড়ান। প্রভুর ব্যাখ্যা বুঝবার মত পণ্ডিত নবদ্বীপে নেই বললেই চলে। গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে তার মধ্যে মহাভাগ্যবান বলা যায়, কারণ তাঁর কাছেই প্রভু বিদ্যাভ্যাস করছেন। সকলেই বলেন—এমন ছেলে যাঁর, তার জীবনই ধন্য। স্ত্রীলোকেরা তাঁকে মদনরূপে দেখে, পাষণ্ডীদের কাছে তিনি যম, পণ্ডিতগণের কাছে তিনি বৃহস্পতিতুল্য, যার যেমন মনোভাব তিনি প্রভুকে তেমনি দেখেন। বিশ্বম্ভরকে দেখে বৈষ্ণবদেব মনে সুখ ও দুঃখ দুইই হচ্ছে। এমন সুদর্শন যুবক কিন্তু তাঁর কৃষ্ণভক্তি নেই, মহাকালের হাত থেকে বিদ্যা কি রক্ষা করতে পারবে? প্রভুর লীলাশক্তি-যোগমায়ার প্রভাবে বৈষ্ণবগণ তাঁকে দেখেও দেখতে পাচ্ছে না। প্রভুকে ডেকে তাই কেউ কেউ বলেন—বিদ্যাচর্চায় মত্ত হয়ে দিন কাটিযে কি লাভ? প্রভু ভক্তদের কথা শুনে হেসে বলেন—আমার সৌভাগ্য যে তোমরা আমাকে এভাবে শিক্ষা দিচ্ছ।

প্রভু বিদ্যাচর্চায দিন কাটাচ্ছেন। ভক্তরাই চিনতে পাবছেন না, অন্যদেব আর কি কথা? চার্বদিক থেকে লোক নবদ্বীপে আসে। নবদ্বীপে লেখাপডা করলে তবেই সঠিক শিক্ষিত হতে পারে। চট্টগ্রাম থেকেও অনেক লোক এসে গঙ্গাতীরে বাস করে নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চা করেন। প্রভুর আজ্ঞায় সকলেই জন্মগ্রহণ কবেছেন, তাঁরা কৃষ্ণভক্ত এবং সংসার-বিরাগী। তাঁরা সকলে মিলে নিভৃতে বসে গোবিন্দচর্চা করেন। মুকুন্দ দত্ত সকল বৈষ্ণবের প্রিয়, তাঁর গানে সবাই মুগ্ধ। বিকেলের দিকে এঁরা সকলে এসে অদ্বৈতাচার্যের সভায় উপস্থিত হন। মুকুন্দ যখন কৃষ্ণলীলাকীর্তন আরম্ভ করেন তখন সবা" এসে হাজির হন। তাঁর গান শুনে কেউ হাসেন, কেউ কাঁদেন, কেউ নৃত্য করেন, কেউ গড়াগড়ি দেন, কারো কাপড়চোপড ঠিক থাকে না। কেউ বা হুঙ্কার করে ঝাঁপ দিয়ে গিযে মুকুন্দের পায়ে পড়েন। বৈষ্ণবদের আর কোন দুঃখ নেই, সকলেই পরম আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। প্রভুও মুকুন্দকে খুব ভালবাসেন, দেখলেই তাঁকে জাপটে ধরেন। প্রভু তাঁকে কোন শাস্ত্র কথা জিজ্ঞাসা করেন, মুকুন্দ উত্তব দিলে প্রভু তা অস্বীকার করেন। এভাবে দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়। প্রভু নিজের ভক্তের সঙ্গে এভাবেই সিদ্ধান্তেব অন্য ব্যাখ্যা করে তাঁদেব হারিয়ে দিয়ে মজা পান।

শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হলেও প্রভু এমনি করেন আর শ্রীবাস অকারণ বাক্যব্যয় না করে চলে যান। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে রত, তাঁরা কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কিছু শুনতে চান না। দেখা হলেই প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসা করেন, কৃষ্ণকথা কখনো আলোচনা করেন না। একদিন প্রভু ছাত্রদের সঙ্গে ঔদ্ধত্য করতে করতে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মুকুন্দ গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছিলেন, প্রভুকে দূর থেকে দেখেই তিনি পালিয়ে গেলেন। প্রভু গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ব্যাটা আমাকে দেখে পালাচ্ছে কেন? গোবিন্দ উত্তর দিলেন—আমি জানি না, হয়তো কোনো কাজ আছে, তাই চলে গেলেন। প্রভু

বললেন—কেন পালাচ্ছেন তা আমি জানি। আমি কৃষ্ণবহির্মুখ বলে তাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলতে চান না। এরা যেসব বৈষ্ণবশাস্ত্র পড়েন আমি তার পাঁজী-বৃত্তি-টীকা ব্যাখ্যা করি, আমার ব্যাখ্যায় কৃষ্ণকথা থাকে না। তাই আমাকে দেখে এঁরা পালিয়ে যান। প্রভু মনে মনে সন্তুষ্ট হয়ে বাইরে মুকুন্দকে নিন্দা করছেন এবং এই উপলক্ষে নিজের তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা প্রকাশ করছেন। বললেন—আরে ব্যাটা, আমাকে এড়িয়ে তুমি কত দিন থাকবে? আগে কিছু দিন শাস্ত্রপাঠ কর তবে তো আমাকে চিনতে পারবে। আমি এমন বৈষ্ণব হব যে ব্রহ্মা থেকে শিব পর্যন্ত সকলেই আমার কাছে আসবেন। আমি কথা দিচ্ছি, বৈষ্ণবের সমস্ত মূল লক্ষণ নিয়ে প্রকাশিত হব। আজ আমাকে দেখে যাঁরা পালিয়ে যাচ্ছেন তারাই তখন আমার গুণকীর্তন করবেন। এই বলে প্রভু নিজের শিষ্যগণের সঙ্গে আনন্দ করতে করতে বাড়িতে চলে গেলেন। বিশ্বম্ভর এই সকল লীলা করছেন কিন্তু তিনি না জানালে কে তাঁকে জানতে পারে?

এভাবেই ভক্তগণ নদীয়াতে বসবাস করছেন। অন্যান্য লোকেরা সন্তান সম্পত্তি নিয়ে মেতে আছে। তারা কীর্তন শুনলে ঠাট্টা করে। কেউ কেউ বলে—রোজগারের ধান্দা, আর কিছু নয়। আবার কেউ বলে—জ্ঞানচর্চা ছেড়ে দিয়ে পাগলের মত নেচে কি হবে? কেউ বলে—ভাগবত তন্ন তন্ন করে পড়ে দেখেছি কিন্তু তাতেও নাচা-কাঁদার কথা নেই। শ্রীবাস পণ্ডিতদেব চার ভাইয়ের জন্য খেয়ে দেয়ে ঘুমুবার উপায় নেই। মনে মনে কৃষ্ণনাম নিলে কি পুণ্য হয় না, নেচে-কেঁদে হাঁক-ডাক ছেড়ে কি লাভ?—বৈষ্ণবগণকে দেখলেই পাপী আর পাষণ্ডীরা এই সব কথা বলে। বৈষ্ণবগণ শুনে মনে খুব দুঃখ পান এবং হাত তুলে কৃষ্ণকে ডাকেন। বলেন—হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কত দিনে এই দুঃখের অবসান হবে? তুমি শীঘ্র প্রকাশিত হও, ঠাকুর। বৈষ্ণবগণ সকলে গিয়ে অদ্বৈতাচার্যের কাছে পাষণ্ডীদের কথা জানান। শুনে অদ্বৈত ক্রোধে হুঙ্কার করে বলেন—আমি সব সংহার করব। প্রভু চক্রধারী আসছেন, দেখবে নদীয়াতে কী কাণ্ড হয়। আমি সকলকে কৃষ্ণদর্শন করাব তবেই আমি কৃষ্ণভক্ত। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, এখানেই কৃষ্ণকে দেখতে পাবে। অদ্বৈতের কথা শুনে ভক্তগণ সকলে দুঃখ ভুলে গিয়ে কীর্তনে মন দেন। পরম-মঙ্গল কৃষ্ণ নামের ধ্বনি উঠল চারদিক থেকে, অদ্বৈত এবং অন্যান্য ভক্তগণ সকলেই বিহ্বল হয়ে পড়লেন। পাষণ্ডীদের গালাগালিও কমেছে, নবদ্বীপে এখন চারদিকে আনন্দ বিরাজ করছে।

প্রভু পড়াশোনায় ব্যস্ত দেখে শচীমাতা খুশি। এমন সময় একদিন সন্ন্যাসী বেশে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে এলেন। তিনি দয়ালু, কৃষ্ণভক্ত এবং কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত। সন্ন্যাসী বেশ দেখে কেউ তাঁর আসল পরিচয় জানতে পারেন না। তিনি গিয়ে অদ্বৈতের বাড়িতে উঠলেন। অদ্বৈত তখন ভোজন করছিলেন। তিনি তাঁর সামনে সসঙ্কোচে বসলেন। বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবের কাছে গোপন থাকে না। অদ্বৈত বারে বারে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন—তুমি কে? দেখে মনে হচ্ছে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। ঈশ্বর পুরী উত্তর দিলেন—আমি অতি অধম জীব। তোমার চরণ দর্শন করতে এসেছি। মুকুন্দ তাঁর পরিচয় পেয়ে আনন্দের সঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্তিগীত ধরলেন। গান শুনেই ঈশ্বরপুরী প্রেমাবেশে পড়ে গেলেন। তাঁর প্রেমধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল, তার যেন আর শেষ নেই। অদ্বৈতাচার্য আস্তে আস্তে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। তাঁর চোখের জলে অদ্বৈতের শরীর ভিজে গেল। কিছুতেই প্রেমাশ্রু বন্ধ হচ্ছে না, মুকুন্দ আনন্দে আরো জোরে পদাবলী গাইতে লাগলেন। তাঁর প্রেমবিকার

দেখে উপস্থিত বৈষ্ণবগণ অতীব আনন্দিত হলেন। তিনি যে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী, ভক্তগণ পরে তা সকলেই জানতে পারলেন। তাঁর প্রেম দেখে সকলেই হরিধ্বনি করে উঠলেন। এইভাবে ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁকে সাধারণ লোক কেউ চিনতে পারে নি। শ্রীগৌরসুন্দর একদিন অধ্যাপনা করে বাড়ি ফিরবার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে প্রভু ভক্তকে চিনতে পেরে নমস্কার জানালেন। প্রভুর অতি অনির্বচনীয় সুন্দর রূপ, সর্বগুণলক্ষণ প্রকটিত। যদিও তাঁর স্বরূপ কেউ জানে না কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্যে সকলেই তাঁকে ভয় পায়।

ঈশ্বর পুরী দেখলেন প্রভুর ধীর সিদ্ধপুরুষদের মত গাম্ভীর্যময়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—বিপ্রবর, তোমার নাম কি? তুমি পড়াও? বাড়ি কোথায়? উপস্থিত লোকেরা বললেন—এঁর নাম নিমাই পণ্ডিত। ঈশ্বর পুরী আনন্দে বললেন—ও তাহলে তুমিই সেই? প্রভু তাকে আমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। শচীদেবী তাঁকে সমাদর করে ভোজন করালেন। তারপর বিষ্ণুমন্দিরে বসে দুজনে কৃষ্ণকথা আলাপ করতে করতে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর প্রেমধারা দেখে প্রভু সন্তুষ্ট হলেন কিন্তু তখনো সময় হয় নি বলে আত্মপ্রকাশ করলেন না। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্যের বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করলেন। সকলেই তাকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। প্রভুও তাঁকে দর্শন করতে রোজই আসেন। কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রেমাশ্রু বর্ষিত হয়, বৈষ্ণবগণ তা দেখে পুলকিত হন। শিশুকাল থেকেই তিনি সংসারে অনাসক্ত, ঈশ্বর পুরী তার জন্য তাঁকে খুবই স্নেহ করেন। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী 'কৃষ্ণলীলামৃত' নামে একখানি গ্রন্থ লিখেছেন। অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তিনি সেই গ্রন্থ গদাধর পণ্ডিতকে পড়াতেন। প্রভু অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সেরে সন্ধ্যাবেলা ঈশ্বর পুরীকে নমস্কার করতে এলে তিনি খুশি হয়ে প্রভুকে বললেন— আমি একখানা কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ রচনা করেছি, তুমি যদি তা শুনে একটু দোষগুণ বিচার করে বল তাহলে খুবই ভাল হয়। প্রভু বললেন—ভক্ত ভগবানের বিষয় লিখেছেন, এতে যে দোষ দেখে তারই পাপ হয়। ভক্ত যেভাবেই লিখুন না কেন তাতেই কৃষ্ণ প্রীত হন। পণ্ডিতেরা বলেন —বিষ্ণবে, অশিক্ষিতরা বলে —বিষ্ণায়। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু দুটোই সমান ভাবে গ্রহণ করেন। শাস্ত্রে আছে—অশিক্ষিতরা 'বিষ্ণায' বলে, শিক্ষিতগণ বলেন 'বিষ্ণবে'। কিন্তু উভয়ের পুণ্যই সমান। কারণ, ভগবান জনার্দন ভক্তের ভাবটি মাত্র গ্রহণ করেন। এতে যে দোষ মনে করে আসলে তারই দোষ হয়, কারণ—ভক্তের যে-কোন বর্ণনাই কৃষ্ণের সন্তুষ্টির বিষয়। তাই বলছি, তোমার প্রেমময় বর্ণনাকে দোষ দেবে, এমন কার সাহস আছে? প্রভুর কথা শুনে ঈশ্বর পুরীর যেন সমস্ত শরীরে অমৃতবর্ষণ হল। পুরীজী আবার খুশি হয়ে বলেন—তোমার দোষ হবে না, যা দোষ পাবে তা অবশ্যই বলবে। এইভাবে রোজ প্রভু তাঁর সঙ্গে দু-চার দণ্ড কৃষ্ণকথা আলাপ করেন। একদিন প্রভু তাঁর রচনা শুনে হেসে বললেন—ধাতু প্রয়োগ ঠিক হয় নি এখানে। এ ধাতুটি আত্মনেপদী হবে না।—বলে প্রভু বাড়িতে চলে গেলেন। ঈশ্বর পুরীও বড় পণ্ডিত। ব্যাকরণ বিচারে তিনি খুশি হলেন। প্রভু চলে গেলে তিনি নানাভাবে ধাতু-বিচার আরম্ভ করলেন। পরে প্রভু এলে তিনি আত্মনেপদী প্রয়োগ বিষয়ে ব্যাখ্যা করলেন। বললেন—তুমি যাকে পরস্মৈপদী বলে গেলে, আমি তাকে আত্মনেপদী রূপে ব্যবহার করেছি। প্রভু ব্যাখ্যা শুনে খুশি হয়ে ভক্তকে খুশি করবার জন্য আর দোষ উল্লেখ করলেন না। প্রভু সর্বদা ভক্তের গৌরব ঘোষণা করেন—শাস্ত্রে বলে,

এই তাঁর স্বভাব। এভাবে বিদ্যা আলোচনা করে পুরীজী কিছুদিন প্রভু-সঙ্গে কাটালেন। ঈশ্বরভক্ত বেশিদিন একস্থানে থাকে না। তিনি আবার পর্যটনে চললেন।

ঈশ্বর পুরীর পুণ্য কথা শুনলে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়। শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীর শরীরে যত প্রেম আছে তিনি সবই খুশি হয়ে ঈশ্বর পুরীকে দান করেছিলেন। ভগবানের আশীর্বাদে গুরুর প্রেম লাভ করে ঈশ্বর পুরী স্বচ্ছন্দভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন। হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, হে শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র, তোমরা জীবজগতের প্রাণতুল্য প্রিয়। তোমাদের সেবক বৃন্দাবন তোমাদের পদযুগলের সম্মুখে অন্তশ্চিন্তিত দেহে উপস্থিত থেকে তোমাদের গুণমহিমাসকল কীর্তন করছে।

১/৮ মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের জয় হোক, প্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয় হোক। শ্রীগৌরসুন্দর গ্রন্থ নিয়ে নবদ্বীপে নিরন্তর ক্রীড়া করছেন। প্রভু সকল অধ্যাপকগণকে চালনা করেন অথচ তাঁকে কেউ কিছু বোঝাতে পারেন না। প্রভু শুধু মাত্র ব্যাকরণ অধ্যযন করেছেন তথাপি অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণকে পর্যন্ত তৃণ-জ্ঞান করতেন না। তিনি নিজের স্বরূপগত লক্ষণ-জনিত আনন্দে নগর ভ্রমণ করে করে বেড়াচ্ছেন, সঙ্গী রয়েছেন ভক্তবৃন্দ। একদিন পথে মুকুন্দের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন—তুমি আমাকে দেখে পালাও কেন, আজ সেকথা না বললে তোমাকে ছাড়ছি না। মুকুন্দ তখন মনে মনে ভাবছেন—কি করে ছাড়া পাব? তবে এ তো শুধু ব্যাকরণ জানে, একে অলঙ্কার বিষযে জিজ্ঞাসা করে বিপদে ফেলব যাতে আর আমার সঙ্গে গর্ব করতে না আসে। মুকুন্দ এভাবে অনেক কিছু প্রভুকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আর প্রভুও তার প্রত্যেকটি প্রশ্নেব উত্তর দিতে লাগলেন। মুকুন্দ বললেন—ব্যাকরণ হচ্ছে শিশুপাঠ্য, ছেলেপুলেবা তা নিযে চর্চা করে। তোমার সঙ্গে আমি অলঙ্কার বিচার করব। প্রভু বললেন—তোমার যা ইচ্ছা তাই নিয়েই আলোচনা কর। বিখ্যাত কঠিন কঠিন শ্লোক উদ্ধৃত করে মুকুন্দ অলঙ্কার বিচার করতে বললেন। সর্বশক্তিমান শ্রীগৌরচন্দ্র সব শ্লোক খণ্ড খণ্ড করে বিচার কবলেন। মুকুন্দ তার উত্তরে কিছু বলতে পারছেন না দেখে প্রভু হেসে বললেন—আজ বাড়িতে গিযে ভাল করে বইপত্র দেখে নাও, কাল এলে সব বুঝিয়ে দেব। মুকুন্দ প্রভুর চরণেব ধূলি নিয়ে যেতে যেতে ভাবছেন—এমন কোন শাস্ত্র নেই যে-বিষয়ে ইনি জানেন না। মানুষেব মধ্যে এমন পাণ্ডিত্য বড-একটা দেখা যায় না। এমন জ্ঞানী যদি কৃষ্ণ ভক্ত হন, তাহলে তাঁর সঙ্গ আমরা কেউ ছাড়তাম না কিছুতেই।

এভাবেই প্রভুর সঙ্গে একদিন গদাধর পণ্ডিতের দেখা হলে তিনি তাঁকে দুহাত দিয়ে আটকে ধরে বললেন,—তুমি তো ন্যায়শাস্ত্র পড়ছ, আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিযে যাও। গদাধর বললেন,—জিজ্ঞাসা কর। প্রভু প্রশ্ন করলেন,—বল তো মুক্তির লক্ষণ কি? গদাধর শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে উত্তর দিলেন। প্রভু বললেন,—ঠিক হয় নি। গদাধর বললেন,—আত্যন্তিক দুঃখ-নাশকেই শাস্ত্রে মুক্তি বলে। প্রভু একথা মেনে না নিয়ে তার নানা রকম দোষ দেখাতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে তর্ক করে কে পারবে? গদাধর তখন ভাবছেন, পালাতে পারলে বাঁচেন। প্রভু বললেন,—আজ বাড়িতে চলে যাও। কাল তাড়াতাড়ি এসো, তখন শুনব। গদাধর প্রভুকে নমস্কার করে চলে গেলেন।

তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ করছেন। তাঁকে সকলেই বড় পণ্ডিত বলে মান্য করেন। বিকেলের দিকে প্রভু ছাত্রদের সঙ্গে করে এসে গঙ্গাতীরে বসেন। সিন্ধুসুতা লক্ষ্মীদেবী

প্রভুর সেবা করেন, তাঁর অদ্বিতীয় মদনসুন্দর কলেবর। তাঁর চার দিকে ঘিরে ছাত্রগণ বসেন, প্রভু থাকেন মাঝখানে। সন্ধ্যার দিকে বৈষ্ণবগণও গঙ্গাতীরে এসে বসেন। দূরে বসে তাঁরা প্রভুর কথা শোনেন, শুনে তাঁদের মনে আনন্দও হয় আবার দুঃখও হয়। কেউ বলেন,—যাঁর এত রূপ, এত বিদ্যা কিন্তু কৃষ্ণভজন না করলে সবই তো বৃথা। সকলেই আবার বলেন,—একে দেখে আমরা ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে পালিয়ে যাই। কেউ বলেন,—পালাতেও পারি না, পাওনাদার তহশীলদারের মত ধরে রাখে। আর কেউ কেউ বলেন,—বামুনের অমানুষী শক্তি, মনে হয় কোন মহাপুরুষ হবে। দেখলেই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করে তবু তাঁকে দেখে আনন্দ পাই। মানুষের মধ্যে এমন পাণ্ডিত্য কখনো দেখি নি। ইনি কেন কৃষ্ণভক্ত হলেন না এটাই দুঃখের বিষয়। সকলেই সকলকে বলছেন,—তোমরা সবাই বল যেন এঁর কৃষ্ণে মতি হয়। সমস্ত ভক্তগণ মিলে গঙ্গাকে প্রণাম জানিয়ে এই বর প্রার্থনা করলেন,—হে কৃষ্ণ, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র যেন সব ছেড়ে তোমার ভক্ত হয়, সর্বদা যেন তোমার ভক্তিতে মগ্ন থাকে, আমাদের সকলকে এমন একটি সঙ্গ দান কর। প্রভু অন্তর্যামী, সকলের মনের কথাই তিনি জানেন। শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তগণকে দেখলেই তিনি প্রণাম করেন। ভক্তগণের আশীর্বাদ প্রভু মাথা পেতে নেন, ভক্তের আশীর্বাদেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। প্রভুকে দেখে কেউ কেউ তাঁর সামনেই বলেন,—অকারণ বিদ্যাচর্চা করে কি হবে? তার চেয়ে বরং শ্রীকৃষ্ণের ভজনায় মন দাও। লোকে শাস্ত্রপাঠ করে কেন? সে তো কেবল কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব জানবার জন্যই। তাই যদি না হল তবে অবথা পড়াশোনা করে কি লাভ? প্রভু হেসে উত্তর করেন, —তোমরা যদি আমাকে কৃষ্ণভক্তিবিজ্ঞান শিক্ষা দাও তাহলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব। আমার পক্ষে ভাগ্যের কথা যে তোমরা আমার শুভ অনুসন্ধান করছ, আমার মন সেদিকেই যাবে। অনেক দিনই ভেবেছি চতুষ্পাঠী থেকে ফিরে কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে যাব। এই কথা বলে প্রভু ভক্তের সামনে হাসলেও তাঁরই মায়াতে কেউ তাঁকে চিনতে পারল না। এই ভাবেই প্রভু সকলের চিত্ত জয় করছেন। এমন কেউ নেই যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁর কথা না শোনে।

কখনো প্রভু গঙ্গাতীরে বসেন আবার কখনো নগরে নগরে ভ্রমণ করেন। প্রভুকে দেখতে পেলেই নবদ্বীপের লোকেরা সম্ভ্রমে প্রণাম করেন। মহিলারা দেখে বলেন,—এই ত মদন, মেয়েরা জন্মে জন্মে যেন এঁকে স্বামীরূপে পায়। পণ্ডিতগণ তাঁকে বৃহস্পতি-তুল্য মনে করেন। বৃক্ষাদি পর্যন্ত যেন তাঁর পাদপদ্মে প্রণাম জানায়। যোগিগণ দেখেন তিনি যেন সিদ্ধকলেবর কিন্তু দুষ্টলোকেরা দেখে ভয় পায়। প্রভু যার সঙ্গে একদিন মাত্র কথা বলেছেন সেই লোকটিই যেন তাঁর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রভু যতই বিদ্যার অহঙ্কার করুন না কেন কিন্তু লোকেরা তবু তাঁকে ভালবাসেন। প্রভুব স্বভাবই হচ্ছে সকলকে কৃপা করা, যবনেও তাঁকে দেখে ভালবাসে।

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে মুকুন্দ-সঞ্জয়ের নাটমন্দিরে ছাত্র পড়ান। শাস্ত্র আলোচনা নিয়ে দুই পক্ষে তর্ক হলে শ্রীশচীনন্দন তাদের মীমাংসা করে দেন। মুকুন্দ-সঞ্জয় এসব দেখে বড়ই আনন্দ পান কিন্তু তাঁরা কেউ প্রভুর মূলতত্ত্ব জানেন না। বিদ্যাচর্চা করে এই ভাবে প্রভু বাড়িতে এবং নগরে দিন কাটাচ্ছেন।

একদিন প্রভু বায়ুরোগের ছল করে প্রেমভক্তি-বিকার প্রকাশ করেন। হঠাৎ তিনি অলৌকিক শব্দ বলতে শুরু করেছেন, গড়াগড়ি যাচ্ছেন, ঘর ভেঙ্গে ফেলছেন, হাসছেন,

হুঙ্কার-গর্জন করছেন, মালকোচা মেরে ধুতি পরে সামনে যাকে পাচ্ছেন তাকেই আক্রমণ করছেন। মাঝে মাঝে শরীর স্তম্ভের মত নিস্পন্দ হয়ে যায়। তাঁর মূর্ছার অবস্থা দেখে লোকে ভয় পেয়ে যায়। আত্মীয়গণ তাঁর বায়ু-বিকারের কথা শুনে ধেয়ে এসে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। বুদ্ধিমন্ত খান, মুকুন্দ-সঞ্জয় প্রমুখ অনেকেই প্রভুর বাড়িতে চলে এসেছেন। কেউ বিষ্ণুতৈল-নারায়ণ তৈল প্রভুর মাথায় দিচ্ছেন। যার যেমন বুদ্ধিতে কুলোয় তিনি সেভাবেই চেষ্টা করছেন। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের আপন ইচ্ছায় তিনি এসব করছেন, বাহ্যিক চিকিৎসায় তিনি কি করে সুস্থ হবেন? তাঁর সর্ব অঙ্গে কম্প, তিনি আস্ফালন করছেন। তাঁর হুঙ্কার শুনে লোকেরা পালিয়ে যাচ্ছে। প্রভু বলছেন,—আমি সর্বলোকের ঈশ্বর। আমি বিশ্বকে ধারণ করে আছি বলেই আমার নাম বিশ্বম্ভর। আমাকে কেউ চিনতে পারছে না। এই কথা বলেই তিনি দৌড়ে পালাচ্ছিলেন, তখন সকলে গিয়ে ধরলেন। প্রভু বায়ুরোগের ছল করে নিজেকে প্রকাশ করলেন কিন্তু যোগমায়া-শক্তির প্রভাবে তাঁকে কেউ চিনতে পারে নি। কেউ বলল—দানবে পেয়েছে। কেউ বলছে,—এসব ডাকিনী-যোগিনীর কাজ। কেউ বলে,—সব সময় কথা বলে তাই মাথা গরম হয়ে গেছে। এই ভাবে বিষ্ণুমায়ার মোহেতে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁর তত্ত্ব না জেনে নানা লোকে নানা রকম বিধান দেয়। বহু কবিরাজী তেল প্রভুর মাথায় গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হয়। প্রভু তেলের মধ্যে বসে খলখল করে হাসছেন যেন সত্যি তাঁর বায়ুরোগ হয়েছে। নিজের ইচ্ছা মত লীলা করে বায়ুরোগ ত্যাগ করে তিনি পরে স্বাভাবিক হলেন। আনন্দে হরিধ্বনি করে লোকেরা এ ওকে বস্ত্রদান করছে। সকলেই খুশি হয়ে বললেন,—এমন পণ্ডিত মানুষ বেঁচে থাকুন, এই আমরা চাই। এইভাবে প্রভু লীলা করছেন। তিনি নিজে থেকে না জানালে লোকেরা তাঁকে জানতে পারবে কি করে?

প্রভুকে দেখে বৈষ্ণবগণ বলছেন,—শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজনা কর। শরীর অনিত্য, তার কি বিশ্বাস? তুমি জ্ঞানী লোক, তোমাকে এবিষয়ে আর বেশি কি বলব। প্রভু একটু হেসে সকলকে নমস্কার করে ছাত্রদের পড়াতে চলে গেলেন। ভাগ্যবান মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে প্রভুব চতুষ্পাঠী। কোন পুণ্যবান লোক প্রভুর মাথায় সুগন্ধী কবিরাজী তেল মাখিয়ে দিয়েছেন। ভাগ্যবান ছাত্রগণ প্রভুর চারদিকে ঘিরে বসে তাঁর অধ্যাপনা উপভোগ করছেন। এ দৃশ্য উপমা দিয়ে বুঝান অসম্ভব। এ শোভার অপার মহিমা। মনে হয় যেন বদরিকাশ্রমে সনকাদি শিষ্যগণ নারায়ণকে ঘিরে বসে আছেন। তাঁদের যেন প্রভু পড়াচ্ছেন, এভাবেই গোরারায় লীলা করছেন। সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণই এই শ্রীশচীনন্দন। তাই বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যারসে মগ্ন হয়ে শিষ্যগণের সঙ্গে সেই লীলা করছেন।

পড়ান হলে দুপুরে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করেন। কিছু সময় গঙ্গায় বিহার করে বাড়িতে এসে শ্রীবিষ্ণুপূজায় মন দেন। তুলসীকে জল দিয়ে প্রদক্ষিণ করে 'হরি হরি' বলে ভোজনে বসেন। লক্ষ্মী অন্ন দিচ্ছেন, বৈকুণ্ঠপতি ভোজন করছেন, পুণ্যবতী শচীমাতা তা নয়নভরে দেখছেন। ভোজনের পরে পান খেয়ে শয়ন করেন, লক্ষ্মী তাঁর চরণসেবা করেন। তিনি কিছু সময় লীলাসহায়িকা যোগমায়া-রচিত নিদ্রায় কাটিয়ে গ্রন্থ নিয়ে চললেন।

নগরে এসে সকলের সঙ্গেই সহাস্য আলাপ করেন। প্রভুর মূলতত্ত্ব কেউ জানে না তবু সবাই তাঁকে সম্মান করে। শ্রীশচীনন্দনের দেবদুর্লভ নগরভ্রমণ সকলে দর্শন করে। প্রভু তন্তুবায়ের ঘরের সামনে হাজির হলে গৃহকর্তা তাঁকে সসম্মানে প্রণাম জানায়। প্রভু

বলেন,—একখানা ভাল কাপড় দাও। তন্তুবায় তৎক্ষণাৎ কাপড় নিয়ে আসে। প্রভু জিজ্ঞাসা করেন,—এর দাম কত নেবে? তন্তুবায় জানায়,—তুমি যা দেবে তাই নেব। প্রভু বলেন,—এখন সঙ্গে টাকা নেই। তাঁতি বলে,—হপ্তা দুয়েকের মধ্যে দিলেই চলবে।

তাঁতিকে আশীর্বাদ করে প্রভু গোয়ালার বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। তিনি রসিকতা করে বললেন,—দরজায় ব্রাহ্মণ এসেছে বলে কথা, শিগ্‌গির দুধ-দই যা আছে নিয়ে এস। আজ তোমাদের ঘরে ভুরিভোজন করব। প্রভুর অপূর্ব লাবণ্য দেখে গোয়ালারা মহা খুশি হয়ে তাঁকে যত্ন করে সুন্দর আসন এনে বসতে দিলেন। প্রভুর সঙ্গে গোয়ালারা নানা রকম পরিহাস করছে। কেউ মামা বলে ডাকছে। কেউ বলছে,—চল মামা, গিয়ে ভাত খাই। কেউ আবার কাঁধে করে ঘরে নিয়ে তুলছে। একজন বলছেন,—এক সময় আমার ঘরের সব ভাত তুমি খেয়েছিলে, তোমার কি তা মনে নেই? দেবী সরস্বতী গোয়ালার মুখ দিয়ে সত্য তত্ত্ব প্রকাশ করলেন কিন্তু গোয়ালা তা জানেও না। গোয়ালাদের কথা শুনে মহাপ্রভু হাসছেন। গোপবৃন্দ আনন্দের সঙ্গে প্রভুকে দুধ, ঘি, দৈ , সর, মাখন—সব এনে দিচ্ছেন। প্রভু গোপগণকে কৃপা করে পরে গন্ধবণিকদের পাড়ায় গেলেন।

বণিক প্রভুকে সম্মান করে প্রণাম জানায়। প্রভু বলেন,—ভাল গন্ধ নিয়ে এস দেখি, ভাই। বণিক সত্যি ভাল গন্ধ নিযে এল। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—কি দাম নেবে? বণিক উত্তর করে,—তুমিই জান কি দেবে। তোমার সঙ্গে কি দাম করা উচিত? আজ গন্ধ লাগিয়ে বাড়িতে চলে যাও, যদি কালকেও যথেষ্ট গন্ধ থাকে, ধুলেও যদি গন্ধ না যায়, তখন তোমার যা ইচ্ছা হবে দাম দেবে। —এই কথা বলে বণিক খুব মজা করে প্রভুর সারা গায়ে সুগন্ধ মাখিয়ে দেয়। সমস্ত লোকের হৃদয়-মন যে আকর্ষণ করে তাঁর রূপ দেখে কে মুগ্ধ না হযে থাকতে পারে? বণিককে অনুগ্রহ করে প্রভু মালাকারের বাড়িতে গেলেন।

পরম রূপবান প্রভুকে দেখে মালাকার সাদরে আসন দিযে নমস্কার করে। প্রভু বললেন,—আমার সঙ্গে পয়সা-কড়ি কিছু নেই তবু ভালদেখে মালা দাও। সাধুপুরুষ দেখে মালাকার বললে,—তা তোমার ভাবতে হবে না। —এই বলে সে প্রভুর গলায মালা পরিয়ে দিল। প্রভু সঙ্গের ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। মালাকারকে আশীর্বাদ করে প্রভু তাম্বুলীদের বাড়িতে গেলেন।

তাম্বুলী প্রভুর মদনমোহন-রূপ দেখে চরণের ধুলো মাথায ঠেকিয়ে আসন দিয়ে বসিযে বললে,—আমার মত সামান্য লোকের দরজায় যে তুমি পদধূলি দিয়েছ, এ আমার বড ভাগ্য। এই বলে সে নিজে থেকেই এনে পান দিল। প্রভু দেখে হাসছেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করছেন,—দাম না নিয়েই পান দিলে কেন? তাম্বুলী বললে,—আমার দিতে ইচ্ছে করল, তাই দিলাম। প্রভু তাম্বুলীর কথা শুনে খুশি হয়ে পান খেতে লাগলেন। ভাল পান, কর্পূরাদি মশলা দিযে সাজিয়ে শ্রদ্ধা করে খেতে দিল কিন্তু দাম নিল না। প্রভু তাম্বুলীকে আশীর্বাদ করে সেখান থেকে বেরিয়ে সহাস্য বদনে সারা নগর ঘুরে বেড়ান।

সেকালের মথুরার মতই নবদ্বীপের অবস্থা। নানা ঘরে বহুলোক। বিধাতার নির্দেশেই প্রভুর বিহারের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে মথুরালীলা করেছেন তেমনি শচীনন্দন এখন নবদ্বীপে লীলা প্রকাশ করছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্খবণিকের ঘরে গেলে তারা প্রভুকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বসতে দিল। প্রভু বললেন,—ভালো দেখে শাঁখা নিয়ে এসো দেখি কিন্তু ভাই, আমার কাছে তো এখন টাকা-কড়িও কিছু নেই।

শাঁখারি তখনই অতীব সুন্দর শাঁখা এনে প্রভুর হাতে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলো। বলল,—শাঁখা নিয়ে যাও, পরে দাম দিলেও হবে। না দিলেও এমন কিছু নয়। প্রভু শাঁখারির কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আশীর্বাদ করে চললেন। এইভাবে প্রভু নবদ্বীপের সমস্ত লোকের বাড়িতে যেতন। সেই ভাগ্যে আজও নাগরিকগণ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের আশীর্বাদ লাভ করছেন।

এরপর প্রভু সর্বজ্ঞের বাড়িতে গেলেন। সর্বজ্ঞ প্রভুর তেজ দেখে বিনয়পূর্বক তাঁকে প্রণাম করলেন। প্রভু বললেন,—সর্বজ্ঞ, তুমি তো সবই জান, বলতো পূর্বজন্মে আমি কি ছিলাম? আচ্ছা দেখছি, বলে সর্বজ্ঞ নিজের সৌভাগ্য মনে করে গোপাল মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। দেখলেন,—চতুর্ভূজ শ্যামসুন্দর মূর্তি, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, বক্ষে শ্রীবৎস কৌস্তুভ চিহ্ন, মহাজ্যোতির্ময় রূপ। রাত্রিবেলায় প্রভু বন্দী আছেন ঘরের মধ্যে, পিতা মাতা তাঁকে দেখে স্তব করছেন। পুত্রকে পিতা কোলে নিযে গোকুলে বেখে এলেন সেই রাত্রিতেই। আবার দেখছেন, অপূর্ব দিব্য মোহন দিগম্বর দ্বিভুজ মূর্তি, কটিতে কিঙ্কিনী, দুই হাতে মাখন। নিজের ইষ্টমূর্তিকে যেভাবে ধ্যান করেন তাই তিনি দেখতে পেলেন। বালগোপাল রূপ দেখার পরে আবার কিশোর গোপাল রূপ দেখলেন। ত্রিভঙ্গ মুরলীবদন, চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন গোপীগণ। সর্বজ্ঞ চোখ মেলে সামনে গৌরাঙ্গকে দেখে বারে বারে ধ্যানযোগে বসছেন। তারপর সর্বজ্ঞ প্রভুকে বললেন,—ওহে ব্রাহ্মণ ঠাকুর, তুমি কে আমাকে বল। আবার সর্বজ্ঞ দেখলেন, প্রভু দুর্বাদল শ্যাম মূর্তিতে ধনুর্ধারী রূপে বীরাসনে বসে আছেন। আবার দেখলেন, প্রভু প্রলয়জল-মধ্যে বিরাজিত, অদ্ভুত বরাহ মূর্তিতে দাঁতের দ্বারা পৃথিবী ধারণ করে আছেন। পরে দেখলেন,—অপার ভক্ত-বৎসল মহা-উগ্ররূপ নৃসিংহ অবতার নিয়েছেন। আবার বামন রূপ ধরে মায়াপ্রভাবে বলিকে যজ্ঞে ছলনা করছেন। কখনো দেখেন, প্রলয় জলধিতে মৎস্যরূপে আনন্দে জলক্রীড়া করছেন। ভাগ্যবান সর্বজ্ঞ আবার দেখলেন,—প্রভু হলধর রূপে মুষল ধারণ করে রয়েছেন। এবারে দেখলেন,—জগন্নাথ মূর্তি, মধ্যে সুভদ্রা, দক্ষিণে বলরাম। এভাবে সব ঈশ্বরতত্ত্ব দেখেও প্রভুর মায়াবলে তিনি কিছুই সঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। তাই সর্বজ্ঞ বিস্মিত হয়ে মনে মনে ভাবছেন, এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয় বহু তন্ত্রমন্ত্র জানেন। অথবা কোন দেবতা ব্রাহ্মণরূপ ধরে আমাকে পরীক্ষা করছেন। ব্রাহ্মণের শরীরেও অমানুষিক তেজ লক্ষ্য করছি। আমাকে অকারণেই লোকে সর্বজ্ঞ বলে, আসলে আমি আর কি জানি? সর্বজ্ঞ যখন মনে মনে এসব ভাবছেন তখন প্রভু হেসে বললেন,—তুমি কি দেখলে? আমি কে? খুলে সব বল। সর্বজ্ঞ বললেন,—এখন থাক, বিকেলে আবার ভাল করে মন্ত্র জপ করে বলব। প্রভু 'তাই হবে' বলে শ্রীধরের বাড়িতে এলেন।

প্রভু শ্রীধরের উপরে খুব সন্তুষ্ট। নানা কারণে তাই তিনি যখন-তখন শ্রীধরের বাড়িতে আসেন। একথা-সেকথায় সময় কাটিয়ে হাসি-তামাশা করে প্রভু তারপর চলে যান। প্রভুকে দেখে আজও শ্রীধর নমস্কার করে তাঁকে বসতে দিলেন। শ্রীধর অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক। প্রভু তাঁর সঙ্গে কৌতুক করবার জন্য বাইরে ঔদ্ধত্যের ভাব দেখান। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—শ্রীধর, তুমি তো সারাদিন হরিনাম নিচ্ছ, তবে তোমার এত দুঃখ কষ্ট কেন? লক্ষ্মীপতির পূজা করেও অন্নবস্ত্রের কষ্ট যাচ্ছে না কেন? শ্রীধর উত্তর দিলেন,—না খেয়ে তো নেই! ছোট হোক, বড় হোক কাপড়ও পরছি। প্রভু বললেন,—তোমার কাপড়ে গোটা দশেক তাপ্পি, ঘরের চালে খড় নেই। অথচ দেখ

চণ্ডী-বিষহরীর পূজা করে লোকেরা কেমন খেয়ে-পরে আছে। শ্রীধর বললেন,—ঠাকুর, তুমি ভালই বলেছ। তবু দেখ সবারই সময় সেই একই কাটে। রাজারা অট্টালিকায় বাস করে, ভাল খায়দায়, পাখীরা গাছের ডালে বাস করে। তবু দুজনেরই সময় একই কাটে। ঈশ্বরের নির্দেশেই সকলে নিজের নিজের কর্মফল ভোগ করে। প্রভু এ কথার উত্তরে বললেন,—তোমার প্রচুর ধনরত্ন আছে, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে তা ভোগ কর। আমি তোমার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গব, দেখি তুমি কি করে লোককে ঠকাতে পার। শ্রীধর বললেন,—পণ্ডিত, তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া করা উচিত নয়। প্রভু বললেন,—আমি কিন্তু তোমাকে এমনিতে ছাড়ব না। আমাকে কি দেবে বল। শ্রীধর বলছেন,—আমি খোলা বেচে খাই। তোমাকে দেবার মত আমার কি আছে? প্রভু বলেন,—তোমার যে গুপ্তধন আছে তা পোঁতাই থাক, সেসব পরে নেব। এখন তুমি বিনি পয়সায় আমাকে কলা-মূলা-থোড় যা আছে দাও। তাহলে আর আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করব না। তখন শ্রীধর মনে মনে ভাবেন,—বামুন বড়ই গোঁয়ার, কোন দিন আমাকে যা-তা ভাবে কিলোয়। মারলেই বা কি করব, রোজই তো আর বিনি পয়সায় দেওয়া যায় না! তবু কেড়ে-কুড়ে যা নেয়, তা আমি আমার ভাগ্য বলেই মনে করি। রোজই তাই কিছু দিই। এই সব মনে মনে ভেবে শ্রীধর বলেন,—ঠাকুর, শোন, তোমার পয়সা-কড়ি কিছু দিতে হবে না, থোড়-কলা-মূলা-খোলা এমনিই দেব, আমার সঙ্গে অযথা ঝগড়া করো না। প্রভু বললেন,—ঠিক আছে, আর কোন বিবাদ নেই, তবে থোড়-মোচা-কলা-মূলো যেন ভাল দেখে পাই। প্রভু শ্রীধরের খোলায় রোজ ভোজন করেন। থোড়-মোচা-কলা-মূলো দিয়েই সুন্দর সুন্দর তরকারি হয়। শ্রীধরের গাছে চালে যে লাউ ধরে তা দিয়ে প্রভু দুগ্ধ-মরিচের ঝাল খান। প্রভু জিজ্ঞাসা করেন,—তুমি আমাকে কি মনে কর তা বললেই আমি চলে যাব। আর তোমাকে জ্বালাব না। শ্রীধর বলেন,—তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি বিষ্ণু-অংশ। প্রভু বললেন,—তুমি বলতে পারলে না। আমি গোয়ালার ছেলে। তুমি আমাকে ব্রাহ্মণপুত্র বলে মনে করছ কিন্তু আমি নিজেকে গয়লা মনে করি। শ্রীধর নিজের প্রভুকে মায়াবশে চিনতে পারেন নি। প্রভুর কথা শুনে তাই তিনি হাসছেন। প্রভু বললেন,—শ্রীধর তোমাকে মূলতত্ত্ব বলছি। আমা থেকেই গঙ্গার উদ্ভব। শ্রীধর বললেন,—গঙ্গাকেও কি তুমি ভয় পাও না? বয়স বাড়লে লোকের বুদ্ধি একটু স্থির হয়, তোমার দেখি চপলতা আরো দ্বিগুণ বাড়ছে। এইভাবে শ্রীধরের সঙ্গে মজা-তামাশা করে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি শেষে বাড়িতে চলে এলেন। ছাত্রগণ যার যার বাড়িতে চলে গেল।

প্রভু বিষ্ণু মন্দিরের সামনে বসে রইলেন। পূর্ণিমার চাঁদ দেখে প্রভুর মনে বৃন্দাবনচন্দ্রের ভাব উদয় হল। তিনি অপূর্ব মুরলীধ্বনি করতে লাগলেন। শচীমাতা ভিন্ন আর কেউ তা শুনতে পেলেন না। ত্রিভুবনমোহিনী মুরলী শুনে মাতা আনন্দে সেখানেই মূর্চ্ছা গেলেন। একটু পরেই চেতন-পেয়ে মন স্থির করে আবার সেই অপূর্ব মুরলীধ্বনি শুনতে পেলেন। যেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ বসে আছেন সেদিক থেকেই বাঁশীর শব্দ আসছে। শচীমাতা বাইরে এসে দেখেন, পুত্র বিষ্ণুমন্দিরের সামনেই বসে আছে। বাঁশীর শব্দ আর শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু পুত্রের বুকে আকাশের চাঁদকে দেখতে পেয়ে তিনি বিস্মিত হয়ে চার দিকে তাকাতে লাগলেন। ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে শচীদেবী ভাবতে লাগলেন কিন্তু কিছুই স্থির করে উঠতে পারলেন না। এইভাবে ভাগ্যবতী শচীদেবী অনেক অনেক প্রকাশ

দেখতে পাচ্ছেন। একদিন রাতে তিনি শুনলেন, বহু বহু লোক মিলে কত রকম যন্ত্র সহযোগে গান করছে, মুখবাদ্য, নাচ, পায়ের আওয়াজ, যেন মহা রাসক্রীড়া চলছে। কোন দিন আবার দেখেন,—বাড়ি ঘর দরজা সব জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে গেছে। আবার দেখেন,—লক্ষ্মীদেবীর মত দিব্য নারীগণ হাতে পদ্মফুল ভূষণাদি নিয়ে উপস্থিত। আবার কোন দিন জ্যোতির্ময় দেবগণকে দেখেন, হঠাৎ কোথায় তাঁরা মিলিয়ে গেলেন। শচীমাতা যা দেখছেন তা কিছুই বিচিত্র নয়। বেদাদি শাস্ত্রে বলে,—এ হচ্ছে বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিনী ভাব। অপ্রাকৃত শুদ্ধবাৎসল্য-ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ। শচীদেবী আশীর্বাদ করলে অন্যেও তা দেখতে পায়। এইভাবে বনমালী শ্রীগৌরসুন্দর গূঢ়রূপে নিজের আনন্দে মেতে আছেন প্রভু এভাবে নিজেকে প্রকাশ করা সত্ত্বেও কোন ভক্ত এখনো তাঁকে সঠিক চিনতে পারেন নি।

প্রভুর মত এমন উদ্ধত-স্বভাব নবদ্বীপে আর কেউ নেই। তিনি যখনই যে লীলা করেন তাই অপূর্ব, তার কোন তুলনা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে সখাদের সঙ্গে যুদ্ধলীলা করতেন,—এস কে যুদ্ধ করবে, আমার মত বীর আর কে আছে? তেমনি কামলীলা করতে ইচ্ছা হলে অগণিতা বণিতাকে তিনি জয় করতেন। প্রভু যখন ঐশ্বর্যের ভাবে আবিষ্ট হতেন তখন যাঁর প্রতি অনুকূল দৃষ্টিপাত করতেন তিনিই লোভনীয় ধনসম্পত্তির অধিকারী হতে পারতেন। পরবর্তীকালে এই উদ্ধত গৌরসুন্দর যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন তখন তিনি যে বৈরাগ্য ও ভক্তি প্রকটিত করেছেন তার এক কণাও ত্রিভুবনে দেখা যায় না। প্রভু এইভাবে শ্রেষ্ঠ লীলা প্রকাশ করছেন, তাঁর ভক্তের নিকটে তিনি হার মানেন, পরাজয় স্বীকার করেন।

একদিন প্রভু রাজপথ দিয়ে আসছিলেন, তখন কয়েকজন ছাত্র তাঁর পাশে ছিলেন। পরিধানে আটপৌরে ধুতি, কাঁধে হলদে রঙের গামছা। মুখে পান, অসংখ্য চাঁদের শোভায় মুখমণ্ডল পরিশোভিত। লোকে বলাবলি করে,—ইনিই কি মূর্তিমান মদন? ললাটে উর্ধ্ব তিলক, হাতে গ্রন্থাদি, তাঁর দৃষ্টিতেই যেন মনের সব জ্বালা উপশম হয়। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে চলেছেন। স্বভাবে চঞ্চল। তিনি বাহু দুলিয়ে মনের আনন্দে হেঁটে চলেছেন। পথে হঠাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁকে দেখেই প্রভু নমস্কার করলেন। চিরজীবী হও,বলে আশীর্বাদ করে শ্রীবাস বললেন,—উদ্ধতশিরোমণি, কোথায় যাচ্ছ বল দেখি। কৃষ্ণভজনা না করে কেবল পড়িয়েই দিন কাটিয়ে দিচ্ছ? লোকে পড়ে কেন? কৃষ্ণভক্তি শিক্ষার জন্যে। যদি সেই কৃষ্ণভক্তিতেই মন না দিলে তবে অকারণ পড়ে কি হবে? অনেক পড়া পড়েছ, অনেক সময় নষ্ট করেছ, এবারে কৃষ্ণভজনে মন দাও। এই কথা শুনে মহাপ্রভু হেসে বললেন,—তোমাদের কৃপা থাকলেই হবে।

সেখান থেকে এসে তিনি ছাত্রগণকে নিয়ে গঙ্গাতীরে বসলেন। শিষ্যগণ তাঁকে ঘিরে বসেছেন। সেই অপরূপ শোভা উপমা দিয়েও বুঝান যায় না। নক্ষত্র পরিবেষ্টিত চাঁদের সঙ্গেও তাঁর তুলনা চলে না। কারণ চাঁদের কলঙ্ক আছে, তার কলা ক্ষয়-বৃদ্ধি আছে। প্রভু সর্বদা পরিপূর্ণ এবং তিনি নিষ্কলঙ্ক। তাই চাঁদের তুলনাও দেওয়া গেল না। বৃহস্পতির সঙ্গেও তুলনা চলে না। কারণ বৃহস্পতি কেবলমাত্র দেবগণেরই সহায়। অথচ প্রভু দেব-দৈত্য-দানব সকলের সহায়। কামদেবের সঙ্গেও প্রভুর উপমা চলে না। কামদেব চিত্তে উদিত হলে, কামবেগে চিত্ত চঞ্চল হয়। প্রভু চিত্তে জাগ্রত হলে মায়ার সমস্ত বন্ধন কেটে যায়, চিত্ত পরম নির্মল ও সুপ্রসন্ন হয়। তাই দেখা যাচ্ছে প্রভুর সঙ্গে কোন

উপমাবই যোগ্যতা হয না। কেবল মাত্র একটি উপমাই ঠিক হতে পাবে। শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীতীবে গোপগণেব মধ্যে বসে বিহাব কবছেন। তাঁদেবই নিযে যেন তিনি গঙ্গাতীবে ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হযেছেন। এখানে এ অবস্থায প্রভুব মুখেব দিকে তাকালেই মনে অতি অনির্বচনীয সুখ লাভ কবা যায। প্রভুব অত্যন্ত তেজ লক্ষ্য কবে সকলেই বলাবলি কবছে,—এই তেজ কোনো মানুষেব হতে পাবে না। এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুব অংশ হবে। কেউ বলে,—ব্রাহ্মণ গৌডেব বাজা হবেন, কথা ছিল। এই সেই ব্রাহ্মণ। এঁব সব বাজচক্রবর্তী চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। —এই ভাবে লোকেবা নানা কথা বলছে। প্রভু সমস্ত অধ্যাপকদেব প্রতি কটাক্ষ কবে গঙ্গাতীবে বসে নানাবিধ ব্যাখ্যা কবছেন। হযকে নয কবে, নযকে হয কবে তাবপব তিনি আবাব নতুন ব্যাখ্যা স্থাপন কবেন। প্রভু বলেন,—আমাব সঙ্গে বিচাব কবতে পাবলে তবেই আমি তাঁকে পণ্ডিত বলে গণ্য কবব, নতবা নয। আমাব সামনে সিদ্ধান্ত কবতে পাবে এমন শক্তি কাব আছে? এই ভাবে ভগবান অহঙ্কাব ব্যক্ত কবছেন। তা শুনে সকলেবই সব গর্ব চর্ণ হযে যায।

এখন প্রভুব প্রচুব ছাত্র। তাবা দলবেঁধে নানা জাযগায পড়ে। বোজই দশবিশ জন ব্রাহ্মণপুত্র এসে প্রভুকে প্রণাম জানিযে তাঁব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবে এবং আবেদন কবে,—আমবা তোমাব কাছে পডব। দযা কবে তুমি আমাদেব শিক্ষা দাও। প্রভু হেসে বাজি হযে যান। এভাবেই বোজ ছাত্রসংখ্যা কেবল বেড়েই যাচ্ছে। স্বযং ভগবান গঙ্গাতীবে শিষ্যগণকে নিযে গোলাকাব হযে বসেছেন। ভাগ্যবান লোকেবা তা দেখে চোখ জুড়াচ্ছেন। প্রভুব প্রভাবে, এখন নবদ্বীপে কোন দুঃখ কষ্ট নেই। সেই আনন্দেব কথা বলাও সৌভাগ্যেব বিষয। কপালগুণে সে আনন্দ দেখলেও সংসাববন্ধন কেটে যায। শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুব বৈষ্ণবোচিত দৈন্য প্রকাশ কবে আক্ষেপ জানাচ্ছেন যে, তখন তিনি জন্মগ্রহণ কবেন নি বলে সেই আনন্দজনক দৃশ্য দর্শন কবতে পাবলেন না। তথাপি যেন গৌবচন্দ্রেব কৃপায তিনি জন্মজন্ম সেই লীলা স্মবণ কবতে পাবেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পার্ষদগণকে নিযে যেখানে লীলা কববেন সেখানে যেন তিনি ভৃত্য হযে উপস্থিত থাকতে পাবেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দচন্দ্রেব নিকট তাব এই প্রার্থনা।

১/৯ দ্বিজকুলপ্রদীপ গৌবচন্দ্রেব জয। ভক্তগণেব চিত্তেব আনন্দস্বরূপ গৌবচন্দ্রেব জয। দ্বাবপাল গোবিন্দেব কর্তা সকলেব প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত কব। অধ্যাপকশিবোমণি শ্রীচৈতন্য এবং ভক্তসমাজেব জয।

ভগবান শ্রীগৌবাঙ্গ সকলেব বিদ্যাব অহঙ্কাব নাশ কবে নবদ্বীপে বসবাস কবছেন। যদিও নবদ্বীপে অসংখ্য শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপকবৃন্দ বযেছেন, তাবা নিজেদেব মধ্যে বলাবলি কবেন, প্রভু তাঁদেব নিন্দা কবেন, তবু তাব সামনে কেউ সে কথা তুলতে সাহস কবেন না। প্রভুকে দেখে সকলেই বিনত হযে যান। প্রভু যদি কাউকে ডেকে কথা বলেন তাহলে সেই পণ্ডিত প্রভুব অত্যন্ত ভক্ত হযে পডেন। নবদ্বীপেব সকলেই প্রভুব শিশুকাল থেকে পাণ্ডিত্য বিষযে জানেন। সকলেই মনে মনে জানেন যে প্রভুব কথাব উত্তব দেওযা অসম্ভব। প্রভুকে দেখে ভযেই সবাই তাঁকে মান্য কবেন। তথাপি মাযাবশে তাঁব স্বরূপ কেউ ধবতে পাবছেন না। তিনি নিজে ধবা না দিলে কেউ তাঁকে জানতে পাবে না। তিনি নিজমাযাতে নবদ্বীপেব সকলকে মোহিত কবে বিদ্যাবসেব লীলা কবে যাচ্ছেন।

এমন সময সেখানে এক অতি অহঙ্কাবী দিগ্বিজযী পণ্ডিত এসে উপস্থিত হলেন।

তিনি সরস্বতীর একান্ত উপাসক, মন্ত্র জপ করেই সরস্বতীকে বশ করেছেন। দেবী সরস্বতী হচ্ছেন বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিনী, তিনি আবার বিষ্ণুবক্ষস্থিতা, এই জগৎমাতা সরস্বতীই মূর্তিভেদে হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী। ব্রাহ্মণের ভাগ্যবশে তাঁর প্রত্যক্ষ হয়ে তাঁকে তিনি দিগ্বিজয়ীর বর দিয়েছেন। যাঁর দৃষ্টিপাতে বিষ্ণুভক্তি লাভ করা যায় তাঁর কাছে দিগ্বিজয়ী-বর তুচ্ছ মাত্র। ব্রাহ্মণ সরস্বতীর বর পেয়ে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে জয় করে বেড়াচ্ছেন। সমস্ত্র শাস্ত্রই তাঁর কণ্ঠস্থ, তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেবার মত লোক নেই। তাঁর প্রশ্নই কেউ বুঝতে পারে না, উত্তর দেবে কি? তাই তিনি দ্বিগ্বিজয়ী হয়ে সর্বত্র ঘুরছেন। তিনি নবদ্বীপের অসংখ্য পণ্ডিতের কথা শুনে, নবদ্বীপের মহিমা জেনে, বহু হাতি ঘোড়া নিয়ে বহু সভায় জয়লাভ করে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রতি ঘরে, প্রতি পণ্ডিত-সভায় এই কথা ছড়িয়ে পড়েছে যে নবদ্বীপে একজন দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছেন। তিনি বহু রাজ্য বহু দেশ জয় করে বহু মানপত্র নিয়ে এসেছেন। সরস্বতীর বরপুত্র—এই কথা শুনে পণ্ডিতগণ খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। সর্বভারতে নবদ্বীপের খ্যাতি আছে। পণ্ডিত যদি সেই নবদ্বীপকে জয় করে যান তাহলে নবদ্বীপের নিন্দা হবে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পেরেই বা উঠবে কে? সরস্বতী স্বয়ং তাঁকে বর দিয়েছেন। সরস্বতী নিজে তাঁর জিহ্বায় থেকে তাঁকে কথা বলান, মানুষ তাঁর সঙ্গে পেরে উঠবে কি করে? শতশত বড় বড় পণ্ডিত সব কাজকর্ম ফেলে রেখে এখন কেবল এই কথাই চিন্তা করছেন। সবাই বলাবলি করছেন, এইবারে বোঝা যাবে কার কত দূর বিদ্যা। ছাত্রগণ এসে তাঁদের শিক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গকে এসব কথা বলল,—এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছেন, তিনি সরস্বতীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তিনি সব জায়গা থেকেই জয়পত্র নিয়ে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে অনেক লোকজন, হাতি ঘোড়া দোলা,—এই সব নিয়ে তিনি এখন নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছেন। নবদ্বীপে বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে বিচার করতে চাইছেন। তা না হলে তাঁকে জয়পত্র লিখে দিতে হবে। শ্রীগৌরাঙ্গ ছাত্রদের কাছে এই খবর শুনে হেসে হেসে মূল কথাটি বলতে লাগলেন,—ভগবান কখনো অহঙ্কার সহ্য করেন না। কোন গুণের জন্য মানুষ অহঙ্কার করলে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ফলবান গাছের আর গুণবান লোকের নম্রতাই স্বাভাবিক লক্ষণ। সকলেরই জানা আছে যে হৈহয়, নহুষ, বেণ, নরক, রাবণ মহাপরাক্রমশালী ছিল। তাদের সকলেরই গর্ব চূর্ণ হয়েছিল। ঈশ্বর কখনো অহঙ্কার সহ্য করেন না। তোমরা দেখতে পাবে, পণ্ডিতের সব অহঙ্কার নবদ্বীপেই চূর্ণ হয়ে যাবে। এই সব কথা আলোচনা করতে করতে প্রভু সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরেই বসলেন ছাত্রদের নিয়ে। সেখানে বসে নানাবিধ ধর্মকথা শাস্ত্রকথা আলোচনা করছেন। কাউকেও কিছু না বলে তিনি মনে মনে ভাবছেন কি করে দিগ্‌বিজয়ীর গর্ব চূর্ণ করবেন। এই ব্রাহ্মণের মনে ভারি অহঙ্কার এসেছে যে তাঁর মত পণ্ডিত জগতে আর কেউ নেই। এঁকে যদি সভা করে পরাজিত করা যায় তাহলে তা এঁর পক্ষে মৃত্যুতুল্য হবে। পরাজিত বিপ্রকে সকলে ধিক্কার জানাবে। তার ধনদৌলতও হয়তো লুঠপাঠ করে নিয়ে যাবে। শোকে পণ্ডিত মারা যাবে। নির্জন স্থানে তাঁকে জয় করতে হবে। তাহলে তিনি দুঃখও পাবেন না, অথচ অহঙ্কারও কেটে যাবে। ভগবান গৌরচন্দ্র এই রকম চিন্তা করছিলেন তখনই সেই রাত্রে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

পূর্ণিমার রাত্রিতে ভাগীরথী অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। গোরাচাঁদ বাহু তুলে হরি বলে করুণ স্বরে জগৎবাসীকে আকর্ষণ করলেন। শিষ্যগণের সঙ্গে গঙ্গাতীরে তাঁকে অপূর্ব

মনোহর রূপে দেখা গেল। মুখে সর্বদা হাসি, চোখে দিব্যদৃষ্টি, দন্তপংক্তির কাছে মুক্তাও পরাজিত, অরুণ অধর , সুন্দর মস্তকে চাঁচর কেশ, সিংহের মত গ্রীবা, হাতির মত কাঁধ, বিলক্ষণ বেশ, প্রকাণ্ড দেহ, সুন্দর হৃদয়। উপবীতটি যেন শেষনাগের অভ্যুদয়। কপালে ঊর্ধ্ব তিলক, জানু পর্যন্ত লম্বমান হাত, যোগপট্টভাবে ধুতি বাঁধা আছে। বাম উরুর উপরে ডান-পা রেখে বসে তিনি শাস্ত্র-ব্যাখ্যার মাধ্যমে হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করে চলেছেন। ছাত্রগণ সকলে তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আছেন। দিগ্বিজয়ী তাঁকে দেখেই ভাবলেন যে এই হয়তো নিমাই পণ্ডিত হবে। তাঁর আগমণ তখনও কেউ লক্ষ্য করে নি। তিনি দূর থেকেই একদৃষ্টে প্রভুর সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন,—ইনি কে ? ছাত্র বললে,—ইনিই নিমাই পণ্ডিত। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তখন গঙ্গাকে প্রণাম জানিয়ে নিমাইয়ের সভাতে চলে এলেন। প্রভু তাঁকে দেখে সাদরে বসতে বললেন। সাধারণত দিগ্বিজয়ী খুবই নির্ভীক তবু প্রভুকে দেখে তাঁর কেন যেন ভয় হল। যেমন বিপক্ষের হাতে লাঠি দেখলে মানুষ সরে পড়তে চায় তেমনি ঈশ্বর-স্বভাব-শক্তির ফলেই পণ্ডিত আর অগ্রসর হতে চাইলেন না। দুচার কথা বলে প্রাথমিক আলাপ সেরে প্রভু পণ্ডিতকে বললেন,—তোমার অসীম পাণ্ডিত্য, তুমি সব কিছুই বর্ণনা করতে পার। গঙ্গার মহিমা কিছু বর্ণনা কর, শুনে আমরা সকলে পুণ্য সঞ্চয় করি। প্রভুর কথায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তখনই বর্ণনা করতে আরম্ভ করে দিলেন। তিনি এমনই দ্রুত বর্ণনা করতে লাগলেন যে মনে হচ্ছে যেন কবিত্বের গাম্ভীর্য মেঘের গর্জনের মত শোনাচ্ছে। জিহ্বায় সরস্বতী বসে আছেন। তিনি যা বলছেন তাই অত্যন্ত প্রামাণিক বলে গণ্য হচ্ছে। এমন বিদ্বান লোক খুব কমই আছে যে তা বুঝে আবার তার ভুল ধরবে। প্রভুর অসংখ্য ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শুনে তাঁদের সকলেরই বাক্‌রোধ হয়ে গেল। তাঁরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে বললেন,—মানুষের মুখ দিয়ে এমন স্ফুরণ অসম্ভব। অলঙ্কার শাস্ত্রের যত অদ্ভুত উপমা সবই ইনি কবিতায় ব্যবহার করেছেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন, অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের পক্ষেও তা বুঝতে পারা কঠিন হয়ে উঠবে। এক প্রহর কাল এইভাবে অনর্গল শ্লোক আবৃ করেও তিনি যেন থামতে চাইছেন না।

তাঁর বর্ণনা শেষ হলে প্রভু বললেন,—তুমি কোন শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করেছ তা না বলে দিলে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তুমি নিজেই কিছু ব্যাখ্যা করে শোনাও, তুমি যা বলবে তাকেই প্রমাণ বলে ধরতে হবে। প্রভুর সুন্দর কথা শুনে পণ্ডিত ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তিনি শুরু করতেই প্রভু তার মধ্যে তিনটি ভুল ধরলেন। শুরুতে, মাঝখানে এবং শেষ দিকে। প্রভু বললেন,—এসব শব্দ-অলঙ্কার ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-শাস্ত্র অনুসারে শুদ্ধ নয়। তুমি কি ভেবে কি ব্যবহার করেছ তা যদি একটু বুঝিয়ে বল তাহলে ভাল হয়। সরস্বতীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত এত বড় পণ্ডিত কিন্তু আর কোন কথা বলতে পারছেন না। নানা ভাবে কথা ঘোরাচ্ছেন কিন্তু কিছু প্রমাণিত করতে পারছেন না। তিনি যা বলছেন তাতেই নিমাই পণ্ডিত ভুল ধরছেন। পণ্ডিত বড়ই মুষড়ে পড়লেন। ভাবলেন,—এ আমার কি হল। তখন প্রভু বললেন,—বিচার ছেড়ে দিয়ে বরং আরো কিছু শ্লোক শোনাও। কিন্তু তাঁর যেন আর পড়বার শক্তিও নেই। প্রভুর সামনে যে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়বেন তাতে আর বিচিত্র কি, স্বয়ং বেদ পর্যন্ত যাঁকে দেখে মোহিত তিনিই যে সম্মুখে উপস্থিত। অনন্তদেব, ব্রহ্মা, শিবের পর্যন্ত যাঁর সাক্ষাতে মোহ উপস্থিত হয় তাঁর সামনে যে দিগ্বিজয়ী

পণ্ডিত মোহপ্রাপ্ত হবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যোগমায়ার ছায়াতেই ব্রহ্মাণ্ড মোহিত হয়। তাঁরা নিজেরাও তাঁর সামনে মোহপ্রাপ্ত হন তাই তাঁরা সর্বদা তাঁর পেছনেই থাকেন। বেদ-বিভাগ-কর্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পর্যন্ত যাঁর সামনে এলে মোহিত হন, তাঁর সামনে যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মোহিত হবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? মানুষের পক্ষে এ অসম্ভব, তিনি পরব্রহ্ম বলেই তাঁর কাজও তেমনি মহত্তম, অনূর্ধ্ব এবং অসম। ভগবান যা কিছু করেন তা কেবল মাত্র দুঃখিত জীবকে উদ্ধাবেব জন্যই। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাভব জেনে নিমাইর ছাত্ররা উপহাস করে উঠলে প্রভু তাদের বারণ করে পণ্ডিতকে বললেন,—আজ ঘবে চলে যাও, কাল আবাব সবাই মিলে এসে আলাপ করা যাবে। আজ অনেক শ্লোক পড়ে তোমারও শ্রান্তি হয়েছে, তাছাডা রাতও বেড়ে গেছে, আজ গিয়ে শুয়ে পড। প্রভুর এমনি বিনয ব্যবহার তাঁব কাছে হেরে গিয়েও কেউ কিন্তু মনে দুঃখ পায় না। নবদ্বীপের সমস্ত অধ্যাপকগণকেও প্রভু পরাজিত করলেও তাঁদেব প্রতি সম্মান দেখাতে কার্পণ্য কবেন না। —আজ চল ঘরে গিয়ে বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখা যাক কাল কি নিয়ে আবার আলাপ হবে। প্রভু জয়লাভ করেও এভাবে তাঁর সম্মান রক্ষা করে চলেন। তাই নবদ্বীপেব পণ্ডিতসমাজ প্রভুর প্রতি খুশি আছেন। প্রভু ছাত্রদের নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন কিন্তু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেব মনে বড় লজ্জা। তিনি দুঃখিত হযে মনে মনে ভাবছেন,—সরস্বতী নিজে আমাকে বর দান করেছেন। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা-দর্শন, বৈশেষিক, বেদান্ত সর্ববিষয়ে যত নিপুণ পণ্ডিত রয়েছেন, তাঁরা কেউ আমাকে হারাবে কি, আমার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতেই ভয পায়। কিন্তু নিমাইপণ্ডিত ছোট ছেলেদেব ব্যাকবণ পড়ায, আমাকে হারিযে দিল? ঈশ্ববের কি খেলা! আমাব মনে আজ বডই সন্দেহ উপস্থিত হযেছে যে—সবস্বতীব আশীর্বাদও কি তাহলে বৃথা হয? হয়তো বাগ্দেবীর কাছে আমাব কোন অপবাধ হযেছে তাই আমাব প্রতিভা সঙ্কোচিত হয়ে পড়েছে। কেন এমন হল তা আজ আমাকে জানতেই হবে।

এই বলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রজপে বসে গেলেন। বিপ্র দুঃখিত মনে শুযে পড়লেন। সবস্বতী স্বপ্নযোগে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হযে ভাগ্যবান ব্রাহ্মণকে অতি গোপনীয় কিছু কথা বললেন,—হে ব্রাহ্মণ, তোমাকে বেদগোপ্য কথা বলছি। একথা কাউকে বললে তোমার আয়ুক্ষয় হবে। যাঁর কাছে তোমার পরাজয ঘটেছে তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেব পতি। আমি তাঁব পাদপদ্মের নিত্যদাসী। আমি নিজেও তাঁব সামনে যেতে লজ্জা পাই। ভাগবতে নারদকে ব্রহ্মা বলেছেন,—যে ভগবান বাসুদেবের নযনপথে অবস্থান করতেও মাযা লজ্জা পান সেই মায়াদ্বারা বিশেষভাবে মোহপ্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধিহীন লোকেবা মনে কবে—এটা আমার, ঐ আমি ইত্যাদি অহঙ্কারের কথা বলে থাকে। আমি ব্রহ্মা—সেই ভগবান বাসুদেবকে প্রণাম জানাই। —হে ব্রাহ্মণ, তোমার জিহ্বায় বসে তো আমি কথা বলি। তাঁর সম্মুখে আমারই মুখে কথা সরে না। আর আমার কথাই বা কি বলব, এমন যে ভগবান শেষদেব—সহস্রজিহ্বায় তিনি বেদ ব্যাখ্যা করেন। অজ-ভব-আদি তাঁর উপাসনা করেন, তিনিই এঁর সামনে এলে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নিত্য শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ হয়ে সকলের হৃদযে অধিষ্ঠান করেন। ভক্তি জ্ঞান বিদ্যা শুভ অশুভ ইত্যাদি যত দৃশ্য এবং অদৃশ্য আছে—এ সবই যাঁর সাক্ষাতে লয় প্রাপ্ত হয় সেই প্রভুকেই তুমি সামনে সাক্ষাৎ দেখেছ। ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্যন্ত যাঁর আজ্ঞায সুখ-দুঃখ ভোগ করেন,

সব কিছুরই কারণ ইনি। মৎস্য-কূর্ম প্রমুখ অবতারাদিও ইনি ধারণ করেছেন। ইনিই বরাহ হয়ে পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন। ইনিই নৃসিংহরূপে প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছেন। ইনিই বামন হয়ে বলিকে জীবন দান করেছেন। এঁর পদনখ থেকেই গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে। ইনিই অযোধ্যায় অবতীর্ণ হয়ে অশেষ লীলায় রাবণকে বধ করেছেন। ইনি বসুদেব এবং নন্দ মহারাজের পুত্র। এবারে তিনি বামুনের ছেলে হয়ে লেখাপড়ায় মজেছেন। বেদপাঠ করেও তাঁর অবতার সম্বন্ধে সম্যক জানা যায় না, তিনি কৃপা করে জানালেই জানা যায়। তুমি আমার যত মন্ত্র জপ করেছ, তোমার দিগ্বিজয়ী হওয়া তার মুখ্য ফল নয়। আমার মন্ত্র জপের মুখ্য ফল হচ্ছে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথের সাক্ষাৎ পাওয়া, তা তুমি পেয়েছ। আর সময় নষ্ট না করে তুমি এখন গিয়ে তাঁর চরণে তোমার দেহ সমর্পণ কর। তুমি আমার কথাগুলোকে স্বপ্ন বলে মনে না করে বরং মন্ত্রজপের ফলে বেদগোপ্য তত্ত্ব জানতে পেলে বলে মানবে।—এই কথা বলে দেবী সরস্বতী অন্তর্ধান করলেন, ভাগ্যবান দিগ্বিজয়ী জেগে উঠলেন।

জেগেই সেই ঊষাকালে তিনি প্রভুর কাছে চললেন। প্রভুকে দণ্ডবৎ করতেই প্রভু তাঁকে কোলে করে তুললেন এবং বললেন,—তুমি এসব কি করছ? দিগ্বিজয়ী বললেন,—এ তোমার কৃপাদৃষ্টিরই ফল। প্রভু বললেন,—তুমি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়ে এসব কি করছ? দিগ্বিজয়ী বললেন,—তোমাকে ভজনা করলেই সমস্ত কাজ সিদ্ধ হয়। কলিযুগে বিপ্ররূপে তুমিই মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকে আর ক'জনেই বা চিনতে পারে? তুমি জিজ্ঞাসা করছ অথচ আমি উত্তব দিতে পাবছি না, তখনই আমাব সন্দেহ হযেছিল। বেদের কথা হচ্ছে ভগবান গর্বশূন্য এবং সর্বেশ্বর, তা আজ আমাব কাছে সত্য বলে প্রমাণিত হল। তুমি আমাকে তিনবার পবাস্ত করেও আমার গৌবব হানি করনি। এতো ঈশ্বরশক্তি ছাড়া হয না, তাই বুঝলাম তুমি নিশ্চয নারাযণ। গৌড়, ত্রিহুত, দিল্লী, কাশী, গুজরাট, তৈলাঙ্গ, বিজযনগর, কাঞ্চীপুরম্, ওড়িষ্যা—সমস্ত পণ্ডিতসমাজে আমার কথা অনেকে বুঝতেই পারে নি, ভুল ধববে কি? সেই আমিই তোমার কাছে এসে কোন সিদ্ধান্ত তো করতে পারলামই না, এমনকি আমার সব বুদ্ধি যেন লোপ পেয়ে গেল। অবশ্য, এ আর এমন কিছু আশ্চর্ব নয়। কারণ সরস্বতী নিজেই বললেন, তুমি তাঁর পতি। বড়ই শুভ লগ্নে নবদ্বীপে এসেছিলাম, তাই সংসারকূপে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তোমার দর্শন পেলাম। অবিদ্যা-বাসনার মোহে আবদ্ধ হয়ে মূল তত্ত্ব ভুলে, নিজেকেই বঞ্চিত করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দৈবাৎ ভাগ্যবশে তোমাব দর্শন পেয়েছি, এখন আমার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমাকে উদ্ধার কর। অন্যের কল্যাণ করাই তোমার স্বভাব। তোমাকে ছেড়ে আর কার আশ্রয় নেব? আমাকে দযা করে এখন উপদেশ দান কর যাতে আর কখনো মনে কোনো দুর্বাসনা না জাগে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অত্যন্ত নম্র হয়ে অনেক দৈন্যোক্তি করে তাঁর স্তুতি করলেন। তার উত্তরে শ্রীগৌরসুন্দর বললেন,—তুমি তো অতীব ভাগ্যবান লোক। তোমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতীর বসতি। দিগ্বিজয় করা বিদ্যার কাজ নয়, মহাত্মাদের উপদেশ হচ্ছে ঈশ্বরকে ভজনা করা। চিন্তা করে দেখ,সম্পত্তি, ব্যক্তিত্ব কিছুই মৃত্যুর পরে আর থাকে না। তাই মহাপুরুষগণ সব কিছু ত্যাগ করে অচলা ভক্তিতে ঈশ্বরচিন্তা করেন। তাই বলছি, আর বৃথা সময নষ্ট না করে সব ছেড়েছুড়ে শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজনা কর। যতদিন দেহ আছে কেবল নিষ্ঠা নিয়ে কৃষ্ণকে আবাধনা কর। কৃষ্ণপাদপদ্মে মন গেলেই বুঝব যে সত্যিকারের বিদ্যার ফল ফলেছে। এই তোমাকে মহা উপদেশ দিলাম,

অনন্ত সংসারে একমাত্র বিষ্ণুভক্তিই সত্য।—এই বলে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হয়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীভগবানের আলিঙ্গন লাভ করে পণ্ডিতের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হল। প্রভু বললেন,—সমস্ত অহঙ্কার ত্যাগ করে দিয়ে সকল প্রাণীতে দয়া কর এবং শ্রীকৃষ্ণ ভজনা কর। দেবী সরস্বতী তোমাকে যা বলেছেন তা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করবে না। বেদগোপ্য কথা বললে পরমায়ু ক্ষয় হয়, পরলোকে ক্ষতি হয়। প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে ব্রাহ্মণ তাকে পুনঃপুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করে জীবন সার্থক করে চললেন। প্রভুর উপদেশে ব্রাহ্মণের ভক্তি বৈরাগ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ হল। তাঁর দিগ্বিজয়ী দম্ভ চলে গিয়ে তিনি তৃণের চেয়েও নম্র হলেন। তাঁর সঙ্গের হাতি ঘোড়া, দোলা, ধনদৌলত সবই লোকেদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন এবং তিনি নিঃস্ব হয়ে চললেন। এই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা। তাঁর কৃপা পেলে মানুষ রাজ্যপদ ছেড়ে ভিক্ষুকের কাজ করে। কলিযুগে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দবীরখাস, রাজসুখ ত্যাগ করে তিনি বনবাসী হয়েছিলেন। যে ধনসম্পত্তি পাবার জন্য সাধারণ মানুষ লালায়িত, ভক্ত তা পেয়েও অনায়াসে পরিত্যাগ করেন। ভক্তির তাৎপর্য না জানা পর্যন্তই কেবল মানুষ রাজ্যাদি পদকে সুখ বলে মনে করে। রাজ্যপাঠের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, মোক্ষলাভকেও ভক্ত তুচ্ছ জ্ঞান করেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া কিছুই হয় না, তাই শাস্ত্রের উপদেশ হচ্ছে,—ঈশ্বর ভজনা কর।

শ্রীগৌরসুন্দরের অমৃতবাণীতে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের চোখ খুলে গেল। নদীয়ার সমস্ত লোকেরা জেনে গেল যে নিমাই দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করেছেন। তারা সবাই আশ্চর্য হয়ে বলল,—নিমাই পণ্ডিত বড় বিদ্বান, তাঁর কাছে দিগ্বিজয়ী হেরে গেছেন, এত বড় পণ্ডিতের কথা বড় একটা শোনা যায় না। নিমাই পণ্ডিত একেবারে অমূলক গর্ব করেন না, এখন তো সত্যি তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কেউ বলে,—নিমাই পণ্ডিত যদি ন্যায় মীমাংসাদি শাস্ত্র পড়ে ভট্টাচার্য হন তাহলে তিনি সঠিক বিধান দিতে পারবেন। কেউ বলেন,—সকল পণ্ডিতে মিলে তাঁকে প্রতিবাদীর প্রতি সিংহপরাক্রমের স্বীকৃতি রূপে 'বাদিসিংহ' উপাধি দেওয়া দরকার। প্রভুর মায়ার এমনই অদ্ভুত প্রভাব যে তাঁর সব অলৌকিক কাণ্ড দেখেও তাঁর স্বরূপতত্ত্ব কেউ জানতে পারলেন না। সকলেই প্রভুকে কেবল একজন অসাধারণ পণ্ডিত মাত্রই মনে করলেন। নবদ্বীপের লোকেরা সকলেই তাঁদের নিজের নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে প্রভুর সৎকীর্তি কথা আলোচনা করতে লাগলেন। নবদ্বীপবাসীগণের চরণে প্রণাম জানাই। কারণ, তাঁরা এসব লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এই দিগ্বিজয়ী-বিজয়েব কাহিনী শুনলে তার আর কোথাও পরাজিত হবার ভয় থাকে না। তাঁর এই অতি মনোহর বিদ্যারসের বিষয় শুনেও তাঁর সেবক হওয়া যায়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মের গুণকীর্তন করছেন শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর।

১/১০ শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রিয় নিত্য-কলেবর শ্রীগৌরসুন্দরের জয়। শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের জীবনের জীবন, শ্রীপরমানন্দ পুরীর প্রাণধন, সর্ববৈষ্ণবের ধন-প্রাণ-মন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপাদৃষ্টি দ্বারা সর্বজীবের ত্রাণ কর।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ডে এই কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্ররূপে বিহার করছেন। শিষ্যদের সঙ্গে প্রভু বিদ্যারসে মগ্ন হয়ে আছেন। তিনি নবদ্বীপের প্রতি মহল্লায় শিষ্যগণের সঙ্গে বিদ্যাচর্চা করে চলেছেন। নবদ্বীপের সকল লোকের মুখেই এখন কেবল এক কথা,—নিমাই পণ্ডিত সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক হয়েছেন। বড় বড় বিজয়ীগণও

দোলা থেকে নেমে তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানান। নবদ্বীপের সকলেই এখন প্রভুর বশ, তাঁকে দেখে সবাই ভয় পান। যে কোন পূজা-পার্বণ উপলক্ষেই নবদ্বীপের লোকেরা প্রভুর বাড়িতে বস্ত্র এবং ভোজ্যদ্রব্যাদি পাঠান। প্রভুর তো হাত-খোলা, তিনি সেসব গরীবদুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। গরীব-দুঃখী দেখলেই প্রভু দয়া করে তাদের খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড় এবং টাকা-কড়ি দিযে দেন। প্রভুর ঘরে সব সময়েই অতিথি আসে। প্রভু সকলকেই যোগ্যমত দান করেন।

কোন দিন দশ-বিশ জন সন্ন্যাসী এলে প্রভু আনন্দিত মনে তাঁদেব আমন্ত্রণ জানান। এবং তখনই জননীকে বলে পাঠান যে কয়েক জন সন্ন্যাসীর জন্য তাডাতাডি ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে। শচীমাতা ভাবেন, ঘরে তো কিছুই নেই, কুড়িজন সন্ন্যাসীর ভোজন কি করে হবে? কেউ জানতেও পারে না, তিনি এই রকম চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গেই একজন এসে সমস্ত জিনিসপত্র দিযে যায। তখন প্রভ্র গৃহিনী লক্ষ্মীদেবী গিযে রাঁধতে বসেন। রান্না হলে প্রভু সন্ন্যাসীগণকে বসিয়ে সন্তুষ্ট করে ভোজন করান। এই ভাবেই যত অতিথি আসে সকলকেই প্রভু আপ্যাযন করেন। এই ভাবেই প্রভু গৃহস্থদেব শিক্ষা দেন, অতিথিসেবা গৃহস্থের পরম ধর্ম। গৃহস্থ হযে যে অতিথি-সেবা করে না সে পশুপক্ষীর চেয়েও অধম। পূর্বকর্মফলে দরিদ্র হলেও মানুষেব উচিত হচ্ছে অতিথিকে অন্তত শাক-জল দিযেও সেবা কবা। মনুসংহিতায় আছে,—বসবার জন্য তৃণাসন, বিশ্রামের জন্য একটু জাযগা, খাবার জল এবং চতুর্থ হচ্ছে প্রিয়বাক্য,—সৎলোকের ঘরে এসবের কখনো অভাব হয না। নিজেব অবস্থা জানিযে সত্য কথা বলেও অতিথিকে সমাদব করা যায। অকপট ভাবে আনন্দিত মনে যথাশক্তি সেবা কবলেই সত্যিকাবেব 'অতিথি-ভক্তি' হয। বিশ্বম্ভব নিজেই অতিথিদের পরম আদরে জিজ্ঞাসা করেন কাব কি প্রযোজন। সেই সকল ভিক্ষুকদের পরম ভাগ্যও বলতে হয, কাবণ মলনারাযণ শ্রীগৌবাঙ্গ এবং তাঁব কান্তাশক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিযা দেবী তাদেব অন্নদান কবছেন। যাঁব হাতে অন্ন পাবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্বদা কামনা কবেন সেই অন্ন আজ যে-সে খাচ্ছে। কেউ কেউ আবার এবিষযে অন্য কথাও বলেন। তাঁরা বলেন— এ অন্নেব যোগ্য যে-সে নয। লক্ষ্মীনারাযণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন জেনে ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নাবদ প্রমুখ প্রণম্যগণ ভিক্ষুকেব রূপ ধারণ করে তা গ্রহণ করতে এসেছেন। অন্যেব সেখানে যাবার কি শক্তি আছে? ব্রহ্মা আদি দেবগণ ছাডা অন্যেরা কি সেই অন্ন পাবার যোগ্য নাকি? কেউ বলেন,—দুঃখী লোকদের উদ্ধারের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হযেছেন। তাই দুঃখীদেরই তিনি উদ্ধার করছেন। ব্রহ্মাদি দেবতা তো প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ, তাঁরা প্রভুর নিত্যসঙ্গী। তবু এর গূঢ রহস্য হচ্ছে, এই অবতারে প্রভু ব্রহ্মাদিবও দুর্লভ বস্তু নির্বিচাবে সকল জীবকে দেবার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন। তাই তিনি নিজগৃহে দুঃখিত জনকে ডেকে অন্নদান করছেন। লক্ষ্মীদেবী একাই রান্না করছেন কিন্তু তবু তিনি মহা খুশি। লক্ষ্মীপ্রিযার স্বভাবটি দেখে শচীরও মনে খুবই আনন্দ। ভোর থেকে শুরু করে যত ঘরের কাজ লক্ষ্মীদেবী একা হাতেই করেন। ঠাকুর ঘরে আল্পনা দেওয়া, শঙ্খচক্র আঁকা, গন্ধ ধূপ দীপ ফুল, সুবাসিত জল, পূজার সমস্ত উপকরণ তিনিই জোগাড় দেন। সর্বদা নিয়মিত তুলসীর পরিচর্যা করেন, তার চেয়ে বেশি করেন শচীদেবীর যত্ন। স্ত্রীর স্বভাব দেখে বিশ্বম্ভব মুখে কিছু না বললেও মনে মনে খুবই খুশি। কোন কোন দিন লক্ষ্মী প্রভ্র পাদপদ্ম ধারণ করেই কাটিযে দেন। শচীদেবী আশ্চর্য হযে লক্ষ্য কবেন,—ছেলের পাযেব কাছে যেন মহা জ্যোতির্ময অগ্নিপুঞ্জ

জ্বলছে। আবার কখনো তিনি সারা ঘরে পদ্মগন্ধ পান। এভাবেই নবদ্বীপে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজ করছেন,কিন্তু কেউ টের পাচ্ছেন না।

কিছুদিন পরে প্রভুর ইচ্ছে হল, তিনি বঙ্গদেশে যাবেন। তিনি মাকে বললেন যে একটু প্রবাসে যেতে হবে। এই সময় যাতে লক্ষ্মীদেবী মায়ের সেবাযত্ন ভাল করে করেন সেকথাও স্ত্রীকে বললেন। কিছু শিষ্য সঙ্গে নিয়ে তিনি পূর্ববঙ্গে চললেন। যেই প্রভুকে দেখে সে-ই আর চোখ ফেরাতে পারে না। মহিলারা বলেন,—এমন ছেলে যাঁর সেই মায়ের জীবন সার্থক, তাঁকে প্রণাম জানাই। যে এঁকে স্বামীরূপে পেয়েছে তাঁরও স্ত্রীজন্ম ধন্য। যাঁরাই তাঁকে পথে যেতে দেখেন তাঁরা সকলেই তাঁর গুণগান করেন। দেবতারাও যাঁকে দেখতে চান সেই প্রভু কৃপা করে যাকে-তাকে দেখা দিচ্ছেন। এইভাবে গৌরসুন্দর পদ্মাতীরে এলেন। পদ্মা নদীর তরঙ্গ, জলরাশি এবং তীরস্থ বনানী দেখে আকৃষ্ট হযে শিষ্যগণকে নিয়ে তিনি নদীতে স্নান করলেন। ভাগ্যবতী পদ্মানদী সেদিন থেকে সমস্ত জীবকে পবিত্র করার ক্ষমতা লাভ করলেন। পদ্মার আকর্ষণেই যেন তিনি কিছুদিন সেখানে থেকে গেলেন। নবদ্বীপে থাকতে তিনি যেমন ভক্তগণকে নিয়ে গঙ্গায় চান করতেন তেমনি মহা আনন্দে জলক্রীড়া করে সঙ্গীদের নিয়ে রোজ পদ্মানদীতেও চান করছেন। প্রভু পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন, সেই ভাগ্যে পূর্ববঙ্গ আজও গর্বিত। সকলেই তাঁকে পেয়ে মহা আনন্দে মগ্ন হয়েছেন। চারদিকে খবর ছড়িযে পড়ল,—শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত এসেছেন। ভাগ্যবান ব্রাহ্মণগণ উপঢৌকন নিযে তাঁর দর্শনে এলেন। তাঁরা বললেন,—আমাদের খুবই সৌভাগ্য যে তুমি এখানে শুভাগমন করেছ। টাকা-পযসা জোগাড় করে যাঁব কাছে নবদ্বীপে গিয়ে পড়ব তিনি নিজেই এসেছেন, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা। তুমি স্বয়ং বৃহস্পতির অবতার, তোমার তুল্য অধ্যাপক কেউ নেই। বৃহস্পতির সঙ্গে তুলনা করলেও ঠিক হয় না, আমাদের ধারণা, তুমি ঈশ্বরের অংশ। ঈশ্বর ভিন্ন এমন পাণ্ডিত্য অন্য কারো হতে পারে না, আর অপরের জন্য এত ভাবনাই বা কার? আমাদের সকলেরই একটি আবেদন যে তুমি আমাদেব কিছু শিক্ষাদান কর। তোমাব অসাক্ষাতে তোমারই রচিত ব্যাকরণের টীকা আমরা নিজেরাও পড়ি, ছাত্রদেরও পড়াই। এখন তুমি নিজে পড়িয়ে আমাদের সাক্ষাৎ শিষ্য কর। সংসারে তোমার কীর্তি থাকুক। প্রভু সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য কিছুদিন পূর্ববঙ্গে থেকে গেলেন। সেইভাগ্যে আজও পূর্ববঙ্গের লোকেরা নারীপুরুষ নির্বিশেষে শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্তন করে থাকেন। মাঝেমধ্যে অবশ্য কোন পাপী গিয়ে নিজেদের অবতার বলে প্রচার করে। পেট চালাবার ধান্দায় নিজেকে রামের অবতার বলে ঘোষণা করে। কোন কোন পাষণ্ডী কৃষ্ণকীর্তন ছাড়িয়ে নিজেদের গুণগান প্রচার করে। প্রতিদিন যাদের তিন অবস্থা দেখা যায়, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি,—সেই প্রকৃতির উপাদানে গঠিত দেহ যাদের তারা কোন লাজে নিজেদের গুণগান করায়? রাঢ় অঞ্চলে একজন ব্রহ্মদৈত্য আছে, তার অন্তরে রাক্ষসপ্রকৃতি, বাইরে ব্রাহ্মণের সাজ। সে নিজেকে গোপাল বলে পরিচয় দেয় কিন্তু লোকেরা তাকে শেয়াল ছাড়া আর কিছু মনে করে না। শ্রীচৈতন্যকে ছাড়া অন্যকে যে ঈশ্বর বলে তার অধোগতি হবে। তাই প্রাণ খুলে হাত তুলে বলছি, শ্রীচৈতন্যই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ শ্রীহরি। তাঁর নাম নিলে সমস্ত বন্ধন ক্ষয় হয়, তাঁর ভক্তের স্মরণেও সর্বত্র বিজয় লাভ ঘটে। সমস্ত ভুবন যার যশ কীর্তন করছে বিপথে না গিয়ে তাঁরই পাদপদ্ম ভজনা করা উচিত।

বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীগৌরচন্দ্র পূর্ববঙ্গে বিদ্যাদান করে চলেছেন। পদ্মার তীরে প্রভু মহানন্দে বহু লোককে বহু বিদ্যায় পারদর্শী করেছিলেন। যে যেখানেই পড়ুক কিন্তু প্রভুকে পেয়ে তাঁরা হাজারে হাজারে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। নিমাই পণ্ডিতের নাম শুনেই সমস্ত পূর্ববঙ্গের ছাত্ররা তাঁর কাছে পড়বার জন্য এসে ভীড় করতে থাকেন। প্রভুর কৃপাতে তাঁর যথাযোগ্য ব্যাখ্যা শ্রবণ করে তাঁরা সকলেই দুমাসের মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেন। শত শত ছাত্র পদবী লাভ করে গেলেন। তা শুনে আরো বহু ছাত্র এসে ভীড় করলেন। শ্রীভগবান এই ভাবে বিদ্যাদান লীলা করে কিছু দিন পূর্ববঙ্গে অতিবাহিত করলেন।

লক্ষ্মীপ্রিয়া নবদ্বীপে প্রভুর বিরহে মনে দুঃখ নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, কাউকে কিছু বলছেন না। প্রভু পূর্ববঙ্গে যাওয়ার পর থেকেই তিনি শচীমাতার সেবাযত্ন ঠিক মত করছেন কিন্তু নিজের খাওয়া দাওয়ার দিকে তাঁর তেমন নজর নেই। তিনি নামমাত্র আহার করছেন আর প্রভুর বিচ্ছেদে বড় দুঃখিত মনে দিন কাটাচ্ছেন। সারা রাত প্রভুর কথা ভেবে ভেবেই কাটিয়ে দেন। মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। প্রভুর দেহের প্রতিমূর্তি রেখে তিনি সকলের অলক্ষ্যে প্রভুর কাছে চললেন। গঙ্গাতীরে বসে প্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে তিনি অন্তর্ধান করে প্রভুর কাছে চলে গেলেন। শচীদেবী যে শোক পেলেন তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব, সংক্ষেপে কিছু বলা হল। ভক্তরাও শুনে খুব দুঃখ পেলেন, সকলে এসে যথা বিহিত কাজকর্ম সমাধা করলেন।

প্রভু পূর্ববঙ্গে কিছুদিন থেকে বাড়ি ফিরবার কথা ভাবছেন। প্রভু বাড়ি ফিরছেন শুনে যার যেমন সাধ্য সকলেই কিছু কিছু দক্ষিণা দিলেন। সোনা রূপো, জলপাত্র, সুন্দর আসন, রঙীন কম্বল, নানা রকম কাপড়, ভাল ভাল জিনিস যার ঘরে যা ছিল, সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে প্রভুকে দান করলেন। শ্রীগৌরহরিও সকলকে কৃপা করে সেসব দ্রব্যাদি গ্রহণ করলেন। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রভু আনন্দিত মনে বাড়িতে ফিরছেন। প্রভুর সঙ্গে অনেক ছাত্রও চলেছেন। তাঁরা প্রভুর কাছে পড়বেন নবদ্বীপে থেকে।

সমস্ত বিষয়ে সার বস্তুটি গ্রহণ করাই তপন মিশ্রের স্বভাব। জীবের বাস্তব পরমার্থভূত সাধ্যবস্তু কি এবং তার সাধনই বা কি তা তিনি কিছুতেই ঠিক করতে পারছেন না। অথচ পূর্ববঙ্গে তাঁর কাছাকাছি এমন কেউ নেই, যাঁকে তিনি এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। দিনরাত তিনি দীক্ষামন্ত্র জপ করতেন কিন্তু কোন সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করতে পারতেন না। তাই তাঁর মনে শান্তি ছিল না। ভাবতে ভাবতে তিনি একদিন শেষরাত্রে ভাগ্যবশে স্বপ্ন দেখলেন,—সামনে এক দেবমূর্তি উপস্থিত হয়ে তাঁর গুপ্ত লীলাকথা বর্ণনা করছেন,—ব্রাহ্মণ, তুমি মন স্থির কর। নিমাই পণ্ডিতের কাছে যাও, তিনি তোমাকে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবেন। তিনি সামান্য মনুষ্য নন, তিনি নরনারায়ণ। জগৎবাসী জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি নরলীলা স্বীকার করেছেন। বেদগোপ্য এসব কথা তুমি কাউকে বলবে না, বললে জন্ম-জন্মান্তরে কষ্ট পাবে। এই কথা বলে দেবতা চলে গেলেন আর তপন মিশ্র সুস্বপ্ন দেখে কাঁদতে লাগলেন। জেগেই তিনি নিজের সৌভাগ্য মেনে প্রভুর ধ্যান করতে করতে তাঁর কাছে চললেন। শ্রীগৌরসুন্দর শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন। তপন সেখানে এসে সকলের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বললেন,—আমি অতি দীনহীন, কৃপা করে আমার সংসারবন্ধন ছিন্ন করে দাও। বিষয়-সুখে আমার মন বসছে না, কি করে প্রাণে শান্তি পাব, দয়া করে তাই বল।

প্রভু বললেন,—ব্রাহ্মণ, সর্বপ্রকারে তোমার যে শ্রীকৃষ্ণভজনের ইচ্ছা হয়েছে এ

তোমার অত্যন্ত সৌভাগ্যের ফল। ঈশ্বর ভজনের নানাবিধ দুর্গম পথ আছে। যুগের উপযোগী মানুষের চিত্তবৃত্তির অনুকূল সাধনপন্থা ভগবানই নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চার যুগের উপযুক্ত ধর্ম প্রচার করে ভগবান আবার নিজস্থানে চলে যান। গীতায় আছে,—সাধুলোকদের পরিত্রাণের জন্য ও পাপীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি যুগেযুগে জন্মগ্রহণ করি। ভাগবতে,—শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ উপলক্ষে গর্গাচার্য শ্রীনন্দমহারাজকে বলেছিলেন,—তোমার এই পুত্রটি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেহ ধারণ করেন। শাদা, লাল এবং হলুদ—এই তিনটি বর্ণ গত তিনযুগে হয়ে গেছে। এইবারে দ্বাপরে তিনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন।—কলিযুগের ধর্ম হচ্ছে নামসংকীর্তন, চার যুগে মানুষের চার রকম ধর্মকৃত্য। ভাগবত বলেছেন,—সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, ত্রেতাযুগে যজ্ঞে যে ফল হয়, দ্বাপরে পূজার্চনায় যা ফল লাভ করা যায়, কলিযুগে শ্রীহরিকীর্তনে সেই ফলই পাওয়া যায়। শাস্ত্র তাই বলছেন, নামযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। অন্য কিছু দ্বারা পার হওয়া যাবে না। যিনি খেতে-শুতে সর্বদা নাম নেন, শাস্ত্র তাঁর মহিমা গেয়ে শেষ কবতে পারে না। কলিকালে যজ্ঞ-তপস্যা এসব নেই। ভাগ্যবান লোক কেবল কৃষ্ণভজনাই করবে। মনের নানা কুটিল সন্দেহ ত্যাগ করে ঘরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণভজনা কর। হরিনাম সঙ্কীর্তন করলেই সাধ্যসাধন-তত্ত্ব সব পেয়ে যাবে। বৃহৎ নারদীয় পুরাণে আছে,—শ্রীহরিনামই একমাত্র গতি। কলিযুগে আর অন্য কিছুতেই গতি নেই। আর মহামন্ত্র,—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হবে হরে॥—এই শ্লোকটি মহামন্ত্র নাম বলে এতে ষোলটি নাম ও বত্রিশটি অক্ষর আছে,—এই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। এই নাম কীর্তন করতে করতে যখন প্রথম প্রেমভক্তির অঙ্কুর বিকশিত হবে তখনই সাধ্যসাধন-তত্ত্ব সব হৃদযঙ্গম করতে পারবে।

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তপন মিশ্র প্রভুর শ্রীমুখ থেকে এই শিক্ষা লাভ করে তাঁকে বারংবার প্রণাম করতে লাগলেন। তপন মিশ্র বললেন,—আমি তোমাব সঙ্গে যেতে চাই। প্রভু বললেন,—তুমি বরং বারাণসীতে যাও, সেখানেই আমার সঙ্গে তোমাব সাক্ষাৎ হবে। তখন সাধ্যসাধন-তত্ত্ব সব বলা যাবে। —এই বলে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। ব্রাহ্মণের অঙ্গ প্রেমে পুলকিত হয়ে উঠল। ভগবানের আলিঙ্গন লাভ করে তপন মিশ্র পরম আনন্দ লাভ করলেন। প্রভুর বিদায়ের সময়ে তপন তাঁর পায়ে ধরে গোপনে বসে স্বপ্ন বৃত্তান্ত সব বললেন। শুনে প্রভু তপনকে বললেন,—এসব কথা আর কারো কাছে বলা তোমার উচিত হবে না কিন্তু। —প্রভু সুযোগ বুঝে তপনকে বাবে বারে একথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। এইভাবে পূর্ববঙ্গকে ধন্য করে প্রভু ঘরে ফিরলেন।

ব্যবহারিক জগতের অনুকরণে অনেক অর্থ-সম্পদ্ নিয়ে প্রভু সন্ধ্যাকালে এসে বাড়িতে পৌঁছলেন। জননীকে দণ্ডবৎ করে প্রভু তাঁকে সব দিলেন। তারপর শিষ্যগণকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গায় চান করতে গেলেন। শচীমাতা মনে দুঃখ নিয়েই পরিজন সহ রান্না করতে গেলেন। প্রভু শিক্ষাগুরু। তাই সকলকে শিক্ষা দেবার জন্য গঙ্গাকে প্রণাম করে তবে নদীতে নামলেন এবং অনেকক্ষণ গঙ্গায় জলকেলি করে স্নান সেরে ঘরে ফিরলেন। যথাবিধি নিত্যকর্ম সমাপন করে গিয়ে ভোজনে বসলেন। খাওয়ার পর ঠাকুরঘরের সামনে এসে বসলেন। আত্মীয়-স্বজনগণ সকলেই এসে তাঁকে ঘিরে বসলেন। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ বৃত্তান্ত মজা করে বর্ণনা করছিলেন সকলের সঙ্গে। পূর্ববঙ্গের কথার ধরন নিয়ে উপহাস করছিলেন প্রভু, হেসে হেসে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলেন।

প্রভু দুঃখ পাবেন বলে আত্মীয়রা কেউ লক্ষ্মীর অন্তর্ধান সংবাদ দিচ্ছেন না তাঁকে। খানিক পরে আত্মীয় বান্ধবেরা চলে গেলেন। প্রভু বসে পান খেয়ে হাস্য পরিহাস করছেন। শচীমাতা দুঃখিত মনে ঘরের মধ্যে বসে রয়েছেন, ছেলের সামনে আসছেন না। প্রভু নিজেই তখন মায়ের কাছে গেলেন। মায়ের দুঃখিত মুখ দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—মা, তোমার দুঃখিত মুখ কেন? আমি ভাল ভাবে বিদেশ থেকে এলাম, কোথায় তুমি আমাকে আশীর্বাদ করবে, আর তোমার দেখছি ব্যাজার মুখ, কি ব্যাপার বল তো?—ছেলের কথা শুনে শচীমাতা দুঃখে কেঁদে ফেললেন, মুখে কিছুই বলতে পারলেন না। প্রভু বললেন,—মা, তোমার দুঃখের কারণ আমি বুঝতে পেরেছি। আমার মনে হচ্ছে, তোমার বৌমার কোন অমঙ্গল হয়েছে। তখন সকলে বললেন যে নিমাইয়ের স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে। পত্নীর অন্তর্ধানের কথা শুনে প্রভু কিছু সময় মাথা নিচু করে বসে রইলেন। প্রিয়ার বিরহদুঃখ স্বীকার করে সমস্ত বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্ব ভেবে তিনি চুপ করে থাকলেন। লৌকিক দুঃখ প্রকাশ করে তারপরে নিজের চিত্তে ধৈর্য ধারণ করে তিনি স্থির হয়ে থাকলেন। ভাগবত বলছেন,—কে বা পতি, কে বা পুত্র? মোহই এসবের কারণ। প্রভু বলছেন,—মা, দুঃখ করছ কেন? ভবিতব্য যা আছে তা ঘুচবে কি করে? এই রকমই হচ্ছে কালের গতি, কেউ কারো নয়। তাই শাস্ত্রে বলে সংসার অনিত্য। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই দুনিয়া চলছে, তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা কাউকে পাই, কাউকে হারাই। তাই ভগবানের ইচ্ছায় যা হয়েছে তাতে আর দুঃখ করে কোন লাভ নেই। স্বামীর আগে যে স্ত্রী গঙ্গালাভ করে, তাঁর মত ভাগ্যবতী কজন আছে? এই ভাবে প্রভু মাকে বুঝিয়ে আত্মীয়-বান্ধবদের নিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হলেন। প্রভুর মুখের মধুর বাক্য শুনে সকলেরই মনের কষ্ট দূর হয়ে গেল।

ভগবান গৌরহরি বিদ্যাচর্চা নিয়েই ব্যস্ত আছেন। উষায় উঠে সন্ধ্যাবন্দনাদি সেরে তিনি পড়াতে যান। নিত্যপরিকর মুকুন্দ-সঞ্জয়ের পুত্র পুরুষোত্তম দাস। তাঁদের বাড়িতেই রোজ তিনি পড়াতে যান। প্রভু আগে থাকতেই গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসেন, তারপর শিষ্যগণ একে একে আসতে থাকে। কেউ কেউ তাদের মধ্যে হয়তো এক-আধ দিন কপালে তিলক পরেন না ভুল করে। লোকশিক্ষা ও লোক-কল্যাণের জন্য প্রভু বেদবিহিত কোনও কর্মের লঙ্ঘন করেন না। তাই প্রভু তাকে এমন লজ্জা দিয়ে কথা বলেন যে, সে আর কখনো সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে আসে না। প্রভু বলেন, কেন ভাই, তোমার কপালে তিলক দেখছি না কেন? এর কারণটা কি? ব্রাহ্মণের কপালে যদি তিলক না থাকে তবে শাস্ত্রে তাকে শ্মশানতুল্য বলা হয়। বুঝলাম যে আজ তোমার সন্ধ্যা করা হয়নি. তিলক বিনে সন্ধ্যা বিফল। ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা কর, সন্ধ্যা করে আবার এসো।

প্রভুর শিষ্যগণ সকলেই স্বধর্মপরায়ণ। তাই প্রভু বিভিন্ন ছাত্রকে বিভিন্ন প্রকারে শাসন করে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় সহায়তা করতেন। পরস্ত্রীর প্রতি কেউ পরিহাস করত না, প্রভু নারীজাতিকে দেখলেই একপাশ হয়ে সরে যেতেন। বিশেষ করে শ্রীহট্টের লোকের সঙ্গে দেখা হলে স্থানীয় ভাষায় তাদের সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন। শ্রীহট্টের লোকেরা রাগ করে বলতেন, ঠিক আছে, তুমি কোথাকার বল দেখি? তোমার বাবা-মা ইত্যাদি সবারই তো জন্ম শ্রীহট্টে। নিজে শ্রীহট্টের ছেলে, শ্রীহট্টের লোকদের ভাষার অনুকরণ করে ব্যঙ্গবিদ্রূপ কর, এর মানেটা কি? তাঁদের কথায় প্রভু ভ্রূক্ষেপ না করে শ্রীহট্টের ভাষায় তাঁদের ক্ষেপাতেই থাকেন। শ্রীহট্টের লোকটি রাগে ফেটে না পড়া পর্যন্ত

প্রভু বলতেই থাকেন। বিষম রেগে লোকটি হয়ত তাঁকে তেড়ে যান, ধরতে না পেরে প্রচুর তর্জন গর্জন করেন। কেউ হয়তো প্রভুকে ধরে শিকদারের কাছে নিয়ে যায়। রাগ করে কেউ দেওয়ানের আদালতে নেয়। প্রভুর বন্ধুরা এসে মিটমাট করে দেন। প্রভু কোন দিন হয়তো কোন শ্রীহট্টবাসীর বাড়িতে থেকে তার লাউর বাউস ভেঙ্গে দিয়ে পালিয়ে যান। এই ভাবে সকলের সঙ্গেই দুষ্টুমি করেন, কেবলমাত্র মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকান না। সকলেই জানে যে এই অবতারে প্রভু স্ত্রীলোকের নাম কানে পর্যন্ত শুনতে চান না। তাই পরম ভাগবতগণ নদীয়া নাগরী-বল্লভ গৌরাঙ্গ এরকম স্তব পর্যন্ত করেন না। যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে সকল রকমের স্তবই সম্ভব, তথাপি সুধীবৃন্দ তাঁর স্বরূপগতভাব অনুসারেই তাঁর স্তবাদি কীর্তন করে থাকেন।

প্রভু মুকুন্দ- ঞ্জয়ের মন্দিরে নিয়মিত অধ্যাপনা করে চলেছেন। ছাত্রগণ তাঁকে ঘিবে বসেছেন, তিনি মাঝখানে বসে পড়াচ্ছেন। কোন ভক্ত হয়তো তাঁর মাথায বিষ্ণুতেল ঘসে দিচ্ছেন। তিনি নিজের মনে পড়িয়ে যাচ্ছেন। উষাকাল থেকে শুরু করে বেলা দুপুর পর্যন্ত পড়িয়ে তিনি গঙ্গায চান করতে যান। প্রতিদিন মধ্যবাত পর্যন্ত সকলকে পড়াতে থাকেন । তাই প্রভুর কাছে মাত্র এক বছর পড়েই সকলে সমস্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে দক্ষ হয়ে ওঠেন।

পুত্র তো পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত, কিন্তু শচীদেবী সর্বদা ছেলের বিযের কথা ভাবছেন। পুত্রের উপযুক্ত কন্যা নবদ্বীপে পাওযা যায় কিনা এই কথাই শচীদেবীর মনে সবসময়ের চিন্তা। মহাভাগ্যবান দয়ালু শ্রীসনাতন মিশ্র নবদ্বীপে বাস কবতেন। তিনি ছিলেন অকৈতব, পরম উদার, বিষ্ণুভক্ত, পর-উপকারী, অতিথিপরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয এবং কুলীন বংশের লোক। রাজপণ্ডিত রূপে তিনি সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। বৈষয়িক বিষয়েও অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী, সংসারে অনেক লোককে ভরণপোষণ করেন। লক্ষ্মীপ্রতিমাব মত সুন্দব ও সুশীলা একটি কন্যা আছে তাঁর। শচীদেবী তাকে দেখেই ঠিক করলেন, এই কন্যাই তাঁর পুত্রের উপযুক্ত। শিশুকাল থেকেই সে তিনবার গঙ্গাস্নান করে। মাতা পিতা, দেবদ্বিজে পরম ভক্তিমতী। শচীদেবীকেও গঙ্গার ঘাটে দেখে সে রোজই সবিনযে প্রণাম করত। শচীমাতাও খুশি হয়ে তাকে আশীর্বাদ করতেন,—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তুমি যোগ্যপতি লাভ কর। তিনি গঙ্গাস্নানে এসে মনে ভাবতেন, এই মেয়েটি আমার পুত্রবধূ হলে খুব ভাল হয়। রাজপণ্ডিতও সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, তিনি বিশ্বম্ভরকে কন্যাদান করতে চান। অকস্মাৎ শচীদেবীও কাশীনাথ পণ্ডিতকে ডেকে এনে বললেন,—তুমি বলে দেখ, রাজপণ্ডিত আমার ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন কিনা। কাশীনাথ তখনই দুর্গা কৃষ্ণ বলে রাজপণ্ডিতের বাড়ির দিকে বওনা হলেন। কাশীনাথকে দেখেই রাজপণ্ডিত নম্র করে বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি মনে করে? কাশীনাথ বললেন, সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি। বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের সঙ্গে তোমার কন্যার বিয়ে হলে উপযুক্ত কাজ হয়। তোমার পরমা সুন্দরী কন্যার সঙ্গে ঐ রকম দিব্যকান্তি ছেলেটি খুবই মানাবে। আমার মতে নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া কৃষ্ণ-কাত্মণীব মতই পরস্পরের উপযুক্ত। সনাতন মিশ্র কাশীনাথ পণ্ডিতের কথা শুনে স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীযদেব সঙ্গে আলাপ করে দেখলেন। সকলেই বললেন, বেশি ভাবনা চিন্তার দরকার নেই। শীঘ্র কাজে নেমে পড। তখন রাজপণ্ডিত ঘটকঠাকুরকে বললেন যে তিনি এই সম্বন্ধে রাজি আছেন। আর জানালেন, —আমার পূর্বপুরুষের আশীর্বাদেই এমন সম্বন্ধ পাওয়া গেছে। তুমি গিয়ে সব কথা ঠিক কর। আমার

কথার অন্যথা হবে না, জানবে। কাশীনাথ এসে সব কথা শচীদেবীকে বললেন। সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে তাই সব জোগাড়যন্ত্রের উদ্যোগ করতে লাগলেন। প্রভুর বিয়ের কথা শুনে শিষ্যরাও আনন্দিত হলেন। নবদ্বীপবাসী ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমন্তখান শুনে বললেন, —এবিয়ের যাবতীয় খরচ আমার। মুকুন্দ-সঞ্জয় বুদ্ধিমন্ত খানকে বললেন,— বন্ধু, তুমিই যদি সব খরচ কর তবে আমি কি কিছুই করব না? বুদ্ধিমন্ত বললেন, —পুরুতের ছেলের মত এই বিয়ে হবে না। রাজপুত্রের বিয়ের মত জাঁকজমক করব আমি এ বিয়েতে। দেখে লোকের তাক লেগে যাবে।

এরপর সকলে মিলে শুভ দিন দেখে অধিবাস করলেন। বড় সামিয়ানা টাঙিয়ে চার কোণে কলাগাছ রোপণ করা হল। পূর্ণ ঘট, দীপ, ধান, আম্রপল্লব, দধি - মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সব জড়ো করা হয়েছে। বড় করে আল্পনা দেওয়া হয়েছে। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-সজ্জন সকলকে সকালে নিমন্ত্রণ করে দেওয়া হল,—বিকেলে এসে তোমরা সবাই পান-সুপুরি খেয়ে যাবে। বিকেল হতেই বাজনদাররা এসে মৃদঙ্গ সানাই জয়ঢাক করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে আরম্ভ করে দিল। বাদ্যধ্বনিতে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। এদিকে ভাটগণ আবৃত্তি করছেন, মেয়েরা হুলুধ্বনি দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠ করছেন। এর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রকুলমণি শ্রীগৌরাঙ্গ এসে বসলেন। খুশি হয়ে ব্রাহ্মণগণ ঘিরে বসেছেন। তাঁদের সকলকে গন্ধ চন্দন তাম্বুল দিব্যমাল্য দেওয়া হল। একেক জনকে এক বাটা ভর্তি পান দেওয়া হল। মাথায় মালা এবং সারা গায়ে চন্দন মাখিয়েও দেওয়া হয়েছে। নবদ্বীপে তো আর ব্রাহ্মণের অভাব নেই! কত যাচ্ছে, কত আসছে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। তার মধ্যে একেক জন লোভী একবার নিয়ে আবার নিতে হাত বাড়ায়। লোকেরা ভীড়ের মধ্যে ঢুকে কেউ কেউ দুবার করে মালা চন্দন পান নিয়ে যায়। সকলেই আনন্দে মগ্ন। কে কাকে চেনে? খুশি মনে প্রভু বললেন, —সবাইকে তিন বার করে মালা চন্দন পান দাও। খরচের জন্য ভাবনা নেই। যে দু বার করে নিয়ে মনের কুণ্ঠায় ছিল তার মনকে নির্ভয় করার জন্যই প্রভু এই ব্যবস্থা করলেন। বারে বারে নেবার জন্য কেউ যাতে ব্রাহ্মণকে নিন্দা না করে তাই প্রভুর এই ব্যবস্থা। বিপ্রপ্রিয় প্রভুর মনের কথা হচ্ছে, তিন বার করে দিলে লোভীদেরও মনোবাসনা পূর্ণ হবে। তিন বার করে পেয়ে এখন সকলেই খুশি হয়েছে, মিথ্যে কথা বলে আর কারো নেবার দরকার হচ্ছেনা। এর পরেও কোন দ্রব্যের অভাব হল না, অনন্তদেবই যে গুয়া-পানরূপে আত্মপ্রকট করে প্রভুর অধিবাসে সেবা করছিলেন, লীলা শক্তির প্রভাবে তা কেউ জানতে পারেন নি। লোকেরা তো পেয়েছেই, তাছাড়া দিতে গিয়ে যা পড়ে গেছে তাতেও পাঁচটা বিয়ে হয়ে যায়। সকলে আনন্দিত হয়ে বলছে, ধন্য অধিবাস, নবদ্বীপে লক্ষপতিকেও অধিবাস করতে দেখেছি, এমন কিন্তু কারো বাপই করতে পারে নি। এমন অকাতরে দিব্য গুয়া পান মালা চন্দন বিলোতে দেখা যায় নি কাউকে।

রাজপণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয়বর্গকে নিয়ে নানা প্রকার গীত বাদ্য আনন্দের সঙ্গে অধিবাসের সামগ্রী এনে শুভক্ষণে প্রভুকে গন্ধস্পর্শ করালেন। তখন উপস্থিত সকলে মহা স্বস্তিবাণীর সঙ্গে জয় জয় হরিধ্বনি করতে লাগলেন। পতিব্রতাগণের উলুধ্বনি ও জয়জয়কারে বাদ্যগীতে মিলে মহাআনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হল। অধিবাসের কাজ সেরে সনাতন পণ্ডিত বাড়িতে চলে গেলেন। প্রভুর আত্মীয়রা আবার গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার অধিবাস করালেন। দুদিকেই লোকাচারের সব কাজও ঠিকঠাক মত হল।

সকালবেলা প্রভু গঙ্গাস্নান করে বিষ্ণুপূজা সেরে আত্মীয়বৃন্দ পরিবৃত হয়ে নান্দীমুখ করতে বসলেন। গীতবাদ্য ত চলছেই। পূর্ণঘট, ধান, দধি, প্রদীপ, আম্রপল্লব ইত্যাদি দিয়ে ঘরের দরজা এবং উঠোন সাজানো হল। চারদিকে নানাবর্ণের পতাকা উড়ছে। কলাগাছ রোপণ করে তাতে আম্রপল্লব, আম্রশাখা বেঁধে দেওয়া হল। শচীমাতা পতিব্রতা নারীদের নিয়ে আনন্দে লোকাচার সম্পন্ন করতে লাগলেন। আগে গঙ্গাপূজা করে তারপর ষষ্ঠীপূজা করতে গেলেন। ষষ্ঠী পূজা শেষ করে আত্মীয়-বান্ধবদের ঘরে ঘরে গিয়ে লোকাচাব সেরে বাড়িতে এলেন। খই কলা তেল সিঁদুর পান দিয়ে পুরনারীদের আপ্যায়ন করলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোন জিনিসেরই অভাব নেই। শচীমাতা সকলকেই পাঁচসাত বার কবে সব জিনিস দিলেন। তেল মেখে মেয়েরা চান কবল। শচীর মনে যত সাধ ছিল তিনি সবই পূরণ করলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়াদের বাড়িতেও তাঁর মা এভাবেই সব কাজ করলেন। রাজপণ্ডিত উদাব মনে ব্যয় কবে মনে খুবই সুখ পাচ্ছেন।

এদিকে সব কাজ সেরে শ্রীগৌরসুন্দব একটু বিশ্রাম কবছেন। তাবপব বিনীত ভাবে ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্যবস্ত্র দিযে সন্তুষ্ট করলেন। যে যেমন পাত্র তাঁকে সেভাবে দান করে সকলকেই সম্মানিত করলেন। খুশি ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করে ভোজন করবাব জন্য ঘরে চলে গেলেন।

বিকেলের দিকে এসে সকলে মিলে প্রভুকে সাজাতে লাগলেন। সাবা গাযে চন্দন লেপন কবে মাঝে মাঝে গন্ধদ্রব্য ছড়িয়ে দিলেন। কপালে অর্ধচন্দ্রাকৃতি করে চন্দন পবিযে তার মধ্যে গন্ধ তিলকের বিন্দু দিয়ে দিলেন। মাথায় অপূর্ব মুকুট শোভা পাচ্ছে। মালাব সুগন্ধে সারা শবীর ম-ম করছে। সূক্ষ্ম দিব্য হলুদ ধুতি তিনকাছা দিযে পবিযে চোখে কাজল পরান হল। ধান-দূর্বা-সুতো দিযে বেঁধে হাতে নতুন কলাপাতা ও আযনা ধবতে দিলেন। কানে সোনাব কুণ্ডল, বাহুতে নবরত্নহার, এইভাবে যে অঙ্গে যা শোভা পায সবই পরিয়ে দেওয়া হল। প্রভুকে দেখে নরনাবীগণ যেন নিজেদেরকেও ভুলে গিযে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন। এক প্রহব বেলা আছে। সকলেই বললেন, এখনই রওনা কব। সারা নবদ্বীপে ঘুবে তবে শোভাযাত্রা গিয়ে সন্ধ্যাতে কনেদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে।

দোলা সাজিয়ে বুদ্ধিমন্তখান এসে হাজির হযেছেন। ব্রাহ্মণদের সুমঙ্গল বেদধ্বনিতে বাদ্যেগীতে আনন্দ-কোলাহলে বাড়ি পরিপূর্ণ। ভাটগণ গুণকাহিনী পাঠ করতে লাগল। চারদিকে কেবল আনন্দ আর আনন্দ। প্রভু জননীকে প্রদক্ষিণ করে ব্রাহ্মণগণকে নমস্কাব করে গিযে দোলায বসলে সর্বদিকে মঙ্গল-জযধ্বনি হতে লাগল। নারীগণ জযকার হুলুধ্বনি দিচ্ছেন। চার দিকেই শুধু শুভধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে। যাত্রা কবেই প্রথমে গঙ্গাতীরে যাওয়া হল। দোলায় সকলের মাথার উপর প্রভুব শ্রীমুখ যেন পূর্ণচন্দ্রের মত শোভা পাচ্ছে। হাজার হাজার দীপ জ্বলছে, বাজি পুড়ছে। বুদ্ধিমন্তখানের লোকেরা চতুর্দোলার সামনে নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে দুই সারিতে চলেছে। তার পেছনে পেছনে নানা বর্ণের পতাকা চলছে, বিদূষকগণও চলেছে নানা সাজে সেজে। কয়েকটি নাচের দলও চলেছে সঙ্গে নেচে নেচে। জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল, কাড়া, দগড়, শঙ্খ, বাঁশী, করতাল, তোডঙ্গ, শিঙ্গা ইত্যাদি নানাবিধ বাদ্যও চলছে। বাজনদারদের ভীড়ের মধ্যে অনেক ছোট ছেলেরাও নেচে নেচে চলেছে, প্রভু তা দেখে হাসছেন। শিশুরাই বা কেন, বয়স্ক পণ্ডিত

লোকেরাও ঐ আনন্দের দৃশ্য দেখে লজ্জা ত্যাগ করে নাচতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। প্রথমে গঙ্গাতীরে এসে খানিক সময় নৃত্য-গীত-বাদ্যে আনন্দ করা হল। তারপর পুষ্পবৃষ্টি করে গঙ্গাপ্রণাম সেরে সমস্ত নবদ্বীপ ঘোরা হল। বিয়ের এই অপূর্ব আনন্দ-আয়োজন দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেছে। লোকেরা তখন বলাবলি শুরু করে দিয়েছে, —অনেক বড় বড় বিয়ে দেখেছি কিন্তু এমন সমারোহ আগে দেখি নি। নবদ্বীপেব সৌভাগ্য, প্রভুকে দেখে নরনারীগণ আনন্দসাগবে ভাসছেন। যাঁদের ঘরে উপযুক্ত সুন্দরী কন্যা রয়েছে সেই সব ব্রাহ্মণেরা মনে মনে আফশোস করছেন, এমন ছেলেব কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে পারলাম না, ভাগ্যে নেই আর কি হবে ? এই সব দৃশ্য যাঁবা দেখেছেন সেই নবদ্বীপবাসীগণকে নমস্কাব জানাই। সারা নবদ্বীপ ঘোরা হলে গোধূলি সময়ে প্রভু বাজপণ্ডিতের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। জযধ্বনিব মহাকোলাহল শুরু হযেছে। ববপক্ষ আব কন্যাপক্ষেব বাজনদাবেবা প্রতিযোগিতাব মনোভাব নিয়ে বাজাতে লেগেছে। বাজপণ্ডিত এসে পবম সমাদবে জামাইকে দোলা থেকে কোলে কবে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আনন্দে তিনি আত্মহাবা হযে পুষ্পবৃষ্টি কবলেন।

তাবপব বরণের সামগ্রী নিয়ে এসে জামাইকে ববণ কবতে বসলেন। পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয, বস্ত্র, অলঙ্কাবাদি দিয়ে তিনি ববণ শেষ কবলে তাঁব পত্নী অন্যান্য নাবীগণেব সঙ্গে মাঙ্গলিক কার্যাদি কবতে লাগলেন। তাঁবা ধান দূর্বা জামাইযেব মাথায দিয়ে, সাত ঘৃতেব প্রদীপে আরতি করে, খই, কড়িখেলা ইত্যাদি যাবতীয স্ত্রীআচাব সম্পন্ন কবলেন। এবাবে লক্ষ্মীময়ী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সর্বঅলঙ্কাবে বিভূষিত কবে আসনে বসিয়ে ধবে নিয়ে এলেন আত্মীযগণ। প্রভুকে আসনে বসিয়ে তুলে ধবলেন। মাঝখানে কাপড় ধবে বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাতবাব ববেব চাবিদিক ঘোবালেন। প্রদক্ষিণ শেষ হলে বিষ্ণুপ্রিয়া সামনে নমস্কাব কবে থাকলেন। চাবদিক থেকে তখন পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। দুই পক্ষেব বাদ্যকবেবাই মহা উৎসাহে বাজনা বাজাতে লাগল। সকলেব এত বেশি আনন্দ হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন আনন্দ নিজে এসে সেখানে হাজিব হযেছে। প্রথমে জগন্মাতা-লক্ষ্মীদেবী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুব চবণে মালা দিয়ে আত্মসমর্পণ কবলেন। তাবপব প্রভু গৌরচন্দ্র ইষৎ হেসে বিষ্ণুপ্রিয়াব গলায মালা পবিয়ে দিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ও গৌবাঙ্গ উভযে পবস্পবেব প্রতি ফুল ছুঁড়তে লাগলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ অলক্ষ্যে থেকে পুষ্পবৃষ্টি কবলেন। ববপক্ষ কন্যাপক্ষেব লোকেবা মহা আনন্দে জেদাজেদ কবে বব কনেকে খুব উঁচুতে তুলে ধবে। কে কত উঁচুতে তুলতে পাবে- এই প্রতিযোগিতায একেক পক্ষ একেক বাব জিততে থাকে। হেসে হেসে প্রভুকে আবাব সেকথা বলছে। প্রভু সুন্দব মুখে ঈষৎ হেসে সকলেব মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছেন। তাবাও মহানন্দে হেসে চলেছে। হাজাব হাজাব বড় বড় প্রদীপ জ্বলছে। বাজনাব আওযাজে কানেকপাটে কিছু শোনা যাচ্ছে না। শুভদৃষ্টিব সময়ে বিবাট বাজনা এবং জযধ্বনিব শব্দে যেন সাবা দুনিযা ভবে গেল। মুখচন্দ্রিকা হয়ে গেলে শ্রীগৌবসুন্দব ও বিষ্ণুপ্রিয়া দুজনেই বসলেন। বাজপণ্ডিত মহা আনন্দে কন্যাদান করতে লাগলেন। পাদ্য অর্ঘ আচমনী সমস্তই নিযমিত ভাবে সঙ্কল্প কবলেন। বিষ্ণুপ্রীতি কামনা কবে বিষ্ণুপ্রিযাব পিতা প্রভুব হাতে কন্যাকে সমর্পণ কবলেন। গাভী, ভূমি, শয্যা, দাস দাসী সহ অনেক যৌতুক দিলেন। প্রভুব বাম পাশে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বসিয়ে হোম আরম্ভ হল। বেদাচাব লোকাচাব সব সম্পন্ন কবে বর-কনেকে ঘরে তুললেন। রাজপণ্ডিতেব ঘর আজ যেন বৈকুণ্ঠে রূপান্তরিত হযেছে। তাঁদের ভোজনপর্বও শেষ হল।

খাওয়া দাওয়ার পরে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী নাগ্নজিতীর পিতা নগ্নজিত, সীতাদেবীর পিতা রাজা জনক, রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক, জাম্ববতীর পিতা জাম্ববন্ত, পূর্বকালে তাঁরা যে-ভাগ্য নিয়ে এসেছিলেন, বিষ্ণুপূজা করে সনাতন পণ্ডিতও সবান্ধবে এখন সেই সৌভাগ্য ভোগ করছেন। ভোর হলে প্রভু সব লোকাচার সারলেন। বিকেলে বাড়িতে ফিরবার সময় হলে প্রচুর নৃত্য-গীত-বাদ্য হতে লাগল। নারীগণের জয়কার-জোকার হুলুধ্বনি এবং সকলের জয়ধ্বনি হতে থাকল। ব্রাহ্মণেরা যাত্রা-সময়ের স্তবপাঠ করতে লাগলেন। দুই দলে প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে ঢাক ঢোল সানাই বাজাতে লাগল। বাজনা যেন আর থামছে না। সকল মাননীয়গণকে নমস্কাব জানিয়ে প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে এসে দোলায় বসলেন, —এই ভাগ্যবতী কন্যা নিশ্চয বহুকাল লক্ষ্মী এবং পার্বতীর সেবা করেছে। কেউ বলছে,—ঠিক যেন হরগৌরী। কেউ বলছে,—লক্ষ্মীজনার্দন। কেউ বলছে—কামদেব আর রতি। কেউবা বলে—আমাব মনে হয় ইন্দ্র আর শচী। আবার কেউ বলছে,—রাম-সীতা। মহিলাসমাজে এই আলাপ চলছে। নদীয়ার নরনারীর সৌভাগ্য বলতে হয় যে তাঁরা এই দৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গলদৃষ্টিতে নদীয়ার সর্বত্র সুখ বিরাজ করতে লাগল। লোকেরা মহা আনন্দে নাচ-গান বাজনা করতে করতে ফুল ছড়িয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে। এভাবে ভগবান আর ভগবতী এসে বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

শচীমাতা পতিব্রতাদের নিয়ে সানন্দে পুত্রবধূকে ঘরে তুললেন। যে অপূর্ব আনন্দ হল তা বর্ণনা করা অসম্ভব। অতীব পাপীও এই বিবাহ দর্শন করলে বৈকুণ্ঠ লাভ কবতে পারে। প্রভুর এমন বিবাহ চোখের সামনে দেখতে পেয়েই লোকেরা তাঁকে 'দযামঘ দীননাথ' বলেন। যত নট্ট, ভট্ট, ভিক্ষুক—সকলকেই কাপড় দান করলেন। আত্মীয-ব্রাহ্মণগণকেও প্রত্যেককে প্রভু বস্ত্রদান করলেন। প্রভুর আলিঙ্গন লাভ করে বুদ্ধিমন্ত খান অতীব আনন্দ লাভ করলেন। এসব লীলার কখনো বিরাম নেই। বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থে তাকেই 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডেব কোথাও না কোথাও এই লীলা অবিবাম চলছে। এক দণ্ডে যে লীলা ঘটে যাচ্ছে তা শতবর্ষেও কেউ বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না। শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞা মাথায় নিয়ে তাঁব কৃপাতেই অতি সংক্ষেপে মাত্র কিছু লিখছি। এ সকল ঈশ্বরলীলা যে পড়বে এবং যে শুনবে তাবা সকলেই গৌরচন্দ্রের সঙ্গে বিহার করার অধিকারী হবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং প্রভু নিত্যানন্দ হচ্ছেন বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রাণস্বরূপ, তাই তিনি তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের অশেষ গুণকীর্তন করে যাচ্ছেন।

১/১১ সর্বসাধারণের ঈশ্বর লক্ষ্মীকান্ত দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দরের জয়। ভক্তগণের রক্ষার জন্য তিনি সর্বকাল-সত্য কীর্তন করে চলেছেন। তাঁর জয় হোক। ভক্তবৃন্দ সহ শ্রীগৌরাঙ্গের জয় হোক। চৈতন্যকথা শুনলে ভক্তি লাভ করা যায়। আদি খণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাশক্তির মোহনপ্রভাবে তাঁর স্বরূপতত্ত্ব বিষয়ে সকলেই মুগ্ধ হয়ে থেকে মূল তত্ত্ব অবগত হতে পারে নি।

বৈকুণ্ঠনায়ক নবদ্বীপে বিপ্ররূপে গৃহস্থ হয়ে অধ্যাপনা করছেন। প্রেমভক্তি প্রকাশ করার ইচ্ছা থাকলেও তখন পর্যন্ত তিনি তা কিছুই আরম্ভ করেন নি। পরমার্থ বিষযে সকলেই বিমুখ, বিষয়ভোগের ইন্দ্রিয়তর্পণেই সকলে ব্যস্ত। গীতাভাগবত যারা পড়ায় তারাও

ভগবানের গুণকীর্তন কিছুই করে না। ভক্তগণ হাতে তালি দিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনক্রমে কীর্তন করে যাচ্ছেন। তাতেও অন্যেরা ঠাট্টা করে বলে, —এরা অকারণে ডাক ছেড়ে চীৎকার করছে। সকলের মধ্যেই তো ব্রহ্ম-নিরঞ্জন বাস করছেন। ভক্ত-ভগবান ধারণাটা নিতান্তই অকারণ। সংসারী লোকেরা বলে,—ভিক্ষে পাবার জন্যেই এরা ডাক পেড়ে চীৎকার দিয়ে লোককে জানিয়ে ভগবানের নাম নেয়। নদীয়ার অনেক লোকই পরামর্শ করছে, এদের ঘরদুয়ার ভেঙ্গে ফেলতে হবে। ভক্তগণ এসব কথা শুনে মনে দুঃখ পান। কারো কাছে যে মনের দুঃখ জানাবেন তেমন লোকও নেই বললেই হয়। ভক্তগণ তাই উপায় না দেখে মনের দুঃখে 'হা কৃষ্ণ' বলে তাঁকেই ডাকেন। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন পরম ভক্ত শ্রীহরিদাস। তাঁর শরীরে শুধুমাত্র কৃষ্ণভক্তি, লাভপূজা-প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র বাসনা তাঁর নেই।

এখন হরিদাস ঠাকুরের কথা বলা হচ্ছে, তাঁর কাহিনী শুনলে অবশ্যই কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায়। বুঢন গ্রামে হরিদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই সৌভাগ্যেই ঐ অঞ্চলে কীর্তন প্রচার হয়েছে। কিছুদিন পরে তিনি সেখান থেকে এসে গঙ্গাতীরে শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়াগ্রামে থাকতে লাগলেন। অদ্বৈতাচার্য তাঁর সঙ্গলাভ করে অনন্ত আনন্দে হুঙ্কার করছেন। হরিদাসও অদ্বৈতের সঙ্গ লাভ করে কৃষ্ণকথার আস্বাদনে অনির্বচনীয় সুখসমুদ্রে ভাসছেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর সদা সর্বদা গঙ্গাতীরে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করে চলেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সংসারসুখ-বিরাগী হরিদাসের শ্রীমুখে সব সময়ই কৃষ্ণনাম চলছে। ভক্তিতে তিনি নৃত্য কীর্তন করে চলেছেন, তাঁর মুখে কখনো কৃষ্ণনামের বিরাম বিশ্রাম নেই। কখনো নিজে নিজে নাচেন, কখনো মত্তসিংহের মত চীৎকার করেন। কখনো চীৎকার করে কাঁদেন, কখনো অট্টহাস্য করেন। কখনো মুখে হুঙ্কার গর্জন। কখনো মূর্ছিত হয়ে পড়ে থাকেন। কখনো অলৌকিক শব্দ করে চীৎকার করেন আবার তা ভাল করে বুঝিয়ে দেন। শ্রীহরিদাস নৃত্য আরম্ভ করলেই তাঁর শরীরে হাস্য, মূর্ছা, ঘর্ম, অশ্রুপাত, রোমহর্ষ ইত্যাদি কৃষ্ণভক্তির সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয়। আনন্দাশ্রুতে সমস্ত শরীর ভিজে যায়, অভক্তও দেখে বিস্মিত হয়। সেই অদ্ভুত পরম শোভন রোমাঞ্চ দেখে ব্রহ্মা-শিব পর্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। ফুলিয়া গ্রামের সব ব্রাহ্মণেরাও তা দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ে।

হরিদাসপ্রভু ফুলিয়াতেই থেকে গেলেন, সেখানে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তিনি গঙ্গাস্নান করে সর্বদা সর্বত্র উচ্চস্বরে হরিনাম করে বেড়াচ্ছেন। কাজী গিয়ে অঞ্চলের শাসককে সব জানালেন, —যবন হয়ে হিন্দুর আচরণ করছে, তাকে নিয়ে এসে আচ্ছা করে সাজা দিতে হবে। কাজীর কথা শুনে সে তাঁকে তক্ষুনি ধরে নিয়ে এল। হরিদাস কৃষ্ণভক্তি-রসের আনন্দে নিমগ্ন। যবন তাঁকে কি করবে, তিনি যমকেও ভয় পান না। কৃষ্ণনাম করতে করতে তিনি শাসকের দরজায় গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর যাবার খবর শুনে সৎলোকেরা মনে কষ্ট পেলেন। জেলে যে সব সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন তাঁরা কিন্তু শুনে খুশি হয়েছিলেন, পরম বৈষ্ণব হরিদাসকে দেখে আমাদের বন্দীজীবনের দুঃখ লাঘব হবে। জেলের পাহারাদারদের অনুরোধ করে তাঁরা হরিদাসের আসার পথের দিকে চেয়ে রইলেন। জেলে এসেই হরিদাস ঠাকুর বন্দীদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করলেন। হরিদাসের চরণোদ্দেশে তাঁরা সকলে প্রণাম নিবেদন করলেন। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা তাঁর হাত, পদ্মফুলের মত চোখ, উপমাহীন সুন্দর মুখচন্দ্র। তাঁদের সভক্তি নমস্কারের ফলে সকলের মধ্যেই

কৃষ্ণভক্তির উদয় হল। তাঁদের ভক্তি লক্ষ্য করে হরিদাস বললেন, —তোমরা এখন যেভাবে আছ সেভাবেই থাক। মনে মনে তিনি সহাস্যে তাঁদের আশীর্বাদ জানালেন। তাঁর দুর্বোধ্য কথা ধরতে না পেরে বন্দীগণ দুঃখিত হল। পরে হরিদাস কৃপা করে গুপ্ত-আশীর্বাদ বুঝিয়ে বললেন,—আমার আশীর্বাদের মর্ম না বুঝে তোমরা দুঃখিত হয়েছ। তোমরা জানবে, আমি কখনো খারাপ করি না। এখন তোমাদের মন যেমন কৃষ্ণের প্রতি রয়েছে সে ভাবেই থাক। এখন তোমরা সকলেই কৃষ্ণনাম চিন্তা করছ, এখন হিংসা কিম্বা পরপীড়ন কিছুই করছ না, বিনীত ভাবে কৃষ্ণকে ডাকছ। ছাড়া পেয়ে দুষ্টের দলে পড়বে, সংসারে নিমগ্ন হবে, তখনই কৃষ্ণকেও ভুলে যাবে। আবার সেই অপরাধের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে, বিষয়ের এই স্বভাব। আমি বলি না যে তোমরা বন্দীদশাতেই থাক তবে বিষয় ভুলে সব সময় হরিনাম নাও, তাই চাই। আমি প্রকারান্তরে এই আশীর্বাদই করেছি, আমাকে তোমরা ভুল বুঝবে না। আমি সকলকেই ভালবাসি, আমি চাই কৃষ্ণে তোমাদের দৃঢ় ভক্তি হোক। চিন্তা করো না, দুতিন দিনের মধ্যেই তোমাদের বন্ধন দশা ঘুচে যাবে। বিত্তসম্পত্তি-স্ত্রীপুত্রাদির মধ্যেই থাক অথবা যে অবস্থাতেই থাক সর্বদা হরিনাম কীর্তনের কথা যেন কিছুতেই ভুলবে না। বন্দীদের মঙ্গল কামনা করে তিনি ঐ অঞ্চলের শাসকের কাছে এলেন। হরিদাসের অতি মনোহর তেজ দেখে যত্ন করে বসতে দিয়ে অঞ্চলপ্রধান তাঁকে বললেন,—তোমার এমন বুদ্ধি হল কেন? কত ভাগ্যে তুমি যবন হয়েছ তবে হিন্দুর আচার পালন করছ কেন? আমবা হিন্দুদের দেখলে ভাতও খাই না, তুমি বড় বংশে জন্মে নিজের জাতিধর্ম লঙ্ঘন করে অন্য রকম আচরণ কবছ, পরকালে পার পাবে কি করে? না জেনে যে পাপ কবেছ, কলেমা উচ্চারণ কবে তা ঘুচাও। মুলুকপতির মাযামুগ্ধকর কথা শুনে তিনি হেসে বললেন, —হিন্দু-মুসলমান সকলেরই একই ঈশ্বর। নামে মাত্র প্রভেদ। হিন্দুশাস্ত্র এবং কোরাণে এই কথাই বলে। ভগবান পরিপূর্ণ, অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপকতত্ত্ব হয়েও তাঁর অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে সকল জীবের হৃদয়েই বাস করেন। তিনি যাকে যেভাবে চালান, সে সেভাবেই কাজ করে। নিজ নিজ শাস্ত্র অনুসারে জগতের সকলেই সেই এক এবং অদ্বিতীয় প্রভুর নাম-গুণাদির কীর্তন করে থাকে। ভগবান সকলের নিয়ন্তা ও বক্ষাকর্তা, কোন জীবেব প্রতি হিংসা করলে ভগবানকেই হিংসা করা হয়। এই জন্যই ভগবান আমাকে যেমন বুদ্ধি দিয়েছেন আমি সেভাবেই চলছি। হিন্দুব ঘরে জন্মে ব্রাহ্মণ হয়েও কেউ যেমন গিয়ে যবন হয়, তেমনি। হিন্দুরা তার কি করেবে? সে পূর্বজন্মের কর্মের ফলে মরেছে, তাকে আবার মারধোর করে কি হবে? এবার তুমি বিচার করে দেখ। যদি আমার কোন দোষ থাকে তাহলে শাস্তি দাও। হরিদাসের কথার যুক্তিতে উপস্থিত যবনগণ সকলেই খুশি হলেন। একমাত্র পাপী কাজীই মুলুকপতিকে বলতে লাগল,—এ লোকটি অত্যন্ত বদমাশ, আরো বদমায়েশি করবে, যবনকুলের কলঙ্ক করবে। একে ভাল মতে শাস্তি দাও। আর যদি যবনের নিয়ম মেনে চলে তবে ছেড়ে দিতে পার। মুলুকপতি বললেন,—যবনের নিয়ম মেনে চলবে কিনা বল, অকারণ ছোট হবে কেন? পরে বলতেও হবে আবার কাজীরাও শাস্তি দেবে। হরিদাস বললেন,-ঈশ্বর যা করান তাই হবে। কেউ তো আর নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারে না। অপরাধ অনুসারে ঈশ্বরই ফল দেন। আমার দেহ যদি খণ্ড খণ্ড করে ফেল, আমার যদি প্রাণ যায় তবু মুখে হরিনাম বলা ছাড়ব না। এই কথা শুনে মুলুকপতি কাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনলে তো!

এবারে একে কি করতে চাও? কাজী উত্তর দেয়, বাইশ বাজারে নিয়ে একে বেত মেরে প্রাণ নাও, এ ছাড়া আর কিছু করার নেই। তাতেও যদি না মারা যায় তাহলে বুঝব এর জ্ঞানের কথা ঠিকই। তারপর কাজী পাইকদের ডেকে বলে, এমন ভাবে মারবে যেন প্রাণে না বাঁচে। যবন হয়ে হিন্দুয়ানি করছে, মরলেই পাপ থেকে উদ্ধার পাবে।

পাপী কাজীর কথায় পাপী মুলুকপতি হুকুম দিল। দুষ্ট পাইকেরা এসে হরিদাসকে ঘিরে ধরল। ভীষণ রাগে তারা হরিদাসকে মেরে নির্জীব করে দিয়েছে। তিনি মনে মনে কৃষ্ণ নাম স্মরণ করছেন, নামানন্দে তন্ময়তা লাভ করেছেন বলে তাঁর দেহে দুঃখের প্রকাশ নেই। হরিদাসের দেহে প্রহারের দাগ দেখে সৎলোকেরা মনে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। কেউ বললেন,—এমন সাধুর সঙ্গে এই ব্যবহার, দেশ উচ্ছন্নে যাবে। কেউ মনের দুঃখে রাজা-উজিরকে শাপ দিচ্ছে। কেউ মারামারি করতেও উদ্যত হয়। কেউ গিয়ে যবনদের পায়ে ধরে বলে,—আমরা টাকা-কড়ি দেব তবু এঁকে বেশি মারবে না। কিন্তু পাপীদের মনে দয়া হয় না, খুব রেগে গিয়ে বাজারে বাজারে নিয়ে মারতেই থাকে। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে হরিদাসের দেহে কোন কষ্ট নেই। শাস্ত্রে আছে, অসুরদের প্রহারে প্রহ্লাদের শরীরে কোন দুঃখবোধ হয় নি। তেমনি যবনগণের প্রহারেও —অসহ্য প্রহারেও হরিদাস ঠাকুরের শরীরে কোন কষ্ট হয় নি। হরিদাস ঠাকুরের দুঃখ হবে কি? হরিদাস ঠাকুরের নাম নিলেই যে কোন মানুষের দুঃখ কেটে যায়। যেসব পাপীরা তাঁকে মারছে, তাদের পাপের কথা ভেবেই তিনি মনে কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, আমার প্রতি এরা যে অন্যায় আচরণ করছে, তাতে যেন এদের অপরাধ না হয়। ভগবান, তুমি এদের আশীর্বাদ কর। পাইকেরা বাজারে বাজারে নিয়ে তাঁকে সমানে প্রহার করেই চলেছে। তারা মেরে ফেলবার জন্যই প্রহার করছে। প্রহারের কথা হরিদাস ঠাকুর একবারও ভাবছেন না। বিস্মিত হয়ে যবনগণ ভাবছে,—এমন মারের পরেও কি মানুষ বাঁচতে পারে? দু-তিন বাজারে মারলেই লোক মরে যায়, এঁকে তো বাইশ বাজারে মারলাম, মরছে তো না-ই আবার দেখি একটু একটু হাসছে। এ কি মানুষ না পীর? সকলেই এই কথা ভাবছে। যবনেরা তখন বলছে,—ওহে, হরিদাস, তোমার জন্য তো আমাদেরই মরণ হবে। এত মার মারলাম তবু তুমি মরলে না, কাজী এখন আমাদের সকলকে প্রাণে মারবে। হরিদাস ঠাকুর হেসে বললেন,—আমি বেঁচে থাকলে যদি তোমাদের অমঙ্গল হয় তবে আমি এক্ষুনি মারা যাব, এই দেখ। এই কথা বলেই তিনি ধ্যানে আবিষ্ট হলেন। প্রেমসমাধির ফলে হরিদাসের হাত পা নড়া, শ্বাস-প্রশ্বাস, পেটের স্পন্দন,-শরীরের সব কাজ বন্ধ হয়ে গেল। যবনেরা দেখে আশ্চর্য হল, মুলুকপতির কাছে নিয়ে তাকে ফেলে দিল। মুলুকপতি বলল,—একে নিয়ে মাটি দাও। কাজী বলে —তবে তো এর সদ্গতি হবে। শ্রেষ্ঠ কুলে জন্মেও যেমন নীচ কাজ করেছে তাই একে কি করতে হবে শুনে নাও। কবরে দিলে এ উদ্ধার পেয়ে যাবে, নদীতে ফেলে দাও, তাহলেই চিরকাল দুঃখ পাবে।

কাজীর কথায় পাইকেরা তাঁকে নদীতে ফেলবার জন্য তুলতে গেলে হরিদাস নিজে থেকেই উঠে বসলেন। তিনি ধ্যানের আনন্দে বসে আছেন, তাঁর দেহে বিশ্বম্ভর প্রকাশ পেলেন। ভগবান তাঁর দেহে অবস্থিত বলে তাঁর ওজন এত বেড়ে গেল যে, কেউ তাঁকে তুলতে পারছে না। বলবান লোকেরা তাঁকে ঠেলছে কিন্তু তিনি নিশ্চল হয়ে আছেন। কৃষ্ণধ্যানের আনন্দসমুদ্রে তিনি মগ্ন, অন্য বিষয়ে তাঁর কোন জ্ঞান নেই। হরিদাস ঠাকুর

আকাশে, মাটিতে কিম্বা নদীতে কোথায় আছেন সেবিষয়ে তাঁর কোন হুঁশ নেই। শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করবার জন্য প্রহ্লাদের যেমন ভক্তিলাভ ঘটে ছিল, হরিদাস ঠাকুরেরও তেমনি শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। নিরবধি গৌরচন্দ্র তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করছেন, কাজেই তাঁর পক্ষে এসব এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। হনুমান যেমন রাক্ষসের নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান রক্ষার জন্য বন্ধন স্বীকার করেছিলেন তেমনি হরিদাসও জগতের শিক্ষার জন্য যবনদের প্রহার সহ্য করছেন। অশেষ দুর্গতি পেয়ে প্রাণ গেলেও মুখে হরিনাম কীর্তন ছাড়ব না। তা না হলে স্বয়ং ভগবান যাঁর রক্ষক তাঁকে কে প্রহার করতে পারে? হরিদাস ঠাকুরের দুঃখ হবে কি, তাঁর স্মরণেই লোকের দুঃখ দূর হয়ে যায়। হরিদাস ঠাকুর হচ্ছেন শ্রীচৈতন্যের মহামুখ্য অনুচর এবং সেই কারণেই পারমার্থিক বিষয়ে জগতের পালনকর্তা। হরিদাস গঙ্গায ভাসছেন, ঈশ্বর-ইচ্ছায় খানিক সময় পরেই তাঁর বাহ্যজ্ঞান এল। তিনি পরমানন্দে তীরে এসে উঠলেন। আনন্দের সঙ্গে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম বলতে বলতে ফুলিযা চলে এলেন। তাঁর অদ্ভুত শক্তি দেখে যবনগণের হিংসা কেটে গেল, মন ভাল হল। সিদ্ধপুরুষ মনে করে তাঁকে সকলে প্রণাম নিবেদন করল, এইভাবে তারা সকলে নিস্তাব লাভ করল। কৃষ্ণনামে তিনি আবিষ্ট ছিলেন। এবারে আবার বাহ্যজ্ঞান পেয়ে মুলুকপতির দিকে তাকিয়ে কৃপা প্রকাশ করে হাসলেন। মুলুকপতি বিনীতভাবে হাতজোড় করে বললেন, আমি সত্যি বুঝতে পারলাম, তুমি মহাপীর। সকল জাতির লোকেরই ঈশ্বর যে একজন, সে জ্ঞান তোমার হয়েছে। সকলেই মুখে বলে যোগী জ্ঞানী, কিন্তু তুমি সত্যিকারেব সিদ্ধিলাভ করেছ। আমি তোমাকেই দর্শন করবার জন্য এখানে এসেছি, তুমি আমার সব দোষ ক্ষমা করে দাও। তোমার কাছে সকলেই সমান, শত্রু মিত্র কেউ নেই। তোমাকে কেউ চিনতে পারছে না। তুমি যা ভাল মনে কর তাই কর। যদি গঙ্গাতীরে নির্জন গোকায থাকতে চাও, তাই থাক। সৎলোকের তো হবেই, অসৎ লোকেরা পর্যন্ত হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখে আনন্দে ডুবে যায়। মুলুকপতি কত রাগ করে তাঁকে মারবে বলে নিয়ে এসেছিল, শেষ পর্যন্ত পীর বলে মান্য করে পাদপদ্মে হাত দিয়ে প্রণাম জানায়। যবনের প্রতি কৃপা প্রকাশ করে হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়াতে চলে এলেন।

তিনি উচ্চস্বরে হরিনাম করতে করতে ফুলিয়াতে ব্রাহ্মণগণের কাছে এসে গেলেন। তাঁরা দেখে মহা খুশি। ব্রাহ্মণদের হরিধ্বনি শুনে হরিদাস নাচতে লাগলেন। তিনি প্রেমভাবে অশ্রু কম্প হাস্য মূর্ছা পুলক হুঙ্কার করছেন, আছাড় খেয়ে পড়ছেন। ব্রাহ্মণগণ তা দেখে আনন্দে ভাসেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁকে ঘিরে বসেছেন, হরিদাস স্থির হয়ে বললেন, তোমবা আমার জন্য কিছু দুশ্চিন্তা করো না। আমি প্রভুর নিন্দা শুনেছি বলেই ভগবান আমাকে শাস্তি দিলেন। ভালই হল, অল্প শাস্তিতে তিনি আমার বড় দোষ ক্ষমা করেছেন। বিষ্ণুনিন্দা শুনলে কুম্ভীপাকে পড়তে হয়, আমি তাই নিজ কানে কত শুনেছি। ভগবান আমাকে তার যোগ্য শাস্তি দিয়েছেন, আর যেন এ জন্মে তেমন পাপ না করতে হয়।

এখন হরিদাস ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নির্ভয়ে এবং আনন্দে সঙ্কীর্তন করছেন। তাঁকে যারা কষ্ট দিয়েছিল তারা এতদিনে উৎসন্নে গেল। হরিদাস এখন গঙ্গাতীরের গোফায় নির্জনে থেকে দিবারাত্র কৃষ্ণনাম করছেন। রোজ তিন লক্ষ নাম করেন, গোফাই তাঁর বৈকুণ্ঠ ভবন। সেই গোফাতে মহাবিষধর সাপ থাকে, তার বিষের জ্বালা কেউ সহ্য করতে পারে না। সাপের ভয়ে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে কেউ আলাপ করতে আসতে পারে না। এই বিষধর সাপের কথা কিন্তু হরিদাস কিছুই জানেন না। ব্রাহ্মণগণ বলেন, হরিদাসের আশ্রমে

এত উত্তাপ-জ্বালা কিসের? বয়স্ক ওঝারা বললেন, মহাবিষধর সাপের কারণেই এই উত্তাপ এবং জ্বালা। চল, আমরা গিয়ে হরিদাস ঠাকুরকে জানাই যে সাপের সঙ্গে বাস করা কিছুতেই উচিত নয়। শীঘ্র অন্যত্র আশ্রম করে থাকবে চল। সব কথা শুনে হরিদাস বললেন, অনেক দিন হল এখানে আছি। কোন উত্তাপ-জ্বালা তো কিছু টের পাই নি। তবে আমার দুঃখ হচ্ছে এই জন্যে যে তোমরা আসতে পারছ না এখানে, তাই অন্য কোথাও গিয়েই আশ্রম করতে হবে। যদি এখানে তেমন কোন বড় সাপ থাকে এবং সাপ যদি কালকের মধ্যে চলে না যায় তা হলে অন্য জায়গায় গিয়ে আশ্রম করব, তোমরা কোন চিন্তা করো না, কীর্তন কর। এর পর তাঁদের কৃষ্ণকথা এবং মঙ্গলকীর্তনের মধ্যেই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। হরিদাস এ আশ্রম ছেড়ে যাবেন শুনে মহানাগ নিজেই স্থানত্যাগ করল। সন্ধ্যার সময়ে সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে অন্য জায়গার দিকে চলেছে। মহা ভয়ঙ্কর সাপ— লালে হলুদে শাদায়, দেখতে সাঙ্ঘাতিক। মাথার উপরে মহামণি জ্বলছে দেখে ব্রাহ্মণগণ ভয় পেয়ে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলেন। সাপ চলে গেছে, আর কোন জ্বালা নেই। এখন ব্রাহ্মণেরা মহাখুশি। হরিদাস ঠাকুরের বিশেষ শক্তি দেখে তাঁর প্রতি ব্রাহ্মণদের খুব ভক্তি হল। হরিদাসের কথায় সাপ পর্যন্ত বাসা ছেড়ে চলে গেল, কত বড় তাঁর প্রভাব। হরিদাস যার প্রতি একবার দৃষ্টি করেন তার সংসারবন্ধন কেটে যায়। সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণও হরিদাসের বাক্য লঙ্ঘন করেন না।

নাগরাজ হরিদাস ঠাকুরের মহিমার কথা যা বলেছেন তাও শোন। এক দিন এক ধনীলোকের নাট মন্দিরে একটি সাপের ওঝা নানা রকম আস্ফালন করছে। ওঝা মন্ত্র পড়তে পড়তে নাচছে, মন্ত্রের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে ওঝার চার দিকে ঘিরে লোকেরা বাদ্যযন্ত্রের বাজনার সঙ্গে গান গাইছে। হঠাৎ হরিদাস সেখানে এসে সাপুড়ের নাচ দেখছেন এক পাশে দাঁড়িয়ে। নাগরাজ সাপুড়ের শরীরে প্রবেশ করে তাকে নাচিয়ে ছাড়ছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালিদহে যে কাণ্ড করেছিলেন তারই বর্ণনা দিয়ে সাপুড়ে গান গেয়ে চলেছে। হরিদাস কৃষ্ণলীলা-কথা শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কখনও একটু জ্ঞান হচ্ছে, আবার কখনো হুঙ্কার করে উঠছেন, আবার আনন্দে খুব নাচছেন। হরিদাস ঠাকুরের কৃষ্ণপ্রেমাবেশ দেখে সাপুড়েরা এক পাশে সরে গেল। হরিদাস গড়াগড়ি করছেন, তাঁর শরীরে অশ্রু পুলক, কম্প হচ্ছে। তিনি কাঁদছেন কখনও, প্রভুর গুণলীলা-কথা শুনে তিনি তন্ময় হয়ে গেছেন। হরিদাসকে ঘিরে সকলে মিলে গান করছে, সাপুড়ে হাতজোড় করে একপাশে দাঁড়িয়ে তা দেখছে। হরিদাসের আবেশ ছেড়ে গেলে এক ব্রাহ্মণ দেখল সকলেই তাঁর পায়ের ধুলো নিচ্ছে, তাঁর পায়ের ধুলোতে লোকেরা গড়াগড়ি যাচ্ছে। তখন সেও মনে মনে ঠিক করল,—আমি নাচব, তাহলে এই সব নির্বোধ বর্বর লোকগুলো আমাকেও ভক্তি করবে। এই ভেবে সেই ব্রাহ্মণ যেই মাত্র সাপুড়ের সামনে ঢঙ দেখিয়ে হাত-পা বন্ধ করে আছাড় খেয়ে পড়ল অমনি সাপুড়ে রেগে গিয়ে তার গায়ে-গতরে আচ্ছা করে বেত মারতে লাগল। ব্রাহ্মণ বেত খেয়ে কাতর হয়ে পড়ল। তারপর সে 'বাপ বাপ' বলে চীৎকার করে পালিয়ে গেল। তখন সাপুড়ে ওঝা আনন্দ করে নাচতে লাগল। লোকেরা এর অর্থ কিছুই বুঝতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করল, —ব্রাহ্মণকেই বা মারলে কেন আর হরিদাস নাচতে থাকলে তাঁকেই জোড়হাত হয়ে আছ কেন? তখন সেই ডঙ্ক অর্থাৎ সাপুড়েওঝার মুখ দিয়ে বিষ্ণুভক্ত নাগ বলতে লাগলেন, —যদিও একথা বলা ঠিক নয় তবু এই গোপন রহস্য বলছি শোন, তোমরা হরিদাস ঠাকুরকে

সম্মান করছ দেখে ঐ ব্রাহ্মণ ভণ্ডামী করে মাৎসর্য বুদ্ধিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। ভণ্ডামী করে আমার নাচের আনন্দ নষ্ট করার সাধ্য নেই কারো। স্পর্ধা করে হরিদাসের সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করে এই শাস্তি পেল । আমি কত বড় সাধু, তোমরা দেখ। এই ধর্মকর্ম করে এরা। এসকল অহংকারী লোকের কৃষ্ণভক্তি নেই বিন্দুমাত্র। অকপট হলে তবেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায়। এই যে দেখলে, হরিদাস নাচলেন, এই নৃত্য দেখসে সর্ব বন্ধন ক্ষয় হয়। হরিদাসের নৃত্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাচেন। হরিদাস নাম সার্থক, এঁর হৃদয়ে সর্বদা কৃষ্ণ বিরাজিত। সর্বমানবের হিতকারী ভগবানের এই নিত্য পার্ষদ প্রতিজন্মে অবতারীর সঙ্গে অবতরণ করেন। বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের নিকটে ইনি কোন কালে কোন অপরাধ করেন নি, স্বপ্নেও ইনি বিপথে দৃষ্টি দেন না। তিলার্ধ সময় যে এঁর সঙ্গ লাভ করে সেও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করতে পারে। ব্রহ্মা শিব পর্যন্ত হরিদাসের সঙ্গ লাভ করার আশা করেন। জাতি-কুল যে নিতান্তই নিবর্থক তা বুঝাবার জন্যই তিনি প্রভুর আজ্ঞায় নীচকুলে জন্মেছেন। সকল শাস্ত্রেই বলে যে, অধম কুলে জন্মেও কৃষ্ণভক্ত হলে সেই সকলের পূজ্য হয়, আর উচ্চকুলে জন্মেও কৃষ্ণভজন না করলে সে নরকগামী হয়। এ সকল বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাবার জন্যেই তিনি অধম কুলে জন্ম নিয়েছেন। যেমন প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে, হনুমান বানরকুলে জন্মেছেন, তেমনি হরিদাসও নীচজাতিতে জন্মেছেন। দেবগণ থেকে গঙ্গা পর্যন্ত সকলেই হরিদাসের স্পর্শ বাঞ্ছা করেন। স্পর্শেরও দরকার হয় না, হরিদাসকে দর্শন করলেই জীবের কর্মবন্ধন নাশ হয়। হরিদাসের আশ্রিতকে দেখলেও সংসারজাল ছিন্ন হয়। শতবর্ষ ধরে শতমুখে বলেও তা শেষ করতে পারব না। তোমরা ভাগ্যবান বলেই তোমাদের কারণে তাঁর মহিমা কিছু বলতে পারলাম। একবার মাত্র হরিদাসের নাম করলেই সে গোলোকে যেতে পারে। এই সব কথা বলে নাগরাজ থামলেন, সজ্জনগণ শুনে সন্তুষ্ট হলেন। শ্রীকৃষ্ণসেবক অনন্তনাগ হরিদাস ঠাকুরের মহিমা কীর্তন করলেন। শুনে সকলেই অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন।

গৌরচন্দ্রের বাল্যকালের পূর্বেই এই ঘটনা ঘটেছে। প্রভুর জন্মের আগে সমাজে অভক্তদেরই প্রাধান্য ছিল। কীর্তনের খবরও কেউ রাখত না। কোথাও বিষ্ণুভক্তির কোন অনুষ্ঠান হত না, বৈষ্ণবগণকে সাধারণ লোকেরা উপহাস করত। সাধুগণ নিজেদের মধ্যে হাততালি দিয়ে চুপেচাপে নাম করতেন। পাষণ্ডগণ তাতেও এঁদের নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত। বলত, এই বামুনদের কারণে দেশ ছারখারে যাবে, দেশে দুর্ভিক্ষ হবে। সরল মানুষদের ঠকিয়ে ভিক্ষা করে খাবার জন্যেই এরা কীর্তনের কৌশল ধরেছে। বর্ষার চার মাস ভগবানের নিদ্রার সময়। এ সময় তাঁকে ডেকে ঘুমভাঙ্গানো উচিত নয়। ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি রেগে যাবেন, দেশে দুর্ভিক্ষ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ বলে—যদি ধানের দাম বাড়ে তাহলে এগুলোকে ঘাড়ে ধরে আচ্ছা করে মারব। মাঝামাঝি লোকেরা কেউ বলে, একাদশীতে রাত জেগে ভগবানের নাম করব, রোজ কীর্তন করবার কি আছে? ভক্তগণ এই সব আলোচনা শুনে দুঃখ পেলেও কিন্তু কীর্তন করা ছাড়েন না। সমাজে ভক্তিহীনতা দেখে হরিদাসও মনে বড়ই দুঃখ পান। তথাপি তিনি উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্তন করে চলেছেন। পাষণ্ডগণ কিন্তু কিছুতেই উচ্চকীর্তন সহ্য করতে পারছে না।

হরিনদী গ্রামের এক দুর্মতি বামুন হরিদাসকে দেখে রেগে গিয়ে বলছে, চীৎকার করে ভগবানকে ডাকার কি দরকার? শাস্ত্রে আছে, মনে মনে তাঁকে ডাকতে হয়। কোন্ শাস্ত্র বলেছে চীৎকার করতে? এখানকার পণ্ডিতদের কাছেই জেনে নাও না। হরিদাস

তার প্রত্যুত্তরে বললেন, তোমরা ব্রাহ্মণেরাই তাঁর তত্ত্ব জান। তোমাদের কাছে আমি যা শুনেছি বলে বেড়াই। শাস্ত্রে আছে, উচ্চৈস্বরে নাম করলে শতগুণ পুণ্য হয়, দোষ তো কিছু নেই তাতে। ব্রাহ্মণ বলে, উচ্চৈস্বরে নাম করলে পুণ্য হবার কারণ কি? হরিদাস উত্তর দিলেন, বেদে ভাগবতে যা আছে শোন। তখন হরিদাস ঠাকুরের মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা স্ফুরণ হতে লাগল এবং তিনি কৃষ্ণভক্তির আনন্দে বলতে লাগলেন, একবার কৃষ্ণনাম শুনলে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ পর্যন্ত বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়। ভাগবতে সর্পদেহধারী বিদ্যাধর সুদর্শন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন, একবার মাত্র তোমার নাম উচ্চারণ করলে জীব তখনই নিজেকে এবং নিজের মত সমস্ত শ্রোতাকে এবং সেই শ্রোতাদের সঙ্গীদেরও পবিত্র করে দেয়। এমন মহাভক্ত সেই তোমাব চরণেব ছোঁয়া পেয়ে আমিও যে নিশ্চয় নিজেকে এবং অন্য সকলকেও পবিত্র করব তাতে এমন বলার কি আছে? পশুপক্ষী কীটেরা হরিনাম নিতে পারে না। তারা হরিনাম শুনেই উদ্ধাব পায়। জপ করে নিজে উদ্ধার পায় আর উচ্চস্বরে কীর্তন কবলে পবোপকাব হয। তাই উচ্চকীর্তনে শতগুণ ফল হয় শাস্ত্রে বলেছে। নারদীয় সূত্রে প্রহ্লাদ বলেছেন, যিনি শ্রীহরির নাম মনে মনে জপ করেন তাঁর চেয়ে উচ্চস্বরে কীর্তন করলে যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ বলা হয় তা খুবই যুক্তিযুক্ত। কেননা, জপকাবী কেবল নিজেকেই পবিত্র করতে পারেন, উচ্চস্বরে কীর্তন করলে নিজেও পবিত্র হন এবং শ্রোতাদেরও পবিত্র করতে পাবেন। জপেব চেয়ে কীর্তনকে এই জন্যই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে যে , জিহ্বা পেয়েও অন্য প্রাণী কৃষ্ণনাম নিতে পারে না। মানুষ পারে। প্রাণীগণের ব্যর্থজন্ম কীর্তন শুনে নিস্তাব লাভ কবে। শুধু নিজের জন্য না ভেবে যাঁরা পরের জন্যেও ভাবেন তাঁরাই উচ্চকীর্তন করেন। ব্রাহ্মণ হবিদাসের কথা শুনে রেগে গিয়ে গালমন্দ কবতে লাগল, এখন হরিদাস দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করতে লেগেছে। কালে কালে দেখছি বেদ নাশ হতে চলেছে। যুগশেষে শূদ্র বেদ ব্যাখ্যা করবে বলা আছে। তা দেখছি, এখনই আরম্ভ হযে গেছে, শেষে আর কি হবে? এভাবে নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞ প্রচার করে লোকের বাড়িতে ভালমন্দ খেযে বেড়াচ্ছিস? তোর এই কথা যদি ঠিক না হয় তাহলে তোর নাক কেটে তার মধ্যে নুড়ি ঢুকিয়ে দেব। অধম বামুনের কথা শুনে হরিদাস 'হরি' বলে একটু হাসলেন মাত্র, কিছু বললেন না। উচ্চস্বরে কীর্তন করতে করতে চললেন। ঐ গ্রামের বামুনেরা সকলেই পাপমতি। তারা শুনে কেউ কিছুই বলল না। এরা নামেই ব্রাহ্মণ, এরা যম-যাতনা পেয়ে ভুগবে তাতে আর সন্দেহ নেই। কলিযুগে রাক্ষসেরা সাধুদের হিংসা করবার জন্য ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মাবে। বরাহপুরাণে ভগবান শিব বলেছেন, কলিকালে রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম পেয়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে কাজে বাধা দেবে। শাস্ত্রে আছে, এ সব ব্রাহ্মণের কথা, ছোঁয়া বা নমস্কাব পর্যন্ত গ্রহণ করতে নেই। পদ্মপুরাণে দেবাদিদেব বলেছেন, এসব বেশি বলাব দরকার নেই। যে সব ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব, ভুলেও তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে না এবং তাদের ছোঁবে না পর্যন্ত। অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলাপ করলেও পুণ্য ক্ষয় হয। খানিক দিন পরে এই অধম বামুনের বসন্ত রোগ হয়ে নাক খসে পড়ল। হরিদাস ঠাকুরকে কুবাক্য বলার জন্যই যেন ভগবান তাকে শাস্তি দিলেন।

জগৎবাসীকে ভক্তিশূন্য দেখে দুঃখে হরিদাস 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। বৈষ্ণব দর্শন করার জন্য তাঁর মন বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। তাই তিনি নবদ্বীপে চলে এলেন। হরিদাস ঠাকুরকে পেয়ে ভক্তগণও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অদ্বৈতাচার্য হরিদাসকে

খুব যত্ন করে গ্রহণ করলেন। সকল বৈষ্ণবই হরিদাসকে ভালবাসেন, হরিদাসও সকলকে বড় ভক্তি করেন। এতকাল পাষণ্ডীরা তাঁকে যে সব কষ্ট দিয়েছে লোকেরা তা সবই আস্তে আস্তে জানালো। ভক্তগণ সর্বদা গীতা ভাগবত পাঠ-বিচারে ব্যস্ত। আগের কথা সকলেই প্রায় ভুলে গেছেন। এই আখ্যান যে পড়ে অথবা শোনে সে অবশ্যই ভগবান গৌরচন্দ্রকে লাভ করবে।

১/১২ শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয়, নিত্যকলেবর, সর্ববৈষ্ণবের ধন-মন-প্রাণ, মহেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর কৃপাদৃষ্টি দ্বারা সর্বজীবের ত্রাণ করেন। তাঁর জয় হোক। প্রভু গয়ায় যাত্রা করেছেন। আদি খণ্ডে এই কাহিনী সাবধানে শোনা উচিত।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপে অধ্যাপক্-শিরোমণিরূপে বাস করছেন। সমাজে পাষণ্ডের উৎপাত চলছে চারদিকে। কোনও স্থানেই ভক্তিযোগের নামমাত্রও শোনা যায় না। অনিত্য সংসারসুখেই লোকের অত্যন্ত আদর। তাই ভক্তগণের মনে অত্যন্ত দুঃখ। প্রভু অধ্যাপনা নিয়ে ব্যস্ত আছেন দেখেও ভক্তগণ মনে সুখ পাচ্ছেন না। পাষণ্ডীগণ বৈষ্ণবদের নিন্দা করেই চলেছে, প্রভু তা নিজেই শুনতে পাচ্ছেন। প্রভু ভাবলেন, তিনি আগে গয়াতে যাবেন এবং গয়া থেকে ফিরে এসে আত্মপ্রকাশ করে ভক্তদের দুঃখ দূর করবেন। ইচ্ছাময় ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের গয়াধাম দেখতে ইচ্ছা হল। সেখানে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি করবার জন্য তিনি অনেক শিষ্য নিয়ে যাত্রা করে চললেন। জননীর আজ্ঞা নিয়ে আনন্দে গয়াভূমি দর্শনে চলেছেন। বহু দেশ-গ্রামকে পুণ্য তীর্থময় করে তিনি গয়াতে পৌঁছলেন। শিষ্যদের সঙ্গে নানা কথা আলাপ করতে করতে প্রভু মন্দার পর্বতে এসে পৌঁছলেন। মন্দার পর্বতে শ্রীমধুসূদন বিগ্রহ দেখে তিনি স্বরূপগত লীলার আবেশে ভ্রমণ করলেন। এই ভাবে অনেক পথ হেঁটে নিজের দেহে জ্বর প্রকটিত করলেন। তা দেখে শিষ্যগণ চিন্তিত হলেন। অনেক রকম প্রতিকারের চেষ্টা হল, তবু জ্বর ছাড়ল না। তখন প্রভু নিজেই ব্যবস্থা করলেন, ব্রাহ্মণের পাদোদকে সর্বদুঃখ নাশ হয়। ব্রাহ্মণের পাদোদকের মহিমা বুঝাবার জন্যই প্রভু নিজে তা গ্রহণ করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সুস্থ হলেন, আর গায়ে জ্বর নেই। শ্রীমধুসূদন-বিগ্রহের সেবক ব্রাহ্মণগণের মহিমা খ্যাপনের জন্য প্রভু পাদোদক গ্রহণ করে বেদ-পুরাণে বর্ণিত তাঁর ভক্তমহিমা প্রচার করলেন। গীতাতে আছে, আমাকে যে যেমন ভাবে ভজনা করে আমিও তাকে তেমন ভাবে অভীষ্ট দান করি। হে অর্জুন, লোকেরা সর্বদা আমারই প্রদর্শিত পথে চলে। যে ভক্ত ভগবানের দাসত্ব স্বীকার করেন ভগবানও তাঁর দাস হন। তাই তিনি 'সেবকবৎসল'—নিজে হেরে গিয়ে ভক্তের মহিমা প্রচার করেন। প্রভুর শ্রীচরণের দ্বারাই মানুষ সর্বত্র রক্ষা পায়। এই কারণেই সেই শ্রীচরণকে আশ্রয় করে থাকেন ভক্তসমাজ।

এবারে প্রভু জ্বরের বিনাশ সাধন করে পুনপুনা নদীর তীর্থে এসে উপস্থিত হলেন। স্নান করে পিতৃদেবের অর্চনা সমাপ্ত করে প্রভু গয়াতে প্রবেশ করলেন। হাতজোড় করে তীর্থরাজকে নমস্কার করলেন। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করেও পিতৃকার্যাদি করলেন। তারপর গয়াধামের চক্রবেড়ের ভেতরে গিয়ে বিষ্ণুপাদপদ্মের দর্শনে চললেন। পূজারী ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুপাদপদ্মের চারদিকে ঘিরে রয়েছে, পাদপদ্মের উপরে মন্দিরচূড়ার মত মালা জমেছে। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ যে কত জমেছে তার ইয়ত্তা নেই। চারদিকে ঘিরে ব্রাহ্মণেরা পাদপাদ্মের প্রভাব বর্ণনা করতে লাগলেন, এই শ্রীচরণ কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর শিব হৃদয়ে ধারণ করেন,

এই শ্রীচরণ লক্ষ্মীদেবী চিরকাল প্রাণের প্রাণ বলে গণ্য করেন, বলিমহারাজের মস্তকে বামনরূপে ভগবান বিষ্ণু এই পাদপদ্ম স্থাপন করেছিলেন, এই চরণ যে ধ্যান করে যম তার উপর অধিকার বিস্তার করতে পারে না, এই শ্রীচরণ যোগেশ্বরগণেরও দুর্লভ, এই শ্রীচরণ থেকেই ভাগীরথী প্রকাশিত হয়েছেন, ভক্তগণ এই শ্রীচরণ সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করেন, কখনো তা ত্যাগ করেন না। সম্মুখে সেই বিষ্ণুচরণই বিদ্যমান, সকল ভাগ্যবান লোকেরা তা দর্শন কর।

বিপ্রগণের মুখে চবণপ্রভাব কথা শুনে প্রভু প্রেমানন্দে আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। প্রভুর দু নয়ন দিয়ে অশ্রুধারা বইতে শুরু করেছে। রোমহর্ষ এবং কম্প হচ্ছে, সর্বজগতের সৌভাগ্যের ফলে প্রভু প্রেমভক্তি-প্রকাশ আরম্ভ করলেন। প্রভুর নয়ন থেকে গঙ্গাধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমাশ্রু ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। বিপ্রগণ দাঁড়িয়ে এই পরম অদ্ভুত দৃশ্য দেখছেন।

দৈবাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় ঈশ্বর পুরীও তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীগৌবসুন্দর ঈশ্বর পুরীকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করলেন। আনন্দিত হয়ে তিনিও প্রভুকে আলিঙ্গন করলেন। দুজনেব আনন্দাশ্রুতেই দুজনেব শরীর ভিজে গেল। প্রভু বললেন—তোমার দেখা পেয়ে আমার গযাতে আসা সফল হয়েছে। তীর্থে পিণ্ডদান করলে পিতৃপুরুষের উদ্ধার হয, যে পিণ্ড দেয় সেও উদ্ধার পায়। তোমাকে দেখা মাত্র কোটি কোটি পিতৃপুরুষ মুক্তি লাভ করেন। তাই তুমি তীর্থের চেয়েও বেশি মঙ্গলপ্রদ। আমি তোমাকে আমার দেহ সমর্পণ করলাম, তুমি আমাকে সংসাব থেকে উদ্ধার কব। তোমাব কাছে আমার ভিক্ষা, তুমি আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত পান করাও। তখন ঈশ্বর পুবী বললেন, তুমি নিজেই ঈশ্বর-অংশ। তোমার পাণ্ডিত্য এবং চবিত্র দেখেই কারো বুঝতে বাকি থাকে না যে তুমি স্বযং ঈশ্বর-অংশ। পণ্ডিত, আমি তোমাকে বলছি, শোন, আমি যা স্বপ্নে দেখেছিলাম তাই এখন সামনে দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে দেখেই আমাব অপার পরমানন্দ বোধ হচ্ছে। তোমাকে নদীয়াতে যখন দেখেছিলাম সেই থেকেই আমাব মনে আব কিছুই স্থান পেত না, কেবল তোমাকেই ভাবতাম। তোমাকে দেখে আমি কৃষ্ণদর্শনেব আনন্দ লাভ করি। ঈশ্বব পুরীব সত্য কথা শুনে প্রভু হেসে বলেন, আমার পক্ষে তা খুবই সৌভাগ্যেব কথা। এই ভাবে আরো কত কথা হল তা একমাত্র বেদব্যাসই বর্ণনা করতে পারেন।

তাঁর কাছে অনুমতি নিয়ে প্রভু এসে তীর্থশ্রাদ্ধ কবতে বসলেন। ফল্গুতীর্থে বালির পিণ্ড দান করে গিরিশৃঙ্গে প্রেতগয়া স্থানে গেলেন। শ্রাদ্ধাদি করে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিয়ে প্রভু সন্তুষ্ট করলেন। ব্রাহ্মণগণ প্রভুকে চারদিক থেকে ঘিবে মন্ত্র পডাচ্ছেন। প্রভু শ্রাদ্ধ করে পিণ্ড জলে ফেলতেই গযাবাসী ব্রাহ্মণগণ তা ধরে খেযে নিচ্ছেন। প্রভু তা দেখে হাসছেন। সেই ব্রাহ্মণগণেরও সংসারবন্ধন কেটে গেল। তারপবে তিনি উত্তরমানস, ভীমগযা, শিবগয়া, ব্রহ্মগয়া ইত্যাদি সব স্থানে গিয়ে পবে ষোড়শ গযাতে গিযে ষোড়শ দান উৎসর্গ করে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সকলকে পিণ্ডদান কবলেন। স্নান কবে গয়াশিরে এসে আবার পিণ্ডদান করে দিব্য মাল্য চন্দন দিয়ে বিষ্ণুপদচিহ্নকে পজা করলেন।

সব জায়গায় শ্রাদ্ধাদি করে ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করে বাসায ফিরলেন। একটু বিশ্রাম করে রান্নায় গেলেন। রান্না শেষ হতেই এলেন ঈশ্বর পুরী। তিনি প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে কৃষ্ণনাম করতে করতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রভু তখন রান্না ছেড়ে তাঁকে যত্ন করে বসতে দিলেন। ঈশ্বর পুরী বললেন, ভাল সময়েই এসে গেছি। প্রভু বললেন,

আমার সৌভাগ্য, আজ তুমি এখানেই ভিক্ষা গ্রহণ কর। ঈশ্বর পুরী হেসে বলেন, তা হলে তুমি কি খাবে? প্রভু উত্তর দেন, আমি এক্ষুনি আবার রেঁধে নেব। পুরীজী বললেন, আর রাঁধতে হবে না। যা আছে তাই আমরা দুজনে ভাগ করে খাব। প্রভু হেসে বলেন, তুমি যদি আমার কল্যাণ কামনা কর তাহলে বলি, তুমি এই অন্ন গ্রহণ কর। আমি এক্ষুনি রেঁধে নেব। তুমি সঙ্কোচ না করে সেবা কর। তারপর প্রভু সেই অন্ন তাঁকে দিয়ে নিজের জন্য আবার রেঁধে নিলেন। ঈশ্বর পুরীর প্রতি প্রভুর এমনই কৃপা, পুরীজীরও কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছুতে মন নেই। প্রভু শ্রীহস্তে পুরীজীকে পরিবেশন করছেন। পুরীজী পরমানন্দে ভোজন করলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই সকলের অলক্ষ্যে থেকে প্রভুর জন্য তাড়াতাড়ি রেঁধে দিলেন। প্রভুও আগে তাঁকে ভোজন করিয়ে তবে নিজে ভোজন করলেন। ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে প্রভুর এই ভোজনলীলার কথা শ্রবণ করলে কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করা যায়। ভোজনের পরে প্রভু স্বহস্তে পুরীজীর গায়ে দিব্য গন্ধদ্রব্যাদি লেপন করে দিলেন। ঈশ্বর পুরীকে প্রভু যে প্রীতি করেন তা বর্ণনার অসাধ্য।

প্রভু ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান দেখেছিলেন। কুমারহট্ট-হালিশহরকে তিনি প্রণাম জানিয়েছিলেন। প্রভু সেখানে খুব কেঁদেছিলেন। মুখে 'ঈশ্বর পুরী' ভিন্ন অন্য কোন কথা নেই। ঈশ্বর পুরীর ভিটা থেকে প্রভু মাটি নিয়ে নিজের বহির্বাসের কোণে বেঁধে নিলেন। প্রভু বললেন, ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থানের মাটি আমার জীবন-ধন-প্রাণ সবই। ঈশ্বর পুরীকে প্রভু এমনই প্রীতি করেন। ভক্তের মহিমা প্রচারের জন্যই প্রভুর এই সকল লীলা।

প্রভু বললেন, ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার গয়া আসা সার্থক হল। প্রভু ঈশ্বর পুরীর কাছে প্রার্থনা জানালেন, আমাকে দীক্ষা দান কর। পুরীজী বললেন, দীক্ষা কেন, তোমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারি। জগৎগুরু নাবাযণ স্বয়ং পুরীজীর কাছে দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করলেন। প্রভু পুরীজীকে প্রদক্ষিণ করে বললেন, আমার দেহ আমি তোমাকে দান করলাম, তুমি আশীর্বাদ কর যেন আমি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারি। প্রভুর কথা শুনে ঈশ্বর পুরী তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। দুজনই দুজনের প্রেমাশ্রুতে সিঞ্চিত হলেন। কেউই আর স্থির থাকতে পারছেন না। এই ভাবে ঈশ্বর পুরীকে কৃপা করে গৌরহরি কিছু দিন গয়াতে থেকেছিলেন। এবাবে তাঁর আত্মপ্রকাশের সময় হল, দিনদিন প্রেমভক্তির প্রকাশ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

একদিন মহাপ্রভু নিভৃতে বসে ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করছিলেন। তিনি ধ্যানানন্দের আতিশয্যে কেঁদে কেঁদে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন -হে কৃষ্ণ, হে শ্রীহরি, আমার মন হরণ করে তুমি কোথায় গেলে? এই মাত্র তোমাকে পেয়েছিলাম, তুমি এখন কোথায় গেলে? ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করে করে প্রভু কাঁদতে লাগলেন। প্রভু প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হলেন, তাঁর সমস্ত শ্রীঅঙ্গ ধূলায় ধুসরিত হয়ে গেল। তিনি আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন, হে কৃষ্ণ, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় গেলে? তাঁর পরম গম্ভীর ব্যক্তিত্ব এখন প্রেমে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছে। তিনি গড়াগড়ি দিয়ে উচ্চস্বরে কেঁদে নিজ-ভক্তি-বিরহসাগরে ভাসছেন। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যরা এসে বিশেষ যত্ন করে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন। প্রভু বললেন—তোমরা ঘরে ফিরে যাও, আমি আর সংসারে ফিরব না। প্রাণনাথ কৃষ্ণের সঙ্গে মিলবার জন্য আমি মথুরা দেখতে চলে যাব। শিষ্যগণ তাঁকে নানা ভাবে প্রবোধ দিয়ে স্থির করলেন। ভগবান ভক্তিরসে মগ্ন হয়ে পড়েছেন, মনে কোন শান্তি পাচ্ছেন না, কোথায় থাকবেন কোথায় যাবেন ঠিক করতে পারছেন না। প্রভু কাউকে কিছু না

বলে রাত্রিশেষে প্রেমাবেশে মথুরায় যেন চলেছেন আর মুখে বলছেন, হে আমার কৃষ্ণ, তোমাকে আমি কোথায় গেলে পাব? কিছুদূর গিয়ে দৈববাণী শুনলেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি এখন মথুরা যেয়ো না। যাবার সময় হলে তখন যাবে। এখন নিজের বাড়িতে নবদ্বীপে চল। তুমি বৈকুণ্ঠনাথ, লোকনিস্তারের জন্য সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছ। তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় কীর্তন প্রচার করবে, জগৎবাসীকে প্রেমভক্তি-ধন বিলিয়ে দেবে। মহাশক্তিধর শ্রীঅনন্তদেব এবং ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি এই রসে বিহ্বল হয়ে অনন্ত মঙ্গল কীর্তন করেন। তুমি সেই নাম জগৎবাসীদের মধ্যে প্রচার করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছ, একথা ভুলে যেয়ো না। আমরা তোমার সেবক মাত্র, তথাপি তোমাকে একথা স্মরণ করিয়ে দিলাম, তোমার শ্রীচরণে নিবেদন করলাম। তুমি নিজেই নিজের বিধাতা, তোমার ইচ্ছা তো কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না। এখন বাড়িতে চল, পরে সময় মত মথুরা যাবে। আকাশবাণী শুনে শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দিত মনে ফিরলেন। গৌবচন্দ্র নবদ্বীপে ফিরে এসেছেন। দিনদিনই তাঁর প্রেমভক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল।

এই খানেই আদিখণ্ডের কথা শেষ হল। এব পর মধ্য খণ্ডেব কথা বলা হবে। প্রভুব গযা গমনের কথা শুনলে তাঁকে মনের মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধা নিয়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণেব ফলে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার আর কখনো ছাড়াছাড়ি হয় না। অন্তর্যামী নিত্যানন্দেব আদেশে চৈতন্যদেবের চরিতকাহিনী গ্রন্থ লিখিত হল। শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা করে যা লেখাচ্ছেন তাই লিখছি, আমার নিজেব বিচার বুদ্ধি মত কিছুই লিখছি না। নিজেব ইচ্ছায লিখবার মত কোন শক্তি আমার নেই। বাজিকর যেভাবে পুতুল নাচায গৌরচন্দ্রও আমাকে তেমনিভাবে চালাচ্ছেন। আমি চৈতন্য কথার আদি অন্ত কিছুই জানি না, যেন-তেন প্রকারে তাঁর যশোকথা বর্ণনা কবছি। যেমন পাখী আকাশেব অন্ত পায না, যতদূর শক্তি উড়ে যায়, এও তেমনি শ্রীগৌবচন্দ্রেব কৃপায যিনি যতটুকু শক্তি পেযেছেন, তিনি ততটুকুই চৈতন্যকথা কীর্তন করছেন। ভাগবতেও আছে, পাখীরা যেমন নিজনিজ শক্তি মতই আকাশে উড়তে পারে তেমনি পণ্ডিতেবাও নিজনিজ বুদ্ধি অনুসাবেই বিষ্ণুব গতি বা লীলা বর্ণনা কবে থাকেন।

সর্ববৈষ্ণবের চরণে আমি নমস্কার জানাই আমার যেন কোন অপবাধ না হয। সংসাব-সমুদ্র পাব হযে যিনি ভক্তি-সাগরে ডুব দিতে চান তিনিই শ্রীনিত্যানন্দকে ভজন কববেন। আমাব দীক্ষাগুরু শ্রীনিত্যানন্দের প্রভু হচ্ছেন শ্রীগৌরসুন্দব, আমার মনে সর্বদা এই ভরসা আছে। কেউ কেউ বলেন, প্রভু নিত্যানন্দই বলরাম। আবার কেউ বলেন তিনি চৈতন্যের প্রিয়পাত্র। কেউ বলেন, শ্রীনিত্যানন্দ হচ্ছেন শ্রীচৈতন্যেব মহাতেজস্বী অংশ। আবার অনেকে বলেন, শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই বুঝতে পারেন না। নিত্যানন্দ সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেন। কেউ বলেন সন্ন্যাসী, কেউ বলেন জ্ঞানী, কেউ বলেন ভক্ত, যার যেমন ইচ্ছা তাই বলছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যেব যেই হোন, আমি তারই চরণ হৃদয়ে ধারণ করে আছি। এর পরেও যে নিত্যানন্দেব নিন্দা কববে তার অবশ্যই অনিষ্ট ঘটবে। চৈতন্যের অতি আপনজন নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করে আছি। নিত্যানন্দের আনুগত্যে গৌরচন্দ্রের সঙ্গ লাভ কবতে পারি। আদি খণ্ডে চৈতন্যকথা শ্রবণ করলে অবশ্যই তাঁকে লাভ করা যায। ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে বিদায নিযে প্রভু বাড়িতে চলে এলেন। নবদ্বীপের সকল লোকেই শুনে আনন্দিত হলেন, যেন তাঁরা সকলেই দেহে প্রাণ পেলেন।

যে সকল মহাত্মা আদিখণ্ডের অলৌকিক কথা শ্রবণ করেন, তাঁরা নিশ্চয় সকল প্রকার অপরাধ থেকে মুক্তি পেয়ে যান। এই আদিখণ্ড যিনি পাঠ করেন অথবা দেখে দেখে লেখেন, প্রলয়কালেও তাঁর হরিস্মৃতি বর্তমান থাকে। মহাপ্রভুর জন্ম থেকে আরম্ভ করে গয়া যাওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত কথা আলোচিত হয়েছে, পণ্ডিতগণ তাকেই আদিখণ্ড বলে আখ্যা দিয়েছেন। কি করুণা প্রকাশে, কি প্রেমভক্তি বিতরণ-বিষয়ে, কি চৈতন্যের গুণবর্ণনে, কি অকপট বাক্যে —এ সকল কোনও বিষয়েই শ্রীনিত্যানন্দের তুল্য প্রভু আর কেউ নেই।

২/১ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভুজযুগল আজানুলম্বিত, কান্তি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, নয়নদুটি পদ্মপাপড়ির মত দীঘল : —সঙ্কীর্তনের একমাত্র পিতা, বিশ্বসংসারের পোষণকারী, যুগধর্মপালক, জগতের হিতকারী দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দয়ার অবতার এই দুইজনকে আমি প্রণাম জানাই।

তুমি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে সত্য, তুমি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। তোমার সেবক, ভক্ত সকলের সঙ্গে তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকলের ত্রাণকর্তা, তোমাকে প্রণাম।

দ্বিজরাজ বিশ্বম্ভরের জয়, বিশ্বম্ভরের প্রিয় বৈষ্ণবসমাজের জয়। মহাধীর ধর্মসেতু সঙ্কীর্তনময় সুন্দরশরীর, নিত্যানন্দের বান্ধব-ধন-প্রাণ, গদাধর-অদ্বৈতের প্রেমধাম, জগদানন্দের অতিপ্রিয়, বক্রেশ্বর-কাশীশ্বরের হৃদয়, শ্রীবাসাদি প্রিয়বর্গের স্বামী শ্রীগৌরচন্দ্র, তুমি সকল জীবগণের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত কর।

শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড হচ্ছে অমৃতখণ্ড তুল্য, শুনলে মনের সব দোষ দূব হয। গ্রন্থের এই অংশেই সংকীর্তনের কথা বলা হযেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ গয়া থেকে পিতৃকার্যাদি করে নবদ্বীপে এসেছেন, জয়ধ্বনি করে উঠেছে সকলে। স্বজনগণ সকলেই খবর পেযে ছুটে এসেছেন। প্রভু সকলকেই যথাযোগ্য আপ্যায়ন করলেন। বিশ্বম্ভরকে দেখে সকলেই খুশি হয়েছেন। সকলকে ডেকে ঘরে বসিযে তীর্থের নানা কথা আলোচনা করলেন প্রভু। তিনি বললেন, —তোমাদের সবার আশীর্বাদে নির্বিঘ্নে গয়া দশন করে এলাম। প্রভু খুবই বিনয় প্রকাশ করে কথা বলছেন, তাঁব নম্রতা দেখে সবাই তুষ্ট। কেউ মাথায় হাত দিয়ে চিরজীবী হবার আশীর্বাদ করেন, কেউবা সারা গাযে হাত বুলিযে মন্ত্র পাঠ করেন। কেউ প্রভুর বুকে হাত দিয়ে আশিস্ জানিয়ে বলেন, —গোবিন্দ মঙ্গল করুন। শচীদেবীও পুত্রকে দেখে অত্যন্ত আনন্দ করছেন। নবদ্বীপ-লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিযা দেবীর বাপের বাড়িতেও আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল, স্বামীকে দেখতে পেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী খুশি হলেন। সকল বৈষ্ণবই আনন্দিত হলেন, কেউ কেউ দেখা করতেও এলেন। প্রভু সকলের সঙ্গেই বিনয় সম্ভাষণ করলেন। সকলকে বিদায় জানিয়ে তারপর নিজের ঘরে গেলেন।

বিষ্ণুভক্ত দু-চার জনকে নিয়ে তখন কিছু গুঢ় কথা আলাপ করতে লাগলেন। প্রভু বললেন, আমি গয়াঁতে প্রবেশ করেই বিশেষ মঙ্গলধ্বনি শুনতে পেলাম। হাজার হাজার ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করছেন, বলছেন—দেখ, বিষ্ণুপাদোদক তীর্থ দেখ। পূর্বকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে এসে পাদপদ্ম রেখেছিলেন সেখানেই তাঁর শ্রীপদ ধোয়ান হল। বিষ্ণুর পাদোদক বলেই তো গঙ্গার এত মাহাত্ম্য। শিব সেই তত্ত্ব জানেন তাই তিনি গঙ্গাকে মাথায় রেখেছেন। চরণামৃতের প্রভাবেই সেই স্থানের নাম হয়েছে 'পাদোদক তীর্থ'। এই কথা বলতে বলতে প্রভুর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু বর্ষণ শুরু হল। শেষে প্রভু আর নিজেকে

সামলাতে পারলেন না, 'কৃষ্ণ' বলে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর প্রেমাশ্রুতে সামনের ফুলবাগান ভিজে গেল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলতে লাগলেন। তাঁর সারা শরীর পুলকের চিহ্নে ভরে গেল। তিনি কেঁপে কেঁপে উঠছেন, স্থির থাকতে পারছেন না। শ্রীমান পণ্ডিত প্রমুখ ভক্তগণ প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-ক্রন্দন দেখলেন। গঙ্গাধারার মত প্রভুর চোখ থেকে অজস্র ধারায় প্রেমাশ্রু ঝরতে লাগল। সকলেই মনে মনে ভাবছেন, এমন তো আগে কখনো দেখি নি। গয়াতে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করে নিমাই তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছে। কিছু সময় পরে চৈতন্য লাভ করে প্রভু সকলকে বললেন, —বন্ধুগণ, তোমরা সকলে আজ ঘরে চলে যাও। কাল তোমাদের সঙ্গে আমার সব দুঃখের কথা আলোচনা করব। নির্জনে সেসব কথা হবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে। শ্রীমান পণ্ডিতকে বললেন, তুমি আর সদাশিব সেখানে তাড়াতাড়ি চলে এসো। এই কথা বলে সকলকে বিদায় করলেন আর প্রভু নিজের কাজে ব্যস্ত থাকলেন। সর্বদা প্রভুব শরীরে এখন কৃষ্ণাবেশ চলছে। সব কিছুতেই তাঁর বৈরাগ্যভাব। শচীমাতা পুত্রের অবস্থা কিছুই বুঝতে পারছেন না, তবু তিনি পুত্রকে দেখে খুশি হয়েছেন। শচীমাতা দেখছেন, প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কাঁদছেন আব অশ্রুতে সারা উঠোন ভরে যাচ্ছে। প্রভু কেবলই 'কৃষ্ণ কোথা, কৃষ্ণ কোথা' বলছেন আর বলতে বলতে অস্থির হয়ে পড়ছেন। শচীমাতা কিছুই বুঝতে না পেরে গোবিন্দের শরণ নিলেন। এবারে প্রভু স্বযং প্রকাশ আরম্ভ কবলেন। সারা ব্রহ্মাণ্ড আনন্দিত হযে উঠল। প্রভুর প্রেমবৃষ্টির শুভারম্ভ-ধ্বনি শুনে সমস্ত ভক্তবৃন্দ প্রভুকে দেখতে চলে এলেন। প্রভু তাঁদেব আবার বললেন, কাল শুক্লাম্বরের ঘরে আসবে, সেখানে নিবালায বসে সব বলব। এই অদ্ভুত প্রেমদৃশ্য দেখে শ্রীমান পণ্ডিত মনে মনে খুবই আনন্দিত হলেন।

পরদিন সকালে ভক্তগণ সকলেই ফুল তুলতে গেছেন শ্রীবাসেব বাড়িতে। সেখানে বড় এক ঝাড় কুন্দফুলেব গাছ আছে, কুন্দগাছ যেন কল্পতরু। যত ফুল তোলা যায় তবু ফুলের যেন আর শেষ নেই। সকলেই কৃষ্ণকথা বলতে বলতে ফুল তুলছেন। সেখানে গদাধর গোপীনাথ রামাই শ্রীবাস সকলেই বযেছেন। এখন সেখানে হাসতে হাসতে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীমান পণ্ডিত। সবাই জিজ্ঞাসা কবছেন, আজ এত হাসছ কেন? শ্রীমান পণ্ডিত বললেন, অবশ্যই কিছু কারণ আছে। ভক্তগণ তাঁকে ধবলেন কাবণ বলবাব জন্য। তখন শ্রীমান পণ্ডিত বললেন, অতি অসম্ভব, মহা অদ্ভুত কথা। নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণব হয়েছেন। গয়া থেকে এসেছেন শুনে আমি দেখা করতে গেলাম। দেখলাম তাঁব সমস্ত বিষযেই বৈরাগ্য। চরিত্রে বিন্দুমাত্র ঔদ্ধত্য নেই। গযাতে যা যা দেখেছেন সেসব বলতে লাগলেন, নিভৃতে সব কৃষ্ণকথা হল। বিষ্ণুব পাদপদ্মের কথা বলতেই দু চোখ দিযে অবিরাম ধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষিত হতে লাগল। সর্ব অঙ্গ মহাপুলকে পূর্ণ হয়ে গেল, 'হা কৃষ্ণ' বলেই ভূমিতে পড়ে গেলেন। মূর্ছিত হযে পড়েছেন, মনে হচ্ছে যেন দেহে জীবন নেই। খানিক পরে আচম্বিত তিনি সংজ্ঞা পেলেন। তখন এমন ভাবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কাঁদতে লাগলেন যেন চোখে গঙ্গাধারা বইছে। তাঁর মধ্যে আমি যে ভক্তি লক্ষ্য করলাম, এখন আর তাঁকে আমার মনুষ্য বলে মনে হচ্ছে না মোটেই। স্নান হলে মাত্র একটা কথাই বলেছিলেন যে, কাল শুক্লাম্বরের ঘরে দেখা করবে তোমরা সকলে গিয়ে। তুমি, সদাশিব পণ্ডিত আর মুরারি যাবে। তোমাদের কাছে মনের দুঃখ জানাব। তাঁর এই পবম মঙ্গল সংবাদ জানালাম। বুঝতেই পাবছ তোমরা যে এর নিশ্চয কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। শ্রীমান পণ্ডিতের কাছে এই খবর জেনে ভক্তবৃন্দ মহানন্দে হরিধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

প্রথমেই শ্রীবাস উচ্চারণ করলেন, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে আমাদের ভাগবত-সমাজ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমাদের গোত্রবৃদ্ধি হোক। আনন্দে সকলে মিলে পরমমোহন মধুর মঙ্গলধ্বনি শ্রীকৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্তন আরম্ভ করলেন। পরম-ভাগবতগণ সকলেই বলতে লাগলেন, —তাই হোক, তাই হোক। সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ ভজনা করুক। সকল ভক্ত ফুল তুলে নিয়ে পূজা করতে চললেন। শ্রীমান পণ্ডিত চললেন গঙ্গাতীরে। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী তাঁর নিজের বাড়িতে গেলেন।

গদাধর প্রভু এসব কথা শুনে শীঘ্র করে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে চললেন। কি কৃষ্ণকথা আলোচনা হয় তা শুনবার জন্য তিনি শুক্লাম্বরের ঘরে লুকিয়ে রইলেন। প্রেম-অনুচর সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান এবং শুক্লাম্বর সকলে একত্র হলেন। এমন সময় দ্বিজরাজ বিশ্বম্ভর এসে সেই বৈষ্ণব সমাজে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সকলে প্রভুকে পরম আনন্দে আদর করে আপ্যায়ন করলেন। প্রভুর কিন্তু এসব দিকে কোন নজর নেই। প্রভু ভক্তগণকে দেখেই ভক্তিশ্লোক আবৃত্তি করে বলে উঠলেন, আমি ঈশ্বরকে পেয়েছিলাম, তিনি কোথায় গেলেন —এই বলেই তিনি ঘরের খুঁটি জাপটিয়ে ধরে পড়ে গেলেন। ঘরের খুঁটি ভেঙ্গে পড়েছে। প্রভু আবেশে আছেন। তাঁর আলুথালু চুল উড়ছে। তাঁর মুখে একটা মাত্র কথা, —কৃষ্ণ কোথায়? প্রভু 'হা কৃষ্ণ' বলে পড়তেই ভক্তগণও ঢলে পড়লেন। গদাধরও ঘরের মধ্যে মূর্ছা গেছেন। এদিকে কে কোথায় পড়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই। সকলেই প্রেমানন্দে মূর্ছিত। এসব দেখে বিস্মিত হয়ে জাহ্নবী দেবীও বুঝি হাসছেন। কিছু সময় পরে বাহ্য জ্ঞান লাভ করে বিশ্বম্ভর বিলাপ করে কেঁদে চললেন, হে আমার প্রভু কৃষ্ণ, তুমি কোথায় গেলে? এই বলে আবার তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। প্রভু শ্রীশচীনন্দন কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদছেন, তাঁকে চার দিকে ঘিরে ভক্তগণও কাঁদছেন। কতবার যে প্রভু আছড়ে আছড়ে পড়ছেন তার কোন গোনাগুন্তি নেই। নিজের এই প্রেমলীলার প্রতি তাঁর যেন কোন হুঁশই নেই। ভক্তগণ আকুল হয়ে কৃষ্ণনাম কীর্তন করে চলেছেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ি প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। বিশ্বম্ভর কিছু সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসলেন, এদিকে নিরন্তর আনন্দধারা বয়ে চলেছে। প্রভু জিজ্ঞাসা করছেন, ঘরের ভেতরে কে রয়েছে? ব্রহ্মচারী বললেন, তোমার গদাধর। গদাধর পণ্ডিত মাথা নিচু করে কাঁদছিলেন। প্রভু তা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, গদাধর, তোমাদের সৌভাগ্য, তোমরা ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণভক্ত। আমার জীবন বৃথা গেল। অমূল্য নিধি যদিওবা পেলাম তাও কপালদোষে হারালাম। এই বলে বিশ্বম্ভর মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর সর্বসেব্য কলেবর ধুলোয় লোটাচ্ছে তখন। একবার বাহ্যজ্ঞান হয়, আবার পড়ে যান। আছাড়ে আছাড়ে নাক-মুখও বুঝি বাঁচে না। দুই চোখ প্রেমাশ্রুতে ভরে গেছে, তিনি তাকাতে পারছেন না। মুখে কেবল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলেই চলেছেন। সকলকে জড়িয়ে ধরে কেবল একটাই কথা জিজ্ঞাসা করছেন, বন্ধুগণ, শীঘ্র বল, কৃষ্ণ কোথায় গেলেন? ভক্তগণ, প্রভুর আর্তি দেখে কাঁদছেন, কারো মুখে একটি রা নেই। প্রভু বলছেন তোমরা আমার দুঃখ দূর কর। নন্দ-নন্দনকে আমার কাছে এনে দাও। এই বলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রভু কাঁদছেন। মাটিতে চুল লুটোচ্ছে, তা বাঁধবার কোন চেষ্টা নেই। এই আনন্দে সারাদিন যেন এক পলকেই চলে গেল। প্রভু সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

গদাধর, সদাশিব, শ্রীমান পণ্ডিত, শুক্লাম্বর প্রমুখ সকলেই বিস্মিত হলেন। প্রভুর প্রেমদৃশ্য দেখে সকলেই হতবাক হয়ে গেলন। অপূর্ব কাণ্ড দেখে সকলেই আত্মহারা।

এঁরা সকলে এসে অন্যান্য বৈষ্ণবগণের কাছে আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। পরমবৈষ্ণবগণ সকলেই এই সংবাদ পেয়ে 'হরি হরি' বলে কেঁদে উঠলেন। এই অপূর্ব প্রেমকথা শুনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হলেন। কেউ কেউ বললেন, বুঝি ঈশ্বরই আবির্ভূত হয়েছেন। কেউ বললেন, নিমাই পণ্ডিত একটু সুস্থ হলেই পাষণ্ডীদের মুণ্ডু ভাঙ্গব। কেউ বলছেন, গয়াতে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই নিমাই কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। এই রকম ভক্তগণের মধ্যে একেক জন একেক কথা বলছেন। তবে সকলে মিলেই কিন্তু আশীর্বাদ করতে লাগলেন যে তাঁর প্রতি যেন কৃষ্ণের কৃপা বর্ষিত হয়। সকলে মিলে আনন্দে নেচে গেয়ে কেঁদে কীর্তন করতে লাগলেন।

ভক্তবৃন্দ মনের খুশিতেই রয়েছেন। ঠাকুর আবিষ্ট হয়ে রয়েছেন নিজের ঘরে। একটু বাহ্যজ্ঞান হতেই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়িতে চললেন। গুরুকে প্রণাম করতেই গুরু উঠে ছাত্রকে আলিঙ্গন দান করে বললেন, তোমার জীবন ধন্য, বাপু, তুমি পিতৃকুল-মাতৃকুল উদ্ধার করলে। তোমার ছাত্রগণ সকলেই তোমার অপেক্ষায় রয়েছে। ভগবান এসে বসলেও কেউ বই ছোঁবে না। এখন তুমি এসেছ, তুমিই পড়াবে। আজ বাড়িতে চলে যাও। গুরুকে প্রণাম করে বিশ্বম্ভর চলেছেন। ছাত্রগণ তাঁকে ঘিরে রয়েছেন, যেন—নক্ষত্রবেষ্টিত শশধর। এভাবে তিনি মুকুন্দ-সঞ্জয়ের বাড়িতে এসে চণ্ডীমণ্ডপে বসলেন। মুকুন্দ-সঞ্জয়ের পুণ্যবান পরিবার, প্রভুকে দেখে তাঁরা সকলেই আনন্দিত হলেন। পুরুষোত্তমকে কোলে নিতেই প্রভুর প্রেমাশ্রু শিশুর শরীর ভিজিয়ে দিল। পুরনারীগণ হুলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন। সারা বাড়ি আনন্দে ভরে গেল। সকলকে আশীর্বাদ করে প্রভু নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। এসে ঠাকুরঘরের সামনে বসলেন। মধুর সম্ভাষণে সকলকে বিদায় জানালেন। প্রভুর সঙ্গে আলাপ করতে এসে লোকেরা তাঁর পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। আগের সেই বিদ্যার অহংকার তো নেই বরং সর্বদা বৈরাগ্য ভাবেই থাকেন এখন। শচীদেবীও পুত্রের চরিত্র কিছুই বুঝতে পারছেন না। পুত্রের মঙ্গল কামনা করে তিনি গঙ্গাপূজা, বিষ্ণু পূজা করছেন। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, ভগবান, আমার স্বামীকে নিয়েছ, সন্তানদেব নিয়েছ, এখন কেবল একটিই বাকি আছে। হে ভগবান, অনাথিনীকে এই বর দাও যেন বিশ্বম্ভর সুস্থ শরীরে সংসার করে। এই বলে শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রের সামনে বসিয়ে দেন। প্রভু কিন্তু তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। তিনি এমন হুঙ্কার করে ওঠেন যে বিষ্ণুপ্রিয়া ভয় পেয়ে পালিয়ে যান এবং শচীমাতাও ঘাবড়ে যান। রাত্রে প্রভুর ঘুম হয় না, তিনি কৃষ্ণপ্রেমাবেশে থাকেন। তিনি বিরহ-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠেন। বাইরের লোক দেখলে নিজেকে সামলে নেন কোনমতে। ভোরে গঙ্গাস্নান করতে যান।

গঙ্গাস্নান সেরে প্রভু এসেছেন। তখনই ছাত্ররাও পড়তে এসেছে। তাঁর মুখে তো এখন 'কৃষ্ণ' ভিন্ন আর কিছু উচ্চারণ হচ্ছে না। ছাত্ররা এসব কোন খবর জানে না। ছাত্রদের অনুরোধে প্রভু পড়াতে বসলেন। কিন্তু তাঁর হয়তো ইচ্ছা সকলের সামনে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করা। তাই ছাত্ররা যখন 'হরি' বলে পুস্তক খুলল তাতে প্রভু মনে আনন্দ পেলেন। হরিধ্বনি শুনতে পেয়ে প্রভুর আর বাহ্যজ্ঞান নেই। তিনি সকলকে আশীর্বাদ জানালেন। প্রভু আবিষ্ট হয়ে সূত্র বৃত্তি টীকা সব কিছুতেই হরিনাম ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। প্রভু বলে চলেছেন, কৃষ্ণনাম চিরকালই সত্য, কোন শাস্ত্রই কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কথা বলে না। কৃষ্ণই হর্তাকর্তা পালক ভগবান। অজ ভব এঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের

আজ্ঞাবহ। কৃষ্ণচরণ ছেড়ে যে অন্য ব্যাখ্যা করে তার অকারণে সময় নষ্ট হয়। বেদ-বেদান্ত আদি যত দর্শনশাস্ত্র সকলেই কৃষ্ণভক্তি বিষয়েই উপদেশ দেন। কৃষ্ণের মায়াতেই অজ্ঞানী অধ্যাপকগণ কৃষ্ণভক্তি ছেড়ে অন্য পথ ধরে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন করুণাসাগর, জগৎজীবন, নন্দ-নন্দন এবং সেবকবৎসল। এমন শ্রীকৃষ্ণে যার মতি নেই, সে সমস্ত শাস্ত্র পড়লেও তার দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। অধম দরিদ্রও কৃষ্ণনাম নিলে তার সব দোষ কেটে যায় এবং সে কৃষ্ণধামে যেতে পারে। সকল শাস্ত্র এই কথাই বলে এতে যে সন্দেহ প্রকাশ করে তার কপালে অশেষ দুঃখ আছে। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে কৃষ্ণ ভজন ছাড়া অন্য কথা বলে সেই অধম কখনো শাস্ত্রমর্ম জানে না। গাধা যেমন বইপত্রের বোঝা বয়ে বেড়ায় সেই অধ্যাপকও তেমনি অকারণ বাক্যব্যয় করে। যে কৃষ্ণোৎসব থেকে বঞ্চিত তার শাস্ত্রপাঠ বৃথা। যিনি পুতনাকে পর্যন্ত মুক্তি দান করেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে লোকে অন্য কিছু ধ্যান করবে কেন? অঘাসুরের মত পাপীকে যিনি মুক্তিদান করেছেন লোকে তাঁর নামকীর্তন অবশ্যই করবে। যে কৃষ্ণনামে জগৎ পবিত্র হয় দুঃখিত জীব তা কিছুই জানে না। যে কৃষ্ণ-মহোৎসবে ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণ পর্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েন, তা ছেড়ে অন্য দেবদেবীর মঙ্গলগান করে লাভ কি? তারা অবশ্য ধন-কুল-বিদ্যার অহংকারে মত্ত হয়ে রয়েছে, যে কৃষ্ণ অজামিলকে পর্যন্ত উদ্ধার করেছেন তারা তাঁর খবরও রাখে না। তাই বলছি, ভাইসব, আমার কথা শোন, তোমরা অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধন ভজনা কর। লক্ষ্মীঠাকুরানী এই চরণ সেবা করার জন্য অভিলাষ করেন, এই চরণ সেবা করে শঙ্কর শুদ্ধ ভক্ত হয়েছেন। এই চরণ থেকেই জাহ্নবী প্রকাশিত হয়েছেন। এই কারণে আমরা সকলে এই চরণের ভক্ত হতে চাই। নবদ্বীপে এমন কারো সাধ্য নেই যে আমার এই ব্যাখ্যা খণ্ডন করতে পারে। —বিশ্বম্ভর নামেই পরম ব্রহ্ম মূর্তি ধারণ করেছেন, তিনি সব মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন। প্রভু আত্মগত ভাবে ব্যাখ্যা করে চলেছেন, ছাত্রগণ মোহিত হয়ে এক মনে শুনছেন। তিনি সব বিষয়েই 'কৃষ্ণ'ব্যাখ্যা করছেন। ভগবানের ব্যাখ্যা কখনও মিথ্যা নয়। কিছু পরে বিশ্বম্ভর বাহ্যজ্ঞান লাভ করে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ আমি কেমন সূত্র ব্যাখ্যা করলাম, তোমরা কিছু বুঝলে? ছাত্ররা বললেন, সব শব্দের ব্যাখ্যাতেই 'কৃষ্ণ'কে বুঝিয়ে দিলে। আমরা কেউ ঠিক মত ধরতে পারলাম না তুমি কি বলতে চাইছ। তখন প্রভু বললেন, আজ আর হবে না। পুঁথিপত্র বেঁধেছেঁদে নাও। চল গঙ্গায় চান করে আসি।

প্রভুর কথা মত সকলেই বইপত্র বেঁধে নিয়ে তাঁর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে চললেন। সমুদ্রের মাঝখানে পূর্ণচন্দ্রের মত তিনি গঙ্গায় কেলি করছেন। তাঁর এই স্নানলীলা নবদ্বীপের ভাগ্যবান লোকেরা দেখছেন। যে রূপ দেখবার জন্য ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণও বাঞ্ছা করেন, প্রভু সেই রূপে ব্রাহ্মণপুত্র হয়ে জগতে লীলা করছেন। গঙ্গার ঘাটে যাঁরাই চান করছিলেন সকলেই প্রভুর চন্দ্রবদনের দিকে তাকিয়ে আছেন। সকলেই তখন বলাবলি করতে লাগলেন, এমন ছেলের পিতামাতার জীবন সত্যিই ধন্য। প্রভুর স্পর্শে এদিকে গঙ্গারও উল্লাস বৃদ্ধি পেয়েছে। গঙ্গাদেবী আনন্দে তরঙ্গাদি প্রকাশ করছেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদযুগল সেবা করেন, গঙ্গাদেবীও আনন্দে তরঙ্গরূপে তাঁর সামনে নৃত্য করছেন। গঙ্গাদেবী যেন ঘুরে ঘুরে প্রভুর গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। এই সকল লীলার মর্ম কিছু ব্যক্ত হয়েছে পুরাণাদি গ্রন্থে, আর পুরো আছে বেদ-উপনিষদে। স্নান করে বিশ্বম্ভরও বাড়িতে চলে গেলেন, ছাত্ররাও যে যার ঘরে চলে গেল। প্রভু বাড়িতে এসে কাপড় পালটিয়ে, পা ধুয়ে, তুলসীতলায়

জল দিয়ে যথাবিধি গোবিন্দপূজা সেরে খেতে বসলেন। মা তুলসী মঞ্জরী দিয়ে দিব্য অন্নের থালা সামনে রাখলেন। তিনি নিবেদন করে খাওয়া শুরু করলেন। শচীমাতা সামনে বসে আছেন। নবদ্বীপলক্ষ্মী পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে দেখছেন। মা জিজ্ঞাসা করছেন, আজ কি গ্রন্থ পড়লে? কার কার সঙ্গে কি কি বিষয়ে তর্কটর্ক করলে? প্রভু বললেন, আজ শুধু কৃষ্ণনাম পড়েছি। কৃষ্ণ-চরণকমলই একমাত্র গুণধাম। কৃষ্ণ-নাম-গুণ শ্রবণ কীর্তনই একমাত্র সার, কৃষ্ণভক্তের জীবনই সার্থক। যে গ্রন্থ কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ করে তাই একমাত্র সত্য শাস্ত্র, অন্যান্য গ্রন্থের কোন মূল্যই নেই। জৈমিনিভারতে অশ্বমেধিকপর্বে বলা হয়েছে, যে শাস্ত্রে বা পুরাণে হরিভক্তির বিষয় আলোচিত হয় নি, যদি স্বয়ং ব্রহ্মা এসেও বলেন, তাহলেও সেই শাস্ত্র শ্রবণ করা কখনো উচিত নয়। অসৎপথে চললে ব্রাহ্মণকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না, কৃষ্ণকথা বললে চণ্ডালও চণ্ডাল নয়।

কপিলমুনি রূপে ভগবান জননীকে যে কথা বলেছিলেন, প্রভুও এখন তাই বলছেন, মা, তুমি কৃষ্ণভক্তিব প্রভাব মন দিয়ে শোন এবং সর্বপ্রকারে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন কব। কৃষ্ণভক্তের কদাপি বিনাশ নাই, কৃষ্ণভক্তকে মহাকালও ভয় করে চলেন। কৃষ্ণভক্তকে কখনো গর্ভবাস বা জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করতে হয় না। পিতৃদ্রোহীব যে পাপ হয়, জগৎপিতা কৃষ্ণকে [illegible] না করলেও সেই পাপে পচে মবতে হয। কৃষ্ণভজনা না করলে যে দুর্গতি হয় তা মন দিয়ে শোন। বারংবার জন্মমৃত্যুর চক্রে পড়ে তাকে গর্ভে বাস করতে হয, নোংরার মধ্যে থাকতে হয়। সেই অবস্থায মা যা ঝাল-টক-নুন খায তাব ঝাঁঝ তাকে সহ্য করতে হয়। মাংসময় শরীব চারদিকে পোকায় ঘিরে থেকে ঠুকরে খায়, তাড়াবার কোন উপায থাকে না, নিশ্চেষ্ট হযে সেই কষ্ট ভোগ করেতে হয। উত্তপ্ত জঠরে সে নড়তেও পারে না, ভবিষ্যতের জন্য প্রাণ তারই মধ্যে প্রস্তুত হতে থাকে। গর্ভে গর্ভে থেকেই অতীব পাপীর জন্ম-মৃত্যু চলতে থাকে। গর্ভেব মধ্যে সাত মাসে জীবের জ্ঞান জন্মে। তখন সে আগের কাজের কথা মনে কবে অনুতাপ কবে এবং কৃষ্ণকে স্তুতি বিলাপের সঙ্গে বলে, হে জগতজীবন, প্রাণনাথ কৃষ্ণ, আমাকে বক্ষা কব। তোমাকে ছাড়া জীব আর কাকে দুঃখ জানাবে? যে বন্দী করে সেই [illegible]। অকাবণে টাকা-কড়ি পুত্রকলত্রের সুখে জীবন কাটালাম, তোমার অমূল্য চরণ ভজন কবা হয নি। ধর্মাচবণ না করে যে পুত্রদের পালন কবলাম, আমারই কর্মদোষে তাবা কোথায? এখন আমাকে এই দুঃখ থেকে কে পার করবে? এখন তুমিই একমাত্র বন্ধু, তুমি আমাকে উদ্ধার কর। এখন আমি জানলাম তোমার চরণই একমাত্র সত্য, তোমার শরণ নিলাম, কৃষ্ণ, তাই তুমিই আমাকে রক্ষা কর। তোমাব মত কল্পতরু ঠাকুবকে ছেড়ে প্রমত্ত হযে ভুলে অসৎ পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। তেমনি তার জন্য উচিত শাস্তিও দিয়েছ, এখন কৃপা কর। এই কৃপা কর যেন, যেখানেই জন্ম হোক তোমাকে ভুলে না যাই। যেস্থানে তোমাব গুণকীর্তন হয় না, যেখানে বৈষ্ণবগণ নেই, যেখানে তোমার নামে মহোৎসবাদি হয় না, ইন্দ্রলোক হলেও তেমন জায়গায় যেতে চাই না। জৈমিনিভারতেই আছে, যেখানে ভগবান বৈকুণ্ঠের নামামৃত-নদী নাই, যেখানে ভাগবতগণ নাই, এবং যেখানে যজ্ঞেশ্বব বিষ্ণুর নৃত্য-কীর্তনাদি-যজ্ঞ নাই, সাক্ষাৎ ব্রহ্মলোক হলেও সেখানে যাবার ইচ্ছা কবো না। হে ভগবান, যদি তোমার স্মৃতিতে সর্বদা থাকতে পারি তাহলে আমার গর্ভবাসও ভাল। প্রভু তুমি আমাকে এমন কৃপা কর, তোমার নাম যেখানে লোকে লয় না সেখানে

যেন আমাকে জন্মাতে না হয়। আমারই কর্মফলে আমি কোটি কোটি জন্ম ধরে ভুগে মরছি। সমস্ত বেদের সার তোমাকে যদি স্মরণে রাখতে পারি তাহলে আমি সেসব দুঃখকেও বিন্দুমাত্র গণ্য করি না। হে কৃষ্ণ, এখন দাস্যযোগ দিয়ে আমাকে তোমার শ্রীচরণে দাসীপুত্র করে রেখে দাও। একবার এই দুঃখ থেকে পার পেলে, তোমাকে ছাড়া আর কারো নাম করবনা। এইভাবে গর্ভবাসে কষ্ট ভোগ করেও কৃষ্ণস্মৃতির কারণে তার কাছে তা দুর্ভোগ মনে হয় না। স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ পায় না এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও কালপ্রভাবে তাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়। এবং ভূমিষ্ঠ হয়েই সে অজ্ঞান হয়। মূর্ছা যায়, দীর্ঘশ্বাস বয়, কখনো কাঁদে, কথা বলতে পারে না, দুঃখসাগরে ভাসে। জীব হচ্ছে কৃষ্ণের সেবক, কৃষ্ণের মায়াতে কৃষ্ণকে ভজনা না করে এই রকম দুঃখ পায়। যথাসময়ে তার জ্ঞানবুদ্ধি হয়, আর যদি কৃষ্ণ-ভজন না করে অসৎসঙ্গ করে তাহলে আবার মহাপাপে গর্ভবাস করতে হয়। ভাগবত বলছেন, মানুষ যদি সৎপথে থেকেও শিশ্নোদরপরায়ণ লোকদের সঙ্গে আমোদপ্রমোদে নিরত থাকে তাহলে সে আবার অন্ধকার নরকে প্রবেশ করে। গোবিন্দচরণের আরাধনা না করলে তার পক্ষে অনায়াস মৃত্যু এবং অঘৃণ্য জীবন লাভ সম্ভব নয়। একমাত্র কৃষ্ণভজন করলেই অনায়াস মৃত্যু এবং বিনা দৈন্যে জীবন অতিবাহিত করা যায়। তাই বলছি মা, সাধুসঙ্গ কর, কৃষ্ণভজন কর, মনে কৃষ্ণচিন্তা রাখ, মুখে 'হরি' বল। ভক্তিহীন কর্ম নিষ্ফল হয়, হিংসাযুক্ত কাজই ভক্তিহীন কাজ জানবে। —কপিলের ভাবে প্রভু মাকে উপদেশ দিচ্ছেন, পুত্রের কথা শুনে শচীদেবী মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করেছেন।

ভোজনে শয়নে জাগরণে প্রভু সর্বদা কৃষ্ণকথা আলোচনা করেই চলেছেন। ভক্তগণ আত্মীয়দের মুখে এই কথা শুনে ভাবছেন —তাঁর সাধুসঙ্গের ফলে এসব হয়েছে না কি পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে? না কি কৃষ্ণই তাঁর শরীরে প্রকাশিত হলেন? সকলের মনে আনন্দ হয়েছে এবং তাঁরা এই সব কথাই কেবল আলোচনা করছেন। ভক্তগণের দুঃখ গেল, পাষণ্ডীদের এবারে খারাপ সময় পড়েছে, মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি বৈষ্ণব-আবেশে জগতকে নিরন্তর কৃষ্ণময় দেখছেন। রাতদিন কানে কৃষ্ণনাম শুনছেন আর মুখে কেবলই কৃষ্ণনাম নিচ্ছেন। প্রভু এতদিন কেবল বিদ্যা চর্চায় মগ্ন ছিলেন, এখন কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু পছন্দ করেন না।

ছাত্ররা খুব ভোরেই এসে হাজির হয়। প্রভু গিয়ে পড়াতে বসেন কিন্তু তাঁর মুখে কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই আসে না। ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করে, —বর্ণ কোন্ সংজ্ঞায় সিদ্ধ হয়? প্রভু উত্তর দেন, সর্ববর্ণে নারায়ণই সিদ্ধ। ছাত্ররা জানতে চায়, কি করে তা হল? প্রভু ঘোষণা করেন, কৃষ্ণের দৃষ্টিপাতে তা হয়েছে। শিষ্যগণ অনুরোধ জানায়, পণ্ডিতজী, ঠিক ব্যাখ্যা করুন। প্রভু উপদেশ দেন, সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ কর। কৃষ্ণভজনের কথা সঠিক ভাবে শোন, আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণভজনই উদ্দেশ্য। —প্রভুর ব্যাখ্যা শুনে শিষ্যরা হাসাহাসি করে। কেউ বলে, বায়ু হয়েছে। শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করে, এ কি রকম ব্যাখ্যা? প্রভু বলেন, শাস্ত্রবিধান মতই বলছি। এখন যদি না বুঝতে পার তবে রেখে দাও, বিকেলে তোমরা সবাই এসো।

শিষ্যগণ প্রভুর এই কথা শুনে সকলে বইপত্র বন্ধ করে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে চলে গেল। তাঁকে জানালো, নিমাই পণ্ডিত এখন সব কিছুতেই কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করছেন। গয়া থেকে আসার পরই কৃষ্ণ ছাড়া মুখে আর অন্য কথা নেই। 'কৃষ্ণ' বলতেই শরীরে

আনন্দ আসে, কখনো হাসেন, কখনো হুঙ্কার করে ওঠেন। প্রত্যেক শব্দে ধাতু সূত্র একত্র করে কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর অবস্থাতো মোটেই ভাল দেখছি না। আমরা এখন কি করব? উপাধ্যায়শিরোমণি গঙ্গাদাস পণ্ডিত বললেন, তোমরা আজ বাড়িতে চলে যাও। কাল সকালে এসো। আজকে বিকেলে আমি তাঁকে বলে দেব যেন ভাল করে তোমাদের পড়ান। বিকেলে তোমরাও আসতে পার। —এই কথায় ছাত্রগণ সকলেই খুশি হয়ে ঘরে চলে গেল এবং বিকেলে নিমাইয়ের সঙ্গে আবার এল। প্রভু গুরুকে প্রণাম করলে গুরু তাঁকে 'বিদ্যালাভ হোক' বলে আশীর্বাদ করলেন। আর বললেন, ব্রাহ্মণসন্তানের পক্ষে অধ্যাপনার কাজ বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী, তোমার বাবা জগন্নাথ-পুরন্দর মিশ্র, উভয় কুলে কেউ মূর্খ নেই। তোমার করা টীকাও খুব বিখ্যাত হয়েছে। পড়ানো ছাড়লেই কি ভক্তি লাভ কবা যায়? তোমাব পিতা এবং মাতামহ কি ভক্ত ছিলেন না? এই সব প্রশ্ন বিবেচনা কবে পডানোতে মন দাও, শাস্ত্র পাঠ করেই সঠিক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হওযা যায়। মূর্খ থাকলে তত্ত্ব জানবে কি কবে? এই সব বিবেচনা করে কৃষ্ণকথাও বল এবং অধ্যাপনাও কর। ঠিক মত পড়াও, অন্য বকম করবে না—আমার মাথার দিব্যি দেওয়া রইল।

প্রভু বললেন, তোমার আশীর্বাদে নবদ্বীপে আমাকে কেউ তর্কে হারাতে পাববে না। আমি সূত্র ব্যাখ্যা করে যা খণ্ডন করব, নবদ্বীপে এমন কেউ নেই যে তাকে স্থাপিত কববে। আমি গিয়ে পডাতে বসছি, দেখি কে আমাব ভুল ধবতে পারে? গঙ্গাদাস পণ্ডিত একথা শুনে খুশি হলেন। প্রভু প্রণাম কবে চললেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের আর দুঃখ কি? সবস্বতীপতি, চতুর্দশ ভুবনেব আরাধ্য বেদপতি তাঁর শিষ্য। তাবকাবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রেব মত ছাত্রবেষ্টিত হযে প্রভু চলেছেন। লক্ষ্মীপতি প্রভু একজন বিশিষ্ট লোকেব বাড়িতে এসে বসলেন এবং বসে বলতে লাগলেন, —কলিকালে সন্ধি-সমাস না জেনেও ভট্টাচার্য হয। যাব শব্দজ্ঞান নেই সেও তর্ক জুড়ে দেয। আমাকে তো এভাবে বোঝানো যাবে না। আমি যা খণ্ডন কবব আর আমি যা স্থাপন করব তার অন্যথা কববার মত কে আছে? —পরম বিপ্র বিশ্বনাথ বিশ্বম্ভরেব কথার উত্তর দেবার লোক নেই। গঙ্গাদর্শনে যে অধ্যাপকগণ গিযেছিলেন, এসব কথা শুনে তাঁদেরও মনের অহঙ্কাব সব চূর্ণ হয়ে গেল। বিশ্বম্ভরের সামনে কোন সিদ্ধান্ত দেবার মত লোক সত্যি নবদ্বীপে কেউ নেই।

বিশ্বম্ভর এই ভাবে আবেশে ব্যাখ্যা করে চলেছেন। রাত বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু কথা থামছে না। আর একজন বিশিষ্ট নাগরিকের পাশে রত্নগর্ভ আচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। জগন্নাথ মিশ্রের পরিচিত এবং একই গ্রামে দুজনের জন্ম। তাঁব তিন ছেলে, কৃষ্ণানন্দ, জীব এবং যদুনাথ-কবিচন্দ্র। এঁবা সকলেই কৃষ্ণভক্ত। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত যত্ন নিয়ে ভাগবত পাঠ কবেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের একটি শ্লোক পড়লেন, যজ্ঞপত্নীগণ দেখলেন, তিনি শ্যামকান্তি, পরিধানে সুবর্ণ আভাময় পীতাম্বর, বনমালা, ময়ূবপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও প্রবালে নটরূপ তাঁর বেশ, তিনি একটি হাত অনুগত বন্ধুদেব কাঁধে বেখে আরেকটিতে লীলাকমল দোলাচ্ছেন। তাঁর দুকানে দুটি পদ্ম, গালের উপরে কোঁকড়ানো চুল এসে পড়েছে এবং মুখপদ্মে সুমধুর হাসির শোভা। ব্রাহ্মণ পরম আনন্দে ভক্তিসহ এই শ্লোক পাঠ করছেন, প্রভু তা শুনতে পেলেন। তিনি এই ভক্তের পাঠ শুনেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ছাত্ররা হতভম্ব হয়ে গেল। খানিক পরে অবশ্য প্রভু বাহ্যজ্ঞান পেলেন। প্রভু তখন মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন এবং বলছেন, আবার বল, আবার বল।

ব্রাহ্মণ আবার পড়ছেন। প্রভু কৃষ্ণসুখসমুদ্রে যেন ডুবে রয়েছেন। আনন্দাশ্রুতে মাটি ভিজে গেল। অশ্রু কম্প পুলক সবই দেখা দিল। প্রভুকে দেখে ব্রাহ্মণও খুব আনন্দ পেলেন। প্রভুর ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে তিনি আরো ভক্তিভাব নিয়ে পড়তে লাগলেন। প্রভু খুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। বৈকুণ্ঠেশ্বরের আলিঙ্গন লাভ করে রত্নগর্ভ আচার্য প্রেমে বিগলিত হয়ে পড়লেন। তখন রত্নগর্ভ প্রভুর চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন, প্রভুর প্রেমফাঁদে তিনি যেন ধরা পড়লেন। রত্নগর্ভ ভক্তিতে আবিষ্ট হয়ে বারে বারে শ্লোকটি পড়ছেন। প্রভু হুঙ্কার করে বলছেন, আবার পড়। নবদ্বীপবাসীরা এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে প্রভুকে প্রণাম করতে লাগলেন। গদাধর উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন, আর পড়বার দরকার নেই। সকলে মিলে প্রভুকে ধরলেন। একটু পরে তাঁর বাহ্যজ্ঞান এল। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি বলাবলি করছ? আমি কি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছি? ছাত্রগণ বললেন, তুমি শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের এর বেশি কিছু বলাব শক্তি নেই। আত্মীয়বান্ধবগণ বললেন, স্তুতি করো না। বিশ্বম্ভর এর মধ্যেই চৈতন্য লাভ করে নিজেকে সামলে নিলেন। তখন সকলে মিলে গঙ্গা দেখতে গেলেন। গঙ্গাকে নমস্কার করে গঙ্গাজল মাথায় ছিটিয়ে দিলেন এবং সকলে মিলে গঙ্গাতীরে বসলেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপগণকে নিয়ে যমুনাতীরে নানা লীলা করতেন শচীনন্দনও তেমনি গঙ্গাতীরে ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ আলাপ করছেন। কিছু সময় পরে সকলকে বিদায় দিয়ে বিশ্বম্ভর বাড়িতে চলে গেলেন।

সর্বভুবন-নাথ ভোজন করে যোগনিদ্রার প্রতি দৃষ্টিপাত কবলেন। রাত পোহালে সমস্ত ছাত্রেরা পডতে এল। ঠাকুর গঙ্গাস্নান করে এসে তাডাতাডি পডাতে বসে গেলেন। প্রভুর মুখে কৃষ্ণ ছাডা অন্য কথা আসে না কিছুতেই। প্রত্যেক শব্দেরই তিনি কৃষ্ণভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করছেন। ছাত্রেরা জিজ্ঞাসা করে, ধাতু-সংজ্ঞা কার? প্রভু বলেন, তোমরা মন দিযে শোন, আমি বলছি। মূল ধাতুসূত্র হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণশক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তি। আমার একথা কেউ খণ্ডন করুক তো দেখি তবে বুঝব। গন্ধচন্দনে সুসজ্জিত, কনকভূষিত যত দিব্যদেহ রাজাদের দেখছ যাঁর কথায় লক্ষ্মী থেকে যম পর্যন্ত সকলে চলেন তাঁরই ইচ্ছায় সব হচ্ছে। মূল ধাতুর অভাবে তাদেব সর্বাঙ্গের সৌন্দর্যও চলে যায় এবং তাদের কাউকে পোড়ানো হয় আবার কাউকে বা পুঁতে ফেলা হয়। সমস্ত জীবের দেহেই ধাতুরূপে কৃষ্ণশক্তি অবস্থান করেন। তাকেই সকলে আদর করে, তাকেই ভক্তি করে। অধ্যাপকগণ ভ্রমবশত এসব বুঝতে চান না। তোমরা ভেবে দেখ, কথাটা ঠিক কিনা। এখন যাকে মান্য করে নমস্কার করি, তার ধাতু চলে গেলে ছুঁয়ে চান করতে হয়। বাবা ছেলেকে আনন্দে কোলে নেয় কিন্তু তারই ধাতু চলে গেলে মুখে আগুন দিতে হয়। কৃষ্ণশক্তিই হচ্ছে ধাতুসংজ্ঞা, তাই সকলের কর্তা। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে কি? যে-কৃষ্ণশক্তি এমন পূজনীয় তাকে নিষ্ঠা নিয়ে ভক্তি করা উচিত। কৃষ্ণনাম শোন, কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ ভজন কর; দিবানিশি কৃষ্ণচরণ ধ্যান কর। নিয়ত যে কৃষ্ণচরণে দূর্বাজল দেয় তাকে যমলোক যেতে হয় না। আঘাসুর বকাসুর এবং পুতনাকে পর্যন্ত যিনি মুক্তি দিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভজনা কর। পুত্রের নামে অজামিল যাঁকে স্মরণ করে বৈকুণ্ঠে গেলেন, যাঁর পাদপদ্ম সেবা করে শিব দিগম্বর হয়েছেন, যে চরণ সেবা করার জন্য লক্ষ্মীদেবীও সাধনা করেন, অনন্তদেব যে চরণমহিমা কীর্তন করেন দন্তে তৃণ নিয়ে সেই শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজনা কর। যত দিন প্রাণে বেঁচে আছ এবং দেহে শক্তি আছে ততদিন কৃষ্ণ চরণে

ভক্তি কর। কৃষ্ণই মাতা, কৃষ্ণই পিতা, কৃষ্ণই ধনপ্রাণ সব, আমি তোমাদের পায়ে ধরে বলছি, কৃষ্ণে মন দাও। প্রভু ভক্তভাবে আপন মহিমা বলছেন, বেলা দুপুর হয়ে গেছে তবু বলেই যাচ্ছেন। ছাত্রগণ মোহিত হয়ে শুনছেন, কারো মুখে একটি কথা নেই। এটা ঠিকই যে তাঁরা সকলেই কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ যাঁদের পড়াচ্ছেন তারা কখনো অন্য কেউ হতে পারেন? খানিক পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হল। তিনি সকলের দিকে তাকিয়ে যেন লজ্জা পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ধাতুসূত্র কি রকম ব্যাখ্যা করলাম? ছাত্রগণ বললেন, ঠিকই ব্যাখ্যা করেছ। তোমার ব্যাখ্যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তোমার ব্যাখ্যা সবই ঠিক, তবে আমরা অবশ্য অন্য উদ্দেশ্যে পড়ি। প্রভু বললেন, আমাকে সব কথা খুলে বল তো! সূত্ররূপে কি ব্যাখ্যা করলাম? শিষ্যগণ বললেন, এক হরিনামই ব্যাখ্যা করেছ। সূত্র বৃত্তি টীকাতে কৃষ্ণকথাই বলেছ। তোমার ব্যাখ্যা পুরোটা কেই বা বুঝতে পারে? তোমার ব্যাখ্যার ভক্তিস্রোতে যে আশীর্বাদ আমরা লাভ করেছি তাতে এটুকু বুঝতে পারছি যে তুমি সাধারণ মানুষ নও। প্রভু জিজ্ঞাসা করছেন, কেন? আমার কি বিশেষত্ব দেখলে তোমরা? ছাত্রগণ সকলেই বলছেন, তোমার যে অশ্রু কম্প পুলক আমরা দেখলাম তা আগে কখনো দেখি নি। গতকাল নগরে একজন ব্রাহ্মণের ভাগবত পাঠ শুনে তুমি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলে। তোমার দেহে প্রাণের চিহ্ন ছিল না। আমরা দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছি। জ্ঞান হতেই তুমি কাঁদতে শুরু করলে। চোখ দিয়ে গঙ্গাধারা বইতে লাগল। শেষে তোমার শরীরে এমন কাঁপুনি এল যে একশো লোকে ধরেও সামলাতে পারছিল না। তোমার দেহ পা থেকে মাথা পর্যন্ত আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। লালা ঘাম এবং ধুলোতে তোমাব গৌর অঙ্গ ভরে গেছে। সেই অপূর্বলীলা যেই দেখেছে সেই বলেছে, এ লোকটি স্বয়ং নাবায়ণ। কেউ কেউ বলেছেন, ব্যাসদেব, শুকদেব, নারদ অথবা প্রহ্লাদের পক্ষেই এসব সম্ভব আর কারো পক্ষে নয়। সকলে মিলে তখন জোর করে ধরল, একটু পরেই তোমার বাহ্য জ্ঞান হল। এসব ব্যাপার তো তুমি কিছুই জান না। আরো কি হয়েছে জান? গত দশ দিন যাবৎ তুমি কেবল কৃষ্ণভক্তি আর কৃষ্ণনামই ব্যাখ্যা করে চলেছ। দশ দিন ধরে আর কোন পড়াশোনা হয় নি। তোমাকে বলতেও তো আমরা ভয় পাচ্ছি। তুমি একেকটি শব্দের অনেক রকম অর্থ করে থাক, আমরা তার কি উত্তর দেব? —প্রভু বললেন, দশ দিন ধরে পড়ালেখা হচ্ছে না, তোমরা আমাকে বললে না কেন? সব ছাত্ররা মিলে বললেন, তুমি তো ঠিকই ব্যাখ্যা করেছ, সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তো মূলত কৃষ্ণ। এই শিক্ষাই সমস্ত শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। আমাদের কর্মদোষে আমরা তোমার সত্য-শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছি না। ছাত্রগণের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে প্রভু বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছ। আমার এসব কথা অন্যত্র বলা ঠিক হবে না। আমি সব সময় দেখছি একটি কালো ছেলে মুরলী বাজাচ্ছে। আমি কেবলই কৃষ্ণনাম শুনছি। আমি দেখছি, সবই গোবিন্দের ধাম। তোমাদের কাছে একটা কথা বলছি, আজ থেকে আমি আর পড়াব না। আমি বলে দিচ্ছি, তোমাদের যাঁর কাছে ইচ্ছা তাঁর কাছে গিয়ে পড়। নির্ভয়ে এবং নির্ভাবনায় তাই কর। আমি তোমাদের সত্যি করে বলছি, আমার মুখ দিয়ে 'কৃষ্ণ' ভিন্ন অন্য কথা আর বেরুচ্ছে না। আমার মনের কথা তোমাদের কাছে সবই বললাম। এই বলে মহাপ্রভু চোখের জলে ভেসে পুঁথিপত্র বেঁধেছেঁদে রাখলেন। শিষ্যগণ তখন নমস্কার করে বললেন, আমরাও স্থির করেছি, পড়া ছেড়ে দেব। তোমার কাছে যা শিখেছি এখন অন্যত্র গিয়ে আমাদের আর মন ভরবে

না। গুরুবিচ্ছেদ-দুঃখে কেঁদে শিষ্যগণ বলতে লাগলেন, তোমার মুখে যে ব্যাখ্যা শুনেছি তাই জন্মে জন্মে আমাদের মনে থাকুক, আমরা এই চাই। তোমার কাছে যা শিখেছি তাই যথেষ্ট, অন্য জায়গায় গিয়ে আর কি পড়ব? হাতজোড় করে প্রভুকে এই কথা বলে শিষ্যগণ ধ্বনি দিয়ে উঠলেন, প্রভু তাঁদের আঁকড়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। শিষ্যগণ মুখ নিচু করে কাঁদছেন বটে কিন্তু তাঁদের মনে অপার আনন্দ। তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রভু তাঁদের আশীর্বাদ করে বললেন, আমি যদি এক দিনের জন্যেও কৃষ্ণভক্ত হয়ে থাকি তবে তোমাদের মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তোমরা সকলে কৃষ্ণকে আশ্রয় কর, কৃষ্ণনাম কর, কৃষ্ণগুণগান শ্রবণ কর, কৃষ্ণই তোমাদের প্রাণের প্রাণ হোক। যা পড়েছ তাই যথেষ্ট আর দরকার নেই। এবারে সকলে মিলে এক সঙ্গে কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণের আশীর্বাদেই তোমাদের অন্তরে শাস্ত্রজ্ঞান উদিত হবে, তোমরা সকলে আমার জন্মজন্মান্তরের বান্ধব, আমার পরিকর। প্রভুর মধুর বাক্যে সকলেই আনন্দিত হলেন, যাঁরা শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব লাভের সৌভাগ্য পেয়েছেন তাদের চরণে আমার প্রণাম। কৃষ্ণ যাঁদের নিজে পড়াচ্ছেন তাঁরা অবশ্যই কৃষ্ণভক্ত। সেই দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন তাঁদেরও অবশ্যই মোহবন্ধন টুটে যায়। আমি পাপিষ্ঠ বলেই তখন আমার জন্ম হয় নি এবং সেই দৃশ্যও দেখতে পাই নি। আশীর্বাদ চাই যেন সেই বিদ্যাবিলাস আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। বৈকুণ্ঠপতির সেই অধ্যাপনার চিহ্ন এখনো নবদ্বীপে বর্তমান। চৈতন্যলীলার তো শেষ কিছু নেই, শাস্ত্রে কেবল মাত্র আবির্ভাব তিরোভাব বলে উল্লেখ করেছে। এই সময় থেকেই প্রভুর অধ্যাপনার ইতি এবং সঙ্কীর্তনের প্রারম্ভ। চার দিকে শিষ্যগণের চোখে জল, কান্না। এত কাল তো পড়াশোনা অনেক হল, এখন পরিপূর্ণ মনের আনন্দে কীর্তন কর, কৃষ্ণকীর্তন। শিষ্যগণ জানতে চান, কেমন সঙ্কীর্তন? প্রভু নিজে তাঁদের শিক্ষা দেবার জন্যে বলেন:

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ৷৷

প্রভু কেদার রাগে হাতে তালি দিয়ে শিষ্যগণকে নিয়ে কীর্তন করলেন এবং তাঁদের সেভাবে গাইতে শিখিয়ে দিলেন। সংকীর্তন-পিতা নিজেই গাইছেন এবং তাঁকে ঘিরে শিষ্যরাও গাইছেন। প্রভু নিজ-নামরসের আবেশে ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। 'বল বল' বলতে বলতে প্রভু পড়ে যাচ্ছেন, আছাড়ে আছাড়ে যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। উচ্চরব শুনে নদীয়ার সব লোক প্রভুর বাড়িতে চলে এল। যে সব বৈষ্ণবগণ প্রভুর বাড়ির কাছেই থাকতেন, তাঁরা সকলেই এসেছেন। ভক্তগণ প্রভুর পরম অপূর্ব আবেশ দেখে আনন্দিত হয়ে মনে মনে ভাবছেন, এবারে নবদ্বীপে সেই সঙ্কীর্তন আরম্ভ হল। এমন দুর্লভ ভক্তি যে আছে তা জগতে কেউ জানতই না। এ দৃশ্য দেখলেও নয়ন সফল হয়। বিশ্বম্ভর ছিল মহা উদ্ধত, আজ দেখছি, নারদ প্রমুখ মুনিগণের পক্ষেও এমন ভক্তি দুঃসাধ্য। সেই উদ্ধত ছেলেটির যদি এই অবস্থা হতে পারে তাহলে বুঝলাম শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সবই সম্ভব। খানিক পরেই বিশ্বম্ভর বাহ্যজ্ঞান পেলেন এবং সকলকে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে উঠলেন। জ্ঞান হলেও অন্য কোন কথা বলছেন না। কেবলই সকল বৈষ্ণবের গলা ধরে কাঁদছেন। সকলে মিলে ঠাকুরকে স্থির করে বৈষ্ণবেরা আনন্দ করে বাড়িতে চলে গেলেন। কোন কোন ছাত্র প্রভুর সঙ্গেই প্রেমভক্তিতে মাতোয়ারা হয়ে চলেছেন। প্রভু এবারে স্বরূপ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন। তা দেখে বৈষ্ণববৃন্দের মহা আনন্দ হল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের আশীর্বাদে শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই পদ রচনা করেছেন।

২/২ জগৎজীবন জগতমঙ্গল গৌরচন্দ্রের জয় হোক, ভক্তবৃন্দ সহ তাঁর জয় হোক। আমার হৃদয়ে তোমার পদযুগল স্থাপন কর প্রভু। শ্রীচৈতন্যের কথা শুনলেও ভক্তি লাভ করা যায়।

ঠাকুরের প্রেম দেখে ভক্তগণ সকলেই মহা বিস্মিত হলেন। যে যা দেখেছেন সব কথাই অদ্বৈতাচার্যকে সকলে জানালেন। প্রভু যে অবতরণ করেছেন, অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে তা সবই জানেন। তবু অদ্বৈত-তত্ত্ব কিছু বুঝা যায় না। তাঁর ব্যবহারে সর্বদা জোয়ার-ভাঁটা খেলছে। অদ্বৈতাচার্য শুনেই খুশিতে আবিষ্ট হয়ে বলতে লাগলেন, আমি গত রাত্রে কি দেখলাম এবং অনুভব করলাম তা তোমরা মন দিয়ে একটু শোন। গীতার অর্থ বুঝতে না পেরে উপোস করে শুয়েছিলাম। মধ্যরাত্রে আমাকে একজন ডেকে বললেন, আচার্য, আর শুয়ে থেকো না, উঠে পড়। আমি তোমাকে অর্থ বলে দিচ্ছি, তুমি উঠে খেয়ে নাও। আমাকে পূজা কর। আর তো তোমার দুঃখ করার কোনো কারণ নেই। যে জন্য সঙ্কল্প করেছিলে তা তো তুমি সবই পেয়ে গেলে। যত উপবাস, আরাধনা, 'কৃষ্ণ' বলে কান্না, যার জন্যে বাহু তুলে প্রতিজ্ঞা করেছ সেই প্রভু এখন তোমার সামনে হাজির। সর্বত্র কৃষ্ণকীর্তন হবে, ঘরে ঘরে, নগরে নগরে সর্বদা নামসঙ্কীর্তন হবে। জগতের সকলে তোমার প্রসাদে ব্রহ্মার পক্ষেও যা দুর্লভ সেই প্রতিমা দেখতে পাবে। শ্রীবাসের ঘরের সকল বৈষ্ণব তা অনুভব করতে পারবেন। আমি বিদায় নিচ্ছি। তুমি ভোজনে বস। ভোজনের সময়ে আর একবার আসব। —চোখ মেলে তাকিয়েই এই বিশ্বম্ভরকে দেখতে পেলাম। দেখতে না দেখতে যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল। কৃষ্ণ যে কখন কোন রূপে কার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হন তা আমরা বুঝতেও পারি না। এঁর বড়ভাই বিশ্বরূপ আমার কাছে এসে গীতা ব্যাখ্যা করত। এই পরম মধুর রূপবান শিশু তাকে ডাকতে আমার বাড়িতে আসত। শিশুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে আশীর্বাদ করতাম, তোমার ভক্তি লাভ হোক। অভিজাত বংশের ছেলে, নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র। নিজেও সর্বগুণান্বিত, ভাল পণ্ডিত। কৃষ্ণভক্ত হবারই উপযুক্ত। তোমাদের কাছে এ খবর পেয়ে বড়ই খুশি হলাম। তোমরাও সবাই আশীর্বাদ কর যেন তাই হয়। সকলের উপরেই কৃষ্ণের অনুগ্রহ হোক, সারা পৃথিবী কৃষ্ণনামে পূর্ণ হোক, আমরাও তাই চাই। যদি ভগবানের আবির্ভাব সত্যি হয় তাহলে সকলকেই এই শর্মার কাছে আসতে হবে। অদ্বৈতাচার্য এই কথা বলে আনন্দে হুঙ্কার করে উঠছেন, সকল বৈষ্ণবগণ জয়ধ্বনি করছেন। 'হরি হরি' বলে উঠছেন সকলে, শ্রীকৃষ্ণ যেন কৃষ্ণরূপেই অবতীর্ণ হলেন। কেউ কেউ বলছে, নিমাইকে পেলে আমরা মহা আনন্দে কীর্তন করতে পারি। ভক্তগণ আচার্যকে প্রণাম করে কৃষ্ণগুণকীর্তন করতে করতে চললেন।

প্রভুর সঙ্গে কারো দেখা হলেই প্রভু তাঁকে বিনয়ে নমস্কার করেন। ভোরবেলা প্রভু যখন গঙ্গাস্নানে যান তখন অনেক বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হয়। শ্রীবাস প্রমুখ বৈষ্ণবগণের সঙ্গে দেখা হলে ঠাকুর তাঁদের প্রণাম করেন। বৈষ্ণবেরাও খুশি হয়ে আশীর্বাদ করেন, কৃষ্ণচরণে তোমার ভক্তি হোক। কৃষ্ণনাম কর, কৃষ্ণকথা শ্রবণ না করলে রূপ বিদ্যা সবই নিরর্থক। কৃষ্ণই জগৎপিতা, কৃষ্ণই জীবন। নিষ্ঠা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজনা কর। বৈষ্ণবগণের আশীর্বাদ পেয়ে প্রভু মনে বড় আনন্দ পেলেন। তিনি তাকিয়ে বললেন,

তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর, তোমরাই কৃষ্ণভজন দিতে পার। ভক্তগণকে সেবা করলেই কৃষ্ণ অনুগ্রহ করেন। তোমরা আমাকে ধর্ম-উপদেশ করছ দেখেই আমি বুঝতে পারছি যে আমার কর্মফল ভাল। তোমাদের সেবা করলেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারব। এই বলে প্রভু সেখানেই তাঁদের পায়ে ধরেন। প্রভু কোনো বৈষ্ণবের ধুতি এগিয়ে দেন, কারো বা ভিজে কাপড় নিংড়ে দেন। কাউকে কুশ এবং গঙ্গামাটি এগিয়ে দেন। কোন দিন কারো ঝুড়ি বয়ে দিয়ে আসেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ খুবই আপত্তি করেন। তাঁরা বলেন,-তোমার এসব কাজ করা ঠিক নয়। এই ভাবে প্রভু বিশ্বম্ভর নিজের ভক্তের দাস হয়ে কাজ করেন। কৃষ্ণ সেবকের জন্য সবই করতে পারেন, ভক্তের জন্য কৃষ্ণ নিজের ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করেন। কৃষ্ণ সকলেরই বন্ধু, তাই কৃষ্ণ কাউকে বিদ্বেষ করেন না। ভক্তের কারণে কৃষ্ণ আবার সবই ত্যাগ করতে পারেন। দুর্যোধন-বংশের বিলুপ্তিই তার প্রমাণ। ভক্তের স্বভাবই হচ্ছে কৃষ্ণের সেবা করা, ভক্তের জন্যই কৃষ্ণের সব ভালবাসা। ভক্ত ভক্তিদামে কিনে নিতে পারেন কৃষ্ণকে। দ্বারকায় সত্যভামা তার সাক্ষী। সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে গূঢ়রূপে আছেন। ভক্তগণ কেউই আপন প্রভুকে চিনতে পারছেন না, তাঁদের জন্য তাই তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। কৃষ্ণভজনের ইচ্ছা থাকলে তাকে এই পথ ধরেই চলতে হবে। প্রভু নিজহাতে বৈষ্ণবের সেবা করে সকলকে শিক্ষা দিচ্ছেন, সমাজকে শেখাচ্ছেন। কারো সাজি, কাবো ধুতি তিনি নিজহাতে বয়ে দিচ্ছেন, বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করছেন না এসব করতে।

বৈষ্ণবগণ সম্ভ্রম প্রকাশ করে তাঁর হাতে ধরেন। বিশ্বম্ভরের বিনীত ভাব দেখে তাঁরা অকাতরে আশীর্বাদ করেন। বলেন, কৃষ্ণকে ভজনা কব, কৃষ্ণ-স্মবণ কর, নাম শ্রবণ কর, কৃষ্ণই সকলের জীবন-ধন প্রাণ হোক। তোমাতে যেন একমাত্র কৃষ্ণই স্ফুবিত হন। তোমার দ্বারা আমাদের সকলের দুঃখ দূর হোক। যে সব অজ্ঞ লোকেবা কীর্তনকে উপহাস করে, তারা যেন তোমার দ্বারা কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হযে ওঠে। তুমি যেমন শাস্ত্রীয় বিচারে সকল বড় বড় পণ্ডিতদের জয় করেছ তেমনি কৃষ্ণভক্তি দিয়ে সব পাষণ্ডদের উদ্ধার কর। তোমার অনুগ্রহে যেন আমরা সকলে কৃষ্ণপ্রেমে নেচে গেযে আপ্লুত থাকতে পারি। ভক্তগণ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে হাত রেখে স্নেহাশিস জানিয়ে দুঃখ করে এত কথা বলছেন, নবদ্বীপে অধ্যাপক কম নেই কিন্তু তারা কেউ কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করেন না। নবদ্বীপে যত বড় বড় জ্ঞানী তপস্বী সন্ন্যাসী রয়েছেন তাঁরা তো কৃষ্ণগুণগান কীর্তন করেনই না বরং কেবল নিন্দাই করে থাকেন। পাপিষ্ঠরা তাদের কথাই শোনে, আমাদের কেউ তৃণ বলেও জ্ঞান করে না। কোথাও একটু কৃষ্ণনাম কীর্তন শুনতে না পেয়ে আমরা বড়ই কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। এখন দেখছি সত্যি শ্রীকৃষ্ণ সকলের উপরে প্রসন্ন হয়ে তোমাকে এই পথে পাঠিয়েছেন। আমাদের দৃঢ় ধারণা যে তোমার দ্বারাই পাষণ্ডদলন কাজটি সম্পন্ন হবে। তোমার দ্বারা লুপ্ত কৃষ্ণনাম আবার প্রচারিত হোক, কৃষ্ণনাম করে তুমি চিরজীবী হও, আমরা এই কামনা করি। প্রভু ভক্তবৃন্দের আশীর্বাদ মাথা পেতে নিলেন। ভক্তের আশীর্বাদেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায়। ভক্তের মনেব দুঃখ জানতে পেরে প্রভু বিশ্বম্ভর শীঘ্র প্রকাশিত হতে ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন, তোমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র। তোমরা যা চাও তা অবশ্যই হবে। তোমরা ঠিকই বলেছ, তোমাদের কথা মত চলতে পারলে মহাকালও আমার কিছুই করতে পারবে না। আমার জীবন ধন্য হবে। পাষণ্ডীদের ভয় করবার কোন দরকার নেই। তোমরা নিশ্চিন্তে গিয়ে কৃষ্ণকীর্তন করতে থাক। ভক্তের

জন্যই প্রভু অবতীর্ণ হন্। ভক্তের দুঃখ ভগবান সহ্য করতে পারেন না। বুঝতে পারছি, তোমরা নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণকে না এনে ছাড়বে না। নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণের বৈকুণ্ঠ-আনন্দ লাভ হবে। তোমরা অবশ্যই জগৎ উদ্ধার করবে। তোমাদের চেষ্টায় কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন। তোমরা আমাকে তোমাদের সেবক বলে মনে করবে। এই আশীর্বাদ থেকে আমাকে কখনো তোমরা বিচ্যুত করো না। এই কথা বলে বিশ্বম্ভর সকলের চরণধূলি নিলেন, সকলেই তাঁকে অজস্র আশীর্বাদ করলেন। সবাই গঙ্গাস্নান করে বাড়ির দিকে চললেন। প্রভুও মনে মনে খুশি হয়ে চললেন।

ভক্তগণের দুঃখের কথা শুনে পাষণ্ডীদের প্রতি প্রভুর অত্যন্ত ক্রোধ হল। তিনি হুঙ্কার করে বারংবার বলতে লাগলেন, সব সংহার করব। আমিই সেই, আমিই সে। এই অবস্থায় তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন, কখনো মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কখনো কখনো আবার গৃহিণীকে মারতে উদ্যত হন। ভক্ত-বৈষ্ণবের আবেশে প্রভুর এই রকম অবস্থা হয়েছে। শচীমাতা বুঝতে পারছেন না যে কী ব্যাধিতে তাঁর এমন হল। একমাত্র সন্তানের এই অবস্থা দেখে শচীমাতা সকলকে বলতে লাগলেন, বিধাতা আমার স্বামীপুত্র সবই নিয়েছেন, কেবলি এই একটি মাত্র বাকি আছে। তারও যে কী মতিগতি তা আমি কিছুই বুঝতে পারি না। সে কখনো হাসে কখনো কাঁদে, কখনো মূর্ছা যায়। নিজে নিজে কথা বলে। 'পাষণ্ডীদের মুণ্ড ছিঁড়ব, মুণ্ড ছিঁড়ব' বলে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে। কখনো কখনো গিয়ে গাছের উপরে উঁচুতে ডালে বসে থাকে, চোখ বুজে সেখান থেকে মাটিতে পড়ে যায়। মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে, দাঁতে দাঁতে কড়মড় করে, মাটিতে গড়াগড়ি যায়, মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না।

কৃষ্ণভক্তির এই লক্ষণ তো লোকেরা আগে দেখে নি, শোনেও নি কখনো। বায়ুরোগী ভেবে লোকেরা পরামর্শ দেয় বেঁধে রাখতে। শচীর কাছে শুনে যারাই দেখতে এসেছে সকলেই এই একই কথা বলছে। প্রভু ঐ অবস্থাতেই পাষণ্ডদের দেখলে তেড়ে যান। বায়ুরোগ মনে করে লোকেরা হেসে পালায়। মা গিয়ে আস্তে আস্তে তাঁকে ধরে নিয়ে আসেন। লোকেরা বলে, আগের সেই বায়ুরোগ আবার দেখা দিয়েছে। ম' 'করুন, একে আর কিছু করার নেই। দু পা ভাল করে বেঁধে ঘরে আটকে রেখে দাও। কচি ডাবের জল খেতে দাও, তাহলে বায়ুরোগ আর বাড়তে পারবে না। কেউ বলে সামান্য ডাবের জলে এর কিচ্ছু হবে না। শিবাদিঘৃতে এই বায়ুরোগ সারতে পারে। স্নান না হওয়া অবধি ঠাণ্ডা তেল মাথায় দিয়ে চান করাও। শচী দেবী আর কি করবেন? লোকেরা যে যা বলে তিনি তাই করার চেষ্টা করেন। শচীমাতা চিন্তায় আকুল, তিনি মনেপ্রাণে গোবিন্দ-শরণ নিয়েছেন। শ্রীবাস প্রমুখ সকল বৈষ্ণবদের কাছে তিনি সব জানালেন। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত এলে প্রভু উঠে তাঁকে প্রণাম করলেন। ভক্তকে দেখে প্রভুর ভক্তি বেড়ে গেল। তাঁর কম্প, অশ্রুপাত, লোমহর্ষ হতে লাগল। তুলসীকে প্রদক্ষিণ করছিলেন, ভক্তকে দেখেই মূর্ছিত হয়ে গেলেন। খানিক পরে জ্ঞান হলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। কাঁপুনির জন্যে প্রভু স্থির হয়ে বসতে পারছেন না।

এই আশ্চর্য অবস্থা দেখে শ্রীবাস পণ্ডিত মনে মনে ভাবছেন, মূর্খরা একে বায়ুরোগ বলছে। আসলে হচ্ছে মহাভক্তিযোগ। জ্ঞান হলে প্রভু পণ্ডিতকে বললেন, আমার এ অবস্থা দেখে কেউ বলছে বায়ুরোগ, কেউ বলছে বেঁধে রাখতে। তুমি কি বল পণ্ডিত? তোমার কি মনে হয়? শ্রীবাস হেসে বলেন, তোমার মত এই বায়ুরোগ আমিও চাই।

তোমার উপরে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হয়েছে। তোমার শরীরে আমি মহাভক্তিযোগের সমস্ত লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনে প্রভু আনন্দিত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, সকলেই বলছে বায়ুরোগ, কেবলমাত্র তুমিই অন্য কথা বললে। আজ আমি ধন্য হলাম। তুমিও যদি বলতে যে আমার বায়ুরোগ হয়েছে, তাহলে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতাম। শ্রীবাস বললেন, তোমার মত এই রকম ভক্তিযোগ ব্রহ্মা-শিব-শুকদেব সকলেই বাঞ্ছা করেন। পাষণ্ডী-পাপীরা যাই বলুক, আমরা একসঙ্গে মিলে কীর্তন করব।

তারপর শ্রীবাস পণ্ডিত শচীদেবীকে বললেন, তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না। তোমাকে আমি বলছি, এ বায়ুরোগ নয়। এ হচ্ছে কৃষ্ণভক্তিযোগ। সাধারণ লোকেরা এসব বুঝতে পারবে না। যদি শ্রীকৃষ্ণের অনেক রহস্য দেখার ইচ্ছা থাকে তাহলে এ সব কথা সকলকে বলে বেড়াবে না। গোপন রাখবে। এই কথা বলে শ্রীবাস পণ্ডিত সেদিন চলে গেলেন। শচীমাতা বুঝতে পারলেন যে এ বায়ুরোগ নয়। দুশ্চিন্তা গেলেও মনে আশঙ্কা যে ছেলে আবার সংসার ছেড়ে না চলে যায়।

প্রভু বিশ্বম্ভর এভাবে আছেন। তিনি নিজে না জানালে তাঁর ব্যাপার কে জানতে পারে? একদিন প্রভু গদাধরকে নিয়ে অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাঁরা দুজনে গিয়ে দেখলেন যে অদ্বৈতাচার্য তুলসী-গঙ্গাজল দিয়ে অর্চনা করে দুই বাহু তুলে 'হরি হরি' বলে চীৎকার আস্ফালন করছেন। পূজা ভুলে গিয়ে একবার কাঁদছেন, একবার হাসছেন। উন্মত্ত সিংহের মত হুঙ্কার করছেন। ক্রোধ দেখে মনে হচ্ছে যেন মহারুদ্র-অবতার। প্রভু বিশ্বম্ভর অদ্বৈতকে দেখা মাত্র মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অদ্বৈত ভক্তিতে মহা শক্তিশালী। তিনি জেনে গেলেন যে এই তাঁর প্রাণনাথ, প্রাণপ্রিয় জীবনস্বামী। মনে মনে ভাবলেন,—আজ আর চোরা কোথাও যেতে পারবে না। এতদিন তুমি নবদ্বীপে লুকিয়ে ছিলে, তবে এবারে অদ্বৈতের কাছে ধরা পড়ে গেছ। আজ চোরের উপরে বাটপাড়ি হবে।—তিনি সময় বুঝে সমস্ত পূজার সামগ্রী নিয়ে এলেন। পাদ্য, অর্ঘ, আচমনী ইত্যাদি নিয়ে এসে আচার্য গৌরাঙ্গকে পূজা করতে লাগলেন। শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দিয়ে বারংবার বিষ্ণু পুরাণের শ্লোকটি পড়লেন —

> নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
> জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

প্রহ্লাদ বলেছেন,—হে কৃষ্ণ, তুমি ব্রহ্মদেব এবং গো-ব্রাহ্মণগণের মঙ্গলসাধক। সমস্ত জগতেরও কল্যাণকারী। গোপালন তোমার একটি লীলা, এই জন্যই তোমার নাম গোবিন্দ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার জানাই।—শ্লোকটি বারবার পাঠ করে অদ্বৈতাচার্য প্রভুর চরণে কাঁদছেন। আপন প্রভুকে তিনি চিনতে পেরেছেন। চোখের জলে দুটি পা ধুইয়ে দিয়ে, হাত জোড় করে পদতলে দাঁড়ালেন। —গদাধর পণ্ডিত হেসে জিভ কেটে বলছেন,—আচার্যদেব, একজন বালক ছেলেমানুষের সঙ্গে এই ব্যবহার করা কি আপনার মত লোকের পক্ষে ঠিক হচ্ছে? গদাধরের কথা শুনে অদ্বৈতাচার্যও হাসলেন এবং হেসেই বললেন,—গদাধর, এ কেমন বালক তা তুমি কিছুদিনের মধ্যেই টের পাবে। গদাধরও তখন বিস্মিত মনে ভাবলেন,—তাহলে কি ঈশ্বরই অবতীর্ণ হলেন? খানিক ক্ষণ পরে বিশ্বম্ভর চৈতন্য লাভ করে দেখলেন অদ্বৈতাচার্য আবিষ্ট হয়ে আছেন। প্রভু তখন নিজের স্বরূপতত্ত্ব গুপ্ত করে দুহাত জোড় করে অদ্বৈতের স্তুতি করতে লাগলেন। প্রভু অদ্বৈতাচার্যকে নমস্কার করে তাঁর পদধূলি নিয়ে বললেন,—আচার্যবর, তুমি আমাকে অনুগ্রহ কর। তুমি আমাকে তোমার সেবক বলেই মনে করবে। তোমাকে দেখে আমি ধন্য হয়েছি।

তুমি কৃপা করলে তবেই মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হবে। তুমিই সংসার বন্ধন ছিন্ন করতে পার, শ্রীকৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে সর্বদা প্রকাশিত হয়ে আছেন।—ঠাকুর নিজভক্তকে সঠিক শিক্ষা দেবার জন্য নিজেই আদর্শ ভক্তের মত আচরণ কবছেন। অদ্বৈতাচার্য মনে মনে ভাবছেন,—তুমি ঢংঢাং অভিনয় কি করছ? চোরের উপরে আজ আমি চুরি করেছি। তারপর তিনি হেসে বললেন,—তুমি আমার কাছে সকলের চেয়ে বড়, আমরা এক সঙ্গে থেকে কৃষ্ণকথা আলাপন করব। তোমাকে সব সময় আমি দেখতে পাব। সকল বৈষ্ণবেরই ইচ্ছা তোমাকে দেখতে এবং তোমার সঙ্গে কীর্তন করতে।—অদ্বৈতাচার্যের কথা স্বীকার করে প্রভু বাড়িতে চলে গেলেন। অদ্বৈতাচার্য বুঝতে পারলেন যে প্রভুর প্রকাশ হয়েছে, তথাপি তিনি পরীক্ষা করার জন্য শান্তিপুরের বাড়িতে চলে গেলেন। ভাবলেন,—যদি সত্যি তিনি প্রভু হন এবং আমি তাঁর দাস হই তাহলে তিনি আমাকে বেঁধে তাঁর পাশে অবশ্যই নিয়ে আসবেন। অদ্বৈতাচার্যের মনেব কথা কেউ বুঝতে পাবে না। তাঁরই শক্তির কারণে শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। এসব ঘটনা যে বিশ্বাস কববে না তার পক্ষে অদ্বৈতাচার্যের সেবা করা অনর্থক।

মহাপ্রভু রোজই বৈষ্ণববৃন্দের সঙ্গে কীর্তন করছেন। সকলেই তাঁকে দেখে মহা আনন্দিত কিন্তু কেউ নিজ-ঈশ্বরকে সঠিক চিনতে পারছেন না। তাঁব শরীবে পবম-আবেশের কথা একমাত্র অনন্তদেবই বলে শেষ কবতে পারেন, আর কাবো পক্ষে তা সম্ভব নয়। একশো লোকেও তাঁকে ধরে বাখতে পারে না। অশ্রুপাত হতে যেন শতধারার নদী বয়ে যাচ্ছে। সোনার কাঁঠালের মত তাঁর পুলকিত অঙ্গ। কখনো নানা রকম মজা কবেন, কখনো অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। মাঝে মাঝেই এক প্রহব ব্যাপী মূর্ছিত হয়ে থাকেন। জ্ঞান এলে কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কিছুই মুখে আনেন না। এমন হুঙ্কার করে ওঠেন যেন শুনে কানেব পর্দা ফেটে যায। তাঁর অনুগ্রহে কেবলমাত্র তাঁর ভক্তগণই এসব বুঝতে পারেন। কখনো সারা শরীর স্তম্ভাকৃতি হযে যায়, কখনো আবার সেই শরীরই মাখনের মত নরম হয। সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ তা দেখে বুঝতে পারছেন যে তিনি সাধারণ মনুষ্য নন্। কেউ বলেন,—ইনি অংশ অবতার। কেউবা বলেন,—এই শরীরে কৃষ্ণ বিহার করেন। অন্য একজন বলেন,—নারদ প্রহ্লাদ কিম্বা শুকদেব হবেন। কেউ কেউ বলেন,—এটা বুঝতে পারছি যে আমাদের বিপদ কেটে গেছে। শ্রেষ্ঠ ভক্তবৃন্দের গৃহিণীদের মত হচ্ছে,—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই এসে জন্মগ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন,—এটা সাব বুঝেছি যে প্রভু এসেছেন। এইভাবে লোকেরা নানা কথা ভাবছেন।

প্রভু জ্ঞান পেলেই সকলের গলা ধরে অঝোরে কেবলই কাঁদেন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন,—আমি কোথায় গেলে নন্দের নন্দন, মুরলীবদনকে পাব? প্রভু একটু সুস্থির হয়েই সকলকে বলছেন,—আমার দুঃখের কথা বলছি, শোন। আমি পেয়েও জীবনকানাইকে হারালাম, আমার দুঃখের কি আর শেষ আছে?—সকলেই প্রভুর কাছে জানতে চাইলেন যে মূল ঘটনাটা কি? তাঁরা শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁকে ঘিরে বসলেন। তিনি বলতে লাগলেন,—গয়া থেকে ফিরবার পথে 'কানাইর নাটশালা' নামক গ্রামে তমাল-শ্যামল-সুন্দর একটি বালককে দেখলাম। নবগুঞ্জায় সাজানো সুন্দব কুণ্ডল। তাব উপরে বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ। এমন ঝলমলে মণিমাণিক্য রয়েছে তার দিকে ঠিক মত তাকানো যায় না। হাতে মোহনবাঁশী, চরণে নূপুর, নীলস্তম্ভের চেয়েও সুন্দর ভুজযুগলে রত্ন-অলঙ্কার, বক্ষে শ্রীবৎসকৌস্তভে মণিহার শোভা পায। পরনে আবার হলুদ রঙের কাপড়। কানের

মকরকুণ্ডল চোখের পাশে ঝুলছে, অপূর্ব তার শোভা। সেই অপূর্ব নয়নমনোহর বেশে ছেলেটি হাসতে হাসতে আমার কাছে এল। এসে আমাকে আলিঙ্গন করেই যেন কোথায় আচম্বিতে পালিয়ে গেল।—এই যাঁর রূপবর্ণনা করলেন শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁর কৃপা না হলে তো তা বুঝতেও পারা যাবে না। এই কথা বলতে বলতেই তিনি 'হা কৃষ্ণ!' বলে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। আস্তে আস্তে সকলে মিলে ধরে তাঁকে বসিয়ে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে শ্রীঅঙ্গের ধুলো ঝেড়ে দিলেন। প্রভু তো স্থির হচ্ছেন না। কেবলই 'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বলে কাঁদছেন। কিছু সময় পরে শ্রীগৌরসুন্দর স্থির হয়ে বসলেন। তখন তাঁর অতি নম্র ভাব। সকলেই খুশি হলেন। প্রভুর এই ভক্তিকথা শুনে সকলেই বলেন,—কত পুণ্যের জোরেই তোমার সঙ্গ লাভ করে ধন্য হলাম। তোমার সঙ্গ লাভ করতে পারলে বৈকুণ্ঠও চাই না। তিলেক তোমাব সঙ্গ পেলে ভক্তি লাভ করা যায়। তুমিই আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নিয়ে তুমি কীর্তন কব। পাষণ্ডীদেব কথা শুনে শুনে এতকাল আমরা যেন জ্বলেপুড়ে মরছিলাম, এখন তোমার প্রেমব্যবহারে আমাদের শরীর মন শীতল কর।—প্রভু সন্তুষ্ট হয়ে সকলকে আশ্বাস দিযে নিজের বাড়িব দিকে চললেন। ঘরে এসেও সাংসারিক কথা কিছুই বলছেন না, সব সময়েই আনন্দ-আবেশে রয়েছেন। চোখ দিয়ে আনন্দধারা বইছে, যেন পাদপদ্মের গঙ্গা মুখমণ্ডলে এসেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে কিছু উত্তর দেন না, মুখে একমাত্র কথা,—'কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ'। কোন ভক্ত-বৈষ্ণবকে সামনে দেখলেই জিজ্ঞাসা করেন,—কৃষ্ণ কোথায আছেন? এই বলে চলেছেন আব কেবলই কাঁদছেন। সকলেই সাধ্যমত প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেন।

একদিন গদাধর পান নিযে প্রভুর কাছে এলেন। গদাধরকে দেখে প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—পীতাম্বর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ কোথায? প্রভুর সেই আর্তি দেখে সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হযে যাচ্ছে। কি বলে যে তাঁকে সান্ত্বনা দেবে তাও কেউ বুঝে উঠতে পারেন না। তখন গদাধরই সসম্ভ্রমে বললেন,—শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তোমার হৃদয়েই রযেছেন। 'হৃদয়ে আছে' শুনে প্রভু নখ দিয়ে হৃদয় চিবতে চাইছেন। গদাধর তাঁকে কোন মতে ধরে রাখলেন। বললেন,—শ্রীকৃষ্ণ এখনই আসবেন, একটু সুস্থিব হও। —এই কথা শুনে শচীমাতা গদাধবের প্রতি খুবই খুশি হলেন আর বললেন, —এমন বুদ্ধি তো কোন ছেলের দেখি নি। আমি তো ভয়ে সামনে এগুতেই পারি না। তুমি ছেলেমানুষ হয়েও অথচ কেমন সুন্দর সান্ত্বনা দিলে। বাপু, তুমি এর কাছে সব সময় থাকবে, একে ছেড়ে কোথাও যাবে না।—প্রভুর আশ্চর্য প্রেমযোগ দেখে শচীমাতা মনে মনে ভাবছেন,—এ মনুষ্য নয়, মানুষের চোখ দিয়ে কি এত জলধারা বইতে পারে? মানুষের রূপ ধরে কে এসেছে কে জানে?—ভয়ে শচীমাতা পুত্রের সামনেও আসেন না। সন্ধ্যা হলেই ভক্তগণ একে একে এসে প্রভুর বাড়িতে মিলিত হন। শ্রীমুকুন্দ তখন ভক্তি শাস্ত্রের শ্লোক পাঠ করেন। মুকুন্দের কণ্ঠের উদাত্ত স্বরে প্রভু আবিষ্ট হয়ে পড়েন। 'হরিবোল' বলে গর্জন করে প্রভু পড়ে যাচ্ছেন, কেউ তাঁকে ধরে রাখতে পারছে না। হাস্য, পুলক, গর্জন, কম্প, স্বেদ, দীর্ঘশ্বাস সবই এক সঙ্গে দেখা দিল। প্রভুর এই অপূর্ব দিব্যভাব দেখে ভক্তগণ কীর্তন করে যাচ্ছেন, ঈশ্বরে প্রেমাবেশ চলছেই। মুহূর্তের মধ্যেই যেন রাত শেষ হয়ে গেল। ভোরের দিকে প্রভু একটু বাহ্যজ্ঞান পেলেন। শ্রীশচীনন্দন এইভাবে নিজের বাড়িতে দিবারাত্র কীর্তন করে চলেছেন।

মহাপ্রভু কীর্তন করতে আরম্ভ করায় ভক্তগণের মনে আর কোন দুঃখ থাকল না।

প্রভুর 'হরিবোল' চীৎকারে পাষণ্ডীদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটল। ঘুমের ব্যাঘাত হওয়াতে বহির্মুখ লোকেরা বড়ই রেগে গেল। কেউ বলে,—এই লোকগুলোর কি হল কে জানে, এদের চীৎকার চেঁচামেচিতে ঘুমুবার উপায় নেই। কেউ বলে,—এদের গণ্ডগোলে ঘুম হচ্ছে না, কিছু দিন এরকম চললে তো আমাদের শরীর খারাপ হয়ে পড়বে। কেউ কেউ আবার বলে,—এদের চীৎকারে ভগবান অসন্তুষ্ট হবেন, তার ফলে এদের সর্বনাশ হবে। কেউ বলে,—জ্ঞানের চর্চা ছেড়ে দিয়ে অকারণ হৈ চৈ চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। অন্যরা বলে,—কিসের কীর্তন তাই বা কে জানে? শ্রীবাস ঠাকুরের অনেক পোষ্য, অনেক রান্না করতে হয়। বেশি ভিক্ষা পাবার জন্যে চার ভাই মিলে 'হরি' বলে পাগলের মত ডাক ছাড়ে। মনে মনে ভগবানকে ডাকলে কি পুণ্য হয় না? রাতে চীৎকার করলে কি বেশি পুণ্য হয়? কেউ বলে,—আরে ভাই, আচ্ছা বিপদ উপস্থিত হয়েছে। শ্রীবাসের জন্য দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। আজকে আমি দেওয়ানের সব কথা শুনেছি। বাদশা দুই নৌকা সৈন্য পাঠিয়েছে, তারা এদের ধরে নিয়ে যাবে। শ্রীবাস পণ্ডিতেরা তো দৌড়ে পালাবে, শেষে আমরাই পড়ব বিপদে। আমি আগেই বলেছিলাম যে শ্রীবাসের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে নদীতে ফেলে দাও, তখন আমার কথায় কেউ কান দেও নি, হেসেছ। এখন তার মজা টের পাবে।—আবার কেউ বলে,—আমরা কেন ঝামেলায় জড়াতে যাব? বাদশার লোক এলে শ্রীবাসকে ধরিয়ে দেব, ওরা বেঁধে নিয়ে যাবে।

নবদ্বীপে চারদিকে গুজব রটে গেল,—বৈষ্ণবদের ধরবার জন্য নৌকা করে বাদশার লোক আসছে। বৈষ্ণবগণও সেই কথা শুনলেন, তাঁরা গোবিন্দ স্মরণ করে সাহস সঞ্চয় করলেন। —শ্রীকৃষ্ণ যা করেন তাই হবে, তিনি থাকতে আমরা কাকে ভয় করব? শ্রীবাস পণ্ডিত অতি সরল লোক, যা শোনেন তাই বিশ্বাস করেন। যবনের রাজ্য, সকলেই ভয় পেলেন। প্রভু অন্তর্যামী, তিনি সবই জানেন। ভগবান যে অবতীর্ণ হয়েছেন তা ভক্তরা সকলে জানেন না, তাই প্রভু এবারে জানাতে আরম্ভ করেছেন। তিনি নির্ভয়ে বেড়াচ্ছেন। অপর্ব মদনসুন্দর, সর্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লিপ্ত। অরুণ অধর, কমল নয়ন শোভা পাচ্ছে। চাঁচর-চিকুর, পূর্ণচন্দ্রমুখ। কাঁধে সুন্দর উপবীত, পরিধানে দিব্য বস্ত্র, তাম্বূলে অধর রাঙ্গত। কৌতুকে তিনি ভাগীরথীতীরে বেড়াচ্ছেন। ভাগ্যবান লোকেরা সেই দৃশ্য দেখে আনন্দ পাচ্ছেন। পাষণ্ডীগণ বিমর্ষ হয়ে পড়ছে। এত ভয়ের কথা শুনেও তিনি মোটেই ভয় পাচ্ছেন না, রাজপুত্রের মত নগরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।—একজন বললে, —আসলে কিন্তু পালাবার পথ খুঁজছে।—বিশ্বম্ভর নির্ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে গঙ্গার স্রোত এবং সুন্দর বনাঞ্চল দেখছেন। একদল গাভী বাগানে চরে বেড়াচ্ছে, হাম্বা রব করে জল খেতে এসেছে। একটি আবার লেজ তুলে চারদিকে দৌড়াচ্ছে, একটি শুয়ে আছে, একটি শিং তুলে গুঁতোচ্ছে। এসব দেখে প্রভু হুঙ্কার করে বলে উঠছেন, — আমি সেই, আমি সেই।

বলতে বলতে তিনি শ্রীবাসের বাড়িতে চলে গেলেন দ্রুতপদে। রাগে হুঙ্কার করে বললেন,—শ্রীবাস, কি করছ? বলতে বলতে প্রভু শ্রীবাসের ঠাকুরঘরে বারে বারে লাথি মারছেন। শ্রীবাস ঘরের ভেতরে নৃসিংহদেবের পূজা করছিলেন তখন। প্রভু বললেন,—কাকে পূজা করছিস্, কার ধ্যান করছিস? যাঁকে পূজা করছিস চেয়ে দেখ তোর সামনে উপস্থিত। শ্রীবাস রেগে গেলেন, সমাধি ভঙ্গ হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখেন বিশ্বম্ভর বীরাসনে বসে আছেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ, মত্ত সিংহের মত গর্জন

করছেন। বাম কক্ষে তালি দিয়ে হুঙ্কার করছেন। এসব দেখে শ্রীবাস পণ্ডিতের শরীরে কম্প এসে গেল, তিনি চুপ করে গেছেন, মুখে কোন কথা নেই।—প্রভু তাঁকে ডেকে বলছেন,—শ্রীবাস, এতদিন আমার প্রকাশ দেখো নি। তোমার উচ্চ সঙ্কীর্তনে এবং অদ্বৈতের হুঙ্কারে আমি সপরিবারে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এখানে এসেছি, আর তুমি এদিকে আমাকে নিয়ে এসে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে রয়েছ। নাড়া-অদ্বৈত আমাকে ফেলে শান্তিপুরে চলে গেছে। আমি সাধুদের উদ্ধার করব, দুষ্টদের সব বিনাশ করব। তোর কোন চিন্তা নাই, তুই আমার স্তব পাঠ কর। —প্রভুকে দেখে শ্রীবাস প্রেমে কেঁদে দিলেন। তাঁর মনের সব ভয় কেটে গেল প্রভুর আশ্বাস পেয়ে। তাঁর সমস্ত শরীরে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। তিনি দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড় করে স্তুতি করতে লাগলেন, স্বভাবতই শ্রীবাস পণ্ডিত মহাভক্ত। তিনি প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে, ভাগবতের ব্রহ্মার মোহনাশক শ্লোক পাঠ করে স্তুতি কর'লন।—ব্রহ্মা বৎসহরণের পর শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা জেনে ভয়ে স্তব করছেন,—হে জগৎবরেণ্য, নতুন মেঘের মত তোমার গায়ের রং আর মেঘের কোলে সৌদামিণীর মত তোমার পীত বসন। গুঞ্জার কর্ণভূষণে ও চূড়ার উপরে ময়ূরপুচ্ছে তোমার বদন মণ্ডলের অত্যন্ত শোভা ধারণ করেছে। তোমার গলায় নানা বর্ণের পত্রপুষ্পের মালা এবং বাম হাতে দধিমাখা ভাতের গ্রাস, বাম বগলে বেণু ও শিঙ্গা—এই অনুপম পরম সুন্দর সজ্জা তোমার। তুমি শ্রীনন্দের নন্দন, তোমাকে পাবার জন্যই আমি তোমাকে নমস্কার করছি।—বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার। তাঁর গায়ের রং নবমেঘের—পরনে পীতবাস। নবগুঞ্জা শিখিপুচ্ছ তোমার অলংকার। বনমালায় সজ্জিত, হাতে দধিমাখা ভাত। তোমার মুখখানি কোটিচন্দ্রের চেয়ে সুন্দর। তোমাব ভূষণ হচ্ছে শিঙ্গা, বেত্র, বেণু। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের শিষ্য, শচী-জগন্নাথের তনয়, তোমাকে নমস্কার করি। চারখানি বেদে তোমাকেই নন্দের কুমার বলেছে, তোমাকে নমস্কার জানাই। ব্রহ্মস্তবে স্তুতি করে যা কিছু মনে পড়ছে সবই বলছেন,—তুমি বিষ্ণু, কৃষ্ণ, যজ্ঞেশ্বর, তোমার চরণোদক গঙ্গাতীর্থ-বারি। তুমি জানকীবল্লভ, তুমি নরসিংহ। অজ-ভব প্রমুখ দেবগণ তোমার শ্রীচরণকমলের ভ্রমর। বেদান্তজ্ঞানের দ্বারা তোমাকেই জানা যায়, তুমি নারাযণ, তুমি বামনরূপে বলিরাজাকে ছলনা করেছ। তুমি জগৎজীবন হয়গ্রীব। তুমি সকলের ত্রাণকর্তা নীলাচলচন্দ্র। তোমার মায়াতে সকলেই মুগ্ধ হয়ে অছে। লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত তা সব জানেন না। তোমাকে নিজ জন বলে ভজনা করলেই কেবল মাত্র তুমি ধরা দাও। তুমি অকারণে সংসারে ডুবিয়ে রেখেছ, তোমাকে না জেনে আমার জীবন হেলায় নষ্ট হল। নানা রকম মায়া করে তুমি আমাকে ঠকিযেছ। তুমি কত সময় আমার পূজার সাজি, ধুতি বয়ে এনে দিযেছ। আমি তাতেও ভয় পাই না, তুমি যে আমার সামনে দেখা দিয়েছ তাতেই আমার সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়েছে। তাই আজকের দিনকে আমি আমার সৌভাগ্যের দিন মনে করছি। আজ আমার জন্ম-কর্ম সফল হল। আজ আমার চোখের দৃষ্টির ভাগ্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবী যে চরণের সেবা করেন আজ আমার সামনে তাই উপস্থিত।—বলতে বলতে শ্রীবাস পণ্ডিত আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। ঊর্ধ্ববাহু হযে কাঁদছেন, তাঁর ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। ভাবে বিভোর হয়ে তিনি গড়াগড়ি করছেন। গৌরচন্দ্রের প্রকাশরূপ দেখে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছেন। সৎব্রাহ্মণ শ্রীবাস আনন্দামৃত সমুদ্রে ডুবে রইলেন।—প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি শুনে হেসে বললেন,—তোমার বাড়ির স্ত্রীপুত্র সকলকে এনে আমার এই রূপ দেখাও। তুমি সস্ত্রীক আমাকে পূজা কর। আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।

প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত সকলকে ডেকে আনলেন। ঘরে বিষ্ণুপূজার জন্যে যে ফুল ছিল তা প্রভুর চরণে দেওয়া হল। গন্ধ মাল্য ধূপ দিয়ে শ্রীবাস সস্ত্রীক প্রভুর চরণ পূজা করলেন এবং কাঁদলেন। ভাই,স্ত্রী, দাসদাসী সকলকে নিয়ে শ্রীবাস প্রভুর চরণে মিনতি জানালেন। প্রভু শ্রীবাসের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাই তাঁর পরিবারের সকলের মাথায় স্বীয় চরণের স্পর্শ দান করলেন এবং হেসে বললেন,—আমার প্রতি যেন তোমাদের সকলের মতি হয়। তারপর গর্জন করে শ্রীবাসকে বললেন,—ভয় পাচ্ছ নাকি? রাজার লোক নৌকা ভরতি করে এসে ধরবে তা শুনেছ তো? ভয় নেই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব বাস করে আমিই তাদের সব কাজে পাঠাই। আমি যদি রাজার মাধ্যমে বলি তবে তো তারা আসবে? যদি এমন হয় যে সেই রাজা নিজের ইচ্ছাতেই ধরবার জন্য লোক পাঠাচ্ছে, তাহলেও জানবে—আমিই তা চাই। রাজার নৌকা এলে আমিই সকলের আগে গিয়ে নৌকায় উঠব। আমরা রাজাব কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে রাজা কি সিংহাসনে বসে থাকতে পারবে? আমি সেখানেই তাঁদের বিহ্বল করে ফেলব। যদি তা না হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কবরে। তাও আমার ইচ্ছাতেই হবে, জানবে। আমি রাজাকে বলব,—তোমার যত কাজী মোল্লা আছে সকলকে এখানে নিয়ে এস। হাতি ঘোড়া পশুপাখী যা আছে সব নিয়ে এস। তারপর কাজীকে বল যেন সে তোমাদের শাস্ত্র পড়ে এদের কাঁদাতে পারে। যদি না পারে তখনই আমি নিজেকে প্রকাশ করব। বলব যে, দেখলে তো? এদের কথায় তুমি সঙ্কীর্তন বন্ধ করছ, এদের ক্ষমতা তো দেখলে! এবারে আমার ক্ষমতা দেখ।—এই কথা বলে পাগলা হাতি ধরে আনব। হাতি ঘোড়া হরিণ পাখি সব একত্র করে সেখানে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলে তাদের কাঁদাব। রাজার সমস্ত পাইক বরকন্দাজ সকলকে 'কৃষ্ণ' বলে কাঁদাব। তাতেও যদি বিশ্বাস না কর তবে নিজের চোখেই দেখ। তখন সেখানে একটি ছোট মেয়ে উপস্থিত ছিল। শ্রীবাসের ভাইঝি, নাম নারায়ণী। আজও পর্যন্ত বৈষ্ণব সমাজে তাঁকে 'চৈতন্যের অবশেষ পাত্র' বলে গণ্য করে। অন্তর্যামী প্রভু গৌরচন্দ্র নারায়ণীকে ডেকে বললেন,—কৃষ্ণনাম নিয়ে কাঁদ। চার বছরের সেই চঞ্চলমতি বালিকা সত্যি 'হা কৃষ্ণ' বলে কাঁদতে লাগল। তার কোন বাহ্যজ্ঞান নেই. গা বেয়ে অশ্রু পড়ে মাটি ভিজে গেল। তখন প্রভু তাঁদের সকলকে উদ্দেশ করে বললেন,—এখন তোমার ভয় কাটল তো? মহাবক্তা শ্রীবাস সমস্ত তত্ত্ব অবগত হয়েছেন। তিনি হাত তুলে প্রভুর সামনে বললেন,—তুমি ভগবানের বিগ্রহ, মহাকালরূপে যখন সমস্ত সৃষ্টি সংহার কর তখনই তোমার নামের জোরে কোন কিছুকে ভয় করি না, এখন আমি কি ভয় করব? তুমি তো আমার ঘরেই রয়েছ।—এই কথা বলে শ্রীবাস আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। পরিবারস্থ সকলেই প্রভুর প্রকাশ দেখতে পেলেন। চার বেদ মিলে যাঁকে দেখতে চায় আজ শ্রীবাসের বাড়ির ঝি-চাকবেরাও তাঁকে দেখছে। শ্রীবাসের মহৎ চরিত্রের কথা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর চরণধূলিতে সংসার পবিত্র হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন বসুদেবের ঘরে জন্ম নিয়ে নন্দরাজের ঘরে সব বাল্যলীলা করলেন এও তেমনি প্রভু জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অবতীর্ণ হয়ে লীলা সব করলেন শ্রীবাসমন্দিরে। শ্রীবাস সমস্ত বৈষ্ণবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, তাঁর বাড়িতে গিয়ে সকলেই আনন্দ লাভ করেন। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থাদি যাঁকে অনুভবে স্তবস্তুতি করে, শ্রীবাসের বাড়ির ঝি-চাকরগণ তাঁকে সানন্দে দর্শন করে। এজন্যেই বলা হয় বৈষ্ণবসেবাই হচ্ছে তাঁকে পাবার পরম পন্থা। বৈষ্ণবের কৃপায় অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাবে। প্রভু শ্রীবাসকে

আদেশ করলেন,—এসব কথা কাউকে বলবে না। বিশ্বম্ভর বাহ্যজ্ঞান পেয়ে লজ্জিত হয়ে, শ্রীবাসকে আশ্বাস দিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। সেই থেকে শ্রীবাসের গৃহ মহানন্দময়। পত্নী বধূ ভাই দাস দাসী সকলেই খুশিতে দিন কাটাচ্ছেন। শ্রীবাস প্রভুর প্রকাশ দেখে তাঁকে স্তুতি করেছেন। এই কাহিনী যে শোনে সেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে।

অন্তর্যামী রূপে ভগবান বলরাম চৈতন্যের আখ্যান বর্ণনা করতে আজ্ঞা দিয়েছেন। বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে আমার এই কামনা যেন আমি জন্মে জন্মে বলরামকে প্রভুরূপে পাই। নৃসিংহ এবং যদুপতি যেমন কেবলমাত্র নামে প্রভেদ তেমনি নিত্যানন্দ এবং বলদেব কেবল নামেরই তফাৎ, আর কিছু নয়। মূলত তত্ত্ব একই। শ্রীচৈতন্যের প্রিয় বিগ্রহ হচ্ছেন বলরাম, এখন তিনি অবধূত।

মধ্যখণ্ড-কথা ভাই! শুন এক চিত্তে।
বৎসরেক কীর্তন করিলা যেন মতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

২/৩ যাঁরা নিজ করুণাবশেই অবতীর্ণ, পৃথক মনে হলেও যাঁরা নিত্য ও ঈশ্বর, আমি জগতে অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ দুই ভাইকে ভজনা করি। নিত্যানন্দ ও গদাধরের ঈশ্বর সর্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভরের জয় হোক। ভক্তি বিতরণের কারণে অদ্বৈত প্রমুখ ভক্তবৃন্দের অধীন মহাপ্রভুর জয় হোক। দীনগণকে তুমি উদ্ধার কর।

প্রভু বিশ্বম্ভর সকল ভক্তবৃন্দকে নিয়ে ভক্তিসুখে নবদ্বীপে ভেসে বেড়াচ্ছেন। প্রাণপ্রিয় ভক্তবৃন্দের গলা ধরে প্রভু কাঁদছেন। প্রভুর প্রেম দেখে প্রভুকে ঘিরে ভক্তগণও কাঁদছেন। প্রভুর ভক্তদের কথা দূরে থাকুক, প্রভুর প্রেম দেখে শুকনো কাঠ এবং পাষাণ পর্যন্ত গলে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ভক্তবৃন্দ টাকা-কড়ি, পুত্র-কন্যা, ঘর-সংসার ছেড়ে দিনরাত প্রভুর সঙ্গে কীর্তন করছেন। গৌরচন্দ্র কৃষ্ণভক্তিময় হয়েছেন, তিনি যখন যে ভাবের পদ বা শ্লোক শোনেন তখন সেভাবেই আবিষ্ট হন। প্রভু যখন দাস্যভাবে ক্রন্দন করেন তখন দু প্রহর পর্যন্ত অজস্র অশ্রু বর্ষণ করতে থাকেন, মনে হয় যেন গঙ্গানদী এসেছেন। হাসলেও তিনি এক প্রহর সময় ধরে হাসতে থাকেন আবার মূর্ছা গেলে এক প্রহর পর্যন্ত শ্বাস থাকে না। কখনো স্বীয় স্বরূপগত ঈশ্বরভাব অনুভবে আসে, তখন তিনি যেন দম্ভ করে বসেন এবং 'আমিই সেই, আমিই সেই' বলে হাসেন। বুড়ো অদ্বৈত আমাকে ডেকে এনে এখন কোথায় গেল? আমি সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রেখে ঘরে ঘরে, জনে জনে ভক্তিরস বিতরণ করব। তখনই আবার প্রভু 'কৃষ্ণ আরে বাপ' বলে কাঁদছেন এবং নিজের চুল নিজের পায়ে বাঁধছেন। ভাগবতের অক্রূর-সংবাদের শ্লোক পড়ে পড়ে প্রভু অক্রূরভাবে আবিষ্ট হয়ে লাঠির মত সোজা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে চলতে লাগলেন,—চল নন্দ, মথুরায় গিয়ে ধনুর্যজ্ঞ দেখি, কৃষ্ণ এবং বলরামকে সঙ্গে নিয়ে চল।—এই রকম নানাভাবে নানা কথা বলছেন প্রভু। বৈষ্ণবগণ তা দেখে আনন্দ লাভ করছেন।

একদিন প্রভু বরাহদেবের লীলামহিমাদি বর্ণিত শ্লোক পাঠ শুনে বরাহের ভাবে আবিষ্ট হয়ে গর্জন করতে করতে মুরারি গুপ্তের বাড়ির দিকে চললেন। শ্রীরাম হনুমানকে যেমন স্নেহ করেন, প্রভুর অন্তরেও মুরারির প্রতি তেমনি প্রেম বর্তমান। প্রভুকে উপস্থিত দেখে

মুরারি তাঁর চরণবন্দনা করলেন। প্রভুর মুখে 'শূকর শূকর' শব্দ শুনে মুরারি গুপ্ত হতভম্ব হয়ে যান এবং কোথাও শূকর আছে কিনা তা খোঁজ করতে থাকেন। প্রভু বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করতে গিয়ে দরজার পাশে জলের গাড়ু দেখতে পেলেন। লীলাশক্তির প্রভাবে বরাহদেবের ভাবে আবিষ্ট হয়ে নিজে দাঁত দিয়ে জলপাত্র তুলে নিলেন। সর্বযজ্ঞমূর্তি ভগবান বরাহদেব গর্জন করছেন। তাঁর চারটি খুর বেরিয়েছে। তিনি বলছেন,—মুরারি, আমার স্তুতি কর। অপূর্ব মূর্তি দর্শন করে মুরারির মুখে কোন কথাই বেরুচ্ছে না। প্রভু বলছেন,—তুমি বল, তোমার কোন ভয় নেই। আমি এতদিন এখানে আছি, তুমি এখনো আমাকে চিনতে পার নি? কম্পিত মুরারি বিনীত ভাবে বলছেন,—প্রভু, তোমার স্তুতি কেবল তুমিই জান। অনন্তদেব তাঁর একটি ফণাতে পৃথিবী ধারণ করে আছেন, তিনিই সহস্র সহস্র বদনে তোমার স্তুতি করেন। সেই অনন্ত দেবই বলেন যে তিনি তোমার অন্ত পান না। তাহলে আর অন্য কে তোমার স্তব করতে পারবে? সমস্ত জগৎ-সংসার বেদের মতে চলে, সেই বেদজ্ঞরা তোমার সব তত্ত্ব স্থির কবতে পারেন না। অনন্ত ভুবন তোমার কারণার্ণবশায়ী স্বরূপের লোমকূপে গিয়ে মিলিয়ে যায়। তুমি সদানন্দ রূপে কখন কি কর তা তুমি নিজেও জান না, বেদজ্ঞরা কি করে জানবে? তাই বলছি তুমি একমাত্র তোমার কৃপাপাত্রকে জানালে তবেই জানা যেতে পারে। আমি কোন্ অধিকাবে তোমার স্তুতি করব?—এই সব কথা বলে মুরাবি গুপ্ত কেবলই কাঁদছেন এবং নমস্কার করছেন। মুরারির কথায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান ববাহদেব বললেন,—বেদেব পণ্ডিতেরা বলে আমার হাত পা মুখ নেই। তাঁরা জানে না। কাশীতে প্রকাশানন্দ বেদ পড়ান, তিনি আমাকে টুকরো টুকরো করেন। বেদ ব্যাখ্যা কবে অথচ আমার বিগ্রহ মানে না। সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হলেও তাব জ্ঞান হয না। আমাব অঙ্গ সর্বযজ্ঞময় পবিত্র। অজ ভব প্রমুখ দেবগণ তাঁব গুণকীর্তন করেন। সেই অঙ্গ স্পর্শ কবে পুণ্য নিজেই পবিত্র হয। এসব পণ্ডিতেরা তাকে কোন্ সাহসে মিথ্যা বলে? মুবারি, আমি তোমাকে কিছু বেদেব গুহ্য কথা বলছি শোন। আমি সকল বেদের সার যজ্ঞববাহ। আমিই একদা পৃথিবীকে উদ্ধাব কবেছি। সঙ্কীর্তনের মধ্যে এবার আমি অবতীর্ণ হয়েছি। ভক্তগণকে রক্ষা করব এবং দুষ্টদের সংহাব করব। আমার ভক্তকে কেউ অবজ্ঞা করলে আমি তা সহ্য করতে পারি না। আমার ছেলেও যদি তেমন অন্যায করে তাহলে তাকেও আমি জীবিত বাখব না। একথা তুমি ঠিক জানবে। আমি যখন পৃথিবীকে উদ্ধার কবেছিলাম তখন আমার স্পর্শ পেয়ে পৃথিবী গর্ভবতী হন্। 'নরক' নামে এক মহাবল পুত্রের জন্ম হয। পুত্রকে আমি সব ধর্মকথা বললাম। ছেলে রাজা হল। দেব দ্বিজ গুরু ভক্তি সহ কাজ কবে যাচ্ছে। দৈবদোষে 'বাণ' অসৎসঙ্গ করে ভক্তদ্রোহী হযে উঠল। সেবকেব হিংসা আমি সহ্য কবতে পাবি না। তখন আমি আমার ভক্তকে রক্ষা কবাব জন্য নিজপুত্রকে হত্যা করলাম। তুমি জন্মেজন্মে আমাকে সেবা করেছ তাই তোমাকে এই সকল তত্ত্বকথা বললাম।—মুবাবি গুপ্ত প্রভুর কথা শুনে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। যজ্ঞববাহ সেবককে বক্ষা করেন। মুরারি গুপ্ত সহ গৌরচন্দ্রের জয হোক।

এইভাবে প্রভু কৃপা করে সকল ভক্তকে নিজতত্ত্ব জানাচ্ছেন। সকল ভক্তই তাঁদের আরাধ্যতত্ত্বকে জেনে মহা আনন্দিত হলেন। এখন আর কেউ পাষণ্ডীগণকে ভয করেন না, হাটে ঘাটে মাঠে সর্বত্র উচ্চস্বরে কৃষ্ণকীর্তন কবেন। প্রভুর সঙ্গে মিলে ভক্তগণ দিনরাত আনন্দকীর্তনে কাটিয়ে দেন। নিত্যানন্দকে ছাড়া প্রভু সকলকেই পেয়েছেন, ভাইকে না দেখে প্রভুর মনে দুঃখ হচ্ছে। বিশ্বম্ভর সর্বদা নিত্যানন্দকে স্মরণ করছেন।

প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দের কথা কিছু বলা যাক। রাঢ় অঞ্চলে একচাকা নমাক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকে কিছু দূরে মৌড়েশ্বর শিব আছেন। নিত্যানন্দ তাঁর পূজাও করেছেন। সেই গ্রামে দয়ালু বিরাগী হাড়াই পণ্ডিত বাস করতেন। জগন্মাতা, পরম বৈষ্ণবী শক্তি পদ্মাবতী ছিলেন তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী। এই মহা উদার ব্রাহ্মণ-দম্পতির ঘরে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করলেন। নিত্যানন্দ ছিলেন সন্তানদের মধ্যে সকলের বড়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুলক্ষণযুক্ত। আদিখণ্ডে বাল্যলীলা বিস্তারিত বলা হয়েছে। এখানে পুনরায় বললে গ্রন্থ বেড়ে যাবে। হাড়াই পণ্ডিতের ঘরেই নিত্যানন্দের শৈশব কাটে। কৈশোরে তিনি গৃহত্যাগ করতে চাইলে বাবা-মা রাজি হলেন না। মাতা-পিতা কখনই চোখের সামনে থেকে যেতে দেন না। পিতা হাড়াই ওঝা পুত্রকে ছেড়ে একটু সময়ের জন্যও কোথাও যান না। তিনি সংসারের কাজে যজমানি কাজে কিংবা হাটেবাজারে যেখানেই যান না কেন সব সময়ই নিত্যানন্দের কথা ভাবেন। যদি নিত্যানন্দ চলে যায়? এক পলকের মধ্যে একশোবার ফিরে ফিরে তাকান। পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে পিতা সব জায়গায় যান। যেন নিত্যানন্দ হচ্ছেন প্রাণ আর হাড়াই ওঝা হচ্ছেন শরীর। অন্তর্যামী নিত্যানন্দ এসবই জানেন। পিতার আনন্দের জন্যই তিনি পিতার সঙ্গে থাকছেন।

দৈবাৎ একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন নিত্যানন্দের বাড়িতে। হাড়াই তাঁকে যত্ন করে ভোজন করালেন, বাড়িতেই রাখলেন। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা হল। খুব ভোরে সন্ন্যাসী যাবার সময় হাড়াই পণ্ডিতকে বললেন,—আমার কিছু বলবার ছিল। হাড়াই বললেন—বল। সন্ন্যাসী বললেন,—আমি তীর্থ পর্যটন করি কিন্তু আমার ভাল সঙ্গী নেই। তোমার এই জ্যেষ্ঠ সন্তানটিকে কিছুদিনের জন্যে আমার সঙ্গে দাও। আমি তাকে খুব যত্নেই রাখব এবং তার সব তীর্থদর্শনও হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীর এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ মহা বিপদেই পড়লেন যেন। ভাবছেন,—সন্ন্যাসী ঠাকুরতো আমার প্রাণভিক্ষা চেয়ে বসেছেন, না দিলেও সর্বনাশ হবে। পুরাকালেও মঙ্গলের জন্য অনেকেই সন্ন্যাসীদের পুত্রদান করেছেন। রাজা দশরথ তাঁর জীবনতুল্য পুত্র রামচন্দ্রকে দান করেছিলেন বিশ্বামিত্র মুনির কাছে। যদিও রামকে ছাড়া দশরথের জীবন ধারণ অসম্ভব তবু তিনি দান করেছিলেন। পুরাণে এর উল্লেখ আছে। আমারও তো আজ কি সেই অবস্থা। হে কৃষ্ণ, এমন ধর্মসঙ্কটে তুমিই আমাকে রক্ষা কর। দৈববশে লক্ষ্মণতত্ত্বই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, কাজেই এমন ঘটনা তো ঘটবেই। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ব্রাহ্মণ গিয়ে কথাটা ব্রাহ্মণীকে জানালেন। ব্রাহ্মণী শুনে বললেন,—তুমি যা করবে তাতেই আমার মত রয়েছে। তখন হাড়াই পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানিয়ে পুত্রকে তাঁর সঙ্গে যেতে দিলেন। এই ভাবে নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পিতা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সেই বিলাপের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কাঠ এবং পাথর পর্যন্ত তা শুনে বিদীর্ণ হয়ে যায়। আস্তে আস্তে তিনি ভক্তিরসে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। লোকেরা বলতে লাগল,—হাড়াই ওঝা পাগল হয়ে গেছে। তিন মাস তিনি অন্ন গ্রহণ করলেন না। শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদে কেবল জীবনটুকুই রইল। যাঁর মনে এমন অনুরাগ, প্রভু তাঁকে কি কখনো ছেড়ে যেতে পারেন? কপিল ঋষিও এক কালে স্বামীহীনা জননী দেবহূতিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ব্যাসদেবের মত পরম বৈষ্ণব পিতাকেও ছেড়ে শুকদেব চলে গিয়েছিলেন, একবার ফিরেও তাকান নি। শচীদেবীকেও ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন নিমাই। পরমার্থের কারণে এসব

ত্যাগ, লৌকিক ত্যাগ নয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই মাত্র এসবের মর্ম উদ্ধার করতে পারেন। জীব-উদ্ধারের জন্যই এই সকল লীলাও। এসব কথা শুনে শক্ত কাঠও গলে যায়।

রামচন্দ্রকে হারিয়ে দশরথ কেঁদেছিলেন, সে কাহিনী শুনে সকলেই কাঁদে। নিত্যানন্দও তেমনি বাড়ি ছেড়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি গয়া কাশী প্রয়াগ মথুরা দ্বারকা বদরিনারায়ণ, বৌদ্ধাশ্রম হয়ে ব্যাসদেবের আশ্রমে গেলেন। তারপর রঙ্গনাথ সেতুবন্ধ মলয়পর্বত ভ্রমণ করে গোমতী গণ্ডকী সরযূ কাবেরী অযোধ্যা দণ্ডকবন ত্রিমল্ল বেঙ্কটেশ্বর সপ্তগোদাবরী কন্যাকুমারী রেবা মহিস্মতী মনু হরিদ্বার—ইত্যাদি সমস্ত তীর্থ দর্শন করে নিত্যানন্দ মথুরায় ফিরে এলেন। পূর্বের জন্মস্থান দেখে তিনি হুঙ্কার করছেন কিন্তু অনন্তধামকে কেউ চিনতে পারছে না। বৃন্দাবনে তিনি খেলাধূলা করছেন, সর্বদা বাল্যভাব। খেলায় মেতে খাবার কথা ভুলেই গেছেন। তাঁর ভাবসাব কেউ বুঝতে পারছেন না। তিনি কেবল একটু দুধ খান। এইভাবে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে বাস করছেন। নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র প্রকাশিত হয়েছেন,তিনি পরমানন্দে সঙ্কীর্তন করছেন। নিত্যানন্দকে না দেখতে পেয়ে প্রভু দুঃখ পাচ্ছেন। নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে থেকেই প্রভুর প্রকাশেব সংবাদ পেলেন। তাড়াতাড়ি তাই তিনি নবদ্বীপে এসে নন্দন আচার্যের বাড়িতে উঠলেন। মহাভক্ত নন্দন আচার্য সূর্যের মত এক তেজঃপুঞ্জ দেখতে পেলেন। মহা অবধূত বেশ, প্রকাণ্ড শরীর, দৃষ্টি স্থির। ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যধাম নিত্যানন্দ দিবারাত্র মুখে কৃষ্ণনাম নিচ্ছেন। মহামত্ত বলরামের মত মাঝে মাঝে নিজের আনন্দে হুঙ্কার করে উঠছেন। কোটি চন্দ্রের চেয়েও সুন্দর হাসি। দাঁতের আভা মুক্তোর চেয়েও সুন্দর। চোখ দুটি বড় বড় ঈষৎ রক্তাভ। হাত হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, উন্নত বক্ষ, পা দুটি পদ্মফুলের মত নরম হলেও হাঁটতে পটু। পবম কৃপায় সকলকে উপদেশ দান করেন, তা শুনে লোকের কর্মবন্ধ নাশ হয়। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এসেছেন, জানতে পেরে চারদিকে তাঁর জয়ধ্বনি উঠেছে। ইনি মহাপ্রভুর দণ্ড ভঙ্গ করেছিলেন, তাঁব মহিমা প্রকাশের ক্ষমতা কারো নেই। অধম মূর্খ বণিকদের তিনি পার করেছেন। তাঁব নাম উচ্চারণ করলেই ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়। তাই নন্দন আচার্য তাঁকে পেয়ে আনন্দে নিজেব কাছে বেখে দিলেন। সেখানেই নিত্যানন্দের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হল। নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমন-কাহিনী শুনলেও পুণ্য হয়। প্রেমধন লাভ হয়।

বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের আগমন-সংবাদ পেযে খুবই খুশি হলেন। প্রভু যে আগেই ইঙ্গিতে নিত্যানন্দের আগমনেব কথা বলেছেন তা কেউ বুঝতে পারে নি। দু-তিন দিনের মধ্যেই একজন মহাপুরুষ এখানে আসবেন, তিনি বলেছিলেন। সেদিন গৌরচন্দ্র বিষ্ণুপূজা সেরে বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রভু সকলকে বললেন,—আজ এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখেছি। আমাদের বাড়ির দরজায একটি চিন্ময রথ এসে উপস্থিত। তার পতাকাতে তালবৃক্ষ আঁকা। রথে এক বিরাটাকার ব্যক্তি। তাঁর কাঁধে এক বিবাট মুষল, তিনি প্রেমে চঞ্চল। তাঁর বাম হাতে একটি কালো কমণ্ডলু বাঁধা। মাথায় এবং পরিধানে নীল বস্ত্র। বাম কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল। বলরামের মত তাঁর স্বভাব। বারে বারে তিনি জিজ্ঞাসা কবছেন,- -এই বাড়ি কি নিমাই পণ্ডিতের? পরম প্রচণ্ড মহা অবধূত বেশ. এমন মহাপ্রভাবশালী আর কখনো দেখিনি। তাঁকে দেখেই আমি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি কে? তিনি হেসে বললেন,—আমি তোমার ভাই, কালকে পরিচয় হবে। তাঁর কথা শুনে আমার আনন্দ হল। আমি নিজেকে তাঁর সমান মনে করি। —এই কথা বলতে বলতে প্রভু বলদেব ভাবে আবিষ্ট হয়ে গর্জন করলেন,—মদ আন, মদ আন। প্রভুর চীৎকারে কান

ফেটে যায়। শ্রীবাস তখন বললেন, —তুমি যে মদিরা চাইছ সেই প্রেমমদিরা তোমার কাছেই আছে। তুমি দিলেই তা অন্য লোকে পেতে পারে। উপস্থিত সকলে তাঁর দিকে তাকিয়ে কাঁপছেন। বৈষ্ণবগণ ভাবছেন,—অবশ্যই এর কোন বিশেষ কারণ আছে। প্রভু সঙ্কর্ষণ বলরামের মত শরীর দুলিয়ে অরুণনেত্রে আর্যা-তর্জা হেঁয়ালি-ছড়া পড়ছেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু সহজ অবস্থা পেয়ে স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়ে বললেন,—আমার মনে হচ্ছে এখানে কোন মহাপুরুষ এসেছেন। আমি আগেই তোমাদের বলেছি, একজন মহাপুরুষের দর্শন হবে। শ্রীবাস, হরিদাস, খুঁজে দেখ গিয়ে কোথায় কে এলেন।

প্রভুর আদেশে দুই মহাভাগবত সমস্ত নবদ্বীপ খুঁজে দেখলেন। যেতে যেতে দুজনের মধ্যে আলাপ হচ্ছে,—তবে কি সঙ্কর্ষণ এলেন? দুজনেই আনন্দে বিহ্বল হয়ে চলেছেন কিন্তু কোথাও কোন খোঁজ পেলেন না। তিন প্রহর পর্যন্ত সমস্ত নবদ্বীপে খুঁজে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা প্রভুর কাছে ফিরে এলেন। খবর দিলেন,—কোথাও কাউকে দেখা গেল না। বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, পাষণ্ড সকলের বাড়িতেই খবর নিয়েছি। নবদ্বীপের সব জায়গাতেই দেখেছি, নবদ্বীপের বাইরে অবশ্য যাই নি। দুজনের কথা শুনে শ্রীগৌরাঙ্গ হাসছেন। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে নিত্যানন্দ অত্যন্ত গোপনীয়। এমন লোক আছেন যাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনা করেন কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দকে মান্য করেন না, যেমন গোবিন্দ পূজা করেন অথচ শঙ্করকে মানেন না। এইভাবে তাঁরা নরকে যাবেন। শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বড়ই গূঢ়, শ্রীচৈতন্য কৃপা করে যাঁকে জানান কেবল তিনিই জানতে পারেন। না বুঝে যে নিত্যানন্দের গূঢ় চরিত্রের নিন্দা করে সে কৃষ্ণভক্তি থেকে বঞ্চিত হয়। শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জানেন তথাপি প্রভু মজা করে তাঁদের তা দেখালেন না। একটু পরেই প্রভু ঈষৎ হেসে বললেন,—আমার সঙ্গে এস, আমরা সকলে মিলে গিয়ে দেখি। ভক্তবৃন্দ আনন্দিত হয়ে 'জয় কৃষ্ণ' ধ্বনি দিয়ে প্রভুর সঙ্গে চললেন। প্রভু জেনেশুনেই সকলকে নিয়ে গিয়ে নন্দন আচার্যের বাড়িতে উঠলেন। সকলেই দেখলেন, কোটি সূর্যের সমান দীপ্তিতে এক পুরুষরত্ন বসে আছেন। সেই পুরুষরত্ন আবিষ্ট অবস্থায় আছেন, অন্যেরা তা ধরতে পারছেন না। তিনি ধ্যানমুখে আছেন, তাঁর মুখে হাসির আভা। প্রভু তাঁর মহাভক্তিযোগ বুঝে সঙ্গীদের নিয়ে তাঁকে নমস্কার জানালেন। সকলেই সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কেউ কিছু বলছেন না। সামনে দাঁড়ানো বিশ্বম্ভরকে দেখে নিত্যানন্দ তাঁর প্রাণের ঈশ্বরকে চিনতে পারলেন।

মদনের মত শ্রীগৌরাঙ্গের অবয়ব। দিব্য বস্ত্র, দিব্য গন্ধমাল্য পরিধানে। সোনার জ্যোতিও তাঁর কাছে তুচ্ছ। তাঁর মুখখানি দেখবার জন্য চাঁদেরও ইচ্ছে হয়। তাঁর দাঁত মুক্তোর চেয়েও সুন্দর। হাত দুটি হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, সরু কোমর, বুকের উপরে শাদা পৈতে। কপালে সুন্দর উর্ধ্বতিলক, অলঙ্কার ছাড়াই সর্বদেহ অতি সুন্দর। গৌরাঙ্গের নখের কাছে কোটি কোটি মণিও তুচ্ছ, তাঁর হাসিতে যে সুধা ঝরে তার কাছে স্বর্গের অমৃতও কিছুই নয়।

২/৪ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের সামনে রয়েছেন, নিত্যানন্দ নিজের প্রভুকে চিনলেন। আনন্দে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, একদৃষ্টে বিশ্বম্ভরের দিকে তাকিয়ে আছেন। জিহ্বা দিয়ে বিশ্বম্ভরেরর দেহ লেহন করছেন, চোখ দিয়ে রসসুধা পান করছেন, বাহু দিয়ে কোলাকুলি করছেন, নাক দিয়ে গায়ের ঘ্রাণ নিচ্ছেন। নিত্যানন্দ এমনই স্তম্ভিত হলেন যে কাউকে

কিছু বলেনও না পর্যন্ত। ভক্তগণ সকলেই বিস্মিত। সর্বপ্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝলেন যে ভক্তগণ নিত্যানন্দকে চিনতে পারেন নি বলেই বিস্মিত হয়েছেন, তাই তিনি সকলের কাছে নিত্যানন্দকে পরিচিত করাবার জন্য এক উপায় স্থির করলেন। প্রভু ইঙ্গিতে শ্রীবাসকে ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করতে বললেন। শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর কথা ধরতে পেরে কৃষ্ণধ্যানের একটি শ্লোক পড়লেন।

শরৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গাভী ও গোপবালকগণের সঙ্গে বেণু বাজাতে বাজাতে বলরামকে নিয়ে পরম রমণীয় বৃন্দাবনে প্রবেশ করেছিলেন। নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছরচিত চূড়া, কর্ণদ্বয়ে পীতবর্ণ কুসুম, পরিধানে সোনার রংয়ের পীত বসন, এবং গলায় পাঁচ রঙা ফুলের বৈজয়ন্তীমালা পরে নিজের মুখের অমৃত বাঁশীর ছিদ্রগুলোতে পুরে দিয়ে, নিজের অসাধারণ চরণ-চিহ্ন শোভিত সকলের আনন্দস্থান বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে গোপগণও তাঁর যশঃকীর্তন করতে লাগলেন।

নিত্যানন্দ ভাগবতের শ্লোক শুনেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। নিত্যানন্দ আনন্দে মূর্ছিত হলে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে আরো পড়তে বললেন। শ্লোক শুনে তাঁর জ্ঞান এল, তিনি কাঁদতে লাগলেন। বারেবারে শ্লোক শুনে নিত্যানন্দ-প্রভুর উন্মাদনা বেড়ে যাচ্ছে। তিনি খুব উচ্চস্বরে চীৎকাব করছেন। তিনি এমন জোরে আছড়িয়ে পড়ছেন যে সকলেই মনে করলেন, গায়ের হাড় বুঝি ভেঙ্গে গেল। অন্য লোকের কথা দূরে থাক, বৈষ্ণবগণও এমন উল্লম্ফন দেখেন নি। বৈষ্ণবগণ ভয় পেয়ে 'কৃষ্ণ রক্ষা কর' বলে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। নিত্যানন্দ-প্রভু মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন, চোখের জলে সারা শরীর ভিজে গেছে। বিশ্বম্ভরের দিকে তাকিয়ে তিনি ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছেন, তাঁর অন্তরে আনন্দ, মাঝে মাঝে খুব হাসছেন। কখনও নাচছেন, গড়াগড়ি দিচ্ছেন, কখনও বগল বাজিয়ে পা-জোড়া করে উপরের দিকে লাফ দিয়ে উঠছেন। নিত্যানন্দ-প্রভুর এই উন্মাদ আনন্দ দেখে সকল বৈষ্ণবের সঙ্গে গৌরচন্দ্রও কাঁদছেন। ক্রমেই তাঁব কৃষ্ণানন্দ-সুখ বেড়েই চলেছে, সকলেই তাঁকে ধরে থামিয়ে দিতে চান কিন্তু পারেন না। বৈষ্ণবগণ কেউ যখন পারলেন না তখন বিশ্বম্ভর তাঁকে নিজের কোলে টেনে নিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কোলে গিয়েই শ্রীনিত্যানন্দ আত্মসমর্পণের ভাবে নিষ্পন্দ হয়ে থাকলেন। শ্রীরামচন্দ্রের কোলে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের মত চৈতন্যের প্রেমাশ্রুতে নিত্যানন্দ ভাসছেন। নিত্যানন্দ প্রেমভক্তি-বাণে মূর্ছিত, গৌরচন্দ্র তাঁকে কোলে নিয়ে কাঁদছেন। পূর্বে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সম্পর্কে যেমন শোনা গেছে তেমনি সকলেই নিবানন্দে ডুবে রইলেন। গৌর-নিতাইয়ের স্নেহের সীমা একমাত্র রাম-লক্ষ্মণের উপমা দিয়েই বুঝতে পারা যায়।

কিছু সময় পরে নিত্যানন্দ বাহ্যজ্ঞান পেলে প্রভুর পরিকরভুক্ত ভক্তগণ সকলে হরিধ্বনি জয়ধ্বনি করে উঠলেন। বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে কোলে করে আছেন, এই উলটো ব্যাপার দেখে গদাধর পণ্ডিত মনে মনে হাসছেন। সর্বদা বিশ্বম্ভরকে ধারণ করেন বলে যে নিত্যানন্দরূপ অনন্তের গর্ব হওয়া সম্ভব আজ তা চূর্ণ হল। আজ অনন্ত নিজেই বিশ্বম্ভরের কোলে। অনন্তদেবরূপ নিত্যানন্দ যে বিশ্বম্ভরকে নিত্য ধারণ করে আছেন, গদাধর তা জানেন। গদাধরের অবগতির কথা আবার নিত্যানন্দের সম্যক জানা আছে। নিত্যানন্দকে দেখে সকল ভক্তের মন নিত্যানন্দময় হয়ে গেল। গৌর নিতাই দুজন দুজনকে দেখছেন, কেউ কিছু বলছেন না, কেবল অশ্রুপাত হচ্ছে। দুজনই বড় বিবশ হয়ে পড়লেন, উভয়ের অশ্রুতে বসুন্ধরা ভেসে গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন,—আমার আজ শুভদিন। বেদের সারবস্তু ভক্তিযোগ দেখলাম। এই কম্প, অশ্রুপাত, গর্জন-হুঙ্কার একমাত্র ঈশ্বর শক্তি

ভিন্ন কিছুতেই সম্ভব নয়। এই ভক্তিযোগ একবার মাত্র চোখে দেখলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কখনো ত্যাগ করতে পারেন না। আমি বুঝলাম যে তুমি ঈশ্বরের পূর্ণশক্তি, তোমাকে ভজনা করলেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায়। তুমি চোদ্দভুবন পবিত্র কর, তোমার গূঢ় চরিত্র-বিষয়ে ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। তুমি কৃষ্ণপ্রেমভক্তিরূপ সম্পত্তির মূর্ত বিগ্রহ, তোমার স্বরূপতত্ত্ব জানবে এমন কে আছে? তিলার্ধেক সময়ের জন্যও যদি নিত্যানন্দের সঙ্গ লাভ করা যায়, তাহলে সেই সঙ্গের প্রভাবেই কোটি জন্মের পাপ কেটে যাবে। এখন বুঝতে পেরেছি যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উদ্ধার করবেন বলেই তোমার সঙ্গলাভ করতে দিয়েছেন। মহাভাগ্যের ফলে তোমার চরণ দর্শন করতে পেরেছি। তোমাকে ভজনা করলেই বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারব।

শ্রীগৌরাঙ্গ আবিষ্ট হয়ে অনবরত শ্রীনিত্যানন্দের স্তুতি করে চলেছেন। নিতাই গৌরের অনেক কথাই হয়েছে ইঙ্গিতে, অন্যেরা তা বুঝতে পারে নি। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—এখন কোন্ দিক থেকে এলে? ভয়ে ভয়েই অবশ্য বলছি। বাল্যভাবের আবেশে যেন চঞ্চলতা প্রকাশ করেই নিতাই বললেন,—প্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন।—হাতজোড় করে অতি নম্রভাবে তিনি কথাটি উচ্চারণ করলেন। প্রভুর স্তুতিতে লজ্জিত হয়ে তিনি তীর্থভ্রমণের কথার ছলে—এই বিশ্বম্ভরই যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তা বললেন। নিত্যানন্দ বললেন,— অনেক তীর্থ করেছি। কৃষ্ণলীলা-চিহ্নিত বহু স্থান দেখেছি। কেবল স্থানই দেখেছি, কৃষ্ণকে দেখতে পাই নি। ভাল ভাল লোককে জিজ্ঞাসা করলাম,—সিংহাসন সব আচ্ছাদিত দেখছি কেন? কৃষ্ণ কোথায় গেছেন? তারা জানালেন,—কৃষ্ণ গেছেন গৌড়দেশে। কিছুদিন আগে তিনি গয়াতে এসেছিলেন। নদীয়াতে অনবরত হরিসঙ্কীর্তন শুনে কেউ কেউ বলেছেন,—নারায়ণ অবতীর্ণ হয়েছেন। নদীয়াতে পতিতরা উদ্ধার পাচ্ছে শুনে এই অধম পাতকীও ছুটে এসেছে।—শুনে প্রভু বললেন,—আমরা সকলেই ভাগ্যবান তাই তোমার মত ভক্তের দর্শন লাভ করলাম। আজ তোমার আনন্দবারিধারা দেখে জীবন সার্থক মনে করছি। মুরারি গুপ্ত তখন হেসে বললেন,—তোমাদের দুজনেরই জীবন সার্থক হয়েছে বুঝলাম কিন্তু আমরা তো কিছুই ধরতে পারলাম না। শ্রীবাস বললেন,—মনে হচ্ছে যেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীশঙ্কর পরস্পরকে পূজা করছেন। আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। গদাধর বললেন,—শ্রীবাস পণ্ডিত, তুমি ঠিকই বলেছ। গৌর-নিতাইয়ের সম্পর্ক রাম-লক্ষ্মণের মধ্যে স্নেহের মত। কেউ আবার বলছেন,—দুজন যেন কৃষ্ণ-বলরাম। অন্য কেউ বলছেন,—আমি বিশেষ কিছু জানি না। তবে মনে হচ্ছে যেন অনন্তদেবই নিজে কৃষ্ণকে কোলে করে বসে আছেন। আর একজন বলছেন,—দুই বন্ধুকে কৃষ্ণ আর অর্জুন মনে হল, সেই রকমই স্নেহ-সম্পর্ক দেখলাম। আবার কেউ বলছেন,—ইঙ্গিতে কথা বলেছেন, কিছু বুঝতে পারি নি, তবে মনে হল—আগেরই খুব চেনা।—নিত্যানন্দকে দেখে মহা খুশি হয়ে ভক্তগণ এইসব কথাবার্তা বলছেন।

নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র দুজনকে দেখলে, এ বিষয়ে শুনলে সংসারবন্ধন কেটে যায়। নিত্যানন্দ ছাড়া আর কেউ সখা, সঙ্গী, ভাই, ছত্র, শয়ন, বাহন হতে পারেন না। নানা রূপে নিজের ইচ্ছায় তিনি প্রভুকে সেবা করছেন। তিনি অন্যকে অধিকার দিলে তবেই অন্যে সে অধিকার লাভ করতে পারে। সহস্রবদন অনন্তদেবও নিত্যানন্দের সব মহিমা জানেন না, তাঁর মহিমা অসীম। বিষ্ণুভক্তি লাভ করেও কেউ যদি না জেনে নিত্যানন্দকে নিন্দা করে তাহলে তার সেই অর্জিত কৃষ্ণপ্রেমও নষ্ট হয়ে যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ

রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রার্থনা জানাচ্ছেন,—শ্রীচৈতন্যের প্রিয়দেহ বলরাম-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ যেন তাঁর প্রাণনাথ হন। এই তাঁর মনস্কামনা। তাঁর আশীর্বাদেই শ্রীচৈতন্যে রতি জন্মেছে। তাঁর উপদেশেই তিনি চৈতন্যস্তুতি লিখছেন। 'রঘুনাথ' এবং 'যদুনাথ' যেমন কেবল মাত্র নামেই ভেদ, সেই রকম 'নিত্যানন্দ' ও 'বলদেব' কেবলমাত্র নামেই প্রভেদ। সংসারসমুদ্র পার হয়ে যে ভক্তিসাগরে ডুবতে চায় কেবলমাত্র সেই নিতাইচাঁদকে ভজনা করবে। যিনি এই কথা কীর্তন করেন বিশ্বম্ভর তাঁকে গোষ্ঠীসহ আশীর্বাদ করেন। বিশ্বম্ভর নাম জগতে বড়ই দুর্লভ, সমস্ত জীবের ধন-প্রাণ সেই প্রভু শ্রীচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বৃন্দাবনদাসের প্রাণস্বরূপ, তিনি তাঁদের শ্রীচরণযুগলে এই প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

২/৫ মহাভাগবত পরম উদার সব ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপ করে বিহ্বল হয়ে মাতোয়ারা ভাবে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন। প্রভু-নিত্যানন্দ চারদিকে তাকিয়ে হাসেন, সকলেই আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত। এই অবস্থায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন,—শ্রীপাদ, তোমার ব্যাসপূজা কোথায় হবে? কাল পূর্ণিমা, তোমার কি ইচ্ছা বল।—নিত্যানন্দ প্রভুর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে শ্রীবাসকে ধরে হেসে বললেন,—এই বামুনের ঘরে আমার ব্যাসপূজা হবে। — বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে বললেন,—তোমার উপরে তো তাহলে অনেক বোঝা এল। —শ্রীবাস পণ্ডিত উত্তর দিলেন,—প্রভু, বোঝা এমন কিছু নয়, তোমাদের আশীর্বাদে সবই ঘরে রয়েছে। পান, সুপুরি, ঘি, পৈতে ডাল, কাপড় —প্রয়োজনীয় সবই জোগাড় আছে। একখানা 'পূজাপদ্ধতি' কারো কাছে চেয়ে আনব,—এই মাত্র। কাল ব্যাসপূজা দেখার সৌভাগ্য হবে।—সকল বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করে উঠলেন। শ্রীবাসের কথায় মহাপ্রভু খুশি হয়ে শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বললেন,—চল, আমরা সকলে মিলে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে শুভাগমন করি। প্রভুর কথায় আনন্দিত হয়ে নিত্যানন্দ চললেন। গোকুলবাসী গোপগণ যেন কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে চলেছেন ঠিক তেমনি সব ভক্তগণ শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ির দিকে চললেন।

শ্রীবাস আঙ্গিনায় ঢুকেই সকলে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেন। প্রভুর আজ্ঞায় দরজায় খিল পড়ল, নিজজন ছাড়া কেউ ভিতরে ঢুকতে পারেন না। প্রভু কীর্তন করতে আজ্ঞা করলেন, কীর্তনের আনন্দধ্বনিতে বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল। ব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্তনের আনন্দে দুই প্রভু নৃত্য করছেন, ভক্তবৃন্দ তাঁদের পরিক্রমা করে গেয়ে চলেছেন। অনাদি প্রেমে গৌর নিতাই পরস্পরকে একাগ্র চিত্তে চিন্তা করে নৃত্য করতে লাগলেন। কেউ হুঙ্কার করছেন, কেউ বা গর্জন করছেন, কাঁদছেন, মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। স্বেদ, কম্প, পুলকাশ্রু, আনন্দমূর্চ্ছা—ঈশ্বরের নানাবিধ বিকার প্রকাশ পাচ্ছে। স্বকীয় তত্ত্ব উপলব্ধি করে দুই প্রভু নাচছেন, কখনও কাঁদছেন, কোলাকুলি করছেন। দুজনেই দুজনের চরণ স্পর্শ করতে চাইছেন, দুজনই পরম চতুর তাই কেউ পাচ্ছেন না। পরম আনন্দে দুজনেই গড়াগড়ি করছেন, নিজ নিজ লীলার আবেশে কেউই নিজেকে চিনতে পারছেন না। বাহ্যজ্ঞান নেই, কাপড় চোপড় ঠিক নেই, বৈষ্ণবগণ ধরতে চাইছেন কিন্তু পারছেন না। যিনি ত্রিভুবন ধারণ করে আছেন তাঁকে ধরবে কে? দুই প্রভু কীর্তনের মহানন্দে ডুবে আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মাঝে মাঝে 'বল বল' বলে উঠছেন, আনন্দজলে সারা গা ভিজে গেছে। বহুকাল পরে শ্রীনিত্যানন্দ অভিলষিত বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে পেয়ে আনন্দ সাগরে

ভাসছেন। বিশ্বম্ভর এমন সুন্দর নাচছেন যে তাঁর মাথা গিয়ে পায়ে ঠেকছে। নিত্যানন্দ যখন তালে তালে নাচছেন তখন তাঁর পায়ের আঘাতে মাটি কেঁপে উঠছে। লোকেরা মনে করছে বুঝি বা ভূমিকম্প হচ্ছে। এই রকম ভাবে পরমানন্দে দুই প্রভু নাচছেন। সেই উল্লাসের কথা বর্ণনা করা অসাধ্য। নিত্যানন্দের স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে প্রভু খাটের উপরে উঠে বলরাম-ভাবে মত্ত হয়ে 'মদ আন' 'মদ আন' বলে কেবলই চীৎকার করছেন,—নিত্যানন্দ, আমাকে শীঘ্র হল মুষল দাও। প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে শ্রীনিতাই তাঁর হাতে দিলেন। প্রভুও হাত পেতে নিলেন। সকলেই শুধু হাত দেখছে, আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কেউ কেউ প্রত্যক্ষ হল-মুষল দেখতে পেলেন। প্রভু যাঁকে কৃপা করেছেন তিনিই দেখেছেন, আবার দেখেও কিন্তু বর্ণনা করতে পারছেন না। এত বড় অতি গোপনীয় বহস্যময় কথা অল্প লোকেই জানেন, কেবল তাঁদেব কাছেই নিত্যানন্দ-তত্ত্ব পরিস্ফুট। নিত্যানন্দের কাছ থেকে হল এবং মুষল নিয়ে প্রভু 'বারুণী' চাইলেন, চীৎকার করে। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। তারপর সকলে মিলে যুক্তি করে এক ঘট ভরতি গঙ্গাজল এনে দিলেন। তখন প্রভু এমন ভাবে সেই গঙ্গাজল পান করলেন যেন ঠিক বারুণী-মদিরাই পান করছেন। চারদিকে ভক্তগণ বলবামের স্তব পাঠ করছেন। প্রভু কেবলই 'নাঢ়া নাঢ়া' বলে চীৎকার করছেন। ভক্তরা কেউ বুঝতে পারছেন না। প্রভুকে সকলেই জিজ্ঞাসা করলেন,—নাঢ়া কে?—প্রভু বললেন,—যে আমাকে ডেকে এনেছে, যাঁকে তোমরা অদ্বৈতাচার্য বল তাঁব কারণেই আমাব এই অবতাব। নাঢ়া আমাকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনে এখন হরিদাসকে নিয়ে বেশ মজায় রয়েছে। সঙ্কীর্তনের জন্যই আমার অবতার, আমি ঘরে ঘরে কীর্তন প্রচাব করব। স্নান তপস্যা কুল বিদ্যা ধনেব অহঙ্কারে যারা আমার ভক্তদেব কাছে অপরাধী সেই অধমগণকে আমি প্রেমযোগ দান করব না। অন্য সব নগরবাসীগণকে এমন ধন দান কবব যা ব্রহ্মাদি দেবগণেবও আকাঙ্ক্ষিত। এই কথা শুনে সব ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হচ্ছেন। একটু পবেই শ্রীশচীনন্দ সুস্থির হয়ে বললেন,—আমি কি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ কর্বেছি? ভক্তগণ উত্তর দিলেন,—অস্বাভাবিক কিছু কবো নি, প্রভু। সকলের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গন কবে প্রভু বলছেন,—কখনো আমার ব্যবহারে অপরাধ নিও না। ভক্তগণ প্রভুর কথায় হাসছেন, নিতাই-গৌর আনন্দ করছেন।

নিত্যানন্দ আবেশ সম্বরণ করতে পারছেন না, তিনি বলরাম ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছেন আবার দিগম্বর হচ্ছেন, তাঁব সমস্ত শবীরে বাল্য ভাবের আবেশ দেখা গেল। নিত্যানন্দের দণ্ড কমণ্ডলু ও বসন তাঁব থেকে বহু দূরে পড়ে রইল। স্বভাবত অত্যন্ত ধীর নিত্যানন্দ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, প্রভু তাঁকে ধবে আস্তে আস্তে স্থির করলেন। মত্ত সিংহের ন্যায় চঞ্চল নিত্যানন্দ কেবলমাত্র চৈতন্যের কঠোর বাক্যেই স্থির থাকেন আর কিছুকেই কাউকেই গ্রাহ্য করেন না। প্রভু নিত্যানন্দকে বললেন,—যদি কাল ব্যাসপূজা করতে চাও তাহলে আজ চাঞ্চল্য ত্যাগ কব। এইভাবে নিত্যানন্দকে স্থির করে প্রভু নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। ভক্তরাও যে যাঁর বাড়িতে চলে গেলেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাসের ঘরে থেকে গেলেন। রাত্রে নিত্যানন্দ নিজের দণ্ড ও কমণ্ডলু ভেঙ্গে ফেললেন। ঈশ্বরের অসীম স্বভাব কে বুঝতে পারে? কেন তিনি দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গলেন তা কে বলতে পারে? রামাই পণ্ডিত ভোরে উঠে ভাঙ্গা দণ্ড-কমণ্ডলু দেখে বিস্মিত হলেন। রামাই তাঁব বড় ভাই শ্রীবাসকে সব বললেন, শ্রীবাস বললেন

বিশ্বম্ভরকে খবর দিতে। রামাইয়ের কাছে খবর পেয়ে প্রভু এলেন, তখন নিত্যানন্দের বাহ্য জ্ঞান কিছু নেই, তিনি কেবল হাসছেন। প্রভু নিজহাতে দণ্ড নিয়ে নিত্যানন্দকে গঙ্গাস্নান করাতে চললেন। শ্রীবাস প্রমুখ সকলেই গঙ্গাস্নানে গেলেন। প্রভু দণ্ডটি গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন। নিত্যানন্দ বড়ই চঞ্চল, কারো কথা মানছেন না, তখন প্রভু একবার ধমক দিয়ে উঠলেন। নিত্যানন্দ গঙ্গায় কুমীর দেখে ধরতে যাচ্ছেন। গদাধর, শ্রীনিবাস 'হায় হায়' করে উঠছেন। নিত্যানন্দের ভয়-ডর একটুও নেই, সাঁতরে গঙ্গার মাঝখানে চলে যাচ্ছেন, কেবল গৌরাঙ্গের কথায় একটু থামেন। প্রভু নিত্যানন্দকে বললেন,—তাড়াতাড়ি এসে ব্যাসপূজা কর। প্রভুর কথা শুনে তিনি স্নান করে প্রভুর সঙ্গে ঘরে ফিরলেন।

এর মধ্যেই সব ভক্তরা এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা অবিরাম কৃষ্ণনাম কীর্তন করে চলেছেন। ব্যাসপূজার আচার্য শ্রীবাসপণ্ডিত চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় সব কাজ করলেন। সকলে মিলে সুমধুর কীর্তন করছেন, শ্রীবাসের আঙ্গিনা যেন বৈকুণ্ঠ হয়ে উঠল। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীবাস সব কাজ নিয়ম মত সমাধা করলেন। দিব্য গন্ধমাল্য নিত্যানন্দের হাতে দিয়ে তিনি বললেন,—এই মালা নিয়ে মন্ত্র পড়ে ব্যাসদেবকে নমস্কার কর। শাস্ত্রবিধিমতে নিজহাতে মালা দিতে হয়, ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হলে সব অভীষ্ট লাভ হবে। নিত্যানন্দ শুনে কেবলই হ্যাঁ হ্যাঁ বলে যাচ্ছেন কিন্তু ঠিক মত কাজ করছেন না। আস্তে আস্তে কী যে বলছেন তা শোনাও যাচ্ছে না, মালা হাতে নিয়ে বারে বারে চারদিকে তাকাচ্ছেন। শ্রীবাস প্রভুকে ডেকে বললেন,—তোমার শ্রীপাদ তো ঠিক মত ব্যাসপূজা করছেন না। শ্রীবাসের কথা শুনে প্রভু তাড়াতাড়ি সামনে এসে বললেন,—নিত্যানন্দ, শীঘ্র মালা দিয়ে ব্যাসদেবের পূজা কর। —নিত্যানন্দ প্রভুকে সামনে পেয়ে তাঁর মাথার উপরে মালা পরিয়ে দিলেন। কোঁকড়ানো চুলে মালা ভালই মানাল। প্রভু নিত্যানন্দকে ষড়ভুজ রূপ দেখালেন। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল—ছয় হাতে এই ছয়টি দ্রব্য দেখে নিত্যানন্দ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ষড়ভূজমূর্তি দেখে নিত্যানন্দ মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর শরীরে জীবনীশক্তির চিহ্নমাত্রও নেই। বৈষ্ণবগণ ভয় পেয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করে 'রক্ষা কর রক্ষা কর' বলতে লাগলেন। জগন্নাথ-তনয় শ্রীগৌরাঙ্গ তখন বগল বাজিয়ে হুঙ্কার গর্জন করতে লাগলেন। ষড়ভুজ দেখে নিত্যানন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়লে প্রভু নিজহাতে তাঁকে তুলে বললেন,—মন স্থির কর, উঠে বস, মন দিয়ে সঙ্কীর্তন শোন। যে কীর্তনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছ তা তো সফল হয়েছে, আর কি চাই? তুমি প্রেমময়, তোমার প্রেমভক্তি তুমি নিজে না দিলে কেউ ভক্তি লাভ করতে পারে না। নিজেকে সামলে উঠে পড়, তোমার ভক্তদের দিকে তাকাও, যাকে দেবার ইচ্ছা তাকেই প্রেমভক্তি তুমি বিলিয়ে দাও। তোমার প্রতি যাঁর একটুও বিদ্বেষভাব আছে, সে আমাকে ভজনা করলেও আমার প্রিয় হতে পারবে না। চৈতন্যকে পেয়ে, তাঁর কথা শুনে এবং ষড়ভুজরূপ দর্শন করে নিত্যানন্দ আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেলেন। অনন্তদেব নিত্যানন্দের হৃদয়ে গৌরচন্দ্র বাস করেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাই তিনি নিত্যানন্দকে ষড়ভুজ রূপ দেখিয়ে অবতার অনুযায়ী লীলাই প্রকাশ করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র পিণ্ডদান করলে রাজা দশরথ প্রত্যক্ষ হয়ে তা গ্রহণ করেছিলেন। সে ঘটনা যদি অদ্ভুত হয় তাহলে প্রভুর ষড়ভুজরূপ প্রদর্শনও অদ্ভুত। এসব শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক মাত্র, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বলরামের এই নিত্যানন্দ-স্বরূপের দাস্যভাব সর্বদা বর্তমান থাকে। লক্ষ্মণরূপেও তিনি সর্বদা শ্রীরামের আজ্ঞা পালনকারী ছিলেন। এই প্রকারে নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের প্রতি সর্বদা দাস্যভাবেই বিরাজিত। যদিও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু ঈশ্বরতত্ত্ব বলরাম নিরাশ্রয় ভাবে সর্বত্র বিরাজিত তথাপি তিনি প্রলয়কালে ত্রিকালসত্য-রূপে অবস্থিত থাকেন। তথাপি অনন্তদেবের স্বভাব হচ্ছে নিরবধি দাস্য-অনুরাগ-প্রেম। যুগে যুগে প্রত্যেক অবতারেই তাঁর দাস্য চরিত্র। লক্ষ্মণ অবতারে ছোট ভাই হয়ে সেবা করেছেন। পান-ভোজন-নিদ্রা ত্যাগ করে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করেও তাঁর যেন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয না। বলরাম অবতারে জ্যেষ্ঠ হয়েও তিনি কখনো দাসভাবে প্রভুর সেবা ছাড়লেন না। কৃষ্ণকে তিনি স্বামী বলেও মান্য করতেন, ভক্ত ছাড়া অন্যের তো এমন হবার কথা নয়। ভাগবতে আছে, বৎসহরণের সময বলরাম বলছেন,—এই মায়া কে? কোথা থেকেই বা এসেছে? একি ব্রহ্মাদি দেবগণের দৈবী মায়? নাকি ঋষিদের কৃত নারীমায়া। না কি আসুরী? না কি আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া? কেননা, অন্য কোন মায়া আমাকে বেশিক্ষণ মোহিত করে রাখতে পারে না।—সেই প্রভু অনন্ত-বলরামই স্বরূপে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু—এতে কোন সন্দেহ নেই। বলরাম এবং নিত্যানন্দকে যে দুজন বলে মনে করে তাকে মূর্খই বলতে হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তাই তাঁর প্রতি কেউ অনাদর প্রকাশ করলে তা স্বয়ং বিষ্ণুর কাছেই অপরাধ করা হয। শাস্ত্র বলেন, —লক্ষ্মণ-মন্ত্রেব জপ না করে বিনি রাম-মন্ত্রের জপ করেন, শতকোটি কল্পেও তাঁর কার্য সিদ্ধ হবে না।

যদিও লক্ষ্মীদেবী ব্রহ্মা-মহেশ্বর প্রমুখের বন্দনীয তথাপি চরণসেবা-লীলাই হচ্ছে তাঁব স্বভাব। সর্বশক্তিসম্পন্ন শেষ-বলরাম হচ্ছেন ঈশ্বরতত্ত্ব তথাপি বলরামের স্বভাবধর্ম শ্রীকৃষ্ণ-সেবা। ভক্তবৎসল ভগবানের স্বভাবই হচ্ছে ভক্তিবশ্যতা। তিনি নিজেও ভক্তের গুণকীর্তন শুনতে ভালবাসেন। বিষ্ণুর ভক্তিবশ্যতা-স্বভাব এবং বৈষ্ণবের ভগবৎ-সেবাস্বভাব কীর্তন করতে তিনি ভালবাসেন। এজন্যই বেদে এবং পুরাণে ভক্তকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সেইজন্যই বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বেদানুগত পুরাণশাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে গ্রন্থ লিখছেন। নিত্যানন্দ স্বরূপের মনের ভাব হচ্ছে, শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর আমি তাঁর ভক্ত।—তাঁর মুখে আর অন্য কোন কথা নেই। কেবলই তিনি আমার ঈশ্বর এবং আমি তাঁরই আশ্রিত। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে যে আমার স্তুতি করে সেই ভক্তই আমাকে পাবে।—শ্রীনিত্যানন্দ নিজে ষড়ভুজ-দর্শনের কথা বলেছেন, তাঁর প্রীতির জন্যই এসকল কথা বলছি। তত্ত্বের বিচারে চৈতন্য-নিত্যানন্দ দুজনই দুজনের হৃদয়ে বিরাজিত। তথাপি অবতার অনুরূপ লীলা-বশে তিনি ঈশ্বরসেবা করেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রভু-নিত্যানন্দ সেবার ভাব স্বীকার করেছেন, বেদে-মহাভারতে-পুরাণে তাই বর্ণিত হয়েছে। প্রভু যে কার্য করেন তাই বেদের কথা, প্রভু যে লীলাদি করেন, সব ভেদাভেদ ছেড়ে শাস্ত্র তাই বর্ণনা করছেন। ভক্তিযোগ ব্যতীত এসব বুঝতে পারা যায় না, গৌরচন্দ্রের কৃপায মাত্র অল্প কয়েকজনই এই তত্ত্ব জানেন। তথাপি যে নিত্যশুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় তা কেবলমাত্র মজা করবার জন্যেই। এই সকল গূঢ় বিষয় বুঝতে না পেরে কোন কোন অভক্ত একজনকে বন্দনা আর এক জনকে নিন্দা করে, তারা অবশ্যই অপরাধী হবে। শাস্ত্র বলেন,—কোনও লোক যদি বিশেষ যত্নে কোন ব্রাহ্মণের পদসেবা করে সেই ব্রাহ্মণেরই মাথায় আঘাত করে তাহলে সেই মূর্খ লোকটির যেমন নরকবাস হয় তেমনি প্রতিমাতে বিষ্ণুপূজা করেও সর্বব্যাপক-তত্ত্ব বিষ্ণু অন্তর্যামীরূপে জনগণের

হৃদযে অবস্থান কবেন বলেই সেই জনগণেব প্রতি অন্যায আচবণ কবলে সে বিষ্ণুব কাছেই অপরাধী হযে নবকে যাবে।—বৈষ্ণবহিংসাব কথা ছেড়ে দিযেও সাধাবণ জীবকে যে-অধম পীড়া দেয এবং বিষ্ণুপূজা কবেও যে সাধাবণ লোককে কষ্ট দেয় তাব সমস্ত পূজা নিষ্ফল হয এবং কেবল দুঃখই ভোগ কবে। সর্বভূতে বিষ্ণু আছেন—একথা না জেনে কেবল হুজুগে বিষ্ণুপূজা কবলে তাব মানে দাঁড়ায যেমন একহাতে ব্রাহ্মণেব পা ধুইযে দেওযা হলো আব এক হাতে তাঁব মাথায ঢিল মাবা হলো,—এসব লোকেব কি কখনো মঙ্গল হয? সাধাবণ লোককে হিংসা কবলে যত পাপ হয, বৈষ্ণবেব নিন্দা কবলে তাব চেযে শতগুণ বেশি পাপ হয। ধুমধাম কবে মূর্তিপূজা কবা হচ্ছে অথচ ভক্তকে সম্মান দেখায না, মূর্খ-নীচ-পতিতকে দযা কবে না এবং নিত্যধামস্থিত প্রভুই যে পৃথিবীতে অবতাব রূপে আসেন —এসব যে বিশ্বাস কবে না, শাস্ত্রে তাকে অধম বলা হযেছে। এক অবতাবকে ভজনা কবে অন্য অবতাবকে কবে না, শ্রীবাম এবং শ্রীকৃষ্ণতে পার্থক্য জ্ঞান কবে, বলবাম এবং শিবকে শ্রদ্ধা কবে না, এবকম লোককে শাস্ত্রে অধম বলা হযেছে। ভাগবতে আছে,—যে ব্যক্তি শ্রীহবিব প্রীতিব জন্য কেবল শ্রীবিগ্রহতেই পূজা কবে কিন্তু শ্রীহবিব ভক্তগণকে বা অন্য কাউকে শ্রদ্ধা কবে না সেই লোককে প্রাকৃত ভক্ত বা ভক্তাধম বলা হয।

এখানে প্রসঙ্গত ভক্তাধমেব লক্ষণ বলা হল এবং নিত্যানন্দেব ষড়ভুজ দর্শনও হল। এই কাহিনী শুনলে [illegible] বন্ধনমুক্তি ঘটে। বাহ্যজ্ঞান পেযে শ্রীনিত্যানন্দ তৎক্ষণে কাঁদতে শুরু কবেছেন। দুই কমল-নযনে মহানদী বইতে লেগেছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সকলকে বললেন,—ব্যাসপূজা সম্পূর্ণ হযেছে, এবাবে তোমবা কীর্তন আবম্ভ কব। প্রভুব আজ্ঞা পেযে আনন্দিত হযে চাবদিকে সকলে আচম্বিতে কৃষ্ণনামেব ধ্বনি দিতে আবম্ভ কবলেন। মহামত্ত দুইভাই গৌব-নিতাই নেচে নেচে বাহ্যজ্ঞান হাবিযে ফেললেন। মহানন্দে ব্যাসপূজা সমাপ্ত হযেছে। বৈষ্ণবগণেব যেন আনন্দ আব ধবে না। কেউ নাচে, কেউ গান গায, কেউ গড়াগড়ি যায। যে যাব পাবছে চবণধূলি নিচ্ছে। জগৎমাতা চৈতন্যজননী শচীদেবী নিভৃতে বসে এ সব মজা দেখছেন। বিশ্বম্ভব এবং নিত্যানন্দ- —দুজনকে দেখে তাঁব মনে হচ্ছে যেন দুজনই তাঁব পুত্র। পবম উদাব ব্যাসপূজামহোৎসব একমাত্র প্রভু অনন্তদেবই যথার্থ বর্ণনা কবতে পাবেন। অন্যেব পক্ষে তা অসম্ভব। বৃন্দাবনদাস ঠাকুব বলে[illegible],—তিনি মাত্র কিছু সূত্রই বলছেন চৈতন্যজীবনেব। কাবণ যেমন তেমন কবেও কৃষ্ণকথা বললে তাতে মঙ্গল সাধিত হয। এইভাবে ব্যাসপূজা কবে দিন শেষ হল। বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভবেব সঙ্গে নেচে চলেছেন। মহাভাগবত ভক্তগণ পবমানন্দে মত্ত, তাঁবা সকলেই কেবল 'হা কৃষ্ণ' বলে কাঁদছেন।

এইভাবে নিজেব ভক্তিযোগ প্রকাশ কবে সকলকে নিযে বিশ্বম্ভব স্থিব হলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতকে প্রভু আদেশ কবলেন,—ব্যাসপূজাব নৈবেদ্য সব তাড়াতাড়ি নিযে এস।—তাবপব প্রভু নিজহাতেই সকলকে প্রসাদ বিতবণ কবলেন। প্রভুব হাতে প্রসাদ পেযে ভক্তবৃন্দ ভোজন কবতে থাকেন। বাড়িব ভেতবে যাবা ছিল তাদেবও প্রত্যেককে ডেকে প্রভু নিজেব হাতে সকলকে প্রসাদ দিলেন। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণ পর্যন্ত য[illegible] পেযে নিজেদেব সৌভাগ্যবান মনে কবেন, বৈষ্ণবেব বাড়িব কাজেব লোকেবাও তা অনাযাসে পাচ্ছেন। শ্রীবাস-আঙ্গিনায এই সমস্ত লীলা চলছে। তাই বলা হচ্ছে, শ্রীবাসেব, তাঁব পবিবাবেব সকলেব অসামান্য সৌভাগ্য। এই ভাবে নবদ্বীপে একেক দিন একেক বকমেব লীলা-বিলাস হচ্ছে, সাধাবণ লোকেবা সকলে তাব সব খববও বাখে না।

২/৬ হে জগৎজীবন গৌরচন্দ্র, আমাদের হৃদয়ে তোমার পাদপদ্ম স্থাপন কর। গৌরভক্ত-বৃন্দের জয় হোক, জগৎজীবন বিশ্বম্ভরের জয় হোক। পরমানন্দ পুরীর জীবন, স্বরূপদামোদরের প্রাণ, রূপ-সনাতনের প্রিয় প্রভু, জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয়, দ্বারপাল গোবিন্দের কর্তা,—হে প্রভু, তুমি এই ধরার জীবগণের প্রতি শুভ কৃপাদৃষ্টি-পাত কর।

ভক্তবৃন্দের সঙ্গে গৌর-নিতাই সঙ্কীর্তনে মেতে আছেন। অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে প্রভুর কি ভাবে দেখা হয়েছিল সেই কথা এই মধ্যখণ্ডে বলা হবে। একদিন পূর্ণরসে ঈশ্বর আবেশে মহাপ্রভু রামাইপণ্ডিতকে আদেশ করলেন,—তুমি অদ্বৈতের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে আমার প্রকাশের কথা জানাও। যে জন্যে তিনি বিস্তর আরাধনা করেছেন, ক্রন্দন করেছেন, উপবাস করেছেন তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। বল যে তাঁর জন্যেই প্রকাশ ঘটেছে। বল যে,—প্রেমভ ি বিলিয়ে দেবার জন্য তিনি এসেছেন। তুমি শীঘ্র গিয়ে তার সব ব্যবস্থা কর। আমার এবং নিত্যানন্দের বিষয়ে তুমি এখানে যা-কিছু দেখলে তা সবই তাঁকে নির্জনে জানাবে। তিনি যেন সত্বর পূজার সামগ্রী নিয়ে সস্ত্রীক এখানে চলে আসেন।—শ্রীবাসের ভাই রামাইপণ্ডিত তখনই শ্রীহরির নাম স্মরণ করে প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে চললেন। রামাই পথও ভাল জানেন না তবু চৈতন্যের আজ্ঞা পেয়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে যথাস্থানে এসে হাজির হলেন। রামাইপণ্ডিত আচার্যকে প্রণাম কবছেন কিন্তু আনন্দে মুখে কথা আসছে না। ভক্তিযোগের প্রভাবে অদ্বৈতাচার্য সবই জানেন, তিনি আগে থাকতেই জানেন যে প্রভুর আজ্ঞা এসেছে। তাই তিনি রামাইকে দেখে বলছেন,—কি? প্রভু আমাকে নিতে পাঠিয়েছেন? রামাইপণ্ডিত হাতজোড় করে বলছেন,—তুমি তো সবই জান, এবারে তাড়াতাড়ি চল। অদ্বৈতাচার্য আনন্দে আটখানা হয়েছেন কিন্তু তাঁর চরিত্র বোঝা বড়ই কঠিন। জেনেও তিনি নানা রকম প্রশ্ন করছেন,—মানুষের ঘরে ভগবান আসবে কোত্থেকে? কোন্ শাস্ত্রে বলে যে নদীয়াতে ভগবান অবতীর্ণ হবেন? তোমার দাদা শ্রীবাস আমার জ্ঞান, বৈরাগ্য, অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে সবই জানেন। আমাব সঙ্গে চালাকি? —রামাইপণ্ডিত অদ্বৈতাচার্যের স্বভাব ভালই জানেন, তাই তিনি মুখে কোন কথা বললেন না, কেবল মনে মনে হাসলেন। অদ্বৈতাচার্যের চরিত্র-রহস্য বড়ই গভীর, অভক্তের পক্ষে তা বুঝা সম্ভব নয়, সাধনভক্তির জোরে কেউ কেউ মাত্র বুঝতে পারেন। তিনি আবার রামাইপণ্ডিকে বলছেন,—কেন হঠাৎ এসেছ, বল। রামাইপণ্ডিত বুঝতে পারলেন যে প্রেমাবেশে অদ্বৈত এখন শান্তচিত্ত, তাই তিনি কেঁদে বললেন,—যাঁর জন্যে তুমি বহু আরাধনা করেছ, কেঁদেছ, উপবাস করেছ, এখন তোমার কারণেই তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি ভক্তিযোগ দান করতে এসেছেন। তোমার উপরে হুকুম হয়েছে তার সব ব্যবস্থাপত্র করবার জন্য। প্রভু আদেশ করেছেন, তুমি ষড়ঙ্গ পূজার দ্রব্যাদি যথা—অন্ন জল বস্ত্র দীপ তাম্বুল ও আসনাদি নিয়ে সস্ত্রীক চল। তোমার জীবন, প্রভুর দ্বিতীয় দেহ শ্রীনিত্যানন্দও এসেছেন। তুমি তো তাঁর বিষয়ে জানই, আমি আব কি বলব! যদি ভাগ্যে থাকে তবে তোমাদের তিনজনকে একসঙ্গে দেখতে পাব। —রামাইপণ্ডিতের কাছে এই সব শুনে অদ্বৈতপ্রভু বাহু তুলে কাঁদতে লাগলেন। কেঁদে আনন্দে তিনি মূর্ছিত-হয়ে পড়লেন, ভক্তগণ দেখে বিস্মিত হলেন। একটু পরে বাহ্যজ্ঞান পেয়ে হুঙ্কার করে বলে উঠলেন,—আমার প্রভুকে আমিই এনেছি। আমার জন্যই তিনি বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এসেছেন।—এই কথা বলেই আবার মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে

কাঁদতে লাগলেন। অদ্বৈতগৃহিনী পতিব্রতা জগন্মাতা সীতাদেবীও প্রভুর প্রকাশের কথা শুনে আনন্দে কাঁদতে লাগলেন। অদ্বৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ, সামান্য বালক, সেও কেবলই কাঁদছে। মাতা-পুত্র-ভক্তবৃন্দ সকলেই কাঁদছেন।

কে কোথায় কাঁদছে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, অদ্বৈতের সংসার কৃষ্ণপ্রেমময় হয়ে গেল। অদ্বৈতপ্রভু স্থির হতে চাইলেও হতে পারছেন না, শরীর কেবলই ভাবাবেশে দুলে দুলে উঠছে। তিনি আবার রামাইকে জিজ্ঞাসা করলেন,—প্রভু আমাকে কি করতে বলেছেন? —রামাই জানালেন,—তাড়াতাড়ি করে যেতে বলছেন।—অদ্বৈত বললেন,—যদি তিনি ঐশ্বর্য প্রকাশ করে আমাকে দেখান আর আমার মাথায় শ্রীচরণ তুলে দেন তবে আমার বিশ্বাস হবে এবং তবেই বুঝতে পারব যে তিনি আমার প্রাণনাথ। সত্য সত্য সত্য,—এই তিন সত্য করে তোমাকে বললাম।—রামাইপণ্ডিত বললেন,—আমি আর এসব বিষয়ে কি বলতে পারি? যদি ভাগ্যে থাকে তবেই দেখতে পাব। তোমার যা প্রার্থনা, তাঁরও তাই ইচ্ছা। তোমাব জন্যই তিনি এই অবতার গ্রহণ করেছেন।—অদ্বৈতাচার্য রামাইপণ্ডিতের কথায় খুশি হযে শুভ যাত্রাব উদ্যোগ কবতে লাগলেন।—গৃহিনীকে বললেন,—পূজার সামগ্রী নিযে শীঘ্র চল। পতিব্রতা সীতাদেবীও চৈতন্যতত্ত্ব বিলক্ষণ জানেন। তিনি পূজার সামগ্রী গন্ধ মাল্য ধূপ বস্ত্র, ক্ষীব দধি নবনী কর্পূর তাম্বুল ইত্যাদি নিযে চললেন। অদ্বৈতপ্রভু সস্ত্রীক যাত্রা করেও বামাইপণ্ডিতকে বললেন,—তুমি বলবে, আচার্য এলেন না। দেখি, তখন প্রভু আমাব সম্পর্কে কি বলেন। আমি নন্দন আচার্যেব বাড়িতে লুকিয়ে থাকব। তুমি গিযে তাঁকে বলবে যে তিনি এলেন না। প্রভু বিশ্বম্ভর সকলের চিত্তেই অবস্থান করেন, তাই তিনি অদ্বৈতেব ইচ্ছাব কথাও জানতে পেবেছেন। প্রভু আচার্যের আগমনের সংবাদ নিজমনে জেনে শ্রীবাস-অঙ্গনে চললেন। চৈতন্যদেবের সকল ভক্তই তখন প্রভুব ইচ্ছায় সেখানে উপস্থিত হযেছেন। সকলেই বুঝতে পারছেন, প্রভু আবিষ্টভাবে আছেন। তাই সবাই ভযে ভযে বযেছেন। প্রভু বিষ্ণুখট্টায় উঠে বসে হুঙ্কার করে বাবে বারে বলছেন,—নাঢা এসেছে কিন্তু নাঢা আমার ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা কবতে চাইছে। নিত্যানন্দ প্রভুব ইঙ্গিত বুঝে তাঁর মাথাব উপরে ছাতা ধরলেন। গদাধব তাম্বুল কর্পূব দিচ্ছেন, যাতে প্রভু প্রীত হন সেভাবেই সকলে সেবা করছেন। কেউ কোন সেবার কাজ কবছে, কেউ স্তুতি পাঠ করছে। এমন সময় রামাইপণ্ডিত এলে প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আমাকে পবীক্ষা কববাব জন্য নাঢা তোকে পাঠিযেছে?—নাঢা এসে গেছে,—বলে প্রভু মাথা নাড়ছেন। তিনি বললেন,—জেনেও নাঢা আমাকে পরীক্ষা করছে। নবদ্বীপেই নন্দন আচার্যেব ঘবে লুকিযে রয়েছে। আমাকে পরীক্ষা কববার জন্য সে তোমাকে পাঠিযেছে। আমি খুশি হযেই নিজমুখে বলছি, তুমি গিয়ে তাঁকে শীঘ্র এখানে নিযে এস।—রামাইপণ্ডিত খুশি মনে আবাব গিযে সব কথা অদ্বৈতাচার্যকে বললেন। শুনে অদ্বৈতও আনন্দে ভাসছেন। তিনি প্রভুব কাছে এলেন, কারণ তাঁর কার্য সিদ্ধ হয়েছে। দূব থেকে দণ্ডবত কবতে কবতে তিনি সস্ত্রীক স্তব পড়ে এগোচ্ছেন। শ্রীঅদ্বৈত নির্ভযপদে প্রভুর সামনে এলেন। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণও প্রভুর এমন অপরূপ বেশ দেখে নি।

কোটি কন্দর্পের লাবণ্যের চেয়েও তাঁর জ্যোতির্ময় স্বর্ণসুন্দর দেহ। কোটি কোটি চন্দ্রের চেয়েও প্রসন্নবদন প্রভু, প্রচুর সদয অদ্বৈতের প্রতি। কনকস্তম্ভের চেযেও সুগোল দুবাহুতে দিব্য রত্নালঙ্কার খচিত। বক্ষে শ্রীবৎস কৌস্তুভ-মহার্মনি মকরকুণ্ডল বৈজয়ন্তীমালা। তাঁর

তেজের অন্ত নেই যেন কোটি সূর্য দীপ্তি পাচ্ছে, পাদপদ্মে লক্ষ্মীদেবী এবং শিরে ছত্র ধারণ করে আছেন অনন্তদেব। পায়ের নখের সঙ্গে মণির কোন পার্থক্য করা যাচ্ছে না। ত্রিভঙ্গ হয়ে হাসতে হাসতে তিনি বাঁশী বাজাচ্ছেন। প্রভু, প্রভুর অলংকার, তাঁর ভক্তবৃন্দ—সকলকেই কেবল জ্যোতির্ময় রূপে দেখা যাচ্ছে। শিব, ব্রহ্মা, দেবগণ এবং নারদ, শুক মুনিগণ সকলেই মহাভয়ে তাঁর স্তুতি করছেন। মকরবাহন রথে করে এসে এক দিব্যাঙ্গনা গঙ্গার মত তাঁকে প্রণাম করছেন। সহস্রবদন অনন্তদেবও প্রণাম করছেন, চাবদিকেই জ্যোতির্মষ দেবগণ রয়েছেন। অদ্বৈত নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, হাজার হাজার দেবতা কৃষ্ণ-নাম নিচ্ছেন। অদ্বৈতাচার্য বিভিন্ন সময়ে যেসব দেবগণকে ধ্যান করেছেন তাঁরাই সবাই পদতলে আশ্রয় নিয়েছেন। বড়ই অদ্ভুত ব্যাপাব দেখে অদ্বৈত তাড়াতাড়ি প্রণা॰ না করেই উঠে পড়লেন। দেখলেন, সপ্তফণাধর মহানাগগণ ফণা তুলে ঊর্ধ্ববাহুর মতন স্তব করছেন। আকাশে গজ-হংস-অশ্বরূপ বহু দিব্য রথে পথ আটকে রেখেছে। কোটি কোটি নাগপত্নী সজল নয়নে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলে স্তুতি করছেন। আকাশে. মাটিতে কোথাও একটু জায়গা নেই, বড় বড় ঋষিগণ পাশে দাঁড়িযে আছেন। মহা ঐশ্বর্য দেখে পতি-পত্নী দুজনেরই নিশ্চুপ অবস্থা। পরম সদয় প্রভু বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের দিকে তাকিযে বললেন,—তুমি আমার বহু আরাধনা কবেছ, তোমার সঙ্কল্পের জন্যই আমি অবতীর্ণ হয়েছি। ক্ষীরসাগরে আমি শুয়ে ছিলাম, তোমারই প্রেমহুঙ্কারে আমাব নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। জীবগণের দুঃখে কাতর হযে তুমি জীবোদ্ধারের জন্য আমাকে এনেছ। আমার যত পবিকরগণকে চারদিকে দেখছ তোমার কারণেই সকলকে জন্মগ্রহণ করতে হযেছে। যে সকল বিষ্ণুভক্তগণকে ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণও দর্শন করতে চান, তোমার উপলক্ষেই তাঁদেরকে সকলে দেখতে পাবেন।

প্রভুর এই কথা শুনে অদ্বৈতাচার্য হাত তুলে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।—আজ আমার জীবনেব সুপ্রভাত, আমার সব আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হল। তোমাব শ্রীচরণযুগল সাক্ষাতে দেখতে পেযে আজ আমার জন্ম সার্থক, জীবন সফল। বেদ যাঁকে বর্ণনা করেন কিন্তু দেখা যায না, সেই তুমি আমাকে সকলের সামনে দেখা দিলে। আমার কিছু ক্ষমতা নেই, সবই তোমার দয়া, তুমি ছাড়া জীবকে আর কে উদ্ধার করবে?—এই কথা বলতে বলতে অদ্বৈত প্রেমে যেন ভেসে চলেছেন। প্রভু আদেশ করলেন,—আমার পূজার আয়োজন কব। প্রভুর আজ্ঞা পেযে তিনি পরমানন্দে শ্রীচরণে পূজা করতে লাগলেন। শ্রীঅদ্বৈত সুবাসিত জলে শ্রীচৈতন্যচরণ ধুইযে পরে গন্ধদ্রব্য মাখিযে দিলেন। তুলসীমঞ্জরীতে চন্দন মাখিয়ে তা দিযে চরণে অর্ঘ দিলেন। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ এবং নৈবেদ্য—এই পঞ্চ উপচারে পূজা করলেন। তারপর পঞ্চপ্রদীপ দিযে আরতি কবলেন। জয় জয় ধ্বনি ঘোষণা করলেন। আবার মাল্য বস্ত্র অলঙ্কারাদি দিয়ে ষোড়শোপচারে শাস্ত্রবিধি অনুসারে পূজা করে বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটি পড়ে প্রণাম করলেনঃ

নমো ব্রহ্মাণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করে পর্বতের দ্বারা আচ্ছাদিত করলে প্রহ্লাদ ভগবান অচ্যুতের স্তব করে বলেছিলেন, —ব্রহ্মণ্যদেবকে এবং

গো-ব্রাহ্মণের হিতকারীকে নমস্কার। জগতের হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। —এই শ্লোক পড়ে বিশ্বম্ভরের সামনে নমস্কার করে নানা শাস্ত্রবিধি মতে তিনি স্তুতি করতে লাগলেন। —সর্বপ্রাণেশ্বর বিশ্বম্ভর, করুণাসাগর গৌরচন্দ্র, ভক্তের প্রতিজ্ঞারক্ষাকারী, মহাঅবতারী মহাপ্রভু, সিন্ধুসুতা লক্ষ্মীদেবীর চিত্তবিনোদনকারী, শ্রীবৎস-কৌস্তুভে শোভিত, কৃষ্ণমন্ত্রের প্রকাশক, নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাসী, অনন্তশয়ন, সর্বজীবের শরণ মহাপ্রভুর জয় হোক। তুমিই বিষ্ণু কৃষ্ণ নারায়ণ, তুমিই মৎস্য কূর্ম বরাহ বামন। তুমি যুগে যুগে বেদ উদ্ধার কর, পালন কর। তুমিই রাক্ষসকুলের হন্তা এবং জানকীজীবন, তুমি শুভ বরদাতা, তুমি অহল্যামোচন। তুমি প্রহ্লাদের রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করে নরসিংহ নাম ধারণ করেছ। তুমি সর্বদেবচূড়ামণি দ্বিজরাজ, তুমিই নীলাচলে সেবাগ্রহণ কর। বেদবেদান্ত তোমাকে খুঁজে বেড়ায় আর তুমি এসে এখানে লুকিয়েছ। তুমি আত্মগোপনে বড পটু, ভক্তরাই তোমাকে খুঁজে বার করে। সঙ্কীর্তনের মধ্যে তুমি অবতীর্ণ হয়েছ, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সেই সমস্ত রূপে তুমিই আত্মপ্রকট করে বিরাজিত। তোমার চরণদ্বয়ের কৃপায় গৌরীশঙ্করও আকুল। এই চরণদ্বয় লক্ষ্মীদেবী নিজে সেবা করেন এবং শতমুখে এর যশকীর্তন করেন। এই চরণদ্বয় ব্রহ্মা পূজা করেন, স্মৃতি শ্রুতি পুরাণ এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এই চরণই বলিরাজার মস্তক ধন্য করেছে এবং সত্যলোক অবধি পৌঁছেছে। এই চরণ থেকেই গঙ্গা অবতরণ করেছেন এবং তার মহাবেগ শিব মাথায় ধারণ করেছেন।

মহাপণ্ডিত অদ্বৈতাচার্যের কাছে কোটি বৃহস্পতির পাণ্ডিত্যও হার মানে। তিনিই সঠিক চৈতন্যতত্ত্ব জানেন। প্রভুর চরণদ্বয়ের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি অশ্রুতে ভেসে গিয়ে শ্রীচরণেই দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। সর্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ তখন অদ্বৈতের মাথায় পা তুলে দিলেন। চারিদিক থেকে জয়ধ্বনি হতে লাগল। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে সকলেই বিস্মিত হলেন। হরিধ্বনি করে উঠলেন। কেউ গড়াগড়ি যাচ্ছেন, কেউ কাছুটি করে লাফ মারছেন, কেউ আবার অন্যের গলা জড়িয়ে উচ্চস্বরে কাঁদছেন। প্রভুর চরণ শিরে পেয়ে অদ্বৈতের সস্ত্রীক মনোরথ পূর্ণ হল। প্রভু অদ্বৈতকে আদেশ করলেন, —আমার কীর্তন গেয়ে নৃত্য কর। প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে অদ্বৈত নানাবিধ ভক্তি লক্ষণে সেখানে নৃত্য করতে লাগলেন। অপূর্ব মনোহর কীর্তনের ধ্বনি উঠল। গৌরচন্দ্রের সামনে অদ্বৈত নাচছেন। কখনো মনোরম ভঙ্গীতে, কখনো উদ্দণ্ডভাবে, কখনো দাঁতে তৃণ নিয়ে অদ্বৈত নৃত্য করে চলেছেন। কখনো পড়ে যান, গড়াগড়ি যান। ঘন শ্বাস বইছে, মূর্ছা পাচ্ছে। কীর্তন চলছে, তার ভাব অনুযায়ী অদ্বৈত নানা রকম নেচে চলেছেন। বিভিন্ন ভাবের অনুরূপ নৃত্য করে সব শেষে শ্রীঅদ্বৈত দাস্যভাবে আবিষ্ট হলেন। অচিন্ত্য ভাবের মহিমা বুঝা বড়ই কঠিন। তিনি বারে বারে দৌড়ে প্রভুর কাছে যাচ্ছেন। নিত্যানন্দ ভুরু নাচিয়ে হাসছেন। অদ্বৈত বলছেন,—নিতাই, তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। এত দিনে তোমাকে পাওয়া গেল। আর কোথাও যেতে পারবে না, এবার তোমাকে বেঁধেই রেখে দেব। কখনো বলেন—'প্রভু', আবার বলেন,—'মাতাল'। অদ্বৈতাচার্যের কথা শুনে নিত্যানন্দ হাসছেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলার একই স্বরূপ—নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত রূপে দুই ভাগে আবির্ভূত হয়েছেন।

নিত্যানন্দ নানারূপেই শ্রীচৈতন্যের সেবা করছেন, আগেই তা বলা হয়েছে। বিভিন্ন রূপে তিনি গুণকীর্তন করেন, ধ্যান করেন, ছত্র ধারণ করেন, শয্যা হয়ে থাকেন। খুব

সৌভাগ্যের ফলেই কোন লোক অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের এই অবতারের অভেদ-ভাব এবং পরস্পরের প্রতি প্রেম জানতে পারে। তাঁদের দুজনের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ দেখা যায় তা নিতান্ত বাহ্যিক ব্যাপার। ঈশ্বরগণের এই আচরণ, এই কৌতুক, সাধারণ মানুষের চিন্তার বাইরে। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ—এই দুজনের পরস্পরের প্রতি প্রীতি যেন অনন্তদেব ও শঙ্কর-মহাদেবের প্রীতির মত। এই দুজনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয়। এসব গূঢ় তত্ত্ব না জেনে যে এঁদের মধ্যে কারো এক পক্ষ নিয়ে মাতামাতি করে সে নিজের অমঙ্গল ডেকে আনে। অদ্বৈতের নৃত্য দেখে বৈষ্ণবগণ আনন্দে ভাসছেন। প্রভুর আদেশে নৃত্য বন্ধ হয়েছে। প্রভু নিজের গলার মালা অদ্বৈতকে পরিয়ে দিয়ে বললেন,—বর চাও। —অদ্বৈত কিন্তু চুপ করে আছেন। বিশ্বম্ভর তখন বারবারই বলছেন,—বর চাও। অদ্বৈত বললেন,—আর কি চাইব? যা চেয়েছিলাম সবই পেয়েছি। তোমার সামনে নাচলাম পর্যন্ত, মনের সব সাধই পূর্ণ হয়েছে। আর কি চাওয়ার বাকি আছে? তোমার অবতার চোখে দেখলাম। আমি আর কি চাইব? তুমি তো সবই জান। দিব্যদৃষ্টিতে তুমি তো সবই দেখতে পাও।—প্রভু মাথা নেড়ে বললেন,—তোমার জন্যই আমি অবতীর্ণ হলাম। এবারে আমি ঘরে ঘরে কীর্তন প্রচার করব। সারা পৃথিবী আমার যশ কীর্তন করবে। ব্রহ্মা-ভব-নারদাদি যে জন্য তপস্যা করে আমি সেই প্রেমভক্তি নির্বিচারে বিলিয়ে দেব,—এই তোমাকে বললাম।—অদ্বৈত বললেন,—স্ত্রীজাতি, শূদ্র, মূর্খ—সকলকে এই প্রেমভক্তি বিলিয়ে দিতে হবে। বিদ্যা-ধন-কুলের ও তপস্যার অহঙ্কারে যারা মনে করে তোমার ভক্তি সকলের প্রাপ্য নয় তারা তোমার নির্বিচারে দান দেখে যেন জ্বলেপুড়ে মরে। চণ্ডালও যেন তোমার নাম-গুণ কীর্তন করতে পারে। —অদ্বৈতের কথা শুনে প্রভু হুঙ্কার করে বললেন,—তুমি অত্যন্ত সঠিক কথা বলেছ।

সারা পৃথিবী এসব কথার সাক্ষী আছে। মূর্খ নীচ সকলের প্রতিই তাঁর কৃপা হয়েছে। চণ্ডাল পর্যন্ত প্রভুর গুণকীর্তন করে। ভট্ট মিশ্র চক্রবর্তীরা কেবল নিন্দাই করতে পারে। মস্তক মুণ্ডন করে আর শাস্ত্র পড়ে তাদের সৎবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। কেবল উচ্ছন্ন যাবার জন্যেই অকারণ তারা শ্রীনিত্যানন্দের নিন্দা করছে। অদ্বৈতাচার্যের প্রার্থনাতেই জগতের লোক প্রভুর প্রেমভক্তি-ধর্ম লাভ করেছে। মধ্যখণ্ডে এবিষয়ে আলোচিত হল। শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হলো তা কেবল জগন্মাতা সরস্বতীই জানেন। দেবী সরস্বতীই তার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে জগতের ভাগ্যবান্ লোকদের চিত্তে তা স্ফুরিত করেন এবং তাঁরা শ্রীচৈতন্যের গুণকীর্তন করেন। সর্ববৈষ্ণবের চরণে প্রণাম জানিয়ে এই প্রার্থনা করি যেন আমার এতে কিছু অপরাধ না হয়। আদেশ পেয়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সেখানে সস্ত্রীক থেকে গেলেন।

২/৭ জগৎবাসী জীব কোনরূপ সাধন-ভজন না করে থাকলেও ভাগ্যবিধাতা তাদের হাতে গুণনিধি চিন্তামণি শ্রীচৈতন্যদেবকে এনে দিয়েছেন।

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম এবং সর্বজীবের প্রাণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের জয় হোক। শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভপ্রভুর জীবন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রেমধন, জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর গৌরচন্দ্রের জয় হোক। গৌরচন্দ্রের সকল পার্শ্বদবর্গেরও জয় হোক।

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপধামে শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে নানাবিধ লীলা করে চলেছেন। অদ্বৈতাচার্য সব বৈষ্ণবদের নিয়ে কৃষ্ণকথা আলাপ এবং নৃত্য-কীর্তনাদি করেছেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাস

পণ্ডিতের বাড়িতে বাল্যভাবে রয়ে গেলেন। তিনি নিজে হাতে ধরে ভাত পর্যন্ত খান না, মালিনীদেবী তাঁকে ছেলের মত ভাত খাইয়ে দেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কথা এবারে বলা হচ্ছে। ভগবান পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামকে ধন্য করবার জন্য তাঁকে সেখানে অবতীর্ণ করালেন। ঈশ্বর-শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে না দেখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। একদিন প্রভু নাচের মধ্যেই 'পুণ্ডরীক' বলে চীৎকার করে ডেকে উঠলেন। ও আমার বাপ, পুণ্ডরীকাক্ষ, তোমাকে কবে দেখতে পাব? শ্রীচৈতন্য এই লীলায় যে সব ভক্তগণকে আগে অবতরণ করিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও তাঁর একজন অতি প্রিয়পাত্র। প্রভু তাঁর নাম নিয়ে কাঁদছেন কিন্তু ভক্তগণ কেউ কিছু বুঝতে পারছেন না। সকলে মিলে তখন আলোচনা করছেন,—পুণ্ডরীকাক্ষ তো শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়। তিনি তো আবার বিদ্যানিধি বলছেন। সবাই অনুমান করলেন যে হয়তো কোন প্রিয় ভক্ত হবেন। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হলে সকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, — প্রভু, তুমি কোন্ ভক্তের জন্য কাঁদছ, আমাদের কাছে বল তো দেখি। তাকে জানা আমাদের পক্ষেও সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁর জন্ম কর্মইবা কোথায়? তিনি কোথায় থাকেন, কি করেন?—প্রভু বললেন,—তোমরা অবশ্যই ভাগ্যবান, তাই তাঁর কথা শুনতে তোমাদের ইচ্ছা হয়েছে। অত্যন্ত অদ্ভুত তাঁর চরিত্র, তাঁর নাম শুনলেও সংসার পবিত্র হয়। তিনি যে বৈষ্ণব তা কেউ বুঝতে পারে না কারণ, তাঁর বেশভূষা ঘোর বিষয়ীর মত। এই ব্রাহ্মণের জন্ম চট্টগ্রামে। বড় পণ্ডিত, সদাচার সম্পন্ন, সর্বসাধারণের দ্বারা সম্মানিত। তিনি সর্বদা কৃষ্ণভক্তির সমুদ্রে ভাসছেন, কলেবর অশ্রু কম্প পুলকবেষ্টিত। গঙ্গাজল পায়ে লাগবে বলে তাঁর গঙ্গাস্নান করা হয় না। রাতে তিনি গঙ্গা দর্শন করেন। লোকেরা যে গঙ্গাতে কুলকুচা করে, দাত মাজে, মুখ ধোয়, মাথা ধোয়,—এ সব দেখে তিনি মনে কষ্ট পান। তাই তিনি রাত্রিবেলায় গঙ্গাদর্শনে যান। তাঁর আরো একটি বিচিত্র অভ্যাসের কথা শোন, দেবপূজার আগে তিনি গঙ্গাজল পান করে পবিত্র হন। তারপর তিনি পূজা আদি নিত্যকর্ম করেন। এইভাবে পণ্ডিতদেরও গঙ্গার মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দেন। থাকেন চট্টগ্রামে, এখানেও তার বাড়ি আছে। তোমরা দেখতে পাবে, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এখানে আসবেন। তাঁকে চট করে কেউ চিনতে পারে না, দেখলে নিতান্ত সংসারী লোক বলেই মনে করবে। তাঁকে না দেখলে আমার ভাল লাগছে না, তোমরা সকলে মিলে আকর্ষণ করে তাঁকে নিয়ে এস দেখি।—প্রভু তার কথা বলতে বলতে আবিষ্ট হয়ে 'পুণ্ডরীক বাপ' বলে কাঁদতে লাগলেন। জোরে জোরে কাদছেন। তাঁর ভক্তের তত্ত্ব তিনিই জানেন। কোন ভক্তও জানতে পারেন তিনি বললে।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রতি ঈশ্বরের আকর্ষণ হল, তিনি নবদ্বীপে আসতে চাইলেন। অনেক চাকর বাকর, জিনিসপত্র, অনেক ব্রাহ্মণ ভক্ত-শিষ্য নিয়ে তিনি নবদ্বীপে এসে গোপনভাবে থাকলেন। সবাই তাঁকে নিতান্ত সংসারী লোক বলেই জানে। তিনি যে নবদ্বীপে এসেছেন, এ কথাও অনেকে জানে না, কেবল মুকুন্দ দত্ত জানেন। বৈদ্য পণ্ডিত শ্রীমুকুন্দ দত্তই একমাত্র তাঁকে চেনেন কারণ তাঁরও জন্ম চট্টগ্রামে। বিদ্যানিধি নবদ্বীপে এসেছেন শুনে শ্রীচৈতন্য খবই খুশি হলেন। পুণ্ডরীক ঘোর সংসারী লোকের মত রয়েছেন, প্রভুও কাউকে কিছু খুলে বলছেন না। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রেমভক্তির মহত্ত্ব কেবল মুকুন্দ আর তাঁর ভাই বাসুদেব দত্ত জানেন।

গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তিনি যেখানেই যান মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে থাকেন। যা কিছু শোনেন সবই এসে তিনি গদাধরকে জানান। তিনি বললেন,—আজ এখানে একজন অদ্ভুত বৈষ্ণব এসেছেন। তুমি তো বৈষ্ণব দর্শন করতে চাও, আজ তোমাকে একজন মজার বৈষ্ণব দেখাব। আমার এই সেবার কথা তোমার অনেক দিন মনে থাকবে। —গদাধর শুনে খুশি হয়ে তখনই কৃষ্ণকে স্মরণ করে দেখতে চললেন।

বিদ্যানিধি বসে আছেন। গদাধর উপস্থিত হয়ে তাঁকে নমস্কার করলেন। গদাধরকে যত্ন করে বসতে দেওয়া হল। তিনি মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এঁর নাম কি, কোথায় থাকেন? শরীরে বিষ্ণুভক্তির জ্যোতি রয়েছে, চেহারা স্বভাব দুইই বেশ সুন্দর।—মুকুন্দ বললেন,—নাম 'দাধর। ছোটবেলা থেকে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যভাব। মাধব মিশ্রের ছেলে। বৈষ্ণবগণ সকলেই এঁকে খুব স্নেহ করেন। ভক্তিপথে মতি, ভক্তসঙ্গ করেন, তোমার নাম শুনে দেখতে এসেছে। —বিদ্যানিধি একথা শুনে খুবই খুশি হলেন। আগ্রহ নিয়ে তাই আলাপ করতে লাগলেন। —পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি রাজপুত্রের মত বসে আছেন। অতি মনোরম পালঙ্কে, হিঙ্গুলরঞ্জিত পিতলের তৈরি দণ্ডাদি। তার উপরে তিনটি চাঁদোয়া খাটানো। খাটের উপরে অত্যন্ত দামী চাদর বালিশ। ছোট-বড় পাঁচ-সাতেক গাড়ু, চমৎকার পিতলের থালা তাতে পানের খিলি সাজানো রয়েছে। আরো চমৎকার দুটি পিকদানি দুপাশে রয়েছে, তিনি পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছেন। গদাধর তা দেখে মনে মনে হাসছেন। দু জন লোক দুপাশ থেকে সুন্দর দুটি ময়ূরপাখা দিয়ে তাঁকে হাওয়া করছে। বিদ্যানিধির কপালে সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে আবিরের ফোঁটা এবং চন্দনের তিলক শোভা পাচ্ছে। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো, তা থেকে সুন্দর আমলকীতেলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ভক্তির প্রভাবে দেহখানা মদন দেবের মত সুন্দর। বাইরে থেকে তাঁকে রাজপুত্র বলেই মনে হবে। সামনে একটি দামী জমিদারী পালকী, বিষয়াসক্ত লোকের মত আসবাবপত্রের সমাবেশ। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির এই বিষয়ীরূপ দেখে গদাধর পণ্ডিতের মনে কিছু সন্দেহ জাগল। কারণ, গদাধর-যে আজন্ম বৈরাগ্যযুক্ত। গদাধর ভাবলেন,—এ তো বেশ ভাল বৈষ্ণব দেখা গেল, বিষয়ীলোকের বেশভূষা, দামী পোশাক আশাক, চুলে দামী গন্ধ তেল। শুনে তো ভক্তি হয়েছিল ভালই কিন্তু দেখার পরে তো আর ভক্তি থাকল না। —মুকুন্দ দত্ত গদাধরের মনোভাব বুঝতে পেরে বিদ্যানিধির স্বরূপ প্রকাশ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে গদাধরের কিছুই না জানা নেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজেই জীবের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মায়া বা ছলনারূপ কৃপা প্রকাশ করেন। —মুকুন্দ দত্তের বড়ই মধুর কণ্ঠ, তিনি ভক্তিমহিমা-প্রকাশক শ্লোক পড়তে লাগলেন,—পুতনারাক্ষসী শিশুরূপী ভগবানকে মারবার জন্য বিষ নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভগবান তাকেও মায়ের সম্মান দিলেন, অথচ এমন দয়ালুকেও অবোধ জীব ভজনা করে না। ভাগবতেই রয়েছে,—মারবার ইচ্ছায় বকাসুরের বোন অসৎ পুতনা নিজের স্তনে বিষ মেখে শ্রীকৃষ্ণকে খাইয়েছে। কিন্তু ভগবান তাকে ধাইমার উপযুক্ত গোলোকে স্থান দিয়েছেন। কাজেই তাঁর মত দয়ালুকে ছেড়ে আর কার আশ্রয় নেব? মনুষ্যশিশুর প্রাণহরণই যার স্বভাব সেই রক্তপিপাসু পুতনারাক্ষসী শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্যই স্তনদান করেও সদ্‌গতি লাভ করেছিল।—এই ভক্তিকথা শোনামাত্র বিদ্যানিধি কাঁদতে লাগলেন। চোখে গঙ্গার স্রোতের মত আনন্দধারা বইতে লাগল। এক সঙ্গে তাঁর শরীরে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্ছা, পুলক-হুঙ্কার দেখা দিল। 'বল বল' বলে গর্জন করতে লাগলেন, স্থির থাকতে

পারলেন না—মাটিতে পড়ে গেলেন। ঘরের সব আসবাব-পত্র লাথির ঘায়ে ভেঙ্গেচুরে গেল। সুন্দর সুন্দর বাটা, পান-সুপারি, গাড়ু, পিক্‌দানি, পালঙ্কের দামী বালিশ ইত্যাদি লাথির আঘাতে কোথায় গিয়ে পড়ল তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। প্রেমাবেশে তিনি দামী কাপড়-চোপড় দুহাতে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। অত সুন্দর করে চুল-আঁচড়ানো—তাই বা কোথায় গেল, তিনি ধুলোয় লুটিয়ে কেবল কেঁদেই চলেছেন। বলছেন,—হে কৃষ্ণ, হে প্রাণের ঠাকুর, তুমি আমাকে পাষাণ করে গড়ে তুলেছ। অনুতাপে চীৎকার দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলছেন,—এমন অবতারেও আমি বঞ্চিত রয়ে গেলাম?—গড়াগড়ি দিয়ে এমন জোরে আছড়ে পড়ছেন, মনে হচ্ছে যেন গায়ের হাড়গোড় সব ভেঙ্গে গেল। ভাবের বিকারে এমনই কাঁপতে লাগলেন যে দশ জন লোকে ধরেও ঠিক মত সামলাতে পারছে না। ঘরের আসবাবপত্র লাথির চোটে সব চুরমার হয়ে গেছে। কর্মচারীরা অল্পকিছু জিনিসপত্রই মাত্র রক্ষা করতে পেরেছে। এই ভাবে প্রেমাবেশে থেকে খানিক পরে আনন্দে মূর্ছিত হয়ে তিনি পড়ে রইলেন। তাঁর শরীরে বিন্দুমাত্র চেতনা নেই, তিনি আনন্দসাগরে ডুবে আছেন।

গদাধর পণ্ডিত এসব দেখে বিস্মিত হয়ে মনেমনে ভাবলেন,—এমন লোককে আমি অবজ্ঞা করলাম? কি কুক্ষণে দেখতে এসেছিলাম! মুকুন্দকে জড়িয়ে ধরে তিনি প্রেমাশ্রুতে শরীর ভিজিয়ে ফেললেন। বললেন,—তুমি বন্ধুর কাজই করেছ বিদ্যানিধিকে দেখিয়ে। ভক্তি কি বস্তু তা সত্যি দেখলাম। এমন বৈষ্ণব কি আর ত্রিভুবনে আছে? এই ভক্তকে দেখলে ত্রিলোক পবিত্র হয়ে যায়। তুমি সঙ্গে ছিলে বলে আজ আমি মহা বিপদ থেকে রেহাই পেলাম, আমি পোশাক আশাক দেখেই এঁকে সংসারকীট ভেবেছিলাম। তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝেই পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধির ভক্তির উদয় দেখিয়েছ। আমি যতটা অপরাধ করেছি ততটাই বিদ্যানিধির আশীর্বাদ লাভ করা প্রয়োজন। ভক্তির পথে যেতে গেলে একজন গুরু করা অবশ্যই দরকার। আমি একে মনে মনে অনেক অবজ্ঞা করেছি। এখন আমি তাঁর শিষ্য হলে তবেই একমাত্র ক্ষমা পেতে পারি।—এই ভেবে গদাধর মুকুন্দকে দীক্ষার কথা বললেন। মুকুন্দ এই কথা শুনেই খুশি হয়ে তাঁকে প্রশংসা করতে লাগলেন। প্রায় ছয় ঘণ্টা পরে বিদ্যানিধি আবেশ কাটিয়ে সুস্থ হয়ে বসলেন। গদাধর পণ্ডিতের চোখের জলে সারা শরীর ততক্ষণে ভিজে গিয়েছে। বিদ্যানিধি তা দেখে খুশি হয়ে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। বুকে জড়িয়ে ধরলেন। গদাধর সসঙ্কোচে আছেন। মুকুন্দ দত্ত গদাধর পণ্ডিতের মনোগত ভাবের কথা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে খুলে বললেন,—তোমার সাংসারিক জাঁকজমক দেখে গদাধরের মনে প্রথমে কিছু দোষ জন্মেছিল। এখন ইনি তোমার কাছে দীক্ষা নিয়ে সেই দোষ ক্ষালন করতে চাইছেন। এই মাধব মিশ্রের পুত্র কৈশোর থেকেই বংশের ধারা অনুযায়ী ভক্ত এবং সংসারবিরাগী ও জ্ঞানবৃদ্ধ। ছোটবেলা থেকেই শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ, গদাধর পুণ্ডরীকের শিষ্য হবার উপযুক্তই। তুমি নিজে বুঝে একটা শুভ দিন দেখে একে ইষ্টমন্ত্র দীক্ষা দান কর। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শুনে বললেন,—ভগবান তো আমাকে মহারত্ন মিলিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয় দীক্ষা দেব, এমন শিষ্য বহু জন্মের ভাগ্যে পাওয়া যায়। সামনের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতেই শুভলগ্ন রয়েছে, সেদিনই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।—গদাধর এই কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন।

সেদিন গদাধর মুকুন্দের সঙ্গে সেখান থেকে চলে এসে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে দেখা

করলেন। প্রভু বিদ্যানিধির আসার খবর শুনে খুশি হলেন। বিদ্যানিধি একদা রাত্রিতে নির্জনে প্রভুর সঙ্গে দেখা করলেন। ভগবানকে দর্শন করেই বিদ্যানিধি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। একটু পরে জ্ঞান হলেই হুঙ্কার করে উঠলেন এবং কেঁদে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললেন,—কৃষ্ণ, তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার পিতা, এই অপরাধীকে তুমি আর কত কষ্ট দেবে? তুমি সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করলে, একমাত্র আমাকেই বঞ্চনা করলে?—এই লোকটি যে বিদ্যানিধি তা উপস্থিত বৈষ্ণবগণ কেউ জানেন না তবে তাঁর কান্না দেখে সকলেই কাঁদছেন। নিজের প্রিয়তম ভক্ত বলেই প্রভু তাড়াতাড়ি উঠে তাঁকে কোলে নিলেন। প্রভু বললেন,—বাবা পুণ্ডরীক, আজই মাত্র তোমাকে আমি প্রত্যক্ষ দেখলাম।—এই কথা শুনে ভক্তগণ বুঝতে পারলেন যে পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধিই এসেছেন। তারপর বৈষ্ণবগণ যে কান্না আরম্ভ করলেন তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। বিদ্যানিধিকে কোলে নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর সর্বাঙ্গ প্রেমাশ্রুতে ভরে দিলেন। বিদ্যানিধি প্রভুর প্রিয়তম ভক্ত জানতে পেরে সকলের মনেই তাঁর সম্বন্ধে প্রীতি ভয় ও আত্মীয়তা-ভাব জন্মাল। প্রায় এক প্রহর সময় তাঁকে কোলে নিয়ে প্রভু চুপ হয়ে ছিলেন, পরে তিনি বাহ্যজ্ঞান পেয়ে 'হরি নাম' করে বলে উঠলেন,—আজ শ্রীকৃষ্ণ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। সকল বৈষ্ণবগণ পুণ্ডরীককে নিয়ে কীর্তন করলেন। প্রভু বললেন,—এঁর পদবী পুণ্ডরীক প্রেমনিধি, প্রেমভক্তি বিতরণের জন্যই যেন ভগবান এঁকে সৃষ্টি করেছেন।—প্রভু এইভাবে তাঁর গুণকীর্তন করে হাত তুলে হরিনাম করছেন আর বলছেন,—আজ আমার সুপ্রভাত হয়েছে। আমি ভাবছি আজ আমার মহামঙ্গল ঘটল। ঘুম থেকে উঠেই বিদ্যানিধিকে সামনে দেখতে পেলাম। বিদ্যানিধি এসেই অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন, এখন প্রভুকে চিনতে পেরে তাঁকে প্রণাম করলেন। বিদ্যানিধি আগে প্রভুকে প্রণাম করে তারপর সর্বাগ্রে অদ্বৈতাচার্যকে নমস্কার করে সকল বৈষ্ণবকে যথাযোগ্য প্রীতি ও নমস্কার করলেন। এমন ভক্তিমান পুণ্ডরীককে দর্শন করে সমস্ত ভক্তবৃন্দই অপার আনন্দ লাভ করলেন। একটু সময়ের মধ্যে যে প্রেমভক্তি আবির্ভূত হল তা যথার্থরূপে একমাত্র ব্যাসদেবই বর্ণনা করতে পারেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্রগ্রহণের জন্য গদাধর প্রভুর কাছে আজ্ঞা চাইলেন। গদাধর বললেন,—এঁর দুর্বোধ্য চরিত্র না জেনে আমি এঁকে মনে মনে অবজ্ঞা করেছিলাম। এই জন্যই আমি এঁর শিষ্য হব, শিষ্যের অপরাধ গুরু অবশ্যই ক্ষমা করবেন।—গদাধরের কথায় প্রভু সন্তুষ্ট হয়ে বললেন,—হ্যাঁ, তুমি দেরি না করে মন্ত্র নিয়ে নাও।

গদাধর তখন পুণ্ডরীক প্রেমনিধির কাছে মন্ত্র গ্রহণ করে মনে শান্তি পেলেন। পুণ্ডরীকাক্ষর মহিমার কথা আর কি বলবার আছে? গদাধর যাঁর শিষ্য তিনি অবশ্যই ভক্তকুলচূড়ামণি। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই কাহিনী বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন যেন তিনি প্রেমনিধির দেখা পান।

পুণ্ডরীকাক্ষ এবং গদাধর হচ্ছেন যোগ্য গুরু-শিষ্য। দুজনই মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। পুণ্ডরীক ও গদাধরের মিলনকাহিনী শুনলে শ্রোতার প্রেমভক্তি লাভ হয়। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের পাদপদ্ম-স্থানে এই কথা কীর্তন করেছেন।

২/৮ নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেমধাম, জগদানন্দ শ্রীগর্ভের জীবন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রেমধন, জগদীশ গোপীনাথের ঈশ্বর, সর্বপ্রাণ শ্রীগৌরসুন্দরের জয় হোক। জয় হোক তাঁর সকল পারিষদ ও ভক্তবৃন্দের।

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে নানাবিধ লীলা করে চলেছেন। অদ্বৈতাচার্য বৈষ্ণবগণকে নিয়ে মহানৃত্যগীতে কৃষ্ণকীর্তনে মাতিয়ে তুলেছেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে নিত্য বাল্যভাব নিয়ে রয়েছেন। তিনি নিজে হাত দিয়ে ভাতও খান না। মালিনী দেবী তাঁকে মেখেজুখে খাইয়ে দেন যেন ঠিক ছোট্ট ছেলেকেই খাওয়াচ্ছেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী দেবী নিত্যানন্দের আচরণের মর্ম জানেন তাই তিনি মায়ের মত ভাব নিয়ে নিত্যানন্দকে পুত্ররূপে সেবা করছেন।

একদিন প্রভু শ্রীনিবাস পণ্ডিতের সঙ্গে বসে কৃষ্ণকথা আলাপ করছিলেন,—এই অবধূতকে কেন ঘরে ঠাঁই দিয়েছ? এঁর জাতি-কুল তো কিছুই আমরা জানি না। তুমি অত্যন্ত সরল মানুষ বলেই এসব করছ। নিজের জাতিধর্ম যদি রক্ষা করতে চাও তাহলে শীঘ্র একে বিদেয় কর।—প্রভুর কথায় শ্রীবাস একটু হেসে বললেন,—এভাবে আমাকে পরীক্ষা করা তোমার উচিত না। যে ব্যক্তি তোমাকে একদিনের জন্যও ভজনা করে সেও আমার প্রাণের সমান—তুমি এ কথা জেনে নেবে। আমি জানি, নিত্যানন্দ আর তুমি একই দেহ। নিত্যানন্দ যদি অবধূতের মতই মদিরা পান করে এবং পরস্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করে, আমাকে যদি ধনে-প্রাণেও নাশ করে তাহলেও আমার মনে তাঁর সম্পর্কে যেভাব আছে তাই থাকবে,—তোমাকে আমি ঠিক এই কথা জানালাম।—শ্রীবাস পণ্ডিতের মুখে এই কথা শোনামাত্র প্রভু হুঙ্কার করে তাঁর বুকে চেপে বসে বলছেন,—শ্রীবাস পণ্ডিত, তুমি কি বলছ? নিত্যানন্দের প্রতি তোমার এমনই দৃঢ় বিশ্বাস? শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে আমি গোপন করে রাখতে চাই, কিন্তু তুমি তো জেনে গিয়েছ। তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমাকে বর দিতে চাই,—যদি লক্ষ্মীঠাকরুনও নগরে ভিক্ষে করতে নামেন তাহলেও তোমার ঘরে কক্ষনো দারিদ্র্য থাকবে না। তোমার বাড়ির বিড়ালকুকুরও আমার প্রতি ভক্তিমান হবে। আমি নিত্যানন্দকে তোমার হাতেই সঁপে দিলাম, তুমি এঁকে সব বিষয়ে সামলাবে। শ্রীবাস পণ্ডিতকে বর দান করে প্রভু বাড়িতে চলে গেলেন।

নিত্যানন্দ মনের আনন্দে সমস্ত নগরীতে ঘুরে বেড়ান। কখনো তিনি গঙ্গায় সাঁতার কাটেন। স্রোতের টানে কোথায় নিয়ে যায় তার ঠিক নেই কিন্তু তাতেই তাঁর মহা আনন্দ। সব ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলা করে আবার কখনো গঙ্গাদাস পণ্ডিত কিম্বা মুরারি গুপ্তের বাড়িতে যায়। নিমাইয়ের বাড়িতেও কখনো খেয়ে যান নিতাই। শচীমাতা তাঁকে দেখে খুবই স্নেহ করেন। নিতাই বাল্যভাবে শচীমাতার চরণে প্রণাম করতে এগোন কিন্তু শচীদেবী পালিয়ে যান।

একদিন শচীমাতা স্বপ্ন দেখে বিশ্বম্ভরকে বললেন,—শেষরাত্রে আমি স্বপ্ন দেখলাম, তুমি আর নিতাই দুজনে পাঁচ বছরের ছেলের মত হয়ে গিয়ে মারামারি করে বেড়াচ্ছ। দুজন হঠাৎ ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়েছ। সে হাতে নিয়েছে কৃষ্ণকে, তুমি নিয়েছ বলরামকে। আমার সামনেই তারপর তোমরা চারজনে মারামারি করছ। তখন রেগে গিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম দুই ঠাকুর বললেন,—কে তোরা ডাকাতের মত এখানে ঢুকে পড়েছিস, বেরিয়ে যা। এ বাড়ি-ঘর সব আমাদের দুভাইয়ের। এ বাড়ির সন্দেশ-দই-দুধ যত খাবার সবই আমাদের প্রাপ্য।—নিত্যানন্দ বললেন,—সে-কাল বাসি হয়ে গেছে। তখন গোয়ালা হয়ে দই-ছানা লুটে পুটে খেয়েছ। এখন এসব বামুনের অধিকারে। বুঝেসুঝে সব ছেড়ে দাও। খুশি হয়ে ছাড় তো ভাল, তা নইলে মারধোর খাবে। কেউ ঠেকাতে আসবে না।—বলরাম

ও কৃষ্ণ বললেন,—আমাদের কিছু দোষ নেই, আজ তোমাদের দুই কপটকে এখানে বেঁধে রাখব। বলরাম তর্জন-গর্জন করে নিত্যানন্দকে বললেন,—কৃষ্ণও ঠেকাতে পারবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি। কথা শোন। আজেবাজে কিছু ক'রো না। তার উত্তরে নিত্যানন্দ বললেন, —তোর কৃষ্ণকে কে ডরায়, গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভরই আমাদের কর্তা। —এইভাবে ঝগড়া করে চারজনে মিলে কাড়াকাড়ি করে খেতে লাগল। এর হাত থেকে ও কেড়ে খাচ্ছে, ওর মুখ থেকে এ চেটে খায়। নিত্যানন্দ আমাকে ডেকে বলছে,—মা, বড় খিদে পেয়েছ। আমাকে খেতে দাও। —এই কথা শুনেই আমি আচম্বিতে জেগে গেলাম। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। তোমাকে তাই সব কথা বললাম।

প্রভু বিশ্বম্ভর স্বপ্নের কথা শুনে মাকে বললেন,—তুমি বড়ই ভাল স্বপ্ন দেখেছ। কারো কাছে এ কথা বলবে না কিন্তু। তোমার ঘরের এই প্রত্যক্ষ বিগ্রহ। তোমার স্বপ্নের কথা শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল,—প্রায়ই দেখতাম নৈবেদ্যের অর্ধেক থাকে না, লজ্জায় বলতে পারতাম না। আমি তোমাদের বৌমাকে সন্দেহ করতাম, আজ তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে সেই সন্দেহ কেটে গেল। জগন্মাতা লক্ষ্মীদেবী স্বামীর কথা শুনে ভেতরের ঘর থেকে হাসছেন। বিশ্বম্ভর মাকে বললেন,—শিগগির নিত্যানন্দকে এনে খেতে দাও। বুঝলে ?—অমনি শচীমাতা খাবার আয়োজন করতে লাগলেন। প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে বললেন,—শ্রীপাদ, তুমি আজ আমাদের বাড়িতেই খেয়ে নাও তবে খাওয়ার সময় কোন চঞ্চলতা প্রকাশ করবে না। —নিত্যানন্দ কানে হাত দিয়ে 'বিষ্ণু বিষ্ণু' উচ্চারণ করে বললেন,—চঞ্চলতা করে পাগলে,আমি করব কেন ? তুমি কি আমাকে তাই ভাবলে নাকি ? সকলকেই বুঝি নিজের মত মনে কর ?—দুজনে কৃষ্ণকথা বলতে বলতে বাড়িতে এলেন। এসে দুজন এক জায়গাতেই বসলেন। গদাধর প্রমুখ অন্যান্য নিজ জনেরাও রয়েছেন। ঈশান পা ধোবার জল এনে দিলেন। দুই প্রভু ভোজন করতে বসলেন। কৌশল্যার ঘরে যেমন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ এও যেন ঠিক তেমনি। দুই প্রভুর ভোজন দেখে মনে হচ্ছে পরস্পরের প্রতি শ্রীরাম-লক্ষ্মণের যেমন প্রেম বা প্রীতি, গৌর-নিত্যানন্দেরও হচ্ছে পরস্পরের প্রতি তেমনি ভালবাসা। —মাতা পরিবেশন করছেন আনন্দের সঙ্গেই। খাবার দ্রব্যাদি তিন ভাগ হয়ে গেল। দুজন তা দেখে হাসছেন। শচীমাতা আবার ঘরে এসে দেখলেন যেন দুজনেই পাঁচ বছরের শিশু হয়ে গেছে। একজন শুক্লবর্ণ, একজন কৃষ্ণবর্ণ। দুজনেই চতুর্ভুজ, দুজনই দিগম্বর। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হল-মুষল। শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-মকরকুণ্ডল। আরো দেখলেন, নিজের ছেলের বুকে দেখলেন বধূমাতাকে। একবার মাত্র দেখে আর তাকাতে পারলেন না। দেখেই তিনি মূর্ছিত হয়ে মেজেতে পড়ে গেলেন। চোখের জলে কাপড় ভিজে গেল। সমস্ত ঘরে ভাত ছড়িয়ে পড়েছে। অদ্ভুত ঐশ্বর্য দেখে শচীমাতা বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু ব্যস্ত হয়ে উঠে আচমন করে গায়ে হাত দিয়ে ধরে জননীকে তুললেন। বললেন,—মা, তুমি স্থির হয়ে বস। হঠাৎ ঘরের মেঝেতে পড়ে গেলে কেন ?—শচীমাতা তাড়াতাড়ি উঠে চুল ঠিক করে বেঁধে নেন, কিছু বলেন না। ঘরের ভেতরে গিয়ে কাঁদছেন। দীর্ঘশ্বাস পড়ছে, সারা গায়ে কাঁপুনি। তিনি বাৎসল্য প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এখন আর কিছুই ভাল লাগছে না। গৌরনিতাইয়ের পাতে যা পড়েছিল এবং ঘরে যে ভাত ছিটিয়ে ছিল সবই ঈশান পরিষ্কার করলেন। এই ঈশানই বরাবর শচীমাতার সেবা করেছেন। ঈশানের মত মহাভাগ্যবান মানুষ চতুর্দশ লোকের মধ্যে বড়ই বিরল।

রোজই এভাবে অনেক লীলা করেন প্রভুদ্বয় কিন্তু অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া অন্য কেউ তা জানতে পান না। শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই মধ্যখণ্ডের কথা অতি অমৃতময়, শুনলে মনের পাপ-তাপ ধুয়ে-মুছে যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে ভক্তগণকে নিয়ে কীর্তনাদি করছেন। যেখানে যত পার্ষদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই ক্রমান্বয়ে নবদ্বীপে আসতে লাগলেন। সকলেই ঈশ্বরের অবতারের কথা জানলেন, মনে তাঁদের আনন্দ সঞ্চারিত হল। প্রভুর প্রকাশ দেখে বৈষ্ণবগণ অভয় পরমানন্দে মেতে উঠলেন। প্রভুও সমস্ত প্রধান পারিষদগণকে প্রাণের প্রাণ বলে মনে করেন। বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ যাঁকে সর্বদা অন্বেষণ করছেন সেই প্রভু সকলকে প্রেমালিঙ্গন দান করে চলেছেন। প্রভু রোজই ভক্তদের ঘরে যান এবং চতুর্ভুজ ষড়ভুজ মূর্তি দেখান। তিনি কখনো গঙ্গাদাস পণ্ডিত অথবা মুরারি গুপ্তের বাড়িতে আবার কখনো চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে যান। নিত্যানন্দ কিন্তু সব সময়ই প্রভুর সঙ্গে রয়েছেন, তাঁকে ছেড়ে প্রভু কোথাও যান না। শ্রীনিত্যানন্দের সব সময়ই বাল্যভাবের আবেশ কিন্তু প্রভু বিশ্বম্ভরের সকল ভাবের আবেশই প্রকাশ পেত। প্রভুর চরণকমলের মধু আস্বাদক ভ্রমরতুল্য ভক্তগণ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ ইত্যাদি নানারূপেই দেখতেন তাঁকে নিজেদের ভাগ্য অনুযায়ী। প্রভু কোন কোন দিন গোপীভাবে রোদন করেন, তখন তাঁর রাত দিন জ্ঞান পর্যন্ত থাকে না। প্রভুর কোন দিন উদ্ধব, কোন দিন অক্রূরের ভাব হয়। কোন দিন বলরাম আবেশে তিনি মদিরা চেয়ে পাগল। কোন দিন আবার চতুর্মুখ ব্রহ্মার ভাবে ব্রহ্মাস্তব পড়ে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করেন। কোন দিন প্রভু প্রহ্লাদ-ভাবে স্তুতি করে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। এসব দেখে শচীমাতা মনে আনন্দ পান কিন্তু আবার তার এও সন্দেহ হয় যে ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে না ঘর ছেড়ে চলে যায়। মা বলেন, —বাপু, গঙ্গাচান করে এস।—পুত্র তার উত্তরে বলেন,—মা, জয় কৃষ্ণ বলরাম বল। শচীমাতা পুত্রকে যা কিছু বলেন, পুত্র কিন্তু 'কৃষ্ণ' ছাড়া আর কিছুই বলেন না। অচিন্ত্য আবেশ, কিছুই বুঝতে পর্যন্ত পারা যায় না। যখন যে-আবেশই হোক না কেন তাই অপূর্ব মনোহর দেখায়।

একদিন এক শিবকীর্তন গায়ক এসে ডমরু বাজিয়ে শিবের কাহিনী শুরু করেছে। প্রভুর বাড়িতে এসে ভিক্ষার জন্যে শিবের গান গাইছে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে। প্রভু তাই শুনে দিব্য জটাধর শঙ্করমূর্তি ধারণ করলেন। এক লাফে প্রভু গায়কের কাঁধে উঠে তাকে বললেন,—আমিই দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্কর। কেউ কেউ তাকে শিঙ্গা ডমরু বাজাতে দেখল, কেউ কেউ তাঁর জটাও দেখল। তিনি গায়ককে আরো গাইতে আদেশ করলেন। ভাগ্যবান গায়ক জীবনে যত শিবকীর্তন করেছেন আজ তার হাতে হাতে ফল পেলেন। গায়ক ভেদজ্ঞান না করে নিরপরাধে গান করেছেন বলেই শ্রীগৌরাঙ্গ তার কাঁধে উঠে বসেছিলেন। বাহ্যজ্ঞান পেয়ে প্রভু কাঁধের উপর থেকে নেমে গায়ককে তার ঝুলি ভরে ভিক্ষা দিলেন। গায়ক কৃতার্থ হয়ে চলে গেলেন। প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে মঙ্গলময় হরিধ্বনি উঠল। প্রভুর সঙ্গে মিলে ভক্তগণ যখন মঙ্গলময় হরিধ্বনি করছিলেন তখন ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে এবং ভক্তভাবাপন্ন প্রভুর হৃদয়েও নতুন ভাবে ভক্তি উচ্ছ্বসিত হতে লাগল। প্রভু বললেন, ভাইসব, তোমরা আমার একটি সার উপদেশ শোন, আমরা কেন আমাদের জীবনের রাতগুলোকে বৃথা নষ্ট করছি? আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর, রোজ রাত্রে মঙ্গলকীর্তন করা হবে। কীর্তন করে সকল ভক্তগণ মিলে ভক্তিস্বরূপিনী গঙ্গায়

ডুব দিয়ে চান করব। কৃষ্ণনাম শুনে জগৎ উদ্ধার হোক। তোমাদের ধনপ্রাণ সবই পরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ কর। এই কথা শুনে সকল বৈষ্ণবের মনে মহা আনন্দ হল, এবং তাঁরা মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্কীর্তন শুরু করে দিলেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় রোজ রাতে কীর্তন হয়, কোন কোন দিন চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতেও হয়। নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, বিদ্যানিধি, মুরারি গুপ্ত, হিরণ্য, হরিদাস, গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন, জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্তখান, নারায়ণ, কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই, গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান পণ্ডিত, শ্রীধর, সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভপণ্ডিত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম-সঞ্জয় ইত্যাদি সকল ভক্তগণই শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যকীর্তনের সঙ্গী ছিলেন। প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ-ভক্তগণ ব্যতীত অন্য কেউ কীর্তনের ত্রিসীমায় থাকেন না। প্রভুর প্রেমহুঙ্কার এবং রাত্রের হরিধ্বনি শুনে মনে হয় যেন তা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে প্রবাহিত হচ্ছে।

সেই কীর্তন শুনে অভক্তরা বলে, রাত্রে এবা মদ এনে খায। এরা মধুমতী-সিদ্ধি জানে। রাত্রে মন্ত্র পড়ে পঞ্চকন্যা আনে। সারা রাতে একটু ঘুমুতে পারি না। সব সময খালি 'বোল বোল' হুহুঙ্কার শুনি। পাষণ্ডী অভক্তরা এই বলে গালাগালি করে কিন্তু শ্রীশচীনন্দন সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আনন্দে কীর্তন করেই চলেছেন। কীর্তন শুনে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তিনি মাটিতে আছাড খেয়ে পড়ে যান। প্রভু এমন জোর আছড়ে পড়েন যেন মাটি ফেটে যাবে মনে হয। সকলেই ভয় পেয়ে যান। নবম শরীরে কত না কষ্ট হচ্ছে দেখে শচীমাতা চোখ বুজে ভগবানকে ডাকেন। প্রভু ভক্তভাবেব আবেশে মাটিতে পড়ে যান কিন্তু শচী দেবী মাতৃস্নেহে অত্যন্ত দুঃখ পান। কি করলে যে ছেলে আর আছাড় খেযে পড়বে না তা মাতা জানেন না। তাই তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, বিশ্বম্ভরের আছাড পড়ার সময় আমি যেন সেখানে না থাকি। যদিও পবমানন্দ আস্বাদন করে পুত্র দুঃখ পায না, তবু তাব আছাড়ের কথা আমি না জানলেই ভাল।

মায়ের মনোভাব বুঝতে পেরে শ্রীগৌরাঙ্গ সে ভাবেই ব্যবস্থা করলেন। প্রভু যতক্ষণ হরিসঙ্কীর্তন করেন, শচীমাতার ততক্ষণ কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তিনি পরমানন্দে বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে থাকেন। এখন প্রভুর অবিরাম অনন্দ-কীর্তনাদি চলছে, ভক্তগণ তাঁকে দিবারাত্র ঘিরে রয়েছেন। কোন কোন দিন প্রভুর বাড়িতে ভক্তরা গান করেন, প্রভু নাচেন। কখনো তিনি ঈশ্বরভাবে প্রকাশিত হন। আবার কখন, 'আমি দাস' বলে কাঁদেন।

প্রভুর এই সাত্ত্বিক প্রেমবিকারের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে এর কোন তুলনাই নেই। গৌরচন্দ্র যেমন আনন্দে নৃত্য করছেন ভক্তবৃন্দও তেমনি আনন্দে গাইছেন। শ্রীহরিবাসর-ব্রতদিনে শ্রীহরিনাম কীর্তনের বিধি আছে শাস্ত্রে। প্রভু জগতের জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য তাই নৃত্য আরম্ভ করলেন। পুণ্যবন্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের আঙ্গিনায কীর্তনের শুভারম্ভ হল; ধ্বনি উঠল, 'গোপাল গোবিন্দ'। ভোর থেকেই বিশ্বম্ভর কীর্তন আরম্ভ করেছেন। ভক্তগণ দলে দলে ভাগ হয়ে সুন্দর কীর্তন করছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত এক দল নিয়ে গাইছেন, মুকুন্দ আবার কয়েক জনকে নিয়ে গাইতে লেগেছেন। গোবিন্দ দত্ত আরো কয়েক জনকে নিয়ে কীর্তন করছেন। গৌরচন্দ্র নৃত্য করছেন, সকলে গাইছেন। নিত্যানন্দ তাঁকে ধরে আছেন যাতে তিনি পড়ে না যান। অদ্বৈত সবার অলক্ষ্যে প্রভুর

পদধূলি নিচ্ছেন। গদাধব প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রভুব কীর্তনে সজল-নয়নে আনন্দে বিহ্বল হয়ে আছেন। প্রভু বিভিন্ন ভাবে চল্লিশ পদ কীর্তন কবেছেন, সেই সকল প্রেমবিকাবেব কথা বলা হচ্ছে। ভক্তগণ, মন দিয়ে শোন। চল্লিশটি ভাবই বর্ণনা কবা হচ্ছে।

(১) চাবদিকে গোবিন্দধ্বনি, শচীনন্দন লীলায় নৃত্য কবছেন। তিনি পাবিষদগণেব সঙ্গে বিহ্বল হয়ে আছেন। হবি বাম বাম বাম—কীর্তন হচ্ছে। প্রভু প্রেমাবেশে এক প্রহব ধবে কাঁদেন। তখন তাঁব চুল মাটিতে লুটায়, তিনি তা বাঁধেন না। কাঠেব মত কঠিন মনেব এমন কোন লোক নেই যে প্রভুব সে অবস্থা দেখে না কেঁদে থাকতে পাবে। (২) প্রভুব হাসবাব সময়েও তেমনি এক প্রহব ধবে হাসেন। ভক্তভাবে আবিষ্ট হয়ে প্রভু নিজমহিমা জানতে পাবেন না। 'জয় কবলাম' বলে ঘন ঘন চেঁচিয়ে ওঠেন। (৩) মাঝেমধ্যে তিনি খুব জোবে গান কবেন যেন ব্রহ্মাণ্ড ভেদ কবে শব্দ হয। কখনো আবাব সাবা দুনিয়াব জোব এসে গায়ে ভব কবে। কোন সঙ্গীই তাঁকে ধবে বাখতে পাবেন না। (৪) আবাব কখনো তুলো থেকেও হাল্কা হয়ে যান। সকলেই অনায়াসে কাধে তুলে নিতে পাবেন। ভক্তগণ প্রভুকে কাঁধে নিয়ে মহা আনন্দে উঠোন ঘুবতে থাকেন। (৫) প্রভু যখন আনন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়েন তখন সকলে ভয় পেয়ে তাঁব কানেব কাছে হবিনাম উচ্চাবণ কবতে থাকেন। খুব শীতে যেমন বাচ্চাদেব দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি খায় তেমনি প্রভু কখনো কখনো সর্বঅঙ্গ অসম্ভব বকম কাঁপতে থাকে। (৬) মাঝে মাঝে প্রভুব শবীব যেন আগুনে পুড়ে যায় এমন গবম হয়। চন্দন দেওয়ামাত্র শুকিয়ে যায়। (৭) কখনো জোবে জোবে শ্বাস বইতে থাকে, তখন সকলে সামনে থেকে পাশে সবে যায়। কখনো তিনি সবাব পায়ে ধবতে চান, ভক্তগণ ভয়ে পালিয়ে যান। (৮) প্রভু কখনো নিত্যানন্দেব গায়ে হেলান দিয়ে বসেন, ভক্তগণ ইঙ্গিত বুঝতে পেবে তখন তাঁব চবণধূলি গ্রহণ কবেন। (৯) অদ্বৈতাচার্য বলেন, তোমাব পালিয়ে থাকাব উপায় নেই, আমবা সব ধবে ফেলেছি। বিশ্বম্ভব মহানন্দে গড়াগড়ি দেন, ভক্তেবা কৃষ্ণগুণগান কবতে থাকেন। (১০) প্রভু যখন উদ্দণ্ড নৃত্য কবতে থাকেন তখন পৃথিবী কেঁপে ওঠে, সকলে খুব ভয় পায়। আবাব কখনো নন্দ-নন্দন নটবব গোপালেব মত মধুব ভাবে নৃত্য কবেন। (১১) প্রভু কখনো কোটি সিংহেব মত হুঙ্কাব কবেন, কানে তালা লেগে যায়। লাফিয়ে অনেক উপবে উঠে যান। তা কেউ দেখে, কেউবা দেখেও না। (১২) প্রভু ভাবাবেশে যাব দিকে চোখ পাকিয়ে তাকান সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। বিশ্বম্ভব কৃষ্ণ আবেশে চঞ্চল হয়ে নেচে নেচে অভিভূত হয়ে পড়েন। তখন তাঁব আপন-পব জ্ঞান থাকে না। (১৩) প্রভু একবাব ভাবাবেশে যাব পায়ে ধবেন আবাব তাবই মাথায় চড়ে বসেন। এই মাত্র যাব গলা ধবে কাঁদলেন পবক্ষণেই আবাব তাব কাঁধে উঠে বসলেন। (১৪) কখনো প্রভুব চঞ্চল বাল্যভাব হয তখন তিনি ছোটদেব মত মুখ বাজিয়ে শব্দ কবেন, পা দোলান, খলখল কবে হাসেন। হামাগুড়ি দিয়ে চলেন। (১৫) প্রভু কখনো এক প্রহব কাল ত্রিভঙ্গ হয়ে হাতে যেন মুবলী নিয়ে বাজাতে থাকেন। সাক্ষাৎ বৃন্দাবনেব শ্রীকৃষ্ণ মনে হয। (১৬) সেই ভাব কেটে গেলে আবাব দাস্যভাবে কাঁদতে থাকেন, দাঁতে তৃণ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণেব পদসেবা কবতে চান। এক প্রহব কাল গোল হয়ে ঘুবতে থাকেন তাতে তাঁব পা এসে নিজেব মাথায় লেগে যায়। (১৭) যখন যে ভাব হয় তাতেই নিজেব নামেব আনন্দে মজে থাকেন, এই এক অদ্ভুত ব্যাপাব। ঘন ঘন হিক্কা হয়,

সারা গা নড়ে ওঠে, তিনি স্থির থাকতে পারেন না, মাটিতে পড়ে যান। (১৮) প্রভুর গৌরবর্ণ দেহ, মাঝেমাঝেই রং পালটে যায়। দুটো চোখ কখনো কখনো দ্বিগুণ দীঘল হয়ে যায়। তিনি অলৌকিক ভক্ত-আবেশে থাকেন, যা বলা ঠিক নয় তেমন কথাও বলেন। (১৯) আগে যে-বৈষ্ণবকে তিনি ভক্তিভরে প্রণাম করেছেন এখন তিনি চুলে ধরে বলেন,—এ আমার দাস। তিনি যাঁর পায়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন এখন তাঁরই বুকে উঠে পা তুলে দেন। (২০) প্রভুর আনন্দ দেখে ভক্তগণ নিজেদের গলা ধরাধরি করে কাঁদেন। সকলেই চন্দন এবং মালা পরেছেন, কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দে বিহ্বল হয়ে কীর্তন করে চলেছেন। (২১) সঙ্কীর্তনের সঙ্গে মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খকরতাল বাজতে লাগল। আকাশ পূর্ণ করে ব্রহ্মাণ্ডে ধ্বনি উঠেছে, চারদিকের অমঙ্গল সব দূর হয়ে গেছে। (২২) যাঁর সেবকের নৃত্যে সর্ব বিঘ্ননাশ হয়ে জগৎ পবিত্র হয় সেই প্রভু নিজে নৃত্য করলে যে তার কী ফল হবে তা পুরাণে লিখেও শেষ করতে পারে নি। (২৩) চার দিকে শ্রীহরিমঙ্গল-সঙ্কীর্তন হচ্ছে, মাঝে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গ নাচছেন। এই নামানন্দেই শিব কৃত্তিবাস হয়েছেন। শিব যাঁর প্রতি ভক্তিতে নাচছিলেন এখন তিনি নিজেই নাচছেন। (২৪) যাঁর নামে তপস্বী বল্মীক হয়েছেন, অজামিল মুক্ত হলেন, লোকের সংসার বন্ধন ঘুচে যায়, সেই প্রভু কলিযুগে অবতীর্ণ হয়ে নাচছেন। (২৫) যাঁর নাম নিয়ে শুকদেব নারদ অনন্তদেব কীর্তন করে বেড়ান, যাঁর নাম সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত তুল্য পাপনাশক, তিনি নিজেই এখন নৃত্য করছেন, ভাগ্যবানগণ দেখতে পাচ্ছেন। (২৬) গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর দৈন্য প্রকাশ করে বলছেন, আমি পাপিষ্ঠ তাই তখন জন্মাই নি এবং এমন মহোৎসবও দেখতে পাই নি। শ্রীভাগবতে কলিযুগের প্রশংসা করা হয়েছে, ব্যাসদেবের কাছে জেনে তা শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন। (২৭) মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নিজের আনন্দেই নাচছেন, পাদপাতের শব্দও কত সুন্দর। ভাবাবেশে প্রভুর গলায় মালা থাকছে না, ছিঁড়ে গিয়ে ভক্তের গায়ে পড়ছে। (২৮) তাঁর গরুড়বাহনের সুখ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী রূপ, অনন্ত-শয়ন সুখ—এসব কোথায় গেল? এখন তিনি দাস্য ভাবে ধুলোয় লুটিয়ে রোদন করছেন। (২৯) বৈকুণ্ঠের সুখ ত্যাগ করে, সমস্ত সুখ ভুলে গিয়ে এখন দাস্য সুখে মত্ত আছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বদন দর্শনের আনন্দ ভুলে শ্রীকৃষ্ণবিরহের ভাবে আবিষ্ট হয়ে বাহু মুখ তুলে তিনি কাঁদছেন। (৩০) শঙ্কর নারদ প্রমুখ যাঁর ভক্তরূপে সব ঐশ্বর্য ত্যাগ করে দাস হয়ে থাকেন তিনি নিজেই দন্তে তৃণ ধারণ করে সব সুখ ছেড়ে দাস্যভক্তি প্রার্থনা করছেন। (৩১) যে ভক্তিব্যাখ্যা না করে ভাগবত পাঠ করে এবং যে দাস্যযোগ ছেড়ে অন্য কিছু চায় সে যেন অমৃত ছেড়ে বিষের জন্য ধেয়ে মরে। (৩২) শাস্ত্রের মর্ম না জেনে পড়াতে যাওয়া যেন গাধার মত গ্রন্থের বোঝা বয়ে বেড়ান। ভক্তিহীন স্বভাব বলে সে কদর্থ ব্যাখ্যা করে। (৩৩) বেদাদি শাস্ত্রে এবং ভাগবতে বলে, দাস ভাব বড় সম্পত্তি। রমা-অজ-ভব এঁরা সকলেই দাস্যভাব পাওয়ার জন্য যত্ন করেন। চৈতন্যের উপদেশে যাঁর বিশ্বাস নেই তাকে মূর্খ বললেই হয়। আর কিছু বলার নেই। (৩৪) চার দিকে সুন্দর কীর্তনের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস্যভাবে নাচছেন। প্রভু শুনতে শুনতে যখন মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন তখন অদ্বৈত হাতে তৃণ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। (৩৫) অদ্বৈত তৃণ দিয়ে প্রভুর আপাদমস্তক রক্ষা করলেন এবং সেই তৃণ মাথায় নিয়ে নাচতে লাগলেন। অদ্বৈতের ভক্তি দেখে সকলে ভয় পেলেন কিন্তু

নিত্যানন্দ ও গদাধর দুজনে হাসছেন। (৩৬) জগৎজীবন প্রভু গৌরচন্দ্র বারংবার আবেশে নৃত্য করছেন। তাঁর শরীরে এমন সব প্রেমবিকার দেখা যাচ্ছে যা ভাগবতেও পুরো নেই। (৩৭) কখনো সারা গা স্তম্ভ হয়ে যায়, একটুও নোয়ানো যায় না। আবার সেই শরীরই এমন মাখনের মত নরম হয় যেন হাড়গোড় কিছুমাত্র নেই। (৩৮) প্রভুর শরীর কখনো দু-তিন গুণ বড় হয়ে যায় আবার কখনো স্বাভাবিকের চেয়ে ক্ষীণ হয়। কখনো আবার তিনি মাতালের মত হেলে পড়ছেন, হেসে হেসে শরীর দোলাচ্ছেন, তখন খুবই আনন্দ। (৩৯) সকল বৈষ্ণবগণের দিকে তাকিয়ে প্রভু ভাবাবেশে তাঁদের পূর্বজন্মের নাম ধরে ডাকছেন,—হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ, রমা, অজ, উদ্ধব ইত্যাদি। (৪০) সকল ভক্তদের দিকে তাকিয়ে প্রভু পূর্বের নাম ধরে ডাকছেন, কে কী ডেকে সকলকে তত্ত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। প্রভুর অপরূপ নৃত্য এবং অপরূপ কৃষ্ণ-আবেশ সকল ভক্ত নয়ন ভরে দেখছেন।

পরম দয়াল গৌরহরির ধন্য অবতারে এই পৃথিবী ধন্য হয়েছে, এই কলিকাল ধন্য হয়েছে। আগে যাঁরা বাড়ির ভিতরে ঢুকেছিলেন তাঁরাই রইলেন, অন্য কেউ ঢুকতে পারল না। প্রভুর আজ্ঞায় দরজায় খিল এঁটে দেওয়া হয়েছে। নদীয়াবাসী সকলেই কিন্তু ঢুকতে পারছেন না। কীর্তন শুনে লোকেরা দৌড়ে এসেও ভেতরে যেতে না পেরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। হাজার হাজার লোক মিলে চীৎকার করছে, কীর্তন দৃশ্য দেখব, দরজা খুলে দাও তাড়াতাড়ি। বৈষ্ণবগণ কীর্তনের রসে ডুবে রয়েছেন, তাঁদের কানে কোন শব্দ ঢুকছে না। অভক্তরা ঢুকতে না পেরে বাইরে দাঁড়িয়ে গাল-মন্দ করতে লাগল। কেউ বলে,—এরা সব অখ্যাদ-কুখাদ্য খায়, লোকে দেখলে লজ্জা পাবে তাই দরজা বন্ধ করে নিয়েছে। কেউ বলে,—কথা ঠিকই। তা নইলে সারা দিন এমন চীৎকার করছে কিসের জোরে। কেউ বলে,—নিমাই পণ্ডিত তো ভালই ছিল, ভগবান তার এমন মনের অবস্থা কেন করলেন কে জানে। কেউ বলে,—এসব হচ্ছে পূর্বজন্মের কর্মফল। আবার কেউ বলছে,—সঙ্গদোষে নিমাই পণ্ডিতের এই অবস্থা হয়েছে। একে তো দেখবার কেউ নেই, বাবা মারা গেছেন তার উপর আবার বায়ুরোগ আছে। তাই কুসঙ্গে মিশে এখন এই অবস্থা হয়েছে। কেউ কেউ বলে—পড়াশোনা সব ভুলে গেছে। ব্যাকরণ এমনই একটা বিষয় যে মাসখানেক চর্চা না করলেই সব ভুলে যেতে হয়। কেউ বলে,—দরজা বন্ধ করে কেন কীর্তন করে তার গূঢ় রহস্য আমরা জানি। গভীর রাত্রে মন্ত্র পড়ে পঞ্চ কন্যা নিয়ে আসে। নানা রকমের জিনিসপত্র আসে তাদের সঙ্গে—গন্ধদ্রব্য, মালা, কাপড়চোপড়, খাবারদাবার জিনিস। খেয়ে দেয়ে তাদের সঙ্গে নানা রকম ফষ্টিনষ্টি চলে। এসব তো আর বাইরের লেকের সামনে করা চলে না, তাই দরজা বন্ধ করে মজা লোটে। কেউ বলে,—সকাল হোক, কালকেই কাজীর কাছে যাব। দেখবে তখন, সব কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে। দেশে রাজ্যে কোথাও যে কীর্তন ছিল না তাই আমদানি করে এখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। সব উলটাপালটা হচ্ছে। বুঝতে পারছি, দেবতা বৃষ্টি দেবে না, ধানগাছ মরে যাবে, টাকাকড়ির আমদানি কমে যাবে। দেশে আকাল নেমে আসবে। শ্রীবাসই দলের সর্দার। কালই ব্যবস্থা করছি। তখন অদ্বৈতাচার্যও কিছু করতে পারবে না। কোথা থেকে হঠাৎ অবধূত নিত্যানন্দ এসে হাজির হয়েছে। শ্রীবাসের বাড়িতে থেকে এসব অপকীর্তি করছে। কীর্তনানন্দে বিভোর থেকে

বৈষ্ণবগণ পাড়ার গুণ্ডাদের এসব ভয়ের কথা কিছুই শুনতে পান নি। কেউ বলে,—এই সব নাচাকোঁদা ব্রাহ্মণের কাজ নয়। শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও এরা কি করে এমন করছে বুঝতে পারি না। কেউ বলে—এদের সঙ্গে কথা বললে, এমন কি এদের দিকে তাকালেও পাপ হয়। এদের এই নাচনকোদন দেখলেই ভাল লোকও সঙ্গদোষে নষ্ট হয়ে যায়। তা প্রমাণ দেখ, নিমাই পণ্ডিত বেশ ভাল ছেলে ছিল, এগুলোর সঙ্গে মিশে সেও গোল্লায় গেছে। কেউ কেউ অবার বলে, পরমাত্মার সন্ধান না করে চীৎকার করে কি হবে? নিজের শরীরেই পরব্রহ্ম আছেন। ঘরের মধ্যে কিছু হারিয়ে গিয়ে বনে তা খুঁজে কি লাভ হবে?

কেউ বলে —পরচর্চা করে কি হবে, চল বাড়িতে চলে যাই, আমাদের এসব দেখার দরকারই বা কি? কেউ বলে,—আমাদের কর্মদোষেই আমরা কীর্তনদৃশ্য দেখতে পেলাম না। সেসব ভাগ্যবান সুকৃতি লোকদের সম্বন্ধে এমন কুকথা বলা ঠিক নয়।

১ পাষণ্ডীরা সকলে দল বেঁধে তাকে ধরতে গেল দৌড়ে, এই যে ওদের লোক যাচ্ছে। আরো বলল, ঐ কীর্তন না দেখতে পেলে এমন আর কি ক্ষতি হবে। শ'খানেক লোক মিলে যেন ঝগড়া করছে, এই তো ব্যাপার। পাষণ্ডীরা আরো বলল—এই কীর্তনে কোন্ জপ আছে, না কোন্ তপস্যা আছে, না কি কেবল তত্ত্বজ্ঞানের কথা আছে যে তা আমাদের না দেখলেই নয়। বরং তার চেয়ে গিয়ে নিজেদের কাজেকর্মে মন দেওয়াই ভাল। চাল ডাল দই কলা এক সঙ্গে মেখে সকলে মিলে খেয়ে জাতি নাশ করে। বিদ্রূপ করার জন্যই তারা দেখতে আসে। মনের ভাবটা হচ্ছে, দেখি পাগলগুলো মিলে কি করে। এই সব বলে সকলে মিলে এগোয়। কেউ কেউ চলে যায়, আবার গোটা কতক এসে জোটে। এক পাষণ্ডীর সঙ্গে আর এক পাষণ্ডীর দেখা হলেই তারা এসব কথা বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে। এক জনকে আরেক জন আবার ধরে নিয়ে যায় দেখাবার জন্যে। কেউ বা আবার কারো অনুরোধে ফিরে আসে। কেউ হয়ত বলে, দেখলাম যে নিমাই পণ্ডিতের কারণেই সব পাগল হয়েছে। শ্রীবাসের বাড়িতেই এই ব্যাঙের কেত্তন আরম্ভ হয়েছে। দুর্গা পূজার মণ্ডপে সারি গানের সময় দুই দলের হুড়োহুড়ির মত আর কি। খালি হৈ-হট্টগোল চলছে। নবদ্বীপের আর মান থাকল না। যেখানে বড় বড় পণ্ডিতের বাস সেখানে কতগুলো বদমাশের আড্ডা হয়েছে। কালকে গিয়ে শ্রীবাসের বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে গঙ্গায় ফেলে দেব। ঐ বামুনকে তাড়াতে পারলেই গ্রামের মঙ্গল, তা না হলে যবনেরা অত্যাচার শুরু করবে। পাষণ্ডীরা এভাবে উৎপাত চালিয়ে যাচ্ছে। তবু তাদের ভাগ্যবান বলব, কারণ এরা প্রভুর সময়ে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছে, প্রভু যে কীর্তন বিধান করেছেন তাও তারা শুনেছে। শ্রীচৈতন্যের পারিষদবর্গ কৃষ্ণভক্তিতে মাতোয়ারা, তাঁরা এসব লোকের আজেবাজে কথা কানেও তোলেন না। তাঁরা আনন্দে দিবারাত্রি গেয়ে চলেছেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী'। প্রভু অষ্টপ্রহর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নৃত্য করছেন। অথচ কেউ শ্রান্ত হচ্ছেন না। ভগবানের নিত্য-পার্ষদগণের দেহ প্রাকৃত-পঞ্চভূতাত্মক নয়, তাই মায়া-প্রভাবিত শ্রান্তি তাঁদের নেই। তাঁরা চিন্ময় তত্ত্ব। শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভুর এই কীর্তন এক বছর চলেছিল। নামেই এক বছর। আসলে যে কত যুগ কেটে গেছে তা তাঁরা মহানন্দে থেকে জানতেও পারেন নি। বৃন্দাবনের সেই রাসক্রীড়া যেমন কত যুগ ধরে চলেছে কিন্তু গোপিকাগণের মনে হয়েছে, ক্ষণিক মাত্র।

কৃষ্ণের প্রকাশ এমনি অচিন্ত্য, ভাগ্যবান চৈতন্যভক্তবৃন্দই কেবল তা জানতে পারেন। প্রভু নৃত্য করে চলেছেন, আর মাত্র এক প্রহর রাত আছে। এমন সময়ে তিনি শালগ্রাম-শিলা কোলে নিয়ে সিংহাসনে উঠে বসলেন। বিশ্বম্ভরের ভারে সিংহাসন মড়-মড় করে উঠল, তাড়াতাড়ি নিত্যানন্দ সিংহাসন ধরে সামলালেন। সিংহাসনে সহস্রবদন অনন্তদেবের অধিষ্ঠান হল, আসন ভাঙ্গল না, শ্রীগৌরাঙ্গ দুলতে লাগলেন। শ্রীচৈতন্যের আদেশে কীর্তন বন্ধ হল। তিনি নিজের তত্ত্ব বলতে লাগলেন, কলিযুগে আমি ভগবান দেবকীনন্দন, কৃষ্ণ এবং নারায়ণ আমিই, অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা আমি, আমার নাম-গুণাদিই তোমরা কীর্তন করছ, তোমরা সকলেই আমার পরম ভক্ত। তোমাদের জন্যই আমি অবতীর্ণ হয়েছি তোমরা যা দাও তাই আমি আহার করি। তোমরা যা কিছু শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন কর তা সবই আমি পাই।

শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন, এই যে নিবেদিত দধি-দুগ্ধ যা আছে সবই তোমার। প্রভু বললেন, আমিই সব খাব। অদ্বৈতাচার্য তখন বললেন, প্রভু, সে তো আমাদের সৌভাগ্য, বড়ই মঙ্গল।

সমস্ত ভক্ত হাতে হাতে প্রভুকে সব দ্রব্যাদি তুলে দিচ্ছেন। স্বীয় শ্রীকৃষ্ণভাবের আবেশে প্রভু ভোজন করছেন। প্রভু দধি দুগ্ধ নবনীত খেযে নিয়ে বলছেন, আর কি আছে, নিয়ে এস। শর্করা মিশ্রিত নানাবিধ সন্দেশ, মুগের নাড়ু, কচি ডাব ও তার জল, কলা, চিঁড়ে, চালভাজা, এসব খেয়ে প্রভু বলছেন, আর একবার নিয়ে এস। জাগতিক হিসাবে দুশো লোকের খাবার নিমেষে খেয়ে প্রভু বলছেন, আর কি আছে? নিয়ে এস। ভক্তগণ ভয়ে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলেন। হাতজোড় করে তারা বললেন, প্রভু, তোমার মহিমা আমরা কি জানি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর উদরে রয়েছে তাঁকে সামান্য অর্ঘ্য দিয়ে কি করব?

প্রভু বললেন, ভক্তের দেওয়া উপহার কিছুতেই সামান্য নয, অসামান্য। কি আছে শীঘ্র নিয়ে এস।

ভক্তগণ বললেন, কর্পূর তাম্বুল আছে।

প্রভু বললেন, কোন চিন্তা নেই, তাই দাও।

তখন সকলে আনন্দ লাভ করলেন। ভয় কেটে গেল। ভক্তগণ সাধ্যমত তাম্বুলাদি দিলেন। ভক্তবৃন্দের হাত থেকে প্রভু নিজে হাত পেতে নিয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। চিত্তে গাম্ভীর্য পোষণ করে প্রভু মাঝে মাঝে হাসছেন, ভক্তগণ কিন্তু ভয়ে আছেন। হঠাৎ চোখ পাকিয়ে হুঙ্কার করে উঠলেন, নাঢ়া কোথায়? নাঢ়া কোথায়? প্রভু অগ্নিশর্মা হয়ে আছেন। তাঁর সামনে কেউ যেতে পারছে না। নিত্যানন্দ তাঁর মাথায় ছাতা ধরে রয়েছেন, অদ্বৈতাচার্য সামনে হাতজোড় করে স্তুতি করছেন। অন্য ভক্তগণ সকলে মহাভয়ে হাতজোড় করে, মাথা নামিয়ে চৈতন্যচরণ চিন্তা করছেন। ঐশ্বর্যকথা শুনবার যার ইচ্ছে আছে সে অবশ্যই প্রভুর শ্রীমুখ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করবে। যে যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, আজ্ঞা না হলে কেউ এগোতে পারছে না। প্রভু অদ্বৈতের দিকে তাকিয়ে বললেন, বর প্রার্থনা কর। তোমার জন্যই আমি এখানে এসেছি। এইভাবে সব ভক্তের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে প্রভু একে একে সকলকে বর চাইতে বললেন। প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশ দেখে ভক্তবৃন্দ যেন আনন্দসাগরে ভাসতে

লাগলেন। অচিন্ত্য চৈতন্যলীলা বুঝতে পারা যায় না, ঐশ্বর্য দেখিয়ে আবার পরক্ষণেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ....জ্ঞান পেয়েই প্রভু কাঁদতে লাগলেন, তখন তাঁর দাস্যভাব। সকল বৈষ্ণবের গলা ধরে কাঁদছেন, 'ভাই বন্ধু' বলে কথা বলছেন। প্রভুর এই মায়ার খেলা কেউ বুঝতে পারে না। ভক্তবৃন্দ ছাড়া অন্যেরা বুঝবেই বা কি করে? প্রভুর আচরণ দেখে ভক্তরা হাসছেন, সকলেই বলছে, নারায়ণ অবতীর্ণ হয়েছেন। কিছু সময় সিংহাসনে থেকে শ্রীগৌরসুন্দর আনন্দে মূর্ছিত হলেন। শরীরে চেতনার চিহ্নমাত্র নেই। পার্ষদগণ চারদিকে ঘিরে কাঁদতে লাগলেন। ভক্তগণ বলাবলি করতে লাগলেন, প্রভু বোধ হয় আমাদের ছেড়ে চললেন। প্রভু যদি সত্যি এমন নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করেন তাহলে আমরাও প্রাণ বিসর্জন দেব। ভক্তবৃন্দ এই রকম চিন্তা করতেই সর্বজ্ঞের চূড়ামণি বাহ্যজ্ঞান লাভ ক'রে মহা-হরিধ্বনি করে উঠলেন। উপস্থিত লোকেরা সকলেই তখন মহা আনন্দধ্বনিতে বিহ্বল হয়ে প্রায় নেচে উঠলেন। স্বয়ং ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ প্রেমরসে নবদ্বীপধামে এই রকম আনন্দলীলা করছেন। নবদ্বীপে যেন আর আনন্দ-উদ্দীপনার শেষ নেই। এই সকল পুণ্যকথা যে শ্রবণ করে সপার্ষদ্ গৌরচন্দ্রে তাঁর মতি স্থির থাকে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং নিত্যানন্দচন্দ্র জানেন যে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁদের শ্রীপদযুগপ্রান্তে এই কীর্তন করছেন।

২/৯ অখিল-ভুবন-অধিকারী শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসবেশ ধারণ একটি ছলনা মাত্র। শচী-জগন্নাথেব পুত্র শ্রীচৈতন্যের সঙ্কীর্তন জয়যুক্ত হোক। নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন, অদ্বৈত-শ্রীবাসের প্রাণধন, জগদানন্দ-হরিদাসের প্রাণ, বক্রেশ্বর-পুণ্ডরীকের প্রেমধাম, বাসুদেব-শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক। প্রভু, তুমি জীবের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত কর। ভক্তগোষ্ঠীসহ শ্রীগৌরাঙ্গের জয়গান করি। শ্রীচৈতন্য-কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনলে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করা যায়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে প্রভুর বিহারের কথাই বলা হয়েছে। এখন প্রভুর মহাপ্রকাশের কথা বলা হচ্ছে, এই মহাপ্রকাশেই ভক্তবৃন্দের সর্ববিধ অভিলাষ সিদ্ধ হয়েছে। এখানেই প্রভু সর্ব-অবতার ধাবণ করেছিলেন, এই মহাপ্রকাশই লোকগণের মধ্যে 'সাতপ্রহরিয়া ভাব' নামে বিখ্যাত। তখন তিনি জনে জনে বিষ্ণুভক্তি দানের লীলা করেছেন, অদ্ভুত রকমের প্রকাশে অদ্ভুত ভোজনাদি করেছেন। সকল ভক্তবৃন্দ মিলে প্রভুকে সেদিন রাজরাজেশ্বরের যেমন অভিষেক হয় তেমনি মাঙ্গলিক স্নানাদি করিয়েছিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীগৌবসুন্দর একদিন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের বাড়িতে এলেন। সঙ্গে পরম বিহ্বল নিতাইচাঁদ আছেন। আস্তে আস্তে ভক্তগণ সকলেই এলেন। মহাপ্রভু আবেশিত চিত্তে পরম ঐশ্বর্য প্রকাশ করে চারদিকে তাকাচ্ছেন। প্রভুর ইঙ্গিত বুঝে ভক্তবৃন্দ উচ্চকীর্তন আরম্ভ করলেন। অন্যান্য দিন প্রভু দাস্যভাবে নৃত্য করেন। কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ করার পর আবার বাহ্যজ্ঞান লাভ করেন। ভক্তবৃন্দের সৌভাগ্যই বলতে হবে, প্রভু নাচতে নাচতে বিষ্ণুখট্টায় উঠে বসলেন। অন্যান্য দিন প্রভু ভাবে বিভোর হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় বিষ্ণুর আসনে উঠে বসেন। আজ প্রভু সাতপ্রহারিয়াভাবে যোগমায়ার সব ছলনা ছেড়ে সাত প্রহর ধরে ব্যক্ত হয়ে বসলেন। ভক্তবৃন্দ সকলে মহাআনন্দে তাঁর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। অপূর্ব আনন্দধারা বইতে লাগল, সকলেই মনে করলেন যেন

মায়াতীত ভগবৎ ধামের লীলাই চলছে। বিন্দুমাত্র মায়ার প্রভাব নেই, প্রভু ঠিক যেন বৈকুণ্ঠনাথের মতই বসলেন। তিনি আদেশ দিলেন, আমার অভিষেকে গান কর। ভক্তগণ আনন্দে গান ধরলেন। অভিষেক-সঙ্গীত শুনে প্রভু আনন্দে মাথা দোলাচ্ছেন, আর পূর্ণ-প্রসন্নতায় সকলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করছেন। ভক্তবৃন্দ প্রভুর ইঙ্গিত বুঝেছেন। সকলেরই ইচ্ছা অভিষেক করার। সকল ভক্তগণ মিলে গঙ্গাজল এনে ভাল কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিলেন। তারপর পরম যত্নে কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য দিলেন। জয়ধ্বনি সহ অভিষেক-মন্ত্র পড়তে লাগলেন। সকলের আগে শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলে প্রভুর মাথায় জল দিলেন। অদ্বৈত-শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তগণ পুরুষসূক্ত পড়ে স্নান করালেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্রবিদ্ ভক্তগণ মন্ত্র পড়ে জল দিচ্ছেন। মুকুন্দ প্রমুখ ভক্তগণ সুমঙ্গল অভিষেক-গীত করছেন। কেউ নাচছে, কেউ গাইছে, আনন্দে বিহ্বল হয়ে পতিব্রতাগণ উলুধ্বনি করছেন, সকলেরই মন আনন্দে ভরে গিয়েছে। বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর বসে আছেন, ভক্তরা মাথায় জল ঢালছেন। একশো আট ঘট জল দেবার কথা কিন্তু ভক্তগণ হাজার ঘট জল ঢেলেও থামছেন না। ভাগ্যবান দেবতারাই গুপ্ত-ভাবে মানুষের আকার ধরে অভিষেকের কাজ করছেন। সাক্ষাতে নয়, ধ্যানে একবিন্দু জল প্রভুর পাদপদ্মে দিলেই তার আর যমের ভয় থাকে না। সেই প্রভু এখন সাক্ষাতে সকলের জল নিচ্ছেন। শ্রীবাসের দাসদাসীগণ প্রভুকে জল এনে স্নান করাচ্ছেন। শ্রীবাসের বাড়ির এক দাসীর নাম ছিল 'দুঃখী'। সেও প্রভুর ভক্তগণের সেবা করার সৌভাগ্যের ফলে প্রভুকে স্নান করাচ্ছেন। প্রভু তাঁর ভক্তিযোগ দেখে তার নাম পাল্টে রাখলেন 'সুখী'।

ভক্তগণ বেদমন্ত্র পাঠ করে প্রভুকে স্নান করিয়ে তাঁর গাত্রমার্জন করতে লাগলেন। স্নানের পরে নতুন কাপড় পরালেন, গায়ে চন্দন লেপন করলেন। সিংহাসন সাজান হল। প্রভু সেই বিষ্ণুখট্টায় বসলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় ছত্র ধরলেন। কোন ভাগ্যবান ভক্ত চামর দোলাচ্ছেন। পূজার সামগ্রী এনে সকল ভক্ত মিলে প্রভুর চরণ পূজা করতে লাগলেন। পাদ্য অর্ঘ আচমনী গন্ধ পুষ্প ধূপ প্রদীপ নৈবেদ্য বস্ত্র যথাযথ দেওয়া হল। যজ্ঞসূত্র এবং অলঙ্কারাদি দিয়ে ষোড়শ উপচারে পূজা করা হল। ভক্তগণ সকলে মিলে পুনঃপুনঃ তুলসীমঞ্জরীতে চন্দন মেখে প্রভুর চরণে দিচ্ছেন। দশ অক্ষর গোপাল মন্ত্রের বিধিমতে ভক্তগণ প্রভুকে পূজা করে স্তব করতে লাগলেন। অদ্বৈত প্রমুখ প্রধান পার্ষদগণ প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। সকলের চোখেই প্রেমাশ্রু বইছে, সকলেই স্তুতি করছেন, প্রভু প্রসন্নচিত্তে শুনছেন। হে জগৎপতি, তোমারই জয় হোক। ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ জীবগণের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত কর। সকলের জনক, সকলের মূল কারণ, সঙ্কীর্তনের আরম্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, তোমার জয় হোক। তুমি বেদ-ধর্ম-সাধুগণের ত্রাণকর্তা, ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে লতা পর্যন্ত সকলের মূল প্রাণ, গুণসিন্ধু পতিতপাবন, পরমেশ্বর দীনবন্ধু, তুমি ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতি জীবে অন্তর্যামী, ভক্তের আনন্দের জন্য আবির্ভূত, অচিন্ত্য অগম্য আদিতত্ত্ব, পরম কোমল শুদ্ধসত্ত্ব, ব্রাহ্মণকুলের উদ্ধারকর্তা, বেদধর্মাদির জীবন, পতিত অজামিলের উদ্ধারকর্তা, তুমি পুতনার দুষ্কৃতি মোচন করেছ, তুমি অদোষদর্শী রমাকান্ত, —এই সব বলে সকলে প্রভুর স্তুতি করছেন। প্রভুর পরম প্রকটরূপ প্রকাশিত দেখে সব ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। প্রভু যোগমায়ার সব ছলনা ত্যাগ করে অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে ভক্তগণকে চরণ

দান করলেন, তাঁরাও পূজা করলেন। কেউ প্রভুর চরণে দিব্য গন্ধ দ্রব্য লেপন করছেন, কেউ তুলসী ও পদ্ম একত্র করে পূজা করছেন। কেউ আবার রত্ন-সুবর্ণ-রজত-অলঙ্কার দিয়ে প্রভুর পাদপদ্মে নমস্কার করছেন। সকলেই পট্টসূত্র নির্মিত বস্ত্র, শাদা নীল হলুদ কাপড় ইত্যাদি প্রভুর পাদপদ্মে দিয়ে নমস্কার করছেন। অনেকে ধাতু নির্মিত নানাবিধ পাত্র প্রভুর পদপ্রান্তে এনে রেখে প্রণাম করছেন। যেই শ্রীচরণ পূজা করবার জন্য অজ-রমা-শিবাদি পর্যন্ত কামনা করেন, বৈষ্ণবের দাসদাসীগণও সেই চরণ পূজা করছেন। বৈষ্ণবের সেবা করলে এই ফল লাভ করা যায়। অভয় পেয়ে সকলে মিলে দুর্বা, ধান্য, তুলসী দিয়ে শ্রীচরণ পূজা করছেন। নানাবিধ ফল এনে দিচ্ছেন কেউ কেউ। কেউ আবার গন্ধ পুষ্প চন্দন এনে শ্রীচরণে দিচ্ছেন। কেউ পূজা করছেন ষোড়শোপচারে, কেউ ষড়ঙ্গ মতে, যার যেমন সাধ্য তিনি সেভাবেই পূজা করছেন। সকলে আনন্দে কস্তূরী, কুঙ্কুম কর্পূর ফাগ দিচ্ছেন শ্রীচরণে। শ্রীচরণের নখপংক্তি চম্পক, মল্লিকা, কুন্দ, কদম্ব, মালতী—নানা রকম ফুলে শোভা পাচ্ছে।

বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি পরম প্রকাশ ভাবে বললেন, কিছু দেও, খাব। ভক্তগণ দেখছেন, প্রভু হাত পাতলেন। যে যা দিচ্ছেন, প্রভু সবই খাচ্ছেন। কলা, মুগ, দধি, ক্ষীর, নবনী, দুগ্ধ—সমস্ত কিছু প্রভুর হাতে দিচ্ছেন ভক্তগণ। প্রভু আনন্দে সবই ভোজন করছেন। নগরে দৌড়ে গিয়ে সকলেই ভাল ভাল জিনিস কিনে আনতে লাগল। কেউ নারকেল ছাড়িয়ে শর্করা দিয়ে প্রভুর হাতে দিলেন। নানা রকমের সন্দেশ হাতে দিচ্ছেন কেউ, প্রভু খেয়ে নিচ্ছেন সবই। মেওয়া, ক্ষীর, কাঁকুড়, আখ, গঙ্গাজল, এসব এনে দিচ্ছেন সকলে। প্রভু দেখে আনন্দ পাচ্ছেন। কোন কোন ভক্ত পাঁচবার দশবার করেও দিচ্ছেন। শত শত লোকে জল দিচ্ছে, মহাযোগেশ্বর তা সবই পান করছেন। হাজার হাজার ভাণ্ড দধি, ক্ষীর, দুধ, হাজার হাজার কাঁদি কলা, ডাল, কত সন্দেশ, কত ফলমূল, হাজাব বাটা কর্পূর তাম্বুল দিচ্ছেন সবাই। গৌরচন্দ্র যে কি অপূর্ব শক্তিবলে এসব খেয়ে নিচ্ছেন তা ভক্তগণ কিছুই বুঝতে পারছেন না। ভক্তের দেওয়া দ্রব্যাদি প্রভু সবই সন্তুষ্ট হয়ে খেয়ে নিচ্ছেন।

তারপর তিনি সকলের জন্মকর্ম কাহিনী বলতে লাগলেন। শুনে তারাও সবই স্মরণ করতে পারছেন, আনন্দে আছাড় খেয়ে তখন কাঁদতে লাগলেন। প্রভু শ্রীবাসকে বললেন, তোমার কি মনে পড়ছে যে তুমি দেবানন্দের কাছে ভাগবত পাঠ শুনেছিলে? প্রেমরসে পূর্ণ ভাগবত কথা শুনে তোমার হৃদয় গলে গেল। তুমি উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলে, বিহ্বল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে। দেবানন্দের অজ্ঞ ছাত্র ভক্তিযোগের বিষয় জানে না, সে ভাবল—এতে কাঁদবার কি আছে? তুমি প্রেমানন্দে বাহ্যজ্ঞান-রহিত ছিলে, ছাত্রটি তোমাকে বাইরের দরজার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। দেবানন্দ বারণ করলেন না, গুরু শিষ্য উভয়েই ভক্তিযোগ বিষয়ে অনধিকারী ছিলেন। তোমাকে ঘর থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এল, তুমি দুঃখ পেয়ে চলে এসেছিলে। দুঃখ পেয়ে তুমি নির্জনে বসেছিলে এবং আর একবার ভাগবত আস্বাদন করতে চেয়েছিলে। তোমার দুঃখ দেখে আমি বৈকুণ্ঠ থেকে এসে তোমার দেহে আবির্ভূত হয়েছিলাম এবং আমিই তোমার হৃদয়ে বসে তোমাকে প্রেমযোগ দান করে কাঁদিয়েছিলাম। ভাগবত শুনে তোমার আনন্দ হয়েছিল এবং তোমার প্রেমাশ্রুতে সেখানকার মাটি পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। সমস্ত কথা শ্রীনিবাসের স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে গড়াগড়ি করে কাঁদতে লাগলেন। এই ভাবেই

অদ্বৈত প্রমুখ সকল বৈষ্ণবকে তাঁদের পূর্বকথা স্মৃতিপথে জাগ্রত করালেন। সব ভক্তবৃন্দই তখন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হলেন এবং প্রভু পান চিবোতে লাগলেন।

কোন ভক্ত নাচছেন, কেউ সঙ্কীর্তন করছেন, কেউ 'জয় জয় শ্রীশচীনন্দন' বলছিলেন। কদাচিৎ যদি কোন ভক্ত উপস্থিত না থাকেন তাহলে প্রভু তাঁকে খবর পাঠিয়ে নিয়ে আসছেন এবং তাঁদের কাছে হাত পেতে বলছেন, —কিছু দাও খাব। যে যা দিচ্ছেন তা আবার তিনি সবটাই খেয়ে নিচ্ছেন। খেয়েই প্রভু বলছেন, কি, তোমার মনে আছে তো? একদিন রাত্রে তোমার কাছে বসেছিলাম। ব্রাহ্মণের বেশ ধরে এসে তোমার জ্বর সারিয়ে দিয়েছিলাম। শুনেই সেই ভক্তটি বিহ্বল হয়ে প্রভুর পায়ে পড়লেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে দেখে প্রভু বললেন, একবার রাত্রিতে তুমি রাজভয়ে পালাচ্ছিলে, তোমার কি মনে আছে? পরিবারের সকলকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে দেখলে কোথাও নৌকা নেই, মহা বিপদে পড়লে। রাত শেষ হয়ে গেছে, নৌকা না পেয়ে দুঃখে কাঁদতে লাগলে। মনে মনে ভাবলে, যদি আমার সামনে পরিবারের লোকেরা যবনের হাতে অসম্মানিত হয় তাহলে নদীতে ডুবে মরব। তখন আমি মাঝি হয়ে খেয়া নৌকা নিয়ে নদীর ঘাটে তোমার কাছে এলাম। তুমি নৌকা দেখে খুব খুশি হয়ে বলেছিলে, ভাইটি, এবারের মত আমাকে রক্ষা কর। আমার ধন প্রাণ দেহ জাতি সবকিছুই তোমার। আমাকে সপরিবারে পার করে দাও। তোমাকে এক জোড়া কাপড় এবং নগদ একটি টাকা দেব। তখন তোমাকে সপরিবারে পার করে দিয়ে বৈকুণ্ঠে চলে গেলাম। এই কথা শুনে গঙ্গাদাস পণ্ডিত আনন্দসাগরে ভাসতে লাগলেন। প্রভু এই সব লীলা করে চলেছেন। বললেন, গঙ্গা পার হবার জন্যে তুমি আমাকে স্মরণ করেছিলে। আমি যে তোমাকে পার করেছিলাম তা কি এখন মনে পড়েছে? প্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে এই সকল কাহিনী বলছেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত শুনে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গড়াতে লাগলেন।

বৈকুণ্ঠ-অধীশ্বর বসে আছেন। মাল্যচন্দনে তাঁর দেহ ঢেকে রয়েছে। কোন প্রিয়তম শ্রীঅঙ্গে ব্যজন করছেন, অতি প্রিয়জন কেউ তাঁর কেশসংস্কার করে দিচ্ছেন। অতি প্রিয় ভক্ত পান এগিয়ে দিচ্ছেন, কেউ গাইছেন কেউ সামনে নাচছেন। এই ভাবে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। ভক্তবৃন্দ ধূপ দীপ নিয়ে শ্রীচরণ অর্চনা করতে লাগলেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ বাজাচ্ছেন ভক্তরা। তাতে প্রভুর আনন্দ হচ্ছে। ভক্তবৃন্দ যাই করছেন, প্রভু কিন্তু কিছুই বলছেন না। তিনি মহা খুশিতে বসে আছেন। সকলে তাঁর শ্রীচরণে নানাবিধ ফুল দিয়ে 'রক্ষা কর' বলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ছেন। কেউ কাকুতি-মিনতি করছেন, কেউ জয়ধ্বনি করছেন। চারদিকে কেবল আনন্দ-চীৎকারই শোনা যাচ্ছে। রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে এক অপূর্ব আনন্দ রাজ্যে প্রবেশ করলেন। যে আসছে সেই মনে করছে যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেছে। প্রভু মহা-ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দ তাঁর সামনে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভক্তের গায়ে হেলান দিয়ে পাদপদ্ম মেলে গৌরহরি সানন্দে লীলামগ্ন রয়েছেন। প্রভু এখন বর দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। প্রভু সাতপ্রহরিয়া-ভাবে সকলকেই আনন্দে কৃপা করছেন। তিনি আদেশ করলেন, তাড়াতাড়ি শ্রীধরকে নিয়ে এস। আমার আত্মপ্রকাশের বিধান সে এসে নিজের চোখে দেখুক একবার। সে দুঃখে জীবন কাটায় কিন্তু সর্বদা আমাকে স্মরণ করে। শুধু তাকেই নয়, নগরের সীমায় গিয়ে বসে থেকে দেখ, যে আমায় ডাকছে তাকেই ধরে নিয়ে এস। বৈষ্ণবগণ প্রভুর আদেশ পেয়ে শ্রীধরের বাসায় গেলেন।

সেই শ্রীধরের কাহিনী কিছু বলা হচ্ছে। খোলা বেচে তিনি জীবন-ধারণ করেন। একটি বড় থোড় কিনে এনে তাকে ছোট ছোট করে তিনি বেচেন। তাতে যা লাভ হয় তার অর্ধেক দিয়ে তিনি গঙ্গাপূজা করেন। বাকি অর্ধেক দিয়ে জীবনরক্ষা করেন। এই রকম দারিদ্র্য দিয়েই বিষ্ণুভক্তের পরীক্ষা হয়ে থাকে। তিনি যুধিষ্ঠিরের মতই সত্যসন্ধ। তাঁর জিনিসে দরাদরি চলেনা , তিনি এক দামে বিক্রি করেন। যাঁরা তাঁকে চেনেন তাঁরা তাঁর কাছ থেকে এক দামেই থোড়-মোচা কেনেন। নবদ্বীপের লোকেরা তাঁর আসল পরিচয় জানেন না। তাঁকে 'খোলাবেচা-শ্রীধর' নামেই সকলে চেনে। সারা রাত্র তিনি উচ্চ কৃষ্ণনামে কাটিয়ে দেন, ঘুমোন না। পাষণ্ডীরা বলে, শ্রীধরের চীৎকারে রাতে ঘুমোতে পারবে কার বাপের সাধ্যি, কান যেন ফেটে যায়। চাষাড়ে ব্যাটার তো পেটে ভাত জোটে না, তাই খিদে্র জ্বালায় অস্থির হয়ে জেগে জেগে রাত কাটায়। পাষণ্ডীরা এই ভাবে গালাগালি দিয়ে মরে, শ্রীধর নির্বিকার চিত্তে তাঁর আপন কর্তব্য করে যাচ্ছেন। শ্রীধর তো হরিনাম কীর্তন করেই চলেছেন। রাত্রে ভক্তিযোগে গলা একটু বেড়ে যায়।পথের অর্ধেকটা গিয়েই ভক্তগণ শ্রীধরের গলা শুনতে পেলেন। আওয়াজ অনুসারে এগিয়ে গিয়ে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে ভক্তগণ শ্রীধরকে ধরে ফেললেন। তাঁরা বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে চল, প্রভুকে দেখবে গিয়ে চল। আমরা তোমাকে স্পর্শ করে কৃতার্থ মনে করছি। শ্রীধর প্রভুব নাম শুনে আনন্দে বিহ্বল হযে মাটিতে পড়ে গেলেন, ভক্তগণ আস্তে আস্তে শ্রীধরকে মাটি থেকে সাবধানে তুলে বিশ্বম্ভরের সামনে নিয়ে এলেন। প্রভু শ্রীধরকে দেখেই আনন্দে বলে উঠলেন, এস, এস। তুমি আমার বিস্তর আরাধনা করেছ, আমাব প্রেমে তুমি বহু জন্ম জীবনপাত করেছ। এজন্মেও তুমি আমাব সেবা কম কিছু কর নি। তোমার খোলাতেই আমি সর্বদা ভাত খেতাম। তোমার হাতের অনেক জিনিসই খেয়েছি। আমার কথায় কি সব উত্তর করতে তা কি তুমি ভুলে গেলে ?

যখন প্রভূ বিদ্যাবিলাস করতেন তখন প্রভুর পরম উদ্ধত প্রকাশ ছিল। সেই সময গূঢ়-রূপে শ্রীধবের সঙ্গে খোলা-কেনা-বেচা-ছলে নানা বকম রঙ্গ-তামাশা হযেছে। রোজই প্রভু শ্রীধরের দোকানে গিয়ে থোড় কলা মূলা এইসব কিনে আনতেন। রোজই প্রভু শ্রীধরের সঙ্গে বেশ কিছু সময় ঝগড়া করে অর্ধেক দাম দিযে তাঁব জিনিসপত্র নিযে নিতেন। শ্রীধব এক-কথাব লোক। যা দাম তাই বলতেন। প্রভু অর্ধেক দামে নিজহাতে তুলে নিযে আসতেন। শ্রীধর কিছুতেই দিতে চাইতেন না। তাতে খুব কাড়াকাড়ি হত দুজনের মধ্যে। প্রভু বলতেন, তুমি সাধুব ভাবে থাকলে কি হবে, তোমার অনেক টাকাকড়ি আছে। অথচ তুমি আমাব হাত থেকে জিনিস কেড়ে নিচ্ছ। তুমি এত দিনেও জানতে পারলে না যে আমি কে। শ্রীধরের দেবদ্বিজে খুব ভক্তি। তাই তিনি রাগ করেন না। মুখের দিকে তাকিয়ে কেবল জিনিসগুলো কেড়ে নেন। গৌরাঙ্গসুন্দবের মদনমোহন রূপ। ললাটে উর্ধ্ব তিলক, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, তেকাছা দেওয়া ধুতি পরা, স্বভাবতই চোখ দুটি খুব চঞ্চল। শাদা পৈতে রয়েছে শরীর ঘিরে যেন অনন্তনাগই সূক্ষ্মরূপে রয়েছেন। প্রভুর মুখে পান, তিনি শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আবার খোলা তুলে নিচ্ছেন নিজের হাতে। শ্রীধর বলছেন, ব্রাহ্মণঠাকুর, আমি তোমার পোষা কুকুরের মত। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। প্রভু বলছেন, আমি জানি। তুমি খুবই চালাক লোক। তোমার খোলাবেচা পয়সা প্রচুর আছে। শ্রীধর বলছেন আর কি দোকান দেখতে পাও না ? অন্য দোকানে যাও, গিয়ে কম দামে খোল পাতা কিনে নাও। প্রভু বলছেন, আমি রোজ এক দোকান

থেকেই জিনিসপত্র কিনি। তাকে ছেড়ে যাই না। অথচ তুমি আমার কাছ থেকে থোড় কলা কেড়ে নাও। শ্রীধর প্রভুর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে আছেন। বিশ্বম্ভর তাঁকে মহানন্দে গালাগালি করে যাচ্ছেন, তুমি তো রোজই জিনিসপত্র কিনে নিয়ে গঙ্গাপূজা কর, আমাকে দামে কিছু সস্তা করে দিলে তোমার এমন কি ক্ষতি হয়? তুমি তো গঙ্গাপূজা করছ, আমি সেই গঙ্গার পিতা। তোমাকে আমি সত্যি করেই বলছি। বিশ্বম্ভরের এই কথা শুনে শ্রীধর 'হরি হরি' বলে ওঠেন। বিশ্বম্ভরের উদ্ধত ভাব দেখে তাঁকে খোলা, পাতা দিয়ে দেন। রোজই এই রকম ঝগড়া হচ্ছে। শ্রীধরের মনে হয়, এই ব্রাহ্মণ বড়ই চঞ্চল। তিনি তাই বলেন, আমি তোমার কাছে হার মেনেছি। পয়সা-কড়ি ছাড়াই কিছু দেব। আমাকে ক্ষমা কর। আমি এক খণ্ড করে খোলা, থোড়, মূলা সবই দেব, তবু আমার দোষ? তখন প্রভু তাঁকে বললেন, না, আর কোন দোষ নেই। শ্রীধরের খোলেই প্রভু রোজ ভাত খান। এইভাবে প্রভু ভক্তের দ্রব্য গ্রহণ করেন। অভক্তের প্রচুর থাকলেও তার দিকে ফিরেও তাকান না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই লীলা করবেন বলেই শ্রীধর খোলা বিক্রি করছেন। ভক্ত আর ভগবানের লীলা কে বুঝতে পারে? প্রভু না জানালে কি করে জানতে পারবেন তাই তিনি সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। প্রভু তাই বললেন, শ্রীধর, মাথা তুলে আমার রূপ দর্শন কর। আজ তোমাকে আমি অষ্টসিদ্ধি দান করব। প্রভুর কথা শুনে শ্রীধর মাথা তুলে তাকাল শ্যামল রূপ শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন বিশ্বম্ভরের মধ্যে। তাঁর হাতে মোহন বাঁশী। ডান পাশে বলরাম। দুজনেই মহা জ্যোতির্ময়। কমলা শ্রীহস্তে তাম্বুল দিচ্ছেন। ব্রহ্মা, শিব তাঁদের সামনে স্তুতি করছেন। অনন্তনাগ মহা ফনা বিস্তার করে শিরে ছত্র ধরে আছেন। হাত জোড় করে সনক, নারদ, শুকদেব দেখছেন। পরমা সুন্দরী দেবীগণ চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে স্তুতি করছেন। এই সব দেখেই শ্রীধর মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন প্রভু আজ্ঞা করলেন, শ্রীধর, ওঠ, ওঠ। প্রভুর কথায় শ্রীধর বললেন, প্রভু, আমি অতি নির্বোধ। আমার মত অধম তোমার কি স্তুতি জানে? আমি কি করে তোমার স্তুতি করব? প্রভু বললেন, আমার বিষয়ে তুমি যা বলবে তাই স্তুতি।

প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী জিহ্বায় প্রবেশ করলে শ্রীধর স্তুতি আরম্ভ করলেন, —অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডনাথ, নবদ্বীপ-পুরন্দর পুণ্যমতী-শচী-গর্ভজাত, মহা-বেদ-গোপ্য বিপ্ররাজ, মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরের জয় হোক। তুমি যুগে যুগে নানা কাজ করে ধর্ম পালন কর, আত্মস্বরূপ গোপন করে লোকসমাজে বেড়াও, তুমি নিজে না জানালে তোমাকে কেউ জানতে পারে না। ধর্ম-কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি, শাস্ত্র-বেদ-সর্বধ্যান, ঋদ্ধি-সিদ্ধি-যোগ-ভোগ, শ্রদ্ধা-দয়া-মোহ-লোভ,-সবই তুমি। ইন্দ্র-চন্দ্র-অগ্নি-জল, সর্ব-বায়ু-ধন-বল সবই তুমি। তুমিই ভক্তি, মুক্তি। অজ, ভব, এ সব তুমিই। আর তুমিই বা এসব হতে যাবে কেন? এসব তোমার বিভূতি মাত্র। তুমি আগে আমাকে বলছিলে, তুমি যে গঙ্গা পূজা করছ সেই গঙ্গা আমারই চরণসলিল, তথাপি আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারি নি। আমি পাপে পূর্ণ, তোমার শ্রীচরণকে আমি চিনতে পারি নি। তুমি এক কালে গোকুল-নগরকে ধন্য করেছ, এবারে করলে নবদ্বীপকে, তুমি তোমার দেহের মধ্যে প্রেমভক্তিকে গোপন করে বেড়াও, এখন নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করেছ। ভীষ্ম ভক্তিযোগের দ্বারা তোমাকে যুদ্ধে জয় করেছেন, তুমি প্রতিজ্ঞা করেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে। মাতা-যশোদাও ভক্তিযোগের সাহায্যেই তোমাকে বাঁধতে

পেরেছিলেন। ভক্তির সাহায্যেই সত্যভামা তোমাকে নারদের নিকট বিক্রি করেছিলেন। ভক্তির কারণেই ব্রজগোপীকে তুমি রাসরজনীতে কাঁধে নিয়েছিলে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-বাসী জীবগণ তোমাকে হৃদয়ে বহন করে, আর সেই তুমি গোপবালক শ্রীদামকে কাঁধে নিয়ে বয়ে বেড়িয়েছিলে। নিজে কি ভাবে পরাজিত হবে—সেই কথা কেউ কারো কাছে বলে না। ভক্তির কারণে ভক্তবৃন্দের কাছে পরাজিত হয়ে এখন তুমি ভক্তি লুকিয়ে নিজে জয়ী হয়ে বেড়াচ্ছ। তোমার সেই মায়ার খেলা এখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। ঐ দেখ সারা পৃথিবী তোমার কাছে ভক্তি প্রার্থনা করছে। সে-সময় তোমাকে দু-চার জন হারিয়েছে, এই কলিযুগে তোমাকে সকলেই প্রেমভক্তিরজ্জুতে বেঁধে রাখবে।

শ্রীধরের মুখে এই অপূর্ব শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব-কথা শুনে বৈষ্ণববৃন্দ বিস্মিত হলেন। প্রভু বললেন, শ্রীধর, তুমি ইচ্ছা মত বর প্রার্থনা কর। আজ আমি তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দান করব। শ্রীধর বললেন, প্রভু, তুমি ভেবেছ আমাকে আরো ঠকাবে। আর পারবে না, তোমাকে বলে দিলাম। প্রভু বললেন—আমার দর্শন ব্যর্থ হয় না। যা ইচ্ছা হয় তাই চাও, অবশ্যই পাবে। চেয়ে নাও, চেয়ে নাও। শ্রীধর বললেন, প্রভু, আমাকে এই বর দাও, যে-ব্রাহ্মণ আমার খোল পাতা কেড়ে নিতেন, আমার সঙ্গে রোজ ঝগড়া করতেন, তিনি যেন জন্মে জন্মে আমার প্রভু হন। তাঁর চরণযুগলই যেন আমি সর্বদা ধ্যান করি। বলতে বলতে শ্রীধর প্রেমোন্মত্ত হযে দু বাহু তুলে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন। শ্রীধরের ভক্তিভাব দেখে উপস্থিত বৈষ্ণবগণও সকলেই বিহ্বল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। বিশ্বম্ভর হেসে বললেন, —শ্রীধর, খুব বড় একটি দেশের রাজত্ব দিযে তোমাকে রাজা করে দেব। শুনে শ্রীধর বললেন,—প্রভু, এমন ব্যবস্থা করে দাও যাতে সর্বদা তোমার নাম-গান করতে পারি, আর কিছুই চাই না। প্রভু তার উত্তরে বললেন, শ্রীধর, তুমি আমার দাস, আমার পরম ভক্ত। তাই তুমি আমার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতে পারলে। তাই কিছুতেই তোমার মতিভ্রম হল না। বেদেও যে ভক্তিযোগের কথা অতি গুপ্ত ভাবে কথিত আছে আমি সেই প্রেমভক্তিযোগ তোমাকে দান করলাম।

তখন বৈষ্ণবমণ্ডলে মহা জয়ধ্বনি উচ্চারিত হল। সকলেই জানলেন যে শ্রীধর বর লাভ করেছেন। ধনবল নেই, জনবল নেই, পাণ্ডিত্যও কিছুমাত্র নেই, এসব চৈতন্যভক্তকে কেউই চেনেও না। বিদ্যা, ধন, রূপ, বেশ ও কুলে কি করে? শুধুমাত্র অহঙ্কার বাড়ায়, এবং তাতেই মানুষের পতন ঘটে। কলা মূলা বিক্রি করে শ্রীধর জীবনে যা লাভ করলেন, কোন কালে কোন কোটিপতি ধনাঢ্যও তা পায় নি। বিষয়ী লোকের অহংকার এবং পরপীড়ন আছেই এবং তার ফলেই তাদের পতন হয় কিন্তু তারা এসব কথা কিছুতেই বুঝতে পারে না। মূর্খ দরিদ্রকে দেখে যে সব ভব্যলোকেরা উপহাস করে তারা নিজকর্মদোষেই নরকে যায়। বৈষ্ণবকে, ভক্তকে কেউ চিনতে পারে না। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় তাঁরা মূর্খ, দরিদ্র। অথচ তাঁদের কোন অভাব-বোধ নেই, ভক্তির আনন্দেই তাঁদের চিত্ত পরিপূর্ণ।

খোলাবেচা শ্রীধরই তার সাক্ষী। অষ্টসিদ্ধি উপেক্ষা করে তিনি ভক্তি চেয়ে নিলেন। বাইরে থেকে বৈষ্ণবকে দেখে দুঃখে আছেন মনে হলেও, তিনি মানসিক ভাবে কিন্তু মহানন্দে রয়েছেন। বিষয়ী লোকেরা বিদ্যা এবং ধনের অহঙ্কারে তাঁদের চিনতে পারে না, এর মর্মও কিছুই জানে না। ভাগবত পাঠ করেও বুদ্ধি ঠিক হয় না, নিত্যানন্দপ্রভুকেই হয়তো নিন্দা করে, তাই তাদের পতন হবেই। শ্রীধর স্তব করে যে বর পেয়েছেন,

সে কাহিনী শুনলেও প্রেমভক্তি লাভ করা যায়। যে লোক বৈষ্ণব-নিন্দা করে না, সেই শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি লাভ করে এবং কৃষ্ণকে পায়। নিন্দা করে কিছুই লাভ করা যায় না, শুধুই পাপ বাড়ে, তাই কখনো নিন্দা করা উচিত নয়। যে কারো নিন্দা করে না, আনন্দে এক-মনে কৃষ্ণ নাম নেয়, তাকে সত্যই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার করে থাকেন। বৈষ্ণবচরণে এই মাত্র প্রার্থনা, শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে যেন প্রাণের প্রাণ বলে পাওয়া যায়। এই ভাবেই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এবং নিত্যানন্দের শ্রীচরণে কীর্তন মাধ্যমে প্রার্থনা নিবেদন করছেন।

২/১০ প্রভু শ্রীধরকে বর দিয়ে 'নাঢ়া নাঢ়া' বলে আচার্য অদ্বৈতকে ডেকে বললেন, তোমার প্রয়োজন মত প্রার্থনা জানাও, বর চেয়ে নাও। অদ্বৈতাচার্য বললেন, আমি যা চেয়েছিলাম তাতো পেয়েছিই। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন এমন হুঙ্কার করতে লাগলেন যে আর কেউ কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। প্রভু বিশ্বম্ভরের মহাপ্রকাশ হয়েছে। গদাধর পান সেজে দিচ্ছেন, প্রভু আনন্দে খাচ্ছেন। অনন্তদেব নিত্যানন্দপ্রভু মাথায় ছাতা ধরে আছেন। সামনে অদ্বৈত প্রমুখ পরম-ভাগবতগণ রয়েছেন। প্রভু মুরারিকে আদেশ করলেন, আমার রূপ দর্শন কর। মুরারি শ্রীরাম বিগ্রহকে প্রতক্ষ্য করলেন। মুরারি গুপ্ত সেই বিশ্বম্ভরকেই রামচন্দ্ররূপে দেখলেন। খুব বড় একটি ধনু নিয়ে তিনি বীরাসনে বসে আছেন। বাম পাশে জানকী এবং ডান দিকে লক্ষ্মণকেও দেখলেন। চার দিকে প্রধান প্রধান বানরগণ দাঁড়িয়ে প্রভুকে স্তুতি করছেন। মুরারি গুপ্ত ছিলেন বামভক্ত-হনুমান, তাই তিনি নিজের স্বরূপ দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। চৈতন্যের ফাঁদ মুরারি গুপ্তকে বেঁধে রাখল। বিশ্বম্ভর তখন ডেকে বললেন, ওহে হনুমান, তোমাকে যে সীতাহরণকারী রাবণ পুড়িয়ে ছেড়েছিল তা কি তুমি ভুলে গেছ ? তুমি তার লঙ্কাপুরী পুড়িয়ে ছারখার করে তাকে নির্বংশ করেছিলে। তোমার সেই প্রভু আমিই তোমাকে এখন পরিচয় দিলাম। তুমি আমার বড় ভক্ত। তুমি উঠে দেখ, আমি সেই রামচন্দ্র এবং তুমিই হনুমান। তুমি গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে যার জীবনরক্ষা করেছিলে সেই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে দেখ। জানকীর দুঃখ দেখে তুমি প্রচুর কেঁদেছিলে, এখন তাঁকেও প্রণাম কর। শ্রীচৈতন্যের কথা শুনে মুরারি গুপ্তের চেতনা হল। সব দেখে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে কাষ্ঠও গলে যায়, ভক্তগণ তো আকুল হবেনই, এ আর এমন বিশেষ কি। বিশ্বম্ভর, মুরারিকে আবার বললেন, তোমার ইচ্ছামত বর চেয়ে নাও। মুরারি উত্তর করলেন, প্রভু, আর কিছু চাই নে, শুধু এই বর দাও যেন তোমার গুণগানে জীবন কাটাতে পারি। জন্ম-জন্মান্তরে যেখানেই জন্মাই না কেন, যেন তোমাকে স্মরণে থাকে। চিরজন্ম যেন তোমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গ লাভ করতে পারি। যেখানে আমি তোমার ভক্ত হয়ে থাকতে পারব না, আমাকে সেখানে পাঠাবে না। তুমি যেখানে যেখানে পার্ষদগণকে নিয়ে অবতার গ্রহণ করবে আমি সেখানেই তোমার ভক্ত হয়ে থাকতে চাই। প্রভু বললেন, তাই সত্য হবে, এই বর দিলাম। তখন চারদিকে মহা জয়ধ্বনি হতে লাগল। মুরারির প্রতি সকল বৈষ্ণবগণই অত্যন্ত খুশি। জীবমাত্রের প্রতিই দয়া হচ্ছে মুরারি গুপ্তের স্বভাব। মুরারি যেখানে যান সেস্থানই বৈকুণ্ঠের মত তীর্থস্থান হয়ে যায়। মুরারির প্রভাব বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, কারণ তিনি হচ্ছেন প্রভুর নিত্যপার্ষদ। চৈতন্যদেব বলছেন, সব ভক্তগণ, মন দিয়ে শোন। মুরারির নিন্দা করলে কোটি গঙ্গাস্নানেও তার নিস্তার নেই। গঙ্গাস্নান এবং হরিনামও তাকে রক্ষা করতে পারবে

না। মুরারি গুপ্ত নাম সার্থক। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ মুরারির সৌভাগ্য লক্ষ্য করে প্রেমভক্তি নিয়ে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে কাঁদতে লাগলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুরারিকে কৃপা করলেন, এই কাহিনী যে শোনে সেই প্রেমভক্তি লাভ করে। মুরারি এবং শ্রীধর সামনে পড়ে কাঁদছেন। প্রভু পান চিবোচ্ছেন কিন্তু মাঝেমাঝেই গর্জন করেও উঠছেন।

প্রভু হরিদাসের প্রতি সদয় হয়ে তাঁকে ডেকে বললেন, হরিদাস, তুমি আমার দিকে একবার তাকাও, আমার এই দেহের চেয়ে তুমি আমার কাছে বেশি প্রিয়। তুমি যে জাতিই হও তাই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ। পাপিষ্ঠ যবনেরা তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছে, সে কথা মনে পড়লেই দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। হরিদাস, তোমাকে যখন যবনেরা নগরে নগরে মেরে চলেছে, আমি তখন বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে সুদর্শন চক্র নিয়ে আসছিলাম: কিন্তু তোমাকে যারা প্রহার করেছে তুমিই তাদের কুশল কামনা করছ, নিজে মার খেয়েও তাদের কোনই দোষ দেখছ না, তখনও তুমি তাদের কল্যাণ কামনা করেই চলেছ, তুমি যাদের মঙ্গল কামনা করছ, আমি তাদের কি করব? তোমার কারণেই আমি সুদর্শন চক্র তুলেও আবার ফিরিয়ে নিলাম। তোমার সঙ্কল্পের জন্যই আমি তাদের বধ করলাম না। তোমার প্রহার দেখে আমি তোমার পিঠে পড়ে প্রহার স্বীকার করলাম। মিথ্যে বলছিনা, এখনো তার দাগ রয়েছে। তখনও আমার অবতীর্ণ হবার দেরি ছিল, তোমার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে হল। অদ্বৈতাচার্য তোমাকে সঠিক চেনেন। তিনিই আমাকে সব রকমে আটকে রেখেছেন।

প্রভু ভক্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভক্তের কারণে কিছু বলতে বা কিছু করতে তাঁর বাধে না। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তছাড়া আর কিছু জানেন না, অনন্ত-ভুবনে ভক্তের সমান আর কেউ নয় তাঁর কাছে। এমন কৃষ্ণভক্তকে যারা ভক্তি করে না, দৈব-নির্দেশেই তাদের পাপ হয়। হরিদাসের প্রতি প্রভু যা বললেন তাতেই ভক্তের মহিমা চাক্ষুষ দেখান হল। প্রভুর মুখের এই সদয় বাক্য শুনে হরিদাস মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁর বিন্দুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নেই, একটু শ্বাসও পর্যন্ত নেই. তিনি আনন্দে মগ্ন হয়ে আছেন। প্রভু বললেন, হরিদাস, ওঠ। উঠে আমার প্রকাশ দর্শন কর। প্রভুর কথা শুনে হরিদাস বাহ্যজ্ঞান লাভ করলেন। তিনি রূপ দর্শন করবেন কি, কেঁদেই আকুল। সারা উঠোন গড়াগড়ি করছেন, কখনো দীর্ঘশ্বাস বইছে কখনো মূর্ছা পাচ্ছে। হরিদাসের শরীরে আবেশ হল, শ্রীচৈতন্য তাঁকে স্থির করাতে থাকেন কিন্তু তিনি কিছুতেই স্থির হতে পারছেন না। হরিদাস বলছেন, প্রভু, তুমি জগতের নাথ, তুমি পাতকীকে কৃপা কর, তোমার চরণে পড়ি। আমার কোনই সদ্‌গুণ নেই, সমস্ত হিন্দু জাতির বহির্ভূত, আমি দয়ার কথা আর কি বলব? আমাকে দেখলেও লোকের পাপ হয়, ছুঁলে চান করতে হয়। আমি কি করে তোমার গুণকীর্তন করব? তুমি নিজমুখে বলেছ, যে তোমার চরণ স্মরণ করে সে কীটতুল্য হলেও তুমি তাকে ত্যাগ কর না, তোমার ভক্ত না হলে তুমি রাজাকেও নিপাত কর। আমি কখনো তোমার চরণ স্মরণ করি নি, আমার তো সেই পুণ্যের জোরও নেই, যিনি তোমার চরণ স্মরণ করেন তিনি সর্ববিষয়ে দীনদরিদ্র হলেও তুমি তাঁকে রক্ষা কর। দ্রৌপদীকে বিবসন করবার জন্য দুঃশাসন সভার মধ্যে নিয়ে এসেছিল, কৃষ্ণা বিপদে পড়ে তোমাকে স্মরণ করেছিলেন তুমি তাই তাঁর শাড়িতে প্রবেশ করে তাঁকে লজ্জা থেকে রক্ষা করেছিলে। স্মরণ-মননের প্রভাবে অফুরন্ত বস্ত্র হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তথাপি সেই পাষণ্ডরা কিছুতেই তোমাকে চিনতে পারল না। একদা পার্বতীকে ঘিরে ডাকিনীরা খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল

কিন্তু পার্বতী তোমাকে স্মরণ করায় তুমি সেখানে উপস্থিত হয়ে বৈষ্ণবীকে রক্ষা করে ডাকিনীদের শাস্তিবিধান করেছিলে। আমি স্মরণবিহীন পাপিষ্ঠ, আমাকে বাপু, তোমার চরণে আশ্রয় দাও। দুষ্ট হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ধরে পাথর বেঁধে জলে ফেলেছিল, বিষ খাইয়েছিল, সাপের মুখে দিয়েছিল, আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। প্রহ্লাদ তোমার শ্রীচরণ স্মরণ করেছিলেন, স্মরণপ্রভাবেই তাঁকে তুমি মুক্ত করেছিলে। ভগবৎ-স্মরণের মহিমার ফলে নৃসিংহদেব রূপে তুমি আত্মপ্রকাশ করেছিলে। বনবাসের মধ্যে একদিন পাণ্ডবগণও তোমাকে স্মরণ করেছিলেন। তুমি সদয় হয়ে অরণ্যের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হয়েছিলে। বলেছিলে, যুধিষ্ঠির, তোমার কোন চিন্তা নেই। আমিই মুনির ভিক্ষার ব্যবস্থা করব। তুমি শুধু বসে দেখ। খাওয়ার পরে হাঁড়িতে একটি শাকের কণা মাত্র ছিল, তুমি তোমার ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য খুশি মনে সেই শাকের কণাটি খেয়ে নিলে। স্নানের সময়েই ঋষিদের পেটভরা মনে হল। খাবার জন্য আর কোন আগ্রহই নেই। তাই ঋষিরা সেখান থেকেই পালিয়ে গেলেন। স্মরণ প্রভাবে পাণ্ডবগণ রক্ষা পেয়ে গেলেন, এসব কেবল মাত্র ভগবৎ স্মরণের মহিমা। এঁরা নিরবচ্ছিন্নভাবে তোমার স্মরণ করতেন, তাই এদের উদ্ধার বিচিত্র নয়। অজামিল যে তোমাকে স্মরণ করেছিল তার মহিমা বলে শেষ করা যাবে না। অজামিলের কোন রকমের ধর্মবোধই ছিল না। যমদূতের ভয়ে সে পুত্রকে নাম ধরে, 'নারায়ণ' বলে ডেকেছিল। পুত্ররূপে নারায়ণকে ডাকার ফলেই সে সব পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। ভগবানের স্মরণের ফলে ভক্ত যে অপূর্ব সম্পদ লাভ করবেন তাতে আশ্চর্য কি? যাঁরা তোমার চরণ স্মরণ করেন, এমন কি তোমার নামাভাসেরও স্মরণ করেন, তাঁদের তুমি রক্ষা কর। আমি তাও করিনি কিন্তু প্রভু, তুমি আমাকে ছাড়বে না, এই প্রার্থনা করি। তোমার চরণে আমাকে স্থান দেবে। তোমার দর্শন পাবার অধিকার আমার নেই। তাই তোমার কাছে মাত্র একটি প্রার্থনাই জানাব। প্রভু বললেন, সবই তোমার। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। হরিদাস তখন করজোড় করে বললেন, আমি বড় দুর্ভাগা, তবু আমার আশা বড় বেশি। তোমার ভক্তদের প্রসাদ যেন আমি পাই। জন্মে জন্মে যেন আমি এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হই। আমার পাপ-জন্ম, আমি তোমাকে কখনো স্মরণ করি নি। তোমার দাসের উচ্ছিষ্ট দিয়ে আমার জীবন সার্থক কর। বৈষ্ণবের প্রসাদ পাওয়া মহা ভাগ্যের কথা, আমি বেঁচে থেকেও মৃতের মত, আমার সব অপরাধ তুমি ক্ষমা করে নাও। প্রভু-শচীনন্দন, কৃপা করে আমাকে তোমার কোন ভক্তের বাড়িতে কুকুর করে রেখে দিও। হরিদাস ঠাকুর প্রেমভক্তিময় হয়ে গেলেন, পুনঃ পুনঃ মিনতি করেও তাঁর আশা মিটছে না।

প্রভু বললেন,—হরিদাস, তুমি মন দিয়ে আমার কথা শোন। যে লোক কেবলমাত্র একদিনের জন্যও তোমার সঙ্গ লাভ করেছে কিংবা যার সঙ্গে তুমি একবার কথা বলেছ সে অবশ্যই আমাকে লাভ করতে পারবে। এতে আর কোন সন্দেহের কারণ নেই। তোমাকে যে শ্রদ্ধা করে সে আমাকেও শ্রদ্ধা করে। আমি সর্বদা তোমার মধ্যে রয়েছি। তোমার মত সেবকের কাছেই আমি 'ঠাকুর'। তুমি আমাকে তোমার হৃদয়ে বেঁধে রেখেছ জানবে। আমার কাছে অথবা আমার কোন ভক্তের কাছে তোমার কিছু অপরাধ নেই। তাই আমি তোমাকে প্রেমভক্তি দান করলাম। হরিদাসকে প্রভু বর দান করলেন, অমনি চারদিকে জয়ধ্বনি পড়ে গেল। জাতি, কুল, ক্রিয়া, অর্থ-সম্পত্তিতে কিছু করতে পারে না। আর্তি, উৎকণ্ঠা না থাকলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। যে কোন কুলে জন্মাক না

কেন, ভক্ত হলেই সে সর্বোত্তম, সকল শাস্ত্র এই কথাই বলে। তার প্রমাণ, ব্রহ্মাদিও ভগবানের যে-রূপ দর্শন করতে পান না, হরিদাস তাই দেখতে পেলেন। যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বিচার করে সে জন্মজন্ম নীচ পরিবেশে আসে। শ্রীহরিদাসের স্তুতি এবং বরপ্রাপ্তির কথা যে শুনবে সে অবশ্যই কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করবে। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলছেন যে একথা কেবল তাঁরই নয়, সব শাস্ত্রেই রয়েছে যে ভক্তকথা শুনলে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মে। মহাভক্ত হরিদাসের জয় হোক, কেবলমাত্র হরিদাসকে স্মরণ করলেও পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। কেউ বলেন,—ব্রহ্মাই হরিদাস। কেউ বলেন,—হরিদাস প্রহ্লাদেরই একটি প্রকাশ। হরিদাস-যে মহাভাগবত এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। তিনি সর্বদা শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তদের সঙ্গেই ছিলেন। ব্রহ্মা শিব আদি দেবতারা পর্যন্ত হরিদাসের মত ভক্তের সঙ্গলাভ করতে সর্বদা উন্মুখ। দেবতারাও হরিদাসকে স্পর্শ করতে চান, গঙ্গাদেবীও চান হরিদাস যেন তাঁর গঙ্গাজলে ডুব দিয়ে চান করেন। স্পর্শ করতেও হয় না, হরিদাসকে দেখলেই সমস্ত জীবের চিরজন্মের সব পাপ মোচন হয়ে যায়। প্রহ্লাদ যেমন দৈত্যকুলে জন্মেছেন, হনুমান জাতিতে বানর, তেমনি হরিদাসও নামেই নীচ জাতি, আসলে মহা মহা ভক্ত, শ্রীভগবানের অতি প্রিয়পাত্র। হরিদাস, মুরারি, শ্রীধর কাঁদছেন কিন্তু প্রভু হেসে হেসে পান চিবোচ্ছেন। বিষ্ণু-সিংহাসনে তিনি মহাজ্যোতির্ময় হয়ে বসে আছেন। মহাজ্যোতি নিত্যানন্দ তাঁর মাথার উপরে ছাতা ধরে রয়েছেন।

মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যের দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর মনের গোপন কথা হেসে হেসে প্রকাশ করে বলছেন,—তোমাকে যে আমি এক রাত্রে ভোজন করিয়েছিলাম তা কি তোমার মনে পড়ে? আমাকে অবতার করে আনবার জন্য তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ। গীতাপাঠ করে তুমি ভক্তিব্যাখ্যা কর, তোমার কথা কেউ ধরতে পারে না। যে শ্লোকের ভক্তিব্যাখ্যা পাওয়া যায় না তার দোষ না দিয়ে বরং তুমি অনাহারে থাকতে চাও। মনের দুঃখে শুয়ে থাক, আমি তখন তোমাকে দেখা দিই। তোমার উপবাসকে আমি নিজের উপবাস বলে মনে করি। তুমি নিবেদন করলে তবেই আমি ভোজন করি। তোমার বিন্দুমাত্র দুঃখ আমি সহ্য করতে পারি না। আমি স্বপ্নে তোমার সঙ্গে কথা বলি। আমি তখন তোমাকে তুলে নিয়ে শ্লোকের ভক্তি-অর্থ বলে দিই। আর বলি যে,—উঠে ভোজন কর, উপোস করো না। তোমার জন্যে আমি অবতীর্ণ হব। তখন তুমি খুশি হয়ে উঠে ভোজন করলে। আমার কথাগুলোকে তুমি স্বপ্ন বলেই ভেবেছিলে। এইভাবে দ্বিধা দেখলেই শ্রীচৈতন্য নিজে এসে বলে দিতেন। যত রাত্রিতে যত ঘটনা ঘটেছে, কি কি শ্লোক নিয়ে এসব কথা হয়েছিল প্রভু তা সবই একে একে বলতে লাগলেন। চারদিকে অদ্বৈতাচার্যের নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। তাঁর অসীম ভক্তির কথা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রভু বললেন,—সবই তোমাকে বলেছি, একটা কথা তখন বলিনি, আজ বলছি। সম্প্রদায়ের খাতিরে অনেকেই ভুল পড়ে থাকে। বলে,—'সর্বতঃপানিপাদন্তৎ'। কিন্তু সত্য পাঠ হচ্ছে,—'সর্বত্র পাণিপাদন্তৎ'। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শ্লোকটি হচ্ছে :

সর্বতঃপাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

অর্থাৎ পরতত্ত্ববস্তু ব্রহ্মের সর্বত্রই কর ও চরণ. সর্বত্রই চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্বত্রই কর্ণ। সর্বলোকে তিনি সমস্ত বস্তুকে আবরণ করে অবস্থান করছেন।

আমি তোমাকে অতি-গুপ্ত-পাঠ বললাম, সকলকে তো এ সব বলাও যায় না।

—অদ্বৈতাচার্য হচ্ছেন শ্রীচৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য, তাই তাঁকে তিনি সব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। ব্যাখ্যা শুনে আচার্য মহা প্রেমানন্দে আত্মহারা হয়ে কাঁদতে লাগলেন। অদ্বৈত বললেন,—আমার আর কিছু বলার নেই। আমার মহত্ব এই টুকুই যে তুমি আমার প্রভু। অদ্বৈতাচার্য প্রভুর প্রকাশ দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। এসব কথা বিশ্বাস না করলে পাপ হবে। প্রকৃত ভক্তবৃন্দই অদ্বৈতের অবস্থা বুঝতে পারবেন কারণ, শ্রীচৈতন্য নিজে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। বেদের গূঢ় তত্ত্বের মতই আচার্যের কথাও কিছুই বুঝতে পারা যায় না। অদ্বৈতাচার্যের কথা যিনি পুরো বুঝতে পারবেন তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরের বিশেষ পার্থক্য নেই। শরতের মেঘ-যে সব জায়গায় বারিপাত করে না, সে তার কোন দোষ নয়। ভাগবত বলেছেন,—জ্ঞানীগণ যেমন সময়বিশেষে উপাদেশ দান করেন, আবার দান করেনও না, তেমনি শরৎকালে পর্বতেরা কোথাও মঙ্গলবারি দান করে, কোথাও আবার করেও না। এতে আচার্যের কোন দোষ নেই। বৈষ্ণবসমাজ জানেন যে চৈতন্যের চরণ সেবাই অদ্বৈতের কাজ। ভক্তবৃন্দের কথা অগ্রাহ্য করে কেউ অদ্বৈতকে সেবা করলেও তিনি তা মঙ্গলদায়ক বলে মনে করেন না। শ্রীচৈতন্যকে যে ভগবান বলে স্বীকার করে অদ্বৈত তাকেই ভক্তবলে স্বীকার করেন। সর্বপ্রভু গৌরচন্দ্রকে যে মানে না, অদ্বৈত তার সেবা গ্রহণ করেন না। রামচন্দ্রকে না মান্য করে শিবের পূজা করায় রাবণের শিরঃ ভঙ্গ হল শেষ পর্যন্ত। শিব তাকে ত্যাগ করলেন, রাবণ তা জানত না, সে সবংশে নিহত হল। শিব তো আর সবই খুলে বলবেন না, যার বুদ্ধি আছে সেই তা বুঝতে পারবে। তেমনি কিছু অদ্বৈতভক্ত আছে যারা অদ্বৈতের মনোভাব না বুঝতে পারার ফলেই চৈতন্যদেবকে নিন্দা করে। অদ্বৈত স্বভাবত সব কথা খুলে বলেন না। তাবা বৈষ্ণববৃন্দের কথা না শুনে, নিজের বুদ্ধিমত চলে অধঃপাতে যায়। যার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্বসিদ্ধি সেই শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব এরা কিছুই জানে না। এসব কথা বুঝিয়ে বলতে গেলেই তারা তেড়ে মারতে আসে, সবই মায়ার খেলা, কাকে কিইবা বলবার আছে! অদ্বৈত যে প্রভুর প্রিয় পার্ষদ এবং প্রিয় ভক্ত তা তারা জানেও না, মানেও না। এসব বিষয়ে যে বিশ্বাস করে তার কোনও ক্ষতি হতে পারে না। যার যতই মহত্ত্বের দম্ভ শুনছ, শ্রীচৈতন্যের সেবায় যে মহত্ব তার চেয়ে বেশি মহৎ কিছু নেই। যাঁদেব প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হয় তাদের চিত্তবৃত্তি অনুসারে ভক্তিতে তিনি গৌরচন্দ্রের সমাদর করেন। শ্রীনিত্যানন্দ সব সময়ই লোকজনকে ডেকে বলছেন,— ভাইসব, তোমরা বল, গৌরচন্দ্রই আমার প্রভু। অদ্বৈতাচার্য চৈতন্য-স্মরণে সর্বদা কাঁদছেন, তাঁর আর কিছু মনে পড়ছে না। এইসব দেখেও শ্রীচৈতন্যের প্রতি যার ভক্তি জন্মায় না তার সঙ্গে কথা বললেও পুণ্য ক্ষয় হয়ে যায়। শ্রীঅদ্বৈত হচ্ছেন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য—এই বিশ্বাস নিয়ে যিনি অদ্বৈতের গুণকীর্তন করেন সেই বৈষ্ণবই জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। অদ্বৈতকে প্রভুর ভক্তরূপে জানলেই অদ্বৈত খুশি হন, অদ্বৈতের কিছু শিষ্য তা জানেন না। 'সকলের ঈশ্বর গৌরাঙ্গসুন্দর'—এই কথাতেই অদ্বৈত প্রীতি লাভ করেন। অদ্বৈতের শ্রীমুখের এই সকল কথায় সন্দেহ করা ঠিক নয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের কথা অমৃততুল্য, এই কথা শুনলে পাষণ্ডদের পর্যন্ত পাপ খণ্ডন হয়ে যায়।

অদ্বৈতাচার্যকে গীতার সঠিক পাঠ বলে দিয়ে বিশ্বম্ভর ভক্তির দরজা খুলে দিলেন। বিশ্বম্ভর তখন হাত তুলে বললেন,—সকলেই আমাকে দর্শন কর, যার যা ইচ্ছা আমার

কাছে বর প্রার্থনা কর। প্রভুর কথা শুনে সকলেই আনন্দিত হলেন এবং যার যা ইচ্ছা বর প্রার্থনা করতে লাগলেন। অদ্বৈত বললেন,—প্রভু, তোমার কাছে আমি এই বর চাই যে তুমি মূর্খ দরিদ্র সকলকে অনুগ্রহ করবে। কেউ বলে,—আমাকে আমার বাবা আসতে দেয় না, তোমার আশীর্বাদে যেন তাদের মন ভাল পথে আসে। কেউ শিষ্যকে, কেউ পুত্রকে, কেউ স্ত্রীকে, কেউ চাকরকে—কর্মচারীকে—আসতে বারণ করে। তাদের সকলেরই যেন মন ভক্তিপথে আসে। এভাবেই সকলে বর প্রার্থনা করছে। কেউ বলে,—আমার যেন গুরুভক্তি হয়। এইভাবে সকলেই যার যার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করছে। প্রভু ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করতে ভালবাসেন। তাই তিনি খুশি মনেই সকলকে বর দিচ্ছেন।

মুকুন্দ পর্দার আড়ালে রয়েছেন। সামনে আসতে পারছেন না। মুকুন্দ পরম ভাগবত, তিনি বৈষ্ণবদের সকলের মহিমাই ভাল করে জানেন। সর্বদা প্রভুর সঙ্গে কীর্তন করেন। কেউই বুঝতে পারল না যে তবু তাকে কেন প্রভু শাস্তি দিলেন। প্রভু তাঁকে ডাকছেনও না। তাতে সকলেরই মনে বড় দুঃখ হল। শ্রীবাস বললেন,—প্রভু, মুকুন্দ তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে? মুকুন্দ তোমার প্রিয়পাত্র, আমরাও তাকে ভালবাসি, মুকুন্দের গান শুনে সবারই মন গলে যায়। মুকুন্দ ভক্তিমান, তার সব দিকেই কর্তব্যজ্ঞান তীব্র, তার তো কিছু অপরাধ দেখি না. তাকে কেন উপেক্ষা করছ, প্রভু? যদি অপরাধ কিছু করেই থাকে তাহলে শাস্তি দাও, নিজের ভক্তকে কেন দূরে সরিয়ে দিচ্ছ? তুমি না ডাকলে তো সে তোমার সামনে আসতেও ভরসা পাচ্ছে না। তোমার দর্শনপ্রার্থী, তুমি তাকে ডাক। প্রভু বললেন,—তোমরা কেউ আমাকে একথা বলবে না। ও-ব্যাটার জন্যে কেউ আমাকে অনুরোধ করবে না। কথায় বলে না,—ঘাসও খাওয়ায়, লাঠিও মারে। ও হচ্ছে সেই রকম। ওকে তোমরা কেউ চিনতে পার নি। কখনো দাঁতে তৃণ নিয়ে বিনয়ের অবতার আবার সুবিধে বুঝেই লাঠি হাতে নেয়। ঐ সুবিধাবাদীকে আমার সামনে আসতে দিও না। মহাবক্তা শ্রীবাস আবার বলেন,—তোমার কথা তো আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, আমরা তো মুকুন্দের কিছু দোষ দেখছি না, তোমার অভয় পাদপদ্মই তার সাক্ষী। প্রভু বলনে,—ও ব্যাটা যখন যেখানে যায়, সুবিধে মত কথা বলে তাদের দলে ভিড়ে পড়ে। অদ্বৈতের কাছে যখন যোগবাশিষ্ট রামায়ণ পড়ে তখন ভক্তি দেখিয়ে নাচ গান সবই করে। আবার যখন অন্য দলে মেশে তখন ভক্তির উপরে লাঠি মারে। যে বলে—যে ভক্তির চেয়েও বড় কিছু আছে সে আমাকে সর্বদা আঘাত করে জানবে। ভক্তির কাছে ও অপরাধী হয়েছে তাই আমার দর্শন পাবে না। মহাপ্রভু যে তাঁকে দর্শন দেবেন না—একথা মুকুন্দ বাইরে দাঁড়িয়ে সবই শুনতে পেলেন। শিক্ষকের কথামত আমি ভক্তিকে মান্য করতাম না, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য অন্তর্যামীরূপে সবই জানেন, —মনে মনে এই কথা ভেবে তিনি স্থির করলেন,—আমার এ দেহ রাখার কোন যুক্তি নেই। অপরাধী শরীর আজই আমি ত্যাগ করব। কবে প্রভুর দেখা পাব কে জানে? তারপর মুকুন্দ শ্রীবাসপণ্ডিতকে বললেন,—প্রভুকে শুধু এইটুকু জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও যে আমি কখনও তার দর্শন পাব কিনা। মুকুন্দের দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে, মুকুন্দের দুঃখ দেখে ভক্তগণও কাঁদছেন। প্রভু তখন বললেন,—আর যদি কোটি জন্ম হয় তবে নিশ্চয় আমার দর্শন পাবে। প্রভুর মুখে 'নিশ্চয় পাবে' শুনে মুকুন্দ মহা আনন্দে 'পাব পাব' বলে খুব নাচতে লাগলেন। চৈতন্য-ভক্তগণ সকলেই তখন আনন্দিত হলেন।

দেখতে পাবেন, এই কথা কানে শোনা মাত্র মুকুন্দ সেখানেই নাচতে শুরু করে দিলেন। প্রভু মুকুন্দের অবস্থা দেখে ভক্তদের ডেকে বললেন,—শিগগির মুকুন্দকে ডেকে দাও। তখন বৈষ্ণবগণ তাঁকে ডাকলেন, মুকুন্দ কিছু না জেনেই আনন্দ করছেন। প্রভু বললেন,—মুকুন্দ, তোমার আর কোন অপরাধ নেই, আমাকে দর্শন কর, প্রসাদ নাও। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সকলে মুকুন্দকে ধরে নিয়ে এল, মুকুন্দ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। প্রভু বললেন,—ওঠ মুকুন্দ, ওঠ। তোমার আর কিছু অপরাধ নেই। তোমার সঙ্গদোষ কেটে গেছে। আমি তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করলাম। আমি বলেছিলাম, তুমি কোটি জন্মে পাবে, কিন্তু নিমেষের মধ্যেই তুমি আমার কথা মিথ্যা বলে প্রমাণ করলে। আমার বাক্য অব্যর্থ, তুমি জান। তুমি চিরদিনের মত তোমার হৃদয়পুরে আমাকে আটকে রাখলে। তুমি আমার কীর্তনীয়া, আমার সঙ্গেই থাক, তুমি আমার পরিহাসের পাত্র, তাই আমি তোমার সঙ্গে একটু মজা করলাম। তুমি যদি সত্যি কোটি অপরাধও কর, সে অপরাধ মিথ্যে হয়ে যাবে, তুমি আমার অতি প্রিয়পাত্র। তুমি আমার ভক্ত, তোমার শরীর ভক্তিময়, আমি সর্বদাই তোমার জিহ্বায় বাস করি।

প্রভুর আশ্বাসবাণী শুনে মুকুন্দ নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগলেন,—প্রভু, আমি যে আমার এই পাপ মুখে ভক্তিকে অমান্য করেছি। দর্শন পেলেই বা অভক্তের তাতে কি আনন্দ হবে? বেদ যা অন্বেষণ করে বেড়ায় দুর্যোধন তোমার সেই বিশ্বরূপ দেখেছিল, তাতে কি লাভ হল? দেখেও সে সবংশে মারা গেল, ভক্তি না থাকায় সে কোন সুখলাভ করতে পারল না। আমি পাপমুখে সেই ভক্তি অমান্য করেছি, তাই তোমার দর্শন পেলেও কি আর আমার প্রেমসুখ হবে? তুমি যখন রুক্মিণীহরণে যাচ্ছিলে রাজারা সকলেই তোমাকে দেখেছিল। অভিষেকে রাজ-রাজেশ্বর নাম হয়েছিল, সেই মহাতেজস্বী রাজা শিশুপাল বিদর্ভনগরে তোমার দর্শন পেয়েছিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ যা দেখতে চান, তা দেখেও রাজারা মারা গেল, আনন্দ কিছু পেল না। ভক্তিহীনদের এই হয়। জগতের কারণ ভগবানের শূকর-রূপ হচ্ছে সর্বযজ্ঞময়, তোমার সেই রূপ প্রলয়-সমুদ্রজলে আবির্ভূত হয়েছিল, অনন্ত পৃথিবী দাঁতে লেগে রয়েছে। দেবতারা যে রূপ দেখতে চান হিরণ্যাক্ষ তোমার সেই অপূর্বদর্শন লাভ করেও কোন আনন্দ পায় নি, কারণ—সে ভক্তিহীন। তার ভাই হিরণ্যকশিপুও তোমার মহাপ্রকাশ দেখেছে। ত্রিভুবনের মধ্যে অপূর্ব সেই নৃসিংহরূপ দেখেও তার মৃত্যুই হল। কারণ, সেও ছিল অভক্ত। সেই ভক্তিযোগ আমি মুখে অমান্য করেছি, আমার মুখ খসে পড়ল না কেন? কুব্জাদেবী, যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের পত্নীগণ, পুরনারীরা, মালাকার-সুদামা, তাঁরা তো তোমার প্রকাশ দেখে নি, অথচ ভক্তির ফলে তাঁরা তোমাকে লাভ করেছেন। কংস তোমার প্রকাশ দেখেও অভক্ত বলে প্রাণে মারা গেল। এমন ভক্তিকে আমি অমান্য করেও আমার সেই পাপ-মুখ যে এখনো আছে তা একমাত্র তোমার অপার করুণার ফলেই। ভক্তির প্রভাবেই অনন্তদেব মহাবলী হয়েছেন। তিনি পরমানন্দে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মস্তকে ধারণ করে আছেন। তাঁর মাথার উপরের এই ভারের কথা কৃষ্ণগুণ-কীর্তনের তন্ময়তার জন্য তিনি জানতেও পারেন না। অনন্তদেবের নিজের কোনও আশ্রয় বা দাঁড়াবার স্থান নেই তথাপি শুধু ভক্তিযোগ-প্রভাবে তিনি সব দায়িত্ব পালন করছেন। আমার এমনই পাপবুদ্ধি যে আমি সেই ভক্তিকে মান্য করি নি, হাজার জন্মেও আমার ভাল গতি হবে না। ভক্তিযোগেই গৌরীপতি শিবশঙ্কর হয়েছেন, জগতের মঙ্গল করছেন। ভক্তির প্রভাবেই নারদ শ্রেষ্ঠমুনি হয়েছেন। ব্যাসদেব বেদ বিভাগ

করে, ধর্মশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেও মনে বিন্দুমাত্র শান্তি পাচ্ছিলেন না। ভক্তি অত্যন্ত গোপনীয় বস্তু বলে ব্যাসদেব ভক্তিসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন নি, কেবল মাত্র এই অপরাধেই চিত্তে শান্তি পাচ্ছিলেন না। শেষে নারদ মুনির উপদেশে বিস্তারিত ভাবে ভক্তির কথা লিখে, ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন করে নিজের ও মনের দুঃখ দূর করলেন এবং পৃথিবীরও উপকার সাধন করলেন। আমি কীটানুকীট হয়ে সেই ভক্তিকে অমান্য করেছি, এখন তোমাকে দর্শন করার আর আমার ভাগ্য পাব কি করে? মহাভক্ত মুকুন্দ বাহু তুলে এমন কাঁদছেন আর তাঁর এমন জোরে শ্বাস বইছে যেন মনে হয় সেই হাওয়াতেই তার শরীর চলছে। মুকুন্দ মনেপ্রাণেই বিশুদ্ধ ভক্ত, তাঁর অসীম ভক্তি, তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্ষদরূপেই পরিগণিত।

মুকুন্দের মনের দুঃখের কথা জেনে প্রভু বললেন,—মুকুন্দের ভক্তিযোগ আমার অত্যন্ত প্রিয়বস্তু। তুমি যেখানে কীর্তন কর আমি সেখানেই উপস্থিত থাকি। তবে তোমার কথা ঠিকই, ভক্তি না থাকলে শুধু আমার দর্শন পেয়েও কিছু লাভ নেই। তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। সৎকর্মের সুফল হবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না। সমস্ত বিধির উপরে আমার অধিকার আছে বলে আমি সমস্ত বিধির অন্যথা করতে পারি। আমি নিজমুখেই এই কথা বলে রেখেছি যে ভক্তি বিনে কোন কিছুতেই কিছু হবে না। ভক্তি না মানলে আমি মনে দুঃখ পাই, আমার দুঃখেই তার দর্শন-সুখ ঘুচে যায়। মথুরার পথে রজকও আমাকে দেখেছে কিন্তু ভক্তি নেই বলে সে বঞ্চিত হল, তার কাছে কাপড় চেয়েছিলাম আমি। আমার দর্শন লাভের জন্য রজক পূর্ব পূর্ব বহু জন্মে অনেক তপস্যা করেছিল, বহুবার দেহত্যাগও করেছিল কিন্তু ভক্তি না থাকায় দেখেও আনন্দ পায় নি। আমার ভক্তের কাছে কোন অপরাধ করলে সে দর্শন-সুখ পাবে না। ভক্তের কাছে অপরাধ করলে ভক্তি নষ্ট হয়ে যায়, ভক্তি না থাকলে দর্শনের ক্ষমতা থাকে না। তুমি এতক্ষণ যা বললে তা সবই আমারই কথা, আমি যা বললে তুমি বলবেই বা কি করে? তোমাকে বলে রাখলাম, আমি ভক্তি বিলিয়ে দেব, তাই আগে তোমার কণ্ঠস্বরে প্রেমভক্তি দান করলাম। তোমার গলায় কীর্তন শুনলে আমার সকল ভক্তেরই হৃদয় গলে যায়। আমি তোমাকে যেমন অত্যন্ত প্রিয় মনে করি, সকল ভক্তও যেন তোমাকে তেমনি অত্যন্ত প্রিয় মনে করে,—এই আমি চাই। আমি যখনই যেখানে অবতীর্ণ হব, তুমি সব জায়গাতেই আমার কীর্তনীয়া থাকবে। মুকুন্দের প্রতি প্রভুর এই বর দান শুনে ভক্তবৃন্দ মহা জয়ধ্বনি করে উঠলেন। 'হরি বোল হরি বোল জয় জগন্নাথ'—সকলে হাত তুলে প্রভুকে এই বলে সম্বোধন করলেন। মুকুন্দের স্তুতিপাঠ এবং মুকুন্দকে প্রভুর বরদানের কথা যে শুনবে সেও প্রভুর পার্ষদ হয়ে মুকুন্দের সঙ্গে কীর্তন করতে পারবে। বেদগোপ্য এই সকল চৈতন্যকথা ভক্তিমান সুবুদ্ধিরাই মানবে, মূঢ়গণ মানতে পারবে না। এসব কথা শুনে যে আনন্দ পাবে কেবল সেই শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভ করতে পারবে।

সকল ভক্তই প্রভুকে স্তুতি করে বরলাভ করলেন। অত্যন্ত মহা উদার শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই প্রভুর এই সাতপ্রহরিয়া লীলা হয়েছিল। যাঁর উপাস্যদেবতা যেরূপ তিনি বিশ্বম্ভরকে সেই রূপেই দর্শন করলেন। প্রভুর যে প্রকাশে সকলেই প্রভুকে নিজ-নিজ উপাস্যস্বরূপে দেখতে পান সেই প্রকাশকেই মহা-মহা প্রকাশ বলা যায়। প্রভুর এরকম আত্মপ্রকাশ দিনের পর দিন চলতে লাগল। চৈতন্যভক্তবৃন্দ সকলেই সস্ত্রীক তা দর্শন করলেন।

কায়মনোবাক্যে যাঁরা প্রভুর ভক্ত তাঁরাই কেবল এমন প্রকাশ দেখতে পান। নবদ্বীপে অনেক তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও যোগী আছেন। তাঁরা সর্বদা গীতা ভাগবত পড়েন, কেউ পড়ান, বর্ণাশ্রম ধর্ম মেনে চলেন। কেউ কেউ অন্যের দান গ্রহণ করেন না, ব্রহ্মচর্য নিয়ে বৃথা শরীর শুকোচ্ছেন। কিন্তু এমন বৈকুণ্ঠের আনন্দ সেই অভিমানীগণ কেউ দেখতেই পেলেন না। শ্রীবাসের বাড়ির দাস-দাসীরাও যা দেখলেন তাঁরা শাস্ত্রাদি পাঠ করেও তা জানতে পেলেন না। মুরারি গুপ্তের চাকর যে আশীর্বাদ লাভ করলেন, অনেকে মাথা মুড়িয়েও তা পেল না। ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে শ্রীচৈতন্যকে পাওয়া যায় না, তিনি একমাত্র ভক্তির বশ। লোকসমাজে খুব যশস্বী হলেই যে শ্রীচৈতন্যকে পাওয়া যায় তা নয়, সর্ব শাস্ত্রেই বলে,—তিনি ভক্তিবশ। নবদ্বীপের এই প্রকাশ কিন্তু পণ্ডিতেরা কেউ দেখতে পান নি। পাপীরা কখনো এমন প্রকাশ দেখতে পায় না। অশেষ দুষ্কৃতি না থাকলে কি এমন মহাপ্রকাশের দর্শন থেকে বঞ্চিত হতে পারে? এসব লীলার কোন শেষ নেই, শাস্ত্রে কেবল আবির্ভাব-তিরোভাব বলে উল্লেখ আছে। আজও শ্রীচৈতন্য এসব লীলা করছেন, যখন যাঁকে আশীর্বাদ করেন কেবল তিনিই তা দেখতে পান। যে বৈষ্ণব যে মন্ত্রে ইষ্টদেবের ধ্যান করেন, ঠাকুর তাঁকে সেই রূপেই দেখা দেন। তিনি দর্শন দান করে সকলকে শিখিয়ে দেন,—এ সকল কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করবে না। তোমরা জন্মে জন্মে আমার সঙ্গ লাভ করবে, তোমাদের ভক্তেরাও আমার লীলা দর্শন করতে পাবে। প্রভু নিজের গলার মালা সকলকে দিলেন, চিবানো পান দিলেন। শরৎকালের কোটি কোটি পূর্ণচন্দ্রের চেয়েও পরম সুন্দর মুখের দ্রব্য পেয়ে সবাই আনন্দে খেতে লাগলেন। প্রভুর সেই চিবানো পান বৈষ্ণবগণ খাওয়ার পরে যা বাকি ছিল তা সবই খেলেন শ্রীবাস পণ্ডিতের পুণ্যবতী ভাইঝি নাবালিকা নারায়ণী। তাঁকে প্রভু নিজেই দিলেন। বালিকা মহা আনন্দে প্রভুর প্রসাদ খেল, বৈষ্ণবগণ সকলে তাকে আশীর্বাদ করলেন,—এই ছোট্ট মেয়েটির জীবন ধন্য হল, এই বয়সেই সে নারায়ণের আশীর্বাদ পেল।

প্রভু বললেন,—নারায়ণী, তুমি কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদো দেখি। সত্যি প্রভুর আজ্ঞায় বালিকা নারায়ণী কৃষ্ণনাম নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে তাই এই কথা প্রচলিত হল,—নারায়ণী গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র। চৈতন্যদেব যাঁকে যেমন আদেশ করেন তিনি ঠিক সেভাবে এসে উপস্থিত হন। এসব কথায় যার অবিশ্বাস সে অবশ্যই অধঃপাতে যাবে। শ্রীঅদ্বৈতের শ্রেষ্ঠ মহিমার প্রাচুর্য হচ্ছে যে ঠাকুর-শ্রীচৈতন্য হচ্ছেন অদ্বৈতের প্রিয়। শ্রীচৈতন্যের অতি আদরের পাত্র হচ্ছেন ঠাকুর-নিতাই। শাস্ত্র তাঁর মহিমা কীর্তন করেছেন। সমাজে গণ্যমান্য লোক হয়েও যদি সে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত না হয় তবে তাকে তৃণ বলে গণ্য করলেও চলে। নিত্যানন্দ নিজেকে চৈতন্যের দাস বলে প্রচার করেন, এছাড়া আর কোন কথাই তিনি বলেন না। নিত্যানন্দের কৃপাতেই চৈতন্যভক্তি লাভ করা যায়। নিত্যানন্দকে ভজনা করলে আর কোন বিপদের ভয় থাকে না। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলছেন যে তাঁর প্রভুর প্রভু হচ্ছেন গৌরাঙ্গসুন্দর, তাই তাঁর ভরসা যে তিনি শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভ করবেন। গৌরচন্দ্রের কৃপা হলেই নিত্যানন্দের চরণে শরণ গ্রহণ সম্ভব হতে পারে, নতুবা অসম্ভব। বলরাম-নিত্যানন্দের প্রীতির জন্য চৈতন্যচরিত কীর্তন করছি। হে নিত্যানন্দ রূপ প্রভু বলরাম, তুমি কৃপা করে জগৎবাসী জীবের মঙ্গল সাধন কর। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের দাস্য ছাড়া আর কিছু জানেন না, নিত্যানন্দই চৈতন্যভক্তি দান করেন। নিত্যানন্দের কৃপাতেই গৌরচন্দ্রকে চিনলাম, নিত্যানন্দের আশীর্বাদেই ভক্ততত্ত্ব

জানলাম। নিত্যানন্দকে অবহেলা করলে শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাওয়া অসম্ভব। দেবাদিদেব মহাদেবও তাঁর মহিমার অন্ত পান না। যিনি কারো নিন্দা করেন না এবং সর্বদা কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন একমাত্র তিনিই সুদুর্লভ শ্রীচৈতন্যকে জয় করতে পারবেন। নিন্দায় কিছু লাভ হয় না, সকলকে সম্মান করাই ভাগবত ধর্ম। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য খণ্ড অমৃততুল্য, কিন্তু পাষণ্ডীরা তাকে নিমের মত তেতো মনে করে। কোন রোগীর মুখে যেমন চিনিও তেতো লাগে, সেটা তার কপাল, চিনির দোষ নয়। তেমনি কেউ কেউ শ্রীচৈতন্যের যশকীর্তন শুনে কপালদোষে আনন্দ পায় না। সন্ন্যাসীও যদি গৌরচন্দ্রকে মান্য না করে তাহলে বুঝতে হবে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান-হীন এবং নীচ প্রকৃতির লোক। পাখীও যদি চৈতন্য নাম নেয় তাহলে সেও চৈতন্যধাম প্রাপ্ত হবে। নিত্যানন্দের জীবন গৌরচন্দ্রের জয় হোক, তোমার নিত্যানন্দকে যেন আমি প্রাণের প্রাণ বলে লাভ করতে পারি। তুমি যাঁদের সঙ্গে লীলাবিলাস করলে তাঁদেব সকলের চরণে আমি প্রণতি জানাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং নিত্যানন্দ চন্দ্র জানেন যে বৃন্দাবনদাস তাঁদের পদযুগলে নিয়ত কীর্তন করে চলেছেন।

২/১১ হে পতিতজনের বন্ধু, অনাথের নাথ, প্রেমসিন্ধু গৌরাঙ্গনিধি, প্রভু, তুমি কোথা থেকে এলে? দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ বিশ্বম্ভর, তোমার চরণে পতিত ভক্তবৃন্দের জয় হোক। শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন, দামোদর স্বরূপের প্রাণ, রূপ সনাতনের আশ্রয়, জগদীশ গোপীনাথের হৃদয়, তোমার জয় হোক।

প্রভু বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে লীলাবিলাস করছেন কিন্তু সকলে তা দেখতে পায় না। চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে নবদ্বীপের অনন্ত কৌতুক বর্ণনা করা হচ্ছে, ভাগ্যবন্ত শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরে বসেই তা দেখতে পাচ্ছেন। শ্রীবাস অন্তর দিয়ে প্রভুর সেবা করেছেন তাই তিনি সপরিবারে প্রভুর প্রকাশ দেখতে পেলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতেই থাকেন, শ্রীবাসকে তিনি বাবা ডাকেন। তিনি সর্বদা বাল্যভাবে বাহ্যজ্ঞান হারিযে থাকেন, শ্রীবাসের গৃহিনী মালিনীদেবীর স্তন্য পান করেন। মালনী দেবীর স্তন শুকনো, তাতে দুধ নেই কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীনিত্যানন্দ স্পর্শ করলেই তাঁর স্তনে দুধ আসে। মালিনীদেবী শ্রীনিত্যানন্দের এই সব অচিন্ত্য শক্তি দর্শন করেন। শ্রীচৈতন্য এসব বিষয়ে প্রকাশ করতে বারণ করেছেন, তাই মালিনী দেবী কাউকে কিছু বলেন না, কিন্তু তিনি নিজে নিত্যানন্দের শিশুরূপ প্রত্যক্ষ করছেন। প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে বললেন,—কারো সঙ্গে যেন ঝগড়া ক'রো না। শ্রীবাসের ঘরে চঞ্চলতাও করবে না। এই কথা শুনে নিত্যানন্দ আশ্চর্য হয়ে 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বললেন। —আমার চঞ্চলতা মোটেই নেই। আমাকে তোমার মত ভাববে না। বিশ্বম্ভর বললেন,—আমি তোমাকে বেশ চিনি। নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন,—আমার দোষটা কি দেখলে, তুমি? শ্রীগৌরাঙ্গ হেসে বললেন,—তুমি খেতে বসে সারা ঘরে অন্ন ছড়াও। নিত্যানন্দ উত্তর করলেন,—পাগল না হলে কেউ ঘরে ভাত ছড়ায়? তুমি এই সব কথা বলে আমাকে ভাত দেবে না ঠিক করেছ। আমাকে না দিয়ে তুমি নিজে সুখে খাও, সে তো ভাল কথা, তার জন্যে অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? প্রভু বললেন,—তোমার অপকীর্তি আমার গায়ে লাগে, তাই তোমাকে শোধরাতে চাই। তখন নিত্যানন্দ হেসে বললেন,—এ তো ভাল কথা, চাঞ্চল্য দেখলে অবশ্যই শুধরে দেবে। তুমি ঠিকই বলেছ, আমি তো চঞ্চলই। এই কথা বলে তিনি প্রভুর দিকে তাকিয়ে খলখল করে হাসছেন।

আনন্দের আবেশে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বসে আছেন, পরবার কাপড়টি খুলে মাথায় বাঁধলেন। সারা উঠোনে তিনি জোড়া পায়ে ল্যাফয়ে ল্যাফয়ে ঘুরছেন আর কেবলই হাসছেন। গদাধর শ্রীনিবাস হরিদাস সকলেই হাসছেন। সকলেই নিত্যানন্দের বাল্যভাবে তাঁকে উলঙ্গ দেখলেন। প্রভু ডেকে বললেন,—এ কি করছ? গৃহস্থের বাড়িতে এসব করা ঠিক নয়। এক্ষুনি বললে—আমি কি পাগল? বলেই আবার সব ভুলে গেলে? কিন্তু নিত্যানন্দের তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না তাই লজ্জাও পান নি। তিনি আনন্দসমুদ্রে ভাসছেন। প্রভু নিজেই তখন ধরে তাঁকে কাপড পরিয়ে দিলেন। নিত্যানন্দের এই রকম অপূর্ব ব্যবহার। চৈতন্যের কথায় তাঁর ভয় আছে, তিনি আর কাপড় খুললেন না। নিত্যানন্দ নিজহাতে ভাতও খান না, মালিনী দেবী তাঁকে ছেলের মত ভাত খাইযে দেন। মালিনী দেবী নিত্যানন্দের মর্ম জানেন, মা যে-ভাবে ছেলেকে পরিচর্যা করে তিনি সেভাবেই নিত্যানন্দকে পালনপোষণ করছেন।

একদিন একটি কাক পেতলের বাটি নিযে উডে চলে গেল। বাটি রেখে এসে সে দেখে মালিনী দেবীর মুখ মলিন হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র কাকে নিয়ে গেছে। পাপের ভয়ে কাউকে তিনি একথা বলতেও পারছেন না, নিজের মনে কাঁদছেন। তখন নিত্যানন্দ এসে মালিনী দেবীকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মালিনী দেবী নিত্যানন্দকে জানালেন সব। শুনে নিত্যানন্দ বললেন,—মা, তুমি কেঁদো না, আমি তোমার বাটি এনে দেব। নিত্যানন্দ কাককে বললেন,—শিগগিব বাটি এনে দাও। সকলের হৃদয়েই নিত্যানন্দ বিদ্যমান। তাঁব আজ্ঞা লঙ্ঘন করবার শক্তি কারোই নেই। প্রভুর আজ্ঞা শুনে কাক উড়ে গেল, মালিনী দেবী শোকাকুল হযে কাকের দিকে তাকিযে রইলেন। কাক খানিকটা উডে গিয়ে বাটি মুখে করে ফিরে এল। বাটিটি এনে মালিনী দেবীর কাছে রেখে দিল। মালিনী দেবী নিত্যানন্দের প্রভাব বুঝতে পারলেন। আনন্দেব আবেশে মালিনী দেবী মূর্ছিত হযে পড়লেন এবং মূর্ছাভঙ্গে দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে নিত্যানন্দের স্তব করতে লাগলেন,—তুমি গুরুর মৃতপুত্র বাঁচিয়ে দিয়েছ, সকল ভুবন তুমি পালন কবছ, যমের ঘর থেকে যে লোককে ফিরিয়ে আনতে পারে তার পক্ষে কাকের কাছ থেকে বাটি আনা এমন কিছু বিশেষ কাজ নয়। তোমার মাথায় অনন্তভুবন, লীলার ফলে তুমি তার ভার বোধ কর না। তোমার নামে অনাদি অবিদ্যা নষ্ট হয়ে যায়, কাকেব কাছ থেকে বাটি আনাব কি আছে? তুমি লক্ষ্মণরূপে বনবাসে থেকে সীতাকে সবদা রক্ষা করেছ, তুমি সীতাদেবীর পা দুখানি ছাড়া একবার মুখের দিকে তাকাও নি, তোমাব বাণে রাবণের বংশ নাশ হয়েছে, সেই তুমি বাটি আনায এমন কি মহিমা প্রকাশ হল? তোমার চবণে কালিন্দী এসে প্রণাম জানিয়ে স্তব করেছে, তুমি চতুর্দশ ভুবন পালন করার শক্তি ধারণ কর। তোমার পক্ষে কাকের কাছ থেকে বাটি নিয়ে আসায় কি এমন মহত্ব আছে? তোমার অচিন্ত্য প্রভাবের তুলনায় এ কাজ সামান্য হলেও, শাস্ত্র বলেন—তুমি যা কর তাই সত্য। নিত্যানন্দ মালিনী দেবীর স্তব শুনে হাসলেন এবং বাল্যভাবের আবেশে তিনি বললেন,—আমি খাব। নিত্যানন্দকে দেখলেই তাঁর স্তনধারা ক্ষরিত হয়, নিত্যানন্দ পান করেন। সকলেই জানে, নিত্যানন্দের এই রকম অচিন্ত্যনীয় চরিত্র। তাঁর কাজকর্ম অলৌকিক এবং দুর্জ্ঞেয়। যে সেই তত্ত্ব জানে সেই সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে, অন্যে পারে না। সারা নবদ্বীপে তিনি সর্বদা অসংযত হয়ে জ্যোতির্ময় বিগ্রহ রূপে ঘুরে বেড়ান। কেউ বলেন নিত্যানন্দ মহাযোগী, কেউ বলেন তিনি মহাজ্ঞানী, কারো কারো মতে তিনি

পরমভক্ত—যিনি যেমন বুঝেছেন তেমনই বলছেন। গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলছেন,—ওসব কথা কিছু বুঝি না, নিত্যানন্দ চৈতন্যের যেই হোন তাঁর শ্রীচরণ যেন আমি হৃদয়ে ধারণ করতে পারি। কোনো পাপী তাঁর নিন্দা করলে আমরা তাতে কর্ণপাত করি না। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতেই রয়েছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে বাল্যভাবাবেশের চাঞ্চল্য থেকে সর্বদা রক্ষা করেন।

একদিন গৌরহরি নিজের বাড়িতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে নিয়ে বসে আছেন। স্ত্রীর হাতের তৈরি পান খেয়ে প্রভুর আনন্দে সময় কাটছিল। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরাঙ্গ থাকলে শচীদেবীর মনে আনন্দ হয়। মায়ের আনন্দ হবে জেনেই তিনি স্ত্রীর সঙ্গে বসে আছেন। এমন সময় পরম-চঞ্চল আনন্দবিহ্বল নিত্যানন্দ সেখানে এলেন। তিনি প্রেমাবিষ্ট হয়ে আছেন, বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই, বাল্যভাবে তাঁদের সামনেই দিগম্বর হয়ে গেলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করছেন,—নিত্যানন্দ, দিগম্বর হলে কেন? নিত্যানন্দ 'আচ্ছা আচ্ছা' বলে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। প্রভু বললেন,—নিত্যানন্দ, কাপড় পর। নিত্যানন্দ বলছেন,—আজ চলে যাই। প্রভু বলছেন,—এ রকম করছ কেন? নিত্যানন্দ বলেন,—আর খেতে পারছি না। প্রভু বললেন,—কি কথার কি উত্তর দিচ্ছ? নিত্যানন্দ বললেন,—দশবার গিয়েছিলাম। প্রভু তখন রেগে গিয়ে বললেন,—আমার দোষ নেই। নিত্যানন্দ বললেন,—প্রভু, শচীমাতা তো এখানে নেই। প্রভু অনুরোধ করলেন,—দয়া করে কাপড় পর। নিত্যানন্দ বললেন,—আমি ভোজন করব। শ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্যের ভাবে মত্ত হয়ে এক কথা শুনে আর অন্য কথা উত্তর দিচ্ছেন, হাসছেন। পদ্মাবতীনন্দন নিত্যানন্দের বাহ্যজ্ঞান নেই, তিনি হাসছেন। প্রভু উঠে তাঁকে কাপড় পরিয়ে দিলেন। নিত্যানন্দের কাণ্ডকারখানা দেখে শচীমাতা হাসছেন, নিজের ছেলে বিশ্বরূপের মতই মনে হয় তাঁকে। বিশ্বরূপের মতই কথাবার্তা নিত্যানন্দের, মাঝে মাঝে নিত্যানন্দকে শচীমাতার বিশ্বরূপ বলেই মনে হয়। মাতা কাউকে কিছু বলেন না কিন্তু নিত্যানন্দকে ছেলের মতই স্নেহ করেন এবং বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ দুজনকেই সমান যত্ন করেন। বাহ্যজ্ঞান হলে নিত্যানন্দ কাপড় পরলেন। মাতা তাঁকে সন্দেশ খেতে দিলেন। মায়ের কাছে পাঁচটি ক্ষীরের সন্দেশ পেয়ে নিত্যানন্দ একটি খেলেন, আর চারটি ছড়িয়ে ফেললেন। শচীদেবী বললেন,—এ কি করলে, ছড়িয়ে ফেললে কেন? নিত্যানন্দ উত্তর করলেন,—এক সঙ্গে দিলে কেন? মাতা বললেন,—আর তো নেই, কি খাবে? নিত্যানন্দ বললেন,—ঘরের মধ্যে খুঁজে দেখ, নিশ্চয় পাবে।...অতি আশ্চর্য ব্যাপার, সেই চারটি সন্দেশ মাতা ঘরের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে পেলেন। শচীদেবী বললেন,—সন্দেশ বা কোথায় পড়ল আর তা ঘরের মধ্যেইবা কি করে এল?...ধুলো ঝেড়ে মাতা সেই সন্দেশ নিয়ে এলেন। এসে দেখছেন, নিত্যানন্দ সেই সন্দেশ খাচ্ছেন। শচীমাতা জিজ্ঞাসা করলেন,—এগুলো কোথা থেকে পেলে? নিত্যানন্দ বললেন,—যেগুলো ছড়িয়ে ফেলেছিলাম, তোমার কষ্ট দেখে তাই আবার চেয়ে আনলাম। মাতা এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে মনে মনে ভাবছেন,—নিত্যানন্দের মহিমা অবশ্য সকলেই জানে। শচীমাতা তারপর নিত্যানন্দকে বললেন, ফাঁকি দিচ্ছ কেন? আমাকে আর মায়ায় ঢেকে রেখো না, আমি জানলাম যে তুমি সত্যি ঈশ্বর। নিত্যানন্দ বালক-স্বভাবে শচীমাতার চরণ ধরতে চাইছেন, মাতা পালিয়ে যাচ্ছেন। নিত্যানন্দের এই সব ব্যবহার, ভক্তিমার্গের সুকৃতি যাঁদের আছে মাত্র বুঝতে পারেন আর যাদের পূর্বজন্মের দুষ্কৃতি আছে তারা নিত্যানন্দ চরিতের

রহস্য বুঝতে পারেন না। নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যভাবাবেশের চাঞ্চল্যকে পাগলামি বলে যারা নিন্দা করে, পাপনাশিনী গঙ্গাও সেই নিত্যানন্দ-নিন্দককে স্পর্শদান না করে দূরে পালিয়ে যান। নিত্যানন্দ প্রভু বৈষ্ণবের অধিরাজ, অনন্ত ঈশ্বর এবং মহীধর অনন্তনাগ বা শেষনাগ। চৈতন্য নিত্যানন্দের চরণস্পর্শ পেলেই জীবন ধন্য। বৈষ্ণবের চরণে এই মনস্কামনা জানাচ্ছেন গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যেন নিতাইবলরাম তাঁর প্রভু হন। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ ভালই জানেন যে বৃন্দাবনদাস তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের সমীপে কীর্তনানন্দে বিভোর রয়েছেন।

২/১২ শ্রীগৌর নিতাই নবদ্বীপে নানা রঙ্গলীলা করছেন। শ্রীনিতাই অলৌকিক প্রেমানন্দে বালকের মত ব্যবহার করে চলেছেন। সকলের সঙ্গেই হেসে মধুর আলাপ করেন, নিজের মনেই নাচ-গান-বাজনা করেন এবং হাসেন। নিজের অনুভবের আনন্দে তিনি হুঙ্কার করেন, লোকেরা শুনে মনে মনে ভাবে এমন হুঙ্কার আগে কখনো শোনে নি। বর্ষা কালে গঙ্গায় নেমে নিত্যানন্দ চারদিকে কুমীরের মধ্যে ভাসতে থাকেন, একটুও ভয়ডর নেই। দেখে সকলেই সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে হায় হায় করে ওঠেন কিন্তু তাঁর সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। শ্রীহরির শয্যারূপ অনন্তনাগের ভাবে আবিষ্ট হয়ে তিনি গঙ্গায় ভাসতে থাকেন, লোকেরা সেই গূঢ় মর্মটি না বুঝেই ভয় পায়। কখনো নিত্যানন্দ আনন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়েন, তিন-চার দিনেও চেতন হয় না। তাঁর এই রকম কত যে অচিন্ত্যনীয় কাণ্ডকীর্তন আছে তা অসংখ্য মুখেও বলে শেষ করা যাবে না।

মহাপ্রভু যেখানে বসে আছেন, হঠাৎ শ্রীনিত্যানন্দ সেখানে এসে একদিন হাজির হলেন। চোখে আনন্দের ভাষা, মুখে হাসি এবং তিনি বাল্যভাবে দিগম্বর। সব সময় হুঙ্কার করে বলছেন,—নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত আমার প্রভু। মহাপ্রভু তাঁর সুন্দর জ্যোতির্ময় তনু এবং দিগম্বর মূর্তি দেখে হাসছেন। মহাপ্রভু ব্যস্ত হয়ে তাঁর নিজের কাপড় নিতাইকে পরিয়ে দিলেন, তাতেও তিনি হাসছেন। নিত্যানন্দের সারা গায়ে দিব্যগন্ধ লেপন করে তারপরে মহাপ্রভু তাঁর শ্রীঅঙ্গকে মালা দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। নিজের সামনে বসতে দিলেন। ভক্তবৃন্দও উপস্থিত আছেন। তাঁদের সামনেই প্রভু স্তুতি করতে লাগলেন,—তুমি নামেও নিত্যানন্দ রূপেও নিত্যানন্দ, তুমিই মূর্তিমন্ত শ্রীবলরাম। তোমার হাঁটা, চলা, খাওয়া সবকিছুই আনন্দময়। তোমাকে বুঝতে পারা মানুষের সাধ্য নয়। এটাই সত্য যে তুমি যেখানে শ্রীকৃষ্ণও সেখানে। মহামতি নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের প্রীতি ছাড়া আর কিছুই জানেন না, তাই শ্রীচৈতন্য যা বলেন বা করেন তা সবই শ্রীনিত্যানন্দ মেনে নেন। প্রভু বললেন,—আমার বড়ই ইচ্ছা যে তুমি আমাকে তোমার একখানি কৌপীন দাও। এই বলে প্রভু শ্রীনিতাইয়ের একখানি কৌপীন এনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো করে সকল বৈষ্ণবকে বেঁটে দিলেন। দিয়ে বললেন,—এই কাপড়ের টুকরো তোমরা সকলেই মাথায় বাঁধ। অন্য কোন লোকের কথা ছেড়ে দাও, যোগেশ্বরগণও এই দ্রব্য কামনা করেন। নিত্যানন্দের আশীর্বাদে কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায়। নিত্যানন্দ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি—একথা কেউ ভুলবে না। নিত্যানন্দ ছাড়া কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর কেউ নেই। ইনিই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু এবং ভাই—সবই। নিত্যানন্দচরিত্র বেদেরও দুর্বোধ্য, তিনি সর্বজীবের জনক-রক্ষক এবং একমাত্র সুহৃদ। এঁর সমস্ত ব্যবহারই কৃষ্ণ-রসময়, এঁর সেবা করলেই কৃষ্ণের প্রেমভক্তি লাভ করা যায়। ভক্তি করে এঁর কৌপীন মাথায় বেঁধে

নাও, ঘরে গিয়ে যত্ন করে এর পুজো করবে। প্রভুর আদেশ পেয়ে সকল ভক্তবৃন্দ কৌপীনের এক-এক টুকরো একেকজন মাথায় বেঁধে নিলেন। প্রভু বললেন—তোমরা নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ কর। এই পাদোদকে কৃষ্ণভক্তি দৃঢ় হয়—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে সকলেই শ্রীনিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ করলেন। একেক জন পাঁচবার দশবার করে নিচ্ছেন, নিত্যানন্দের হুঁশ নেই। তিনি কেবলই হাসছেন। মহাপ্রভু নিজেই বসে বসে নিত্যানন্দের পাদোদক ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন। সকলেই পাদোদক নিয়ে পান করে উন্মত্ত হয়ে হরিনাম করে চলেছেন। কেউ বলছেন,—আজ আমাদের জীবন ধন্য হল। কেউ বললেন—আজ আমাদের সব বন্ধন খণ্ডন হয়ে গেল। কেউ বললেন,—আজ থেকে আমরা সত্যি কৃষ্ণভক্ত হলাম। কেউ বলছেন,—আজ আমাদের জীবনের শুভ দিন। আরেকজন বললেন,—পাদোদক বড় সুস্বাদু, এখনো মুখে যেন মিষ্টি লেগে রয়েছে। নিত্যানন্দের চরণামৃতের প্রভাবেই যেন সকলে কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কেউ নাচে, কেউ গান গায, কেউ গড়াগড়ি যায, কেউবা সব সময় হুঙ্কার করতে থাকে। সকলেই পরমানন্দে কৃষ্ণকীর্তন আরম্ভ করলেন, ভক্তরা বিহ্বল হয়ে নাচতে লাগলেন। কখনো শ্রীগৌরচন্দ্র হুঙ্কার করে উঠে অপার নৃত্য করতে লাগলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দও উঠলেন এবং ভক্তগণ দুই প্রভুকে ঘিরে নৃত্য করতে থাকেন। কেউ কারো গায়ে পড়ছেন, কেউ ধরছেন, কেউবা চরণধূলি নিয়ে মাথায় দিচ্ছেন। কেউ কারো গলা ধরে কাঁদছেন, কতজন যে কত কি করছেন তা বলাও যায় না। প্রভু যে রয়েছেন তাতেও যেন কারো কোন ভয় নেই, ভক্ত-ভগবান সকলে এক সঙ্গেই নাচছেন। নিত্যানন্দ ও চৈতন্য দু'জনে কোলাকুলি করে পরম আনন্দে নাচছেন। নিত্যানন্দের পায়ের তালে তালে যেন পৃথিবী কেঁপে উঠছে, ভক্তগণ দেখে আনন্দে হরিধ্বনি করে উঠছেন। পরম ভক্ত সেবকগণকে নিয়ে দুই প্রভু প্রেমরসে মত্ত হয়ে নাচছেন। এসব লীলা তো আনাদি কাল থেকেই চলছে, বেদ তার মধ্যেই 'আবির্ভাব-তিরোভাব' বলছেন।

এইভাবে সারাদিন নৃত্য করে ভক্তগণকে নিয়ে গৌরহরি বসলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ হাতে তিনটি তালি দিয়ে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কয়েকটি কথা বললেন,—এই শ্রীনিত্যানন্দকে যে ভক্তি শ্রদ্ধা করে আমি সেই ভক্তি পাই, সে আমাকেই ভক্তি করে। ব্রহ্মাদি শিব পর্যন্ত এঁর চরণবন্দনা করেন, তাই তোমরাও সকলে এঁকে শ্রদ্ধা করবে। এঁকে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ করলেও, সে আমার ভক্ত হলেও আমার প্রিয় হতে পারবে না। এঁর গায়ের হাওয়া-মাত্র যাঁর গায়ে লাগবে শ্রীকৃষ্ণ তাকেও কোন প্রকারেই ছাড়বেন না, অবশ্যই কৃপা করবেন। প্রভুর কথা শুনে ভক্তগণ সকলে মিলে মহা জযধ্বনি করে উঠলেন। ভক্তি নিয়ে যিনি এসব কাহিনী শুনবেন গৌরচন্দ্র অবশ্যই তাঁর প্রভু হবেন। শ্রীনিত্যানন্দকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সকলেই এই বিষয়ে পুরোপুরিভাবে জানেন। চৈতন্যদেবের প্রিয় মহাভক্তগণ সকলেই নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রভাব জানেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ বিলক্ষণ জানেন যে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁদের পদপ্রান্তেই এইসব নিবেদন করছেন।

২/১৩ প্রভু বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে ক্রীড়া করছেন কিন্তু সকলেই তাঁর স্বরূপতত্ত্ব জানতে পারে না। সাধারণ লোকেরা প্রভুকে দেখে মনে করত, নিমাই পণ্ডিত আগে যেমন ছিলেন এখনও তেমনি আছেন, এমন কিছু পালটায় নি। অথচ ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রভু এলেই

প্রেমানন্দে ভাসতে থাকেন। ভক্তগণের মধ্যে যাঁর যেমন ভাগ্য প্রভু তাঁকে সেই পরিমাণেই দেখাতেন, বিশেষ কিছু বেরিয়ে পড়লেই প্রভু তা লুকিয়ে ফেলতেন, আত্মপ্রকাশ করতেন না।

একদিন হঠাৎ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসের প্রতি আজ্ঞা করলেন,—তোমরা দুজনে আমার আদেশ প্রচার করে দাও, আমার হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে এই মিনতি কর যে সকলে যেন শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে, হরিনাম সঙ্কীর্তন করে এবং কৃষ্ণভক্তি আচরণ করে। এছাড়া তোমাদের আর কোনো কাজ নেই, দিনের শেষে এসে আমাকে খবর দেবে। তোমাদের অনুরোধেও যে হরিনাম করবে না তাকে আমি চক্র দিয়ে বিনাশ করব। প্রভুর আজ্ঞা শুনে বৈষ্ণবগণ হাসছেন, তাঁর আদেশ অমান্য করবার ক্ষমতা কারো নেই। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে তক্ষুনি নিত্যানন্দ এবং হরিদাস আনন্দে পথে বেরিয়ে পড়লেন। নিত্যানন্দ যে-আজ্ঞা শিরোধার্য বলে মান্য করেন সেই কথায় যে অসন্তোষ প্রকাশ করে তাকে মূর্খ বলতে হয়। যে ব্যক্তি অদ্বৈতকে সেবা করে কিন্তু চৈতন্যকে মানে না, অদ্বৈত নিজেই তাকে সংহার করবেন। প্রভুর আজ্ঞা পেলে নিতাই-হরিদাস দুজনেই ঘরে ঘরে গিয়ে বলতে লাগলেন,—কৃষ্ণনাম কর, কৃষ্ণভক্তি আচরণ কর, কৃষ্ণকে ভজনা কর। কৃষ্ণই সকলের একমাত্র ধন-প্রাণ-জীবন সবই, তাই একমনে কৃষ্ণনাম কর। দুজনে মিলে নদীয়ার প্রতিটি ঘরে গিয়ে শুধু এই একটি কথাই বলছেন সকলকে ডেকে। দুজন সন্ন্যাসী বেশে যার ঘরেই যান সেই যথাশীঘ্র তাঁদের আহারের আমন্ত্রণ জানায়। নিত্যানন্দ হরিদাস দুজনেই বলেন,—আমরা আর কোনো ভিক্ষা চাই না, আমাদের একটি মাত্র ভিক্ষা যে তোমরা সকলে কৃষ্ণনাম কীর্তন কর, কৃষ্ণকে ভজনা কর এবং কৃষ্ণভক্তি চর্চা কর। এই কথা বলেই দুজন চলতে থাকেন, সাধুলোকেরা তাঁদের কথা শুনে মনে খুবই আনন্দ লাভ করেন। দুজনের মুখে এই অপূর্ব কথা শুনে নানা লোকে তাদের ইচ্ছা মত নানা কথা বলতে থাকে। কেউ কেউ খুশি হয়ে বলেন,—নিশ্চয় করব। কেউ কেউ বলে,—মন্ত্রের দোষে এরা দুজন পাগল হয়েছে, তোমরাও সেই মন্ত্রদোষে পাগল হবে, আমাদের আর পাগল করতে চেষ্টা করো না। যারা চৈতন্যদেবের কীর্তনে ঢুকতে পারে নি তাদের বাড়িতে গেলেই তারা তেড়ে আসে আর বলে,—গণ্যমান্য লোকেরাও দেখছি পাগল হয়েছে, নিমাই পণ্ডিতই নষ্টের গোড়া। কেউ বলে,—এই দুজন হয়তো চোরের চর, ভণ্ডামি করে ঘরে ঘরে এসব বলে বেড়াচ্ছে, ভদ্রলোক হলে এ রকম করবে কেন? তারা এলে ধরে দেওয়ানের কাছে নিয়ে যাব। এই সব কথা শুনে নিত্যানন্দ এবং হরিদাস দুজনেই মনে মনে হাসেন, শ্রীচৈতন্যের কাছ থেকে আজ্ঞা পেয়েছেন বলে তাঁরা আদৌ ভয় পাচ্ছেন না। এইভাবে তাঁরা ঘরে ঘরে বলে বেড়ান এবং প্রতিদিন বিশ্বম্ভরকে খবর দেন।

তাঁরা একদিন পথে দুজন মাতালকে দেখতে পেলেন, তারা ভীষণ দস্যু এবং সাঙ্ঘাতিক মদ্যপায়ী। তাদের কথা বলে শেষ করা যায় না। তারা করে নি এমন কোন পাপ নেই। ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়ে তারা মদ, গোমাংস খায়, সর্বদা চুরি-ডাকাতি, পরের ঘরে আগুন দেওয়া—এই সব করে বেড়ায়। তারা কখনো রাজদরবারে যায় না অথচ নিজেদের নগর-রক্ষক কোটাল বলে পরিচয় দেয। দুজনেই পথে পড়ে গড়াগড়ি দেয়, যাকে পায় তাকেই ধরে মারে। লোকেরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। হরিদাস ও নিত্যানন্দ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দুজন নেশাখোরের মধ্যে এই ভাবে আবার এই মারামারি চলছে।

চীৎকার দিয়ে অশ্রাব্য চকারাদি বকারাদি করে গালাগালি করে। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট করল, আবার মদের নেশাতেই কাউকে হয়তো খুব আশ্বাস দিয়ে বলে,—তোমার কোন ভয় নেই। সব রকম পাপ কাজই তারা করেছে কিন্তু বৈষ্ণবের নিন্দা করার কোনো সুযোগ তারা এযাবৎ পায় নি। যেখানে বৈষ্ণবের নিন্দা হয় সেখানে সব ধর্ম রক্ষা পেলেও তবু নিন্দকদের বিনাশ হবেই। সন্ন্যাসীরা যদি পরনিন্দা করেন, মদ্যপের কাজের চেয়েও তাঁদেরই বেশি অধর্ম হবে। মদ্যপ তবু কোন কালে একদিন নিষ্কৃতি পাবে কিন্তু পরনিন্দকের কখনো সদ্গতি হবে না। শাস্ত্রাদি পাঠ করেও কারো কারো যথার্থ জ্ঞান হয় নি, তারা নিত্যানন্দের নিন্দা করে, তাদের কিন্তু সর্বনাশ হবেই। ঐ দুজন লোক কিলাকিলি গালাগালি করেই চলেছে. নিত্যানন্দ এবং হরিদাস দূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন। উপস্থিত লোকদের কাছে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করছেন,—এরা কি জাতি? এ রকম করছে কেন? লোকেরা উত্তর দেয়,—দুজনই ব্রাহ্মণসন্তান। পিতা-মাতা সদাচার-পরায়ণ। উচ্চ বংশেই এদের জন্ম। এরা কয়েক পুরুষ ধরেই নবদ্বীপবাসী, ভাল বংশ। এ দুজন জন্ম থেকে ধর্মকর্মকে তুচ্ছ করে অসৎ কাজ করে বেড়াচ্ছে। এদের আত্মীয়-স্বজনেরাও এদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না, দূরে দূরে থাকে। নবদ্বীপের সকলেই এই দুজনকে খুবই ভয় করে। কবে কার ঘরে আগুন দেবে তার ঠিক কি? এরা কোন দুষ্কর্মই করতে ছাড়ে না। চুরি ডাকাতি করা মদ-মাংস খাওয়া—কিছুই বাদ নেই। করুণাবতার নিত্যানন্দ এই সব কথা শুনলেন। তাঁর মনে হল, এদের উদ্ধার করা দরকার। তিনি ভাবলেন,—পাপী-তাপীকে উদ্ধার করতেই তো প্রভু অবতার গ্রহণ করেছেন। এদের মত এত বড় পাপী আর কোথায় পাওয়া যাবে? প্রভু লুকিয়ে কেবল মাত্র ভক্তবৃন্দের কাছেই প্রকাশিত হন্। লোকেরা কিছুই না জেনে তাঁকে উপহাস করে। এই দুটোকে যদি প্রভু অনুগ্রহ করেন তাহলে জগৎবাসী দেখে বুঝতে পারে। এই দুজনকে যদি সৎপথে আনতে পারি তবেই আমি নিজেকে শ্রীচৈতন্যের দাস এবং নিত্যানন্দ বলে মনে করতে পারব। এখন এই দুজন যেমন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে নিজেদেরও ভুলে রয়েছে. যদি শ্রীকৃষ্ণনামে এই রকম মত্ত হয়ে নিজেদের ভুলে থাকে এবং তাঁরা যদি শ্রীচৈতন্যকে 'আমার প্রভু' মনে করে প্রেমাবেশে কাঁদে, তাহলেই আমার হরিনাম-প্রচারের ভ্রমণ সার্থক হয়। লোকেরা এদের ছায়া মাড়ালেও গঙ্গা-চান করে। সেই সব লোকেরা যখন এদের দুজনকে দেখলে গঙ্গা স্নান করার মত পুণ্য হয়েছে বলে মনে করবে তখনই কেবল আমি নিজেকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের দলে ধরতে পারব।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপার মহিমা, পতিতের ত্রাণ করার জন্যই তিনি অবতার গ্রহণ করেছেন। তিনি তাই হরিদাসকে বললেন,—দুজনের দুর্গতি একবার দেখ। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে অপকর্ম করে চলেছে। যমের কাছে এরা কিছুতেই পার পাবে না। যে যবনেরা তোমাকে প্রাণান্ত করতে মেরেছিল তাদের জন্যও তুমি ভগবানের কাছে মঙ্গলকামনা করেছ। তুমি শুভকামনা করলে এ দুজনও উদ্ধার পাবে। তোমার মনোবাঞ্ছা কখনো অপূর্ণ থাকতে পারে না. প্রভু নিজেই এই কথা বলেছেন। দুনিয়ার লোক প্রভুর প্রভাব দেখুন যে এমন দুজনকেও তিনি উদ্ধার করলেন। অজামিল-উদ্ধারের কথা পুরাণেই উল্লেখ আছে। আর এখন জগৎবাসী তা প্রত্যক্ষ করুক। হরিদাস-ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব ভালই জানেন, তিনি এবার বুঝতে পারলেন যে দুজনের উদ্ধারের আর বিলম্ব নেই। হরিদাস-ঠাকুর বললেন,—তোমার ইচ্ছাই প্রভুর ইচ্ছা। আমাকে বোকা পেয়ে

তুমি ফাঁকি দিচ্ছ, বারে বারে আমাকে পরীক্ষা করছ। হেসে নিত্যানন্দ তাঁকে আলিঙ্গন করে প্রীতি-স্নিগ্ধ স্বরে বললেন,—আমরা যে প্রভুর আজ্ঞা নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি, চল সেকথা গিয়ে এদের কাছে বলি। কৃষ্ণভজন করবার জন্য সকলের প্রতিই প্রভুর আদেশ, অত্যন্ত পাপীদের নিকট প্রভুর আদেশ প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন। বলবার দায়িত্বই আমাদের, বললেও যদি তারা নাম না নেয় তা দেখবার কাজ স্বয়ং ভগবানের। দুই মদ্যপকে এই কথা বলবার জন্য নিত্যানন্দ ও হরিদাস অগ্রসর হলেন। বিশিষ্ট লোকেরা বারণ করলেন,—ওদের কাছে যেও না। ধরতে পারলে প্রাণে মেরে দেবে। আমরাই খুব ভয়ে ভয়ে আছি, তোমরা কি সাহসে কাছে যাচ্ছ ? যারা অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা করেছে, তারা যে সন্ন্যাসী দেখে শ্রদ্ধা করবে এমন কথা মনেও স্থান দিও না। এসব সত্ত্বেও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে তাঁরা দুজনে অগ্রসর হলেন। কাছে গিয়ে প্রভুর আজ্ঞা জানিয়ে বললেন,—কৃষ্ণকে ভজনা কর, কৃষ্ণনাম নাও, কৃষ্ণভক্তি চর্চা কর, কৃষ্ণই মাতা-পিতা-ধনপ্রাণ সব। তোমাদের জন্যই কৃষ্ণের অবতার, সব অনাচার ছেড়ে তাই কৃষ্ণভজনা কর। এই কথা শুনে দুই পাষণ্ড মাথা তুলে তাকায়, রাগে দুজনেরই চোখ লাল। সন্ন্যাসীর চেহারা দেখে 'ধর ধর' বলে দুজনকে ধরতে যায়। নিত্যানন্দ-হরিদাস পিছিয়ে আসেন। 'দাঁড়াও' বলে দুই দস্যু ধেয়ে আসে। তাদের তর্জন গর্জন শুনে দুই প্রভু ভয়ে চলে আসেন। লোকেরা তখন বলল,—আগেই বুঝেছি যে আজ দুই সন্ন্যাসী বিপদে পড়লেন। পাষণ্ডীরা সকলে মনে মনে হাসছে আর বলছে,—ভগবান ভণ্ডদের উচিত শাস্তি দিয়েছেন। 'কৃষ্ণ, আমাদের রক্ষা কর' বলে সৎব্রাহ্মণেরা সে স্থান থেকে পালিয়ে গেলেন। দুই দস্যু দৌড়াচ্ছে, দুই ঠাকুরও পালাচ্ছেন। 'ধরলাম, ধরলাম,' বলে তাঁদের ওরা ধরতে পারছে না। নিত্যানন্দ বললেন,—ভালই বৈষ্ণব হবে এরা, আজকে এদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচলেই হয়। হরিদাস বলছেন,—আর কেন বলছ, তোমার কথায় আজ অপমৃত্যু হবে দেখছি। মাতালকে তুমি কৃষ্ণকথা শোনাতে গেছ, তার উচিত শাস্তি হবে, প্রাণ যাবে। এই বলে তিনি দৌড়াচ্ছেন, নিত্যানন্দও দৌড়াচ্ছেন। দুই দস্যুও পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে তর্জন গর্জন করে। দুই প্রভুই মোটা সোটা, তাঁরা গুণ্ডাদের মত দৌড়াতে পারছেন না। তবুও গুণ্ডাদের দেখে দৌড়ে পালাচ্ছেন। দুই দস্যু তখন বলছে,—এখন কোথায় যাবে ? জগাই-মাধাইর কাছ থেকে ছাড়া পাবে না। তোমরা জান না যে এখানে জগা-মাধা আছে ? পেছনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ না ! কথা শুনে দুই প্রভু খুবই ভয়ে ভয়ে আছেন, আর মনে মনে বলছেন,—হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, রক্ষা কর।

শ্রীহরিদাস বললেন,—আমি আর চলতে পারি না। আমি জেনেশুনেই চঞ্চলের সঙ্গে এসেছি। কাল যবনের হাত থেকে কৃষ্ণ রক্ষা করেছেন, আজ চঞ্চলের বুদ্ধিতে চলে প্রাণ হারাতে হচ্ছে। নিত্যানন্দ বললেন,—আমি কিছুই চঞ্চল নই। ভেবে দেখ, তোমার প্রভুই বড্ড ব্যাকুল। ব্রাহ্মণ হয়ে তিনি রাজার মত হুকুম করছেন, তাঁর কথাতেই আমরা ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁর নাম প্রচার করছি। তাঁর মত এমন ঢালাও হুকুম কেউ করবে না। তাঁর আজ্ঞা পালন না করলেও তিনি প্রাণে মারবেন আর পালন করতে গেলে তো এই হয়। তোমার প্রভুর আদেশের কথা আমরা দুজনেইতো প্রচার করেছি, আমি তো একা করিনি, এখন দোষ হল কি কেবল আমার ? দুজনের মধ্যে এই মজার ঝগড়া চলছে। জগা-মাধা পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে, নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভয়ে অস্থির।

তাঁরা দৌড়ে মহাপ্রভুর বাড়িতে চলে এসেছেন, মাতাল দুটো নেশার ঝোঁকে দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করতে লেগেছে। নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে দেখতে না পেয়ে মাতাল-দুটো নিজেদের মধ্যেই টুঁসোটুঁসি আরম্ভ করেছে। কোথায় ছিল, কোথায় এল, মদের নেশায় তারা কিছুই ঠাওর করতে পারল না। কিছু পরে দুই প্রভু পেছনে তাকিয়ে দেখলেন যে মাতাল দুটো কোথায় চলে গেল। সরে পড়েছে। তখন দুই প্রভু স্থির হয়ে কোলাকুলি করলেন এবং হাসিমুখে বিশ্বম্ভরের কাছে গেলেন। কমললোচন মদনমোহন সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ মহাপ্রভু বসে আছেন। চারদিকে বৈষ্ণবগণ রয়েছেন, পরস্পর কৃষ্ণকথা আলোচনা করছেন। মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের কাছে নিজতত্ত্ব প্রকাশ করে বলেছেন, দেখলে মনে হয় যেন শ্বেতদ্বীপ-পতি ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ সনকাদির সঙ্গে বিরাজিত। এমন সময়ে নিত্যানন্দ ও হরিদাস উপস্থিত হয়ে সারা দিনের ঘটনা জানাচ্ছেন,—আজ এক অবাক কাণ্ড হয়েছে, দুজন মহামাতালের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তারা আবার বলে—তারা নাকি ব্রাহ্মণ। তাদের দুজনকে কৃষ্ণনাম বলতে বলা হল, অমনি তারা এমন তেড়ে এল যে ভাগ্যে প্রাণে মাত্র বেঁচে আছি কোন রকমে।

প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—তারা কে? তাদের নাম কি? ব্রাহ্মণ হয়ে এমন কাজ করছে কেন? সেখানে গঙ্গাদাস পণ্ডিত এবং শ্রীনিবাস ছিলেন, তাঁরা মাতালদের অপকর্মের কথা সব বললেন,—ওদের দুজনের নাম হচ্ছে জগাই আর মাধাই। এক পরিবারেই জন্ম, দুজনই সৎব্রাহ্মণের ছেলে। অসৎ সঙ্গে পড়ে তাদের এমন অবস্থা হয়েছে, জন্মাবধি মদ ছাড়া আর কিছু চেনে না। সারা নদীয়ার লোক তাদের দুজনকে ভয় পায়, তারা প্রতিটি ঘরে চুরি-ডাকাতি করেছে। ও-দুটোর পাপের কথা বলে শেষ করা যায় না, তুমি স্বয়ং ভগবান, তুমি সবই জান। প্রভু বললেন,—জানি জানি, আমি সবই জানি। এখানে এলে ও-দুটোকে আমি টুকরো টুকরো করে ছাড়ব। নিত্যানন্দ বললেন,—তুমি টুকরো টুকরো কর আর যাই কর, ও-দুটো বেঁচে থাকতে আমি আর কোথাও নাম-প্রচারে যাব না। ও-দুটোর মুখে গোবিন্দ নাম নেওয়াতে না পারলে বৃথা বড়াই করে লাভ নেই। ধার্মিক লোকেরা স্বাভাবিক ভাবেই কৃষ্ণনাম নিয়ে থাকেন, ও-দুটো অপকর্ম ছাড়া কিছু জানে না। ও-দুটোকে যদি ভক্তি দান করা যায় তবেই পতিত পাবন নাম সার্থক। আমাকে উদ্ধার করে তোমার যে মহিমা প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি মহিমা প্রকাশ পাবে এ-দুটোকে উদ্ধার করলে। বিশ্বম্ভর হেসে বললেন,—ওরা যখন তোমার দেখা পেয়েছে তবে কি উদ্ধার না হয়ে থাকবে? তুমি যখন তাদের এমন মঙ্গল-চিন্তা করছ নিশ্চয় কৃষ্ণ তাদের কল্যাণ সাধন করবেন। শ্রীমুখের বাক্য শুনে ভাগবতগণ হরিধ্বনি-জয়ধ্বনি করে উঠলেন। সকলেই বুঝলেন, ও-দুটোর উদ্ধার হয়েই গেছে বলতে গেলে। শ্রীহরিদাস অদ্বৈতাচার্যকে বললেন,—নিত্যানন্দের মত চঞ্চল লোকের সঙ্গে প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি বা কোথায় থাকি সে বা কোথায় যায়। বর্ষায় নদীতে কুমীর সাঁতরিয়ে বেড়ায়, নিত্যানন্দ ঝাঁপ দিয়ে তাকে ধরতে যায়। পারে দাঁড়িয়ে আমি হায় হায় করে ডেকে মরি। সে তো মহানন্দে গঙ্গায় ভেসে চলেছে। যদি বা নদী থেকে উঠল আবার ছেলেদের সঙ্গে মারামারি আরম্ভ করে দিল। তাদের মা-বাবা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে, কোন রকমে পায়ে ধরে আমি তাদের ঠেকাই। গয়লাদের ঘি দই নিয়ে পালায়, তারা আমাকে মারতে আসে। এই রকম সব আজে বাজে কাজ করে, কুমারী মেয়েদের দেখলে বলে,—'আমাকে বিয়ে কর'। ষাঁড়ের পিঠে চড়ে বলে,—'আমিই

শিব'। লোকের গাইয়ের দুধ দুইয়ে খায় কখনো। আমি কিছু বলতে গেলে আমাকে বলে,—'তোর অদ্বৈত আমার কি করবে? এসব কথা তো আমি প্রভুকে কিছুই জানাই না, আর আজ যে কাণ্ড হয়েছে, সে তো কেবল দৈবের জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। দুই মহা মাতাল পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কাছে গিয়ে বলছে কৃষ্ণনাম নিতে। তারা তেড়ে এসেছে, কেবল তোমার আশীর্বাদে কোন রকমে বেঁচে গিয়েছি।

অদ্বৈতাচার্য হেসে বললেন,—এতে আর এমন আশ্চর্যের কি আছে? মাতালে মাতালে তো বন্ধুত্ব হবেই। তিন মাতাল জুটেছে, ঠিক আছে। তুমি নিষ্ঠাবান লোক তার মধ্যে গিয়েছ কেন? আমি ভালই জানি নিত্যানন্দ সকলকেই মাতোয়াল করে ছাড়বে। তুমি দেখো, দিন দু-তিনেকের মধ্যেই ঐ মাতাল দুটোকে সকলের মধ্যে এনে হাজির করবে। —বলতে বলতে অদ্বৈতাচার্য রেগে গেলেন এবং তিনি খুলে সব বলতে লাগলেন,—আমি শ্রীচৈতন্যের সব কৃষ্ণভক্তি শোষণ করে নেব, দেখি কি করে নাচে-গায়? দেখবে আগামী কালই ঐ মাতাল দুটোকে নিমাই আর নিতাই সঙ্গে করে নাচতে থাকবে। ওরা সব একাকার করে দেবে, চল—তুমি আর আমি দুজনে এসব উৎপাতের মধ্যে না থেকে পালিয়ে যাই। অদ্বৈতাচার্যের ক্রোধভাব দেখে হরিদাস হাসছেন, বুঝতে পারলেন যে মাতাল দুটো শীঘ্রই উদ্ধার পাবে। অদ্বৈতের কথা সকলেই ধরতে পারে না, হরিদাস কিন্তু বিলক্ষণ সেসব বুঝতে পারেন। এখন আবার অনেক পাপী অদ্বৈতের পক্ষ নিয়ে গদাধরকে নিন্দা করছে। যে পাপী এক বৈষ্ণবের পক্ষ নিয়ে অন্য বৈষ্ণবকে নিন্দা করে সে অবশ্যই পাপে ডুবে মরে।

সেই মাতাল দুটো ঘুরতে ঘুরতে প্রভুর স্নানের ঘাটে একদিন এসে উপস্থিত হয়েছে। ওখানে আড্ডা গেড়ে চারদিকে গালাগালি করে, ঝামেলা পাকায়। ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকলেই এদের উৎপাতের ভয়ে ভীত হয়ে আছে। সন্ধ্যাবেলা কেউ আর এখন গঙ্গাস্নানে যায় না, গেলেও দশ-বিশজন মিলে এক সঙ্গে যায়। এরা প্রভুর বাড়ির কাছে থেকে রাত্রে জেগে কীর্তন শোনে। কীর্তনের সঙ্গে মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে, এরা মদের নেশায় তা শুনে নাচে। দূর থেকে সব শোনে আর শুনে আরো বেশি করে মদ খায়। কীর্তন থামলে ওরাও থামে আবার কীর্তন শুরু হলে ওরা উঠে নাচতে থাকে। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে, কোথায় ছিল—কোথায় আছে, কোন হুঁশ নেই। প্রভুকে দেখে বলে,—নিমাই পণ্ডিত, পুরো মঙ্গলচণ্ডীর গান তো গাওয়ালে এবারে গায়কদের সব আমাদের একটু দেখাও। আমরা তাহলে যেখানে যা পাই সমস্ত এনে তোমাকে দেব। প্রভু এদের দেখে একটু দূরত্ব রেখেই চলেন, অন্য ভক্তগণ যে যার পথে পালিয়ে যান।

একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করে রাতে ফিরছিলেন, এমন সময় দুটোতে এসে তাঁকে ধরলে। জগাই মাধাই ডেকে হেঁকে বলে,—কেরে, কেরে? নিত্যানন্দ বলছেন,—প্রভুর বাড়িতে যাচ্ছি। মদের ঝোঁকে ওরা জিজ্ঞাসা করে,—তোর নাম কি? নিত্যানন্দ বললেন,—আমার নাম অবধূত। শ্রীনিত্যানন্দ বাল্যভাবের আবেশে মাতালদের সঙ্গে অনায়াসে কথা বলছেন। এই দুজনকে উদ্ধার করবার ইচ্ছা নিয়েই তিনি রাত করে এপথে ফিরছিলেন। অবধূতের নাম শুনেই মাধাই রেগে গিয়ে ঘড়া তুলে প্রভুর মাথায় মারল। ঘড়া মাথায় ফেটে গিয়ে মাথা বেয়ে বেগে রক্ত পড়তে লাগল, কিন্তু নিত্যানন্দ-প্রভু তখনও গোবিন্দকে স্মরণ করে চলেছেন। মাথায় রক্ত দেখে জগাইয়ের

দয়া হল। মাধাই আবার মারতে যাচ্ছিল, জগাই তখন বাধা দিল। বলল,—তুমি এমন নির্দয় কাজ করলে কেন? বিদেশী লোককে মেরে কি এমন বাহাদুরি দেখাচ্ছ? ছেড়ে দাও, অবধূতকে আর মেরো না। সন্ন্যাসীকে মেরে তোমার কি লাভ হবে?

তাড়াতাড়ি লোকেরা গিয়ে প্রভুকে এই খবর দিল। প্রভু ভক্তবৃন্দকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। নিত্যানন্দের গা বেয়ে রক্ত পড়ছে, কিন্তু তবু শ্রীনিতাই সেই দুই দস্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাসছেন। রক্ত দেখে প্রভুর আর বাহ্যজ্ঞান রইল না, তিনি 'চক্র চক্র' বলে বারে বারে আহ্বান করতে লাগলেন। শীঘ্র চক্র এসে উপস্থিত হল। জগাই মাধাই তা নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করল। ভক্তবৃন্দ প্রমাদ গুণছেন। নিত্যানন্দ তখন প্রভুকে বললেন,—প্রভু, মাধাই মারতে যাচ্ছিল, জগাই ঠেকিয়েছে। দৈবাৎ রক্তপাত হয়েছে, তাতে আমার দুঃখ নেই। এ দুটি শরীর আমাকে ভিক্ষে দাও। আমাব কোন দুঃখ নেই, তুমি স্থির হও।

জগাই নিত্যানন্দকে রক্ষা করেছে শুনে প্রভু জগাইকে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন,—কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করুন। নিত্যানন্দকে বাঁচিয়ে তুমি আমাকে কিনে নিয়েছ, তোমার যা ইচ্ছা তাই চাইতে পার। আজ থেকে তোমার প্রেমভক্তি লাভ হোক। জগাই বর পেয়েছে শুনে বৈষ্ণবগণ সকলে হরিধ্বনি জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। প্রভু যখনই বললেন,—তোমার প্রেমভক্তি হোক,—তখনই জগাই প্রেমে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। প্রভু বললেন,—জগাই তুমি উঠে দেখ, আমি সত্যি তোমাকে প্রেমভক্তি দান করলাম। জগাই দেখল, প্রভু বিশ্বম্ভর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করে চতুর্ভুজ হয়েছেন। দেখে জগাই আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ল। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তার বুকে শ্রীচরণের স্পর্শ দান করলেন। লক্ষ্মীদেবীর জীবন-ধন শ্রীচরণ লাভ করে জগাই যেন অমূল্য রত্নই পেল। ভাগ্যবান জগাই প্রভুর শ্রীচরণ ধরে কাঁদতে থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গের এই অপূর্ব লীলা চলছে।

জগাই মাধাই দুই দেহ হলে কি হবে, তাদের জীবন যেন একটাই। তাদের পাপ-পুণ্য, ওঠা-বসা সবই এক সঙ্গে। জগাইকে প্রভু অনুগ্রহ করা মাত্র মাধাইরও ভাবান্তর দেখা গেল। তখন মাধাই তাড়াতাড়ি শ্রীনিত্যানন্দের কাপড় ধরে শ্রীচৈতন্যের চরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ল। আর বলল,—প্রভু, আমরা দুজনে এক সঙ্গে পাপ কাজ করলাম আর এখন দয়া হয়ে হলাম দুভাগ! আমাকে অনুগ্রহ কর, আমি তোমার কাছে ঋণী থাকব, আমার মত লোককে আর কেউ উদ্ধার করবে না। প্রভু বললেন,—আমি তোমার পরিত্রাণের কোন রাস্তা দেখছি না, কারণ তুমি নিত্যানন্দের শরীরে রক্তপাত ঘটিয়েছ। মাধাই তখন বলল,—তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। তুমি তো তোমার নিজের ধর্ম অবশ্যই রক্ষা করে চলবে। অসুরেরা যখন তোমাকে বাণবিদ্ধ করল তখন তুমি তাদের শ্রীচরণে স্থান দিলে কি করে? প্রভু বললেন,—তার চেয়েও তোমার অপরাধ আরো বেশি। তুমি নিত্যানন্দের শরীরের রক্তপাত করেছ। আমার কাছে আমার নিজের দেহের চেয়ে নিত্যানন্দের দেহ অনেক বড় অত্যন্ত প্রিয়। তোমার কাছে এই একটি অতীব সত্য কথা বললাম। মাধাই বলল,—ঠাকুর, তুমি যখন সত্যই প্রকাশ করলে তবে আমাকে উপদেশ দাও, আমি কি করে উদ্ধার পাব। তুমি সব-রোগ-নাশ-করা চিকিৎসক, তুমি চিকিৎসা করলেই কেবল আমি সুস্থ হয়ে উঠতে পাবি। হে প্রভু জগতের নাথ, আমাকে ছলনা করো না। একবার প্রকাশিত হয়ে আর লুকুবে কি করে? প্রভু বললেন,—তুমি

নিত্যানন্দের কাছে সাঙ্ঘাতিক অপরাধ করেছ, তুমি গিয়ে তারই চরণে পড়। মাধাই তখন প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণে পড়ল। এই চরণ ধরলে তার কখনো কোন বিঘ্ন আসতে পারে না। বলরাম-প্রেয়সী রেবতীদেবী এই চরণের মাহাত্ম্য জানেন।

বিশ্বম্ভর বললেন,—শ্রীপাদ, কেউ যদি পায়ে পড়ে তাহলে তাকে কৃপা করাই উচিত। তোমার শরীরের রক্তপাত করেছে তাই একমাত্র তুমিই একে ক্ষমা করলে করতে পার। নিত্যানন্দ বললেন,—প্রভু আমি আর কি বলব? তুমি ইচ্ছা করলে গাছকে দিয়েও কৃপা করাতে পার। আমার যদি কোন জন্মের কোন সুকৃতি থেকে থাকে তাহলে আমি তা সবই মাধাইকে দান করলাম। কিন্তু অপরাধ কিছুই তাকে দিলাম না। তুমিই মাধাইকে কৃপা করতে পার, আর কেউ নয়। এখন তুমি কপটতা ছেড়ে তোমার মাধাইকে কৃপা কর। বিশ্বম্ভর বললেন,—যদি এর সব দোষ ক্ষমাই করলে, তাহলে একে এখন আলিঙ্গন কর। প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ মাধাইয়ের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন, তার ফলে মাধাইর সমস্ত ভববন্ধন খণ্ডন হয়ে গেল। নিত্যানন্দ মাধাইর দেহে প্রবেশ করলেন, মাধাই সর্বশক্তি সম্পন্ন হল। এইভাবে দুজনে মুক্তি পেয়ে দুই প্রভুর শ্রীচরণে স্তুতি প্রণাম করল।

প্রভু বললেন,—তোরা আর কোন পাপ কাজ করবি না। তখন জগাই মাধাই কথা দিল যে তারা আর জীবনে কোন পাপ কাজ করবে না। প্রভু বললেন,—তোমরা মন দিয়ে শোন। আমি বলছি যে কোটি কোটি জন্মে তোমরা যে পাপ করেছ, আর যদি পাপ না কর তাহলে সেসব দায়দায়িত্ব আমার। তোমাদের মুখে আমি আহার করব, তোমাদের দেহে আমি অবতীর্ণ হব। প্রভুর মুখের এই কথা শুনে জগাই-মাধাই আনন্দে সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তাদের মোহ কেটে গেছে। এখন এ দুই ব্রাহ্মণসন্তান আনন্দ সাগরে ভাসছেন বুঝতে পেরে প্রভু ভক্তগণকে বললেন, —এই দুজনকে তুলে আমার বাড়িতে চল। এদের সঙ্গে আজ কীর্তন করা হবে। ব্রহ্মারও যা দুর্লভ আজ এদের তাই দেব। এ দুজনকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করে তুলব। আগে যারা এদের দুজনকে ছুঁলেও গঙ্গা স্নান করত তারাই এখন বলবে,—এরা গঙ্গার তুল্য পবিত্র। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রতিজ্ঞা কখনো বৃথা যায় না। তোমরা নিশ্চিত জেনে রাখ যে নিত্যানন্দের ইচ্ছাতে এবং আমার ইচ্ছাতে কোনো প্রভেদ নেই।

বৈষ্ণবগণ সকলে মিলে ধরে জগাই-মাধাইকে প্রভুর বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ সকলেই প্রভুর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর দরজা বন্ধ হল। আর কেউ ভেতরে যেতে পারল না। প্রভু বিশ্বম্ভর এসে বসলেন, দুপাশে নিত্যানন্দ এবং গদাধর। সামনে বসেছেন অদ্বৈতাচার্য। চারদিকে বসেছেন বৈষ্ণববৃন্দ। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীহরিদাস, গরুড়াই, রামাই, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য,—এরা সকলেই শ্রীচৈতন্যের কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত আছেন। মহাভাগবতগণ সকলেই শ্রীচৈতন্য এবং জগাই-মাধাইকে ঘিরে বসে আছেন। জগাই মাধাইয়ের শরীরে লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু এবং কম্প দেখা যাচ্ছে, তাঁরা গড়াগড়ি যাচ্ছেন। মহাপ্রভুর শক্তি কে বুঝতে পারে? দুই দস্যু এখন দুজন মহাভক্ত হয়ে গেলেন। আবার দেখা যায় তাঁরই ইচ্ছায় কখনো কখনো তপস্বী সন্ন্যাসীও পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাঁর অমৃতলীলা-রহস্য বুঝতে পারা যায় না। এতে যার বিশ্বাস হয় সেই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারে, সন্দেহ হলেই অধঃপাতে যায়।

জগাই-মাধাই দুজন স্তুতি করছেন, সকলের সঙ্গে গৌরাঙ্গসুন্দর তা শুনছেন। প্রভুর আজ্ঞায় বিশুদ্ধা সরস্বতী দেবী তাদের জিহ্বায় অধিষ্ঠান করছেন। ভাগ্যবান জগাই-মাধাইর সামনে দুই প্রভুর স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশিত হল এবং নিজেদের দুজনের স্বরূপতত্ত্বও তাঁরা দেখতে পেলেন। দর্শন লাভ করে তারা সেভাবে স্তুতি করতে লাগলেন। এই স্তুতি শুনলে কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায়। মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরের জয়, তাঁকে যিনি ধারণ করেন সেই নিত্যানন্দের জয়। প্রভু নিজনামগানে আনন্দ পান, চৈতন্যের সব কাজই নির্বাহ করেন নিত্যানন্দ। শচী-জগন্নাথের পুত্র, করুণাসিন্ধু, রাজপণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামী, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, অদ্বৈত-জীবন, গদাধরের প্রাণ, মুরারির ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যের অশ্রয়, চৈতন্যের বন্ধু, কৃপাময় কলেবর, বৈষ্ণবাধিরাজ, প্রভুর অভিন্নকলেবর অবধূতশ্রেষ্ঠ, সহস্রবদন, হরিদাস-বাসুদেবের প্রিয়কার্যকারী শ্রীনিত্যানন্দ। বিভিন্ন অবতারে যত পাপীকে উদ্ধার করেছ, পৃথিবীতে অদ্ভুত কাজ বলে সকলে জানে, কিন্তু আমাদের মত দুজন পাপীকে উদ্ধার করে তোমার আগের মহিমাও ছাড়িয়ে গেছে। অজামিল উদ্ধারের গুরুত্বও এবারে কমে গেল। আমরা স্তুতি করে বলছি না, সত্যি বলছি, অজামিল মুক্তি পেতেই পারত কারণ, কোটি ব্রহ্মবধের পাপ করেও তোমার নাম নিলে তার সদ্য মোক্ষ লাভ হয়—এই শাস্ত্রের কথা। তাই অজামিল তোমার নাম নিয়ে মুক্তি পেয়েছে—সেটা এমন বিশেষ কিছু নয়। শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করার জন্যই তোমার অবতার, অজামিলকে উদ্ধার না করলে যে শাস্ত্রই মিথ্যে হয়। তোমার অতি প্রিয় নিত্যানন্দের শরীরে আমি আঘাত হেনেছি তবু তুমি আমাদের উদ্ধার করলে। তাই বলছি অজামিলের এবং আমাদেব মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। অজামিলের মুখে নারায়ণ নাম শুনে চারজন বিষ্ণুদূত এসেছিলেন, অজামিল তাঁদের দর্শন পেয়েছেন। আর আমরা তোমাব প্রিয়বরের অঙ্গে রক্তপাত করে তোমাকে সাঙ্গোপাঙ্গ, পারিষদ এবং অস্ত্র সহ দেখতে পেলাম। তুমি তোমার এসব মহিমা গোপন করে রেখেছিলে, এখন তা প্রকাশ পেয়েছে, যাদের কোন সাধন নেই তেমন লোকদেরও উদ্ধার করলে। একেই বলে 'নির্লক্ষ্য উদ্ধার'। কংস ইত্যাদি দৈত্যগণও তোমার বিরুদ্ধতা করে মুক্তি পেয়েছে। তারাও সর্বদা তোমার কথা নিরন্তর মনে মনে ভেবেছে। তারা মৃত্যু পর্যন্ত তোমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। সবংশে নিহত হয়ে তোমাকে পেয়েছে। কোন মহাজন তাদের স্পর্শও করেন নি। কিন্তু আমাদের ছায়ামাত্র ছুঁয়ে যারা গঙ্গাস্নান করতেন সেই সব মহা মহা ভক্তগণ এখন আমাকে স্পর্শ করছেন। তাই বলি, তোমার এই মহিমা সব চাইতে শ্রেষ্ঠ, সবাই ভাল রকমে জেনে গেছে, এখন আর তুমি কাকে ঠকাবে? মহাভক্ত গজরাজ একান্ত শরণ নিয়ে তোমার স্তব করাতে তুমি তাকে মুক্ত করেছ। সৌভাগ্যের ব্যাপারে পুতনা রাক্ষসী, অঘ-বক ইত্যাদি অসুরদের সীমাও আমরা পার করে এসেছি। তারাও দেহ ছেড়ে দিব্যগতি লাভ করেছে তা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে কিন্তু আমরা দুই পাপী এই শরীরেই যা করলাম তা সমস্ত সংসার দেখেছে। তুমি যত পাপীতাপীই উদ্ধার করেছ তাদের সকলেরই কোন উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু আমাদের মত দুইজন ব্রহ্মদৈত্যকে উদ্ধার করেছ তা হচ্ছে নির্লক্ষ্য উদ্ধার। এই সব কথা বলে বলে জগাই-মাধাই কাঁদছেন, এই হল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপূর্ব মহিমা। উপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণবগণ এ সব দেখে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে স্তুতি করতে লাগলেন,—এই দুই মাতাল তোমার যে স্তুতি করল তা কখনো তোমার কৃপা না হলে পারত না। তোমার অচিন্ত্য শক্তি কেউ

বুঝতে পারে না। তুমি যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা যে কোন রূপে কৃপা করে থাক। প্রভু বললেন,—এরা এখন থেকে আর মাতাল নয়। এরা দুজন আজ থেকে আমার সেবক। সকলে মিলে এই দুজনকে অনুগ্রহ কর যেন আর কোন জন্মে আমাকে না ভুলে থাকে। এরা তোমাদের কাছে যা কিছু অপরাধ করেছে তোমরা এদের দুজনকে সেই অপরাধ ক্ষমা করে দাও, আশীর্বাদ কর।

জগাই-মাধাই প্রভুর কথা শুনে সেখানে সকলের পা ধরে পড়ল। সকল বৈষ্ণবগণ আশীর্বাদ করলেন, জগাই-মাধাইয়ের পাপ কেটে গেল। প্রভু বললেন,—জগাই-মাধাই, তোমরা ওঠ, আজ থেকে আমার ভক্ত হলে। আর চিন্তা নেই। তোমরা দুজনে যে স্তব করেছ তা অতি সত্য, কারো পক্ষে তা খণ্ডন করবার উপায় নেই। সশরীরে কেউ এমন গতি লাভ করতে পারে না, একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাতেই তোমাদের এ সৌভাগ্য হল। তোমাদের সব পাপ আমি নিলাম, তা তোমরা সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ কর। দুজনের শরীরে যে আর পাপ নেই তা বুঝাবার জন্য প্রভু কালো হয়ে গেলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করছেন,—তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? অদ্বৈতাচার্য বললেন,—আমরা যেন শ্যামসুন্দর গোকুলচন্দ্রকেই দেখছি। অদ্বৈতের উপস্থিত বুদ্ধিতে বিশ্বম্ভর হাসলেন, ভক্তগণ সকলে হরিধ্বনি করে উঠলেন। প্রভু বললেন,—এ দুজনের পাপ নিয়েছি বলে আমাকে কালো দেখছ। তোমরা কীর্তন কর, এই পাপ নিন্দকদের দেহে চলে যাবে। প্রভুর বাক্য শুনে সকলে উল্লসিত হয়ে মহানন্দে কীর্তন শুরু করে দিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে নাচছেন, বৈষ্ণবগণ তাঁদের ঘিরে কীর্তন করছেন। অদ্বৈতপ্রভুর কারণেই মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই অদ্বৈতও নাচছেন। সকলেই করতালি দিয়ে নাচছেন, আনন্দে গাইছেন। আনন্দের আবেশে কারো ভয় নেই, প্রভুর সঙ্গে যে ঠেলাঠেলি হচ্ছে তাও কারো খেয়াল নেই।

শচীমাতা পুত্রবধূকে নিয়ে ঘরের ভেতর থেকে এসব লক্ষ্য করছেন আর তাঁর মন আনন্দে ভরে যাচ্ছে। সকলেই মহানন্দে মত্ত, সকলেই কৃষ্ণ-আবেশে উল্লসিত। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীদেবী যাঁর অঙ্গ স্পর্শ করতে ভয় পান সেই প্রভুর গা- ঘেঁসে আজ মাতাল দুটি নাচছে। শ্রীচৈতন্য মদ্যপকে উদ্ধার করলেন কিন্তু বৈষ্ণবনিন্দকদের স্থান কুম্ভীপাক নরকে। নিন্দায় কখনো ধর্ম হয় না বরং পাপই বাড়ে, তাই ভাগবতগণ কখনো নিন্দা করেন না। দুই দস্যুকে দুজন মহাভক্তে পরিণত করে মহাপ্রভু পার্ষদবৃন্দের সঙ্গে নেচে চলেছেন। নৃত্যের আবেশেই প্রভু বলেন এবং বৈষ্ণবগণ চারদিকে ঘিরে থাকলেন। সকলের গায়েই প্রচুর ধুলো, তবু তাঁদের মনে হচ্ছে সবার গা-ই পরিচ্ছন্ন, নির্মল। প্রভু আবার আগের মত স্বাভাবিক হয়ে সকলকে বললেন,—এ দুজনকে আর তোমরা পাপী বলে মনে করবে না। এদের পাপ আমি নিজে নিয়ে নিয়েছি, সকল জীবের দেহে আমিই চলি ফিরি খাই, মৃত্যু হলে আমি চলে যাই। সামান্য আঘাত পেলেও মানুষ কষ্ট পায় কিন্তু আমি চলে গেলে সেই দেহ পোড়ালেও সে টের পায় না। আমি কবি, আমি কর্তা—এই অহঙ্কারের জন্যই জীব দুঃখ পায়। আজ পর্যন্ত এরা দুজনে যত পাপ কাজ করেছে আমি তা থেকে এদের অব্যাহতি দিলাম। এই কথা ভেবে তোমরা এই দুজনকে তোমাদের সঙ্গে অভেদ দৃষ্টিতে দেখবে। আমার ভক্তগণ এবার আমার একটি কথা মন দিয়ে শোন। এই দুজনকে শ্রদ্ধা করে যে সেবা করাবে সে এমনই ফল পাবে যে কৃষ্ণের মুখে সারা পৃথিবীর সমস্ত

মধু দিলে যে কৃষ্ণভক্তিরস পাওয়া যায় এদের মুখে সামান্য কিছু মাত্র দিলেই সেই ফল লাভ হবে। জগাই-মাধাইকে শ্রদ্ধা না করে এদের উপহাস করলে সেই অপরাধে তার সর্বনাশ হবে।

বৈষ্ণবগণ এই কথা শুনে মহাপ্রেমে কাঁদতে থাকেন এবং জগাই-মাধাইকে প্রণাম করেন। প্রভু আবার বলছেন,—ভক্তগণ, তোমরা শোন। চল সকলে মিলে গঙ্গায় যাই। তারপর সকলে মিলে গঙ্গায় নেমে ছেলেদের মত হুড়োহুড়ি করে জল ছিটিয়ে স্নান করলেন। বিষ্ণুভক্তির প্রভাবে মহা ভব্য বৃদ্ধও যেন চঞ্চল মতি শিশুর তুল্য হয়ে গেছেন। গঙ্গাস্নান মহোৎসব কীর্তনের শেষে আনন্দে আবেশে সকলেরই যেন প্রভু-ভৃত্য-বুদ্ধি চলে গেল। মহাপ্রভু সকল বৈষ্ণবের গায়ে জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন, তারাও দিচ্ছেন কিন্তু প্রভুর সঙ্গে কেউ পেরে উঠছেন না, তাই সকলে হেসে হেসে পালাচ্ছেন। প্রভুর সঙ্গে জলযুদ্ধ করে সকলেই পিছিয়ে গেলেন। এই ভক্তগণের মধ্যে ছিলেন অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, মুকুন্দ, শ্রীগর্ভ, সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান, পুরুষোত্তমসঞ্জয়, বুদ্ধিমন্তখান, বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস,জগদীশ, গোপীনাথ, গদাধর, গরুড়, শ্রীরাম, গোবিন্দ, শ্রীধর, কৃষ্ণানন্দ, কাশীশ্বর, জগদানন্দ, গোবিন্দানন্দ, শুক্লাম্বর,—বহু বহু চৈতন্যভক্ত, কত জনের আর নাম বলা যায়। সকলেই মহানন্দে জলকেলিতে যোগ দিয়েছেন, কেউ জেতেন—কেউ হারেন। গদাধর এবং গৌরাঙ্গ—ওদিকে নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতের মধ্যে জলকেলি হচ্ছে। নিত্যানন্দ একবার খুব জোরে অদ্বৈতের চোখে জল ছিটিয়ে দিলেন। অদ্বৈত চোখ মেলতে না পেরে খুব রেগে গিয়ে নিত্যানন্দকে গালাগালি করতে লাগলেন,—মাতাল নিত্যানন্দ আমার চোখ কানা করে দিল, এটা কোথা থেকেই বা এল ? আসলে শ্রীনিবাস পণ্ডিতেরই জাতির ঠিক নেই, তাই কোথা থেকে একটা অবধূতকে এনে জায়গা দিয়েছে। শচীর ছেলেটা সবই করতে পারে, সব সময় অবধূতের সঙ্গে কাটায়। —নিত্যানন্দ শুনে বললেন,—তোমার কি বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই ? হেরে গিয়ে এখন ঝগড়া পাকাচ্ছ। শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন,—এক বারে হারজিত বোঝা যায় না, তিন বার হলে তবে ঠিকমত বুঝতে পারি। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই দুই স্বরূপে একই দেহ অবস্থিত, তাঁরা আবার জলযুদ্ধ করতে লাগলেন। কেউ হারতে রাজি নন্, একবার ইনি জেতেন তো আর একবার উনি জেতেন। একবার সুযোগ বুঝে নিত্যানন্দ অদ্বৈতের চোখে খুব জোরে জল ছিটিয়ে দিলেন। অদ্বৈতের চোখে খুবই চোট লেগেছে, তিনি রেগে গিয়ে বললেন,—এটা একটা মাতাল, সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী কিছু নয়, না হলে এভাবে ব্রাহ্মণকে মারতে চায় ? পশ্চিমে যার-তার ঘরে খেয়েছে, কুল-জন্ম-জাতির কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। মা-বাবা-গুরু কে কিছুই জানি না, সবই খায়, সবই পরে আর বলে 'অবধূত'। নিন্দার ছলে নিত্যানন্দের স্তব শুনে প্রভু পার্ষদগণ সহ হাসছেন। —আমি সকলকে সংহার করব, আমার কোন দোষ নেই, —এই কথা বলে অদ্বৈতাচার্য জলে ঝাঁপ দিলেন। আচার্যের ক্রোধে ভাগবতগণ হাসছেন। শুনতে মনে হয় গালাগালি কিন্তু আসলে তিনি নিত্যানন্দের স্বরূপতত্ত্বই বলেছেন। এই কলহ-রসের মর্ম না বুঝে যে নিন্দা কিংবা প্রশংসা করে সে নরকের আগুনে পুড়ে মরে। গৌরচন্দ্র যাঁকে কৃপা করেন তিনি এই বৈষ্ণববাক্য অবশ্যই বুঝতে পারেন। কতক্ষণ পরে সেই দুই মহারঙ্গ-প্রিয় নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত পরস্পরকে প্রীতিভরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দু জনই গৌরপ্রেমের

রসাস্বাদনে অত্যন্ত প্রেমোন্মত্ত। নিত্যানন্দ তো সর্বদাই গঙ্গায় ভাসছেন। রোজই রাতে কীর্তনের শেষে প্রভু দলবল নিয়ে গঙ্গায় জলকেলি করেন। মানুষের পক্ষে এসকল লীলা দর্শন করা অসম্ভব, দেবতারা গোপনে দর্শন করেন। সদলবলে গৌরচন্দ্র গঙ্গাস্নান করে উঠে উচ্চস্বরে হরিধ্বনি করেন। প্রভু সকলকেই প্রসাদী মালা চন্দন দিলেন, তখন সকলে ভোজন করতে চলে গেলেন। জগাই-মাধাইকে প্রভু সকল বৈষ্ণবগণের হাতে সমর্পণ করলেন এবং তাদের দুজনকে নিজের গলার মালা খুলে দিলেন। শাস্ত্রে আবির্ভাব তিরোভাব বলে বটে কিন্তু এসমস্ত লীলার কখনো শেষ নেই।

মহাপ্রভু ঘরে ফিরে এসে পা ধুয়ে তুলসীর চরণবন্দনা করলেন। তারপর খেতে বসলেন, শচীমাতা পরিবেশন করছেন। সকল ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়ন করে প্রভু ভোজন শুরু করলেন। পরম সন্তোষে মহাপ্রসাদ খেয়ে মুখশুদ্ধি করতে বসলেন। শচীদেবী এবং বৌমা আনন্দে তা চোখ ভরে দেখছেন। সহস্রবদন অনন্তদেবই একমাত্র শচীমাতার ভাগ্যের সীমা বর্ণনা করতে পারেন, আর কেউ নয়। জাগতিক বিষয়ের কথাবার্তাতেও যে তাঁকে মা-বলে ডাকা হয় তাতেই তিনি পরিতুষ্ট। পুত্রের চন্দ্রবদন দেখে আনন্দের পরম আবেশে শচীমাতা নিজের দেহজ্ঞানও যেন হারিয়ে ফেলছেন। বিশ্বম্ভর শুতে চলে গেলেন, তখন গুপ্তভাবে দেবতারাও বিদায় নিলেন। ব্রহ্মা শিব প্রমুখ দেবগণ রোজই এসে চৈতন্যমহাপ্রভুর সেবার কাজে যোগদান করেন। তাঁর আজ্ঞাছাড়া কেউ এসব দেখতে পায় না। প্রভুই অনুগ্রহ করে কারো কারো কাছে তা বলেন।

একদিন হয়তো বিশ্বম্ভর বসে আছেন, এমন সময় কোন একজন লোক এল। প্রভু বললেন,—ওখানেই দাঁড়াও, এগিয়ো না। চতুর্মুখ পঞ্চানন এঁরা যে প্রণাম করে রয়েছেন দেখতে পাচ্ছ না? ভক্তবৃন্দ হাত জোড় করে বলেন,—প্রভু, ত্রিভুবন তোমার সেবা করে, তুমি যদি শক্তি না দাও আমরা তা কি করে দেখতে পাব! শ্রীচৈতন্যের এসব অদ্ভুত গুপ্ত কথা শুনলে নিশ্চয় সর্বসিদ্ধি হয়। এতে যেন মনে কোন সন্দেহ না থাকে যে ব্রহ্মা-শিবাদি রোজই গৌরাঙ্গের কাছে আসেন। এভাবেই জগতের প্রাণ শ্রীগৌরচন্দ্র জগাই-মাধাইকে পরিত্রাণ করলেন। বৈষ্ণব-নিন্দকদের ছাড়া আর সকলেই গৌরসুন্দর উদ্ধার করবেন। মহাদেবের মত প্রভাবশালী কেউ যদি ভক্তের নিন্দা করে তাহলে অচিরেই যে তার সর্বনাশ হয় শ্রীভাগবতে তার প্রমাণ আছে। ভরতকে রাজারহূগণ বলেছিলেন,—আমার মত কোনও লোক, মহাদেবের মত প্রভাবশালী হলেও, যদি কোন পরম ভক্তের অবমাননা করে তাহলে শীঘ্রই বিনষ্ট হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কোন মূর্খ যদি বৈষ্ণব-নিন্দা করে তাহলে তার অধঃপাত হবেই,—সর্বশাস্ত্রই তা বলে। সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে কৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠ কিন্তু বৈষ্ণবের কাছে অপরাধ করলে তাতেও রক্ষা নেই। পদ্মপুরাণের উপদেশ মেনে চললে প্রেমভক্তি লাভ হতে পারে। যথা,—সাধুরাই জগতে কৃষ্ণনাম প্রচার করেছেন, সেজন্যই কৃষ্ণনাম সাধুদের নিন্দা সহ্য করতে পারেন না। কৃষ্ণনামের কাছে বৈষ্ণবনিন্দা সাঙ্ঘাতিক অপরাধ বলে গণ্য।

জগাই-মাধাই উদ্ধার-কাহিনী যে শোনে গৌরচন্দ্র তাকে উদ্ধার করেন। পরম-সদয, করুণাসাগর, ব্রহ্মদৈত্য-পাবন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের জয় হোক। স্বরূপতই করুণাসিন্ধু মহাকৃপাময় প্রভু কারো দোষ বিচার করেন না, কেবলমাত্র গুণই গ্রহণ করেন। এমন প্রভুকে না দেখেও যে প্রাণে বাঁচা যায় তা কেবল পরমায়ুর জোরে আর কিছু নয়। প্রভু, তুমি এই কৃপা কর যেন মুখে তোমার যশ কীর্তন করি এবং কানে তোমার যশ

শুনি। গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই প্রার্থনা জানাচ্ছেন, তাঁর প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যেখানে অবস্থান করেন তিনি যেন সেখানে তাঁর অনুচর হয়ে থাকতে পারেন। চৈতন্যকথার আদি-অন্ত তিনি জানেন না, বিনয়-বচনে বলছেন,—যে কোন প্রকারে তিনি চৈতন্যের যশ বর্ণনা করছেন। এতে যেন তাঁর কোন অপরাধ না হয়—সপরিকর প্রভুর পাদপদ্মে নমস্কার করে তিনি এই প্রার্থনা জানাচ্ছেন তাঁদের শ্রীচরণে।

২/১৪ ব্রহ্মা-শিব প্রমুখ দেবগণ রোজই এসে শ্রীচৈতন্যের সেবার কাজ করে যান। প্রভুর আজ্ঞা ছাড়া তা কেউ দেখতে পায় না, তাঁরা বারংবার এসে ঠাকুরের পরিকরগণের সেবা করেন। তাঁরা সারাদিন ধরে প্রভুর সমস্ত লীলা দর্শন করেন এবং প্রভু শুয়ে পড়লে তাঁরা চলে যান। ব্রহ্মদৈত্যের সমান দুই অসুরের উদ্ধার-কাজ দেখে তাঁরা আনন্দে চলে যাচ্ছেন এবং ভাবছেন,—শ্রীচৈতন্য এমনই করুণাবতার যে ঐ দুজন দস্যুকেও তিনি উদ্ধার করলেন। এতে একটা ভরসা পাওয়া গেল যে সকলেই উদ্ধার পেয়ে যাবে। এসব কথা আলোচনা করতে করতে দেবগণ মহানন্দে চললেন। ধর্মরাজ যম রোজ প্রভুর কাছে আসেন এবং তাঁর কাজ নিজের চোখে দেখে যান। যম চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করলেন,—জগাই-মাধাই কি কি পাপ করেছে? এদের কি রকম শাস্তি হতে পারত? চিত্রগুপ্ত বললেন,—ধর্মরাজ, আর বৃথা পরিশ্রমের কি দরকার? এক লক্ষ রাজকর্মচারী একমাস ধরে পড়েও এদের পাপের কথা শেষ করতে পারবে না। তুমি এক লক্ষ কানে শুনলেও তার শেষ হবে না। দূতেরা রোজই এসে এদের পাপের কথা জানাত, কর্মচারীরা লিখতে লিখতে ক্ষেপে যেত, রাগ করত। এই দুজনের পাপের কথা সব সময় জানায় বলে দূতেরা রাজকর্মচারীদের কাছে কত মারধোর খেয়েছে। দূতেরা বলত,—ওরা পাপ করে, আমাদের কাজ জানানো, আমাদের মারছ কেন? না জানালে তো আমরাই শাস্তি পাব তাই জানাই, লিখে লিখে পর্বতপ্রমাণ খাতাপত্র হয়েছে—দেখতেই পাচ্ছ। আমরা পর্যন্ত এদের জন্য কত কেঁদেছি যে এরা এসে কি করে এত শাস্তি সহ্য করবে! অথচ মহাপ্রভু চোখের নিমেষে তাদের সব অপরাধ ক্ষমা করলেন, এখন হুকুম কর—খাতাপত্রের পাহাড় জলে ডুবিয়ে দিই। যুগে যুগে কত পাপী তাপী উদ্ধার হয়েছেন কিন্তু এমন অসীম উদ্ধার-লীলা যম কদাপি দেখেন নি। যমরাজ স্বভাবতই বৈষ্ণব, তিনি মূর্তিমন্ত ধর্ম, ভাগবত-ধর্মের সকল মর্ম তিনি জানেন। চিত্রগুপ্তের কথা শুনে তিনি কৃষ্ণ-আবেশে দেহ-বুদ্ধি ভুলে গেলেন। রথের উপরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন, শরীরে প্রাণ নেই মনে হল। চিত্রগুপ্ত প্রমুখ তাঁর কর্মীবৃন্দ তাঁকে ধরে কাঁদতে লাগলেন। প্রভুর লীলা দর্শন করে সমস্ত দেবগণ নিজেদের রথে চড়ে কীর্তন করতে করতে চলে গেলেন, কেবলমাত্র যমরাজই শোকাকুল হয়ে রথে বসে আছেন। দুই ব্রহ্মদৈত্যের মুক্তি দেখে গুণকীর্তন করতে করতে সকলে চলে গেলেন। শঙ্কর-বিরিঞ্চি-অনন্তদেব এবং নারদ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মুনিগণ সকলেই এই দুজনের উদ্ধার-কাহিনী আলোচনা করতে করতে চলেছেন। দেবতারা সকলেই কীর্তনের আনন্দে মেতে আছেন। কেউ কারো খবর রাখেন না। গৌরের করুণা দেখে কেউ কেউ কাঁদছেন। দেবগণ দেখছেন যে যমরাজার রথও দাঁড়িয়ে রয়েছে। যমরাজার রথের কাছেই অন্যান্য দেবতাদের রথও অপেক্ষা করছে। অনন্তনাগ, অজ, ভব, নারদাদি ঋষিবর্গ সকলেই দেখছেন যে যমরাজ অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। সকলেই বিস্মিত, কেউ কারণ জানেন না। চিত্রগুপ্ত সব বললেন। কৃষ্ণ-আবেশে যমরাজ অচৈতন্য হয়ে

আছেন জেনে ব্রহ্মা শিব প্রমুখ দেবগণ তাঁর কানের কাছে সকলে মিলে নাম কীর্তন করতে লাগলেন। কীর্তনের শব্দে যমরাজ জ্ঞান পেয়ে উঠে মহামত্ত হয়ে নাচতে লাগলেন। পরমানন্দ দেবকীর্তন আরম্ভ হয়েছে, যমরাজ কৃষ্ণের আবেশে নাচতে থাকেন। যমরাজের নৃত্য দেখে সব দেবতারাই নাচতে লাগলেন, সঙ্গে ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি সকলেই নাচতে থাকেন। অতি সাবধানে দেবগণের নৃত্যকথা শোনা উচিত। এই অতি গুহ্য তত্ত্ব বৈদিক শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হয়েছে।

ধর্মরাজ যম সব কাজ ছেড়ে আত্মভোলা হয়ে কৃষ্ণ-আবেশে নেচে চলেছেন। প্রভু যে পতিত লোকদের উদ্ধার করেছেন, এই কীর্তিই তাঁর জয়পতাকা তুল্য। যমরাজের নানা ভাব উপস্থিত হচ্ছে। তিনি পুলকিত প্রেমে হুঙ্কার-গর্জন করছেন। জগাই-মাধাইকে স্মরণ করে তিনি বিহ্বল হয়ে ক্রন্দন করছেন। যমের অনুচরেরা তাঁর প্রেমভাব দেখে আনন্দে গড়াগড়ি করছে, চিত্রগুপ্তের কৃষ্ণপ্রতি বড়ই অনুরাগ, তিনি মালকোচা মেরে দৌড়াদৌড়ি করছেন। মহাদেবও কৃষ্ণাবেশে দিগম্বর হয়ে নাচছেন, তাঁর বসনের খোঁজ নেই। সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহাদেব তারক রাম-নাম কীর্তন করে জগতকে ধন্য করছেন। মহাদেব নিজপ্রভুর মহিমা দেখে মহানন্দে নাচছেন, তিনি তাঁর জটা বাঁধতে ভুলে গেছেন। কার্ত্তিক-গণেশও তাঁর পেছন পেছন নাচছেন মহাপ্রভুর অপূর্ব দয়ার কথা মনে করে। মহাভক্ত ব্রহ্মাও সপরিবারে নৃত্য করছেন,—কশ্যপ, কর্দম, দক্ষ, এবং মনু-ভৃগু প্রমুখ মহা মহা ঋষিগণ ব্রহ্মার পেছন পেছন নাচছেন। মহা ভাগবতগণ সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়ে কৃষ্ণকথা প্রচার করছেন, প্রভুর করুণার কথা ভেবে ব্রহ্মার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কেউ কেউ কাঁদছেন। দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করছেন, তিনি প্রভুর অসীম যশের কথায় নিজের বীণাটি পর্যন্ত ভুলে গিয়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রিয়ভক্ত শুকদেব ভক্তির মহিমা ভালই জানেন, তিনিও নৃত্য করছেন, তিনি 'জগাই-মাধাই' বলে লুটিয়ে পড়ে দণ্ডবৎ-প্রণাম করছেন। মহাবীর বজ্রধর সুরেশ্বর ইন্দ্র অনুতাপ করছেন, তাঁর জীবনে ব্রহ্মশাপ সফল হয়েছে, তিনি সহস্র নয়নে অবিরত অশ্রুপাত করছেন। প্রভুর মহিমা দেখে দেবরাজ ইন্দ্র অধীর হয়ে আনন্দে গড়াগড়ি করছেন, তাঁর শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বজ্র, হার, কিরীটি কোথায় পড়েছে কিছুই ঠিক নেই, একেই বলে কৃষ্ণপ্রেম। চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, কুবের, অগ্নি, সমস্ত দেবগণ নৃত্য করছেন, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখে কৃষ্ণভক্তগণ সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য করছেন। সকল দেবতারাই আনন্দে ছোট-বড় বিচার ভুলে গিয়ে, ঠেলাঠেলির মধ্যেও খুশি হয়ে কৃষ্ণের আবেশে সত্য সুখ লাভ করে নৃত্য করছেন। গরুড়কে সঙ্গে নিয়ে সহস্রবদন অনন্তদেব নাচছেন, সকল শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে পালন করাই যাঁর কাজ সেই অনন্তদেবই আজ মহানন্দে নৃত্য করছেন। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শুকদেব সকলেই অনন্তদেবকে ঘিরে নাচছেন, গৌরচন্দ্র অবতারে ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধারে তাঁরা প্রীত হয়ে সহস্র বদনে তাঁর গুণকীর্তন করছেন। মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ দেখে কেউ কাঁদেন কেউ হাসেন, কেউ বা সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কেউ বলেন,—গৌরের মাহাত্ম্যে জগাই-মাধাই মহাপাপীও উদ্ধার পেয়ে ধন্য হল। নৃত্য-গীত-বাদ্যে কৃষ্ণগুণকীর্তনে আকাশ-বাতাস ভরে গেল। মহা জয় জয় ধ্বনিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরে গেল, সব অমঙ্গল নাশ হল। মঙ্গলধ্বনিতে যেন সত্যলোককে ছাড়িয়ে গেল, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ভরে গেল। ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধারের কথা ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না, সকলেই এই কথাই আলোচনা করছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য প্রকটিত হয়ে

পড়েছে। মহাজন ভাগবত দেবগণ কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হয়ে নিজ পুরে চললেন, শ্রীগৌরাঙ্গের যশকীর্তন ছাড়া তাঁদের মুখে আর কোনো কথা নেই। সর্বজীব-লোকনাথ, জগৎমঙ্গল প্রভু গৌরচন্দ্রের জয়, তুমি যেভাবে করুণাবশে ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধার করলে সেই ভাবে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। সংসার-তারক পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যের জয়পতাকা ধন্য। শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ এবং তাঁদের ভক্তবৃন্দ সকলেই পতিতপাবন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁদের গুণকীর্তন করছেন।

২/১৫ শচীনন্দন-বিশ্বম্ভর এভাবে নবদ্বীপে অচিন্ত্য লীলাদি প্রকাশ করছেন কিন্তু তাতেও সকলে তাঁকে চিনতে পারে না। জলের মধ্যে চাঁদকে পেয়েও যেমন মাছেরা তার কিছুই জানে না এও ঠিক তেমনি। শ্রীচৈতন্যের কৃপায় জগাই-মাধাই পরম ধার্মিক জীবন যাপন করছেন এখন নদীয়াতে। প্রতিদিন ঊষায় গঙ্গাস্নান করে দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করেন। সব সময় নিজের কাজের জন্য ধিক্কার করেন এবং কৃষ্ণনাম নিয়ে কাঁদেন। পরম উদার কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে তাঁরা এখন বুঝতে পেরেছেন. জগতের সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। আগের হিংসার কাজের কথা মনে করে কেঁদে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি করেন। কেবলই পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গের কথা ভেবে কাঁদেন। কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দে তাঁরা ক্ষুধা-তৃষ্ণাও ভুলে গেছেন। চৈতন্যকৃপার কথা ভেবে কেবলই কাঁদেন। ভক্তবৃন্দের সঙ্গে প্রভু বিশ্বম্ভর তাঁদের সবদা অনুগ্রহ করে বলেন,—কৃষ্ণ তোমাদের কৃপা করবেন, কোন চিন্তা নেই। প্রভু নিজে বসে থেকে তাঁদের ভোজন করান তবু তাঁরা মনে সোয়াস্তি পান না। বিশেষ করে মাধাই নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করে তাঁর চরণে অপরাধী হয়েছেন বলে বারংবার তা মনে করে কাঁদেন। শ্রীনিত্যানন্দ কিন্তু মাধাইয়ের সব অপরাধ মার্জনা করেছেন, তবু তিনি মনে শান্তি পাচ্ছেন না। আমি নিত্যানন্দের শরীরের রক্ত ঝরিয়েছি, —এই কথা বলে কেবলই নিজেকে নিজে প্রহার করেন। যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র বিহার করেন আমি সেই অঙ্গে প্রহার করেছি,—মাধাই মূর্ছিত হয়ে ভাবছেন আর কেবল এই কথাই বলছেন, মুখে অন্য কোন কথা নেই।

নিত্যানন্দ-প্রভু বালক-আবেশে সর্বদা নদীয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। তাঁর মনে অভিমান বলে কিছু নেই, তিনি সহজেই পরমানন্দে থাকেন। একদিন নিত্যানন্দকে একলা পেয়ে মাধাই তাঁর দুই চরণে ধরে পড়লেন। প্রেমাশ্রুতে প্রভুর চরণ সিক্ত করে দাঁতে তৃণ নিয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন,—প্রভু, তুমি বিষ্ণুরূপে পালন কর। তুমি অনন্তদেব রূপে ফণায় ব্রহ্মাণ্ড ধারণ কর। তোমার কলেবর ভক্তির স্বরূপ, হরপার্বতী তোমাকেই ধ্যান করেন। তুমিই ভক্তিযোগ দান কর, তোমার চেয়ে শ্রীচৈতন্যের প্রিয় আর কেউ নেই। তোমার আশীর্বাদেই গরুড় অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে বহন করেন। তুমিই অনন্ত মুখে কৃষ্ণগুণ গান কর, ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তা তুমিই প্রচার-প্রসার কর। নারদ স্বয়ং তোমার গুণকীর্তন করেন, শ্রীচৈতন্যের এবং তোমার মহিমা একই। তুমি 'কালিন্দীভেদন' বা যমুনাকর্ষণ লীলা করেছিলে, তোমার সেবা করেই মিথিলাপতি জনক মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তুমি সর্বধর্মময় পুরাণপুরুষ, বৈদিক শাস্ত্রে তোমাকেই আদি দেব বলা হয়েছে। তুমি জগৎপিতা মহাযোগেশ্বর, তুমি মহাধনুর্ধর শ্রীলক্ষ্মণ। তুমি পাষণ্ডগণের বিনাশকারী এবং কৃষ্ণভক্তির উপদেষ্টা, তুমি শ্রীচৈতন্যের সমস্ত লীলার বিষয় সম্যক জ্ঞান। মহামায়া তোমাকে ভজনা করেই পূজনীয় হয়েছেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার পদছায়া প্রার্থনা করে।

তুমি চৈতন্যভক্ত, তুমি ছাড়া কৃষ্ণের আর কে আছে? গৌরচন্দ্রের সকল অবতারেই তুমি অবতীর্ণ হও। তুমি পতিতের ত্রাণ কর, পাষণ্ডীদের সংহার কর। তুমি বৈষ্ণবধর্ম শিক্ষা দাও এবং বৈষ্ণবদের রক্ষা কর। তোমার কৃপাতেই ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য নিবাহ করতে সমর্থ, বরুণ-কন্যা রেবতী অপ্রাকৃত মদিরা দ্বারা তোমার সেবা করেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও তোমারই সেবা করেন। তোমার ক্রোধ থেকেই মহারুদ্রের অবতার হয় এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টি সংহার করেন। বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন,—অনন্তদেবের মুখ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র ত্রিজগৎকে গ্রাস করে থাকেন। এ সব কাজ করেও তুমি নির্লিপ্ত থাক, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি গৌরচন্দ্রকে তুমি তোমার বক্ষে ধারণ করে থাক। তোমার অত্যন্ত কোমল আনন্দপূর্ণ দেহ, শ্রীকৃষ্ণ তাতে শযনলীলা করে থাকেন। সেই অঙ্গে আমি প্রহার করেছি, আমার মত সাঙ্ঘাতিক পাপী আর নেই। পার্বতী প্রমুখ অসংখ্য নারীদের নিয়ে স্বয়ং শিব প্রাণতুল্য প্রিয় মনে করে তোমাকে পূজা করেন, তোমার অঙ্গের স্মরণ করলেও সর্ব বন্ধন থেকে মুক্তি পাওযা যায়, সেই অঙ্গের রক্তপাত করেছি আমি। মহারাজ চিত্রকেতু তোমার অঙ্গের পূজা করে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলে গণ্য হয়েছেন। এই অঙ্গ সেবা করেই শৌনক প্রমুখ ঋষিবৃন্দ নৈমিষারণ্যে মুক্তিলাভ করেছেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যে অঙ্গের পরিচর্যা করে আমি সেই অঙ্গকে কষ্ট দিলাম, রাবণ এই পাপেই সবংশে ধ্বংস হয়েছে। এই অঙ্গে ইন্দ্রজিৎ শক্তিশেল বিদ্ধ করে নিজেই মারা গেল। নরকাসুরের বন্ধু দ্বিবিদ বানর তোমার অঙ্গ লঙ্ঘন করে নিহত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক রুক্মী তোমাকে অপমান করে মারা গেল। সূত মুনি ব্রহ্মাসন পেয়েছিলেন, দীর্ঘায়ুযোগ পেয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তোমাকে যথাযোগ্য সম্মান না করায় মারা গেলেন। রাজা দুর্যোধন তোমাকে অপমান করে স্বজনগণসহ রাজপুরীতে বিপাকে পড়েছিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ দৈবযোগে এর সব কারণ জানতে পেরেছেন। কুন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জুন—এঁদের অনুরোধে সেযাত্রা দুর্যোধন রক্ষা পেয়েছিলেন। তোমার অপমান করেই তাঁদের এঅবস্থা হযেছে, আর আমার মত নিষ্ঠুরের কি অবস্থা হবে?—বলতে বলতে মাধাই শ্রীচরণে আছড়ে পড়ে প্রেমে ভাসতে থাকেন এবং বলে চলেন,—তোমার চরণে আশ্রয় নিলে কোন বিপদ থাকে না, পতিতকে উদ্ধার করার জন্যই তোমার আবির্ভাব, তুমি শরণাগতের রক্ষাকর্তা, তুমি আমার জীবন ধন প্রাণ সবই, তুমি আমাকে পবিত্রাণ কর। পদ্মাবতীর পুত্র, সব বৈষ্ণবের প্রাণ নিত্যানন্দের জয় হোক। অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ শরণাগতকে সর্বদা রক্ষা করেন। আমি দারুণ চণ্ডাল, কৃতঘ্ন গর্দভ, আমি অনেক অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

মাধাইর মিনতি স্তব এবং ভক্তি লক্ষ্য করে শ্রীনিত্যানন্দ হেসে বললেন,—মাধাই, তুমি ওঠ, তুমি আমার দাস, তোমার শরীরে আমার প্রকাশ লাভ ঘটেছে। শিশু পিতাকে প্রহার করলে পিতা কি দুঃখ পায়? তোমার প্রহারও আমার কাছে তাই। কেউ তোমার স্তুতি শুনলেই আমার প্রতি তার ভক্তি জন্মাবে। তুমি আমার প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করেছ, তাই আমি তোমার কোন অপরাধই নিতে পারি না। যে চৈতন্যকে ভজনা করে সেই আমার প্রাণতুল্য প্রিয়, যুগে যুগে আমি তাকে রক্ষা করি। চৈতন্য ভজনা না করে আমার গুণকীর্তন করলে জন্মে জন্মে দুঃখ পাবে। —এই বলে খুশি হয়ে শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে আলিঙ্গন দান করলেম, মাধাইর সব দুঃখ কেটে গেল।

মাধাই আবার চরণ ধরে বললেন,—প্রভু, আমার আর একটি প্রার্থনা আছে। তুমি

সব জীবের হৃদয়ে বাস কর কিন্তু আমি তো অনেক লোককেই হিংসা করেছি। আমি কত লোকের কাছে যে কত শত অপরাধ করেছি তা নিজেও জানি না। তাঁদের চিনিও না, তাঁরা এখন কি করেই বা আমাকে ক্ষমা করবেন? তুমি যখন আমাকে কৃপা করেছ, এখন উপদেশ কর কি করে আমি রক্ষা পেতে পারি। প্রভু বললেন,—উপায় আছে। তুমি রোজ গঙ্গার ঘাট ঝাড়পোঁছ করে পরিষ্কার রাখবে। লোকেরা যখন স্নান করে খুশি হবেন তখন তাঁরা তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। পতিতপাবনী গঙ্গাই তোমার সৌভাগ্যে সেবা গ্রহণ করলে আর ভয় নেই। মিনতি করে সকলকে প্রণাম করবে তবেই তোমার ক্ষমা মিলবে। —মাধাই প্রভুর কাছে এই উপদেশ পেয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে চললেন। এখন মাধাইর কৃষ্ণনাম নিয়ে অশ্রুপাত হয়। তিনি রোজ গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করেন। সকলেই তা দেখেন। দেখে সবাই আশ্চর্য হন, মাধাই সকলকে প্রণাম করেন আর বলেন,—জেনে বা না জেনে যত অপরাধ করেছি তোমরা সকলে আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর। মাধাইর কান্নায় সকলেরই চোখে জল। সবাই আনন্দে গোবিন্দ-স্মরণ করেন। সকল লোকেই শুনল যে নিমাই পণ্ডিত জগাই-মাধাইয়ের চরিত্র পালটে দিয়েছেন। শুনে সবাই আশ্চর্য হয়ে বলছেন,—নিমাই পণ্ডিত কিছুতেই মনুষ্য নন্। না জেনেই দুর্জনেরা তাঁর নিন্দা করছে, তিনি সত্যি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন করেন, ভণ্ডামি নয় মোটেই। নিমাই সত্যি ভগবানের সেবক, তাঁকে উপহাস করলে নিপাতে যেতে হবে। জগাই-মাধাইকে যে সুমতি দান করতে পারে সে নিশ্চয় ঈশ্বর বা ঈশ্বরের শক্তি ধারণ করে। নিমাই পণ্ডিত সাধারণ লোক নয়, এখন তাঁর মহিমা জানা গেল। নদীয়ার সর্বত্র এখন এসব কথাই কেবল আলোচনা হয়। যেখানে নিন্দার কথা হয় সেখানে আর লোকেরা এখন ঘেঁষে না। মাধাই মহা কঠোর তপশ্চর্যা শুরু করেছেন। এখন তাঁকে সকলেই ব্রহ্মচারী বলে জানে। তিনি সর্বদা গঙ্গার ঘাটের কাছেই থাকেন, নিজে হাতে করে কোদাল নিয়ে পরিশ্রম করে ঘাট পরিষ্কার রাখেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপায় এখনো তার চিহ্ন রয়েছে, সকলেই ঐ স্থানকে 'মাধাইর ঘাট' বলে। শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদে দুজন দস্যু উদ্ধার পেল,—একথা চারদিকে প্রচার হয়ে গেল। মধ্যখণ্ডে অমৃত কাহিনী এই দুজন মহা পাষণ্ডের উদ্ধার-কথা বর্ণিত হয়েছে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের জন্যই এটা হয়েছে। এ কথাটি মেনে নিতে যে মনে কষ্ট পাবে তাকে নিশ্চয় খলপ্রকৃতি বলে বুঝতে হবে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রেও যা খুলে বলা হয় নি সেই পরম গুপ্ত তত্ত্বটি শ্রীচৈতন্যই আপামরে দান করলেন। শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের পদযুগলে এই সকল কথা নিবেদন করছেন।

২/১৬ প্রভু বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে সর্বদা সঙ্কীর্তন করছেন। দরজা বন্ধ করে রাত্রে কীর্তন করেন, অন্য লোকে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। শ্রীবাসের বাড়িতে একদিন কীর্তনের সময় শ্রীবাসের শাশুড়ী ঘরে লুকিয়েছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু এবং শ্রীবাস পণ্ডিত জানতেন না, তিনি ডোলের মধ্যে মাথা গুঁজে ঘরের এক কোণে বসেছিলেন। লুকিয়ে থাকলেই হলো না, ভাগ্যে না থাকলে সেই নৃত্যকীর্তন দেখা যায় না। প্রভু নাচতে নাচতে কেবলই বলছেন,—আজ নৃত্যে আমার আনন্দ হচ্ছে না কেন? অন্তর্যামী প্রভু সব জেনেও ভেঙ্গে বলছেন না। নাচের মধ্যে বারেবারেই বলছেন,—কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছি না, হয়তো কেউ কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হল। শ্রীবাস নিজেও সব ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখে নিলেন।

বাইরের কোন লোক নেই ভেবে শ্রীবাসও আনন্দে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নাচতে থাকেন। খানিক পরে প্রভু আবার বললেন,—আজ শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহ করেন নি, কিছুই আনন্দ হচ্ছে না। মহাবৈষ্ণবগণ ভাবছেন,—আমরা ছাড়া তো বাইরের কেউ নেই। আমরাই হয়তো কিছু অপরাধ করেছি তাই প্রভু মনে শান্তি পাচ্ছেন না। শ্রীবাস আবার ঘরে গিয়ে খোঁজাখুজি করে দেখতে পেলেন তাঁরই শাশুড়ী লুকিয়ে রয়েছেন। শ্রীবাস কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট, তাঁর বাহ্য জ্ঞান নেই। প্রভুর বাক্যে তিনি ভয় পেয়ে গেছেন তাই শাশুড়ীকে বেরিয়ে যেতে বললেন। এই খবর কিন্তু আর কেউ জানেন না অথচ বিশ্বম্ভর তখন সানন্দে নাচছেন। প্রভু বললেন,—এখন কিন্তু মনে আনন্দ পাচ্ছি। শ্রীবাসও হেসে হেসে কীর্তন করছেন। কীর্তনের মহানন্দ-কোলাহল হতে থাকে, বৈষ্ণবগণ হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন। মহাপ্রেমানন্দের আবেশে প্রভু নৃত্য করছেন, মহাবলী নিত্যানন্দ প্রভুকে ধরে ধরে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন নাচছেন। শ্রীচৈতন্য যাঁকে অধিকার দেন তিনি ছাড়া তাঁর লীলা কেউ দেখতে পায় না। মহাপ্রভু রোজই কীর্তন করছেন কিন্তু সকলেই তা দেখবার সৌভাগ্য অর্জন করে নি।

আর একদিন প্রভু এই রকম নাচতে নাচতে চারদিকে তাকাচ্ছেন, মনে আনন্দ হচ্ছে না। বললেন,—আজ কেন কীর্তনে মন লাগছে না? হয়তো কোনো ভক্তের নিকট কিছু অপরাধ হয়েছে। অদ্বৈতাচার্য অবশ্যই চৈতন্য-ভক্ত, শ্রীচৈতন্যের প্রতি ভক্তি ছাড়া তাঁর মনে অন্য কোনো ভাব নেই। চৈতন্য যখন বিষ্ণুখট্টায় বসে সকলের মাথায় তাঁর চরণস্পর্শ দান করলেন এবং প্রভু ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন তখন অদ্বৈতাচার্য আনন্দসাগরে ভাসতে থাকেন। মহাপ্রভু যখন অদ্বৈতকে নিজের ভক্ত বলে স্বীকার করেন তখন তিনি খুব আনন্দই পান। অচিন্ত্য গৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝতে পারা যায় না, তখনই প্রভু আবার কোনো বৈষ্ণবের পায়ে ধরেন। দাঁতে তৃণ নিয়ে কেঁদে বলেন,—হে কৃষ্ণ, তুমিই আমার জীবন। তাঁর কান্নায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যায়, প্রভু তখন দাস্যভাবে আচরণ করেন। ঈশ্বরভাব কেটে গেলেই প্রভু সাধারণ লোকের মত সকলকে জিজ্ঞাসা করেন,—আমি কিছু অন্যায় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিনি তো? অন্যায় কিছু করলে আমাকে বলবে, আমি তাহলে আর প্রাণ রাখব না। কৃষ্ণই আমার ধন-প্রাণ-ধর্ম সবই। তোমরা আমার জন্মজন্মান্তরের বন্ধু এবং ভাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস্যভাব ছাড়া আমার কোনো গতি নেই। আমি কিছু অন্য রকম আচরণ করে থাকলে তোমরা আমাকে বলবে। ভয়ে বৈষ্ণবেরা সকলেই চুপ করে আছেন। প্রভুর ঐশ্বর্য প্রকাশের কথা কেউ সাহস করে বলতে পারছেন না। তিনি আদেশ করলে তবেই কেউ তাঁর চরণ-স্পর্শ করতে পারেন। প্রভু সর্বদা দাস্যভাবে থেকে বৈষ্ণবগণের চরণের ধূলি গ্রহণ করেন, তাঁদের সম্মান করেন। বৈষ্ণবগণ তাতে মনে খুবই কষ্ট পান তাই আবার তিনি সকলের সঙ্গে আলিঙ্গন করেন। অদ্বৈতাচার্যকে তিনি গুরু-স্থানে মান্য করেন, অদ্বৈত তাতে মনে খুবই দুঃখ পান। অদ্বৈত নিজে তো প্রভুর সামনে তাঁর কোনরূপ সেবাযত্ন করতে পারছেনই না বরং প্রভুই তাঁর দুই পায়ে ধরে প্রণামাদি করেন। অদ্বৈত প্রভুর সামনে কিছুই করতে পারেন না কিন্তু না জানিয়ে চরণধূলি নেন। প্রভু যখন ভাবাবেশে মূর্ছিত হন তখন অদ্বৈত তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে প্রেমাশ্রুতে শ্রীচরণ ধুইয়ে দেন। কখনো বা তিনি হাত দিয়ে পুঁছে নিজের মাথায় মোছেন কখনো শাস্ত্রবিহিত ভাবে তাঁর পূজা করেন। এই কাজ একমাত্র অদ্বৈতই করতে পারেন কারণ তিনি প্রভুর সর্বাপেক্ষা মহা-কৃপাপাত্র। সেজন্যই অদ্বৈতাচার্য সকলের কাছে মহামান্য,

বৈষ্ণবগণও বলেন,—অদ্বৈতের জীবন ধন্য। শ্রদ্ধেয় অদ্বৈতাচার্যের এই মহিমার রহস্য বহির্মুখ ভক্তিহীন লোকেরা কিছুই জানে না।

একদিন মহাপ্রভুর নৃত্যের সময় অদ্বৈতাচার্য পেছনে পেছনে চলছিলেন। এমন সময় প্রভুর চরণধূলা নিজের অঙ্গে মেখেছিলেন। প্রভু নাচে আনন্দ না পেয়ে বললেন,—কার কাছে অপরাধ করলাম যে মনে উল্লাস অনুভব করছি না? আমাকে না জানিয়ে হয়তো কেউ আমার উল্লাসের মূল প্রেমকে চুরি করে নিয়ে গেছেন। সেই অপরাধে আমি নাচতে পারছি না। কেউ কি আমার পদধূলি নিয়েছ, বল। সত্য কথা বল, চিন্তা নেই, আমি বলছি, বল। অন্তর্যামীর কথা শুনে ভক্তগণ ভয়ে চুপ করে আছেন, কেউ কোনো কথা বলছেন না। বলতে অদ্বৈতের ভয়, না বললে প্রাণ যায়। তাই বুঝে-শুনে অদ্বৈতাচার্য জোড় হাত করে বললেন,—প্রভু, যদি সাক্ষাতে না পায় তবেই চোরে চুরি করে, আমি চুরি করেছি, আমাকে ক্ষমা কর। তুমি যখন অসন্তুষ্ট হচ্ছ তখন আর আমি করব না। মহাপ্রভু অদ্বৈতের কথা শুনে অত্যন্ত রেগে গিয়ে বিস্তারিত ভাবে অদ্বৈতের মহিমা বলতে লাগলেন,—সংহারকর্তা শিবরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে সংহার করেও কি তুমি মনে শান্তি পাচ্ছ না? এখন কেবল মাত্র আমিই বাকি আছি, আমাকেও শেষ করে দিয়ে তুমি সুখে থাক। তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী—কাকেই বা তুমি শূল দিয়ে সংহার না কর? যে তোমার কাছে কৃতার্থ হতে আসে তাকেও তুমি পায়ে ধরে সংহার কর। মথুরানিবাসী এক জন বিশেষ বৈষ্ণব তোমার চরণ-বৈভব দেখতে এসেছিলেন। কোথায় তোমাকে দেখে তিনি বিষ্ণুভক্তি লাভ করবেন তা না করে তুমি তাঁর ক্ষতিই করলে। তুমি তাঁর চরণধূলি নিয়ে তাঁকে সর্বনাশ করলে, সংহার করবার সময়ে তুমি অত্যন্ত নির্দয় হয়ে পড়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত ভক্তিযোগ আছে তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ সবই দান করেছেন। তবু তুমি ছোটর কাছে চুরি কর, ছোটকে সংহার করতে তোমার মনে একটু কৃপা জাগে না? তুমি দেখছি মহাচোর, ডাকাত বললেই হয়, তুমি আমার প্রেমানন্দ চুরি করলে? —এইভাবে মহাপ্রভু ক্রোধের ছলে সত্যি তত্ত্বই জানালেন। পরম বৈষ্ণববৃন্দ শুনে মহানন্দে ভাসছেন। —তুমিই কেবল একা চুরি করতে পার, আমি পারি না? তবে এখন দেখ, চোরের উপরে কি করে বাটপাড়ি করতে হয় আমি দেখাচ্ছি। —এই বলে প্রভু হেসেহেসে অদ্বৈতের চরণধূলি লুটপাট করে নিচ্ছেন। যুবক শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে বৃদ্ধ অদ্বৈত পারছেন না, প্রভু অদ্বৈতাচার্যের চরণ নিজের মাথায় বার বার ঘষছেন। তাঁর চরণ বুকে ধরে রেখে প্রভু বলছেন,—দেখ, চোরের দশ দিন, গেরস্থের একদিন। চোর সারা জীবন ধরে যা চুরি করে গৃহস্থ একদিনে তার কাছ থেকে সব উদ্ধার করে নিয়ে আসে। অদ্বৈত বললেন,—ভালই বলছ, তুমি যে গৃহস্থ তা আমি জানতাম না। প্রাণ বুদ্ধি মন দেহ সবই তোমার, তুমি সংহার করলে কে রক্ষা করবে? তুমিই মানুষকে আনন্দে রাখ, তুমিই কষ্ট দাও, তুমি মারলে তাকে বাঁচাবে কে? দ্বারকা নগরীতে নারদ প্রমুখ পরম ভাগবতগণ গিয়েছিলেন তোমার শ্রীচরণ দর্শন করতে। উলটে তুমিই তাঁদের চরণধূলি নিলে। নিজের সেবকগণের যদি তুমি নিজেই ক্ষতি সাধন কর তাহলে সেবকেরা আর কি করতে পারেন, তুমি নিজেই সেটা একবার ভেবে দেখ। পায়ের ধুলো নেওয়ার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, তুমি যদি তাঁদের কেটেও ফেল, তাহলেই বা তোমাকে শাস্তি দেবে কে? তবু যে তুমি এমন আচরণ কর তা কিন্তু তোমার স্বরূপের অনুকূল কাজ হচ্ছে না। আমার সর্বনাশ হলেই তুমি খুশি হও। আমার দেহ বস্তুত আমার নয়,

এ তোমারই। তুমি ইচ্ছে করলে একে রাখতেও পার, সংহার করতেও পার। মহাপ্রভু বললেন,—তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী, তাই তোমার চরণের সেবা করি। তোমার চরণধূলি অঙ্গে মাখলে অখিল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়। তুমি না দিলে কেউ ভক্তি লাভ করতে পারে না। আমি সর্বদা তোমারই অনুগত, একথা তুমি অবশ্য মনে রাখবে। তুমি আমাকে যেখানে বিক্রি করবে আমি সেখানেই বিকোব। অদ্বৈতাচার্যের প্রতি প্রভুর কৃপা দেখে সকল বৈষ্ণবগণ মনে মনে ভাবছেন,—এই মহাপুরুষ অদ্বৈতাচার্যকে সত্যি প্রভু কৃপা করছেন। এর কাছে কোটি কোটি মোক্ষও কিছুই নয়। দেবাদিদেব মহাদেবও এমন ভাগ্য করেন নি। শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে যে কৃপা করলেন তার সঙ্গে কারো কোন তুলনাই চলে না। আমাদেরও পরম সৌভাগ্য বলতে হয় যে এমন ভক্তের সঙ্গ করতে পারছি, তাঁর পদধূলি নিতে পারছি। কিন্তু পাপীরা মন খুলে শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত বলে স্বীকার করতেও পারে না। প্রভুর প্রকটলীলাকালে বৈষ্ণববাক্য না মান্য করে অনেকেই দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েছেন। বিশ্বম্ভর একবার 'হরিবোল' বললে চারপাশের লোকেরাও সঙ্গে সঙ্গে নাম নিতে থাকেন। অদ্বৈতাচার্য আনন্দের আবেশে অন্য সমস্ত বিষয় ভুলে গিয়ে মহামত্ত হয়ে নাচতে থাকেন। তিনি ভ্রূকুটি এবং তর্জন গর্জন করে দাড়িতে হাত বুলিয়ে নাচেন। সকলেই মহানন্দে 'জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী' বলে কীর্তন করছেন। নিত্যানন্দ-প্রভু পরম বিহ্বল হলেও নৃত্যের সময়ে মহাপ্রভুকে রক্ষার বিষয়ে খুবই নিপুণ। তিনি সাবধানে চারদিকে হাত দুটি মেলে থাকেন, শ্রীচৈতন্যকে পড়তে দেখলেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ধরে ফেলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অশেষ আবেশে নৃত্য করেন, সে দৃশ্য বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সরস্বতীর সঙ্গে বলরামই বাসনা পরিপূর্ণ করে কীর্তন করেন। শ্রীচৈতন্য মাঝে মাঝে মূর্ছিত হচ্ছেন, আবার কাঁপছেন, হাতে তৃণ নিচ্ছেন আবার মাঝেমধ্যে মহা অহঙ্কার প্রকাশ করছেন। প্রভু কখনো হাসছেন, কখনো তাঁর দীর্ঘশ্বাস বইছে, কখনো ভক্তদের মধ্যে বীরাসনে বসে অট্টহাস্য করেন। সকলকেই তিনি যাঁর যাঁর ভাগ্য মত কৃপা করছেন, বৈষ্ণবগণ তা দেখে মহা আনন্দিত। সামনে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে দেখে তাঁকেই প্রভু অনুগ্রহ করলেন।

এই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী হচ্ছেন প্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপেরই অধিবাসী। অত্যন্ত ধার্মিক, শান্ত, মহাভাগবত। কিন্তু তাঁর বাইরের আচরণ দেখে কেউ তাঁকে সঠিক চিনতে পারেন না। তিনি নবদ্বীপের ঘরে ঘরে কাঁধে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষা করেন এবং কৃষ্ণনামে কাঁদেন। তিনি দরিদ্র বলে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করেন,—লোকে এইটুকুই জানে। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ সারাদিন ভিক্ষা করে যা পান তাই কৃষ্ণ সেবায় নিবেদন করে নিজে প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণের আনন্দে শুক্লাম্বর অনটনের কথা ভুলে থাকেন, তিনি বাড়ি-বাড়ি কৃষ্ণনাম প্রচার করে চলেছেন। চৈতন্যের কৃপা-পাত্রকে কেউ চিনতে পারেন না। প্রভু কাকে কখন কৃপা করবেন কে বলতে পারে? দ্বাপর যুগে যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী সুদামা ব্রাহ্মণ দরিদ্র ছিলেন তেমনি শুক্লাম্বরও মহা বিষ্ণুভক্ত। প্রভুও তাঁকে তেমনি কৃপা করলেন, ইনি প্রভুর নৃত্যের সময় বাড়ির ভিতরে থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন। বিপ্র প্রভুর সঙ্গে কাঁধে ঝুলি নিয়েই নাচতে থাকেন, তা দেখে অন্যান্য বৈষ্ণবদের সঙ্গে প্রভুও হাসেন। প্রভু যখন ঈশ্বর-আবেশে আসনে বসেন শুক্লাম্বর তখনও ঝুলি কাঁধে নিয়ে হাসেন কাঁদেন এবং নাচতে থাকেন। প্রভু শুক্লাম্বরকে দেখলেই ডেকে এনে কাছে বসান এবং বলেন,—তুমি জন্মে জন্মে আমার দরিদ্র সেবক, আমাকে তুমি সব কিছু

দান করে নিজে ভিক্ষুকের বৃত্তি গ্রহণ করেছ। আমিও তোমার দ্রব্যই সর্বদা চাই, তুমি না দিলেও আমি কেড়ে নিয়ে খাই। দ্বারকাপুরীতে আমি তোমার চিঁড়ের খুদ কেড়ে খেয়েছিলাম, স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিনী রুক্মিনী দেবী আমার হাত চেপে ধরেছিলেন, তুমি কি সে সব কথা ভুলে গেলে? —এই বলে বিশ্বম্ভর শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চাল নিয়ে চিবোতে থাকেন। শুক্লাম্বর তখন বললেন,—প্রভু, এ কি করছ? এই ভিক্ষার চালে যে প্রচুর খুদ-কণা রয়েছে। প্রভু তার উত্তরে বললেন,—আমি তোমার খুদ-কণাই খাই, অভক্তের পায়েসেও আমি নজর দিই না। স্বেচ্ছাবিহারী, ভক্তজীবন, পরমানন্দ শ্রীবিশ্বম্ভর শুক্লাম্বরের ভিক্ষার চাল চিবিয়ে খাচ্ছেন, তাঁকে কে বারণ করবে? প্রভুর করুণার নিদর্শন দেখে ভক্তবৃন্দ মাথায় হাত দিয়ে বসে কাঁদতে লাগলেন। সকলেই প্রভুর দয়া দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, এখন কে কোথায় আছেন তা কেউ বলতেও পারবে না। তখনই আবার পরমানন্দজনক কীর্তন শুরু হল, শিশু-বৃদ্ধ সকলেই সেই কীর্তনের আবেশে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। কেউ—দাঁতে তৃণ নিয়েছেন, কেউবা প্রণাম করছেন, কেউ বা বলছেন,—প্রভু, তুমি আমাকে কখনো ত্যাগ ক'রো না। প্রভু শুক্লম্বরের চাল চিবোচ্ছেন আর ভাগ্যবান্ শুক্লাম্বর গড়াগড়ি দিচ্ছেন। প্রভু বলছেন,—শুক্লাম্বর, আমি সর্বদা তোমার হৃদয়ে বাস করি। তুমি খেলেই আমার খাওয়া হয়, তুমি ভিক্ষায় বেরুলে আমারই হাঁটা হয়। প্রেমভক্তি দান করতেই আমি অবতীর্ণ হয়েছি, জন্মজন্মান্তরে তুমি নিশ্চিত জানবে প্রেমভক্তিই আমার প্রাণ। শুক্লাম্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্তিতে বৈষ্ণবমণ্ডলী হরিধ্বনি-জয়ধ্বনি করে উঠলেন। লক্ষ্মীপতির সেবক ঘরে ঘরে ভিক্ষা করছেন, এই তত্ত্বের মর্ম ও রস একমাত্র ভাগ্যবান ভক্তগণই জানেন। দশখানা ঘরে ভিক্ষা করে ব্রাহ্মণ যে চাল পান তাই কেড়ে খান লক্ষ্মীপতি নারায়ণ স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ। বৈদিক শাস্ত্রের বিধান হচ্ছে, নৈবেদ্যের সঙ্গে দক্ষিণার টাকা দিতে হয়। নিবেদিত ভোগ্যদ্রব্য তা ছাড়া গ্রহণ করা যায় না কিন্তু ভক্তের কাছে শাস্ত্রবাক্যও কিছুই নয়। শুক্লাম্বরের তণ্ডুলই তার সম্যক প্রমাণ, তাই দেখা গেল,—সমস্ত কিছু শাস্ত্রীয় বিধানের প্রাণস্বরূপ হচ্ছে 'ভক্তি'। সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের পরে ভক্তির স্থান, একথা যে খুশি মনে মেনে নিতে পারবে না তাকে মূর্খ বলতে হয়। সমস্ত বিধি-নিষেধ যে ভক্তির দাস তা বেদব্যাস বৈদিক শাস্ত্রে বলে গেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ দক্ষিণার টাকা না দিলেও প্রভু তাঁর চাল সযত্নে খেলেন। বিষয়মদে-মত্ত লোকেরা এর মর্ম জানে না, তাঁরা অর্থ-কুল-পুত্রের অহঙ্কারে বৈষ্ণব চিনতে পারে না। ভক্তের মূর্খতা এবং দারিদ্র্য দেখে যে ঠাট্টা করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বর্যের জাঁকজমকময় পূজা কখনো গ্রহণ করেন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন,—যাঁরা নির্ধন এবং ভগবানকেই একমাত্র সম্পদ মনে করেন, প্রেমময় শ্রীহরি তাঁদের হৃদয়ে বাস করেন আর যারা বেদবিদ্যা, ধনসম্পত্তি, কুল এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের অহঙ্কারে অকিঞ্চন ভক্তগণকে নিন্দা করে পাপভাগী হয় সেই দুর্বুদ্ধি লোকদের দাম্ভিক পূজা তিনি স্বীকার করেন না।

শ্রীকৃষ্ণ অকিঞ্চন ভক্তগণের প্রাণতুল্য প্রিয়, সমস্ত শাস্ত্রেই এই কথার উল্লেখ আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ এই অবতারে তা সাক্ষাতে দেখালেন। শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন কাহিনী যে শোনে সেই শ্রীচৈতন্য-চরণে ভক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীল নিত্যানন্দচন্দ্র তা জানেন, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, তাঁদের শ্রীপাদপদ্ম সমীপে এই কীর্তন করে চলেছেন।

২/১৭ শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডকথা অমৃতের টুকরোর মত, এই কথা-কাহিনী শুনলে মনের কালিমা ঘুচে যায়। প্রভু বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ না করে নিরন্তর সঙ্কীর্তন করছেন। প্রভু যখন নগরভ্রমণ করেন তখন লোকেরা দেখেন যেন সাক্ষাৎ মদন। প্রভুর ব্যবহারিক আচারণ দেখে সাধারণ লোকেরা মনে করে তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক, তাঁর বিদ্যাবত্তা দেখে পাষণ্ডীরাও প্রভুকে ভয় করে। প্রভু সবে মাত্র ব্যাকরণে শিক্ষা নিয়েছেন, সেই অবস্থাতেই পণ্ডিত-ভট্টাচার্যদেরও আলোচনার অযোগ্য মনে করেন। প্রভু নিজের আনন্দে নগরভ্রমণ করেন এবং সেবকদের সঙ্গে গূঢ় রূপে থাকেন। পাষণ্ডীরা প্রভুকে ডেকে বলেন,—নিমাই পণ্ডিত, তোমাকে ধরে নেবার জন্যে শীঘ্রই বাদশার লোক আসবে। অপরাধ? তুমি রাত্রে লুকিয়ে কীর্তন কর। লোকেরা দেখতে পায় না তাই তোমার উপরে তারা খুবই চটে রয়েছে। কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়, তুমি শীগ্গীরই দেখতে পাবে। তোমাকে আমাদের বন্ধু মনে করেই জানালাম। প্রভু বললেন,—ঠিক আছে। আমারও ইচ্ছে, একবার রাজদর্শন করি। ছোট বয়সেই সব শাস্ত্র শিখেছি কিন্তু ছেলেমানুষ ভেবে কেউ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না। কেউ আর খোঁজও করে না। আমি চাই যে লোকেরা আমার সঙ্গে দেখা করুক। পাষণ্ডীরা বলল,—বাদশা তোমার গোপন কীর্তনই শুনতে চাইবে, যবন রাজা তোমার শাস্ত্রজ্ঞান চাইবে না। পাষণ্ডীদের কথায় প্রভু গুরুত্ব দিলেন না, তিনি বাড়িতে চলে এলেন। প্রভু ভক্তদেব বললেন,—আজ পাষণ্ডীদের সঙ্গে কথা হল, আজেবাজে কথা শুনে মনটা ভাল নেই, তোমরা কীর্তন কর তাহলেই আনন্দ পাব।

বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর মহাপ্রভু কীর্তন করছেন, তাঁকে ঘিরে ভক্তগণ গাইছেন। মাঝে মাঝেই প্রভু বলছেন,—আজ প্রেমানন্দ অনুভব করছি না কেন? নগরে পাষণ্ডীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যই এমন হল? তোমাদের প্রতি কি আমি কিছু অবজ্ঞা প্রকাশ করেছি? তোমরা ভক্ত, আমার অপরাধ ক্ষমা করে প্রাণ রক্ষা কর।

পরম ভাগতোত্তম অদ্বৈত ভ্রূকুটি করে নাচছেন আর বলছেন, —কি করে প্রেম হবে? তোমার প্রেমসুখ অদ্বৈতই শোষণ করেছে। আমি এবং শ্রীবাস তোমার প্রেমভক্তি পেলাম না অথচ তুমি তেলি-মালীদের সঙ্গে প্রেমবিলাস করছ। আচারভ্রষ্ট অবধূতও তোমার প্রেম পেয়েছে। কেবল শ্রীবাস এবং আমি-এই দুই বামুনই তোমার প্রেম পেলাম না। অবধূত কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেই প্রেমের ভাণ্ডারী হয়ে গেল। প্রভু, আমাকে যদি তুমি প্রেম না দাও তাহলে তোমার সমস্ত প্রেম আমি নিজেই শোষণ করে নেব, তখন আমার দোষ দিতে পারবে না। আচার্য শ্রীচৈতন্যের প্রেমেতে মত্ত হয়ে কখন কি বলেন, কি করেন তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কৃষ্ণ সর্বদা ভক্তির মহিমা বাড়িয়ে চলেন, ভক্তরা তাঁকে যার কাছে বেচেন তিনি সেখানেই কেনা হয়ে থাকেন। যিনি ভক্তিপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বেচতে পারেন তিনি যে এসব বলবেন তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? গৌরচন্দ্র নানা ভাবে ভক্তের মহিমা বাড়ান, তাঁর অনুগ্রহ-রূপ-দণ্ড সকলেই ধরতে পারে না। প্রেমসুখ না পেয়ে প্রভু যে মন খারাপ করেছেন তাঁর এই লীলা দেখে অদ্বৈতাচার্য মজা করে হাতে তালি দিয়ে নাচছেন।

অদ্বৈতের কথা শুনে প্রভু আর কোন উত্তর করলেন না। তিনি দরজার খিল খুলে গঙ্গার দিকে দৌড় মারলেন, নিত্যানন্দ এবং হরিদাস পেছনে পেছনে ছুটলেন। প্রেমশূন্য এই দেহকে রেখে কোন দরকার নেই—ভেবে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিত্যানন্দ

এবং হরিদাসও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিত্যানন্দ তাড়াতাড়ি মাথার চুল ধরে ফেললেন আর হরিদাস পা জাপ্‌টে ধরলেন। দুজনে মিলে ধরে তাঁকে তীরে তুললেন। প্রভু বললেন,—তোমরা কেন তুললে? প্রেমহীন জীবন রাখব কেন? প্রভুর আচরণ দেখে দুজনেই ভয়ে কাঁপছেন, ভাবছেন, আজ না জানি কি অমঙ্গল ঘটে? নিত্যানন্দের দিকে তাকিয়ে গৌরাঙ্গ বললেন,—তুমি আমাকে চুল ধরে টানলে কেন? নিত্যানন্দ উত্তর করলেন,—তুমিই বা মরতে যাচ্ছ কেন? প্রভু বললেন,—তুমি তো প্রেমে বিভোর তাই অন্যের মনের অবস্থা বুঝতে পার না। নিত্যানন্দ বললেন,—প্রভু, সব দোষ ক্ষমা কর। তুমি যাকে সব রকম শাস্তি দিতে পার তার কথায় দেহত্যাগ করতে চলেছ? অভিমান করে সেবক যদি কিছু বলে তার জন্যে কি প্রভু কখনো সেবকের প্রাণহানি করেন? প্রেমময় নিত্যানন্দের প্রেমাশ্রু বইতে লাগল। শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রাণ-ধন-বন্ধু সবই।

প্রভু নিত্যানন্দ এবং হরিদাসকে বললেন,—আমি কোথায় আছি তা কাউকে বলবে না। বলবে,—আমরা দেখি নি। আমার আদেশ,—তোমরা এ কথাই বলবে। আজ আমি এক জায়গায় লুকিয়ে থাকব। কারো কাছে যদি বল তবে প্রাণত্যাগ করব, তখন আমার দোষ দিতে পারবে না। একথা বলে প্রভু নন্দন আচার্যের বাড়িতে গেলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভুর আদেশে তা কারো কাছে বললেন না। ভক্তবৃন্দ প্রভুকে না পেয়ে গৌররূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাবেশ বশত দুঃখময় হয়ে পড়ল। মহা বিরহে সকলেই কাঁদছেন, সকলেরই প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বলছেন না। ভক্তগণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল, অদ্বৈতাচার্য কোন খবর না পেয়ে গুমরে মরছেন। তিনি প্রভুর বিরহে মহা অপরাধগ্রস্ত হয়ে বাড়িতে গিয়ে উপোস করে থাকলেন। গৌরাঙ্গ-চরণ চিন্তা করতে করতে সকলেই শোকাকুল হয়ে যার যার বাড়িতে চলে গেলেন। প্রভু নন্দন আচার্যের বাড়িতে এসে বিষ্ণুখট্টার উপরে আসন করে বসলেন। নন্দন আচার্য পরম মঙ্গল বিগ্রহকে ঘরে পেয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নতুন কাপড় এনে দিলেন, গৌরহরি ভিজে কাপড় ছাড়লেন। তারপর তিনি প্রভুকে প্রসাদ, চন্দন, মালা, দিব্য অর্ঘ, গন্ধ সব এনে দিলেন, প্রভুর সর্ব অঙ্গ চন্দনভূষিত করলেন। সামনে কর্পূর তাম্বুল রাখলেন। প্রভু সানন্দে ভক্তের দ্রব্যাদি গ্রহণ করলেন। ভক্তের সেবা পেয়ে প্রভু দুঃখ ভুলে গেলেন। ভাগ্যবান নন্দন আচার্য সামনে বসে তাম্বুল এগিয়ে দিচ্ছেন। প্রভু তাঁকে বললেন,—আজ আমি তোমার বাড়িতে লুকিয়ে থাকব, তুমি কাউকে বলবে না। নন্দন আচার্য বললেন,—প্রভু, এতো বড়ই কঠিন কথা, দুনিয়ার মধ্যে তুমি কোথায় লুকিয়ে থাকবে? তুমি মানুষের হৃদয়ে থেকেই লুকোতে পারলে না, ভক্তবৃন্দ তোমাকে বাইরে নিয়ে এলেন। যে ক্ষীরসমুদ্রে লুকিয়ে থাকতে পারে নি সে মনুষ্যসমাজে এসে লুকিয়ে থাকবে কি করে? নন্দন আচার্যের কথা শুনে প্রভু হাসছেন, তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপ করেই রাত কাটিয়ে দিলেন। নন্দন আচার্যের সৌভাগ্যের সীমা নেই বলতে হয়। কৃষ্ণকথার আলাপে খানিক সময়ের মধ্যেই যেন রাত শেষ হয়ে গেল। প্রভু দেখলেন, ভোর হয়ে গেছে।

প্রভু অদ্বৈতকে দণ্ড দিয়ে এখন তাঁর মনে খুবই অনুগ্রহ দেখা দিল। প্রভু নন্দন আচার্যকে বললেন,—শ্রীবাস পণ্ডিতকে একাকী ডেকে নিয়ে এস। তিনি প্রভুর কথা মত পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে তাঁকে নিয়ে এলেন। প্রভুকে দেখে পণ্ডিত কাঁদছেন। প্রভু তাঁকে বললেন,—চিন্তার কিছু কারণ নেই। প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—অদ্বৈতাচার্যের

খবর কি বল দেখি। শ্রীবাস পণ্ডিত উত্তর দিলেন,—আচার্যের খবর জানতে চাইছ? আচার্য কাল থেকে উপোস করে রয়েছেন। তাঁর শুধু দেহখানাই আছে। তিনি তোমার বিশেষ প্রেমপাত্র, আমরা আর কি বলব? আচার্য না হয়ে অন্য কেউ হলে কি আমরাই এই দুঃখ সহ্য করতে পারতাম? আমরা সকলেই তোমার দেওয়া জীবন নিয়ে বেঁচে আছি। তোমার বিরহে আমাদের জীবন অত্যন্ত শোচনীয় মনে করছি। ভাবছি, এভাবে বেঁচে লাভ নেই। অদ্বৈত যেমন অন্যায় কথা বলেছেন, তুমিও তাঁকে তেমনি উচিত শাস্তি দিয়েছ, এখন এসে অনুগ্রহ কর। শ্রীবাসের কথা-মত কৃপাময় প্রভু সদয় হয়ে আচার্যের বাড়িতে এসে দেখেন তিনি মূর্ছিত রয়েছেন। নিজেকে মহা অপরাধী মনে করছেন আচার্য। প্রভুর দেওয়া দণ্ডকে তিনি আশীর্বাদ বলে মেনে নিয়েছেন। সেই সৌভাগ্যের গর্বে তিনি যেন কাঁপছেন। প্রভু তাঁর অবস্থা দেখে সদয় হয়ে বললেন,—আচার্য, ওঠ। দেখ, আমি বিশ্বম্ভর। অদ্বৈত লজ্জায় কিছু বলতে পারছেন না। প্রেমাবেশে প্রভুর চরণ চিন্তা করছেন। প্রভু আবার বললেন,—ওঠ, চিন্তার কিছু কারণ নেই। উঠে নিজের কাজে মন দাও। অদ্বৈত বললেন,—তুমি তো আমাকে দিয়ে সব কাজই করিয়েছ। তুমি আমাকে এখন যা কিছু বলছ সবই বাইরের কথা, তোমার মনের কথা নয়। তুমি সব সময় আমাকে কুবুদ্ধি দাও, অহঙ্কার দিয়ে দুর্গতিতে ফেল। তুমি সকলকে দাস্যভাব দিয়ে ভাল রেখেছ আমাকেই কেবল ক্রোধ দিলে। তুমিই আমাকে দিয়ে কুকথা বলাচ্ছ আবার তুমিই তার জন্য শাস্তি দিচ্ছ। তুমি মুখে এক কথা বল আর মনে অন্য রকম ভাব। আমার প্রাণ দেহ ধন মন সমস্তই তুমি। তবু আমাকে দুঃখ দেওয়াই কি তোমার ঠাকুরালি? প্রভু, তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা,—কৃপা করে তুমি আমাকে দাস্য ভাব দিয়ে তোমার দাসীপুত্র করে চরণে স্থান দাও। —অদ্বৈতাচার্যের কথা শুনে প্রভু সমস্ত ভক্তবৃন্দের মধ্যে অকপটে বললেন,—সত্যি বলছি, লৌকিক জগতের দৃষ্টান্ত দেখ। রাজমিস্ত্রী যখন রাজার কাছে যায় তখন দারোয়ান ইত্যাদি তাদের দাবিদাওয়ার কথা মন্ত্রীকেই জানায়। মন্ত্রী রাজাকে বলে মাইনে বাড়িয়ে দিলে তারা বেঁচে যায়। কিন্তু কখনো রাজার আজ্ঞায় সেই দারোয়ানেরাই আবার মন্ত্রীকে খুন করে। যে মন্ত্রীর উপরে সব রাজভার থাকে, অপরাধের জন্য তাঁকেই নিম্ন কর্মচারীদের হাতে শাস্তি পেতে হয়। তেমনি কৃষ্ণ হচ্ছেন মহা রাজরাজেশ্বর, হর্তাকর্তা। ব্রহ্মা শিব তাঁর কর্মচারী। সৃষ্টি, বিনাশ ইত্যাদি কাজ করবার শক্তি দিয়েছেন, আবার শাস্তি দিতেও দ্বিধা নেই। লক্ষ্মীদেবী, দেবাদিদেব মহাদেব—এঁরাও কৃষ্ণের কাছে শাস্তি পান। আবার তাঁর সেবকদের দোষত্রুটিও ক্ষমা করেন। অপরাধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যাকে শাস্তি দেন, সেই ব্যক্তি জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণের দাস,—এই তোমাকে বললাম। নিজের লোক না হলে তিনি শাস্তি দেন না। তুমি উঠে এখন স্নান কর, পূজা কর। তোমার কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। নাও, খাওয়া-দাওয়া কর। প্রভুর কথায় অদ্বৈত মনে বড়ই আনন্দিত হলেন। দাসকেই দণ্ড দেওয়ার কথা শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। —এই তোমার ঠাকুরালি? —বলতে বলতে অদ্বৈত করতালি দিয়ে নাচছেন। প্রভুর আশ্বাস বাক্যে তিনি আনন্দে মেতে উঠলেন। আগের সব দুঃখ তিনি ভুলে গেলেন। সমস্ত বৈষ্ণবগণই খুব আনন্দিত হলেন। হরিদাস এবং নিত্যানন্দও হাসছেন। দৈবদোষে কেউ কেউ এসব পরমানন্দ-লীলা-কথা-রসেও বঞ্চিত হয়েছে। অদ্বৈতাচার্য শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রেমপাত্র কিন্তু মায়ার প্রভাবে কোন কোন লোক একেও সামান্য তুচ্ছ বলে মনে করে। ভগবানের দাস-ভক্ত কথাটি যা-তা কথা

নয়, অল্প ভাগ্যে ভগবানের দাস হওয়া যায় না। আগে মুক্ত হবে তারপর সমস্ত বন্ধন নাশ হবে তবেই শ্রীকৃষ্ণের দাস হওয়া যাবে। ভাষ্যকারগণ বেদান্তবাক্যের এই ব্যাখ্যা করেন। মুক্ত পুরুষেরা ভক্তির কৃপায় প্রাপ্ত দেহে শ্রীকৃষ্ণভজন করে থাকেন। সোজা কথায়,—মুক্তপুরুষগণও ভক্তির কৃপায় ভজনোপযোগী দেহ ধারণ করেই ভগবানের ভজন করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণও কৃষ্ণশক্তি লাভ করেন, অপরাধ হলেও আবার কৃষ্ণই শাস্তিবিধান করেন। এমন কৃষ্ণভক্তদের বিষয়ে অনুগামীগণ না বুঝে ঝগড়া-তর্ক করে। যারা ভক্তদের বিপক্ষে কুযুক্তি উপস্থিত করে তারা অতীব দুর্ভাগা। শ্রীগৌরচন্দ্র যে সকলেরই প্রভু, এই বিষয়ে যার সন্দেহ হয় সেই দুরাচার কখনো শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না। শেয়াল-গাধার মত অনুগামীদের নিয়ে অনেকে বলে বেড়ায়,—আমাকে শ্রীরামচন্দ্র ভাববে। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করার যাঁর সামর্থ্য আছে তিনিও শ্রীচৈতন্যের দাসত্ব ছাড়া অন্য কোন শক্তিতে শক্তিমান নন্। প্রভু-বলরামই শ্রীচৈতন্য-দাসত্বের শক্তিতে সহস্রফণাযুক্ত অনন্তদেবরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে মস্তকে ধারণ করে রয়েছেন। এমন শক্তিসম্পন্ন প্রভু-বলরাম-নিত্যানন্দও শ্রীচৈতন্যের দাসত্ব করছেন। অন্যের কথা আর কি বলা যায়? হলধর-শ্রীনিত্যানন্দের জয় হোক, তাঁর কৃপাতেই চৈতন্যকীর্তন স্ফুরিত হচ্ছে। তাঁর আশীর্বাদেই শ্রীচৈতন্যে ভক্তি জন্মে। তাঁর শক্তি পেয়েই যা-কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে। শ্রীগৌরসুন্দর আমার প্রভুর প্রভু, মনে সর্বদা এই ভরসা রাখি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং নিত্যানন্দচন্দ্র জানেন যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁদেরই পদপ্রান্তে কীর্তন করছেন।

২/১৮ জগৎমঙ্গল গৌরচন্দ্রের জয় হোক। আমার হৃদয়ে তোমার পাদপদ্ম স্থাপন কর। নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ, ভক্তবৎসল গুণধাম শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দ সহ সকলের জয় হোক। চৈতন্যকথা শুনলে ভক্তি লাভ হয়। প্রভু নবদ্বীপে সর্বদা সঙ্কীর্তনের আনন্দে আছেন।

ভগবৎকান্তা মাত্রেই লক্ষ্মী। লক্ষ্মীবেশে প্রভু নৃত্য করেছিলেন। মধ্য খণ্ডের এই কথা একমনে শোনা প্রয়োজন। প্রভু সকলকে বললেন,—আজ নাটকের নিয়মে নাচব। সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানকে ডেকে প্রভু বললেন,—অভিনেতাদের পোশাক-পরিচ্ছদ যোগাড় কর। পাটের শাড়ি, গয়না, শাঁখা, কাঁচুলী—সকলের জন্য সব পোশাক নিয়ে এস। গদাধর রুক্মিনী হবেন, ব্রহ্মানন্দ হবেন তাঁর বুড়ী সখী সুপ্রভাত, নিত্যানন্দ হবেন মাতামহী বড়াই। হরিদাস হবেন কোতোয়াল, শ্রীবাস হবেন নারদ মুনি, শ্রীরাম হবেন তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্য। শ্রীবাসের ভাই শ্রীমান পণ্ডিত বললেন তিনি ডোম হয়ে মশাল ধরে দাঁড়াবেন। অদ্বৈত জিজ্ঞাসা করলেন,—নায়ক সাজবে কে? প্রভু উত্তর দিলেন,—সিংহাসনের শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহই হবেন প্রধান নায়ক। তারপর বুদ্ধিমন্ত খানকে বললেন,—তুমি গিয়ে তাড়াতাড়ি সাজগোজ সেরে ফেল, আমি নাচব। সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে মহানন্দে বাড়িতে চলে এলেন। তক্ষুনি কাথিওয়াড়ের চাঁদোয়া কেটে কেটে সাজপোশাক তৈরি করে নিলেন এবং তিনি সেগুলো প্রভুর কাছে নিয়ে এলেন। প্রভু দেখে খুশি হয়ে বৈষ্ণবদের বললেন,—আমি লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করব। কেবল মাত্র জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদেরই তা দেখবার অধিকার আছে। ইন্দ্রিয় দমন করার ক্ষমতা যাঁদের আছে কেবল তাঁরাই বাড়ির ভিতরে যাবেন। প্রভু লক্ষ্মীবেশে নাচবেন শুনে বৈষ্ণবদের সকলেরই খুব

আনন্দ হয়েছিল কিন্তু তাঁর শক্ত কথাটি শুনে আবার সবারই মন খারাপ হয়ে গেল। সকলের আগে মাটিতে দাগ কেটে অদ্বৈতাচার্য বললেন,—আজকের নৃত্য দেখার আমার কোন দরকার নেই। আমি জিতেন্দ্রিয় নই, আমি ওখানে যাব না। শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন,—আমারও ঐ একই কথা। এঁদের কথা শুনে ঈষৎ হেসে ঠাকুর বললেন,—তোমরা না গেলে কাদের নিয়ে নাচব? সর্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীচৈতন্য আবার আদেশ করলেন,—কারো চিন্তা নেই, আজ তোমরা মহাযোগেশ্বর হবে, আমাকে দেখে কারো মোহ উৎপন্ন হবে না। সকলকে নিয়ে তখন ঠাকুর চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে চললেন। পুত্রের লক্ষ্মীরূপে নৃত্য দেখার জন্য শচীমাতাও পুত্রবধূকে নিয়ে চললেন। আত্মীয় এবং ভক্তবৃন্দের গৃহিনীরাও শচীদেবীর সঙ্গে এলেন নৃত্য দেখতে। ভাগ্যবান চন্দ্রশেখরের বাড়িতেই প্রভু এই মহিমা প্রকাশ করলেন। বৈষ্ণবগণের সঙ্গে বসে ঠাকুর প্রত্যেককে নিজের নিজের পোশাক করতে বলে দিলেন। করজোড় করে অদ্বৈত আদেশ চাইলেন,—প্রভু, আমি কোন্ চরিত্রের পোশাকে সাজব? প্রভু বললেন,—সব পোশাকই তোমার, তুমি যা ইচ্ছা পরতে পার। মহানন্দে অদ্বৈতের বাহ্যজ্ঞান নেই। তিনি চোখ নাচিয়ে নাচছেন। বিদূষকের মত নানা ভাবে নাচতে লাগলেন। মহানন্দে আছেন। বৈষ্ণবগণ সকলে মিলে মহা আনন্দে কৃষ্ণনাম করে হরিধ্বনি দিয়ে উঠলেন। 'রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ' বলে মুকুন্দ কীর্তনের শুভারম্ভ ঘোষণা করলেন। প্রথমেই হরিদাসঠাকুর বিরাট গোঁফ পাকিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। মালকোচা মারা কাপড় পরে, মাথায় বিরাট পাগড়ি নিয়ে, লাঠি-হাতে সকলকে সাবধান করে বললেন,—জগতের প্রাণপতি আজ লক্ষ্মীদেবীর বেশে নৃত্য করবেন। হাতে লাঠি নিয়ে চারদিকে দৌড়ছুট করে তিনি সকলের মনে কৃষ্ণস্মৃতি জাগিয়ে তুললেন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন,—কৃষ্ণভজনা কর, কৃষ্ণের সেবা কর, কৃষ্ণনাম কর। হরিদাসের অবস্থা দেখে তাঁকে সকলেই জিজ্ঞাসা করছেন,—তুমি কে? এখানেই বা কেন? হরিদাস তার উত্তরে বললেন,—আমি বৈকুণ্ঠের পাহারাদার। সকলের মনে কৃষ্ণস্মৃতি জাগ্রত করানোই আমার কাজ। ঠাকুর সকলের মধ্যে নির্বিচারে প্রেমভক্তির হরির লুট করবেন বলে এখানে এসেছেন। তিনি নিজে লক্ষ্মীবেশে নাচবেন, তোমরা সযত্নে প্রেমভক্তি সংগ্রহ করে নাও। মুরারি গুপ্তের সঙ্গে দৌড়ে যেতে যেতে এই কথা বলে তিনি গোঁফ দুটি পাকাতে লাগলেন। মুরারি গুপ্ত এবং হরিদাস দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত, দুজনের মধ্যেই গৌরের লীলাশক্তির প্রকাশ হয়েছে। শ্রীবাস তাড়াতাড়ি মহানন্দে নারদের সাজে সেজে মঞ্চে উপস্থিত হলেন। লম্বা পাকা দাড়ি, গায়ে তিলক, কাঁধে বীণা, হাতে কুশাসন, তিনি চারদিকে তাকাচ্ছেন। হাতে কমণ্ডলু ও বগলে আসন নিয়ে রামাই পণ্ডিতও তাঁর পেছন পেছন মঞ্চে প্রবেশ করলেন। রামাই তাঁকে বসতে দিলেন, যেন সাক্ষাৎ নারদমুনির দর্শন পেয়েছেন। শ্রীবাসের সাজ দেখে সকলেই হাসছেন। হুঙ্কার করে অদ্বৈত জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কে? এখানে কেন এসেছ? শ্রীবাস বললেন,—আমি নারদ, কৃষ্ণনাম করে বেড়াই। আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়াই। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলাম। শুনলাম তিনি নদীয়ানগরে এসেছেন। বৈকুণ্ঠ শূন্য পড়ে আছে। কর্তা, গিন্নি, পরিবারের লোকেরা কেউ নেই। বৈকুণ্ঠ শূন্য দেখে মনটা খাঁ খাঁ করে উঠল, তাই প্রভুকে দেখবার জন্য এখানে চলে এলাম। প্রভু আজ লক্ষ্মীবেশে নাচবেন, তা দেখবার জন্যই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছি। শ্রীবাসের মুখে নারদের কৃষ্ণনিষ্ঠার সংলাপ শুনে বৈষ্ণবগণ জয়ধ্বনি করে উঠলেন। এখন শ্রীবাসে

আর নারদে কোন ভেদ নেই। চেহারা, কথা, স্বভাব সবই একই রকম। পুরনারীদের সঙ্গে শচীমাতাও কৃষ্ণভক্তিতে মগ্ন হয়ে এসব দেখছেন। তিনি মালিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—ইনিই কি শ্রীবাস পণ্ডিত? মালিনী দেবী উত্তর দিলেন,—তিনিই তো! সর্বলোকমাতা, পরমবৈষ্ণবী শচীমাতা শ্রীবাসের সাজ দেখে আশ্চর্য হলেন। তিনি আনন্দে মূর্ছিত ও অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। মহিলারা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি কানের কাছে কৃষ্ণনাম শোনাতে লাগলেন। জ্ঞান পেয়ে শচীমাতা গোবিন্দ স্মরণ করছেন, মহিলারা তাঁকে ধরে রাখতে পারছেন না। ঘরে-বাইরে সকলেই নির্বাক হয়ে গেছেন, কাঁদছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ সাজ করে রুক্মিনীর বেশে সেজে তাঁরই ভাবে ভাবিত হয়ে পড়েছেন। তিনি এখন নিজে বিদর্ভরাজ-ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিনীর আবেশে আছেন। অশ্রু-কালি দিয়ে অঙ্গুলি-কলমে তিনি পৃথিবী-কাগজে চিঠি লিখছেন। রুক্মিনী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে যে পত্র লিখেছিলেন তা ভাগবতে সাতটি শ্লোকে লেখা আছে। প্রভু কাঁদতে কাঁদতে সেই শ্লোকগুলো পড়তে লাগলেন। গানের আকারে এই সাতটি শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনলে ভগবানকে প্রাণপতি রূপে লাভ করা যায়। তাতে বলা হয়েছে,—হে ভুবনসুন্দর, হে অচ্যুত, তোমার লীলাগুণকথা শুনতে শুনতে কানের ভিতর দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে লোকের শরীরের তাপ-জ্বালা চলে যায়। তোমার রূপ দর্শন করে চোখ তৃপ্তি লাভ করে। তোমার রূপ গুণের কথা শুনে আমার হৃদয়-মন সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিয়ে তোমার আবেশেই ঢুলে পড়ছে, এমন কি তোমার মধ্যেই প্রবেশ করে যাচ্ছে।—তোমার ভুবনসুন্দর গুণ শুনে ত্রিবিধ দুষ্কর অঙ্গতাপ দূর হয়ে যাচ্ছে। তোমার রূপ দর্শনে সর্বনিধি লাভ। বিধি যে চোখ দিয়েছেন তা দিয়েই দেখছি। হে যদুকুলপতি, তোমার যশোগাথা শুনে নির্লজ্জ হয়ে চিত্ত তোমার কাছেই চলে যাচ্ছে। জগতে এমন কোন ধৈর্যশীলা কন্যা আছে যে সুযোগ পেয়েও তোমার চরণ ভজনা করবে না। তোমাকে ছাড়া যে মেয়েদের বিদ্যা-কুল-শীল-ধন-রূপ-বেশ-নিবাস সবই বিফল হয়। হে জগৎপতি, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর, তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমি চিত্ত ঠিক রাখতে পারেছি না। তাই তোমার শ্রীপাদপদ্মের শরণ নিয়েছি, আমার প্রাণ-মন-বুদ্ধি সবই তোমাকে সমপর্ণ করলাম। আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে তোমার সেবিকা করে নাও। আমি তোমারই প্রাপ্য, আমাকে চেদিরাজ শিশুপাল যেন ভোগ করতে না পারে। আমি যদি ব্রত-দান, দেব-দ্বিজ-গুরু অর্চনা করে থাকি, আমি যদি সত্যি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে থাকি তাহলে তুমিই আমার স্বামী হবে। শিশুপাল দূর হোক—নিপাত যাক্। আগামীকাল আমার বিয়ে হবে, দেরি না করে আজই চলে আসবে। গোপনে এসে বিদর্ভপুরের কাছে থাকবে, শেষে সব সৈন্য নিয়ে হাজির হবে। জরাসন্ধ, চৈদ্য, শাল্ব সকলকে পরাজিত করে বাহুবলের সাহায্যে তুমি আমাকে হরণ করবে। এই তোমার শক্তি প্রকাশের সময়, আমি তোমার স্ত্রী। শিশুপাল কখনো আমার যোগ্য নয়। আত্মীয় স্বজনগণকে না মেরে তুমি কি ভাবে আমাকে জয় করতে পারবে আমি তাও বলে দিচ্ছি। আমাদের নিয়ম আছে, বিয়ের আগের দিন কনে ভবানী-মন্দিরে পূজা দিতে যায়। তুমি সেই সুযোগে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে। আমার আত্মীয়দের মারবে না, তাদের দোষ ক্ষমা করে দিও। তুমি যদি আমাকে তোমার শ্রীচরণের ধুলো থেকে বঞ্চিত কর তাহলে আমি আত্মহত্যা করব, তোমাকে বলে রাখলাম। আমি যতদিনে তোমার শ্রীচরণ না পাব তত বারে প্রত্যেক জন্মেই আমার দেহের মায়া ত্যাগ করব।—হে ব্রাহ্মণ, তুমি শীঘ্র গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আমার এই সব কথা বল, তাঁকে জানাও। দেরি করো না।

শ্রীগৌরাঙ্গ রুক্মিনী আবেশে এই সব বলছেন, বৈষ্ণবগণ সকলে প্রেমে কাঁদছেন, কখনো বা হাসছেন। চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে এই নাটক অভিনয় হল। চারদিকে কেবল উচ্চ হরিধ্বনি। ঠাকুর-হরিদাস সকলকে ডেকে বলছেন,— তোমরা জেগে ওঠ। শ্রীবাস নারদচরিত্রে অভিনয় করছেন। রাত্রির প্রথম প্রহরে এসব হল, দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর প্রবেশ করলেন। তার সখী সুপ্রভাত হয়েছেন ব্রহ্মানন্দ। তাঁকে মজা করে বৃদ্ধা ঠাকুমা বলা হচ্ছে। ছোট এক খানা কাপড় পরে কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে হাতে লাঠি ধরে দাঁড়িয়েছেন। হরিদাস বললেন,—তোমরা কারা, কোথায় যাবে? ব্রহ্মানন্দ বলেন,—আমরা মথুরা যাব। শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করছেন,—তোমরা দুজন কাদের স্ত্রী? ব্রহ্মানন্দ বললেন,—কেন জিজ্ঞাসা করছ? শ্রীবাস বললেন,—কেন? জানতে চাওয়া উচিত নয় বুঝি? ব্রহ্মানন্দ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। গঙ্গাদাস জিজ্ঞাসা করলেন,—আজ কোথায় থাকবে? ব্রহ্মানন্দ উত্তর করলেন,—তুমিই থাকার জায়গা দেবে। গঙ্গাদাস বললেন,—কিছু জিজ্ঞাসা করলে রাগ কর আবার থাকার জায়গাও চাইছ। তার কোন দরকার নেই, তোমরা চলে যাও। সেই ভাল। অদ্বৈত বললেন,—এত কথার দরকার কি? পরনারী হচ্ছে মায়ের সমান। তাদের নানা কথা বলে লজ্জায় ফেলা ঠিক নয। আমার ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য-গীত প্রিয়, তোমরা এখানে নাচ-গান কর তাতে কিছু পয়সা-কড়িও পাবে। অদ্বৈতের কথা শুনে গদাধর পরমানন্দে প্রেম প্রকাশ করে নাচতে লাগলেন। রুক্মিনীর সাজে গদাধর সুন্দর নাচছেন, সঙ্গীগণ সেই নাচ অনুযায়ী গান করছেন। গদাধরের চোখে প্রেমনদী বইছে, সেই অশ্রুতে বসুমতী ভিজে গিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। গদাধর যেন মূর্তিমতী গঙ্গার মত গলে গলে পড়তে লাগলেন। গদাধর তো মূলতই শ্রীকৃষ্ণের কান্তাশক্তি। শ্রীচৈতন্য বারংবার বলেছেন,—গদাধর আমার বৈকুণ্ঠের পরিকর—প্রেমরূপা শ্রীরাধা। এই অপূর্ব নাটকের যারা গায়ক, যারা শ্রোতা,—সকলেই প্রেমে ভাসছেন। শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদে কারোই বাহ্যজ্ঞান নেই। বৈষ্ণবগণ 'হরি হরি' বলে কাঁদছেন, আর সকলে মিলেই আনন্দে মেতে উঠেছেন। চারদিকেই কৃষ্ণপ্রেমের কান্না। মাধব মিশ্রের পুত্র গদাধর রুক্মিনীর সাজে নেচেও গোপীভাবে আপ্লুত হয়ে পড়েছেন। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ আদ্যাশক্তির বেশে প্রবেশ করলেন। নিত্যানন্দ সামনে বৃদ্ধা ঠাকুমার বেশে আনন্দে কোমর বাঁকিয়ে হাঁটছেন। বৈষ্ণবগণ একযোগে জয় জয় মহাধ্বনি করতে লাগলেন। এমনই চমৎকার সাজপোশাক হয়েছে যে বিশ্বম্ভরকে কেউ চিনতে পারছে না। নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর বুড়ো ঠাকুমা বড়াই— । তিনি তাঁর পেছনে আছেন। তাই সকলে বুঝলেন ইনিই প্রভু হবেন, এছাড়া অন্য কোনো চিহ্ন ছিল না। সকলেই ভাবছেন,—এই কি সমুদ্র মন্থনে লক্ষ্মী উঠে এলেন? না কি ইনি রামের ঘরনী জানকী? মহালক্ষ্মী, না পার্বতী, না বৃন্দাবনের শ্রীরাধা, না কি ভাগীরথী, অথবা রূপবতী দয়া না কি মহাদেবের মনোমোহিনী মহামায়া? সকলেই এই সব ভাবছেন। কেউই প্রভুকে চিনতে পারলেন না। জন্মকাল থেকে প্রভুকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাও কেউ চিনতে পারছেন না। অন্যের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, শচীমাতাই চিনতে পারেননি এবং ভেবেছেন লক্ষ্মীই হয়তো অন্য মূর্তি ধরে নাচতে এসেছেন। শ্রীহরি স্বয়ং অচিন্ত্য অব্যক্ত সত্য মহাযোগেশ্বরী ভক্তি-স্বরূপা হলেন। পার্বতী পাশে থাকা সত্ত্বেও মহাযোগেশ্বর মহাদেব এই রূপ দেখে মোহিত হয়েছিলেন। তবে যে বৈষ্ণবগণ মোহিত হলেন না, তার কারণ হচ্ছে, তাঁরা আশীর্বাদ-প্রাপ্ত ছিলেন। কৃপার সাগর প্রভু সকলকে কৃপা করলেন এবং সকলেই তাঁকে

মা বলে মনে করতে লাগলেন। পরলোক থেকে যেন তাঁদের মাতৃদেবী এসেছেন, ছেলেরা সবাই আনন্দে আত্মহারা। অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ অনেককেই এই ভাবে দেখে প্রভু যেন কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছেন। বিশ্বম্ভর জগতজননী ভাবে নাচছেন এবং সঙ্গীগণ উপযুক্ত গান ধরলেন। কেউ ঠিক করতে পারছেন না যে প্রভু কোন্ ভগবৎ-কান্তার ভাবে নাচছেন? হঠাৎ প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—ওহে বিপ্র, শ্রীকৃষ্ণ কি এলেন? —তখনই বুঝতে পারা গেল তিনি বিদর্ভরাজকন্যা রুক্মিনীর আবেশে রয়েছেন। আনন্দাশ্রুর ধারা দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং গঙ্গা আবির্ভূত হয়েছেন। যখন প্রভু অট্টহাস্য করে করে ওঠেন তখন ভক্তগণ বুঝতে পারেন যে তিনি মহাচণ্ডীর ভাবে আবিষ্ট হয়েছেন। প্রভু যখন দুলে দুলে নাচেন তখন মনে হয় যেন বলদেব-কান্তা রেবতী বারুণীর দিকে এগোচ্ছেন। কখনো প্রভু বলেন,—চলো বড়াই, বৃন্দাবনের দিকে যাই তখনই বুঝতে পারা যায় তিনি শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হয়েছেন। প্রভু যখন বীরাসনে বসে ধ্যান করেন তখন মনে হয় যেন কোটি-মহাযোগেশ্বরী। প্রভু রুক্মিনী-বেশেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভগবৎ-শক্তির ভাব প্রকাশ করছেন। এই উপলক্ষে প্রভু সকলকে শিক্ষা দিলেন যেন কেউ কোন ভগবৎ-শক্তিরূপকেই নিন্দা না করে। লৌকিক এবং বৈদিক সমস্ত বিষ্ণুশক্তির সম্মান-প্রদর্শনেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায়। যে কোন দেবতার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনেই শ্রীকৃষ্ণ অসন্তুষ্ট হন্, কৃষ্ণ-পরিকরগণ সহ তাঁর পূজা করলেই তিনি সুখী হন। শ্রীকৃষ্ণ যা শিক্ষা দেন তাই সঠিক, অভাগা পাপিষ্ঠরা তা গ্রহণ করে না। সর্ব শক্তি স্বরূপা হয়ে বিশ্বম্ভর নাচছেন, এমন মনোহর নৃত্য কেউ কখনো দেখে নি। যারা এসব দেখছেন, শুনছেন, প্রভুর সঙ্গে গাইছেন তাঁরা সকলেই প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে ভাসছেন। সকল বৈষ্ণবের কথা ছেড়ে দিয়েও মাত্র একজনের চোখের জলেই যেন বন্যা বয়ে যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ আদ্যাশক্তি বেশে নাচছেন, ভক্তবৃন্দ তা মহানন্দে দেখছেন। প্রভু যেন স্বয়ং ভক্তির মূর্তি গ্রহণ করেছেন। তাঁর দেহে অশ্রু-কম্প-স্বেদ-পুলকের অন্ত নেই। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের হাত ধরে কটাক্ষ করে নাচছেন,—এসব দৃশ্যের যথাযথ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

শ্রীমান পণ্ডিত সামনে মশাল ধরলেন, হরিদাস চারদিকের লোককে সাবধান করে দিলেন। হলধর-নিত্যানন্দ তখনই মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেনে। বুড়ী বড়াইযের সাজ নষ্ট হয়ে গেল, অনন্তদেব কৃষ্ণভক্তিরসে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। নিত্যানন্দ পড়ে যেতেই বৈষ্ণবগণ সবাই কাঁদতে আরম্ভ করলেন। সকলের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেমের আকুলি-বিকুলি আরম্ভ হল, শ্রীশচীনন্দনই এসব করাচ্ছেন। কেউ কারো গলা ধরে চেঁচিয়ে কাঁদছেন, কেউ বা কারো পায়ে ধরে গড়াগড়ি করছেন। হঠাৎ মহাপ্রভু মহালক্ষ্মীর ভাবে আবিষ্ট হয়ে গোপীনাথ-বিগ্রহকে কোলে নিয়ে সিংহাসনে উঠে বসলেন। সামনে সকলে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গৌরহরি বললেন,—তোমরা আমার স্তব পড়। অনেকেই মনে করলেন, প্রভু জননী-আবেশে রয়েছেন, তাই তাঁরা সেভাবেই স্তুতি পাঠ করতে লাগলেন। কেউ পড়ছেন লক্ষ্মীস্তব, কেউ পড়ছেন চণ্ডীস্তুতি। যাঁর যেমন ভাব আসছে তিনি সেই ভাবে স্তুতি পাঠ করছেন। —জগজ্জননী মহামায়া, তুমি দুঃখিত জনকে চরণের ছায়া দাও। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম রক্ষা কর। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও তোমার মহিমার সীমা বলতে পারেন না। তুমি জগৎস্বরূপা, তুমি সর্বশক্তি, তুমিই শ্রদ্ধা-দয়া-লজ্জা এবং তুমিই মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি। তুমিই মূর্তিভেদে নানা বিদ্যার রূপ ধারণ কর। বৈদিক শাস্ত্র মতে তুমিই সর্বপ্রকৃতির

শক্তি। মাতা, তুমিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছ, তোমার সঠিক স্বরূপ, কথা বলা সুকঠিন। তুমি ত্রিগুণময়ী প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের হেতু, ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার পরিচয় সঠিক জানেন না। তুমি জগদ্‌বাসে সমস্ত জীবের আশ্রয়, তুমিই তাদের বাসস্থান, তুমি অবিকারা আদ্যাশক্তি। তুমি অদ্বিতীয়া এবং জগতের আশ্রয়। ব্রহ্মাণ্ডরূপে তুমিই সমস্ত জীবজগৎকে পালন করছ। জল রূপে তুমি সকলের প্রাণ। তোমাকে স্মরণ করলে সব বন্ধন খণ্ডন হয়। সাধুলোকের গৃহে তুমি লক্ষ্মীরূপে বিরাজ কর, অসাধুদের ঘরে তুমিই কালরূপা-অলক্ষ্মী। তুমি ত্রিজগতের সৃষ্টি-স্থিতি করাও, তোমার পূজা না করলে লোকের দুর্গতি হয়। তুমি বৈষ্ণবদের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে উদিত হও। মা, তোমার চরণের ছায়া দিয়ে আমাদের রক্ষা কর। সারা দুনিয়া তোমার মায়াতে মগ্ন হয়ে আছে, তুমি রক্ষা না করলে আর উপায় নেই। সকলকে উদ্ধার করবার জন্যই তুমি প্রকাশিত হয়েছ, দুঃখিত জীবগণকে এখন তোমার দাস করে নাও। তুমি সমস্ত জীবের বুদ্ধিস্বরূপা, তোমাকে স্মরণ করলে সব মন্ত্রাদিও শুদ্ধ হয়। উপস্থিত সকল সাধুগণ এইভাবে মহাপ্রভুর স্তুতি করছেন আর তিনিও আশীর্বাদ দেবার জন্য প্রস্তুত হযে আছেন। সকলেই বারংবার প্রণাম করে স্তবস্তুতি করছেন, —মা আমরা তোমার শরণ নিলাম, আশীর্বাদ কর যেন তোমার চরণে আমাদেব ভক্তি থাকে। এইভাবে সকলে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, বাহু তুলে কাঁদছেন। ঘরের ভেতরেও কাঁদছেন মহিলাগণ। চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ি আনন্দে ভরে গেল। মনের আনন্দে সকলেই পবিবেশ ভুলে গেছেন। এমন সময়, রাত শেষ হযে গেল। নিষ্ঠুর সূর্যালোক এসে পড়ল বাড়ির উঠোনে। নাচ থামল। আনন্দ চলে গেল। রাত পোহানোর জন্যে সকলেরই মনে মহা দুঃখ। বৈষ্ণববৃন্দ যে দুঃখ পেলেন তার সঙ্গে পুত্রশোকের তুলনাও চলে না। ভক্তবৃন্দ যে ক্রোধের নজরে সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলেন তাতে সূর্যদেবের ভস্ম হয়ে যাবারই কথা, কেবল প্রভুর কৃপাকটাক্ষে সূর্য এ যাত্রা বেঁচে গেলেন। ভক্তগণ প্রভুর নৃত্য না দেখতে পেয়ে দুঃখ পাবেন অথচ প্রভুর নৃত্যলীলা আজকের মত সমাপ্ত, তাই তিনি এ কাজটি করলেন। ভক্তরা দুঃখ পেয়ে কাঁদছেন মহিলারাও মাটিতে লুটিয়ে কাঁদছেন। সমস্ত জগৎজননী-নারায়ণীযশক্তিই বৈষ্ণবগণের গৃহিনীরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই তাঁরা শচীদেবীর চরণ ধরে কেঁদে আকুল হচ্ছেন। চারদিকে কেবল বিষ্ণুভক্তির কান্না। চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ি প্রেমানন্দে পবিপূর্ণ হযে গেল। কৃষ্ণেব বিভিন্ন অবতারের সমস্ত লীলার কথাই তাঁর পরিকব এই বৈষ্ণবগণ জানেন তাই তাদের কান্না পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাঁদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন,—ওরে রাত, তুই কেন পোহালি ? আমাদের কেন তুই কৃষ্ণপ্রেমরসে বঞ্চিত করলি ? সমস্ত বৈষ্ণবগণেব কান্না দেখে গৌরহরি অনুগ্রহ করে সকলকে সন্তান ভাব দিলেন। তিনি স্নেহ-অনুরাগে মাতৃভাব নিয়ে স্নিগ্ধ হয়ে সকলকে স্তন্যপান করালেন। প্রভু জগৎজননী হযে কমলা দয়া পার্বতী ও মহানারায়ণীব রূপ ধারণ করলেন। তিনি গীতায় যা বলেছেন সে-কথা রাখলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—আমি এই জগতের পিতা মাতা বিধানকর্তা এবং পিতামহ সবই।

বৈষ্ণবগণ মহানন্দে প্রভুর স্তন্যপান করছেন। অনাদি কাল থেকেই এঁরা এই সৌভাগ্যে মহাভাগ্যবান্। স্তন্যপান করে সকলের মনের বিরহ-ভাব কেটে গেল। সকলেই তখন প্রেমভক্তিরসে মজে গেলেন। এ সব লীলার কখনো শেষ নেই। বৈদিক শাস্ত্রাদিতে একে কেবল আবির্ভাব তিরোভাব শব্দ দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন।

মহারাজরাজেশ্বর গৌরাঙ্গসুন্দর নদীয়াতে এই সকল লীলা করে চলেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল-সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ শ্রীচৈতন্য থেকে কিছু ভিন্ন নয়। শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণই জগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। তিনি নিজের ইচ্ছাতেই বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন, সৃষ্টি করেন আবার মিলিয়ে দেন। স্বেচ্ছায় তিনি বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিচ্ছুটি হবার উপায় নেই। তাঁর সমস্ত রূপই পারমার্থিক ভাবে সুসত্য, জগতের জীবগণের উদ্ধারের জন্যই তিনি এসব লীলা করেন। এর মর্ম বুঝতে না পেরে কোন কোন পাপী প্রভুকে নিতান্তই জনৈকা গোপী মনে করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে। অপূর্ব গোপিকানৃত্য চার বেদের অমূল্য সম্পদ। ভাগবত গ্রন্থাদি শ্রবণে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। এই নাট্যলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ বড়াই-বুড়ি হয়েছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ সেজেছেন লক্ষ্মী। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় যে রূপ ধারণ করেন, নিত্যানন্দ সেই অনুরূপ সাজেন। প্রভু গোপী হলেন, নিত্যানন্দ হলেন বড়াই। অনুভব না থাকলে এর প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারা যাবে না। কৃষ্ণ-কৃপাতেই এসব মর্ম অবগত হওয়া যায়, নিত্যানন্দের স্বরূপতত্ত্ব জানা অল্পভাগ্যের কাজ নয়। লোকেরা ইচ্ছামত কেউ নিত্যানন্দকে যোগী বলেন, কেউবা আবার জ্ঞানী কিংবা ভক্ত বলেন। চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ সম্পর্কে যে যা ইচ্ছা বলুক তাতে কারো কিছু যায় আসে না। শুধু প্রার্থনা যে তাঁদের পাদপদ্মের অবস্থান যেন নিজের হৃদয়ে অনুভব করতে পারি। এব পরেও যে সব পাপীরা নিন্দা করবে তাদের মাথায় পদাঘাত বা বজ্রাঘাত হতেই পারে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড অমৃত-তুল্য। নারায়ণ এখানে লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করেছেন। প্রভু ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য জননী ভাবে নৃত্য করেছেন। তিনি সকলকে স্তন্যদান করে আশা পরিপূর্ণ করেছেন। এই নাট্যলীলার পরে সাত দিন পর্যন্ত চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে অত্যন্ত এক অদ্ভুত জ্যোতি দেখা গিয়েছিল। চন্দ্র-সূর্য-বিদ্যুৎ এক সঙ্গে জ্বললে যেমন জ্যোতি হবার কথা তেমনি মহা তেজোময় জ্যোতি দেখা যাচ্ছিল। ভাগ্যবানেরা তা মহানন্দে প্রত্যক্ষ করেছেন। যাঁরাই চন্দ্রশেখরের বাড়িতে আসেন কেউই চোখ মেলতে পারছেন না। লোকেরা বলাবলি করতে থাকেন,—আচ্ছা, চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে চোখে কিছু দেখতে পাই না কেন? অমন ধান্দা লাগে কেন? বৈষ্ণবগণ এই কথা শুনে হাসেন, কেউ কিছু প্রকাশ করেন না। শ্রীচৈতন্যের এই গভীর লীলা-মাহাত্ম্য সকলে বুঝতে পাবে না। নবদ্বীপে তিনি সর্বশক্তি নিয়ে এই ভাবে অচিন্ত্য লীলা করে চললেন। তিনি মধ্যভাগে আর কি কি লীলা করেছেন তাও জানা দরকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ হচ্ছেন বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রাণস্বরূপ। তাঁদেরই শ্রীচরণ প্রান্তে তিনি এই লীলাকীর্তন করছেন।

২/১৯ সর্ববৈষ্ণবের প্রভু বিশ্বম্ভরের জয় হোক। প্রভু, তুমি ভক্তি দিয়ে জীবকে নিজের সেবক রূপে গ্রহণ কর।

প্রভু বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে লীলা করে যাচ্ছেন কিন্তু সকলেই তা চর্মচক্ষে দেখতে পাচ্ছে না। তিনি নিত্যানন্দ ও গদাধরকে নিয়ে নিজভক্তদের বাড়িতে যেতেন। ভক্তগণ তাঁদের দেখে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করতেন। তাঁরা ছিলেন পরম ভাগবত, জগৎকে তাঁরা কৃষ্ণময় দেখেন। সকলেই ভক্তির আবেশে থাকেন। তাঁদের বাহ্যজ্ঞানও প্রায় নেই বললেই চলে। সারা দিনরাত কেবলই সংকীর্তন করেন, আর কিছুই করেন না। সকলের চেয়ে

বেশি মত্ত হচ্ছেন শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য। তাঁর অগাধ চরিত্র কেউ বুঝতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যের কৃপায় মাত্র কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তই জানেন যে অদ্বৈতাচার্য হচ্ছেন মহা চৈতন্যভক্ত। বিশ্বম্ভর যখন বাহ্যজ্ঞানে থাকেন তখন তাঁর আচরণ একজন ভক্তের মত, সকল বৈষ্ণবকেই তখন তিনি খুব ভক্তি করেন, বিশেষ ভাবে অদ্বৈত আচার্যকে। এতে কিন্তু অদ্বৈত মনে মোটেই শান্তি পান না। তিনি নিজে নিজে গর্জে ওঠেন, মনে আদৌ স্বস্তি নেই। তাঁর মনের কথা হচ্ছে,—চোরা ব্যাটা সব সময় আমাকে বিপদে ফেলে, ইষ্টদেবতা হয়ে সে আমার পায়ে হাত দেয়। আমি তাঁর সঙ্গে গায়ের জোরেও পারব না, তিনি অত্যন্ত বলশালী। আমার হাত আটকে রেখে পায়ের ধুলো নেয়। ভক্তিই আমার একমাত্র সম্বল, ভক্তি দিয়েই তাঁকে পরাস্ত করতে হবে। তাঁর কপটতা ঘুচাতে পারলে তবে তো লোকে আমাকে মান্য করবে? ভৃগুকে জয় করে বিষ্ণুরূপে তিনি ভেবেছেন এমন অনেক শিষ্যকেই তিনি ঠকাতে পারবেন। কিন্তু আমি প্রভুকে এমন চটিয়ে দেব যে তিনি নিজহাতে আমাকে মারতে উঠবেন। ভক্তি প্রচার করার জন্যই প্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন, আমি সেই ভক্তিকেই অগ্রাহ্য করব—এই স্থির করেছি। ভক্তিকে না মানলেই প্রভু ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হয়ে আমাকে চুলে ধরে শাস্তি দেবেন। এই কথা ভেবে তিনি হরিদাসকে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলেন। নবদ্বীপ থেকে শান্তিপুর গিয়ে তিনি নিজের বুদ্ধিতে এক ফন্দি করলেন। অদ্বৈতাচার্য ভাবাবেশে মত্ত হয়ে দুলছেন আর যোগবাশিষ্ট নামক জ্ঞানমার্গীদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছেন। জ্ঞান ছাড়া বিষ্ণুভক্তিতে কি হবে? জ্ঞানই হচ্ছে সব কিছুর প্রাণ, জ্ঞানেই সর্বশক্তি। এই জ্ঞানের সম্যক পরিচয় না পেয়ে কেউ কেউ যেন ঘরে রত্ন হারিয়ে বনে গিয়ে খোঁজ করতে থাকে। বিষ্ণুভক্তির আয়নার দিকে তাকাতে গেলে জ্ঞানচক্ষু থাকা চাই। অন্ধ জনের দর্পণে কি প্রয়োজন? আমি বহু শাস্ত্র পাঠ করে এটাই বুঝেছি যে জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ। হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্যকে ভালমতই জানেন, তাই তিনি এই ব্যাখ্যা শুনে মনে মনে হাসছেন। অদ্বৈতকে সাধারণ লোকেরা চিনবে কি করে? সাধুব্যক্তিরা অবশ্যই জানেন।

সর্ববাঞ্ছাকল্পতরু মহাপ্রভু অদ্বৈতের মনোবাসনা বুঝতে পারলেন। একদিন তিনি নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে নিজের সৃষ্টিখানা ভাল করে দেখছিলেন। ব্রহ্মা তখন মনে মনে খুশি হয়েছিলেন। প্রভু তাঁর সৃষ্টি দেখছেন—এই জন্য। দুটি চাঁদ যখন একই সঙ্গে চলে যাচ্ছিলেন তখন লোকেরা নিজেদের মনের ভাব অনুসারে তাঁদের দর্শন পেয়েছিলেন। অন্তরীক্ষ থেকে দেবতারা দেখে মনে মনে ভাবছেন,—স্বর্গই আজ পৃথিবী হয়ে গেছে আর পৃথিবীই হয়েছে স্বর্গ। দেবতারা নিজেদের মানুষ বলে ভাবতে লাগলেন এবং মানুষদের মনে করলেন দেবতা। দুটি চন্দ্র দেখে তাঁরা বিচার করলেন,—স্বর্গে কখনো দুটি চাঁদ হতে পারে না। কোন দেবতা আবার বললেন,—একটিই আসল চাঁদ, আরেকটি তার ছায়া। অন্য জন বলছেন,—চাঁদকে দুভাগ করে ভগবান হয়তো আবার জোড়া দিয়েছেন। কেউ বা বললেন,—পিতা আর পুত্র অনেক সময় দেখতে এক রকম হয়। এও হয়তো তাই, এক চাঁদ আর-এক চাঁদের সন্তান। বেদ পর্যন্ত প্রভুর ইয়ত্তা করতে পারেন না, দেবতারা কি করে পারবেন?

শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীনিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করছেন। গৌরহরি নিত্যানন্দকে বললেন,—চল একবার শান্তিপুরে আচার্যের বাড়িতে যাই। পরম চঞ্চল, মহারঙ্গী দুই প্রভু সেই পথেই শান্তিপুরের দিকে চললেন। মাঝে পথে গঙ্গার পারেই ললিতপুর নামে

একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে নদীর তীরে পথের ধারে একজন সন্ন্যাসীর পোশাকধারী গৃহস্থ আছে। প্রভু নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এ কার বাড়ি? নিত্যানন্দ বললেন,—এতো সন্ন্যাসীর ঘর দেখছি। প্রভু বললেন,—চল, দেখি তার সঙ্গে দেখা হয় কিনা। খুশি মনে দুজনে মিলে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলেন। সুন্দর হাসিখুসি ব্রাহ্মণকুমার দেখে সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করলে,—বিদ্যালাভ কর, ধনে বংশে বৃদ্ধি হোক, ভাল বিয়ে হোক। প্রভু শুনে বললেন,—এতো আশীর্বাদ হল না। বরং বল, তোমার কৃষ্ণভক্তি লাভ হোক। বিষ্ণুভক্তির আশীর্বাদ হচ্ছে অক্ষয় অব্যয়। তুমি যা বললে তা মোটে তোমার যোগ্য নয়। সন্ন্যাসী ঠাট্টার হাসি হেসে বললে,—যা শুনেছি ঠিকই দেখছি। ভাল বলতে গেলাম আর দেখছি বামুনের ছেলে আমাকে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসছে। আমি তাকে ধনবৃদ্ধির আশীর্বাদ করলাম আর সে কিনা আমাকে নিন্দা করছে। সন্ন্যাসী এবারে প্রভুকে বললে,—ব্রাহ্মণকুমার, তুমি আমার আশীর্বাদের নিন্দা করছ কেন? এই সংসারে জন্ম লাভ করে যে ভোগবিলাস করল না, যে উত্তম কামিনীর সঙ্গ করল না, যার ধন-দৌলত নেই তার জীবনে বেঁচে দরকার কি? আমি সেই দন দৌলতের আশীর্বাদ করলাম আর তুমি তা বুঝলে না? আচ্ছা, না হয় ধর, বিষ্ণুভক্তি না হয় লাভ করলে কিন্তু বাঁচবে কি খেয়ে বল দেখি? প্রভু সন্ন্যাসীর কথা শুনে হাসছেন আর দুঃখে কপালে হাত রেখে বললেন,—ভক্তি ছাড়া কেউ যেন আর কিছু না কামনা করে। সন্ন্যাসীর উপলক্ষ্যে প্রভু সকলকেই এই শিক্ষা দিলেন। প্রভু সন্ন্যাসীকে বললেন,—জীবের কর্মফলেই তার খাদ্য জুটে যায়। লোকে তো টাকা চায়, পুত্র চায় অথচ তা হারায় কেন? কোন লোকই শরীরের স্বরপীড়া চায় না, তবু মানুষের রোগ হয় কেন? এসব হচ্ছে মানুষেব কর্মফল। কোন কোন পরম ভাগবত এর মর্ম জানেন। বৈদিক শাস্ত্রও স্বর্গসুখের কথা বলেন, তা হচ্ছে মূর্খদের জন্য বেদের করুণা মাত্র। মানুষ বৈষয়িক সুখ চায়, মনের অবস্থা বুঝেই শাস্ত্র এই কথা বলেছে। গঙ্গাস্নান ও হরিনাম করলে ধনপুত্র লাভ পাওয়া যায়—শাস্ত্রের এই কথা শুনেই লোকে গঙ্গাস্নান ও হরিনাম করতে চায়। যে কোন-ভাবে গঙ্গাস্নান করলে, হরিনাম নিলেও দ্রব্যগুণের মত তাতেই ভক্তি লাভ হবে। বেদের এই কথা মূর্খ লোকেরা বোঝে না, তাই কৃষ্ণভক্তি ছেড়ে বিষয়সুখে মজে থাকে। হে সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি নিজেই ভালমন্দ বিচার করে দেখ। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া অন্য কোন আশীর্বাদ চাইবার নেই। সন্ন্যাসীকে উপলক্ষ্য করে জগৎগুরু প্রভু বৈদিক প্রমাণ দিয়ে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিচ্ছেন। যার সত্য জ্ঞান আছে সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম নেয়। আর যাদের পরনিন্দাই এক মাত্র সম্বল তারা এই নাম নেয় না। প্রভুর কথা শুনে সন্ন্যাসী ভাবছে,—এই সন্ন্যাসী হয়তো ব্রাহ্মণকুমারকে তুকতাক করে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সন্ন্যাসী বললে,—এমন দিনকাল পড়েছে যে এখন আমি এই বালকের কাছেও যেন কিছুই জানি না। আমি নানা দেশ ঘুরেছি,—অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুরী, বদরিকাশ্রম, গুজরাট, কাশী, গয়া, বিজয়নগর, সিংহল ইত্যাদি। কিসে ভালমন্দ হয় তা এখন আমি কিছুই জানি না? দুধের শিশুর কাছে আমাকে শিখতে হবে? নিত্যানন্দ বললেন,—সামান্য বালকের সঙ্গে তোমার তর্ক করার দরকার নেই। আমি তোমার মহিমা জানি। আমাকে দেখে তুমি একে ক্ষমা কর। প্রশংসা শুনে সন্ন্যাসী খুশি হল এবং তাঁদের আহারের জন্য আমন্ত্রণ জানাল। নিত্যানন্দ বললেন,—বিশেষ দরকারি কাজে যাচ্ছি, তাই বিলম্ব করতে পারব না, কিছু

দিয়ে দাও। স্নান করে পথে খাব। সন্ন্যাসী বললে,—এখানেই স্নান কর, কিছু খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তবে আবার হাঁটতে থাকবে।

পাতকী উদ্ধারের জন্যই দুই প্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই দুজনেই সন্ন্যাসীর বাড়িতে থেকে গেলেন। গঙ্গাস্নানে শ্রান্তি গেল, দুজনে তখন ফলাহারে বসলেন। শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে দুজনে সন্ন্যাসীর সামনে দুধ আম কাঁঠাল ভোজন করলেন। বামাচারী সন্ন্যাসী মদ্য পান করে। ইঙ্গিতে তাই নিত্যানন্দকে বললে,—তোমার মত অতিথি আবার কবে পাব? কিছু মদ্য দিব কি? নিত্যানন্দ নানা স্থানে অনেক ঘুরেছেন, তিনি সবই জানেন। বুঝলেন যে এই সন্ন্যাসী মদ্যপায়ী। বারে বারে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করছে মদ আনবে কিনা। নিত্যানন্দ বললেন—তাহলে আমাকে দৌড়ে পালাতে হয়। দুজনের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে সন্ন্যাসীর স্ত্রী তন্ময় হয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন। স্ত্রী স্বামীকে বললেন,—এঁদের খাওয়া নষ্ট করবে নাকি? গৌরহরি জিজ্ঞাসা করলেন,—সন্ন্যাসী আনন্দের কথা কি বললে? নিত্যানন্দ জানালেন,—মনে হয় মদের কথা বলছে। প্রভু তখন বিষ্ণু স্মরণ করে আচমন শেষে শীঘ্র রওনা করলেন। দুই প্রভু তাড়াতাড়ি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে অদ্বৈতাচার্যের বাড়ির দিকে ভেসে চললেন। স্ত্রৈণ মদ্যপায়ীকেও প্রভু কৃপা করে থাকেন কিন্তু শাস্ত্রের পণ্ডিত হয়েও নিন্দক হলে তাকে প্রভু কৃপা করেন না। স্ত্রীসঙ্গী মদ্যপায়ী সন্ন্যাসীর ঘরেও ঠাকুর গিয়েছিলেন। ফলারের পরে বিশ্রাম করে প্রভু আলোচনার মাধ্যমে তাকে ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন। এ জন্মে না হলেও আগামী জন্মে এরা উদ্ধার পাবে কিন্তু নিন্দকদের প্রভু কখনো কৃপা করেন না। অভক্ত সন্ন্যাসীরা প্রভুর দেখা পায় না। কাশীর সন্ন্যাসীরাই তার সাক্ষী। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিনি যখন কাশীতে গিয়েছিলেন তখন কাশীব সন্ন্যাসীরা তাঁর নাম শুনে তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন। এরা সকলেই আজন্ম কাশীবাসী, যশস্বী, তপস্বী এবং বেদান্তবিদ্। কিন্তু এদের এক দোষে সবই পণ্ড হল। এরা বেদান্ত পড়ান কিন্তু বিষ্ণুভক্তি ব্যাখ্যা করেন না। অন্তর্যামী গৌরহরী তা জানেন বলেই কাশীতে গিয়েও তাঁদের দেখা দেন নি। কাশীতে গিয়ে তিনি দু মাস যাবৎ বামচন্দ্র পুরীর মঠে লুকিয়ে ছিলেন। ভাদ্র-পূর্ণিমার দুদিন আগেই প্রভু লুকিয়ে কাশী ত্যাগ করলেন। পরে সন্ন্যাসীরা শুনতে পেয়েছেন কিন্তু আর দেখা হল না সে যাত্রায়। নিন্দার পাপেই তাদেব সব বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছে, পরেও তাদের মনে এজন্য অনুতাপ হয় নি। বরং তাঁরা বললেন,—সন্ন্যাসে আমরা তাঁর চেয়ে জ্যেষ্ঠ, তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলেন কেন? দু দিন থেকে বিশ্বরূপক্ষৌরের পরেই যেতে পারতেন? ভক্তিহীন হলে এই রকমই হয়, শিব নিন্দকের পূজা গ্রহণ করেন না। কাশীতে বাস করে যে পরের নিন্দা করে শিব তাকে শস্তি দেন। শিবের কাছে অপরাধ করার ফলে বিষ্ণু-বন্দনায় তার প্রবৃত্তি হয় না। বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচারদের বাদ দিয়ে প্রভু আব সকলকেই উদ্ধার করবেন। মদ্যপের ঘরেও তিনি স্নান-ভোজন করলেন কিন্তু নিন্দার অপরাধে বেদান্তীরাও তাঁর দেখা পেলেন না। শ্রীচৈতন্যের কাছে শাস্তি পাবার যার ভয় নেই সে জন্মে জন্মে যমের কাছে নরকে দণ্ডনীয় হয়। ব্রহ্মা, শিব, অনন্তদেব, লক্ষ্মীদেবী—সকলের মুখেই সর্বদা যাঁর কথা সেই গৌরহরির গুণকীর্তনে যাদের মন যায় না তাদের সন্ন্যাস এবং বেদান্তপাঠ সবই অকারণ।

আনন্দে দুই প্রভু গঙ্গার স্রোতে ভেসে চলেছেন। মহাপ্রভু বারবার হুঙ্কার করে বলছেন,—আমিই সেই, আমিই সেই। অদ্বৈতাচার্য আমার নিদ্রা ভঙ্গ করে এখানে নিয়ে

এল, এখন সে ভক্তি রেখে জ্ঞানের ব্যাখ্যা করছে? আজ চোখের সামনে দেখবে কেমন শাস্তি দেব। দেখব কি করে সে জ্ঞানযোগ রাখতে পারে? গঙ্গাস্রোতে ভেসে মহাপ্রভু এই রকম তর্জনগর্জন করে চলেছেন। নিত্যানন্দ কিছু না বলে মনে মনে হাসছেন। দুই প্রভু গঙ্গায় ভেসে চলেছেন যেন ক্ষীরোদসাগরে শয্যারূপে সহস্রশীর্ষ অনন্তদেব এবং তাতে শুয়ে আছেন বিষ্ণু। এদিকে ভক্তিযোগের প্রভাবে অদ্বৈত মনে মনে বুঝতে পারলেন যে তিনি সুফল লাভ করবেন। ঠাকুর রেগেমেগে আসছেন জেনে অদ্বৈত আরো বেশি করে জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। চৈতন্যভক্তের লীলা বুঝা সহজ নয়। -দুই প্রভু গঙ্গা দিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে নিত্যানন্দের সঙ্গে এসে দেখছেন,—অদ্বৈত সানন্দে জ্ঞান-ব্যাখ্যা করে অঙ্গ দোলাচ্ছেন। প্রভুকে দেখে হরিদাস ঠাকুর এবং অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুত প্রণাম করলেন। অদ্বৈতগৃহিনী সীতাদেবী মনে মনে প্রভুকে প্রণাম নিবেদন করলেন কিন্তু প্রভুর মূর্তি দেখে তিনি দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কোটি সূর্যের মত গৌরহরির তেজ, দেখে সকলেই ভয় পেয়ে গেল। ক্রুদ্ধ প্রভু অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করলেন,—জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে বড় কে? অদ্বৈত উত্তর করলেন,—চিরকালই জ্ঞান বড়, যার জ্ঞান নেই তার ভক্তিতে কি হবে? —অদ্বৈতের মুখে 'জ্ঞান বড়' শুনে শচীনন্দন রাগে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তিনি অদ্বৈতকে আসন থেকে তুলে এনে উঠোনের মধ্যে আচ্ছা করে প্রহার করতে লাগলেন। পতিব্রতা জগন্মাতা অদ্বৈতগৃহিনী সব তত্ত্ব জেনেও অধীর হয়ে পড়লেন। —বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রাণে মেরো না, কার শিক্ষায় এমন অপমান করছ? বুড়ো বামুনের কিছু হলে তখন তুমি সামলাতে পারবে?—সীতাদেবীর কথায় নিত্যানন্দ মৃদু হাসছেন, হরিদাস ঠাকুর ভয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করছেন। মহাপ্রভু রেগে গিয়ে সীতাদেবীর কথা কিছুই শুনলেন না, অদ্বৈতকে তিনি সমানে তর্জনগর্জন করেই যাচ্ছেন। —আমি ক্ষীরসাগরের মাঝে শুয়ে ছিলাম, তোমার প্রয়োজনে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে এনেছ। তোমার উচিত ছিল, আমাকে এনে ভক্তিধর্ম প্রচার করবে, এখন তুমি ভক্তি লুকিয়ে জ্ঞান ব্যাখ্যা করছ? যদি ভক্তিকে মনের মধ্যে চেপে রাখবারই তোমার ইচ্ছা ছিল তবে আমাকে নিয়ে এলে কেন? আমি তোমার সঙ্কল্প রক্ষা করেছি, তুমি আমাকে এখন বিব্রত করছ কেন? —অদ্বৈতকে ছেড়ে প্রভু দরজায় বসে হুঙ্কার দিয়ে স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করে বললেন, —নাঢ়া অদ্বৈত, তুমি তো সবই জান। আমি কংসকে মেরেছি, ব্রহ্মা-শিব-অনন্তদেব-লক্ষ্মীদেবী আমার সেবা করেন, আমি শেয়াল সমান নকল বাসুদেবকে চক্র দিয়ে মেরেছি। আমি চক্র দিয়ে কাশীপুরী ভস্ম করেছি, আমার বাণের দ্বারাই শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে নিহত করেছেন। আমার চক্রই বাণরাজার হাত কেটেছে, নরকাসুরের মৃত্যু ঘটিয়েছে। আমিই বাম হাতে গিরি-পর্বত ধারণ করেছি, আমিই স্বর্গ থেকে পারিজাত এনেছি। আমিই বলিকে ছলনা করে কৃপা করলাম, আমিই হিরণ্যকশিপুকে মেরে প্রহ্লাদকে রক্ষা করলাম। —প্রভু এইভাবে নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশ করলে অদ্বৈতাচার্য প্রেমভক্তির জোয়ারে যেন ভেসে যেতে লাগলেন। শাস্তি পেয়ে আনন্দে অদ্বৈত বিনীত ভাবে হাতে তালি দিয়ে নাচতে লাগলেন। —যেমন অপরাধ করেছি তেমনি শাস্তি পেলাম। প্রভু, তুমি ভালই করেছ, আমি অল্পেই রক্ষা পেলাম। এখন তোমার কর্তৃত্বের কথা বলছি, তুমি দোষ অনুযায়ী আমাকে শাস্তি দিয়েছ। প্রভু, সেবকের তো এতেই মনের জোর বাড়ে। —এই কথা বলে অদ্বৈতাচার্য আনন্দে নাচতে থাকেন। সারা উঠোনে ঘুরে নাচতে নাচতে তিনি ভ্রূ বাঁকিয়ে বলতে

লাগলেন,—প্রভু, তুমি যে আমাকে স্তুতি-প্রণাম করছিলে এখন সে সব ঢং কোথায় গেল? আমি দুর্বাসা নই যে আমাকে উলটোপাল্টা বুঝিয়ে সারা গায়ে এঁটো লেপে দেবে? আমি ভৃগুমুনিও নই যে বুকে তার পদচিহ্ন নিয়ে বসে থাকবে? আমার নাম 'অদ্বৈত'—তোমার শুদ্ধ ভক্ত। জন্মেজন্মে তোমার মুখের প্রসাদ আমার গ্রাস। তোমার উচ্ছিষ্টের প্রভাবে আমি তোমার মায়াকে গ্রাহ্যও করি না, শাস্তি তো দিলে—এবারে পদছায়া দাও। —এই বলে অদ্বৈতাচার্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে মাথা রেখে পড়ে রইলেন। প্রভু সসম্মানে অদ্বৈতকে কোলে তুলে খুবই কাঁদতে লাগলেন। অদ্বৈতের ভক্তি দেখে নিত্যানন্দও কেঁদে যেন নদী বইয়ে দিলেন। মাটিতে পড়ে হরিদাস কাঁদছেন, সীতাদেবী কাঁদছেন,—আর কাঁদছেন সব ভক্তবৃন্দ। অদ্বৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দও কাঁদছেন। কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে আচার্যের বাড়ি ভরে গেল। অদ্বৈতকে প্রহার করে প্রভু লজ্জিত হয়েছেন, তাই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে এবারে তাঁকে বর দিলেন,—তোমাকে ক্ষণকালের জন্যেও যে আশ্রয় করবে সে পশুপাখী-কীটপতঙ্গ হলেও এবং আমার কাছে শত অপরাধ করলেও আমি তাকে অবশ্যই কৃপা করব।

আশীর্বাদ শুনে অদ্বৈতাচার্য কেঁদে প্রভুর চরণ ধরে বিনীত ভাবে বললেন,—প্রভু, তোমার কথা তো মিথ্যে হবার নয়, তবে আমার এক প্রতিজ্ঞার কথা শোন, যদি তোমাকে না মান্য করে কেউ আমার সেবক হতে চায় তাহলে সেই আমার ভক্তিই তাকে বিনাশ করবে। তোমার পাদপদ্মে যার ভক্তি হবে না, তোমাকে মান্য করবে না, সে কখনো আমার গণমধ্যে স্থান পাবে না। তোমার সেবকই আমার প্রাণ। তোমাব অনাদর আমি সহ্য করতে পারব না। আমার পুত্র কিংবা আমার ভৃত্যও যদি বৈষ্ণবাপরাধী হয তাহলে তাকে আমি আমার নজরের সামনে থাকতে দেব না। তোমাকে ডিঙ্গিযে যদি কেউ কোটি দেবতাকেও ভজনা করে তাহলে কোন ছলে তার সংহার হবেই। এটা কেবল আমার কথা নয়। শাস্ত্রও তাই বলেন। কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণের মৃত্যুই তার প্রমাণ। কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণ অত্যন্ত একাগ্র চিত্তে শিবের আরাধনা করেছিলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন,—বর প্রার্থনা কর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, মারণযজ্ঞ কর। বিষ্ণুভক্তদের অপমান করলে কিন্তু সেই যজ্ঞেই তোমার প্রাণ সংহার করব। শিবের কথার ইঙ্গিত সে ধরতে পারে নি, তাই মারণযজ্ঞ আরম্ভ করে দিল। যজ্ঞ থেকে এক মহাভয়ঙ্কর রূপধারী বেরিয়ে এল। তার তিনটি হাত, তিনটি পা, তিনটি মাথা, তার জঙ্ঘা তালগাছের মত। সে বললে,—বর চাও। রাজা বললে,—দ্বারকা নগরী পুড়িয়ে দাও। মহাশৈবমূর্তি এ কথা শুনে খুশি হলেন না। বুঝলেন যে রাজা সুদক্ষিণের ইচ্ছা পূরণ হবে না। সুদক্ষিণের অনুরোধে তিনি দ্বারকায় গেলেন। কিন্তু দ্বারকারক্ষক চক্র তাঁর দিকে ধাওয়া করে আসছে। সুদর্শন চক্রের কাছে পালিয়েও রক্ষা নেই। মহাশৈবমূর্তি সুদর্শনচক্রের পায়ে পড়ে বললেন,—দুর্বাসাও যার কাছে থেকে পালাতে পারে নি, যার কাছ থেকে ব্রহ্মা এবং শিবও দুর্বাসাকে রক্ষা করতে পারে নি, সেই মহাবৈষ্ণবতেজের কাছ থেকে আমি কোথায় পালাব? হে প্রভু সুদর্শন, তুমি শঙ্করের তেজের চেয়েও তেজস্বী। শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের জয় হোক। হে বৈষ্ণবপ্রধান মহাচক্র, তুমি দুষ্টের কাছে ভয়ঙ্কর, শিষ্টের রক্ষক, তোমার জয় হোক। স্তুতি শুনে সুদর্শন চক্র খুশি হয়ে বললেন,—কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণকে দগ্ধ কর। তিনি দ্বারকা থেকে কাশীতে ফিরে এসে রাজপুত্রকে বিনাশ করেছিলেন। প্রভু তোমাকে উপেক্ষা করে সুদক্ষিণ শিবাপূজা করেছিল, তাই তার যজ্ঞই

তাকে মারল। প্রভু, তাই আমি বলছি, তোমাকে অবজ্ঞা করে কেউ যদি আমাকে সেবা করে তাহলে তাকে আমি পুড়িয়ে মারব। তুমি আমায় প্রাণনাথ, পিতা-মাতা-বন্ধু-ধন-জন সবই। যে তোমাকে লঙ্ঘন করে আমাকে প্রণাম করে তার অবস্থা হচ্ছে যেন মাথা কেটে বাদ দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করার মত। রাজা সত্রাজিৎ উপাসনা করে সূর্যদেবের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। ভক্তিবশে সূর্যদেব তার মিত্রও হয়েছিলেন। কিন্তু তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ভাই প্রসেন সহ সত্রাজিতের মৃত্যু হল। সূর্যদেব তা দেখে খুশিই হয়েছিলেন। দুর্যোধন বলরামের শিষ্য হয়েও তোমার আদেশ অমান্য করায় সবংশে মারা গেল। তুমি সকল দেবগণের মূল, সবাকার ঈশ্বর, দৃশ্য এবং অদৃশ্য যা কিছু আছে সবই তোমার আজ্ঞায় চলে। প্রভুকে ডিঙ্গিয়ে যে তার কর্মচারীর সঙ্গে ব্যবস্থা করে, কর্মচারী তার টাকাও খায় তার ক্ষতিও করে। তোমাকে না মেনে শিব প্রমুখ দেবগণকে পূজা করার মানে হল, গাছের মূল কেটে দিয়ে ডাল-পালার যত্ন করার মত। দেবদ্বিজ-যজ্ঞধর্ম সবকিছুর আদি মূল তুমি, তোমাকে যে ভজনা করে না আমি কখনো তার পূজা গ্রহণ করি না। মহাতত্ত্বপূর্ণ অদ্বৈতাচার্যের কথা শুনে শ্রীগৌরাঙ্গ হুঙ্কার করে বললেন,—সকলে মন দিয়ে আমার কথা শোন। আমার সেবককে লঙ্ঘন করে যে আমার পূজা করে সেই অধম লোকটি যেন আমাকেই খণ্ড খণ্ড করে, তার পূজা আমার গায়ে আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দেয়। যে আমার ভক্তের একবার মাত্র নিন্দা করে, আমার নাম কল্পতরুর মত সব বাঞ্ছা পূরণ করলেও তার কিন্তু সর্বনাশই করে থাকে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সবই আমার আজ্ঞাবহ, এই জন্যেই যে ব্যক্তি অন্যকে হিংসা করে সে অধঃপাতে যায়। অদ্বৈত, তুমি তো আমার দেহের চেয়েও আমার প্রিয়। কেউ যদি দৈবাৎ তোমাকে উপেক্ষা করে তাহলে অবশ্যই তার সর্বনাশ হবে। যে কারো নিন্দা করে না, তেমন লোককে যদি সন্ন্যাসীও নিন্দা করে তাহলে সেই সন্ন্যাসীর সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হয়ে যাবে। —শ্রীগৌরহরি বাহু তুলে জগৎসংসারকে ডেকে বলেন,—কারো নিন্দা করবে না, কৃষ্ণনাম নেবে। অনিন্দক হয়ে যে কৃষ্ণনাম নেবে তাকে আমি সহজেই উদ্ধার করব। মহাপ্রভুর এই কথা শুনে সব ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনি করে উঠলেন। অদ্বৈতাচার্য প্রভুর দুটি শ্রীচরণ ধরে কাঁদতে থাকেন। প্রভু কাঁদেন অদ্বৈতকে কোলে নিয়ে। অদ্বৈতের প্রেমাশ্রুতে সারা পৃথিবী যেন ভেসে যায়। অদ্বৈতাচার্যের ঘটনা এমনি মহা অচিন্তনীয়। অদ্বৈতাচার্যের কথা যিনি বুঝতে পারবেন, ঈশ্বরের সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নেই বললেই হয়। অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দের মধ্যে যে ঝগড়া বেধে যায় তা কেবলই প্রেম-কোন্দল। বিষ্ণুর এবং বৈষ্ণবের কথা বুঝতে পারা খুবই দুষ্কর। একমাত্র তাঁর কৃপা হলেই মর্ম অনুভব করা যায়। প্রভু, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতের মধ্যে আরো যে সব কথাবার্তা হয়েছে তা যথাযথ বর্ণনা করতে পারেন একমাত্র বলরাম। তিনি সহস্র বদনে এই গুণকথা কীর্তন করতে পারেন।

কিছুক্ষণ পরেই প্রভু বাহ্যজ্ঞান লাভ করে হেসে হেসে অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আমি কি কিছু ছেলেমানুষী করে ফেলেছি? অদ্বৈত বললেন,—তা তোমার পক্ষে এমন কিছু বেশি নয়। শুনে প্রভু নিত্যানন্দকে বললেন,—আমার কিছু ছেলেমানষী দেখলে আমাকে ঠেকাবে। প্রভুর কথায় কৌতুক অনুভব করে সকলে সকলের দিকে তাকিয়ে নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈত এবং প্রভু নিজেও উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। অদ্বৈতগৃহিনী সীতাদেবীকে প্রভু মা বলে ডাকেন। প্রভু তাঁকে বললেন,—তাড়াতাড়ি রান্না চাপিয়ে দাও, কৃষ্ণের ভোগ লাগাও। খেতে হবে তো। নিত্যানন্দ, হরিদাস ও

অদ্বৈত প্রমুখ বৈষ্ণবগণের সঙ্গে প্রভু গঙ্গায় চান করতে গেলেন। স্নান করে এসে প্রভু পা ধুয়ে ঘরে ঢুকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। অদ্বৈত বিশ্বম্ভরের পায়ে পড়েছেন আবার হরিদাস পড়েছেন অদ্বৈতের পায়ে। তিন বিগ্রহ মিলে যেন এক ধর্মসেতু হয়েছে। এই অপূর্ব কৌতুক দেখে নিত্যানন্দ হাসছেন। মহাপ্রভু উঠে দেখছেন, অদ্বৈত পায়ে পড়ে আছেন। তাই প্রভু তাড়াতাড়ি উঠে বিষ্ণু-স্মরণ করলেন। এবারে অদ্বৈতকে হাতে ধরে নিত্যানন্দকে নিয়ে প্রভু খাবার ঘরে গেলেন। তিনজন এক সঙ্গে খেতে বসলেন। তিন জনই নিজ-নিজ আবেশে আবিষ্ট। নিত্যানন্দের হচ্ছে বাল্যভাব। হরিদাস দরজায় বসে ভোজন করছেন। প্রভুর সমস্ত প্রকাশ দর্শন করবার যোগ্যতা হরিদাসের ছিল। মহামতী যোগেশ্বরী অদ্বৈতঘরনী শ্রীহরিকে স্মরণ করে পরিবেশন করছেন। চঞ্চল তিন ঠাকুর দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পায়েস সবই ভোজন করছেন। অদ্বৈতের দিকে তাকিয়ে নিত্যানন্দ হাসছেন,—দুজনে একই তত্ত্ব কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাবশে এখন দু ভাগে বিভক্ত। পেট পুরে খাওয়া হয়ে গেছে। তবু থালায় কিছু রয়েছে। এবারে নিত্যানন্দের বাল্য-আবেশে ছেলেমানুষী আরম্ভ হল। তিনি সারা ঘরে ভাত ছিটিয়ে দিয়েছেন। প্রভু হায় হায় করে উঠলেন। হরিদাস দেখে হাসছেন। অদ্বৈত রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগলেন,—এই নিত্যানন্দ আমার জাত মারলে। কোথা থেকে এসে এক মোদো-মাতালের সঙ্গ হল। গুরু নেই, কিছু নেই। নিজেই সন্ন্যাসী বলে পরিচয় দিয়েছে। কোন্ গ্রামে জন্ম তাও জানি না। কি জাত তাও কেউ জানে না। পাগলা হাতির মত হেলে দুলে চলে। পশ্চিমে যার-তার ঘরে খেয়েছে। এখানে এসে ব্রাহ্মণের সঙ্গে খেতে বসেছে। হরিদাস, তুমি দেখে নিও, এই মাতাল নিত্যানন্দ সর্বনাশ করবে। রাগে অদ্বৈতের কাপড়চোপড় খুলে গেছে। তিনি অট্টহাস্য করে হাতে তালি দিয়ে নাচছেন। অদ্বৈতের অবস্থা দেখে গৌরাঙ্গও হাসছেন। হাসি দেখে নিত্যানন্দ দুই বুড়ো আঙ্গুল তুলে দেখাচ্ছেন। শুদ্ধহাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধভাব দেখে ছেলে-বুড়ো সকলেই হাসতে থাকেন। কিছু পরেই বাহ্যজ্ঞান এল। মুখ ধুয়ে সকলে সকলের সঙ্গে কোলাকুলি করতে লাগলেন। নিত্যানন্দ আর অদ্বৈত কোলাকুলি করে প্রেমানন্দে অস্থির। এই দুজন হলেন মহাপ্রভুর দুটি বাহু, এঁদের মধ্যে কখনো অপ্রীতি নেই। তথাপি যে দুজনের মধ্যে সময় সময় কলহ দেখা যায় তা কেবল মাত্র গৌরহরির একটি লীলা। ভগবানের বাল্যলীলা, আর কিছু নয়।

এইভাবে মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে নিজের আনন্দে হরিনাম কীর্তন করে চলেছেন। প্রভু-অনন্তদেব বলরামই এসব কাহিনী বর্ণনা করতে পারেন, সবাই সব কথা জানেও না। বলরামের কৃপায় দেবী সরস্বতী জানেন। বাগ্‌দেবীই সকলের জিহ্বায় অধিষ্ঠান করে প্রভুর গুণগান করান। ক্রমানুসারে এসব কথা না জেনেও কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যেমন তেমন ভাবে লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে প্রণাম জানাই, এতে আমার যে অপরাধ হচ্ছে তা তোমরা ক্ষমা করে দিও।

শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং হরিদাসকে নিয়ে মহাপ্রভু নবদ্বীপে নিজের বাড়িতে চলে এলেন ঠাকুর এসেছেন শুনে বৈষ্ণবগণ আনন্দে ধেয়ে এলেন। সেই চন্দ্রবদন দেখে সকলেরই মনের জ্বালা মিটে যায়। প্রভুর চরণ ধরে সকলে কাঁদতে লাগলেন। সকলের প্রাণস্বরূপ বিশ্বম্ভর সকলকেই প্রেম-আলিঙ্গন দান করলেন। সকলেই প্রভুর নিজের শরীরের মত প্রিয়, সকলেই মহৎ-প্রাণ, মহাভক্ত। অদ্বৈতকে সকলেই প্রণাম করলেন, তাঁর ভক্তির কারণেই মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন।

বৈষ্ণবগণ আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন, সকলেই প্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণকথার আলাপে কলকণ্ঠ হয়ে উঠলেন। শচীমাতা পুত্রকে দেখে খুশি হয়েছেন, তাই তিনি বৌমার সঙ্গে ঘরে মঙ্গল-ঘট স্থাপন করলেন। এসব কথা সঠিকভাবে বলতে পারেন একমাত্র আমার জন্মজন্মান্তরের আশ্রয়দাতা সহস্রবদন-বলরাম-নিত্যানন্দ। যেমন দ্বিজ-বিপ্র-ব্রাহ্মণ এই তিনটি শব্দ দিয়ে একই কথা বোঝান হয় তেমনি বলদেব আর নিত্যানন্দ একই তত্ত্ব। অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে শান্তিপুরে মহাপ্রভু যে লীলা প্রকাশ করেছেন তার কথা শুনলেই তার সঙ্গ লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র জানেন যে ভক্তকবি বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁদের শ্রীচরণের বিনোদনের জন্যই এই লীলাকীর্তন করছেন।

২/২০ গৌরসিংহ শ্রীশচীকুমার, তোমার চরণ সর্বতাপহর। তুমি গদাধরের প্রাণনাথ। তুমি এমন কৃপা কর যেন তোমাতেই আমার মতি থাকে। তোমার জয় হোক।

ঠাকুর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ভাবে নেচে গেয়ে কেঁদে হেসে চলেছেন। গৌরহরি প্রতিদিনই ভক্তদের সঙ্গে নানা রকম অশেষ কৌতুক করছেন। মহাপ্রভু একদিন নিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীবাসের বাড়িতে বসে নানা রকম মজা করছিলেন। এমন সময়ে মুরারি গুপ্ত এসে প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করলেন। পরে নিত্যানন্দকেও প্রণাম করে সামনেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। প্রভু মুরারি গুপ্তের প্রতি খুবই খুশি ছিলেন। তিনি মুরারিকে বললেন,—তুমি তো ঠিক ব্যবহার করলে না। যে জানে না, তুমি তাকেই কোথায় শেখাবে, তা না করে নিজেই ভুল করলে? মুরারি বললেন,—প্রভু, তুমি যেমন বুদ্ধি যুগিয়েছ আমি তেমনই করেছি। প্রভু বললেন,—আচ্ছা, আজ বাড়িতে চলে যাও, কাল সব জানতে পারবে। মুরারি গুপ্ত বাড়িতে গিয়ে রাত্রে শুয়ে স্বপ্ন দেখলেন,—মল্লবেশে নিত্যানন্দ সামনে চলেছেন। নিত্যানন্দের মাথায় মহানাগ অনন্তদেব ফনা ধরে রয়েছেন। হাতে শ্রীহল, মুষল এবং তালধ্বজ। নিত্যানন্দের চেহারা হলধর বলরামের মত এবং তাঁর মাথায় পাখা ধরে রয়েছেন গৌরচন্দ্র। প্রভু বলছেন,—মুরারি, এবারে বুঝলে তো? আমি হচ্ছি ছোটভাই। দুই প্রভু এই ভাবে মুরারিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তত্ত্ব জানিয়ে দিলেন। জেগে উঠে মুরারি কাঁদতে থাকেন। নিত্যানন্দের নাম করে কেবলই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছেন। মহাসতী পতিব্রতা মুরারি-গৃহিণী 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে জেগে গেলেন। নিত্যানন্দই বড় ভাই, একথা জানতে পেরে মুরারি আনন্দিত মনে ঠাকুরের কাছে চলে গেলেন। এসে দেখলেন,—কমললোচন মহাপ্রভু বসে রয়েছেন, তাঁর ডান দিকে প্রফুল্ল বদন নিত্যানন্দ। এবারে মুরারি আগে নিত্যানন্দের চরণে দণ্ডবৎ করে পরে চৈতন্যকে প্রণাম করলেন। প্রভু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন,—মুরারি, আজ এ রকম করলে কেন? মুরারি উত্তর দিলেন,—প্রভু যেমন বুদ্ধি যোগালেন। শুকনো পাতা যেমন হাওয়া পেয়ে উড়ে যায়, এও তেমনি, জীবের সকল কাজই তোমার শক্তিতেই হচ্ছে। প্রভু বললেন,—মুরারি, তোমাকে আমি খুবই ভালবাসি, তাই তোমার কাছে গূঢ় রহস্য প্রকাশ করলাম।

প্রভু মুরারিকে যখন স্বীয় তত্ত্ব বলছিলেন তখন প্রভুর আর একজন অতীব প্রিয়পাত্র গদাধর তাম্বুল পরিবেশন করছিলেন প্রভুকে। প্রভু বললেন,—মুরারিই আমার প্রধান ভক্ত,—এই কথা বলে প্রভু তাঁকে চর্বিত তাম্বুল দিলেন। মুরারি বিনীত ভাবে হাতজোড় করে তা গ্রহণ করে খেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন। প্রভু মুরারিকে বললেন, —তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে ফেল। মুরারি হাতখানা নিজের মাথায় মুছে নিলেন। প্রভু বললেন, —তোমার

তো জাত গেল। আমার এঁটো তোমার গায়ে লাগল।—এ কথা বলেই প্রভুর ঈশ্বর-আবেশ হল এবং তিনি দাঁত কড়মড় করে বলতে লাগলেন,—কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী আমাকে একেবারে টুকরো-টুকরো করে ফেললে। বেদান্ত পড়ায়, আমার বিগ্রহকে মান্য করে না। তার গায়ে কুষ্ঠ করালাম তবু কিছুই বুঝতে পারল না। আমার শরীরেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান, কোন্ সাহসে সে তাকে মিথ্যা বলে? মুরারি, তুমি তো আমার ভক্ত, তুমি জান যে আমার বিগ্রহকে মান্য করবে না তার তো সর্বনাশ হবে। ব্রহ্মা এবং শিব আনন্দ করে যে বিগ্রহের সেবা করেন, সকল দেবতারা প্রাণতুল্য প্রিয় মনে করে পূজা করেন, যে অঙ্গ স্পর্শ করে পুণ্য নিজেই পবিত্র হয় তাকে প্রকাশানন্দ কোন্ সাহসে মিথ্যা বলছে? তোমার কাছে সত্যি আমি সব খুলে বলছি, শোন। আমার লীলাদি এবং ধামাদি সবই সত্য। এসব অমান্য করা মানে আমাকেই খান্ খান্ করে ফেলা। ভগবানের যে লীলাগুণাদি শ্রবণ করলে বহির্মুখতা নষ্ট হয় পাপী অধ্যাপক তাকেই মিথ্যা বলে। যে গুণলীলাদি শ্রবণ করে আনন্দে স্বয়ং শিব দিগম্বর হয়েছেন, অনন্তদেব যা নিজে কীর্তন করেন, যে গুণলীলা-কথা শুনে শুক-নারদাদি মুনিগণ আনন্দে আত্মহারা হন, চার বেদ যে মহত্ত্ব প্রকাশ করছে, এসবকে যে অবজ্ঞা করে সে কখনো আমার অবতার বিষয়ে জানতে পারে না। মুরারি গুপ্তকে উপলক্ষ্য করে ভগবান সকলকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তাঁর বিগ্রহ, তাঁর সেবক, তাঁর লীলাস্থান সবই পরম সত্য। এভাবে প্রভু নিজের তত্ত্ব নিজেই শেখালেন। এসব যে না মানে সে নিজকর্মদোষেই বিনষ্ট হয়। কিছুক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। এখন তিনি অকিঞ্চন ভক্ত। তিনি মুরারিকে আলিঙ্গন করে বললেন,— ভাই মুরারি, তুমি সত্যি আমার শুদ্ধভক্ত। তাই তুমি নিত্যানন্দের তত্ত্ব জানতে পারলে। নিত্যানন্দের প্রতি যার বিন্দুমাত্র সন্দেহ, আমার সেই ভক্ত কখনো আমার প্রিয় নয়। আজ থেকে আমি তোমার কেনা হয়ে রইলাম, তুমি এখন বাড়িতে চলে যাও। তুমি সঠিক নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জেনে গেছ। একমাত্র হনুমানই প্রভুর এতটা প্রিয়পাত্র, আর কেউই নয়। মুরারি গুপ্ত বাড়িতে চলে গেলেন, নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভু গৌরচন্দ্র তাঁর হৃদয়ে বাস করতে লাগলেন।

তিনি নিজের বাড়িতে গিয়েও অন্তরে প্রেমবিহ্বল হয়ে হাসছেন। তিনি উল্লাসভরে বললেন,—ভোজন করব। গৃহিণী খেতে দিলেন। মুরারিগুপ্ত প্রভুর প্রেমাবেশে আবিষ্ট। তিনি 'খাও খাও' বলছেন আর গ্রাস-গ্রাস ভাত ফেলছেন। গৃহিণী স্বামীর অবস্থা দেখে হেসে বারেবারেই এনে ভাত দিচ্ছেন। স্ত্রী জানেন যে তাঁর স্বামী মহাভক্ত, তাই তিনি বারেবারে কৃষ্ণনাম নিয়ে তাঁকে সাবধান করে দিচ্ছেন। মুরারি নিবেদন করলে প্রভু না খেয়ে পারেন না, প্রভু কখনো মুরারিকে নিষেধ করেন না। মুরারি যত অন্ন নিবেদন করছেন প্রভু সবই খেয়েছেন। সকালে এসে প্রভু মুরারিকে জানালেন। মুরারি কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দিত হয়ে বসেছিলেন। এমন সময় প্রভুকে আসতে দেখে তিনি প্রণাম করলেন। খুশি মনে মুরারি আসন দিলেন। গৌরহরি বসলেন। মুরারি গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন,—প্রভুর শুভাগমনের কারণ? প্রভু উত্তর দিলেন, —বদহজমের চিকিৎসা করাতে এসেছি। গুপ্ত অবার জিজ্ঞাসা করলেন,—বদহজমের কারণ কি? কাল কি কি খেয়েছ? প্রভু বললেন,—সে তো তুমিই জান। 'খাও খাও' বলে তুমি যত অন্ন ফেলেছ তুমি কি সেসব ভুলে গেলে? তোমার স্ত্রীর নিশ্চয় মনে আছে, তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি দিলে আমি কি কখনো না খেয়ে পারি? তোমার দেওয়া অন্ন খেয়েই আমার এই অজীর্ণ রোগ হয়েছে, পাচন বা অন্য কোন ওষুধ দিলে তা সারবে না। জল খেলেই

অজীর্ণ রোগ আর বাড়তে পারে না। তোমার অন্ন খেয়ে অজীর্ণ হয়েছে, এবারে তোমার জল খেলেই তা সেরে যাবে। এই বলে প্রভু মুরারির ভক্তিপূর্ণ জলপাত্র থেকে জল পান করতে লাগলেন। প্রভুর কৃপা দেখে মুরারি অচৈতন্য হলেন। মুরারি গুপ্তের ঘরের সকলে মিলে মহাপ্রেমে কাঁদতে লাগলেন। প্রভুর এমন ভক্ত এবং এমন ভক্তি দুর্লভ, আর তাঁরই কৃপাতে এই ভক্তি প্রকাশিত হল। মুরারি গুপ্তের বাড়ির চাকররাও যে আশীর্বাদ পেল, নদীয়ার অনেক পণ্ডিতও তা পায় নি। বৈষ্ণবের কৃপায় যে ভক্তি লাভ করা যায় তা বিদ্যা-ধন-যশের দ্বারা কদাচ পাওয়া যায় না। শাস্ত্র বলেন,—বৈষ্ণবের চাকর-বাকর যে-কেউ হোক না, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। এই ভাবে মহাপ্রভু স্বপ্রণোদিত হয়েই মুরারিকে কৃপা করলেন। মুরারি গুপ্তের এই অদ্ভুত আখ্যান শুনলেও ভক্তি লাভ করা যায়।

মহাপ্রভু একদিন শ্রীবাস-আঙ্গিনায় হুঙ্কার করে নিজমূর্তি ধরে চার হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিয়ে 'গরুড় গরুড়' বলে ডাকছেন। সেই সময়ে মুরারিও আবিষ্ট হয়ে হুঙ্কার করতে করতে শ্রীবাস-আঙ্গিনায় এসে উপস্থিত হলেন। মুরারি গুপ্তের দেহে তখন বিনতা-নন্দন গরুড়ের ভাব হয়েছে। তিনি বললেন,—আমি গরুড়। প্রভু গরুড় বলে ডাকলে মুরারি এগিয়ে বললেন,—এই আমিই তোমার দাস। প্রভু বললেন,—তুমিই আমার বাহন। মুরারি উত্তর করলেন,—নিশ্চয়। তোমাকে পিঠে করে নিয়ে গিয়ে আমিই স্বর্গ থেকে পারিজাত বয়ে এনেছি। বাণরাজার পুরীতে গিয়ে কার্ত্তিকের ময়ূরকে খণ্ড খণ্ড করেছিলাম—তুমি কি তা ভুলে গেলে? আমার পিঠে চড়ে বল, তোমাকে কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে নিয়ে যেতে হবে। প্রভু মুরারির কাঁধে উঠে বসলে শ্রীবাস অঙ্গন হরিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। নারায়ণ মুরারির পিঠে বসে সারা অঙ্গন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পতিব্রতাগণ উলুধ্বনি দিচ্ছেন, ভক্তবৃন্দ মহাপ্রেমে কাঁদছেন। কেউ হরিধ্বনি দিচ্ছেন, কেউ জয়ধ্বনি করছেন। কেউ কেউ প্রার্থনা জানাচ্ছেন,—এই রূপ যেন জীবনে না ভুলি, প্রভু। কেউ মালকোচা মেরে উল্লাসে বলছেন,—আমার ঠাকুরের তুলনা নেই। এই সব বলে কেউ আবার আনন্দে হাসছেন। কেউ আবার বাহু তুলে উচ্চস্বরে বলছেন,—মুরারি বাহন বিশ্বম্ভরের জয়। গৌরহরি মুরারির কাঁধে চড়ে বসেছেন, মুরারি সারা বাড়ি আনন্দে ঘুরপাক খাচ্ছেন। নবদ্বীপে এ সমস্তই প্রকাশিত হয়েছে, পাপীরা গৌরচন্দ্রের এই লীলাবিলাস কিছুতেই দেখতে পায় না। শ্রীচৈতন্য শুধুমাত্র ভক্তির বশ, তাঁকে ধন-কুল-প্রতিষ্ঠা দিয়ে পাওয়া যায় না। জন্মে জন্মে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনা করেছেন সেই ভক্তরাই আনন্দে এসব লীলা প্রত্যক্ষ করছেন। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কৃপা করে বললেও পাপীরা বিশ্বাস করতে পারছে না। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে মুরারি গুপ্তের কাঁধে প্রভুর উঠবার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বঅবতারে মুরারি প্রভুর সেবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এসব লীলার কখনো সমাপ্তি নেই, বৈদিক শাস্ত্রে মাত্র 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' শব্দ দুটির দ্বারা তা প্রকাশ করা হয়েছে। বাহ্যজ্ঞান লাভ করে মহাপ্রভু মুরারির কাঁধ থেকে নামলেন, মুরারির গরুড়ভাবে দৌড়াদৌড়ি থামল। মহাপ্রভু যে গুপ্তের কাঁধে চড়েছিলেন এই নিগূঢ় কথাটি সকলেই জানে না, কেউ কেউ জানেন। মুরারির প্রতি প্রভুর অশেষ কৃপা লক্ষ্য করে ভক্তবৃন্দ তাঁকে ধন্য ধন্য বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। মহাভক্ত মুরারি ধন্য, তাঁর বিষ্ণুভক্তি সফল হয়েছে। যিনি বিশ্বকে ধারণ করেন সেই বিশ্বম্ভরকে মুরারি পিঠে নিয়ে বহন করেছেন। মুরারি গুপ্ত যেখানে যত যত কাজ করেছেন সেই পুণ্যকথা বহু অব্যক্ত আছে।

পরমশুদ্ধ ভক্ত মুরারি গুপ্ত একদিন শ্রীচৈতন্য অবতারে প্রভু কতকাল স্থিতি করবেন সেই বিষয়ে বিচার করতে লাগলেন। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে প্রভু যতদিন প্রকট থাকবেন তার মধ্যে আমার সর্ববিধ সুব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। কৃষ্ণের লীলা কিছুই বুঝতে পারি না। এই মাত্র প্রকট লীলা করে আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করেন। যেই সীতার জন্যে তিনি শ্রীরামচন্দ্ররূপে রাবণকে সবংশে নিধন করলেন সেই সীতাদেবীকেই উদ্ধার করে নিয়ে এসে আবার ত্যাগ করলেন। যে যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য, তিনি চোখের সামনেই তাঁদের নিধন প্রত্যক্ষ করলেন। প্রভু প্রকট থাকার মধ্যেই আমার দেহত্যাগ করা দরকার। এই কথা ভেবে তিনি একটি অত্যন্ত ধারালো কাটারি জোগাড় করে ঘরে রেখে দিলেন। ভাবলেন রাত্রেই সুব্যবস্থা করবেন। অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর মুরারির মনোভাব জানতে পারলেন। প্রভু তাড়াতাড়ি মুরারির বাড়িতে এলে তিনি প্রভুর চরণ-বন্দনা করে বসতে দিলেন। আসনে বসে প্রভু মুরারির প্রতি সদয় হয়ে নানাবিধ কৃষ্ণকথা আলোচনা করতে লাগলেন। প্রভু আস্তে আস্তে বললেন,—মুরারি, তুমি আমার কথা রাখবে? গুপ্ত বললেন,—কথা রাখব কি গো? এই শরীরটাই তো তোমার। প্রভু প্রশ্ন করলেন,—সত্যি তো? গুপ্ত উত্তর দিলেন,—নিশ্চয়। তখন প্রভু মুরারি গুপ্তের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন,—কাটারি খানা আমাকে দিয়ে দাও। যে কাটারিটি দিয়ে আত্মহত্যা করবে ঠিক করেছ সেটি আমাকে দিয়ে দাও, দেখ গিয়ে, ঘরের মধ্যে আছে। গুপ্ত প্রভুর কথা শুনে মহাদুঃখে হায় হায় করে উঠে বললেন,—এমন মিথ্যে কথাটা তোমাকে কে বললে? প্রভু বললেন,— যে কাটারি গড়ে দিয়েছে সেই বলেছে। প্রভু অন্তর্যামী। তিনি সবই জানেন। তিনি ঘরে গিয়ে কাটারি নিয়ে এলেন এবং বললেন,—মুরারি, তোমার এই ব্যবহার? কোন্ দোষে তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছ? তোমাকে কে এই বুদ্ধি দিল? তুমি গেলে কাকে নিয়ে আমার লীলা খেলা হবে? এখন তোমার কাছে আমি এই ভিক্ষা চাইছি যে, তুমি আর এমন করবে না। —প্রভু কোলে তুলে নিয়ে মুরারির হাত নিজের মাথায় রেখে বললেন,—তুমি যদি আবার দেহত্যাগ করতে চাও তাহলে আমার মাথা খাও। —তৎক্ষণাৎ মুরারি মাটিতে পড়ে প্রেমাশ্রুতে প্রভুর চরণ ধুইয়ে দিয়ে প্রভুর চরণ ধরেই কাঁদতে লাগলেন। প্রভুও তাঁকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। প্রভু মুরারিকে যে কৃপা করলেন তা লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা ও অনন্তদেব এবং শিব পর্যন্ত কামনা করেন। এই সব দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য থেকে ভিন্ন নন, বৈদিক শাস্ত্রাদি তাই বলেন। গৌরচন্দ্রই শেষনাগ রূপে পৃথিবীকে ধারণ করেন, ব্রহ্মারূপে তিনিই সৃষ্টি করেন। ত্রিলোচন-শিব রূপে তিনিই আবার সংহার করেন। নিজের মুখে তিনি আবার নিজেরই স্তুতি করেন। যে সব দেবতারা চৈতন্যের সেবা করেন তাদের মধ্যে কোনই প্রভেদ নেই। একটি সামান্য পাখিও চৈতন্যের নাম নিলে সেও চৈতন্যের ধামে স্থান পাবে। আর সন্ন্যাসী হয়েও যদি চৈতন্যের নাম না নেয় তাহলে সেই দুষ্টলোকেরা জন্ম জন্মান্তরেও অন্ধই থেকে যাবে। আলোর সন্ধান পাবে না। ঠ্যাঙ্গাড়ে লুঠেরারা যেমন ভালমানুষ সেজে থাকে, এই নিন্দক দুরাচার সন্ন্যাসীরাও তেমনি। লুঠেরা এবং নিন্দক-তপস্বী, এদের মধ্যে নিন্দকই বেশি জঘন্য। বৈদিক শাস্ত্র শ্রীনারদীয়পুরাণও তাই বলেন: প্রকাশ্যভাবে পতিত লোক বরং ভাল, কারণ সে কেবল একাই নিরয়গামী হয় কিন্তু পাপী বকধার্মিকেরা অন্য লোকদেরও অধোগামী করে। দস্যুরা বাইরে অস্ত্রের সাহায্যে লোকদের সম্পদ হরণ করে। বকধার্মিকেরাও তেমনি তীক্ষ্ণ অবিদ্যাযুক্তি-বাণে লোকদের

যথাসর্বস্ব হরণ করে। ভাল মনে করে লোকেরা সন্ন্যাসী দেখতে এসে সাধুনিন্দা শুনে অধঃপাতে যায়। লুঠেরারা এক জন্মেই লোককে মারে কিন্তু নিন্দকদের সাধুনিন্দা শোনার ফলে লোকেরা জন্মে জন্মে দুঃখ ভোগ করে। তাই ঠ্যাঙ্গাড়ে-লুঠেরা এবং নিন্দক তপস্বী এই দুইয়ের মধ্যে নিন্দক-তপস্বীই অধিক দুরাচার। ব্রহ্ম থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত সবই শ্রীকৃষ্ণের বৈভব, তাই তাদের মধ্যে কারো নিন্দা শুনলেই তিনি মহা রুষ্ট হন। একথা সমস্ত শাস্ত্রই বলে থাকেন। অনিন্দক লোক যদি একবারও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে তবে বাস্তবিকই কৃষ্ণ তাকে অনায়াসে উদ্ধার করেন। বেদ পাঠ করেও কেউ যদি নিন্দায় রত থাকে তাহলে জন্মে জন্মে নরকে ডুবে মরে। ভাগবত পাঠ করেও কেউ যদি নিত্যানন্দকে নিন্দা করে তাহলে তার অবশ্যই সর্বনাশ হবে। নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র প্রকাশিত হয়েছেন কিন্তু নিন্দকেরা প্রভুর পারমার্থিক সত্যলীলাও মান্য করে না। চৈতন্যচরণে যার রতিমতি আছে, জন্ম জন্ম তাদের কল্যাণ হয়। চৈতন্যদেবের প্রতি যাদের ভক্তি নেই তেমন লোক অষ্টসিদ্ধি লাভ করলেও, তাদের যেন মুখ দেখতে না হয়।

প্রভু মুরারি গুপ্তকে সান্ত্বনা দান করে বাড়িতে চলে গেলেন। মুরারি গুপ্তের চরিত্র-প্রভাবের কথা আমি কি বলব, তাঁর বিষয় সকলেই জানে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মুখে সকল বৈষ্ণবগণের তত্ত্ব ও মহত্ব কিছু কিছু শুনেছি। জন্ম জন্ম যেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আমার স্বামী হন, তাঁর আশীর্বাদেই আমি চৈতন্যভক্তি লাভ করেছি। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের জয় হোক। তোমার নিত্যানন্দ যেন আমার প্রাণপতি হন্। আমার প্রাণনাথের জীবন হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। আমি তাই মনে বড় ভরসা বাখি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রাণস্বরূপ, তিনি তাঁদেরই পদপ্রান্তে সংকীর্তন করে চলেছেন।

২/২১ শ্রীনিত্যানন্দের প্রাণ, গদাধরের স্বামী, অদ্বৈতের ভগবান, শ্রীবাস ও হরিদাসের প্রিয়কারী, গঙ্গাদাস ও বাসুদেবের ঈশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্তগোষ্ঠীসহ জয় হোক। চৈতন্যকথা শুনলে ভক্তি লাভ করা যায়।

প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ ও গদাধরকে নিয়ে নবদ্বীপে বিহার করছেন। একদিন প্রভু তাঁর আপন পরিকর ভক্তবৃন্দকে নিয়ে নগর-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। নীলাচলবাসী বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের গ্রামে একদিন গিয়েছিলেন প্রভু। সেই গ্রামেই পরম সুশান্ত মোক্ষকামী দেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন। তিনি জ্ঞানী, তপস্যাপরায়ণ, আজন্ম ভোগে অনাসক্ত। ভাগবত পাঠ করেন কিন্তু ভক্তিহীন। লোকেরা বলে যে ইনি ভাগবতে মহা-অধ্যাপক। কিন্তু ইনি ভক্তিহীনতার কারণে ভাগবতের মর্মার্থ জানেন না। ভাগবতের গূঢ় তত্ত্ব জানবার তাঁর যোগ্যতা আছে অথচ কেন যে তিনি তা জানেন না সেকথা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই বলতে পারেন। প্রভু দৈবাৎ সেই পথে যেতে যেতে তাঁর ভাগবত-পাঠ শুনতে পেলেন। সর্বভূতহৃদয়, সর্বতত্ত্বজ্ঞ মহাপ্রভু দেবানন্দের ব্যাখ্যায় ভক্তির মহিমা শুনতে পেলেন না। তখন তিনি রেগে বললেন,—ব্যাটা কি অর্থ ব্যাখ্যা করছে, ভাগবতের অর্থ কিছুই জানে না। ভাগবত গ্রন্থে এর কোন অধিকার নেই। শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছেন গ্রন্থরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতার। শ্রীভাগবতে প্রতিপাদ্য কাম্যবস্তু হচ্ছে কেবল প্রেমভক্তি, ভাগবত যে প্রেম ও রসস্বরূপ—চার বেদই তা বলেন। চারখানি বেদ যেন দধি, ভাগবত হচ্ছে নবনীত, শুকদেব তা মন্থন করেছেন, খেয়েছেন মহারাজ পরীক্ষিত। আমার প্রিয়

ভক্ত শুকদেব ভাগবতের তত্ত্ব জানেন, তিনি ভাগবতে আমার তত্ত্ব আমার অভিমত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন। আমি, আমার ভক্ত এবং ভাগবতের মধ্যে যে লোক ভেদ মনে করে তার সর্বনাশ হবে। মহাপ্রভু রেগে গিয়ে ভাগবত-তত্ত্ব বললেন, বৈষ্ণবগণ শুনে মহা আনন্দিত হলেন। প্রভু আবার বললেন,—ভাগবত পাঠ করে যে-লোক ভক্তি ছাড়া অন্য কিছুর প্রাধান্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে সে ভাগবতের কিছুই জানে না, বুঝতে হবে। এই অপদার্থটার ভক্তি আদৌ নেই, তাই যা-তা ব্যাখ্যা করছে, আজ আমি এর পুঁথি ছিড়ে ফেলব। পুঁথি ছিঁড়তে উদ্যত হলে ভক্তগণ ক্রোধাবিষ্ট প্রভুকে ধরে রাখলেন। শ্রীভাগবত হচ্ছেন মহা অচিন্ত্য, সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিদ্যা, তপস্যা কিংবা যশের দ্বারা তা বুঝতে পারা যায় না। যে মনে করে সে ভাগবত বুঝেছে, সে কখনো ভাগবত গূঢ় ভাবে জানে না। ভাগবতকে যে অচিন্ত্য ঈশ্বরস্বরূপ মনে করে কেবল সে-ই জানতে পারে—ভাগবতের মূল উপজীব্য হচ্ছে ভক্তি। সর্বগুণযুক্ত দেবানন্দ পণ্ডিতের সমান জ্ঞানী লোক পাওয়া বড়ই কঠিন। অনেকেই ভাগবতের মূল তাৎপর্য জানে না, তবু বাবা ভাগবত জানে বলে গর্ব করে, যম তাদেব শাস্তি দেবেন। ভাগবত পাঠ কবেও কেউ কেউ প্রকৃত মর্ম জানে না, পৃথিবী ধারণকারী অনন্তদেবরূপ অবধূতচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দকে তারা নিন্দা করে।

মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ পবিবৃত হয়ে নগবে প্রতিদিনই ভ্রমণ করেন। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেবিযেছিলেন। শহরের উপকণ্ঠে এক মাতাল বাস করত, প্রভু রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মদের গন্ধ পেলেন। গন্ধ পেয়েই বারুণী মনে পড়ে গেল, গৌরাঙ্গের তখন বলবাম-ভাব হল। বাহ্যজ্ঞান হাবিযে প্রভু হুঙ্কাব কবে বারে বাবে শ্রীবাসকে বলছেন, আমাকে মাতালের ঘরে নিয়ে চল। শ্রীবাস প্রভুব চরণে ধরে তাঁকে বারণ করছেন। প্রভু বলছেন,—আমারও কি সামাজিক বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে? তবু শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুকে নিষেধ করেন। শ্রীবাস বলছেন,—তুমি জগতের পিতা, জগৎকর্তা, তুমি যদি জগৎকে সংহার কর তবে তাকে আব রক্ষা কববে কে? তোমার অপূর্ব লীলার মর্ম বুঝতে না পেরে যে নিন্দা করবে সে জন্মে জন্মে দুঃখ পেয়ে মরবে। প্রভু, তুমি নিত্য সনাতন ধর্মময়, তোমার এ লীলা কেউ বুঝতে পাবে না। প্রভু, তুমি যদি মাতালের ঘরে যাও তাহলে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দেব। —প্রভু ভক্তের সঙ্কল্প লঙ্ঘন করেন না। শ্রীবাসের কথা শুনে তিনি হাসতে থাকেন। প্রভু বললেন,—তুমি যখন বারণ কবছ তখন আমি কিছুতেই তার ঘরে যাব না, তোমার কথা তো আমি অমান্য করতে পারি না। শ্রীবাসের কথায় প্রভু বলরাম-ভাব সম্বরণ করে আস্তে আস্তে বড়রাস্তা ধবে চললেন। ঐ পাড়াতে অনেকেই রাস্তার পাশে বসেও মদ খাচ্ছিল, তাবা প্রভুকে দেখে মদ ছেডে হরিনাম করতে লাগল। কেউ কেউ বলছে,—কীর্তন গান এবং তোমাদের নাচ বড ভাল লাগে। মাতালদের মধ্যে কেউ কেউ হাতে তালি দিয়ে হরিনাম গাইতে গাইতে প্রভুর পেছন পেছন চলেছে। এভাবে মাতালরাও মহা হরিধ্বনি দিতে লাগল। বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের দর্শন লাভ করার ফলে এই হয। মাতালদের উৎসাহ দেখে মহাপ্রভু হাসছেন। মাতালদের মুখে হরিনামের প্রকাশ দেখে শ্রীবাস আনন্দে কাঁদছেন। মাতালবাও শ্রীচৈতন্যকে দেখে আনন্দ বোধ করে কিন্তু শুধু পাপী সন্ন্যাসীবাই তাঁর নিন্দা করে। শ্রীচৈতন্য-মহিমা শুনে যে মনে কষ্ট পায় তার কোন জন্মেই সন্ন্যাস নিযেও সুখ হবে না। যে চৈতন্য-অবতার

দর্শন করেছে সে মোদো-মাতাল হলেও তাকে নমস্কার জানাই। মাতালদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করে প্রভু স্বকীয় আবেশে নগরে নগরে ভ্রমণ করছেন।

কিছু দূর গিয়ে প্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে দেখে রেগে অনেক কথা বলেছিলেন। প্রভুর মনে পড়ে গেল যে, দেবানন্দ শ্রীবাসের কাছে আগে কিছু অপরাধ করেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মের আগে ভক্তরা খুব দুঃখিত মনে ছিলেন, সমাজ প্রেম-ভক্তি-শূন্য ছিল। যদিও বা কেউ কেউ গীতা-ভাগবত পাঠ করত, কিন্তু ভক্তিব্যাখ্যা কেউ শুনতে পেত না। সে-সময়ে দেবানন্দ পণ্ডিত সমাজে খুবই সম্মানিত লোক ছিলেন। তিনি বিয়ে করেননি। ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে থাকেন। সর্বদা ভাগবত পাঠ করতেন। লোকদের ভাগবত-শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। দৈবাৎ একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তার বাড়িতে গিয়ে তার ভাগবত পাঠ শুনছিলেন। শ্রীভাগবত প্রতিপদেই প্রেমরসপূর্ণ, তাই শুনে শ্রীবাসের প্রেমাশ্রুতে চোখ ভরে গেল। ভাগবত-কথা শুনে শ্রীবাস কাঁদছেন, শ্রেষ্ঠ ভক্ত ব্রাহ্মণ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ছেন। পাপিষ্ঠ ছাত্ররা বলে উঠল,—এ তো বড় মুস্কিল হল, পড়াশোনা হচ্ছে না, অকারণ সময় নষ্ট হচ্ছে। শ্রীচৈতন্যের প্রিয় ভক্ত জগৎপাবন শ্রীনিবাস, তাঁর তো কিছুতেই কান্না থামছে না। পাপিষ্ঠ ছাত্ররা পরামর্শ করে শ্রীবাসকে টেনে নিয়ে বাড়ির বাইরে করে দিল। দেবানন্দ পণ্ডিতও কিছু বাধা দিল না, শিষ্যরা যে অভক্ত ছিল তার কারণ হল তাদের গুরুও অভক্ত। ভাব কেটে গেলে বাহ্যজ্ঞান লাভ করে শ্রীবাস বাড়িতে ফিরে গেলেন, কিন্তু অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর সব কিছুই জানেন। দেবানন্দকে দেখে এখন তাঁর সে-সব কথা সবই মনে পড়ল এবং প্রভু রেগেমেগে বললেন,—ওহে দেবানন্দ, তুমিই তো সবাইকে ভাগবত পড়াও—কিন্তু যে শ্রীবাস পণ্ডিতকে স্বয়ং গঙ্গা পর্যন্ত দর্শন করতে চান, সেই তিনি তোমার ভাগবত-পাঠ শুনতে এসেছিলেন একদিন। কি অপরাধে শিষ্যদের দিয়ে তুমি তাঁকে বাড়িব বাইরে করে দিয়েছিলে? যে ব্যক্তি ভাগবত শুনে প্রেমাশ্রুপ্লাবিত হয় তাঁকে টেনে নিয়ে বাড়ির বাইরে করে দেওয়া কি উচিত কাজ? আমি বুঝলাম, তুমি যে ভাগবত পড়াও—আসলে তুমি তার মর্ম কিছুই অনুভব কর নি। খাবারটা যদি খেয়ে হজম না করতে পারে তবে লোকে খেয়ে সুখ পায না। ভাগবত পড়িয়েও তুমি তেমনি সুখ পাওনা কারণ ভাগবত তোমার হজম হয নি। —দেবানন্দ বিপ্র প্রভুর কথা শুনে লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইলেন, কোন কথা বললেন না। বিশ্বম্ভর ক্রোধাবেশে বলেই চলেছেন, দেবানন্দ দুঃখিত মনে চলে গেলেন। তথাপি দেবানন্দকে বড়ই পুণ্যবান বলতে হয়, কারণ প্রভু তাঁকে স্বয়ং বাক্যদণ্ড দান করেছেন। মহাসুকৃতি হলে তবেই শ্রীচৈতন্যের কাছে শাস্তি পাওয়া যায়, তাঁর শাস্তি পেয়ে মারা গেলেও বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। যে ব্যক্তি মাথা পেতে শ্রীচৈতন্যের দেওয়া শাস্তি গ্রহণ করে সেই শাস্তিই তার পক্ষে পরে ভক্তিযোগ হয়ে দাঁড়ায়। চৈতন্যের দণ্ডকে যে ভয করে না সেই পাপিষ্ঠ জন্মে জন্মে যমের হাতে দুর্ভোগ ভোগ করে। ভাগবত, তুলসী, গঙ্গাজল এবং ভক্তজন—এই চারটি বস্তুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চার রকম বিগ্রহ প্রকাশ করে বিরাজ করেন। প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলে তবে তা পূজনীয় হয় কিন্তু এই চারটি জন্মমাত্রই ঈশ্বরস্বরূপ,—শাস্ত্র তাই বলেন। চৈতন্যকথার আদি অন্ত কিছুই জানি না, যে কোন প্রকারে তার যশোকীর্তন করি। শ্রীচৈতন্যের ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি এ কাজে হাত দিয়েছি, তাই এতে আমার অপরাধ কিছু নেই। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড অমৃততুল্য, এসব কথা

শুনলেও মনের পাপ-তাপ দূরীভূত হয়ে যায়। শ্রীচৈতন্য-শ্রীনিত্যানন্দ তাঁদের ভক্তবৃন্দের সঙ্গে যেন আমাকে ত্যাগ না করেন। সপরিকর গৌর-নিতাই যেন সর্বদা আমাকে তাঁদের শ্রীচরণাশ্রয়ে রাখেন।

২/২২ শচী-জগন্নাথের সুপুত্র, কৃপার সাগর গৌরচন্দ্রের জয় হোক। নিত্যানন্দ ও গদাধরকে নিয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে বিহার করছেন। দেবানন্দ পণ্ডিতকে ভৎসনা করে গৌরহরি বাড়িতে চলে এলেন। দেবানন্দ অসৎসঙ্গ-দোষে দুঃখ পেলেন। দেবানন্দের মত পণ্ডিত লোকও শ্রীচৈতন্যের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে ভরসা পেলেন না। বৈষ্ণবের কৃপায় প্রভুকে পেয়েও ভক্তিহীন জপ-তপে কোন কাজ হয় না। বৈষ্ণবের কাছে যার অপরাধ হয় তার কৃষ্ণপ্রেম হলেও সেই প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয়। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলছেন যে তিনি এই কথা বলছেন না, এটা বৈদিক শাস্ত্রের কথা। শ্রীগৌরহরি তা সর্বসমক্ষেই বলেছেন। যে শচীদেবীর গর্ভে গৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরও পূর্বেকার একটি বৈষ্ণবাপরাধ ছিল। প্রভু মায়ের সেই অপরাধ দূর করে দিয়ে জগৎবাসী সকলকেও শিক্ষা দিলেন। এই অপূর্ব কাহিনী মন দিয়ে শুনলে বৈষ্ণব-অপরাধ ঘুচে যায়।

একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিষ্ণুখট্টার উপরে এসে বসলেন। প্রভুর নিজেরই বিগ্রহ শালগ্রামশিলাসমূহ নিজের কোলে নিয়ে নিজের স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করতে লাগলেন,—কলিযুগে আমিই কৃষ্ণ, আমিই নারায়ণ, রামরূপে আমিই সাগরবন্ধন করেছি। আমি ক্ষীরসাগরে শুয়েছিলাম। নাঢার হুঙ্কারে আমার ঘুম ভেঙ্গেছে। প্রেমভক্তি দানের জন্যই আমি আবির্ভূত হয়েছি। অদ্বৈত, শ্রীবাস, তোমরা আমার কাছে বর প্রার্থনা কর। শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ দেখেই তাঁর মাথায় ছাতা ধরলেন। বামদিকে থেকে গদাধর তাম্বুল যোগাচ্ছেন। চারদিকে ভক্তগণ চামর দোলাচ্ছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকেই ভক্তিযোগ দান করলেন। যার যে বিষয়ে প্রীতি তিনি সে-বিষয়ে বর চেয়ে নিলেন। কেউ বলেন,—আমার পিতার মতিগতি মোটেই ভাল নয়, তাঁর মন ভাল হলেই আমি রক্ষা পাই। অন্যেরা কেউ কেউ গুরু, শিষ্য, স্ত্রী, পুত্রাদির জন্য বর চেয়েছিলেন। প্রভু ভক্তের কথা কখনো অন্যথা করেন না। তিনি খুশি হয়ে সকলকে প্রেমভক্তির আশীর্বাদ দান করলেন। শ্রীবাস প্রভুকে বললেন,—শচীমাতাকেও ভক্তি দান কর। প্রভু তার উত্তরে বললেন,—শ্রীবাস, তুমি আমাকে এই অনুরোধ করবে না। তাঁকে আমি প্রেমভক্তি দান করব না। বৈষ্ণবের কাছে তিনি অপরাধ করেছেন। তাই তিনি প্রেমভক্তি পাবেন না। সুবক্তা শ্রীবাস বললেন,—তোমার এ কথা শুনে আমরা সকলেই দুঃখে মারা যাব। তোমার মত পুত্রকে যিনি গর্ভে ধারণ করেছেন তিনি কি প্রেমভক্তি পাওয়ার উপযুক্ত নন্? শচীদেবী সকলের জীবন, তিনি জগন্মাতা। প্রভু, তুমি মায়ার ছলনা ছেড়ে দিয়ে তাঁকে প্রেমভক্তি দান কর। তুমি যাঁর পুত্র তিনি যে সকলেরই মা, ছেলের কাছে মায়ের আবার কি অপরাধ? যদি কোন বৈষ্ণবের কাছে কিছু অপরাধ তিনি করেও থাকেন তবু তাঁকে ক্ষমা করে কৃপা কর। প্রভু বললেন,—আমি উপদেশ দিতে পারি কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডন করতে পারি না। যে বৈষ্ণবের কাছে তিনি অপরাধ করেছেন, তিনি ক্ষমা করলেই অপরাধ খণ্ডন হতে পারে, অন্য কেউ তা খণ্ডন করতে পারবেন না। অম্বরীষের কাছে দুর্বাসা যে অপরাধ করেছিলেন ভাগবতে সেই কাহিনী বিবৃত হয়েছে,

তুমি তা বিলক্ষণ জান। সেই অপরাধ যে ভাবে ক্ষয় হয়েছিল এও কেবল সেভাবেই হতে পারে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের কাছে শচীমাতা অপরাধ করেছিলেন। তিনি ক্ষমা করলেই একমাত্র অপরাধ খণ্ডন হতে পারে, অদ্বৈতের প্রেমপ্রসাদ লাভ করলেই তা হবে। আমার কথা হচ্ছে,—অদ্বৈতাচার্যের চরণধূলি মাথায় নিলেই তিনি প্রেমভক্তি লাভ করতে পারবেন। তখন সকল বৈষ্ণব অদ্বৈতের কাছে গিয়ে তাঁকে সব বৃত্তান্ত জানালেন। অদ্বৈতাচার্য শুনেই বিষ্ণু-স্মরণ করে বললেন,—তোমরা কি আমাকে মারতে চাইছ? যাঁর গর্ভে আমাদের প্রভুর অবতার ঘটেছে তিনি তো আমারও মা, আমি তাঁর পুত্র। আমি নিজেই শচীমাতার চরণধূলি কামনা করি। তোমরা তাঁর প্রভাব কিছুই জান না। পতিব্রতা শচীমাতা বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপা, তিনি প্রেমভক্তির মূর্তির তুল্য। তোমরা এসব কথা মুখে আনছই বা কি করে? গ্রাম সম্পর্কেও যে তাঁকে মা বলে ডাকবে, শুধু এই মা ডাকের জন্যই তার সব দুঃখকষ্ট কেটে যাবে। শচীমাতাতে এবং মা গঙ্গাতে কোন প্রভেদ নেই। দেবকী-যশোদা যাঁরা, তাঁরাই শচীমাতা। —শচীমাতার তত্ত্ব বলতে বলতে অদ্বৈতাচার্য আবিষ্ট হয়ে পড়লেন, তাঁর কিছু মাত্র বাহ্যজ্ঞান নেই। এই সঠিক সময় মনে করে শচীমাতা ঘরের বাইরে এসে আচার্যের পদধূলি গ্রহণ করলেন। পরম বৈষ্ণবী শচীমাতা তাঁর মূর্তিমতী ভক্তিরূপা শক্তি বলে বিশ্বম্ভরকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। শচীমাতা যখন আচার্যের চরণধূলি নিয়েছিলেন তখন আচার্য বাহ্যজ্ঞানরহিত ছিলেন, তিনি কিছুই জানতেন না। উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলী শ্রীচৈতন্যের গুণকীর্তন করে হরিধ্বনি দিয়ে উঠলেন। শচীমাতার প্রভাবে আচার্যের বাহ্যজ্ঞান নেই, আবার অদ্বৈতাচার্যের প্রভাবে শচীমাতারও বাহ্যজ্ঞান নেই। দুজনের প্রভাবে দুজন বিহ্বল হয়ে আছেন, বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করছেন। সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রভু খুশি হয়ে মাকে বললেন,—এবারে তুমি প্রেমভক্তি লাভ করলে, অদ্বৈতাচার্যের কাছে তোমার আর কোন অপরাধ নেই। প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য শুনে বৈষ্ণববৃন্দ আর একবার হরিধ্বনি দিলেন। জগৎগুরু গৌরহরি জননীর উপলক্ষ্যে সকলকে বৈষ্ণবাপরাধ বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন। শাস্ত্রে বলেন, দেবাদিদেব মহাদেবের মত প্রভাববিশিষ্ট কেউ যদি বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন তবে তাঁরও সর্বনাশ হবে। এসব না জেনে যারা সাধুদের নিন্দা করে সে পাপিষ্ঠ জন্মে জন্মে দৈবদোষে ভোগে। স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গের জননীরই যখন বৈষ্ণবাপরাধ গণ্য হয় তখন অন্যের আর কি কথা? তত্ত্ববিচারে এমন কিছু অপরাধ নয় তথাপি প্রভু তাকে অপরাধ বলেই বিবেচনা করেন। শচীদেবী অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন,—এঁকে অদ্বৈত কে বলে? ইনি আসলে দ্বৈত। কেন শচীদেবী এই কথা বলেছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে সেই বিশ্বরূপের কথা বলা দরকার।

প্রভুর বড় ভাই বিশ্বরূপের ছিল অপূর্ব তেজোময় রূপ। তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্রে মহা পণ্ডিত। নিত্যানন্দ হচ্ছেন মূলসঙ্কর্ষণ বলরাম এবং বিশ্বরূপ হচ্ছেন ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু-বলরামের অংশ। তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা বুঝবার মত লোক নবদ্বীপেও কমই ছিল। শচীমাতা বা সঙ্গীদের কাছে তিনি নিতান্ত বালকের মতই থাকতেন। একদিন জগন্নাথ মিশ্র পণ্ডিতদের সভায় যাচ্ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন বিশ্বরূপ। পণ্ডিত সভায় বিশ্বরূপকে দেখে সকলেই আনন্দিত হলেন। সর্বশক্তিধর, নিত্যানন্দরূপ, পরম সুন্দর বিশ্বরূপ সকলের চিত্ত হরণ করলেন। একজন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন,—খোকা, তুমি কি পড়? বিশ্বরূপ বললেন,—সবই কিছু কিছু পড়ি। নিতান্ত বালক মনে করে পণ্ডিতজী তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন

না, জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের কথায় অহংকার প্রকাশ পেয়েছে মনে করে একটু দুঃখ পেলেন। বাড়ি ফেরার পথে জগন্নাথ এই অপরাধে পুত্রকে চড় মেরেছিলেন। —তুমি যেই বই পড় তা ঠিক মত না বলে সভার মধ্যে এ কি বললে? তোমাকেও সকলে মূর্খ মনে করলেন, আমিও লজ্জা পেলাম। —এই কথা বলতে বলতে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের উপর রাগ নিয়েই বাড়িতে গেলেন। বিশ্বরূপ সেই পণ্ডিতসভায় আবার ঘুরে গিয়ে বললেন,—তোমরা তো আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না, আমি কি কি পড়ি কিন্তু বাবা আমাকে খুব শাস্তি দিলেন তার জন্যে। তোমাদের যার যা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে আমাকে সব বল। একজন পণ্ডিত তখন জিজ্ঞাসা করলেন,——আচ্ছা বাপু, তুমি আজ যা পড়েছ তাই কিছু বল। এই কথায় ভগবান বিশ্বরূপ কিছু ব্যাকরণের সূত্র ব্যাখ্যা করলেন। সকলেই বুঝলেন যে বিশ্বরূপের ব্যাখ্যা খণ্ডন করা সম্ভব নয়। সকলেই বললেন,—ভালই ব্যাখ্যা করেছ। প্রভু বললেন,—আমি তোমাদের ফাঁকি দিয়েছি, তোমরা কিছুই ধরতে পার নি। তিনি যা কিছু ব্যাখ্যা করেছিলেন সবই আবার খণ্ডন করলেন। শুনে সকলে বিস্মিত হলেন। এইভাবে প্রভু একেকটি প্রস্তাব তিনবার খণ্ডন করে আবার তিনবার তা স্থাপন করলেন। সকলেই তাঁকে মহাপণ্ডিত বলে স্বীকার করলেন কিন্তু ভগবানের বহিরঙ্গা মায়া প্রভাবে—বিশ্বরূপ যে ঈশ্বরতত্ত্ব একথা কেউ বুঝতে পারলেন না। বিশ্বরূপ এই ভাবে নবদ্বীপে লীলা করে চলেছেন কিন্তু ভক্তিশূন্য লোকেরা তাঁর লীলার মর্মার্থ কিছুই বুঝতে পারল না। সাধারণ লোকেরা সকলেই সংসারজীবন নিয়ে ব্যস্ত, পরম মঙ্গলজনক শ্রীকৃষ্ণকথা নিয়ে কেউ আলোচনা করে না। ছেলের অন্নপ্রাশন, বিয়ে-পৈতেতে বহু ধুমধাম করে কিন্তু কৃষ্ণপূজা বা কৃষ্ণধর্ম কেউ জানে না। অধ্যাপকগণ বৃথা তর্ক করেন অথচ কৃষ্ণভক্তি-কথায় তাঁদের মন নেই। যদিও বা তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গীতা বা ভাগবত পড়ান কিন্তু ভক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন না, অযথা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে তর্ক করেন। প্রভু সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। ভক্তিব্যাখ্যা কোথাও না শুনে মনে বড় ব্যথা পান। অদ্বৈতাচার্যতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি বিরাজিত তাই কেবল তিনিই যোগবাশিষ্ট নামক জ্ঞানমার্গের গ্রন্থ পাঠ করেও তার ভক্তিতাৎপর্যময় ব্যাখ্যা করতে পারতেন। নদীয়াতে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, তাঁর ব্যাখ্যা সকলে বুঝতে পারতেন না। বিশ্বরূপ অন্যান্য অধ্যাপকগণের ব্যাখ্যা শুনে দুঃখ পেতেন, কেবলমাত্র অদ্বৈতের কাছে গিয়েই প্রেমানন্দ অনুভব করতেন। প্রভু সর্বদা অদ্বৈতের সঙ্গে থাকতেন, অদ্বৈতও তাঁর সঙ্গলাভ করে আনন্দ পেতেন।

এই সময়ে গৌরাঙ্গের বয়স কমই ছিল, নিতান্তই বালক বলা চলে, তাঁর কোঁকড়ানো চুল, দেখতে বেশ সুন্দর। একদিন শচীমাতা বললেন,—বিশ্বম্ভর, যাও তো, শিগ্গির গিয়ে তোমার দাদাকে ডেকে নিয়ে এস। মায়ের আদেশে বিশ্বম্ভর দৌড়ে চলে এলেন অদ্বৈতাচার্যের চতুষ্পাঠীতে। সেখানে অদ্বৈতকে ঘিরে শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ বসে আছেন। বিশ্বম্ভর হেসে বললেন,—দাদা, শিগ্গির বাড়িতে চল, মা খেতে ডাকছেন। সকলেই প্রভুর পরম সুন্দর রূপ দেখছেন। তিনি সবার চিত্ত হরণ করেছেন। অদ্বৈতাচার্যও মোহিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন। সব কাজকর্ম ফেলে তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। এই ভাবে রোজ মায়ের আদেশে দাদাকে ডাকবার জন্য প্রভু এখানে আসেন। বিশ্বম্ভরকে দেখে অদ্বৈতাচার্য মনে মনে ভাবছেন,—এই পরম সুন্দর শিশু আমার মন হরণ করেছে। আমার মনে হয়, ইনিই আমার প্রভু, তা না হলে অন্য কেউ কি আমার মন হরণ করতে পারত?

ঠাকুর বিশ্বম্ভর হচ্ছেন সকলের অন্তর্যামী, অদ্বৈত এই রকম চিন্তা করতে করতেই তিনি চট্ করে বাড়িতে চলে যান। বিশ্বরূপ সংসারসুখ ত্যাগ করে সর্বদা অদ্বৈতের সঙ্গেই আনন্দে কাটান। অনন্ত-চরিত্র নিত্যানন্দকলেবর বিশ্বরূপের কথা আদি খণ্ডে বিস্তারিত বলা হয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ঈশ্বরই জানেন, কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিলেন। শ্রীশঙ্করারণ্য নাম নিয়ে তিনি অনন্তের পথে চলেছেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেলে শচীমাতা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তখন শচীদেবী মনে ভাবলেন,—অদ্বৈতই আমার ছেলেকে ঘরের বার করে দিয়েছেন। এই কথা শচীদেবী মনে মনে ভাবলেও বৈষ্ণবাপরাধের ভয়ে মুখ ফুটে কিন্তু কিছুই বলেন নি। মনের শোক-দুঃখ মনেই চেপে রেখেছেন। বিশ্বম্ভরের মুখ দেখেই তিনি সব দুঃখ ভুলবার চেষ্টা করতেন। মা যাতে মনে দুঃখ না পান, প্রভুও তা বুঝে চলতেন, মাকে সুখ দেবার চেষ্টা করতেন। কিছুদিন পরেই প্রভু আত্মপ্রকাশ করলেন এবং তখন থেকে বেশির ভাগ সময় অদ্বৈতের সাহচর্যেই কাটাতেন। লক্ষ্মীদেবী শচীদেবীর কাছে আছেন, প্রভু ঘর ছেড়ে অদ্বৈতের কাছেই থাকেন। ছেলে বাড়িতে থাকে না দেখে, শচীদেবী ভাবলেন,—আমার এই ছেলেটিও কি অদ্বৈতাচার্য নিয়ে নিলেন নাকি? এই মনের দুঃখ থেকেই শচীমাতা বলেছিলেন,—কে তাঁকে অদ্বৈত বলে? আসলে ইনি দো-আঁশলা। আমার সোনারচাঁদ একটি ছেলেকে ঘরের বার করে দিয়ে আবার একেও স্থির হয়ে সংসার করতে দিচ্ছেন না অদ্বৈতাচার্য। আমি স্বামীহারা, আমার অভিভাবক নেই। আমার প্রতি কারো দয়া নেই। জগতের লোকের কাছে তিনি অদ্বৈত কিন্তু আমার কাছে তিনি দ্বৈতভাবরূপ মায়া প্রকাশ করছেন। —এই অপরাধেই প্রভু বিশ্বম্ভর মাতা শচীদেবীকে প্রেমভক্তি দিলেন না। এখন যারা বৈষ্ণবগণকে ছোট-বড় কথা বলে তারা তো জানে না কত বড় অপরাধ করছে। জননীর উপলক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান জগতের জীবগণকে বৈষ্ণবাপরাধ থেকে দূরে থাকার জন্য সাবধান করে দিচ্ছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে যারা বৈষ্ণবনিন্দা করবে তারা ভববন্ধন থেকে উদ্ধার পাবে না। গৌরহরি আচম্বিতে একথা কেন বলতে গেলেন তারও নিশ্চয় কারণ আছে। ত্রিকালজ্ঞ শ্রীশচীনন্দন জানেন যে ভবিষ্যতে কিছু দুষ্কৃতি লোক অদ্বৈতের শিষ্য হবে। বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি অমান্য করে তারা অদ্বৈতকেই শ্রীকৃষ্ণ বলে প্রচার করবে। অদ্বৈতকে যে পরম বৈষ্ণব বলবে তাকেই তারা ঘিরে ধরে তিরস্কার করবে। বৈষ্ণবগণের পক্ষ নিয়ে স্বয়ং অদ্বৈতও যদি কিছু বলেন, এই পাষণ্ডীগণ তা মানবে না। সর্বজ্ঞ-চূড়ামণি বিশ্বম্ভর জানতেন যে ভবিষ্যতে অনেক কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে। তাই প্রভু স্বীয় জননীকে দণ্ড দিয়ে অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দকে সাক্ষী করলেন। যাঁর শিষ্যগণ বৈষ্ণবনিন্দা করবে তাঁকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। যে-লোক বৈষ্ণবনিন্দকগণের আশ্রয়ে থাকে অথচ নিজে বৈষ্ণবনিন্দা করে না, সেও পর্যন্ত পাপ এড়াতে পারবে কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ভক্ত হলে হয়তো তিনি নিজে রক্ষা পেয়ে যাবেন কিন্তু যে উচ্চ অধিকারী নয়—এমন লোক তার দলবল সহ অধঃপাতে যাবে। শ্রীচৈতন্যের দণ্ড কে বুঝতে পারে? জননীর উপলক্ষ্যে তিনি সকলকেই শিক্ষা দিলেন। শ্রীঅদ্বৈতকে কেউ বৈষ্ণব বললে, যে-লোক তাঁর নিন্দা করে অথবা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধায়, সে-লোক অবশ্যই অধঃপাতে যাবে। গৌরাঙ্গসুন্দরের ভক্ত,—এই কথা বললেই তাঁকে সত্যিকারের স্তুতি করা হয়। স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ প্রাণ খুলে দিয়ে তত্ত্বপ্রকাশ করে বলেছেন যে গৌরাঙ্গই ঈশ্বর। এই নিত্যানন্দের কৃপাতেই জগৎবাসী গৌরচন্দ্রকে জানতে পেরেছে, নিত্যানন্দের

আশীর্বাদেই বৈষ্ণব চিনতে পেরেছে। নিত্যানন্দের কৃপাতেই নিন্দকেরা রক্ষা পেতে পারে এবং বিষ্ণুভক্তি লাভ করতে পারে। নিত্যানন্দের ভক্তগণের মুখে কখনো কারো নিন্দা শোনা যায় না, তাঁরা সর্বদা শ্রীচৈতন্যের যশ কীর্তন করেন। নিত্যানন্দের শিষ্যগণ সব দিকে অতি সাবধান, শ্রীচৈতন্যই তাঁদের ধন-প্রাণ স্বরূপ। অল্পসল্প ভাগ্য করে নিত্যানন্দের ভক্ত হওয়া যায় না, কারণ তাঁরাই চৈতন্যতত্ত্ব প্রচার করেন। ভগবান বিশ্বরূপের লীলাকথা যাঁরা শোনেন তাঁরাই অনন্তদেবের ভক্ত এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অতি প্রিয়পাত্র। নিত্যানন্দ এবং বিশ্বরূপ যে একই বিগ্রহ, অভেদ শরীর, শচীমাতা তা ভালভাবেই জানেন আর জানেন দু-এক জন মহাভক্ত। নিত্যানন্দই অনন্তদেব-রূপে গৌরচন্দ্রের শয্যার কাজ করেন, সেই সহস্রবদন অনন্তদেবরূপ প্রভু নিত্যানন্দের জয় হোক। প্রভু-নিত্যানন্দের কৃপা না হলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদ লাভ অসম্ভব। এমন প্রভু-নিত্যানন্দকে যে হারায় তার জীবনে কোথাও সুখ নেই। এমন ভাগ্য কি আমাদের হবে যে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দকে পারিষদ্‌বর্গ সহ একসঙ্গে দেখতে পাব। আমাদের প্রভুর প্রভু হচ্ছেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, এটাই আমাদের চিত্তের অন্তস্তলে সব চাইতে বড ভরসা। প্রভু-অদ্বৈতের চরণে আমাদের এই প্রার্থনা যেন তাঁর ভক্তদের প্রতি আমাদের ভক্তি অক্ষুন্ন থাকে।

২/২৩ মহাদেব প্রমুখ দেবগণেরও বিধাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয়। শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় দ্বিজরাজের জয়, চৈতন্য ভক্ত সমাজেরও জয়। প্রভু বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে ক্রীড়া করে চলেছেন, সকলেই কিন্তু তা দেখতে পাচ্ছে না। বৈকুণ্ঠনাযক বিশ্বম্ভব অবতবণ কবায নবদ্বীপ ক্রমান্বযে মহানন্দের এক পুরী হযে উঠেছে। প্রভু প্রিযতম নিত্যানন্দেব সঙ্গে নিজনাম কীর্তন করে বিভোর হযে আছেন। বোজ বাতে তিনি কীর্তন করেন কিন্তু ভক্ত ছাডা অন্যেরা সেখানে থাকতে পায না। বিশ্বম্ভরের এমনই শক্তি যে, কেউ একথা অমান্য করতে পারে না। প্রভুর চোখেব আডালে দূবে থেকে কেউ কেউ নিন্দা কবে এবং নিন্দা করে নবকে যাওযার বাস্তা প্রশস্ত কবে। তারমধ্যে কেউ আবার বলে, কলিকালে কিসের বৈষ্ণব, যত দেখ সবই পেট পুবে খাওযাব ধান্দায আছে। কেউ কেউ প্রস্তাব করে — এগুলোকে হাতে-পাযে বেঁধে জলে ফেলে দিয়ে দেখ, যদি বেঁচে যায় তাহলে বুঝবে যে নামকীর্তন খাঁটি। আবার কেউ বলে,—নিমাই পণ্ডিতেব জন্যে যবনেরা দেখবে কবে এসে গ্রাম লুটপাট কবে নিযে যাবে। এসব পাষণ্ডীবা চাব দিকে নানা গুজব ছডিয়ে লোকেদেব মধ্যে ভয ঢুকিযে দেবাব তালে ছিল। প্রভু শচীনন্দন কীর্তনেব মাধ্যমে মানুষেব চিত্তবৃত্তি শোধন করতে চাইছেন। তাব মধ্যে অনেকে ছিলেন যারা কীর্তনেব দৃশ্য দেখতে এসেছিলেন কিন্তু দেখতে না পেযে নিজেদের অভাগা বলে মনে কবতেন। এর মধ্যে দু-একজন কোন ভক্তের কাছে তদ্বির করে গোপনে কীর্তন দেখাব ব্যবস্থা কবতে চেযেছিলেন। সকল ভক্তই জানেন যে প্রভু সর্বজ্ঞ, তাই কেউ ভযে কাউকে গোপনেও ঢোকাবার চেষ্টা করল না।

একজন নির্দোষ, পরম সাধু, তপস্বী ব্রহ্মচাবী নবদ্বীপে বাস কবতেন। তিনি অন্নাদি কিছুই গ্রহণ করেন না, শুধু দুধ খেযেই জীবন ধারণ করে আছেন। এই ব্রাহ্মণ কীর্তনের দৃশ্য দেখতে চান। প্রভু দরজা বন্ধ করে কীর্তন করেন। ভক্তরা ছাডা অন্য কারো প্রবেশ নিষেধ। সেই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ রোজই কীর্তন দেখার জন্য শ্রীবাসকে ধরেন! —তুমি যদি কৃপা করে আমাকে একদিন বাড়িব মধ্যে নিয়ে যাও তাহলে আমি নিমাই পণ্ডিতের

নৃত্যাদি দেখে নয়ন সফল করতে পারি। রোজই ব্রাহ্মণ এ রকম বলেন। শ্রীবাস একদিন তাঁকে উত্তর দিলেন,—তোমাকে তো আমি ভাল লোক বলেই জানি, ফলাদি আহার করে ব্রহ্মচর্যেই জীবন কাটিয়ে দিলে। তোমার কোন পাপ নেই, তুমি গিয়ে দেখতেও পার। প্রভুর হুকুম নেই বাইরের কারো কীর্তন দেখার। তুমি লুকিয়ে থেকে দেখবে। এই বলে তিনি ব্রাহ্মণকে নিয়ে এক দিকে গোপনে তাকে থাকতে বলে দিলেন। চতুর্দশ ভুবনের অধিপতি নৃত্য করছেন, চারদিকে দাঁড়িয়ে ভাগ্যবানেরা তা দেখছেন। 'কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী' বলে সকলেই মহানন্দে কীর্তন করছেন। নিত্যানন্দ এবং গদাধর প্রেমবিহ্বল প্রভুকে ধরে থাকছেন। অদ্বৈতাচার্য আনন্দে চারদিকে দৌড়াচ্ছেন। সকলেই মহানন্দে মত্ত। কারো বাহ্যজ্ঞান নেই। মহাপ্রভু নৃত্য করেই চলেছেন। চারদিকেই কেবল হরিধ্বনির শব্দ, তা ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। অশ্রু, কম্প, লোমহর্ষ, ঘন ঘন হুঙ্কার—এসব লক্ষণ দেখা দিচ্ছে বিশ্বম্ভরের। সর্বজ্ঞ প্রভু তার মধ্যেই বুঝতে পেরেছেন যে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ কীর্তনের স্থানে লুকিয়ে রয়েছেন। বিশ্বম্ভর মাঝে মাঝে বলেন,—আজ কেন কীর্তনে প্রেম হচ্ছে না? কেউ কি বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে আছে? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, আমাকে ঠিক করে বল দেখি। ভয় পেয়ে শ্রীনিবাস বললেন,—পাষণ্ড কেউ আসে নি। কেবল একজন ব্রহ্মচারী সদ্‌ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি সর্বদা দুগ্ধাহারী, ধার্মিক লোক। তোমার নৃত্য দেখবার জন্য তাঁর বড় ইচ্ছা, তাই তিনি নিভৃতে আছেন, তুমি ঠিকই ধরেছ। এই কথা শুনে রেগে গিয়ে বিশ্বম্ভর বললেন,—তাকে শীঘ্র বাইরে নিয়ে যাও। আমার নৃত্য দেখার তার কি অধিকার আছে? দুধ খেয়ে থাকলেই কি আমার প্রতি তার ভক্তি আছে—বুঝবে? প্রভু হাত বাড়িয়ে আঙুল তুলে বললেন,—শুধু দুধ খেয়েই কেউ আমাকে পায় না। চণ্ডাল হয়েও যদি কেউ আমার শরণ নেয় তবে জানবে সেই আমার এবং আমিও তার। সন্ন্যাসীও যদি আমার শরণ না নেয় তবে সে আমার নয়, একথা ঠিক জানবে। গজেন্দ্র, বানর, গোপজাতি কি তপস্যা করেছে? তারা কোন্ তপস্যার বলে আমাকে পেয়েছে? অসুরেরাও তপস্যা করে, তাতে কি হয়? আমার শরণ না নিলে আমাকে পায় না। দুগ্ধ পান করে আমাকে পাওয়া যায় না। সব অহঙ্কার চূর্ণ করব, এখনই দেখবে। ব্রহ্মচারী সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে বেরিয়ে এলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন,—যা দেখেছি তাই আমার মহা ভাগ্য বলতে হয়। অপরাধ মত শাস্তি পেয়েছি। অদ্ভুত নৃত্য, অদ্ভুত ক্রন্দন দেখেছি। যেমন অপরাধ করেছি তেমনি শাস্তি পেলাম। সেবকেরই এই রকম বুদ্ধি হয়। সেবকই প্রভুর দেওয়া সব দণ্ড সহ্য করেন। বিপ্রবরের এই মনোভাব চিন্তা করে করুণাসাগর শ্রীগৌরসুন্দর তাঁকে ডেকে তাঁর মাথার উপরে পা তুলে দিলেন। প্রভু তাঁকে বললেন,—তপস্যা করেই ভাববে না যে তোমার উদ্ধার পাবার শক্তি হয়েছে। বিষ্ণুভক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানবে। তখন ভক্তগণ সন্তুষ্ট হয়ে হরিধ্বনি দিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। শ্রদ্ধা নিয়ে যে ব্যক্তি এ রহস্যকথা শুনবেন তাঁর অবশ্যই শ্রীগৌরাঙ্গের আশীর্বাদ মিলবে। প্রভু ব্রহ্মচারীকে কৃপা করে আনন্দ-আবেশে প্রচুর নৃত্য করলেন। শ্রীচৈতন্য যাঁকে দণ্ডদান করেছেন সেই বিপ্রের চরণে গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অসংখ্য প্রণতি জানাচ্ছেন।

রোজ রাত্রে প্রভুর কীর্তন হচ্ছে, কিন্তু অন্য লোকেরা তা দেখতে পায় না। নদীয়ার লোকেরা অন্তরে দুঃখ পাচ্ছে, সকলেই পাষণ্ডীদের নিন্দা করছে। পাপী ও নিন্দুকেরা বুদ্ধি দোষেই এমন মহোৎসব দেখতে পাচ্ছে না। পাষণ্ডীদের কারণে নিমাই পণ্ডিত

সৎলোকদেরও কখনো কখনো দরজা বন্ধ করে দেন। তাঁকে কৃষ্ণভক্ত জেনেও এসব করতে হয়। আমাদের যদি সত্যি তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি থাকে তবে আমরা অবশ্যই তাঁর নৃত্যকীর্তন কোন না কোন প্রকারে দেখতে পাবই। কোন কোন লোক আবার বলে,—অপেক্ষা করলে অবশ্যই একদিন না একদিন তাঁর নৃত্য দেখতে পাব। সংসারের উদ্ধারের জন্যই নিমাই পণ্ডিত নদীয়াতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি সকলকে বলেছেন,—নগরের ঘরে ঘরে তিনি সঙ্কীর্তন করবেন। নবদ্বীপের লোকেরা অনেকেই প্রভুর নিত্য পার্ষদ। তাঁরা সকলেই মহাভক্ত। কিছু কুতার্কিক পণ্ডিত প্রভুর নিন্দা করে অধঃপাতে যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করছে। দিনের বেলাতে নবদ্বীপের অনেক লোকই প্রভুকে দর্শন করতে আসেন। তাঁরা সকলেই কিছু উপঢৌকন নিয়ে আসেন,—ঘৃত দধি পুষ্পমাল্য ইত্যাদি। প্রভুকে দেখে তাঁরা দণ্ডবৎ করেন। প্রভুও তাঁদের আশীর্বাদ করে বলেন,—তোমাদের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হোক। কৃষ্ণগুণকীর্তন করা ছাড়া আর কিছু আলোচনা করবে না। প্রভু সকলকে উপদেশ করলেন,—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হবে রাম রাম বাম হরে হরে॥ —এই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র গাঢ় মনোযোগ দিয়ে সকলে জপ করবে। এর দ্বারাই সকলের সর্বসিদ্ধি হবে। সব সময় এ নাম করতে পার, এর কোন বিশেষ বিধি-নিয়ম কিছু নেই। দশজন, পাঁচজন একত্র হয়ে বাড়ির দরজায় বসে হাতে তালি দিয়েও নাম করতে পার। হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥ তোমাদের সকলকেই বললাম,—স্ত্রী-পুত্র-পিতা মিলে ঘরে বসে একসঙ্গেও এই নাম করতে পার। প্রভুর মুখে মন্ত্র পেয়ে সকলে আনন্দিত মনে দণ্ডবৎ করে বাড়িতে চলে গেলেন। ভক্তগণ সেই থেকে সর্বদা কৃষ্ণনাম জপ করেন এবং কায়মনে প্রভুর চরণ ধ্যান করেন। সন্ধ্যা হলে সকলে নিজের নিজের বাড়িতে বসে একসঙ্গে হাতে তালি দিযে কীর্তন করেন। এই ভাবে শচীনন্দন নগরে নগরে কীর্তন করতে লাগলেন। প্রভু উঠে সকলকে আলিঙ্গন করছেন, নিজের গলার মালা সকলের গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। অত্যন্ত দৈন্য প্রকাশ করে এবং কাকুতি-মিনতি করে প্রভু সকলকে বললেন,—ভাইসব, তোমরা দিবারাত্র কৃষ্ণনাম কর। প্রভুর আর্তি দেখে কেঁদে সকলে কায়মনোবাক্যে কীর্তন করতে লাগলেন। পরম আনন্দে সব নাগরিকগণ হাতে তালি দিয়ে 'রাম নারায়ণ' কীর্তন করছেন। ঘরেঘরে মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে, দুর্গাপূজায় সে সব বাজান হয়। এখন সেই সব বাদ্য কীর্তনের সময়ে বাজান হচ্ছে। সকলেই আনন্দে গান-বাজনা করছেন। 'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম'—নগরময় এই রকম পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন শুরু হয়ে। গেল।

খোলাবেচা শ্রীধর সেই পথ দিয়ে উচ্চস্বরে হরিনাম করতে করতে যাচ্ছিলেন। কীর্তন শুনে তিনি মহানৃত্য আরম্ভ করে দিলেন এবং আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। লোকেরা এই দৃশ্য দেখে আনন্দে তারাও নাচতে লাগলেন এবং তাঁকে ঘিরে কীর্তন আরম্ভ করে দিলেন। শ্রীধর প্রেমানন্দে গড়াগড়ি যাচ্ছেন, বহির্মুখ লোকেরা দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। একজন পাপী তা দেখে বললে,—ভাইসব, তোমরা দেখছ? খোলাবেচা মিনশেও বোষ্টম হয়েছে। পরনে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, অথচ লোককে ঢং করে দেখাচ্ছে যেন তার কতই না ভাব হয়েছে। পাড়ার লোকেরা কেউ কেউ বলছে,—ভিক্ষে মেগে যে খায় সেও দুর্গাপূজা করতে চাইছে অসময়ে, অবাস্তব কাণ্ড। পাষণ্ডীগণ এই সব আলোচনা করছে। কিন্তু নগরবাসীরা রোজই কৃষ্ণনাম কীর্তন করছেন।

একদিন দৈবাৎ কাজী সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খের শব্দ শুনতে পেল। চারদিকে কেবল হরিনামের কোলাহল শুনে কাজী নিজের ধর্মশাস্ত্র স্মরণ করলেন। কাজী তার অনুচরদের হুকুম করলেন কীর্তন করা লোকদের ধরে আনবে আর বললেন,—আজই আমি এদের একটা ব্যবস্থা করব, দেখি এদের গুরু নিমাই কি করতে পারে? এই কথা শুনেই পাড়ার লোকেরা সব পালাল, ভয় পেয়ে কেউ কেউ চুল বাঁধতে পর্যন্ত পারল না। কাজী যাকে পেল তাকেই মারল, মৃদঙ্গ ভেঙ্গে দিল, ঘরের দরজা অপবিত্র করে দিল। কাজী বললেন,—নদীয়াতে বড় বেশি হিন্দুয়ানি আরম্ভ হয়েছে, ব্যাটাদের ধরতে পেলেই শাস্তি দেব। আজকে ছেড়ে দিলাম, রাত হয়ে গেছে। আর এক দিন ধরতে পারলেই জাত মেরে ছাড়ব। এইভাবে কাজী লোকজন নিয়ে রোজই নগরে ঘুরে ঘুরে কীর্তনের খোঁজ নিচ্ছে। মনের দুঃখে নবদ্বীপবাসীরা সকলেই এখন লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছে। হিন্দুদের মধ্যেও কাজীর কিছু সমর্থক আছে, তাদের টিট্‌কারি এখন আরো অসহ্য হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ বলে,—মনে মনে হরিনাম করলেই তো হয়। চীৎকার দেওয়ার কথা কোন্ পুরাণে লেখা আছে? শাস্ত্রবাক্য অমান্য করলে এমনই হয়। এদের কি জাত-যাওয়ারও ভয় নেই? নিমাই পণ্ডিতের বড় অহঙ্কার হয়েছিল, এবারে কাজীর হাতে পড়ে সব চুরমার হবে। নিত্যানন্দও তো নগরে নগরে ঘুরে ঘুরে কীর্তন করেন, এবারে তারও মজা বেরিয়ে যাবে। আমরা উচিত কথা বলে পাষণ্ড হলাম। আসলে নদীয়াতে এখন অনেক ভণ্ডের আমদানি হয়েছে। —এসব কথা শুনেও ভক্তরা কেউ কিছু উত্তর করেন না। তাঁরা গিয়ে সকলে মিলে প্রভুকে জানালেন,—কাজীর ভয়ে আর কীর্তন করি না আমরা তোমাকে জানিযে রাখলাম, আমরা সবাই নবদ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাব। —কীর্তন বাধা পেয়েছে শুনে প্রভু ক্রোধে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন এবং অতি জোরে হুঙ্কার করে উঠলেন। নবদ্বীপবাসী লোকেরা কানে হাত দিয়ে হরিকে স্মরণ করতে লাগলেন।

প্রভু নিত্যানন্দকে ডেকে বললেন,—তুমি প্রস্তুত হও। এক্ষুনি সমস্ত বৈষ্ণবগণের নিকটে চল। আজ সারা নবদ্বীপে কীর্তন করব। দেখি আমাকে কে ঠেকাতে পারে? দেখবে, আজ কাজীর ঘরদুয়ার ছারখার করে দেব, তাঁর বাদশাও কিছু করতে পারবে না। আজ আমি নবদ্বীপের সর্বত্র প্রেমভক্তি বিতরণ করব। আজ পাষণ্ডীদের কপালে দুর্ভোগ আছে। নগরবাসী বন্ধুগণ, তোমরা সব জায়গায় গিয়ে আমার এই কথা সকলকে জানিয়ে দাও। যারা শ্রীকৃষ্ণের রহস্য দেখতে চাও, আজ তারা সকলে একটি করে মশাল নিয়ে আসবে। কাজীর ঘর ভেঙ্গে দিয়ে তারই বাড়ির দরজায় কীর্তন করব, দেখি কে কি করতে পারে? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে আমার সেবকের দাস, সেই আমি যখন উপস্থিত আছি তখন কারো কোন ভয় নেই। মনে কেউ বিন্দুমাত্র ভয় রাখবে না, খাওয়া দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে তাড়াতাড়ি চলে আসবে। প্রভুর মুখে এই কথা শুনে নবদ্বীপবাসীগণের আর আনন্দের সীমা নেই। তাঁরা খাওয়া দাওয়ার কথা যেন ভুলেই গেলেন। ঘরে ঘরে এই খবর রটে গেল যে, নিমাই পণ্ডিত আজ সারা নগরে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করবেন। নবদ্বীপের কত লোক প্রভুর নৃত্য না দেখতে পেয়ে মনে দুঃখ নিয়ে চেপে ছিলেন। হাজার হাজার লোকের মনে কত কষ্ট ছিল। প্রভু আজ নবদ্বীপে সর্বত্র নাচবেন শুনে সকলেই বাড়ির দরজা সাজাতে লাগলেন। মশাল লাগালেন। পিতা একটি মশাল বেঁধেছেন, ছেলেও আবার নিজের উদ্যোগে আর একটি মশাল বাঁধলেন দরজায়।

কেউ কারো আনন্দে বাধা দিচ্ছেন না। সকলেই বড় বড় ভাণ্ডে তেল নিয়ে মোটা করে মশাল তৈরি করছেন। নদীয়ার হাজার হাজার লোক কত-হাজার যে মশাল বেঁধেছে তা গুণে শেষ করা যাবে না। সমাজের যাঁরা গণ্যমান্য তাঁরা একেক জনেই কয়েক শো মশাল তৈরি করালেন। নদীয়ার আবালবৃদ্ধবণিতা আজ আনন্দে ভেসে চলেছেন, সারা নবদ্বীপ শহর মশালে মশালে ছেয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ছাড়া কি এসব হতে পারে? তবু পাপীলোকেরা এখনো কিছুই জানল না। প্রভুর ইঙ্গিতেই সারা নবদ্বীপের লোক অসংখ্য মশাল হাতে করে প্রভুর কাছে চলে এসেছেন। বৈষ্ণবগণও শুনেই চলে এসেছেন। শচীনন্দন সকলকে আজ্ঞা করলেন,—সকলের সামনে যাবেন অদ্বৈতাচার্য, তাঁর সঙ্গে একটি দল গান করবে। মাঝখানে নৃত্য করবেন হরিদাস। তাঁর পাশে একটি দল গান করবে। তার পরে নৃত্য করবেন শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁর সঙ্গেও একটি কীর্তনের দল গান করবে। প্রভু নিত্যানন্দের দিকে তাকাতেই নিত্যানন্দ বললেন,—তোমাকে একা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তোমাকে ধরে ধরে আমি হাঁটব,—এটাই আমাব কাজ। ক্ষণিকের জন্যেও তোমার পাদপদ্ম আমার হৃদয় থেকে ছাডাতে পারব না। তোমাকে ছাডা আমার নাচবার কি শক্তি আছে? তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব,—এই আমার সেবা। নিত্যানন্দের অঙ্গে প্রেমানন্দ ধারা দেখে মহাপ্রভু তাঁকে নিজের শরীরের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখলেন: এইভাবে নিজের মনের আনন্দে কেউ বা একাকী নাচছেন, আবার কেউ প্রভুর পাশাপাশি চলেছেন।

এই মহা-নগরসংকীর্তনের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলে সংসারবন্ধন ছিন্ন হযে যায। গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, শ্রীবাস, গোপীনাথ, জগদীশ, গঙ্গাদাস বিপ্র, রামাই, গোবিন্দানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য, বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, মুকুন্দ, শ্রীধর, গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন আচার্য, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রমুখ যাঁরাই প্রভুর অতি গূঢ় লীলারহস্য জানেন তাঁবা সবাই এসেছেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্তেব সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব। সকলেব নাম বলতে গেলে বেদব্যাসকে একটি পুরাণ বচনা করতে হবে। অঙ্গ ও উপাঙ্গ রূপ অস্ত্র এবং পার্যদগণের সঙ্গে মহাপ্রভু নৃত্য করছেন,—কোন মানুষের পক্ষে এই দৃশ্যের সঠিক বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শচীনন্দন রূপে প্রভু যা প্রকাশ করলেন এমন অদ্ভুত অবতারেও তো আর নেই। আস্তে আস্তে বিশ্বম্ভবের আনন্দ বেড়ে উঠছে, এদিকে বেলাও শেষ হযে এল। ভক্তগণও আনন্দের সমুদ্রে ভেসে চলেছেন। প্রভু কমলাকান্ত নগরে নৃত্য করবেন, দেখে জীবের দুঃখ ঘুচে যাবে। আবালবৃদ্ধবণিতা-স্থাবরজঙ্গম সেই নৃত্য দেখলে সর্ববন্ধ মোচন হবে। আনন্দ-আবেশে কারো বাহ্যজ্ঞান নেই, এদিকে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অগণিত লোক দরজায এসে উপস্থিত হয়েছে, তাদের হরিধ্বনির শব্দ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে উঠছে। প্রভু শচীনন্দন হুঙ্কার করে উঠলেন, সবার কর্ণপথ সুখে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। প্রভুর হুঙ্কারের শব্দে উৎসাহিত হয়ে সকলে 'হরি' বলে প্রদীপ জ্বালাল। চারদিকে হাজার হাজার লোক প্রদীপ জ্বেলেছে এবং তারা সকলে মিলে হরিধ্বনি দিচ্ছে। সকল লোকের মনে যে কী আনন্দ আজ এবং কী শোভা পেয়েছে এই দৃশ্যে তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। চন্দ্র সূর্য গ্রহগণ যে কী শোভা ধারণ করেছে তাও বলে শেষ করা যাবে না। আকাশের সর্বত্র যে অপূর্ব আলোকচ্ছটা দেখা যাচ্ছে, সেই জ্যোতিস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণই কি আত্মপ্রকাশ করছেন? প্রভু হরিধ্বনি করে উঠতেই বৈষ্ণবগণ সকলে প্রস্তুত হলেন। প্রভু ঘুরে ঘুরে কীর্তন করছেন, সকলেরই কপালে আবির চন্দন এবং গলায় ফুলের মালা। সকলের হাতেই করতাল মন্দিরা শোভা

পাচ্ছে, সবারই শরীর-মনে যেন কোটি সিংহের পরাক্রম। নিজেরই বিগ্রহস্বরূপ ভক্তগণকে নিয়ে প্রভু বেরিয়ে পড়লেন। প্রভু নৃত্যের আনন্দে বেবিয়ে পড়েছেন আর ভক্তগণ হরিধ্বনি করে মহানন্দে ভাসছেন। প্রভুর শ্রীমুখ দেখে লোকেদের সংসারতাপ দূর হয়ে যাচ্ছে, তারা তখন লাফিয়ে লাফিয়ে হরিধ্বনি করছেন। প্রভুর মুখশ্রী, তাঁর লাবণ্য কন্দর্পের রূপকেও যেন হার মানায়, কারো সঙ্গেই তাঁর উপমা চলে না। তবু তাঁরই কৃপাবলে কিছু বলছি, তাঁর কৃপা ব্যতীত বর্ণনা করা অসম্ভব। সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রের সারস্বরূপ জ্যোতির্ময় কনক-বিগ্রহ, তাতে চন্দ্রাকারে চন্দনে ভূষিত। কোঁকড়ানো চুলে মালতীর মালা শোভা পাচ্ছে, প্রভু চৌষট্টি কলাকে পরাজিত করে মধুর হাসির সৌন্দর্য ও মাধুর্য বিস্তার করছেন। ফাগবিন্দুর সঙ্গে কপালে চন্দন শোভা পাচ্ছে, প্রভু বাহু তুলে হবিধ্বনি কবছেন। আজানুলম্বিত মালা সর্ব অঙ্গে দুলছে, প্রভুর সারা শরীর নয়নপদ্মের জলে ভিজে যাচ্ছে। প্রভুর দুটি হাতে যেন সোনার স্তম্ভ। প্রেমপুলকে স্ফীত রোমমূলকে মনে হচ্ছে যেন একেকটি সোনার কদম্বফুল। সুরম্য অধর, সুন্দর দশন, কর্ণমূলে ভ্রূভঙ্গেব বিস্তার। চওড়া কাঁধ, সরু কোমর, বুকের উপরে শাদা পৈতে। তাঁর চরণপদ্মে লক্ষ্মীদেবী এবং তুলসীদেবী শোভা পাচ্ছেন। অতীব সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেছেন। উন্নত নাসিকা, সিংহের মত গ্রীবা। সকলের চেয়ে পীতবর্ণ দীর্ঘদেহ। এত লোকের ভীড়ের মধ্যেও প্রভুর উচ্চ শির বহু দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। লোকেরা বলছে,—ঐ যে প্রভুর মাথায় নানা ফুলের মালা শোভা পচ্ছে। মানুষের ভীড়ে ভীড়াকার—একটি সরষেও এই ভীড়ে গলে পড়বে না মনে হচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু তার মধ্যেই সকলেই প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করতে পারছেন। নারীগণ মুখপানে তাকিয়ে উলুধ্বনি করে উঠছেন। প্রতি বাড়ির দবজায় কাঁদি কাঁদি কলা, পূর্ণ ঘট, নারকেল, আম্রপল্লব। বাটার উপবে ঘৃতেব প্রদীপ, দধি, দূর্বা, ধান্য ইত্যাদি মাঙ্গলিক উপচার। নদীযার প্রতি বাড়ির দরজায় এই দৃশ্য। কাব ইচ্ছায় এসব হয়েছে কে বলবে? নারী-পুরুষ সকলেই মহানন্দে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। চোরেব মনে হল,—আজ এই অবসবে সবার-ঘরে চুরি করা যাবে। কিন্তু সেও ভুলে গিযে হরিধ্বনি দিযে আজ এই মেলায় এসে মিশেছে। সমস্ত রাস্তায় খৈ এবং কড়ি ছড়িযে বযেছে, কি করে হল, কে করল, কে জানে? এসব অতিরঞ্জন নয়, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিহার কবেন সেখানে এমনিই হয়। ভাগবত বলেন, চোখের নিমেষে নয় লক্ষ প্রাসাদ বিশিষ্ট রত্নময় দ্বারকা নগরীর উদ্ভব হযেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের সঙ্গে সেই দ্বারকায জলকেলি করেছিলেন। বিখ্যাত লবণসমুদ্র প্রভুর ইচ্ছামাত্রে অমৃত-সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। এ সকল গুপ্তকথা হরিবংশ-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, এতে সন্দেহ করবার কিছু নেই। সেই প্রভু তাঁর নিজের কীর্তনে বিহ্বল হয়ে নাচছেন। তাই আপনা থেকেই সকল মঙ্গল সেখানে উপস্থিত হয়েছে। প্রভু ভাগীরথী তীর দিয়ে নৃত্য করে চলেছেন, তাঁর সামনে পেছনে বহু লোক হরিধ্বনি দিয়ে চলেছেন। অদ্বৈতাচার্য কিছু লোক নিয়ে আনন্দে নৃত্য করে চলেছেন। তারপর হরিদাস প্রভুর আজ্ঞা রক্ষা করে সুন্দর নেচে চলেছেন। তার পেছনে আছেন কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ শ্রীনিবাস। এইভাবে ভক্তগণ আগে আগে নেচে চলেছেন। সকলকে ঘিরে আবার একটি দল গাইছে।

সবার পেছনে রয়েছেন শ্রীগৌরসুন্দর। তিনি অত্যন্ত মনোহর নৃত্য করে চলেছেন। যে-লোক কোনদিন গান করে না সেও আজ গানে যোগ দিয়েছে, সমস্ত ভক্তগণই যেন দৈবাৎ মধুকণ্ঠ হয়ে উঠেছেন। মুরারি, গোবিন্দ দত্ত, রামাই, মুকুন্দ, বক্রেশ্বর, বাসুদেব

ইত্যাদি সকলেই প্রভুর চার দিকে ঘুরে ঘুরে গাইছেন। পরমানন্দে প্রভুর সঙ্গে তাঁরা গেয়ে চলেছেন। প্রেমামৃতসাগরে ভেসে নিত্যানন্দ ও গদাধর দুজন প্রভুর দুপাশে চলেছেন। মহাপ্রভু নেচে নেচে চলেছেন, তাঁকে দেখবার জন্য হাজারে হাজারে লোক কাতারে কাতারে দৌড়ে আসছে। লক্ষ লক্ষ মশাল জ্বলছে, সকলের শরীরে যেন চন্দ্রালোক পড়েছে মনে হল। চারদিকে হাজার হাজার মশাল জ্বলছে, চারদিকে সহস্রকণ্ঠে হরিধ্বনি হচ্ছে। প্রভুর অপূর্ব নৃত্যলক্ষণ দেখে নদীয়ার লোকেরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। প্রভুর সারা শরীর ধুলোয় ভরে যায় আবার ক্ষণেকের মধ্যেই চোখের জলে তা ধুয়ে যায়। প্রভুর শরীরের সেই কম্প ঘর্ম এবং পুলকাদি দেখে পাষণ্ডীদেরও ইচ্ছে হয় নাচে যোগ দিতে। সারা নগরী কৃষ্ণনামের ধ্বনিতে উথাল-পাথাল হয়ে উঠেছে। মানুষ এখানে-ওখানে নানা জায়গায় দলে দলে হরিধ্বনি দিচ্ছে। ভাগ্যবান সব লোকেরা 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' বলে নেচে চলেছেন। চারদিকে দলে দলে লোক কেউ নাচছে, কেউ গাইছে, কেউ বাজাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সারা নদীয়াতে এইভাবে আনন্দে নেচে চলেছে। হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।। —এই নাম করে কেউ একাই নাচছেন আবার কেউ কেউ দশ-পাঁচজন মিলে হাতে তালি দিয়েও নাচছেন। দুহাতে মশাল ধরে রয়েছে কিন্তু কী আশ্চর্য তা সত্ত্বেও তালি দিচ্ছেন। নবদ্বীপ যেন আজ বৈকুণ্ঠ হয়ে গেছে। তাই সবাই বৈকুণ্ঠধর্মে চতুর্ভূজ হয়ে গেছেন। কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে তাঁরা টেরও পান নি যে তাঁরাই কি করে চতুর্ভূজ হয়েছিলেন। লীলাশক্তির প্রভাবে তাঁরা জানতেও পারেন নি যে তাঁদের চার হাত হয়েছিল এবং তারা মশাল ধরেও তালি বাজিয়েছিলেন। এইভাবে বৈকুণ্ঠের আনন্দে সকলে মিলে গঙ্গার তীর ধরে নেচে নেচে চলেছেন। বাম হাতে বাঁশী এবং গলায় কদম্বমালা পবে যেন নন্দনন্দন চলেছেন। এই ভাবে কীর্তন করতে করতে লোকেরা দেহধর্ম ভুলে গেল। দুঃখ-শোক ভুলে গেল। কেউ মালকোচা মেরে গড়াগড়ি দিচ্ছে, কেউ বা মুখে নানা কথা বলে চলেছেন। কেউ বলছে,—এখন কাজীটা কোথায় গেল, তাকে পেলে মাথা ছিঁড়ে ফেলতাম। পাষণ্ডীদের ধরবার জন্য কেউ দৌড়ে যায়, কেউ বা পাষণ্ডীদের নামে মাটিতে কিল-চড়-লাথি মারে। এই কীর্তন-শোভাযাত্রায় যে কত লোক যোগ দিয়েছে, কত জন মহানন্দে গান গায়, কতজন মৃদঙ্গ বাজায় তা বলে শেষ করা যায় না।

বৈকুণ্ঠসেবকরাও যা কামনা করেন সেই প্রেমভক্তি আজ সারা নবদ্বীপকে ছেয়ে ফেলেছে। ব্রহ্মা, অনন্তদেব, শঙ্কর যে-সুখ পেলে বিহ্বল হন আজ সেই রসামৃত ধারায় সারা নদীয়া নগর ভেসে যাচ্ছে, বৈকুণ্ঠনাথ আজ গঙ্গাতীরে সাঙ্গোপাঙ্গ এবং পারিষদবর্গকে নিয়ে নেচে চলেছেন, আজ পৃথিবীর আর আনন্দের সীমা নেই, সে ভক্তদের জন্যে সর্ব দিকে পথ তৈরি করে দিয়েছে। আজ কোথাও কীর্তন ছাড়া আর কিছু নেই, আজ সর্বত্র আনন্দ-উদ্যানে ভরে গেছে। প্রভু গৌরসুন্দর নেচে নেচে চলেছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে গাইছেন,-হে প্রভু, তোমার চরণে আমাদের মন লাগুক। 'তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে। সারঙ্গধর, তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।। —প্রভুর এই আদি কীর্তন গাইছেন ভক্তগণ আর সঙ্গে তিনি নেচে চলেছেন। সকলেই প্রভুব সঙ্গে কীর্তন করে চলেছেন কিন্তু কোন্ দিকে যে যাচ্ছেন তা কেউ জানেন না। মনে হচ্ছে যেন লক্ষকোটি লোকের হরিধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে শব্দ চলে যাচ্ছে। ব্রহ্মলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত কৃষ্ণসুখে ভরে গেছে। দেবতারা সকলেই তাঁদের পার্ষদগণকে নিয়ে এই অপূর্ব কীর্তন দেখতে এসেছেন,

এবং দেখে মূর্ছিত হয়েছেন। কিছু পরেই তাঁরা চৈতন্য লাভ করে মানুষের রূপ ধরে কীর্তনের ভীড়ে মিশে গেছেন। ব্রহ্মা, শিব, বরুণ, কুবের, ইন্দ্র, সোম, যম প্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মসুখ-স্বরূপ অপূর্ব রঙ্গ দেখে সকলেই মানুষের চেহারা নিয়ে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গ নিলেন। দেবতা এবং মানুষে মিলে হরিধ্বনি করছেন। বিরাট বিরাট মশালে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে। প্রতিটি বাড়ির দরজায় কলাগাছ, পূর্ণ ঘট, ধানদূর্বা, দীপ, আম্রপল্লব। আজ এই নদীয়া নগরীর অপূর্ব সম্পত্তি এবং অসংখ্য ঘর-চত্বরের সৌন্দর্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। কোন্ বুদ্ধিহীন আজ এর লোকসংখ্যাই বা গুণতে যাবে? প্রভু অবতীর্ণ হবেন জেনে বিধাতা আজ এখানে এই অপূর্ব সমাবেশ করেছেন। নারীগণ উলুধ্বনি দিয়ে যে হরিধ্বনির সাহচর্য করেছেন তাও লক্ষবৎসর ধরে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। প্রভুকে নেচে নেচে যেতে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না। সেই করুণ দৃশ্য দেখে, সেই ক্রন্দন শুনে অতীব লম্পটও মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে। প্রভু 'বল বল' বলে নাচছেন, তাঁর গলায় অতি-মনোহর ফুলের মালা শোভা পাচ্ছে। প্রভু কাছুটি মেরে কাপড় পরেছেন, গলায় পৈতে, কমল নয়ন কিন্তু সারা গায়ে ধুলো। মন্দাকিনীর মত প্রেমাশ্রুধারা বইছে। এ মুখের কাছে চাঁদেব সৌন্দর্বও কিছুই নয়। প্রভুর সুন্দব নাক দিয়ে অবিরত ধারা বইছে, যেন সূক্ষ্ম মুক্তার হার। সুন্দর কোঁকড়ানো চুল, বিচিত্র ভাবে বাঁধা হয়েছে। তাতে মালতী ফুলের মালা শোভা পাচ্ছে। প্রভু, তোমাব এই লীলার দৃশ্য যেন আমাদের হৃদযে সর্বদা উদিত হয,—জন্ম জন্ম ধরে এই আশীর্বাদ চাই।—সারা পৃথিবী এই বর প্রার্থনা করে। শ্রীশচীনন্দন নেচেই চলেছেন। প্রিয পার্ষদগণ আগে আগে নাচছেন, প্রভু নাচছেন পেছনে। প্রভু ভক্তের মর্যাদারক্ষার জন্যই ভক্তের নাচের তালে তালে পেছনে পেছনে নাচছেন।

এইভাবে নাচতে নাচতে প্রভু গঙ্গার পাশ দিয়ে চলেছেন। বৈকুণ্ঠনাথ সর্বনবদ্বীপে নাচছেন, ভক্তগণ তাঁব পুণ্যকীর্তি গাইছেন! —হে মাযামুগ্ধ লোকগণ, হরি নাম নাও। তাহলে আর শমন ভয় থাকবে না। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণ যাঁব পাদপদ্ম বন্দনা করেন সেই গৌরহরি এই সব কীর্তনে নেচে চলেছেন। সকলের ঈশ্বর বিশ্বম্ভর ভাগীরথী তীরে নাচছেন, সকলেই মহানন্দে তাঁর পদধূলি মাথায় নেন। তাঁর অপূর্ব বিকার, নয়নে অশ্রুধাবা, তিনি হুঙ্কার গর্জন করেছেন। তিনি হাত তুলে হাসি মুখে হরিনাম করছেন। কন্দর্পের মত সুন্দর তাঁর শরীর, তিনি দিব্য বস্ত্র পরেছেন, তাঁর কুঞ্চিত কেশে মনোহব মালা যেন পঞ্চবান তুল্য। শ্রীঅঙ্গে চন্দনের শোভা, গলে বনমালা, শচীনন্দন আনন্দে ঢলে পডছেন, তিনি প্রেমে অস্থির। দুইটি ভ্রূ যেন কামদেবের ধনুক, কপালে চন্দনের ফোঁটা, মুক্তার মত সুন্দর দাঁত, সুন্দর মুখমণ্ডল, স্বভাবে তিনি করুণাসাগর। চোখের নিমেষে অদ্ভুত বিকার হয়—অশ্রু, কম্প, ঘর্ম, পুলক, বৈবর্ণ্য—এমনি নানা ভাব। ত্রিভঙ্গ হয়ে এমন ভাবে মুখের কাছে আঙুল রেখেছেন মনে হচ্ছে যেন মুরলী বাজাচ্ছেন, তাঁর স্বাভাবিক গতিই মত্ত গজগমনকেও হার মানায়। প্রভুর বুকে পৈতে দেখলে মনে হয় যেন অশেষ গুণবান্ অনন্তদেবই প্রভুর অঙ্গস্পর্শলোভে বক্ষস্থলে রয়েছে। মাধবনন্দন গদাধর পণ্ডিত এবং শ্রীনিত্যানন্দ তাঁর দুপাশে দুজন রয়েছেন; প্রভুর ভক্তগণ কীর্তন করছেন, তাঁদের দিকে তাকিয়ে প্রভু মিটিমিটি হাসছেন। শিব যাঁর নামগুণ কীর্তন করে দিগম্বর হয়েছেন, স্বয়ং সেই প্রভু নগরে নগরে কীর্তন করছেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যে করযুগল, কেশকলাপ, দিব্য অঙ্গ, পরিধেয় বস্ত্রাদির সেবাযত্ন করে থাকেন সেই প্রভু

স্বয়ং আজ নগরে নগরে কীর্তন করে ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। অসংখ্য মশালে, চাঁদের আলোকে খুবই আনন্দ হয়েছে, সকলের মুখেই আজ কেবলই হরিনাম। এই অপূর্ব কৌতুক দেখে সকলেই যেন বিভোর হয়ে গেছে, সকলেই সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে কেবল বলছে,—ভাই, হরি বল। নিত্যানন্দ জানেন যে প্রভু কখন প্রেমানন্দে কীর্তন করতে করতে পড়ে যাবেন, তাই তিনি দুবাহু বাড়িয়ে আছেন যাতে প্রভু পড়তে গেলেই ধরতে পারেন। মহাপ্রভু কখনো কখনো বীরাসন করে বসে নিত্যানন্দকে ধরে থাকেন, বাম কাঁখে আনন্দে তালি দিয়ে 'হরি হরি' বলে হাসছেন। তিনি কখনো তত্ত্ব প্রকাশ করে বলেন,—আমি মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ, কংসকে বধ করেছি, বামন রূপে বলিরাজকে ছলনা করেছি। সেতুবন্ধ করে রাবণকে মেরেছি; আমিই রাঘব। —হুঙ্কার করে এসব বলে তিনি চার দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর তত্ত্ব বুঝা ভার, তখনই আবার তিনি অন্য কথা বলছেন। দাঁত দিয়ে তৃণ কেটে 'প্রভু প্রভু' বলে ভক্তি কামনা করছেন। প্রভু যখন যেমন লীলা করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাই করে থাকেন এবং যা করেন তাই দেখতে ভাল লাগে। প্রভু কখনও নিজের মুখ, অথবা নিজের পাযের আঙুল ধরে খেলা করেন। বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর প্রভু-বিশ্বম্ভর সমগ্র নবদ্বীপে নৃত্য করছেন, এই নবদ্বীপই শ্বেতদ্বীপ, শাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে। মন্দিরা, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, করতাল,—কত কি যন্ত্র বাজছে, চারদিকেই মহা হরিধ্বনি মাঝখানে প্রভু। বিশ্বম্ভরের নগরকীর্তনের জয় হোক, চৈতন্যলীলাকথা এবং চৈতন্য ভক্তবৃন্দেরও জয় হোক। প্রভু যে-দিকে তাকাচ্ছেন সেদিকেই যেন প্রেমে ভেসে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দের বিষয়ে এই পদ কীর্তন করছেন শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। শিব শিব উচ্চারণ অতি সুমঙ্গল, বিশ্বম্ভব সেই শিবনাচ নাচছেন।

এই ভাবে প্রভু নগরে নগরে কীর্তন করছেন। সকলেই অবিবাম হরিধ্বনি দিচ্ছেন, তার শব্দ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে বৈকুণ্ঠে পৌঁছে যাচ্ছে। বৈকুণ্ঠনাথ প্রভু বিশ্বম্ভর তা শুনে খুবই প্রীতি লাভ করছেন। প্রভু কেবলই 'বল বল' বলছেন আর আনন্দে লাফ দিচ্ছেন। প্রভুর প্রেমতরঙ্গ নানা ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, তার কাছে যেন মত্তসিংহও পরাজয় স্বীকার করে, সকলে তা দেখে মহা আনন্দিত। নদীয়ার গঙ্গাতীরের রাস্তা ধরে প্রভু আগে আগে চলেছেন। প্রভু নিজের ঘাটে আগে গিয়ে গঙ্গাব তীর ধরে সিমুলিয়া গ্রামে গেলেন। লক্ষকোটি লোকের হাতে মশাল, তাঁরা সবাই হরিধ্বনি দিচ্ছেন। চাঁদের আলোতে যেন সব মিলিয়ে দিনের মত লাগছে। এখানেও প্রতি বাড়িব দবজায় পূর্ণঘট, কলা, আম্রপল্লব, প্রদীপ দিয়ে মাঙ্গলিক আচার করা হয়েছে। অন্তরীক্ষ থেকে স্বর্গের দেবতারা চম্পক এবং মল্লিকা পুষ্প বর্ষণ করছেন। সারা নবদ্বীপ ফুলে ফুলে ঢেকে গেল। ফুল ছড়ানো রাস্তায় হাঁটতে প্রভুর কোমল পদদ্বয়ে কোন কষ্টই হল না। অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর আগে আগে নেচে চলেছেন, সর্বপ্রকাশক প্রভু পেছনে নাচছেন। প্রভু যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই লোকেরা শুনেই ঘব-দুয়াব ছেড়ে দৌড়াচ্ছেন। তাঁর চন্দ্রমুখ দেখেই সকলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়েন। নারীগণ স্বামী পুত্র গৃহ বিত্ত সব ভুলে উলুধ্বনি ও হরিধ্বনি দিচ্ছেন। নদীযার কোটি কোটি লোক কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হয়ে পড়েছেন। কেউ নাচগান করছে, কেউ হরিধ্বনি দিচ্ছে, কেউ নিজেব কথা ভুলে গিয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, কেউ মুখে নানা রকম বাজনা বাজায়, মহানন্দে কেউ লাফিয়ে অন্যের কাঁধে উঠে বসছে, কেউবা অন্যের পা ধরে কাঁদছে, আবার একজন নিজের চুল দিয়ে অন্যের পা বেঁধে দিচ্ছে, কেউ কারো পায়ে দণ্ডবৎ হযে পড়ছে, কেউ বা অন্যের সঙ্গে কোলাকুলি

করছে, কেউ বা বলে বসছে,—আমি নিমাই পণ্ডিত—জগৎকে উদ্ধার করার জন্য এসেছি। কেউ বলে,—আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব। কেউ বলে,—আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ্। আর একজন বললে,—কাজী ব্যাটা কোথায় গেল? ধরতে পারলে আজ মাথা ফাটিয়ে দিতাম। কেউ কেউ পাষণ্ডীদের ধরবার জন্যে দৌড়ে গিয়ে বলে,—পাষণ্ডীরা পালাচ্ছে, ধর ধর। কেউ কেউ গিয়ে গাছের উপরে ওঠে, আবার দলে দলে কেউ কেউ লাফ দিয়ে পড়ে। পাষণ্ডীদের মারবার জন্যে কেউ কেউ গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে দৌড়ে আসে। বলে,—আমি পাষণ্ডীদের যম। কেউ কেউ মুখে নানা রকম অদ্ভুত আওয়াজ করে। একজন হয়তো যমরাজাকেই বেঁধে আনতে ছুটল। যমদূতকে বলেছি,—তোর যমরাজাকে জানিয়ে দে,—বৈকুণ্ঠেশ্বর শচীর কোলে জন্ম নিয়ে নিজেই নগরে নগরে কীর্তন করছেন। এই নামের প্রভাবেই তোদের যম ধর্মরাজ হয়েছেন, অসৎ ব্রাহ্মণ অজামিল এই নামের প্রভাবেই উদ্ধার পেয়ে গেল, প্রভু এই নাম সবার মুখে নেওয়ালেন, সকলের মুখে এই নাম বলালেন। যার নাম উচ্চারণ করার ক্ষমতা নেই, সেও নাম শুনল। তোমরা কাউকেই ধরবে না, তাহলে তোমাদের সংহার করব। কারণ সকলেই নাম নিয়ে, নাম শুনে নিষ্পাপ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে চিত্রগুপ্তকে বলে দাও,—পাপীদের যে বিবরণ লেখা আছে সেসব মুছে দিক। এই নামের প্রভাবেই বারাণসী তীর্থরাজ হয়েছে, শুদ্ধসত্ত্ব-শ্বেতদ্বীপবাসীগণ এই নামই কীর্তন করেন। এই নামের প্রভাবেই মহেশ্বর সকলের কাছে পূজনীয়, সেই নাম এখন সকলেই শোনে এবং নাম করে। তোমরাও সেই নাম নাও, পরের অপকার করা ছেড়ে দাও, বিশ্বম্ভরের ভজনা কর, তাহলে আর তোমাদের সংহার করব না।

আবার দশ বিশ জন লোক দৌড়ে গিয়ে বলে,—কাজী ছদ্মবেশে পালিয়ে যেন যেতে না পারে, ব্যাটাকে ধর গিয়ে। যে সব পাপীরা কখনো কৃষ্ণনাম হরিনাম শুনতে চাইত না, তারা এখন কোথায় গেছে? পাষণ্ডীদের উদ্দেশে কেউ কেউ মাটিতে লাথি মারে আবার হুঙ্কার করে হরিধ্বনি করে ওঠে। এইভাবে সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে তারা যে কে কি করছে আর কি বলছে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। নবদ্বীপ শহরের সমস্ত সাধারণ লোকেদের এমন উন্মত্ত অবস্থা দেখে পাষণ্ডীরা জ্বলেপুড়ে মরছে। পাষণ্ডীরা এইসব কথা শুনে মনে মনে ভাবে,—ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন যদি একবার কাজী এখানে এসে পড়ে তাহলে ব্যাটাদের রংঢং, হাকডাক, জাঁকজমক, নাট্যগীত, কলাগাছ পোঁতা, আম্রপল্লব, ঘট—সব কোথায় যাবে তার কোন ঠিকঠিকানা থাকবে না। তাহলেই এদের সব কথার উত্তর দিতে পারব। প্রতিশোধ নেব। এতসব ভাবুকাল, এতসব মশাল, এত হৈ-হুল্লোড় শুনে যখন কাজী এসে পড়বে তখন ব্যাটারা সব গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পাবে না। ওদের মধ্যে কেউ কেউ বলছে,—আমি তখন খুঁজে খুঁজে নিয়ে এসে লোকগুলোকে কাজীর কাছে বেঁধে এনে দেব। কেউ বলে,—চল, কাজীকে গিয়ে খবর দিই। কেউ বলে,—এসব করা ঠিক হবে না। এর মধ্যেই আবার কেউ বলে,—একটা ভাল বুদ্ধি মনে পড়েছে। আমরা একদল দৌড়ে গিয়ে ভাবুকদের কাছে খবর দিই যে, কাজী লোকজন নিয়ে আসছে। তক্ষুনই দেখবে আর একজন লোকও নিমাইর কাছে থাকবে না, সব ভয়ে পালাবে। পাষণ্ডীরা এই ভাবে নিজেরা নানা রকম পরামর্শ করে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তবৃন্দ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কীর্তন করেই চলেছেন। সকলেরই কপালে চন্দন, গলায় মালা, বিহ্বল হয়ে কৃষ্ণনাম করছেন।

নদীযাব এক প্রান্তে সিমুলিয়া নগব, প্রভু নৃত্য-কীর্তন কবতে কবতে সেখানে এসে পৌঁছলেন। সহস্র কণ্ঠে হবিধ্বনি শুনে প্রভু হুঙ্কাব কবে নাচতে লাগলেন। তাঁব চোখ দিযে অবিবাম ধাবায অশ্রুপাত হচ্ছে। কেঁপে লাফ দিযে উঠছেন একেক বাব, শ্রীনিত্যানন্দও তাকে ধবে বাখতে পাবছেন না। তাবপব আবাব মূর্ছিত হযে পড়েন প্রভু, খানিকক্ষণ কোন চেতনাই থাকে না। এই সব অপূর্ব লক্ষণাদি দেখে সকলেই বলাবলি কবে,—ইনি স্বযং নাবাযণ হবেন। কেউ বলে,—মনে হচ্ছে যেন নাবদ, প্রহ্লাদ কিংবা শুকদেব। কেউ কেউ বলেন,—মানুষ নয, এটা ঠিক বুঝতে পাবছি। যাঁব যেমন উপলব্ধি তিনি সেভাবেই বলছেন। অত্যন্ত তার্কিক লোকেবা বলছে,—পবম বৈষ্ণব আব কি। ভক্তিব আবেশে প্রভুব বাহ্যজ্ঞান নেই, তিনি কেবলই বাহু তুলে 'হবি বোল, হবি বোল' বলছেন। প্রভুব মুখেব কথা শুনে সকল লোকে মিলে একসঙ্গে উচ্চস্ববে হবিধ্বনি কবে উঠছে। শ্রীগৌবাঙ্গ নেচে নেচে যেদিকে যাচ্ছেন, সকল লোক সেই দিকেই ধাওযা কবে। প্রভু তাবপব কাজীব বাড়িব পথ ধবলেন। কাজী ঘবে বসে বাজনাব শব্দ শুনতে পেলেন। কাজী বলছেন,—কিসেব গান হচ্ছে? কাবো বিযে-টিযে হচ্ছে নাকি? না কি ভূতেব কীর্তন লেগেছে। আমাব আদেশ লঙ্ঘন কবে কে এসব হিন্দুযানি কবছে? তাড়াতাড়ি জেনে এসো তো তাহলে আমিই যাব। কাজীব আদেশে তাঁব অনুচবেবা ধেযে গেল। কীর্তন-শোভাযাত্রাব অবস্থা দেখে মনে মনে কোবাণ আওড়াতে থাকে। সহস্র সহস্র লোক এক বাক্যে বলছে,—কাজী ব্যাটাকে মাবো। এই কথা শুনে কাজীব অনুচবেবা পাগড়ী লুকিযে দৌড়ে কাজীব কাছে এসে বলল,— দেবি কবো না। শীঘ্র পালিযে যাও। কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিযে নিমাই পণ্ডিত আসছে, আজ যে কি কাণ্ড হবে কিছুই বুঝতে পাবছি না। লাখ লাখ মশাল জ্বালিযে কোটি কোটি লোক নামকীর্তন কবতে কবতে এদিকে আসছে। নদীযায বাস্তাঘাট ফুলে ফুলে একাকাব, লোকেব বাড়িব দবজায দবজায মঙ্গল ঘট। বাস্তায অজস্র ফুল, খই, কড়িব, ছড়াছড়ি। বাজনাব শব্দে কানে তালা লেগে যাওযাব জোগাড়। নদীযাতে কখনো কোনো বাজাকেও এমন সাড়ম্ববে আসতে দেখিনি। অসংখ্য লোক নেচে নেচে চলেছে, নিমাই পণ্ডিত তাদেব মাঝখানে বযেছেন। সেদিন আমবা যে সব নগববাসীদেব মেবেছি তাবাই আজ 'কাজীকে মাবো' বলতে বলতে এদিকে এগিযে আসছে। নিমাই পণ্ডিতেব হুঙ্কাব শুনে মনে হয, এ নিশ্চয ভূত-প্রেতেব কাজ। তাদেব মধ্যে কেউ আবাব বলে,—বামনা এমনই কাঁদছে যেন তাব চোখ দিযে নদীব স্রোত বযে চলেছে। কেউ বলে,—বামনা আছাড় খেযে পড়ছে কিনা, তাই শবীবেব কষ্টে কাঁদছে। বলে,—ঐ বামুনটাকে দেখলে খুব ভয পাই, মনে হয যেন গিলতে আসছে। সব শুনে কাজী সাহেব বললেন,—মনে হয নিমাই পণ্ডিত বিযে কবতে যাচ্ছে, এ তাবই শোভাযাত্রা। আব তা যদি না হয, যদি আমাব আদেশ অমান্য কবে কীর্তন টির্তন কবতে থাকে তাহলে নদীযাব সকলেব জাত মেবে দেব।

এব মধ্যেই কীর্তনেব দল কাছে এসে গেল। সর্বলোকচূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভব নেচে কাজীব কাছে এসে হাজিব হলেন। কোটি কোটি লোকেব মহা হবিধ্বনি শব্দে যেন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সব ভবে গেছে। সেই শব্দে কাজী তাব লোকজন নিযে ভযে পালাচ্ছে,—ব্যাং, ইঁদুব সাপেব ভযে যেমন পালায ঠিক তেমনি। প্রভুব লোকেবা চাবদিকে ভীড় কবে দাঁড়িযে গেল। ভয পেযে পালাতে পাবছে না ওবা কেউ। পালাবাব পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তখন পাগড়ী খুলে দলে ভীড়ে গিযে নাচতে থাকে প্রাণেব ভযে।

যার দাড়ি আছে সে মাথা নীচু করে নাচতে থাকে, মুখ তোলে না, ভয়ে বুক কাঁপে। অসংখ্য লোকের মধ্যে কে কাকে চেনে? সকলেই আনন্দে নাচ-গান করছে, লোকেদের হরিধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ভরে গেছে। কাজীর দরজায় এসে প্রভু রাগে হুঙ্কার করে বললেন,—কাজী ব্যাটা কোথায় গেল? তাড়াতাড়ি তাকে ধরে নিয়ে এসো, আমি তার মাথা কেটে ফেলব। আজ আমি সারা পৃথিবী যবনশূন্য করে ফেলব। আগে যেমন করে কালযবনকে বধ করেছি ঠিক তেমনি। দরজা বন্ধ করে কাজী কোথায় পালিয়ে গেল? ঘর ভেঙ্গে ফেল।—প্রভু বারেবারেই এই কথা বলেছেন। শ্রীশচীনন্দন সর্বভূত-অন্তর্যামী। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করবে এমন কে আছে? চৈতন্যের ভক্তরা তাঁর আদেশে সকলেই ঘরে ঢুকলেন। তারা কেউ ঘর ভাঙ্গছে, কেউ দরজা ভাঙ্গছে, কেউ লাথি মারছে, কেউ হুঙ্কার করছে। কেউ আম-কাঁঠালের ডাল ভাঙ্গছে। কেউ কলা-বন উজাড় করে দিচ্ছে। ফুলের বাগানে বহু লোক ঢুকে পড়ে সব তছনছ করে দিচ্ছে। বোঁটাসুদ্ধ ফুল ছিঁড়ে নিয়ে কেউ কেউ কানে গুঁজে নাচছে। একটি করে পাতা নিয়েও সকলে মিলে কাজীর বাগান ফাঁকা করে দিল। কাজীর বাইরের ঘর সব ভাঙ্গা হয়েছে। তখন প্রভু হুকুম করলেন,—বাড়ির ভেতরে আগুন লাগিয়ে দাও। চারদিক দিয়ে ঘিরে দাও, সপরিবারে বাড়ির মধ্যে পুড়ে মরুক। দেখি কাজীর নবাব আমার কি করতে পারে। দেখি, আজ তাকে কে বাঁচাতে আসে? যম, কাল, মৃত্যু—এঁরা তিন জনেই আমার সেবকের সেবক। আমার ভক্তের অধীন। আমার ইচ্ছাতেই তারা প্রকাশিত হয়। সঙ্কীর্তন প্রচারের জন্যই আমার অবতার, যে পাপী সঙ্কীর্তনের বিরোধিতা করবে তাকে আমি আস্ত রাখব না। অতীব পাপী লোকও যদি সঙ্কীর্তন করে তবে আমি তাও মনে রাখব। তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগীপুরুষও যদি কীর্তন না করে তবে আমি তার রক্ষা রাখব না। তোমরা সকলে মিলে ঘরে আগুন দাও, ভয় পাবার কিছু নেই। আজ আমি সমস্ত যবন শেষ করে দেব।—ভক্তগণ প্রভুর ক্রোধ দেখে গলায় কাপড় দিয়ে, হাত তুলে প্রভুর পায়ে পড়ে বললেন,—মূল সঙ্কর্ষণ বলরাম হচ্ছেন তোমার প্রধান অংশ। অসময়ে তাঁরও ক্রোধ হয় না। মহা প্রলয়ের সময়েই অনন্তদেবরূপে সঙ্কর্ষণের ক্রোধ থেকে রুদ্রের আবির্ভাব হয়। যে রুদ্র নিমেষে সৃষ্টি সংহার করে সেও এসে তোমার শরীরে মিলিত হয়। তোমার অংশের অংশ ক্রুদ্ধ হলেই সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়, আর তুমি নিজে ক্রুদ্ধ হলে কে রক্ষা পাবে? বৈদিক শাস্ত্রের উক্তি অনুসারে তুমি হচ্ছ অক্রোধ পরমানন্দ, তাই শাস্ত্রবাক্য তো মিথ্যা হওয়া উচিত নয়। ব্রহ্মাদি দেবতারাও তোমার ক্রোধের পাত্র নয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তো কেবল মাত্র তোমার লীলা। কাজীকে তুমি অনেক অপমান করেছ, যদি আবার কিছু অন্যায় করে তখন প্রাণ সংহার করবে।

বাহুতুলে সব মহান্তগণ স্তুতি করতে লাগলেন,—মহারাজরাজেশ্বর বিশ্বম্ভরের জয়। সর্বলোকনাথ শ্রীগৌরসুন্দরের জয়। অনন্তশয়ন রমাকান্তের জয়। মহাপ্রভু বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের কথায় হাসেন এবং 'হরি' বলে নাচতে থাকেন। কাজীর দণ্ডবিধান করে মহাপ্রভু সকলের সঙ্গে কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চললেন। 'রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপালের' জয়ধ্বনি করে মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ, করতাল বাজিয়ে গান করতে করতে চলেছেন। নদীয়ার নাগরিকেরা কাজীর ঘর ভেঙ্গে দিয়ে মহানন্দে হরিধ্বনি দিয়ে চলেছে, পাষণ্ডীদের মনোবল ভেঙ্গে গেল। পাষণ্ডীদের কালো মুখ দেখে বৈষ্ণবেরা আনন্দ পেল। 'জয় কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী' বলে নগরবাসীগণ হাতে তালি দিয়ে কীর্তন করতে লাগল। এখন

সাবা নগরে কেবল জযেব আনন্দ, কে যে কোন দিকে গাইছে, গাইতে গাইতে কে কোথায যাচ্ছে তাব কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। ভক্তবৃন্দ আগে আগে নৃত্য কবে চলেছেন, মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন চলেছেন পেছনে। ব্রহ্মা, শিব, অনন্তদেব নিজেবাই কীর্তন করছেন আব তাঁদেব সঙ্গে নাচছেন বৈকুণ্ঠনাথ। এতে সন্দেহ কবাব কোনই কাবণ নেই, যেহেতু স্বযং শ্রীনিত্যানন্দই কৃপা কবে আমাকে একথা বলেছেন। হাজাব হাজাব লোক সঙ্গে নিযে প্রভু শঙ্খবণিকেব শহবে প্রবেশ কবেছেন। শঙ্খবণিকদেব মহল্লায আনন্দধ্বনি উঠল। সকলেই মৃদঙ্গ ঘন্টা শঙ্খ বাজিযে হবিধ্বনি দিচ্ছে। ফুল ছড়ানো পথে প্রভু নেচে চলেছেন। চাবদিকে সুন্দব সুন্দব প্রদীপ আলো দিচ্ছে। শ্রীগৌবহবি সেখানে কীর্তন কবছেন, চাবদিকে চাঁদেব হাট বসে গেছে। প্রতিটি ঘবেব দুযাবে পূর্ণকলস, কলা, আম্রপল্লব দিযে সাজানো হযেছে, নাবীগণ 'হবি' বলে জযধ্বনি কবছে। এইভাবে সকল নগবে শোভা কবে প্রভু তন্তুবাযেব নগবে এলেন। সেখানেও তেমনি আনন্দ-কোলাহল এবং জযধ্বনি উঠল। তন্তুবাযগণ আনন্দে আত্মহাবা হযে গেল। নগবকীর্তন কবতালি দিযে নেচে নেচে গাইছে, 'হবি বোল মুকুন্দ গোপাল বনমালি'। সকলেব মুখেই হবিনাম শুনে প্রভু খুশি হযেছেন। নেচে প্রভু তখন শ্রীধবেব বাসাব দিকে চললেন। শ্রীধব একখানি ভাঙ্গা ঘবে বাস কবেন। প্রভু এসে সেখানেই উঠলেন। তাঁব ঘবেব দুযাবে একটি ভাঙ্গা লোহাব পাত্র বযেছে, তাতে গোটা কতক তাপ্পি মাবা, চোবেও এমন ঘটি চুবি কবে না। প্রভু নাচতে নাচতে সেই জলপূর্ণ ঘটিটিব দিকে নজব কবলেন। তিনি ভক্তপ্রেম বুঝাবাব জন্যে সেই শতচ্ছিন্ন ঘটিটি তুলে নিযে অত্যন্ত আনন্দে তা থেকে জল খেলেন। তাঁকে বাধা দেয কাব সাধ্য। শ্রীধব তখন চিৎকাব কবে উঠলেন, — মবলাম, মবলাম। সে আমাকে মাববাব জন্যেই আমাব ঘবে এসেছে। এই কথা বলতে বলতেই ভাগ্যবান শ্রীধব মূর্ছিত হযে পড়লেন। প্রভু বললেন, --আমাব শবীব আজ বিশুদ্ধ হল। আজ শ্রীকৃষ্ণেব চবণে আমাব ভক্তি হল। শ্রীধবেব ঘটিব জল খেযে আমি বিষ্ণুভক্তি লাভ কবলাম। - -বলতে বলতে প্রভুব প্রেমাশ্রু বর্ষিত হতে লাগল। শ্রীগৌবাঙ্গ মহাপ্রভু সকলকে বুঝিযে বললেন, বৈষ্ণবেব স্থানে জল পান কবলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয। পদ্মপুবাণ আদিখণ্ডে আছে,— সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাবাব জন্য পণ্ডিতব্যক্তি বিশেষ যত্নে বৈষ্ণবেব অন্ন চাইবেন, না পাওযা গেলে বৈষ্ণবেব গৃহে জল পান কববেন।

প্রভুব অপূর্ব ভক্তবাৎসল্য দেখে সভায মহা-আনন্দ-ক্রন্দন ধ্বনি উঠল। নিত্যানন্দ গদাধব কাঁদছেন, অদ্বৈত এবং শ্রীবাস মাটিতে লুটিযে পড়ে কাঁদছেন। হবিদাস ঠাকুব, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, বক্রেশ্বব, মুবাবি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখব আচার্য, গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীগর্ভ, শ্রীমান, কাশীশ্বব, শ্রীবাম, জগদানন্দ, জগদীশ, গোপীনাথ, নন্দন, শুক্লাম্বব,——হাজাবে হাজাবে লোক মাথায হাত দিযে কাঁদছেন। এইভাবে শ্রীধবেব বাসায উচ্চস্তবেব প্রেমভক্তি প্রকাশিত হল। সর্বজগৎ আনন্দে 'কৃষ্ণ' বলে কাঁদছে। সঙ্কল্প সিদ্ধ হযেছে দেখে শ্রীগৌবাঙ্গচন্দ্র হাসছেন। ভক্তেব মহিমা প্রকাশ কবাব জন্যই প্রভু এই ভক্তবাৎসল্য দেখালেন। বাইবেব কাজেব জন্য বাখা জল, তা আবাব লোহাব ঘটিতে, প্রভু তাই পবম আদবে পান কবে নিলেন। প্রভু যখনই ঐ জল পান কববাব ইচ্ছা কবলেন তখনই ঐ ভক্তেব জল শুদ্ধ অমৃত-স্বরূপ হযে গেল। ভক্তি বুঝাবাব জন্য এমন লোহাব পাত্রের জলও বিশুদ্ধ হল, পবমার্থ দৃষ্টিতে বৈষ্ণবেব কাছে সবই নির্মল। অহঙ্কাবী লোকেব বাড়ির সোনার ঘটিতে রাখা হলেও সেই জলের দিকে তাকাতে নেই, পান কবা তো

দূরের কথা। অথচ প্রভু ভক্তের বাড়ির সবই খান, নৈবেদ্যাদি বিধিরও অপেক্ষা করেন না। ভক্ত সামান্য বস্তু বলে প্রভুকে দিতে সঙ্কোচ বোধ করলেও তিনি চেয়ে খান, দ্বারকার সুদামা-কাহিনী তার প্রমাণ। ভক্তের ভুক্তাবশেষও ভগবান গ্রহণ করেন, তার সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠিরের গৃহে দ্রৌপদীর কাছ থেকে শাক চেয়ে খাওয়া। কৃষ্ণভক্তগণই কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই ইত্যাদি রূপে জন্মগ্রহণ করেন, কৃষ্ণভক্ত ছাড়া অন্য কেউ কৃষ্ণকে এই নিজের লোকের মত সেবা করার অধিকার পান না। ভক্ত তাঁকে যেভাবে চিন্তা করেন তিনি সেভাবেই কৃষ্ণকে লাভ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের নিকট নিজেকে বিক্রয় কর তও পারেন। বৈদিক শাস্ত্রাদি একথাই বলেছেন যে, তিনি বড়ই ভক্তবৎসল, ভক্তের নিকট সর্বদা প্রকাশিত হন্। ভক্তের প্রভাব দেখে সকলেরই উচিত শ্রীকৃষ্ণকে দাস্যভাবে সেবা করা। 'কৃষ্ণদাস' কথাটি খুব যেমন-তেমন কথা নয়, ভগবানের দাস হতে পারা সহজ ভাগ্যের কথা নয়। বহু কোটি জন্ম স্বরূপগত ধর্ম পালন করে, অকপটভাবে, অহিংসায় জীবন যাপন করে, সর্বদা দাস্যভাবে প্রার্থনা জানিয়ে শেষ সময়ে 'নারায়ণ' উচ্চারণ করে তিনি গঙ্গা লাভ করতে পারেন এবং তখন তিনি সমস্ত মায়ার বন্ধন কাটাতে পারেন। এইভাবে ভক্ত গোবিন্দের দাস হয়ে পবিত্রত্ব লাভ করতে পারেন। বৈষ্ণবাচার্য এবং ভাষ্যকারগণ এই ব্যাখ্যা করেন যে, মুক্ত লীলাতনুতে তাঁরা তখন কৃষ্ণভজন করতে সমর্থ হন। ভাষ্যকারগণের বক্তব্য হচ্ছে,—মুক্তপুরুষেরাও স্বেচ্ছায় শরীর গ্রহণ করে শ্রীভগবানের ভজনা করে থাকেন। তাই বলা হচ্ছে, ভক্ত ঈশ্বরতুল্য, ভগবান ভক্তের কাছে পরাজিত হতে ভালবাসেন। পৃথিবীতে যত স্তুতি আছে ভক্তের সমান স্তুতি কেউ করতে পারেন নি। ব্রহ্মা শিব সকলেই দাস হতে চান, অনন্তদেব বা বলরাম বা নিত্যানন্দও তাই দাস হতে চান। এরা ঈশ্বরতুল্য, তাই স্বাভাবিক ভাবেই ভক্ত, তব আবার ভক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা। শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্যও একজন ভক্ত, —এই কথা বললে পাপীরা মনে কষ্ট পায়। এ তাদের কর্মফল ছাড়া আর কিছু নয়। ভক্তের উপরে কৃষ্ণ বড়ই সন্তুষ্ট, তিনি ছাড়া প্রকৃত ভক্তিতত্ত্ব আর কেউ জানেনও না। পাপীরা এখন পেটের ধান্দায় নিজেদের ঈশ্বর বলে প্রচার করে, আসলে কিন্তু এরা মহামূর্খ, অকর্মণ্য, অপদার্থ, জবদগর। শেয়াল-কুকুরের মত শিষ্যদের তারা বলে,—আমাকে শ্রীরামচন্দ্র মনে করবে। বিষ্ণুমায়াতে বিমুগ্ধ হয়ে তারা শৃগাল-কুকুরের খাদ্য এই শরীরকে দেখিয়েই নিজেকে ঈশ্বর বলে চালায়। এই অবস্থায় সবপ্রভু শচীনন্দন শ্রীগৌরচন্দ্রের শক্তি নয়ন ভরে দেখা উচিত।

প্রভুর লীলাশক্তির প্রভাবে সঙ্কীর্তন কোটি গুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। অজস্র অসংখ্য মশাল জ্বলতে লাগল। ঘরে ঘরে কলাগাছ পুঁতল কে? গান-বাজনা পুষ্পবৃষ্টিই বা করছে কে? শ্রীধরের বাড়িতে জল পান করে কি অদ্ভুত প্রেমবন্যার আবির্ভাব হল বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ভক্তবাৎসল্য দেখে ত্রিভুবনের সকলেরই চোখে জল, কেউ কেউ চুল ছেড়ে দিয়ে মাটিতে লোটালুটি করছেন। দাঁতে তৃণ ধরে শ্রীধর সজল নয়নে চীৎকার করে হরিনাম নিয়ে বলছেন,—প্রভু, তুমি কী জল পান করলে? শ্রীধর এখন কেবলই নাচছেন আর কেঁদে কেঁদে হায় হায় করছেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠনাথ ঐ জল পান করেই শ্রীধরের উঠোনে নৃত্য করে চলেছেন। ভক্তরা চারদিকে গান করছেন, নিত্যানন্দ আর গদাধর প্রভুর দুপাশে রয়েছেন। খোলাবেচা শ্রীধরের ভাগ্য দেখে সীমা না পেয়ে এবং এই মহিমা দেখে ব্রহ্মা-শিব পর্যন্ত কাঁদছেন। ধনবল, জনবল ও পাণ্ডিত্যবলে কদাপি শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু কেবল মাত্র ভক্তির বশ।

জলপানে শ্রীধবকে অনুগ্রহ কবে শ্রীগৌবহবি আবাব নগবে এলেন। চাবদিকে প্রচুব হবিধ্বনি শুনে ভক্তিবসেব ঠাকুব গৌবচন্দ্র নৃত্য কবছেন। শোভায নবদ্বীপধাম সর্বলোকে জযলাভ কবেছে, সকলেব মুখেই এখন হবিনাম। শুকদেব, নাবদ, মহাদেব সর্বদা যে পবমানন্দে মগ্ন হযে থাকেন আজ নবদ্বীপবাসী সকলেই সেই আনন্দে নিমগ্ন। প্রভু সাবা নদীযায নেচে নেচে গাদিগাছা, পাবাডাঙ্গা—এই সব জাযগা দিযে চলেছেন। শুধু মাত্র এক বাতই নয, এভাবে যে কত দিন কাটল তাব ঠিক নেই। শ্রীচৈতন্যেব পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয, তাঁব চোখেব ইশাবায ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয ঘটে। সূক্ষ্মতর্কবাদী পাপীবা এসব জানতে পাবে না, মহাভাগ্যবান লোকই কেবল এ তত্ত্ব জানতে পাবেন। বৈকুণ্ঠপতি যেখানে নাচেন সেস্থানেব অধিবাসীদেব আনন্দেব আব সীমা থাকে না। প্রভুব হুঙ্কাব, গর্জন, প্রেমাশ্রু দেখে নাবীপুরুষ সকলেই কাঁদতে থাকে। কেউ বলেন,—যাব গর্ভে এই মহাপুরুষ জন্ম নিযেছেন সেই শচীদেবীকে প্রণাম জানাই। কেউ বলেন,— জগন্নাথ মিশ্রেব মত পুণ্যবান লোক আব কেউ নেই। কেউ বলেন, —আসলে নবদ্বীপেবই মহাভাগ্য। এইভাবে সকলেই হবি বলে জযধ্বনি কবছেন। প্রভুকে দেখে আবালবৃদ্ধ বণিতা দণ্ডবৎ প্রণাম কবছেন। সকলেব প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত কবে প্রভু স্বীয তত্ত্ব আনন্দে কীর্তন কবে যাচ্ছেন। এই সকল লীলাব কখনো আদি অন্ত নেই, শাস্ত্রে একে আবির্ভাব তিবোভাব বলে উল্লেখ কবেছেন। ভক্তগণ যেখানে যেভাবে ধ্যান কবেন প্রভু সেখানে সেরূপে বিদ্যমান থাকেন। ভাগবত বলছেন,—বেদ যাব বহু রূপেব কীর্তন কবেন, হে তাদৃশ ভগবান, ভক্তগণ নিজেদেব মনে তোমাব যে যে রূপেব ধ্যান কবেন, তুমি ভক্তবৃন্দেব প্রতি অনুগ্রহ কবে সেই স্বরূপেই প্রকাশিত হও।

আজও চৈতন্যদেব এসব লীলা কবেন, যাব ভাগ্যে থাকে তিনি দেখেন। চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড অমৃত তুল্য কথায ভবা, এই কথা শুনলে মনেব সমস্ত কালিমা ধুযে মুছে যায। ভক্তেব জন্যই প্রভু সমস্ত অবতাব গ্রহণ কবেন, ভক্ত ছাড়া অন্য লোকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জানতে পাবে না। কোটি জন্ম যোগ তপস্যা কবে মবলেও ভক্তি লাভ কবা যায না, তাই সমস্ত শাস্ত্র বলেছেন, ভক্তেব সেবা কব। আমি-দেব নিত্যানন্দেব জয গান কবি, কাবণ তাব কৃপা হলেই চৈতন্যকীর্তন কবা সম্ভব, নতুবা নয। কেউ বলেন -নিত্যানন্দ বলবাম তুল্য। কেউ বলেন, – তিনি শ্রীচৈতন্যেব প্রিযতম। কেউ বলেন, নিত্যানন্দ মহা তেজীযান এবং উচ্চ অধিকাবি। আবাব কেউ কেউ বলেন,—তাব তত্ত্ব কিছুই বুঝতে পাবি না। নিত্যানন্দ সম্পর্কে কেউ বলেন তিনি জ্ঞানী, কেউ বলেন তিনি ভক্ত, যাঁব যেমন ইচ্ছা তেমনই বলে থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যেব যেই হোন, তাঁব শ্রীচবণ হৃদযে ধাবণ কবতে চাই। এতভাবে বুঝিযে বলবাব পবেও যদি কেউ তাঁব নিন্দা কবে তবে সেই পাপী অবশ্যই মস্তকে পদাঘাত পাবাব যোগ্য। শ্রীচৈতন্যেব ভক্তগণেব চবণে আমাব নমস্কাব, অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ আমাব প্রভুরূপে আমাকে কৃপা করুন। শ্রীচৈতন্যেব কৃপাতেই শ্রীনিত্যানন্দকে চিনতে পাবি, আবাব নিত্যানন্দ জানালে তবেই গৌবচন্দ্রকে জানতে পাবি। গৌব নিতাই হচ্ছেন বাম লক্ষ্মণ তুল্য, শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণেব মত। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দরূপেই শ্রীচৈতন্যেব ভক্তি সর্বতোভাবে উদ্রেক কবাতে শক্তি ধাবণ কবেন। শ্রীচৈতন্যেব শ্রেষ্ঠ-প্রিয ভক্তগণই কেবল শ্রীনিত্যানন্দেব তত্ত্ব অবগত আছেন। তবে যে কলহ লাগে তা কেবল মাত্র লীলাপুষ্টিব কাবণে, আব কিছু নয। শ্রীকৃষ্ণেব লীলাদি সাধাবণ লোকে বুঝতে পাবে না। এতে যে এক বৈষ্ণবেব পক্ষ নিযে অন্য

বৈষ্ণবকে নিন্দা করে সে পাপে ডুবে মরে। যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন, কখনো কারো নিন্দা করেন না, তাঁকেই বৈষ্ণব বলা হয়। অদ্বৈত-প্রভুর চরণে আমার এই নিবেদন যেন তাঁর প্রিয়পাত্রের প্রতি আমার ভক্তি অক্ষুণ্ন থাকে। মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের পারিষদবর্গ সহ সকলের কথা শুনে ভক্তি লাভ করা যায়। অদ্বৈতাচার্যকে মান্য করে যে গদাধর পণ্ডিতকে নিন্দা করে সে কখনো সত্যিকারের অদ্বৈতভক্ত নয়। শ্রীচৈতন্যের অমৃতমধুর কথা সকলের মনে বৃদ্ধি পেলেই শুভ লক্ষণ। চৈতন্যলীলা-কথা শুনে যিনি আনন্দ লাভ করেন তিনি অবশ্যই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দর্শন পাবেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর চৈতন্য-নিত্যানন্দকে তাঁর প্রাণের প্রাণ মনে করে তাঁদের পদপ্রান্তে এই লীলাকীর্তন করছেন।

২/২৪ মহাধীর, শিষ্টগণের পালক, দুষ্টদের সংহারক, গৌর-সিংহের জয়। জগন্নাথ-তনয়, শচীনন্দন, জগদানন্দের-জীবন, হরিদাস ও কাশীশ্বরের প্রাণধন, কৃপাসিন্ধু, দীনবন্ধু, সকলের পালনকর্তা গৌরহরির জয়। তোমার শরণ নিলে তুমি তাকে সর্বভাবে রক্ষা কর।

সারা নদীয়ার লোক জেনে গেলেন যে প্রভু কীর্তন নিয়েই আছেন। শেষ অবধি এমন হল যে, প্রভু হরিনাম শোনা মাত্র শহরে, গ্রামে, উদ্যানে, পুকুরে যে-কোন স্থানে মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং শ্রীনয়নে অশ্রুধারা বইতে থাকে। তাঁর পরিকরগণ সর্বদা তাঁকে রক্ষা করে আছেন, এবং ভক্তসঙ্গ পরিবৃত হয়ে আছেন। কেউ কোনপ্রকারে একবার হরিনাম উচ্চারণ করলেই প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান। অমনি তাঁর মহাকম্প, অশ্রু, সর্বাঙ্গে পুলকচিহ্ন দেখা দেয় এবং তিনি গড়াগড়ি করতে থাকেন। যে আবেশে দেখতে পেলে ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্যন্ত বহু ভাগ্য বোধ করেন, নদীয়ার লোকেরা তা অনায়াসে দেখতে পাচ্ছেন। পরে প্রভুর অত্যন্ত বেশি মূর্ছা ভাব দেখে ভক্তগণ তাঁকে প্রাঙ্গণ থেকে তুলে নিয়ে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেন। তারপর দরজা বন্ধ করে প্রভু যখন আবার কীর্তন শুরু করেন, তখন সেই আনন্দে অনন্ত ভুবন পূর্ণ হয়ে যায়। প্রভুর ঐ সময়ের ভাব বর্ণনা করা অসম্ভব। তিনি যে তখন কি রসে বিহ্বল থাকেন তা বুঝতে পারা যায় না। প্রভু তখন কখনো বলে ওঠেন,- আমিই সেই মদনগোপাল। আবার বলেন,—আমি চিরকালের কৃষ্ণদাস। কোন কোন দিন কেবল মাত্র গোপী-নাম জপ করেন, কৃষ্ণের নাম শুনলেও খুব রেগে ওঠেন। বলেন,—কৃষ্ণ আবার কে, কোথাকার লোক? সে তো মহাদস্যু, শঠ, অভদ্র, কপট। তাঁকে কে ভজনা করতে যাবে? স্ত্রীজাতির বশীভূত হয়েই আবার স্ত্রীজাতিরই নাক-কান কাটে। ব্যাধের মত বালির প্রাণ সংহার করল। সেই চোরের খবর দিয়ে আমার কি দরকার? — যে কৃষ্ণনাম করে প্রভু তাকেই তেড়ে যান। কেবল মাঝে মাঝে তিনি 'গোকুল গোকুল' বলে ওঠেন। আবার কোন দিন 'বৃন্দাবন' বা 'মথুরার' নাম করেন। মাটিতে শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ মূর্তি এঁকে ঐ দিকে তাকিয়ে কাঁদতে থাকেন। প্রভু কখনো বলেন,—বন্ধুগণ, চারদিকেই কেবল বন দেখছি, পালে পালে সিংহ ভাল্লুক বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রেমভক্তিরসে ডুবে প্রভুর এখন এমনই অবস্থা যে তিনি দিনকে রাত এবং রাতকে দিন বলছেন। প্রভুর আবেশ দেখে ভক্তবৃন্দ পরস্পর গলা ধরে কাঁদেন। যে আবেশ দেখতে ব্রহ্মার পর্যন্ত ইচ্ছা হয় তাই এখন সকল বৈষ্ণবের সেবকেরা দেখছেন। প্রভু এখন নিজের বাড়ি ছেড়ে বৈষ্ণবদের বাড়িতে থাকতে লেগেছেন।

কেবলমাত্র জননীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য প্রভু কখনো কখনো সাংসারিক কর্তব্য করেন। ভক্তগণ এখন মহানন্দে আছেন, প্রভুর অনুপস্থিতিতেও তাঁরা নিজেরা কীর্তন করতে থাকেন। প্রভু নদীয়ায় ঘরে ঘরে অনন্তলীলায় মত্ত, নিত্যানন্দও প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছেন। অদ্বৈতাচার্যের উপরে সকল বৈষ্ণবগণের দেখাশোনার ভার এবং গদাধর পণ্ডিত সর্বদা আছেন প্রভুর সঙ্গে ছায়ার মত।

একদিন অদ্বৈতাচার্য গোপীভাবে নৃত্য করছিলেন এবং ভক্তবৃন্দ মহা অনুরাগে কীর্তন করছেন। অদ্বৈত আর্তি করে নাচছেন আর বারে বারে দাঁতে তৃণ চেপে আছাড় খেয়ে পড়ছেন। অদ্বৈতাচার্য প্রেমে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, ভক্তগণ তাঁকে ঘিরে সমানে কীর্তন করছেন। দুপুর হয়ে গেছে, তবু কীর্তন থামছে না, ভক্তবৃন্দ খুবই শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। সকলে মিলে অদ্বৈতকে স্থির করে চারদিকে ঘিরে বসলেন। আচার্য শান্ত হলে শ্রীবাস বাদে সকলে স্নান করতে গেলেন। আচার্য কেবলই কাতর হয়ে পড়ছেন, শ্রীবাস উঠোনে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। বিশ্বম্ভর বিশেষ কাজে তখন নিজের বাড়িতেই ছিলেন। তিনি অদ্বৈতকে নিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। প্রভু তখন অদ্বৈতকে বললেন,—তোমার ইচ্ছা কি ? তুমি কি চাও ? অদ্বৈত উত্তর দিলেন,—তুমি সকল বৈদিক শাস্ত্রের সারতত্ত্ব। আমি তোমাকে পেতে চাই। প্রভু হেসে জবাব করলেন,—আমি তো তোমার সামনেই রয়েছি। এর বেশি তুমি আর কি চাইছ ? অদ্বৈতাচার্য বললেন,— তুমি ঠিকই বলেছ, সর্ববেদান্তের মূল তত্ত্ব তুমি আমার সামনেই রয়েছ তবু তোমার কাছে ঐশ্বর্য দেখতে চাই। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—কি দেখতে চাও, বল। অদ্বৈত নিবেদন করলেন,—তুমি অর্জুনকে যা দেখিয়েছ, আমার তাই দেখার বড় সাধ। অদ্বৈতাচার্য কথাটি শেষ করতে না করতে দেখলেন সামনে একটি রথ উপস্থিত এবং চারদিকে বহু সৈন্য আর বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র। রথের উপরে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্যামসুন্দর। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র, সূর্য, গিরি, নদী, উপবন ইত্যাদি। আর দেখলেন তাঁর কোটি কোটি চোখ, মুখ, বাহু,—সামনে অর্জুন স্তুতি পাঠ করছেন। প্রভুর সমস্ত মুখে মহা আগুন জ্বলছে আর সেই অগ্নিতে পতঙ্গের মত পাষণ্ডগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে মরছে। যে সকল পাপিষ্ঠগণ পরনিন্দা পরদ্রোহে মত্ত ছিল তারা সকলে শ্রীচৈতন্যের মুখের অগ্নিকুণ্ডে পড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এই অপরূপ দৃশ্য আর কারো ভাগ্যে দেখা সম্ভব হয় নি। প্রভুর কৃপাতে একমাত্র অদ্বৈতাচার্যই এই বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারলেন। দেখে তিনি প্রেমানুরাগে কাঁদছেন এবং দাঁতে তৃণ নিয়ে বারবার তাঁর দাস্য কামনা করছেন। পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ মহানন্দে সারা নদীয়া ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, কিন্তু যখনই জানতে পারলেন যে মহাপ্রভু বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন এবং তিনি ঠাকুর ঘরে দরজা দিয়ে মহা গর্জন করছেন, তখনই তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। মহাপ্রভু যখনই জানলেন যে নিত্যানন্দ এসেছেন অমনি তিনি মন্দিরের দরজা খুলে তাঁকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর শ্রীনিত্যানন্দও বিশ্বরূপ দেখলেন এবং দেখে চোখ বুজে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। তখন মহাপ্রভু বললেন,—নিত্যানন্দ, তুমি আমার প্রাণস্বরূপ। তুমি ওঠ। তুমি তো আমার সব বিষয়ই জান। যে ব্যক্তি তোমাকে খুশি করতে পারবে সেই আমাকে পাবে। তোমার চেয়ে প্রিয়তম আমার আর কেউ নেই। তোমার এবং অদ্বৈতের মধ্যে যে ভেদবুদ্ধি করে সে কখনও অবতার সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করতে পারবে না। নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতকে একসঙ্গে দেখে মহাপ্রভু আনন্দে কেঁপে বিষ্ণুমন্দিরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। শচীনন্দন হুঙ্কার

করে বারে বারে বলছেন,—দেখ দেখ। শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য বিশ্বরূপ দেখে আনন্দে প্রভুকে স্তুতি করছেন। এ সমস্ত লীলা ঘটেছে শ্রীবাস আঙ্গিনায়, তথাপি সকলে তা দেখতে পায় নি। অদ্বৈতাচার্যের নিজমুখের এই কথা যে মান্য করে না, কোন বৈষ্ণব কদাপি তার মুখদর্শন করবে না। সে চিরকালের পাপী। গৌরাঙ্গসুন্দর আমার প্রভুর প্রভু, আমার মনে সর্বদা এই ভরসা রাখি। নবদ্বীপ ধামে মহাপ্রভুর বহু ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু অভক্তরা কেউ কিছুই দেখতে পায নি। কৃষ্ণনামের স্মরণে ক্রন্দনই ভক্তি লাভ করার একমাত্র উপায়। এই ভক্তিযোগই একমাত্র পরম ধন। কৃষ্ণ বলে কাঁদলেই প্রভুরূপে কৃষ্ণকে পাওয়া যায। কুলমর্যাদায়, ধনবলে কিছুই হয না। কৃষ্ণকে ভজনা করলেই হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড কথা অমৃত-তুল্য। এই কথা শুনলে মনের কালিমা সব ঘুচে যায। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের বিশ্বরূপ-দর্শন কথা শুনলে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায।

কিছু সময়ের মধ্যে পূর্বভাবাদি সম্বরণ করে মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে চললেন। এদিকে নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতের বিশ্বরূপ দেখে আনন্দে আত্মহারা অবস্থা। তাঁরা দুজনে মিলে শ্রীবাস অঙ্গনের সর্বত্র ধূলায গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। সেখানে কেউ নাচে, কেউ করতালি দিয়ে গান করে, আর এই দুজন হেলে দুলে নাচছেন। দুজন বেশ আনন্দেই ছিলেন, হঠাৎ তাঁরা পরস্পরকে গালাগালি করতে লাগলেন। অদ্বৈতাচার্য বললেন,—মাতাল অবধূতকে এখানে কে ডেকে আনল ? তুই দরজা ভেঙ্গে ঢুকলি কেন ? তোকে সন্ন্যাসী বলে কে স্বীকার করে ? তুই তো নানা জাতের ঘরেই খেয়েছিস্, তোর কোনো জাত আছে ? বৈষ্ণব সমাজ থেকে শীঘ্র পালা, বদ্ধ মাতাল। না হলে ভাল হবে না। নিত্যানন্দ বলছেন,—আরে নাঢা, চপ করে বসে থাক্ গিয়ে। তা নইলে তোকে কিলিয়ে শুইয়ে দেব। বুড়া বামনা, তোমার ভয় নেই ? আমি মত্ত-অবধূত, আমি প্রভুর ভাই। তুমি স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করছ। আমিই ভাগবত পরমহংসের অধিকারী। আমি যদি তোমাকে মারিও তবু তুমি কিছু বলতে পার না, তুমি আমার সঙ্গে বৃথা অহংকার করছ। অদ্বৈত এসব কথা শুনে আগুন হয়ে গেলেন এবং দিগম্বর হয়ে নিত্যানন্দকে গালাগালি করতে লাগলেন,—মাছ খায, মাংস খায়, এ কেমন সন্ন্যাসী ? আমিও এই কাপড় ছেড়ে দিগম্বর হলাম। কে বা এর মা বাবা, কোথায বা থাকে, একে কেই বা চেনে ? এসে বলুক দেখি কেউ চেনে কিনা। চোরের মত এসে এখানে নানা কাজে হাত লাগিয়েছে। আমি একে শেষ করে দেব। যে কিছু চায না তাকেই সন্ন্যাসী বলব। সন্ন্যাসী বলে পরিচয় দিচ্ছে, আবার দিনে তিনবার খাওযাও চাই। কোথাকার অবধূতকে এনে ঠাঁই দিয়েছে, শ্রীবাসেরও জাত গেছে। এই অবধূত সবারই জাত নষ্ট করবে। কোথা থেকে যে এই মদখোর মাতালটা এসে জুটেছে কে জানে ?

কৃষ্ণপ্রেমসুধা-রসে মত্ত দুজন এভাবে নিজেদের মধ্যে প্রায়ই আপোষে ঝগড়া করে থাকেন। এতে যদি কেউ এক জনের পক্ষ হয়ে আরেক জনের নিন্দা করে তাহলে সে অবশ্যই নিপাত যাবে। এই প্রেমকলহের মর্ম না বুঝে একজনকে নিন্দা করে আরেক জনকে প্রশংসা করলে সে অবশ্যই জ্বলেপুড়ে মরবে। অদ্বৈতকে মান্য করে যে গদাধরকে নিন্দা করে সে কখনও অদ্বৈতাচার্যের ভক্ত হতে পারে না। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে যে ঝগড়া তা হচ্ছে প্রেম-কলহ। তাঁরা দুজনেই ঈশ্বরতত্ত্ব। এই ভাগবতজনের এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা সাধারণ লোক বুঝতে পারে না। সকল বৈষ্ণবের মধ্যে অভেদ

জেনে যে শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজনা করে সেই উদ্ধার পেয়ে যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের জয় হোক। বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব উভয়ে অভেদ জ্ঞান করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

২/২৫ ধর্ম, বেদ, বিপ্র এবং সন্ন্যাসী—এই শ্রেষ্ঠ গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আর সমস্ত লোকের প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের জয় হোক। শচীমাতার গর্ভের রত্ন, পরম করুণাময়, নিত্যানন্দের প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দ সহ জয় হোক। শ্রীচৈতন্যের চরিতকথা শুনলে ভক্তি লাভ করা যায়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। প্রভু নবদ্বীপে সর্বদা হরিসঙ্কীর্তন করে স্বীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছেন। নিজের নামের আবেশে তিনি নাচতেন এবং হুঙ্কার করে অট্টহাসি করতেন। প্রভু প্রেমাবেশে ধুলোয় গড়াগড়ি করতেন। স্বয়ং ব্রহ্মা যে অঙ্গের বন্দনা করেন তা এখন ধূলায় ভরে গেছে। প্রভুর আনন্দ-আবেশের কোন শেষ নেই, ভাগ্যবান লোকেরা চোখ ভরে দেখছেন। আবেশ কেটে গেলে তিনি ভক্তবৃন্দকে নিয়ে বসেন এবং কোন কোন দিন গঙ্গায় গিয়ে বিহার করেন। আবার কোন কোন দিন মহাপ্রভু নৃত্য করে উঠোনেই বসেন, তখন ভক্তগণ জল এনে বাড়িতেই তাঁকে চান করান। মহাপ্রভুর আনন্দ-নৃত্য-কীর্তন যখন চলতে থাকেই তারই মধ্যে কাজের-মেয়ে 'দুঃখী' জল এনে জমা করে। দুঃখীকে ভাগ্যবতী বলতে হয। সে সজল-নয়নে কিছুক্ষণ নাচ-গান দেখে। তারপরই জল আনতে শুরু করে দেয। দুঃখী সার দিয়ে গঙ্গাজলে কলসী ভর্তি করে রাখে। প্রভু দেখে খুশি হন। প্রভু শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করেন,—রোজ এত গঙ্গাজল কে আনে? শ্রীবাস উত্তরে জানান,—দুঃখী নামের ঐ কাজের মেয়েটাই সব জল বয়ে আনে। তখন প্রভু উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে বললেন,—একে তোমরা সকলে 'সুখী' বলে ডাকবে, এর নাম কখনও 'দুঃখী' হতে পারে না। আমার মনে হয় এ চিরকালই 'সুখী'। প্রভুর মুখে এমন করুণার কথা শুনে ভক্তগণ প্রেমানন্দে কাঁদতে লাগলেন। সেই থেকে সেই কাজের মেয়েটিকে সকলে 'সুখী' নামেই ডাকত। শ্রীবাসও তাকে আর ঝি-চাকর মনে করতেন না। প্রীতি দিয়ে সেবা করলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। কেবল মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাসী হলেই যমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। বংশ, রূপ, ধন বা বিদ্যায় কিছু হয় না, প্রেমের সঙ্গে ভজনা করলেই শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হন। বৈদিক শাস্ত্রাদিতে, ভাগবতে যা উল্লিখিত আছে, গৌরাঙ্গসুন্দর তা সবই চোখের সামনে জাজ্জ্বল্যমান দেখিয়ে দিচ্ছেন। সাধারণ দাসী-বাঁদী-ঝি হয়েও দুঃখী যে আশীর্বাদ লাভ করেছে অহংকারী লোকেরা কদাচ তা পাবার যোগ্য নয়। শ্রীবাস পণ্ডিতের সৌভাগ্যের কথা আর বলবার কি আছে? তাঁর দাস-দাসীরা পর্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের যে আশীর্বাদ লাভ করেছেন তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

একদিন প্রভু শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নৃত্য করছিলেন, শ্রীবাস এবং তাঁর বাড়ির অন্যান্যরাও কেউ কেউ প্রভুর সঙ্গে নাচছিলেন। অসুখে ভুগে দৈবাৎ শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু হয়, বাড়ির ভেতরে মেয়েরা তাকে ঘিরে রয়েছে। আঙ্গিনায় শ্রীশচীনন্দন আনন্দে — করছিলেন, হঠাৎ শ্রীবাসের বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসা কান্নার শব্দ শোনা গেল। কান্নার শব্দ শুনে শ্রীবাস বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখলেন তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে

পরম গভীর ভক্ত, মহা তত্ত্বজ্ঞানী শ্রীবাস নারীগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন,—তোমরা

তো কৃষ্ণেব মহিমা সবই জান, কান্না থামাও, চিত্ত স্থিব কব। অন্তকালে মাত্র একবাব যাঁব নাম শুনলে মহা পাপীও কৃষ্ণধামে যায, সেই প্রভু স্বযং এখানে নৃত্য কবছেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্যন্ত তাঁব গুণকীর্তন কবেন। এমন সময়ে যাব মৃত্যু হযেছে তাব জন্যে কি শোক কবা উচিত ? এই শিশুব মত ভাগ্য পেলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে কবি। সংসাবী জীবেব পক্ষে এ শোক সম্ববণ কবা বড়ই কঠিন, কিন্তু একটু পবে কাঁদবে, আব কেউ যেন এই খবব না জানতে পাবে তাহলে প্রভুব নৃত্যেব আনন্দ নষ্ট হযে যাবে, প্রভু দুঃখ পাবেন। তোমাদেব কান্নাকাটি শুনে যদি প্রভুব আবেশ নষ্ট হযে যায তাহলে আমি গঙ্গায ঝাঁপ দিযে মবব।

শ্রীবাসেব কথায সকলেই চুপ কবে গেলেন এবং সকলে মিলে প্রভুব সংকীর্তনেব কাছে চলে গেলেন। শ্রীবাস অত্যন্ত আনন্দ কবে কীর্তন কবছেন। এবং ক্রমেই তাব উল্লাস বেড়ে উঠছে। শ্রীবাস পণ্ডিত চৈতন্যেব পার্ষদ বলেই তাব এমন মহিমা. গৌবচন্দ্র স্বাবভাবে নেচে যাচ্ছিলেন। কিছু সময় পবে তিনি ভক্তগণসহ থেমে গেলেন। মুখে মুখে ভক্তগণ শুনতে পেলেন যে পণ্ডিতেব পুত্র মবা গেছে। তবু কেউ কিছু বলছেন না, মনে মনে সকলেই খুব দুঃখ পেযেছেন। সর্বজ্ঞেব চূড়ামণি এবং সকলেব অন্তর্যামী প্রভু শ্রীগৌবসুন্দব ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা কবলেন,— আজ আমাব মনে এমন হচ্ছে কেন ? পণ্ডিতেব বাড়িতে কি কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে ? প্রভুব কথা শুনে শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন, প্রভু, আমাব বাড়িতে যখন তুমি বযেছ, আমাব আবাব কি দুর্ঘটনা হবে ? শ্রীবাসেব কথাব পবে উপস্থিত মহান্তগণ তাব পুত্রেব মৃত্যুব কথা বললেন। প্রভু ব্যাকুল হযে জিজ্ঞাসা কবলেন, কখন এ ঘটনা ঘটেছে ? মহান্তগণ বললেন, সন্ধ্যা বাত্রেই হযেছে কিন্তু তোমাব আনন্দে ভঙ্গ পড়বে বলে শ্রীবাস কাউকে তা বলেন নি। এখন তো আব বাত বেশি নেই, এবাবে তুমি আদেশ কব, সৎকাবেব উদ্যোগ কবা হোক। শ্রীবাসেব বাড়িব এই অস্বাভাবিক খবব শুনে প্রভু বাব বাব 'গোবিন্দ' স্মবণ কবলেন। —আমি এমন সঙ্গ ছাড়ব কি কবে ? — বলেই প্রভু কাঁদতে লাগলেন। যে আমাব প্রেমে পুত্রশোক পর্যন্ত ভুলতে পাবে, তাকে আমি কি কবে ছেড়ে যাব ? —এই সব বলে প্রভু অত্যন্ত কাঁদছেন। ছেড়ে যাবাব কথা শুনে সকলেই ভাবছেন,— আবাব কি বিপদ এসে উপস্থিত হয কে জানে ? সকল ভক্তই মহা দুশ্চিন্তায পড়ে গেলেন। প্রভু সংসাব ছেড়ে সন্ন্যাসী হবেন, সেকথা ভেবেই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাঁদছেন। প্রভু একটু সুস্থিব হলে শিশুকে নিযে সৎকাব কবতে যাওযাব ব্যবস্থা হতে থাকে।

মৃত শিশুকে প্রভু জিজ্ঞাসা কবলেন,—শ্রীবাসেব ঘব ছেড়ে যাচ্ছ কেন ? মৃত শিশু উত্তব কবল,—প্রভু, তুমি যেমন নির্বন্ধ কবেছ, তোমাব আদেশ অমান্য কবাব শক্তি আছে কাব ? —প্রভুব সঙ্গে মৃত পুত্র কথা বলছে, সব ভক্তেবা এই অদ্ভুত ব্যাপাব নিজেবাই শুনলেন। শিশু উত্তব দিল,—যত দিন নির্বন্ধ ছিল তত দিন এই দেহ ভোগ কবলাম, কর্মফল পূর্ণ হযে গেছে, এখন তাই পববর্তী কর্মফল ভোগ কববাব জন্য অন্য জাযগায চললাম। কেউ কাবো বাবাও নয, কেউ কাবো ছেলেও নয। সকলেই কেবল মাত্র নিজ নিজ কর্মফল ভোগ কবে। যত দিন পণ্ডিতেব ঘবে ভাগ্য নির্দিষ্ট ছিল ততদিন ছিলাম, এখন অন্য জাযগায যাচ্ছি। তোমাব এবং তোমাব পার্ষদগণেব চবণে নমস্কাব জানাচ্ছি, অপবাধ নিও না, এখন অন্যত্র চললাম, বিদায দাও। —এত কথা বলে তবে সেই শিশুদেহ থামল। এই সব লীলা কবে চলেছেন শ্রীগৌবাঙ্গচন্দ্র। মৃত পুত্রেব মুখে

অপূর্ব কথা শুনে সকল ভক্তরা আনন্দসাগরে ভাসছেন। শ্রীবাসের বাড়ির সকলের পুত্রশোক দূর হয়ে গেল, তাঁরা সবাই কৃষ্ণপ্রেমানন্দে অস্থির হয়ে উঠলেন। শ্রীবাস সপরিবারে প্রভুর চরণ ধরে বলতে লাগলেন,—প্রভু, তুমি জন্মে জন্মে আমাদের পিতা মাতা পুত্র সবই, তোমার শ্রীচরণে যেন ভক্তি থাকে। চার ভাই প্রভুর চরণে পড়ে এই প্রার্থনা জানাচ্ছেন, ভক্তগণ তাঁদের ঘিরে প্রেমানন্দে কাঁদছেন। শ্রীবাস অঙ্গন কৃষ্ণপ্রেমের আলোড়নে ভরে গেল। প্রভু শ্রীবাসকে বললেন, —তুমি তো সংসারের নিয়ম সবই জান। সংসারের এসব জ্বালা যন্ত্রণা তোমার কিছুই করতে পারবে না। তোমাকে যে দেখবে তারও এসব দুঃখ থাকবে না। আমি এবং নিত্যানন্দ দুজনেই তোমার ছেলে, তোমার মনে আর কোন শোক স্থান দিও না। প্রভুর শ্রীমুখের এই কথা শুনে ভক্তগণ জয়ধ্বনি করে উঠলেন। শিশুর মৃতদেহ নিয়ে লোকজন সহ প্রভু গঙ্গাতীরের দিকে কীর্তন করে চললেন। যথাবিধি কর্ম সম্পাদন করে, গঙ্গায় স্নান করে, কৃষ্ণ নাম স্মরণ করে সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেলেন। প্রভুর করুণার কথা মনে করে শ্রীবাসের পরিবারের সকলেই প্রেমবিহ্বল হয়ে পড়লেন। এসব নিগূঢ় কথা শুনলে অবশ্যই সে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারে। গৌর-নিতাই, শ্রীবাসের পুত্র, শ্রীবাসকে প্রণাম জানাই। নবদ্বীপে এই সব ঘটনা ঘটছে কিন্তু অভক্তরা এর কোনই খবর রাখে না। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডে মৃতদেহে তত্ত্বজ্ঞান দানের এই অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

এইভাবে শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে সঙ্কীর্তন সুখে বিহার করছেন। প্রভু এখন প্রেমরসে এমনই মগ্ন হয়ে পড়েছেন যে ঘরের বিষ্ণুপূজা পর্যন্ত ঠিকমত করতে পারেন না। গঙ্গাস্নান করে প্রভু বিষ্ণুপূজা করতে বসেন কিন্তু প্রেমাশ্রুতে তাঁর কাপড় চোপড় সব ভিজে যায়। বেরিয়ে এসে তিনি কাপড় পাল্টে আবার গিয়ে পূজো করতে বসেন। সে কাপড়খানাও ঠিক আগের মতই আবার প্রেমানন্দ জলে ভিজে যায় আবার বেরিয়ে এসে তিনি গা ধুয়ে নেন। এইভাবে বারে বারে কাপড় পাল্টে যাচ্ছেন কিন্তু বিষ্ণুপূজা কিছুতেই করতে পারছেন না। পরে প্রভু গদাধরকে বললেন, —তুমিই বিষ্ণুপূজা কর, আমার ভাগ্যে নেই। বৈকুণ্ঠনায়ক এভাবে দিবারাত্র ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে নবদ্বীপে বিহার করছেন।

একদিন প্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে এসে কৃপা পরবশ হয়ে তাকে বললেন,- তোমার বাড়িতে আমার অন্নগ্রহণ করার ইচ্ছা হয়েছে, আমি বলছি, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। মহাপ্রভু বার বার একথা বলছেন। শুনে শুক্লাম্বর দৈন্য প্রকাশ করে বললেন, —আমি ভিক্ষুকের অধম, গর্হিত পাপিষ্ঠ এবং পতিত আর তুমি স্বয়ং সনাতন ধর্ম। আমাকে আশীর্বাদ কর যেন চিরকাল তোমার শ্রীচরণের ছায়া পাই। আমি সামান্য কীটের সমানও নই, তুমি আমাকে এত বড় ছলনা প্রকাশ করছ কেন ? প্রভু বললেন, ছলনা মায়া বলছ তুমি ? অথচ আমার বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে তোমার হাতের রান্না খেতে। শীঘ্র বাড়িতে গিয়ে সেবার ব্যবস্থা কর, আমি মধ্যাহ্নে তোমার বাড়িতেই যাচ্ছি। —এত কথার পরেও শুক্লাম্বর মনে মনে ভয় পেয়ে ভক্তগণের কাছে পরামর্শ চাইলেন। সকলেই তাকে বুঝালেন,—তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ? পারমার্থিক তত্ত্বের বিচারে ভগবানের কাছে কেউ পর নয়। বিশেষ করে আরো, যে লোক তাঁকে সর্বভাবে ভজনা করেন, ভগবান বরাবরই তাঁর নিবেদিত অন্ন খোঁজ করেন। শূদ্রার পুত্র বিদুরের কাছে প্রভু চেয়ে খেয়েছেন, এই তাঁর করুণাময় স্বভাব। প্রভু বরাবরই ভক্তের কাছে চেয়ে খান, তুমি ভক্তি করে গিয়ে দাও। তবু যদি তুমি মনে ভয় পাও তাহলে প্রভুর

সেবার জন্য আলাদা ভাবে বিশেষ পরিচ্ছন্ন হয়ে রান্না কর। তোমার বড় ভাগ্য যে প্রভু তোমাকে এমন কৃপা করেছেন। সকলের কাছেই এই সব শুনে শুক্লাম্বর বাড়িতে চলে এলেন। তিনি স্নান করে অত্যন্ত শুদ্ধভাবে রান্না চাপালেন।

ভাত এবং থোড়ের তরকারি রান্না করে ব্রাহ্মণ হাত জোড় করে বললেন,—কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালীর জয় হোক্। তক্ষুনি মা-লক্ষ্মী ভক্তের অন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন আর অমনি সেই ভাত অমৃতে পরিণত হল। এদিকে তখনই প্রভুও চান করে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ এবং আরো কয়েকজন পার্যদ এসেছেন। প্রভু এখানে এসেই ভিজে কাপড় ছাড়লেন। প্রভু ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য নিজেই ভাত বেড়ে নিলেন। শুক্লাম্বরের বাড়ি, প্রভু তাই বড় সুখে বিষ্ণুকে নিবেদন করলেন। প্রভু তারপর আনন্দভোজনে বসলেন, ভক্তগণ নয়নভরে তা দেখছেন। ব্রহ্মাদির নিবেদিত যজ্ঞদ্রব্য যে প্রভু ভোজন করেন তাও কেবল ধ্যানে, তাঁদের পক্ষেও এমন সাক্ষাতে ভোজন দর্শন দুর্লভ। সেই প্রভুই আবার বললেন,—আমার জন্মে আমি এমন স্বাদ্ অন্ন ভোজন করি নি। থোড়ের তরকারি এমন চমৎকার আলগোছে কি করে রাঁধলে ? তোমাদের মত আমার পারিষদ্‌বর্গ আছে বলেই আমার এত মহিমা। ——শুক্লাম্বরের প্রতি প্রভুর এমন কৃপা দেখে ভক্তগণ সকলেই কাঁদতে লাগলেন। প্রভু বারংবার আস্বাদ করে ভোজন করলেন। ভিখিরি শুক্লাম্বর প্রভুর যে আশীর্বাদ লাভ করলেন তা কোটিপতিদেরও দেখবার মত। ধনবলে, জনবলে বা পাণ্ডিত্যবলে প্রভুকে লাভ করা যায় না, প্রভু একমাত্র ভক্তিবশ, বেদ এই কথাই ঘোষণা করেছেন। ভোজন শেষে প্রভু এখন বসে পান খাচ্ছেন। ভক্তগণ কলাপাতা তুলে আনন্দে মগ্ন হলেন, ব্রহ্মা শিব অনন্তদেব পর্যন্ত এই কদলি পত্র পেলে আনন্দে মাথায় রাখেন। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ঘরে আজ কি অপূর্ব আনন্দ হল, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই এই সব কৌতুক করছেন। কিছু সময় কৃষ্ণকথা আলাপ করে প্রভু সেখানেই শুয়ে বিশ্রাম করলেন। ভক্তেরাও সেখানেই শুয়ে পড়লেন।

তাদের মধ্যে একজন আবার একটু বিচিত্র রকমের। প্রভুর একজন ছাত্র-শিষ্য ছিলেন, তাঁর নাম বিজয় দাস। তিনি প্রভুর কিছু ঐশ্বর্য দর্শন করলেন। নবদ্বীপে তার মত আঁখরিয়া আর নেই, তিনি প্রভুকে অনেক গ্রন্থ লিখে দিয়েছেন। 'আঁখরিয়া বিজয়' বলেই তাঁকে সকলে ডাকে। অভক্তেরা তাঁর মর্ম কিছুই জানে না। প্রভু শুয়ে তাঁর গায়ে হাত দিয়েছিলেন, বিজয় তখন এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলেন। সোনার স্তম্ভের মত দীর্ঘ সুগঠিত প্রভুর হাত, তাতে নানাবিধ রত্নালঙ্কার। সব আঙ্গুলেই রত্নাঙ্গুরীয়, মনে হয় যেন কোটি কোটি চন্দ্রসূর্যের মত প্রভা বিস্তার করছে সেই মণিরত্ন। পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সবই জ্যোতির্ময়, প্রভুর এমন হাত দেখতে পেয়ে বিজয় পরমানন্দে আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। এই সব দেখে সেই বিজয় প্রভুকে ডাকতে যাবেন অমনি প্রভু বিজয়ের মুখে হাত দিয়ে তাঁকে বললেন,—আমি যত দিন এখানে থাকব তার মধ্যে কাউকে তুমি একথা বলবে না। —এই কথা বলে প্রভু বিজয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন কিন্তু বিজয় মহা হুঙ্কার করে উঠলেন। হুঙ্কার শুনে ভক্তগণ জেগে গেলেন। তাঁরা বিজয়কে ধরতে গেলেন, কিছুতেই সামলাতে পারছেন না। কিছু সময় উন্মাদের মত কাটালেন, তারপর বিজয় তন্ময় হয়ে অতি আনন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ বুঝতে পারলেন যে বিজয় নিশ্চয় কিছু ঐশ্বর্য দেখেছেন, তাঁরা তাই সকলে কাঁদতে লাগলেন। প্রভু সকলকে জিজ্ঞাসা করছেন,—বিজয় এমন চীৎকার করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল কেন ? গঙ্গার প্রভাবেই হয়তো

এমন হয়েছে। বিজয়ের আবার গঙ্গাদেবীর প্রতি বড় অনুরাগ। কিংবা শুক্লাম্বরের গৃহদেবতার প্রভাবও হতে পারে, কি হয়েছে—কৃষ্ণই জানেন। —এই বলে প্রভু বিজয়ের গায়ে হাত দিয়ে তাঁকে প্রকৃতিস্থ করলেন। বৈষ্ণবগণ তা দেখে হাসছেন। বিজয় উঠেও হতভম্বের মত রইলেন এবং সাত দিন ধরে সারা নদীয়াতে ঘুরে বেড়ালেন। খাওয়া-দাওয়া-ঘুম কিছুই নেই, কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেউ তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে না। এইভাবে কিছু কাল কেটে গেলে তবে বিজয় সুস্থ হল। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে এই সব লীলা ঘটেছে। গৌরচন্দ্র শুক্লাম্বরের গৃহে অন্নগ্রহণ করেছেন, তাই তাঁর ভাগ্যের কথা আর কি বলব? ভাগ্যবান শুক্লাম্বরের বাড়িতে প্রভু ভক্তবৃন্দকে নিয়ে গৌরসুন্দর বিহার করছেন। শুক্লাম্বরের গৃহে প্রভুর ভোজন এবং লিপিকার বিজয়ের প্রতি প্রভুর কৃপা—এসব কাহিনী শুনলে ভক্তি লাভ হয়।

এই ভাবে শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে সর্বদা বেদ-বন্দনীয় লীলা করে চলেছেন। রোজই প্রভু একেক বৈষ্ণবের ঘরে এই রকম লীলা করছেন। প্রভুর শরীর সর্বদা প্রেমরসে বিহ্বল থাকে, নানাভাব প্রকাশিত হয়। মৎস্য, কূর্ম, নরসিংহ, বরাহ, বামন, রাম, বুদ্ধ, কল্কি এবং শ্রীকৃষ্ণ—এই সব অবতারের ভাবে প্রভু ভক্তবৃন্দের প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করেন। এই সমস্ত ভাব হয়ে অল্প সময় পরেই তা আবার চলে যায় কিন্তু বলরামের ভাব এসে অনেকক্ষণ থাকে। প্রভু একদা বলরামের ভাবে মহামত্ত হয়ে 'মদ আন, মদ আ' ' ' , হুংকার করছেন। প্রভুর ইচ্ছা অনিচ্ছা বিষয়ে নিত্যানন্দ ভালই জানেন, তাই তিনি ঘট ভরে গঙ্গাজল এনে দিয়ে তাকে সাবধান করে দিলেন। বলরামের ভাবাবেশে প্রভুর হুঙ্কার গর্জন শুনে সারা নবদ্বীপ যেন কেঁপে উঠছে। তিনি এমন প্রচণ্ড তাণ্ডব আরম্ভ করলেন, মনে হয় যেন মাটিতে পড়লে পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। প্রভুর তাণ্ডব নৃত্যে পৃথিবী কেঁপে উঠেছে, ভক্তগণ তা দেখে ভয় পেয়ে গেছেন। তাঁরা বলরামের লীলাদি বর্ণনাত্মক গান গাইতে আরম্ভ করেছেন। প্রভু শুনে আনন্দে মাছত হচ্ছেন। প্রভু সারা উঠোনে ঘুরে ঘুরে উন্মাদের মত আবোলতাবোল ধাঁধা-হেয়ালি-ছড়া আবৃত্তি করছেন। বলরাম ভাবে প্রভুর যে সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে কারো যেন আশা মিটছে না। প্রভুর মুখখানি অপরূপ সৌন্দর্যে ভরে গেছে, তিনি বারে বারে নিত্যানন্দকে ডাকছেন। খুব মাঝে-সাঝে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হয় আর তিনি বলে উঠছেন,— আমার প্রাণ যায় রে। প্রভু পদ্যের আবেশেই বলে উঠলেন, —পিতা কৃষ্ণ প্রাণ রাখলেও, জ্যেষ্ঠ বলরাম মারবেন দেখছি। এই সব বলতে বলতে প্রভু এমনই মূর্ছাগ্রস্ত হচ্ছেন যে ভক্তগণ ভয়ে কেঁদে উঠছেন। জগন্নাথ-তনয় নানা রকম অদ্ভুত লীলাখেলা করছেন। প্রভু কখনো কখনো এমনই বিরহভাবে আবিষ্ট থাকেন যেন অবর্ণনীয় প্রেমসমুদ্রে ভেসে যাচ্ছেন মনে হয়। এমন ডাক ছেড়ে তিনি কাঁদতে থাকেন, শুনলে অনন্ত ভুবন বিদীর্ণ হয়ে যাবার কথা। এই অবস্থায় তিনি নিজেকেই নিজে ভুলে যান, নিজের ভাবেই নিজে বিহ্বল হয়ে পড়েন। দ্বাপর লীলায় গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে চাঁদ উঠলেই মৃত্যু ভয় পেতেন। সেই সব গোপীদের ভাব,—বিশেষ করে শ্রীরাধিকার ভাবে প্রভু সকলের গলা ধরে ধরে কেবলই কাঁদছেন। প্রভুর এমন অকথ্য ভাবাবেশ দেখে জগন্মাতা শচীদেবীও বাড়িতে থেকে কাঁদছেন। প্রভুর এই অপূর্ব প্রেমভক্তি কথা কোন মানুষের পক্ষে যথাযথ বর্ণনা করা অসম্ভব। যখনই প্রভুর মনে যে ভাবের উদয় হয় তখনই তিনি সেই ভাবেরই অপূর্ব আন্তরিক অভিনয় করতে থাকেন।

প্রভু একদিন গোপীভাবে সর্বদা 'বৃন্দাবন গোপী গোপী' বলছেন। অকস্মাৎ সেখানে গৌরচন্দ্রের একজন ছাত্র এসেছিল। সে এই কথার মর্ম না বুঝে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল,—নিমাই পণ্ডিত 'গোপী গোপী' বলছেন কেন? কৃষ্ণ নাম না করে এসব কি করছেন? 'গোপী' নাম নিয়ে কি পুণ্য হবে? শাস্ত্রে বলে 'কৃষ্ণ' নাম নিতে। প্রভুর এইভাব অজ্ঞলোকেরা কি বুঝবে? প্রভু বললেন,—কৃষ্ণ দস্যু, তাকে কে ভজতে যাবে? কৃতঘ্নের মত বিনা দোষে বালিকে মেরেছে। স্ত্রীর বশবর্তী হয়ে একজন নারীরই নাক-কান কেটে দিয়েছিল। সর্বস্ব নিয়ে বালিকে পাতালে পাঠিয়েছে। সেই লোকের নাম নিয়ে আমার কি হবে? —এই বলে মহাপ্রভু লাঠি হাতে নিয়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে ছাত্রকে তেড়ে মারতে গেল। হন্তদন্ত হয়ে ছাত্রটি দৌড় লাগাল। মহাপ্রভু পেছনে পেছনে ধেয়ে বলছেন,—ধর ধর। প্রভু রেগে গিয়ে লাঠি হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছেন দেখে ছাত্র ভয় পেয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। প্রভুর তখন দুর্জয়-মানবতী শ্রীরাধার ভাব। ছাত্র তা না জেনে ভয় পেয়ে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। ভক্তগণ দৌড়ে গিয়ে প্রভুকে ধরে নিয়ে এলেন। সকলে মিলে প্রভুকে শান্ত করলেন। ছাত্রটি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। ছাত্রেরা সকলেই পালিয়ে গেল, তাদের সারা গায়ে ঘাম, ঘন ঘন শ্বাস বইছে। লোকেরা ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করছে,—ভয়ের কারণ কি? তারা বললে,—কি জিজ্ঞাসা করছ? আজ বড় ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেলাম। সকলেই বলে, নিমাই পণ্ডিত বড় সাধু। আজ আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে। দেখলাম তিনি দিবারাত্র গোপী নাম জপ করছেন, আর কোন কথা বলছেন না। তখন আমরা বললাম,—পণ্ডিত, তুমি কি করছ? শাস্ত্রের বিধান মত কৃষ্ণনাম কর। এই কথা শোনামাত্র আমাকে তিনি লাঠি নিয়ে তেড়ে এলেন। কৃষ্ণকেও যা তা গালাগাল করতে লাগলেন। তা আমি সব মুখেও আনতে পারব না। পরমায়ু ছিল বলেই আজ নিতান্ত বেঁচে গিয়েছি। এই ঘটনা আজই হল। একথা শুনে মহামূর্খেরা হাসাহাসি করতে লাগল আর যার যা মনে আসে তাই বলতে লাগল। কেউ বলল,—একেই লোকে বৈষ্ণব বলে? অথচ সে ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তুলতে চায়? কেউ বলেন,—তাকে বৈষ্ণবই বা বলি কি করে? মুখে তো কৃষ্ণ নামও নিচ্ছে না। কেউ বলে,—এমন আশ্চর্য কথা তো কখনও শুনি নি যে বৈষ্ণব হয়ে গোপী নাম জপ করে। কেউ আবার বলছে,—তাকে এত সম্মান করারই বা কি আছে? আমাদের ব্রাহ্মণের তেজ নেই? সেও ব্রাহ্মণ, আমরাও ব্রাহ্মণ। সে মারতে এলে আমরাই বা সহ্য করব কেন? সে তো আর দেশের রাজা নয়? সে আমাদের মারবে কেন? আমরাও সবাই মিলে দল বেঁধে এক কাট্টা হয়ে যাব। সে আবার মারতে এলে আমরাও তাকে ছাড়ব না। সে নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে। আমাদেরও নিশ্চয় কিছু পরিচয় আছে, আমরা তো আর ভেসে আসি নি? কিছুদিন আগেই আমরা তার সঙ্গে পড়েছি, আমরা তার সহপাঠী। এর মধ্যেই সে একেবারে গোঁসাই হয়ে বসেছে? পাপীরা এই সব যুক্তি করল। অন্তর্যামী শচীনন্দন সবই জানতে পারলেন।

একদিন মহাঁপ্রভু পার্ষদগণকে নিয়ে বসে আছেন, এমন সময় তিনি একটা কথা বললেন, তার মানে কেউ বুঝতে পারল না, সকলেই চমকে উঠল। —কফ রোগ সারাবার জন্য আমি পিপ্পলিখণ্ড তৈরি করলাম, উলটে তাতে লোকের দেহে আরো কফ বেড়ে গেল। —এই কথা শুনে প্রভু অট্টহাস্য করছেন, কি কারণে প্রভু এমন হাসছেন তা না বুঝতে পেরে সকলে ভয় পেয়ে গেল। শ্রীনিত্যানন্দ একমাত্র প্রভুর মনোভাব ধরতে পারলেন।

—প্রভু শীঘ্র সংসার ত্যাগ করবেন। নিত্যানন্দ মনে বড় দুঃখ পেলেন। প্রভু সন্ন্যাসীরূপ ধরবেন, এই সুন্দর চুল আর থাকবে না। নিত্যানন্দ দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন। একটু পরেই শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের হাত ধরে নির্জনে নিয়ে বসলেন। প্রভু বললেন,—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, আমি এলাম জগৎ উদ্ধার করতে। উদ্ধার করতে পারলাম না, সংহার করতে চলেছি। আমাকে দেখে কোথায় লোকেদের মায়াবন্ধন ছিন্ন হবে, বরং তার পরিবর্তে এখন দেখছি একগুণের বন্ধন ছেড়ে কোটি বন্ধনে তারা বদ্ধ হতে চলেছে। যখন তারা আমাকে মারতে এগিয়ে এল, তখনই কোটি বন্ধনে জড়িয়ে পড়ল। লোকদের উদ্ধার করার পরিবর্তে আমি মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাস নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াব। আমাকে যারা মারতে এসেছিল, তাদের দুয়ারে গিয়েই ভিক্ষে চাইব। আমাকে দেখে তারা আমার পায় ধরবে, তবেই তারা উদ্ধার পাবে। এই ভাবেই আমি সারা সংসারকে উদ্ধার করব। সন্ন্যাসীকে সকলেই নমস্কার করে, সন্ন্যাসীকে কেউ মারতে যায় না। আমি কাল সন্ন্যাসী হয়ে ঘরে ঘরে ভিক্ষে করতে যাব, ভিক্ষা কবতে থাকলে কে আমাকে মারবে? আমি তোমাকে আমার মনের কথা বললাম, আমি সংসার ত্যাগ করব। তুমি এতে মনে দুঃখ পেয়ো না, আমাকে সন্ন্যাস নেবার হুকুম দাও। আমি তোমার কথা মতই কাজ করি। আমার অবতীর্ণ হওয়ার মূল উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে আমাকে তুমি আদেশ দাও। তুমি যদি জগতের উদ্ধার চাও তাহলে নিশ্চয় আমাকে নিষেধ করবে না। এতে তুমি মনে দুঃখ পেযো না, তুমি তো অবতারের কারণ জান। —শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিখার অন্তর্ধানের কথা শুনে দেহ-মন-প্রাণ সবই অন্তর থেকে বিদীর্ণ হয়ে গেল।

নিত্যানন্দ কি বলবেন বুঝতে পারছেন না। তবে তিনি এটা বুঝতে পারলেন যে প্রভু অবশ্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। নিত্যানন্দ বললেন,—প্রভু তুমি ইচ্ছাময়, তোমার অন্তরে যা আছে তাই সত্য। তুমি সর্বলোক-পালক, তুমি সর্বলোকনাথ। কি করলে ভাল হবে তা তুমিই জান। তুমি কি করে জগৎ উদ্ধার করবে তা তুমিই জান, অন্যে কি বুঝবে? তুমি স্বতন্ত্র এবং পরমানন্দ, তুমি যা করবে তাই হবে। তবু তুমি সকলকে একবার জানাও কথাটা, দেখ, কে কি বলে। তোমার ইচ্ছা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত টিকবে, তার বিরোধিতা কে করবে? —নিত্যানন্দের কথায় প্রভু সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বারংবার আলিঙ্গন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রভু তখন ভক্তবৃন্দের কাছে গেলেন। প্রভু সংসার ছেড়ে যাবেন শুনেই নিত্যানন্দ স্তব্ধ হয়ে গেছেন, মুখে আর কথা নেই। একটু স্থির হয়েই নিত্যানন্দ প্রথমেই ভাবলেন, প্রভু সন্ন্যাসী হয়ে গেলে শচীমাতা কি করে বাঁচবেন? মাতা কি করে দিন-রাত কাটাবেন—এই কথা ভেবেই নিত্যানন্দ সর্বদা নিভৃতে কাঁদেন। গৌরচন্দ্র মুকুন্দের বাড়িতে এলে মুকুন্দ তাঁকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। প্রভু মুকুন্দকে বললেন,—কৃষ্ণমঙ্গল গীত কিছু গাও। মুকুন্দের গান শুনে প্রভু বিহ্বল হলেন। পুণ্যবন্ত মুকুন্দের সুন্দর গান শুনে ঠাকুর 'বোল বোল' বলে হুঙ্কার করে উঠলেন। কিছু সময়ের মধ্যেই প্রভু ভাব সম্বরণ করে মুকুন্দকে বললেন,—মুকুন্দ, আমি সংসার ছেড়ে চলে যাব। এখানে আর থাকব না। সন্ন্যাস নিয়ে শিখা-সূত্র ত্যাগ করে চলে যাব। —শিখার অন্তর্ধান শুনে মুকুন্দ দুঃখিত হলেন, তাঁর মনের আনন্দ চলে গেল। মুকুন্দ তখন প্রভুকে মিনতি করে বললেন,—প্রভু, তুমি যদি সন্ন্যাস নেওয়াই ঠিক করে থাক, তাহলে অন্তত কিছুদিন এখন কীর্তন কর। তারপরে তোমার মনে যা লয় তাই করবে। মুকুন্দের মিনতি শুনে প্রভু গদাধরের কাছে গেলেন। গদাধর প্রভুকে

দেখে সসম্মানে চবণ বন্দনা কবলেন। তখন প্রভু বললেন,—আমাব একটা কথা আছে। গদাধব, আমি সংসাবে থাকব না। আমি শ্রীকৃষ্ণেব উদ্দেশে বেবিয়ে পডব। যে দিকে দুচোখ যায় সেদিকে চলে যাব। শিখা-সূত্র ত্যাগ কবে মাথা মুডিয়ে চলে যাব। প্রভুব মস্তক মুণ্ডনেব কথা শুনে গদাধব বজ্রাহত হয়ে পডলেন। গদাধব মনে বডই দুঃখ পেলেন, প্রভুকে বললেন,—তোমাব এক অদ্ভুত কথা, মাথা মুডোলেই কি কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে? তুমি কি বল যে সংসাবে থেকে বৈষ্ণব হতে পাববে না? তুমি এই অশাস্ত্রীয় কথা বলছ কেন? অনাথিনী মাকে কি কবে ছাডবে? প্রথমেই তো জননী-বধেব ভাগী হবে। শচীমাতাব সব গিয়েছে, কেবল এখন তুমিই আছ। তুমি চলে গেলে তিনি প্রাণত্যাগ কববে‌ন। ঘবে থাকলে কি ঈশ্ববেব আশীর্বাদ পাওয়া যায় না? যাঁবা সংসাবে থেকে কৃষ্ণভজন কবেন তাঁবা সকলেবই প্রীতিব পাত্র। তব যদি তুমি মাথা মডোলেই ভাল থাক তব তাই কব। এই ভাবে প্রভু সমস্ত নিজগণেব কাছে মস্তক মণ্ডনেব কথা জানালেন। সকলেই শুনে মূর্ছিত হল।

প্রভু মস্তক মুণ্ডন কববেন, তাঁব সুন্দব চুলেব জন্য সকলেই মন খাবাপ কবছেন। কেউ বলেন, -ঐ সুন্দব কুঞ্চিত কেশে আব মালা দিয়ে সাজাব কি কবে? কেউ বলেন,—এই সুন্দব কুঞ্চিত কেশদাম না দেখে পাপিষ্ঠ জীবন বাখব কি কবে? —আব ঐ চুলেব দিব্য গন্ধ পাব না,—বলেই শিবে কবাঘাত কবতে থাকেন কেউ কেউ। আবাব কেউ বললেন,—এই সুন্দব চুল আব একবাব আমলকি দিয়ে পবিষ্কাব কবে দেব। কেউ কেউ 'হাব হাব' বলে উচ্চস্ববে কাঁদছেন। ভক্তবৃন্দ দুঃখ সাগবে নিমগ্ন হলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

২/২৬ প্রভুকে আব দেখতে পাবেন না,— এই কথা ভেবে প্রভুব সকল ভক্ত কান্নাকাটি কবছেন,— সন্ন্যাস নিয়ে প্রভু কোথায় যাবেন? আমবা কোথায় গিয়ে তাব সঙ্গে দেখা কবব? সন্ন্যাস নিয়ে কি তিনি আব নদীয়াতে আসবেন না? তিনি কোথায় যাবাব কথা স্থিব কবলেন? —ভক্তবৃন্দ এইবকম নানা কথা ভাবছেন সর্বদা, অনেকে খাওয়া-দাওয়াও ছেডে দিয়েছেন। প্রভু ভক্তেব দুঃখ সহ্য কবতে পাবেন না, তাই তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,— তোমবা এত চিন্তা কবছ কেন? তোমবা যেখানে থাকবে, জানবে আমিও সব সময় সেখানেই আছি। তোমবা কি ভেবেছ, আমি সন্ন্যাস নিয়ে তোমাদেব সব ছেডে চলে যাব? একথা মনে আদৌ স্থান দেবে না, আমি কখনো তোমাদেব ছাডব না। শুধু এই জন্মেই নয়, তোমবা আমাব জন্ম-জন্মান্তবেব সঙ্গী। এই জন্মে তোমবা যেমন আমাব সঙ্গে আনন্দে সঙ্কীর্তন কবছ, তেমনি আমাব আবো দুটি আনন্দরূপ প্রকটিত হবে। তখনও তোমবা এই ভাবেই মহানন্দে আমাব সঙ্গে কীর্তন কববে। লোকবক্ষাব জন্য আমি সন্ন্যাস নেব, তাই তোমাদেব দুশ্চিন্তাব কোন কাবণ নেই। —এই কথা বলে প্রভু জনে জনে সকলকে ধবে ধবে আলিঙ্গন কবতে লাগলেন। প্রভুব কথায় সকলেই খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বাডিতে চলে গেলেন। লোকেব মুখে-মুখে এ খবব পেয়ে শচীদেবীব শবীবে যেন আব প্রাণ নেই—এমনই অবস্থা। প্রভুব সন্ন্যাসেব কথা শুনে শচীমাতা ভাবতে ভাবতে অন্য সব কথা ভুলে গেলেন। হঠাৎ তিনি মূর্ছিত হয়ে পডে গেলেন, অবিবল অশ্রুপাত হচ্ছে, তিনি কখনও কোতে

পারছেন না। কমললোচন প্রভু বসে আছেন, শচীমাতা কেঁদে কেঁদে বলছেন,—বাপু, তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না, আমার এই পাপের শরীর শুধু তোমার চাঁদমুখ দেখেই বেঁচে আছে। তোমার কমল নয়ন, চন্দ্রবদন, কুন্দফুল ও মুক্তার মত দাঁত, লালবর্ণ অধর এবং তোমার মুখের মিষ্টি কথা। তোমার সঙ্গী রয়েছেন অদ্বৈতাচার্য এবং শ্রীবাস, নিত্যানন্দ তোমার প্রাণের দোসর এবং পরম বান্ধব গদাধর প্রমুখ,—এঁদের সঙ্গে তুমি ঘরে থেকেই কীর্তন কর। জগতের জীবকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তুমি অবতীর্ণ হয়েছ, মাকে ত্যাগ করে কি ধর্ম হয়? এ কেমন বিচার? ধর্মস্বরূপ-তুমিই যদি মাকে ছেড়ে যাবে তাহলে কি করে মানুষকে ধর্ম-উপদেশ দেবে? —শচীমাতা প্রেমশোকে এসব কথা বলছেন শুনে প্রেমে বিশ্বম্ভরের কণ্ঠ রোধ হয়ে গেছে। প্রভু কোন উত্তর করছেন না। —তোমার বড় ভাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল, তোমার বাবাও স্বর্গে গেলেন, তোমাকে দেখে আমি সমস্ত শোক ভুলেছিলাম, তুমিও যদি চলে যাও তাহলে আর প্রাণে বাঁচব না। প্রাণের গৌরাঙ্গ, বাপ, অনাথিনী মাকে ছেড়ে যেয়ো না। নিত্যানন্দ তো রয়েইছে, তুমি সকলকে নিয়ে নিজের উঠোনেই কীর্তন কর। তোমার আঁখি দুটি প্রেমময়, বাহু দুটি দীর্ঘ, কথায় অমৃত ঝরে। প্রদীপ ছাড়াই তোমার আলোতে আমার ঘর উজ্জ্বল, তোমার রাঙ্গা পাদপদ্মেও মধু রয়েছে। শচীর এসব কথা শ্রীগৌরাঙ্গ বসে শুনছেন, যেন মাতা কৌশল্যা বুঝাচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্রকে। শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দ সর্বদা আনন্দ দান করছেন, রসসিক্ত হয়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই গান করছেন।

শচীমাতার বিলাপ শুনে প্রভু চুপ করে আছেন। শচীমাতার শরীর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সেই দেহ অস্থিচর্ম সার হয়েছে, শোকে তাঁর খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ হয়ে গেছে। প্রভু লক্ষ্য করলেন,—শচীমাতা যেন আর বাঁচবেন না মনে হচ্ছে, তাই তিনি নির্জনে মাকে বললেন,—মা, তুমি অস্থির হয়ো না। জন্মে জন্মে আমি তোমারই সন্তান। তুমি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে তোমার গুণচরিত্র-কথা শোন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তোমার নাম ছিল পৃশ্নী, সেখানেও তুমি আমার মা ছিলে, তারপরে তুমি অদিতি নামে আবির্ভূতা হয়েছিলে। তারপরে আমি বামন অবতার হয়ে এলাম, তখনও তুমিই আমার মা ছিলে। তুমি আবার যখন দেবহূতি হলে, আমি হলাম কপিল। এর পর তুমি যখন কৌশল্যা হলে তখন আমি হয়েছিলাম শ্রীরামচন্দ্র। তারপরে তুমি মথুরায় দেবকী হয়ে কংসের অন্তঃপুরে কারারুদ্ধ ছিলে। তখনও আমিই তোমার কোলে পুত্ররূপে এসেছিলাম। এই সঙ্কীর্তন আরম্ভ হবার পরে আমি আরো দুবার তোমার পুত্র হয়ে আসব। তুমি জন্মে জন্মেই আমার মা, পরমার্থ বিচারে তোমার আর আমার মধ্যে কখনো সম্পর্ক ছিন্ন হবার নয়। আমি তোমাকে সমস্ত খুলে বললাম, তুমি আর মনে কোনও দুঃখ রেখো না। প্রভুর গূঢ় বার্তা শুনে শচীমাতা স্থির হলেন।

এইভাবে শ্রীগৌরহরি সর্বদা সঙ্কীর্তনের আনন্দে রয়েছেন। স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর যে কখন কি করেন তা কেউ বুঝতে পারে না। সব সময় প্রভু পরম আনন্দে সকল বৈষ্ণবের সঙ্গে কীর্তনে রত থাকেন। ভক্তরাও কীর্তনে আনন্দে বিভোর হয়ে সব কিছু ভুলে রয়েছেন। সর্ব বেদ যাঁকে দেখতে চায় সেই প্রভু ভক্তগণের সঙ্গে লীলা করছেন,— প্রভু কবে সন্ন্যাস নেবেন তা শ্রীনিত্যানন্দকে গোপনে বললেন,—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, তুমি মাত্র পাঁচ জন লোকের কাছে খবরটি বলবে। এই সংক্রান্তি দিনেই আমি সন্ন্যাস নেব। ইন্দ্রাণির কাছে কাটোয়া গ্রামে সাধু কেশবভারতী থাকেন। তাঁর কাছেই আমি সন্ন্যাস

নিচ্ছি। আমার মা, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য এবং মুকুন্দ —এই পাঁচজনকে মাত্র খবরটি দেবে —প্রভু একথা গোপনে নিত্যানন্দকে বললেন, আর কেউ এ খবর জানে না। নিত্যানন্দ পাঁচ জনকেই বলেছেন। সেই দিন প্রভু সমস্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে সারা দিন কীর্তন করে কাটালেন। দুপুরে ভোজন করে সন্ধ্যার দিকে গঙ্গা-দর্শনে গেলেন। গঙ্গাদেবীকে নমস্কার করে কিছু সময় গঙ্গাতীরে কাটিয়ে ঘরে চলে এলেন। শ্রীগৌরহরি এসে বসলেন, চারদিকে ভক্তগণ তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। সকলেই তাঁর সঙ্গে আনন্দে কাটাচ্ছেন, প্রভু-যে সেদিনই চলে যাবেন তা কেউ জানেন না। কমললোচন প্রভু সর্বাঙ্গে মালা-চন্দনে শোভিত হয়ে বসে আছেন। যে বৈষ্ণবগণ প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন সকলেই হাতে করে মালা আর চন্দন নিয়ে আসছেন। প্রভুর আকর্ষণে সকলেই এসে জুটতে লাগলেন। কত যে লোক আসছে তা ব্রহ্মাদি দেবতারাও লিখে উঠতে পারবেন না। সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রভুর শ্রীমুখের দিকে তাকান। প্রভু নিজের গলা থেকে মালা খুলে সকলকে দিয়ে উপদেশ করলেন,—সকলেই ঘরে গিয়ে সর্বদা কৃষ্ণনাম করবে। কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কিছু গাইবে না। শয়নে-ভোজনে-জাগরণে দিবারাত্র মুখে কেবলই কৃষ্ণনাম নেবে। —সকলের প্রতি মাঙ্গলিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রভু আদেশ করলেন,—এবারে তোমরা সকলে বাড়িতে চলে যাও। —কতলোক যে আসছে আর কতলোক যে যাচ্ছে তার কোনো হিসেব নেই। কেউ কাউকে চেনে না কিন্তু সকলেই মহানন্দে বিহ্বল হয়ে আছেন। শ্রীবিগ্রহ চন্দন মালায় ভরে গেল, চন্দ্রকিরণের মত সেই শোভা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। প্রসাদ পেয়ে সকলেই মহানন্দে উচ্চ হরিধ্বনি করলেন। ভাগ্যবান শ্রীধর সেই সময় একটি লাউ হাতে করে এসে উপস্থিত হলেন। লাউ নিয়ে এসেছেন দেখে প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—কোথায় পেলে? প্রভু তো মনে মনে জানেন যে তিনি কালই চলে যাচ্ছেন, তাই এ লাউ আর ভোজন করা হবে না। কিন্তু শ্রীধরের দেওয়া দ্রব্য তো গ্রহণ করতেই হবে, তাই আজই এই লাউ ভোজন করা দরকার। —এই কথা ভেবে প্রভু ভক্তবাৎসল্য রক্ষা করার জন্য শচীমাতাকে বলে দিলেন আজই লাউ রাঁধতে। সেই সময় আর একজন ভাগ্যবান ভক্ত দুধ নিয়ে এলেন প্রভুর জন্য। হেসে প্রভু মাকে বললেন,—ভালই হয়েছে। মা, 'দুধ-লাউ' রান্না কর আজ। শচীমাতা খুশি হয়েই রাঁধতে গেলেন। শ্রীগৌরহরি এমনি ভক্তবৎসল।

প্রভু এই রকম আনন্দ করেই মধ্যরাত্র পর্যন্ত কাটিয়ে সকলকে বিদায় দিয়ে এসে ভোজন করতে বললেন। ভোজন শেষে মুখশুদ্ধি করে গৌরাঙ্গ শয়নঘরে গেলেন। প্রভু তখন যোগনিদ্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, কাছে শুয়ে ছিলেন হরিদাস এবং গদাধর। শচীমাতা জানেন যে আজ প্রভু চলে যাবেন, তাই তাঁর ঘুম নেই, তিনি কেবলই কাঁদছেন। শেষ রাতের দিকে প্রভু যাবার মত জিনিসপত্র নিয়ে উঠলেন। গদাধর এবং হরিদাসও টের পেয়ে উঠে পড়লেন। গদাধর বললেন,—আমি তোমার সঙ্গে যাব। প্রভু বললেন,—আমার সঙ্গে কারো যাবার দরকার নেই, আমি একাই যাব। প্রভু আজ যাবেন জেনে শচীমাতা দরজায় বসে রয়েছেন। শচীমাতাকে দেখে প্রভু তাঁর হাত ধরে বললেন,—তুমি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছ, তোমার জন্যেই আমার লেখা-পড়া হয়েছে। তুমি কখনো নিজের বিন্দুমাত্র সুখের কথা ভাবো নি, জন্ম থেকেই কেবল আমার সুখের কথাই ভেবেছ। তুমি আমার জন্য যা করেছ তা আমি কোটি কল্পেও শোধ করতে পারব না। মা, এই সংসারের সব কিছু ভগবানের ইচ্ছায় হয়। কেউ নিজের

ইচ্ছামত কিছুই করতে পারে না। কিছু পাওয়া বা না-পাওয়া, লাভ কিংবা ক্ষতি, সবই তাঁর ইচ্ছা। ভগবানের ইচ্ছা কেউ জানে না। আমি এখনই চলে যাই কি দশদিন পরেই যাই—তার জন্যে তুমি কোন চিন্তা ক'রো না। প্রভু বুকে হাত দিয়ে বারংবার বললেন,—তোমার সব ভার আমি নিলাম। প্রভু যা-কিছু বলছেন, শচীমাতা সবই শুনছেন। মুখে কোন কথা নেই, তিনি কেবলই অঝোরে কাঁদছেন। জগন্মাতা শচীদেবী পৃথিবীর মতই যেন সর্বংসহা হয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য কীর্তিকথা কে বুঝতে পারে? প্রভু জননীর পদধূলি মাথায় নিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে যাত্রা করলেন।

বৈকুণ্ঠনায়ক সন্ন্যাস নিয়ে সর্বজীবকে উদ্ধার করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। প্রভুর এই সন্ন্যাস-কাহিনী শুনলে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। প্রভু যাত্রা করা মাত্র শচীমাতা অচৈতন্য হয়ে পড়লেন, তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা আর বেরুচ্ছে না। ভক্তগণ এইসব বৃত্তান্ত কিছুই জানেন না। ঊষায় গঙ্গাস্নান করে তাঁরা প্রভুকে নমস্কার করতে এসে দেখলেন শচীমাতা বাইরের দরজায় বসে রয়েছেন। শ্রীবাস তাঁকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন,—মা তুমি বাইরের দরজার কাছে বসে আছ কেন? মাতা জ্ঞানহারা, মুখে রা নেই, কেবল অশ্রুধারা বয়ে চলেছে। একটু পরে শচীমাতা বললেন,—বাপুরা, তোমরা শোন, বিষ্ণুর দ্রব্যের মালিক সব বৈষ্ণবগণ, তাই আমার ঘরে যা-কিছু আছে সবই তোমরা নিয়ে নাও,—এটাই শাস্ত্রবিধি। তোমরা সকলে মিলে এখন যা ভাল মনে কর তাই কর, আমি এখান থেকে চলে যাব। —প্রভুর গৃহত্যাগের কথা শুনে ভক্তগণ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বৈষ্ণবগণ মনের দুঃখে আর্তনাদ করে কাঁদতে লাগলেন,—গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণ আজ কি নিদারুণ বাত পোহালেন! —এই বলে সকলেই মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছেন। —প্রভুর শ্রীমুখ না দেখে কি করে দিন কাটাব? এই পাপিষ্ঠ জীবন আর রাখব না। আচম্বিতে এমন বজ্রপাত কেন হল? —শিরে করাঘাত করে তাঁরা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কেবল এই কথাই বলছেন। ভক্তগণ কান্না থামাতে পারছেন না, শচীদেবীর গৃহ কান্নায় ভরে গেল। কোন ভক্ত প্রভুকে দর্শন করতে এসেই শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ভক্তগণ মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদছেন আর বলছেন,—প্রভু সন্ন্যাস নিতে চলে গেছেন। কিছু পরে ভক্তবৃন্দ একটু শান্ত হয়ে সকলে মিলে শচীমাতাকে ঘিরে বসলেন। এর মধ্যেই সারা নদীয়াতে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিতে চলে গেছেন। সারা নদীয়ার লোক শুনেই হতভম্ব হয়ে গেল আর তারপরেই দৌড়ে এল খবর জানতে। লোকেরা ছুটে এসে দেখছে, প্রভু চলে গেছেন, শূন্য বাড়িতে সকলে কান্নাকাটি করছেন। তখন সকলেই 'হায় হায়' করে উঠল। যে একদিন মহানিন্দক পাষণ্ডী ছিল সেও আজ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। এমন লোককে আমরা এতকাল চিনতে পারি নি,—এই বলে তারা অনুতাপ করে কাঁদতে লাগল। নদীয়ার লোকেরা মাটিতে গড়াগড়ি করে কেঁদে বলতে লাগল,—আর সেই চন্দ্রবদন দেখতে পাব না। কেউ বলছেন,—চল ঘর-দরজায় আগুন দিয়ে বৈরাগী হয়ে চলে যাই। আমাদের এই প্রভুই যখন নবদ্বীপ ছাড়লেন, আমাদের আর জীবন রেখে লাভ কি? সারা নদীয়ার মেয়ে-পুরুষ যেই এখবর শুনছে সেই মনে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে। প্রভুই জানেন কাকে কিভাবে তিনি উদ্ধার করবেন। এভাবে সকলেই উদ্ধার পেয়ে যাবে। প্রভুর বিষয়ে যাদের মনে কিছুমাত্র নিন্দা-বিদ্বেষ ছিল, তাদের সব দোষ খণ্ডন হয়ে গেল। সর্বজীবের প্রভু গৌরচন্দ্রের জয়। দয়াময় প্রভু অপূর্ব কৌশলে সকলকে উদ্ধার করলেন।

প্রভুর সন্ন্যাসের কাহিনী শুনলে সংসার বন্ধন ক্ষয় হয়। প্রভু গঙ্গা পার হয়ে সেদিনই কণ্টকনগরে চলে এলেন। তিনি যাঁকে যাঁকে আসতে বলেছিলেন তাঁরাও আস্তে আস্তে সকলে এসে হাজির হলেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য এবং ব্রহ্মানন্দ—এই পাঁচ জন এসে কাটোয়ায় কেশবভারতীর আশ্রমে মিলিত হলেন। তাঁদের দেহের জ্যোতি দেখে কেশবভারতী দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। প্রভু তখন তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে করজোড়ে বললেন,—তুমি পতিতপাবন, মহাকৃপাময়, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তোমার মধ্যে অবস্থান করেন, তুমিই আমাকে আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিতে পার। আমি যেন সর্বদা কৃষ্ণদাস হয়ে থাকতে পারি, আর কিছু চাই না, তুমি আমাকে সেভাবে উপদেশতত্ত্ব দান কর। কথা বলতে গেলেই প্রভুর প্রেমজলে শরীর ভেসে যায়, তাই তিনি হুঙ্কার করে নাচতে লাগলেন। মুকুন্দ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ গান করছেন, শচীনন্দন নিজের আবেশে মত্ত হয়ে নাচছেন। এই সংবাদ শুনেই কোথা থেকে হাজার হাজার লোক এসে উপস্থিত হল। কন্দর্পের মত প্রভুর অপূর্ব সুন্দর রূপ দেখে সকলেই একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। প্রভুর নয়নে অনির্বচনীয় অদ্ভুত ধারা বইছে, সহস্রবদন অনন্তদেব তাঁর সমস্রমুখে বর্ণনা করলেও তা শেষ করতে পারবেন না। প্রভু ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকলেন, তাতে যে জল ছিটিয়ে পড়ল, সেই জলে লোকেরা নেয়ে গেল। প্রভুর প্রেমজলে লোকেরা ভিজে গিয়েছে, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে মিলে হরিধ্বনি করে উঠল। কখনো কাঁপুনি, কখনো ঘাম, কখনো মূর্ছা,—কখনো প্রভু আবার আছাড় খেয়ে পড়ছেন,তা দেখে সকলেই ভয় পাচ্ছে। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ নিজদাস্য-ভাবে দাঁতে তৃণ নিয়ে সকলের কাছে ভক্তি যাচ্ঞা করছেন। সেই করুণ ভাবে সকলেই কাঁদছেন। প্রভু সন্ন্যাস নেবেন শুনে তাঁরা সবাই শোকাহত হচ্ছেন। —এর মা কি করে বাঁচবেন, তাঁর জীবনে আজ কি কালরাত্রি পোহাল! কোন্ পুণ্যবতী এমন রত্ন পেটে ধারণ করেছিল, কি দোষেই বা বিধি তা হরণ করলেন। আমাদের দেখেই প্রাণ বিদীর্ণ হচ্ছে, মা কিংবা স্ত্রী তা সহ্য করবেন কি করে? —এই সব ভেবে মেয়েরা দুঃখে কাঁদছেন। সকলের চিত্তেই শ্রীচৈতন্য-প্রেমের উদয় হল। একটু নৃত্য থামিয়ে গৌরহরি বসলেন, ভক্তগণ সকলে তাঁকে ঘিরে রইলেন।

প্রভুর ভক্তি দেখে কেশবভারতী মহানন্দে স্তুতি করতে লাগলেন,—আমি স্বচক্ষে তোমার যে ভক্তি দেখলাম, ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের এ শক্তি ধারণ করা অসম্ভব। তুমি অবশ্যই জগৎগুরু, তোমার গুরু হবার যোগ্য কেউ নয়। তথাপি তুমি লোকশিক্ষার জন্য আমাকে গুরুরূপে বরণ করবে বলে আমার মনে হচ্ছে। তার উত্তরে প্রভু নিবেদন করলেন,—আমাকে ছলনা করো না, আমাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়ে কৃষ্ণভক্ত করে দাও। প্রভু এইভাবে সকলের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করে সেই রাত কাটিয়ে দিলেন। তিনি সকালে চন্দ্রশেখর আচার্যকে বললেন,—আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমি সন্ন্যাসের প্রয়োজনীয় সমস্ত শাস্ত্রীয় কার্যাদি নির্বাহ কর। প্রভুর আজ্ঞায় তিনি সবই করলেন। নানা গ্রাম থেকে নানাবিধ দ্রব্যাদি ভূরি ভূরি আসতে লাগল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মুগ, তাম্বুল, চন্দন, ফুল, যজ্ঞসূত্র, বস্ত্র ইত্যাদি সকলেই নিয়ে আসতে লাগল। খাবার দ্রব্যাদিও সব আসছে, কে কোথা থেকে কি আনছে তার কিছু হিসাব নেই। পরম আনন্দে সকলেই হরিধ্বনি দিচ্ছে, বালক-বৃদ্ধ-যুবা কারো মুখেই অন্য কোন কথা নেই। সর্বজগতের প্রাণ মহাপ্রভু এখন মস্তকমুণ্ডন করতে বসেছেন। নাপিত এসে সামনে বসেছে, অমনি চার দিক থেকে

মহা কান্নার রোল উঠল। নাপিত সেই সুন্দর কোঁকড়ানো চুলে ক্ষুর লাগাতে চাইছে না। তার হাত উঠছে না কিছুতেই, সে কেবলই কেঁদে যাচ্ছে। নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদছেন। ভক্তের কথা থাক গিয়ে, সংসারী লোকেরাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কেউ বলে,—কোন্ বিধি সন্ন্যাসের নিয়ম করেছে? উপস্থিত মহিলারাও এই কথা বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন। স্বর্গের দেবতারাও অদৃশ্য থেকে কাঁদছেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কান্নায় ভরে গেল। শ্রীগৌরহরি এমনই কারুণ্য রসের অবতারণা করলেন যে শুষ্ক কাঠ পাষাণ পর্যন্ত ভিতরে ভিতরে গলে গেল। প্রভু সর্বজীবের উদ্ধারের জন্যই এই সকল লীলা করছেন। তার প্রমাণস্বরূপ সহস্র সহস্র লোক কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। পরম প্রেমচঞ্চল গৌরচন্দ্র একটু সময়ের জন্যও স্থির থাকতে পারছেন না, সব সময় প্রেমাবেশে অশ্রু কম্প হচ্ছে। প্রভু মাঝেমাঝেই 'বোল বোল' বলে উঠছেন আর মুকুন্দ অমনি গান ধরছেন, সঙ্গে প্রভু নাচছেন। বসেও প্রভু স্থির থাকতে পারছেন না, প্রেমকম্প এবং অশ্রুধারা চলছেই। প্রভু কেবলই 'বোল বোল' বলে হুঙ্কার করে উঠছেন, নাপিত তাই মস্তকমুণ্ডন করতে পারছে না। শেষকালে দিনের শেষে কোন রকমে মস্তকমুণ্ডন হল। প্রভু তখন গঙ্গাস্নান করে এসে সন্ন্যাসের জায়গায় বসলেন।

শাস্ত্র বলেন, গৌরচন্দ্র সকলের শিক্ষাগুরু, তিনি কেশবভারতীকে তা প্রকারান্তরে বলেই দিলেন। প্রভু বললেন,—স্বপ্নে আমাকে একজন মহাপুরুষ কানে সন্ন্যাসের মন্ত্র দিয়েছেন। তুমি দেখ তো তা ঠিক আছে কিনা। —এই বলে প্রভু কেশবভারতীকে মন্ত্রটি বললেন। প্রভু কৌশলে কেশবভারতীকে শিষ্য করলেন, ভারতী বড়ই বিস্ময়াপন্ন হলেন। ভারতী বললেন, —এই মহা মন্ত্র কৃষ্ণের আশীর্বাদে তো তোমার অন্তরে দেখছি। তখন প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে কেশবভারতী সেই মন্ত্রেই প্রভুকে সন্ন্যাসদীক্ষা দান করলেন। চারদিকে তখন মহা হরিসঙ্কীর্তন হচ্ছিল। হরিনামের সমঙ্গল ধ্বনি শুনতে শুনতেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তিনি গেরুয়া বসন পরলেন, তখন প্রভুকে কোটি কন্দর্পের মত সুন্দর লাগল দেখতে। সর্ব অঙ্গে মাথায় চন্দন দেওয়া হয়েছে, ফুলের মালায় প্রভুর দেহ ঢেকে গেছে। দুহাতে দণ্ড আর কমণ্ডলু, তিনি সব সময় প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে আছেন। কোটি চন্দ্রের শোভায় শ্রীবদন শোভিত, [illegible]। প্রভুকে সন্ন্যাসীরূপে দেখতে কেমন লাগছে তা একমাত্র বেদব্যাসই পরিপূর্ণভাবে বলতে পারবেন। মহাভারতের দানধর্মে সহস্রনামস্তোত্রে বেদব্যাস বলেছেন, কোনও অবতারে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। দ্বিজচূড়ামণি প্রভু এখন সন্ন্যাস নিয়ে সেই শাস্ত্র বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করলেন। বৈষ্ণব সমাজ তার মর্ম যথার্থই অবগত আছেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন, তিনই সকলের শান্তি দান করবেন, তিনি শুদ্ধসত্ত্ব এবং কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠাপরায়ণ।

প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম কি হবে তাই নিয়ে কেশবভারতী মনে মনে ভাবছিলেন। চোদ্দভুবনের মধ্যে এমন বৈষ্ণব তো আর কেউ নেই। তাই এর নাম একটি নতুন ভাবেই রাখতে হবে। তবেই আমার মনের আশা পূর্ণ হতে পারে। ভারতীর শিষ্য ভারতীই হবে কিন্তু এঁকে তো তা করা যাবে না। এর উপযুক্ত নাম রাখা দরকার। —ভগবান কেশবভারতী এই কথা ভাবতে ভাবতে শুদ্ধা সরস্বতী এসে তাঁর জিহ্বায় ভর করলেন। সঠিক নামটি পেয়ে তিনি প্রভুর বুকে হাত রেখে শুদ্ধ মনে বললেন,—জগৎবাসী সমস্ত জীবকে তুমি কৃষ্ণনাম বলিয়েছ, কীর্তন প্রচার করে কৃষ্ণ চেতনা জাগিয়েছ, তাই সমস্ত

লোক তোমার কৃপায় ধন্য হয়েছে। এজন্য আমি তোমার নাম রাখলাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। কেশবভারতী এই কটি কথা উচ্চারণ করা মাত্র জয়ধ্বনি এবং পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। চতুর্দিকে বৈষ্ণবগণ মহা-হরিধ্বনি দিয়ে আনন্দে চীৎকার করতে থাকেন। সকল ভক্তগণ কেশবভারতীকে প্রণাম করলেন, প্রভুও এই নাম পেয়ে বেশ সন্তুষ্ট হলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রকাশিত হয়ে গেল, ভক্তবৃন্দ সকলে তাঁকে দণ্ডবৎ করলেন। এই ভাবে নিজে সন্ন্যাস নিয়ে প্রভু সন্ন্যাস আশ্রমকে ধন্য করলেন এবং স্বীয় স্বরূপভূত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম প্রকাশ করলেন। এ সকল কথার কখনো শেষ নেই, এক ব্রহ্মাণ্ডে যখন এঁর তিরোভাব হয় তখন অন্য ব্রহ্মাণ্ডে এঁর আবির্ভাব হয়ে থাকে। শ্রীচৈতন্য সর্বদাই লীলা করছেন, কৃপা করে তিনি যখন যাকে দেখান তখন তিনিই দেখতে পান। সেখানে-যে আরো কত লীলা হল একমাত্র নিত্যানন্দই তা জানেন। শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর এখানে বলছেন যে তিনি শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে এবং তাঁর কৃপাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে সূত্র আকারে কিছু বর্ণনা করছেন। তিনি সকল বৈষ্ণবের চরণে নমস্কার জানাচ্ছেন, তাঁর কিছু অপরাধ যেন না হয়। পরবর্তী কালে বেদব্যাস অবতীর্ণ হয়ে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করবেন।

এইভাবে শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস বিষয়ে বর্ণনা করা হল, এই গ্রন্থ পাঠ করলে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তি জন্মাবে। চৈতন্যভক্ত, চৈতন্যদাস হওয়া যাবে। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ—এই দুই প্রভুর কাছে আমাদের এই বাঞ্ছা, একথা যেন কখনো না ভুলি। এমন সৌভাগ্য কি কখনো হবে যে ভক্তবৃন্দবেষ্টিত চৈতন্যনিত্যানন্দকে দর্শন করতে পাব। আমার মনে সর্বদা একটাই ভরসা যে আমার প্রভুর প্রভু হচ্ছেন শ্রীগৌরসুন্দর। যে কেবল মাত্র মুখে নিত্যানন্দের দাস বলে নিজেকে স্বীকার করে সেও অবশ্যই শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ দেখতে পাবে। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র,—এই দুজনের সঙ্গ যেন আমি সর্বদা লাভ করতে পারি। শ্রীনিত্যানন্দ জগতের প্রেমদাতা, সেই নিত্যানন্দের আনুগত্যে যেন প্রভু গৌরচন্দ্রের ভজন করতে পারি। সংসার-সমুদ্র পার হয়ে যে ব্যক্তি ভক্তি-সাগরে মহানন্দে ডুবে থাকতে চায় সে অবশ্যই শ্রীনিতাইচাঁদকে ভজনা করবে। কাঠের পুতুলকে যেভাবে কৌশলে নাচানো হয় তেমনি প্রভু গৌরচন্দ্র আমাকে চালাচ্ছেন। পাখী যতদূর পারে আকাশে উঠে উড়তে থাকে কিন্তু আকাশের সীমা পায় না, তেমনি চৈতন্যকথারও অন্ত নেই, যার যেমন শক্তি সে ততটাই গাইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।

৩/১ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের ভুজ-যুগল আজানুলম্বিত, কান্তি সূর্যের বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, চোখদুটি কমলদলের ন্যায় দীর্ঘ ও আয়ত,—আমি সেই সঙ্কীর্তনের একমাত্র পিতা, বিশ্বসংসারের ভরণপোষণকর্তা, যুগধর্মপালক, জগতের প্রিয়কারী দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দয়ার অবতার দুজনকে বন্দনা করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ দুই ভাই জগতে নিজকরুণাবশেই অবতীর্ণ হয়েছেন। দুভাগে দেখা গেলেও মূলত তাঁরা নিত্য ও সর্বনিয়ন্তা। আমি এই দুজনকেই ভজনা করি। ....প্রভু, তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই তিন কালেই সত্য, তুমি জগন্নাথ মিশ্রের তনয়, তোমার ভৃত্য-পুত্র-কলত্র সহ তোমাকে নমস্কার করি।

লক্ষ্মীকান্ত, নিত্যানন্দের একান্ত বল্লভ, বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী, পতিতপাবন গৌরচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় হোক, ভক্ত সমাজের জয় হোক। প্রভু, আমার হৃদয়ে তোমার পাদপদ্ম স্থাপন কর।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে বর্ণনা করে হবে প্রভু কেমন করে নীলাচলে এলেন সেই সব কথা। বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর সন্ন্যাস গ্রহণ করে সেই রাত্র কণ্টকনগরেই ছিলেন। সন্ন্যাসের পর প্রভু মুকুন্দকে কীর্তন করতে আদেশ দিলেন। 'বোল বোল' বলে প্রভু নিজেই নৃত্য আরম্ভ করে দিলেন, তখন চারদিক ঘিরে ভক্তবৃন্দ গাইতে শুরু করলেন। দীর্ঘশ্বাস, হাস্য, স্বেদ, কম্প, পুলক এবং হুঙ্কার—প্রভুর কত অসংখ্য রকমের প্রেমবিকার হয় তার শেষ নেই। কোটি কোটি সিংহের শক্তি নিয়ে তিনি গর্জন করে ওঠেন। তিনি আছাড় খেয়ে পড়েন তা দেখে সকলেই ভয় পেয়ে যায়। উদ্দণ্ড নৃত্যকালে প্রভুর দণ্ড ও কমণ্ডলু যে কোন্ দিকে ছিটকে পড়ে যায় তার কিছু ঠিক নেই। নাচতে নাচতে প্রভু মনের খুশিতে গুরু কেশবভারতীকেই জড়িয়ে ধরলেন। প্রভুর আলিঙ্গন-অনুগ্রহ পেয়ে ভারতীজী বিষ্ণুভক্তি লাভ করলেন। হাতের দণ্ড ও কমণ্ডলু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভারতীজীও প্রভুর সঙ্গে হরিনাম করে নাচতে লাগলেন। ভারতীজী প্রেমভক্তি প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে গড়াগাড়ি দিতে লাগলেন, তখন আর তাঁর কাপড়-চোপড় সামলাবার ক্ষমতাও নেই। প্রভু ভারতীজীকে কৃপা করেছেন দেখে ভক্তগণ উচ্চস্বরে হরিনাম আরম্ভ করে দিলেন। মনের আনন্দে প্রভু তাঁর গুরুর সঙ্গে নাচছেন দেখে ভক্তগণ আনন্দে কীর্তন আরম্ভ করে দিয়েছেন। ধ্যানেও যাঁর দর্শনলাভ দুষ্কর বলে চার বেদে উল্লেখ আছে, সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ কেশবভারতী সেই প্রভুর সঙ্গেই সাক্ষাৎভাবে নৃত্য করতে লাগলেন। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথকে কেশবভারতী শিষ্য রূপে পেয়েছেন, তাঁকে অসংখ্য প্রণাম জানাই। সারা রাত ধরেই প্রভু তাঁর গুরুর সঙ্গে নৃত্য করে কাটালেন। প্রভাতে প্রভু বাহ্যজ্ঞান পেয়ে গুরুর কাছে বিদায় নিয়ে বললেন,—আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজবার জন্যে আমি এখন অরণ্যে প্রবেশ করব। শুনে গুরু বললেন,—আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে সঙ্কীর্তনের আনন্দে থাকতে চাই।

কৃপা করে প্রভু তাঁকে সঙ্গে নিলেন এবং গুরুকে সামনে দিয়ে তিনি পেছন পেছন বনের দিকে চললেন। তারপর চন্দ্রশেখর আচার্যকে কোলে নিয়ে উচ্চ রোলে কেঁদে কেঁদে বললেন,—তুমি বাড়ি গিয়ে সকল বৈষ্ণবগণের সঙ্গে দেখা কর এবং তাঁদের জানাবে যে আমি বৃন্দাবনে চললাম। তুমি বাড়ি চলে যাও, মনে কোন দুঃখ রাখবে না। আমি সর্বদা তোমার হৃদয়ে বন্দী আছি। তুমি আমার পিতৃতুল্য, আমি তোমার স্নেহাস্পদ। আমার প্রতি জন্মে তুমি আমার অপরিমিত-প্রেমস্বরূপ। এই কথা প্রভু বললেন কিন্তু চন্দ্রশেখর আচার্য মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই চন্দ্রশেখরের প্রাণরক্ষা পেয়েছে, নতুবা এমন শোকে প্রাণ রক্ষা সম্ভব নয়।

নবদ্বীপে এসে চন্দ্রশেখর সকলকে জানালেন যে প্রভু বৃন্দাবনে চলে গেছেন। এই খবর পেয়ে ভক্তরা আর্তনাদ করে কাঁদতে লাগলেন। অদ্বৈতাচার্য এই সংবাদ শুনেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, দেহে যেন প্রাণ নেই এমন অবস্থা। শচীদেবী শোকে পুতুলের মত জড়পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভক্তবৃন্দের গৃহিনীগণ মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের সেই বিলাপ এবং অনুতাপের বর্ণনা করা কোটি মুখেরও সাধ্য নয়। অদ্বৈতাচার্য বলছেন,—আমি আর বাঁচব না। —কাঠ এবং পাথর পর্যন্ত সেই কান্না শুনে বিদীর্ণ

হয়ে যায়। অদ্বৈত বললেন,—প্রভুই যখন ছেড়ে গেলেন তখন আর বেঁচে কাজ নেই। দিনে গেলে লোকেরা ধরে ফেলবে তাই আমি আজ রাত্রে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব। সব ভক্তের মনের এই অবস্থা। সবারই চিত্ত বড়ই উদ্বিগ্ন। কারোই মনে শান্তি নেই, সকলেই যেন মরতে পারলেই বাঁচে। যদিও এঁরা সকলেই স্থিতধী ব্যক্তি কিন্তু আজ সকলেই মহা অস্থির হয়ে পড়েছেন। ভক্তগণ যখন আত্মহত্যা করবেন স্থির করেছেন এমন সময় দৈববাণী হল,—অদ্বৈতাদি ভক্তগণ, তোমরা কেউ দুঃখ ক'রো না। সকলেই আনন্দিত মনে কৃষ্ণ আরাধনা কর। প্রভু দু-চার দিন পরেই তোমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবেন। আত্মহত্যার কথা ভুলে যাও, আগের মতই প্রভুর সঙ্গে তোমরা বিহার করতে পারবে। —ভক্তবৃন্দ এই আকাশবাণী শুনে দেহত্যাগের ভাবনা ছেড়ে দিলেন। প্রভুর গুণগান করে তাঁরা এখন শচীমাতাকে ঘিরে বসে থাকেন। এদিকে সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ গৌরচন্দ্র হরিধ্বনি করে পশ্চিম দিকে চলেছেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ সঙ্গে রয়েছেন। পেছনে গোবিন্দ এবং সামনে কেশবভারতী। প্রভু মত্তসিংহের তেজে এগিয়ে চলেছেন, হাজার হাজার লোক পেছন পেছন আসছে কাঁদতে কাঁদতে। চারদিক থেকে লোকেরা বনজঙ্গল ভেঙ্গে দৌড়ে আসছে, প্রভু সকলকেই অমায়িকভাবে কৃপা করে বললেন,—তোমরা সবাই বাড়িতে ফিরে যাও, গিয়ে হরিনাম নাও। তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে মনপ্রাণ সমর্পণ কর। ব্রহ্মা, শিব, শুকদেব পর্যন্ত যে ভক্তি কামনা করেন, তোমরা তেমন ভক্তি লাভ কর। প্রভুর আশীর্বাদ পেয়ে তারা চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। বিরহের তাড়নায় যেন—তারা সকলেই বাড়িতে ফিরে গেল। গৌরচন্দ্র রাঢ়ভূমিতে এসে প্রবেশ করলেন, রাঢ়দেশের এই পরম সৌভাগ্য। রাঢ়ভূমির সৌন্দর্য দেখে প্রভু আকৃষ্ট হলেন। চার দিকে সুন্দর সুন্দর অশ্বত্থ গাছ, সুন্দর সুন্দর গাভীগণ চরে বেড়াচ্ছে। প্রভু এসব দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। 'বোল বোল' বলে, তিনি নিজেই নৃত্য আরম্ভ করে দিলেন, তাঁকে ঘিরে তাঁর ভক্তবৃন্দ নাচতে লেগেছেন। প্রভু প্রায় প্রায় হুঙ্কার-গর্জন করে ওঠেন, জগৎবাসী সেই শব্দ শুনে পবিত্র হয়।

রাঢ়দেশের ভেতর দিয়ে প্রভু নেচে নেচে চলেছেন আর বলছেন,—আমি বক্রেশ্বর গিয়ে নির্জনে বাস করব। এই কথা বলে তিনি প্রেমাবেশে জোরে হেঁটে চলেছেন, নিত্যানন্দ প্রমুখ সঙ্গীগণ তাঁকে ধরবার জন্য পেছনে পেছনে ছুটছেন। প্রভুর বিচিত্র নৃত্য-কীর্তনের খবর শুনে বহু লোক দৌড়ে আসছে। যদিও এর আগে কেউ কীর্তন শোনে নি অথবা কৃষ্ণপ্রেমের আর্তিও দেখেনি তবু প্রভুর অপূর্ব কান্না দেখে সকলেই তাঁর চরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ছে। তার মধ্যেও দু-একজন নরাধম জিজ্ঞাসা করছে,—এত বেশি কান্নাকাটি করার কি আছে? তারা সকলেই এখন প্রভুর কৃপায় ভক্তিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সকলেই এখন শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে সঙ্কীর্তনে যোগ দিয়েছে। এখনো কিছু বহির্মুখ জীব থেকে গেল। তারা কীর্তনে যোগ দেয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে যারা বিমুখ তারা অবশ্যই ভূতপ্রেত সদৃশ পাপী।

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নেচে-গেয়ে চলেছেন। দিন শেষ হয়ে গেলে প্রভু একজন পুণ্যবান ব্রাহ্মণের বাড়িতে থেকে গেলেন। ভোজনের পরে প্রভু শুয়েছেন, ভক্তগণও তাঁকে ঘিরে শুয়ে রয়েছেন। এক প্রহর রাত্র থাকতে প্রভু উঠে একা একাই চলতে শুরু করেছেন। ভক্তগণ পরে উঠে প্রভুকে না দেখে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছেন। সারা গ্রাম খোঁজাখুজি করে তাঁকে না পেয়ে পরে ভক্তেরা মাঠের দিকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।

প্রভু তখন নিজের প্রেমরসে উচ্চশব্দ করে রোদন করছিলেন,—কৃষ্ণরে প্রভুরে আরে কৃষ্ণ মোর বাপ। এইভাবে সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ ডাক ছেড়ে কাঁদছেন, দু মাইল দূরে পর্যন্ত এই কান্নার শব্দ চলে যাচ্ছে। বহু দূর থেকেও ভক্তরা প্রভুর কান্নার আওয়াজ পেলেন। কান্না শুনে তাঁরা সেদিকে গিয়ে প্রভুকে পেলেন। প্রভুর কান্নায় ভক্তগণও কাঁদতে লেগেছেন। তারই মধ্যে মুকুন্দ কীর্তন শুরু করে দিয়েছেন। কীর্তন শুনে প্রভু নাচতে লাগলেন, তখন তাঁকে ঘিরে ভক্তগণ সকলেই গাইতে লাগলেন। এই ভাবে সকলে মিলে নাচতে নাচতে পশ্চিম দিকে চলেছেন। বক্রেশ্বর পৌঁছুতে আর মাত্র মাইল আটেক বাকি। সেখান থেকে প্রভু এবারে ফিরলেন। তিনি এবারে পশ্চিম দিকে চলেছেন। আবার পুব দিকে ফিরলেন। মনের আনন্দে তিনি অট্টহাস্য করছেন। বাহ্যজ্ঞান পেয়ে প্রভু আনন্দ করে বললেন,—আমি নীলাচলে চললাম, আমি জগন্নাথদেবের আদেশ পেয়েছি, তোমরাও শীঘ্র নীলাচলে চলে এসো। —এই বলে প্রভু পুব দিকে হাঁটতে শুরু করলে ভক্তগণ খুবই আনন্দ পেলেন। তাঁর কি ইচ্ছা তা কেবল মাত্র তিনিই জানেন। আর তাঁর অনুগ্রহে তাঁর কৃপাপাত্র কেউ কেউ জানেন। কেনই বা তিনি বক্রেশ্বরের দিকে যাত্রা করেছিলেন এবং কেনই বা শেষ পর্যন্ত গেলেন না, তা বুঝবার কারো শক্তি নেই। প্রভু বক্রেশ্বর যাওয়ার ছলে সমস্ত রাঢ়দেশকে ধন্য করেছেন। এবারে মনের আনন্দে তিনি গঙ্গা সামনে রেখে এগিয়ে চলেছেন। সারা দেশ ভক্তিশূন্য, কেউ কীর্তন জানে না, কারো মুখে কৃষ্ণনামটি পর্যন্ত নেই।

প্রভু বললেন,—এমন জায়গায় কেনই বা এলাম, এখানে কারো মুখে একটু কৃষ্ণনাম শুনছি না। এমন দেশে কেন এলাম? আমি আর জীবন রাখব না। —সামনে কয়েকটি রাখাল ছেলে ছিল, তাদের মধ্যে একটি ভাগ্যবান রাখাল হঠাৎ হরিধ্বনি করে উঠল। শুনে প্রভু খুব খুশি হলেন। ছেলেটির মুখে হরিনাম শুনলাম, এর কারণ কি বল দেখি? প্রভু আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—এখান থেকে গঙ্গা কত দূরে? সকলেই জানালেন,—এক প্রহরের পথ হবে। গঙ্গার মহিমাতেই হরিনাম শুনতে পেলাম। এখানকার লোকের গায়ে গঙ্গার হাওয়া লাগে তাই তারা হরিনাম করে। গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করতে করতে গঙ্গার প্রতি প্রভুর অনুরাগ বেড়ে গেল। তিনি বললেন,—আজ আমি গঙ্গায় ডুবব। এই বলে তিনি মত্ত সিংহের মত দৌড়াচ্ছেন আর পেছনে পেছনে ছুটছেন তাঁর ভক্তের দল। প্রভু গঙ্গা-দর্শনের জন্য আকুল হয়ে পড়েছেন, তিনি ছুটছেন, ভক্তেরা তাঁকে ধরতে পারছেন না। তিনি কেবল মাত্র শ্রীনিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে এসে গঙ্গাতীরে এলেন, তাঁকে নিয়েই গঙ্গায় চান করলেন। 'গঙ্গা গঙ্গা' বলে কাঁদলেন, পেট পুরে গঙ্গাজল পান করলেন। প্রণাম করলেন। স্তুতি পাঠ করলেন,—একমাত্র দেবাদিদেব শিব তোমার তত্ত্ব জানেন, তোমার দিব্য জল প্রেমরসস্বরূপ। একবার তোমার নাম শুনলে, কিংবা গঙ্গাজল পান করলে তার বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। তোমার কৃপাতেই জীবের মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়। কীট, পক্ষী, শৃগাল, কুকুর পর্যন্ত তোমার পারে বসে যে সৌভাগ্য লাভ করতে পারে, অন্যস্থানে কোটিপতি লোকেরও সে ভাগ্য হয় না। পতিতদের উদ্ধার করার জন্যই তোমার অবতার। তোমার সমান একমাত্র তুমিই, তোমার তুল্য আর কেউ নেই। —শ্রীগৌরসুন্দরের এই স্তুতি শুনে জাহ্নবী দেবী মনে মনে লজ্জা পেলেন। প্রভুর পাদপদ্মেই তো গঙ্গার বাস, অথচ এই অবতারে তিনি তাঁকে স্তুতি করছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের গঙ্গাস্তুতি যে শোনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি তাঁর মতি ও রতি জন্মে।

শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভু সেই রাতটি কোন পুণ্যবানের আশ্রমে কাটালেন। পরদিন ভক্তগণ এসে তাঁদের দেখা পেলেন। ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে এবারে প্রভু নীলাচলের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি নিত্যানন্দকে বললেন,—তুমি তাড়াতাড়ি নবদ্বীপে চল। শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তগণের আনন্দ বিধান কর গিয়ে। তুমি গিয়ে সকলকে জানাবে যে আমি নীলাচলে যাচ্ছি জগন্নাথ-দর্শনে। আমি শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে সকলের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি সকলকে নিয়ে সেখানে আসবে। আমি হরিদাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য ফুলিয়াতে যাচ্ছি। নিত্যানন্দকে পাঠিয়ে দিয়ে প্রভু ফুলিয়াতে চললেন।

প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে নিত্যানন্দ নবদ্বীপের দিকে চলেছেন। তিনি প্রেমে মত্ত। আনন্দে বিহ্বল হয়ে তিনি মত্ত সিংহের মত আনন্দগর্জন করে চলেছেন, তাঁর সমস্ত আচরণই বিধিনিষেধের অতীত। কখনো তিনি কদম্ব গাছে চড়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে মোহনবাঁশী বাজাচ্ছেন। আবার কখনো গরুর পাল দেখে গোষ্ঠ স্মরণে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। বৎসের মত গাভীর দুধ খাচ্ছেন। সারা পথে বেহুঁশের মত মহানন্দে নেচে চলেছেন। কখনো পথে বসে কাঁদছেন, তা দেখলে মানুষের কষ্ট হয়। কখনো তিনি হাসছেন, কখন মাথায় কাপড় বেঁধে উলঙ্গ হয়ে চলেছেন। কখনো তিনি স্বানুভাবে অনন্তনাগের ভাবে আবিষ্ট হয়ে সাপের মত গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাচ্ছেন। নিত্যানন্দের মহিমা গণনা করা যায় না, বুদ্ধির অগোচর এবং চিন্তা করেও কিছু বুঝতে পারা যায় না। ত্রিভুবনের মধ্যে তাঁর করুণাও অসীম। গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপের ঘাটে এসে পৌঁছলেন। সুস্থির হয়ে তিনি প্রথমে এসে শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। এসে দেখছেন শচীমাতা গত কয়েকদিন যাবৎ কিছু না খেয়েই আছেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় কেবল শ্বাসটুকুই আছে। যশোদার মতই তিনি আত্মস্মৃতি-হারা এবং সর্বদা তাঁর স্নেহাশ্রু বয়ে চলেছে। তিনি যাকে দেখেন তাকেই জিজ্ঞাসা করেন,—তোমরা কি মথুরা থেকে আসছ? তোমরা মথুরার লোক? কৃষ্ণ-বলরাম কেমন আছে? —বলতে বলতেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। আবার হয়তো বলে উঠেন, শোন, ঐ শিঙ্গা বাজে, বোধহয় অক্রূর এসেছেন। শচীমাতা এইভাবে কৃষ্ণবিরহ-সমুদ্রে ডুবে আছেন। তাঁর কিছু বাহ্যজ্ঞান নেই। এমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ এসে শচীমাতাকে প্রণাম করলেন। ভক্তগণ তাঁকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। শচীমাতা নিমাইকে স্মরণ করে আবার মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তবৃন্দ নিত্যানন্দের কাছে খবর পেয়ে কিঞ্চিৎ শান্ত হলেন। তিনি বললেন,—প্রভুর সঙ্গে দেখা করার জন্য তোমরা সকলে তাড়াতাড়ি চল, তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘরে আছেন। আমি তোমাদের নেবার জন্যই এসেছি। ভক্তগণ শুনে খুশি হলেন।

প্রভু যেদিন সন্ন্যাস নিতে গেছেন সেদিন থেকেই শচীমাতার উপোস চলছে। নিত্যানন্দ মাতাকে দেখে বড়ই দুঃখ পেলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—কৃষ্ণের রহস্য কেউ জানে না, আমি আর তোমাকে কি বলব? তুমি মনে মোটেই দুঃখ রেখোনা, স্বয়ং বেদও তোমার মত সৌভাগ্যের অধিকারী নয়। বেদ যাঁকে সর্বদা অন্বেষণ করে, তুমি তাঁর মা। তিনি বুকে হাত দিয়ে তোমার সব ভার নিয়েছেন। প্রভু নিজে বারে বারে তোমাকে বলেছেন যে তোমার সংসার এবং ধর্মের সব দায়িত্ব তাঁর। তোমার কিসে মঙ্গল হবে প্রভু তা বিলক্ষণ জানেন, তুমি তাঁর উপরে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। তুমি শীঘ্র গিয়ে কৃষ্ণের জন্য রান্না কর। তাতেই সব ভক্তগণের আনন্দ। সকলেই তোমার হাতের রান্না খেতে চায়। তোমার উপবাসে স্বয়ং কৃষ্ণই অভুক্ত থাকেন। তুমি

যে নিজে হাতে বেঁধে নৈবেদ্য কব, আমাবো তা খাবাব বড় ইচ্ছা। —নিত্যানন্দেব কথা শুনে শচীমাতা দুঃখ ভুলে গিযে বান্নাব জোগাড় কবতে লাগলেন। শচীমাতা কৃষ্ণকে নৈবেদ্য দিযে তাই নিত্যানন্দকে দিলেন এবং তাবপবে সকল বৈষ্ণবকে দিযে সকলেব পবে তিনি নিজে ভোজন কবলেন। ভক্তগণ খুব আনন্দ পেলেন। শচীমাতা আজ দীর্ঘ উপবাস ভঙ্গ কবলেন। তাবপব ভক্তগণ নিত্যানন্দেব সঙ্গে গিযে প্রভুব দর্শন পাবেন, এই ভাবলেন। নবদ্বীপেব লোকেবা এইভাবে খবব পেযে গেলেন যে প্রভু সন্ন্যাস নিযেছেন। তাঁব নতুন নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শুনে তাঁবা আনন্দিত হলেন। প্রভু ফুলিযাতে আছেন শুনে সকলে ফুলিযা যাবাব জন্য উদ্যোগ কবতে লাগলেন। নাবী-পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ সকলেই শ্রীহবিকে স্মবণ কবে আনন্দে চললেন প্রভুকে দেখবাব জন্য।

আগে যে সকল পাষণ্ডীবা প্রভুব নিন্দা কবেছে তাবাও এখন সপবিবাবে চলল প্রভুকে দেখতে। তাবা এখন ভাবছে,—প্রভু গৃঢ়রূপে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ কবেছেন, তাঁব বিষযে ভাল কবে না জেনেই তাকে কত নিন্দা কবেছি। এখন গিযে তাঁব চবণে শবণ নিলে হযতো আমাদেব সেসব পাপ খণ্ডন হবে। — এই সব ভেবে বহুলোক তাঁকে দেখতে ছুটে চলেছে। হাজাবে হাজাবে লোক এসে খেযাঘাটে হাজিব হযেছে, মাঝি পড়েছে বিপদে। তখন কেউ কলসী নিযে সাঁতাব দিল, কেউ কলাগাছ দিযে ভেলা কবল। অসংখ্য লোক এসে উপস্থিত হযেছে, যে যেভাবে পাবছে নদী পাব হবাব চেষ্টা কবছে। একেকটি নৌকাতে বেশি লোক হওযাব ফলে নৌকা মাঝনদীতে গিযে ডুবে গেল। লোকে 'হবিবোল' বলে আবাব সাঁতবাতে থাকে, তবু কেউ কষ্ট মনে কবে না, পিছপা হয না। তাদেব মনে এমনই আনন্দ, মনে হচ্ছে যেন তাবা আনন্দসাগবে ভাসছে। যে সাঁতাব কাটতে জানে না, সেও ভেসে ভেসে চলেছে, ঈশ্ববেচ্ছায তাবা অনাযাসে কূলে পৌঁছে যায। কত দিক দিযে যে কত লোক পাব হচ্ছে তাব কোন ইযত্তা নেই। চাবদিক থেকেই কেবল হবিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘবদুযাব, শোক— সব ভুলে লোকেবা চলেছে আনন্দ-কোলাহল কবতে কবতে। হবিধ্বনি কবতে কবতে সকলে এসে ফুলিযাতে পৌঁছে গেল। হবিধ্বনিব উচ্চ শব্দ শুনে সন্ন্যাসী-শিবোমণি বাইবে এলেন। কি অপূর্ব শোভা তা বলে শেষ কবা যায না। মনে হচ্ছে যেন কোটি চন্দ্র একসঙ্গে উদিত হযেছে। তাঁব মুখে সর্বদা 'হবেকৃষ্ণ' নাম, বলতে বলতে আনন্দধাবা ঝবছে। চাবদিক থেকে লোকেবা দণ্ডবৎ কবছে। কে যে কাব ঘাড়ে পড়ছে তাব কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। পথেব কাঁটা ঝোপ-ঝাড়কেও লোকেবা কিছু মনে কবছে না, তাব মধ্যেই প্রভুকে প্রণাম জানাচ্ছে, দণ্ডবৎ কবছে। সকলেই হাত তুলে প্রভুব কাছে আর্তি জানাচ্ছে,—ত্রাণ কব, বক্ষা কব, প্রভু। হাজাব হাজাব লোক এসে গ্রাম, মাঠ, পথঘাট সব ভবে গিযেছে। নানা গ্রাম থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল। কেউ আব ঘবে ফিবছে না, সকলেই একবাব প্রভুব মুখখানা দেখতে চায। ফুলিযা গ্রামে এভাবে লোকে লোকাবণ্য হযে গেল। এবং প্রভুব শ্রীমুখ দেখে সকলেই ভেতবে-বাইবে পবিপূর্ণ তৃপ্ত হলেন। তাবপব প্রভু সকলেব প্রতি কৃপাদৃষ্টি কবে শান্তিপুবে অদ্বৈতাচার্যেব বাড়িব দিকে চললেন।

অদ্বৈত নিজেব প্রাণনাথকে দেখে পাদপদ্মে দণ্ডবৎ হযে পড়লেন। আর্তনাদ কবে তিনি কাঁদতে লাগলেন, কিছুতেই শ্রীচবণ ছাড়ছেন না, তিনি দুহাত দিযে জড়িযে ধবে বযেছেন। প্রেমাশ্রুতে সিক্ত হলেন। কিছু সময পবে প্রভু স্থিব হযে বসলেন এবং অদ্বৈতভবন আনন্দে ভবে গেল। অদ্বৈতেব ন্যাংটো ছেলে, শিশু অচ্যুতানন্দ, জ্যোতির্ময চেহাবা।

জ্ঞানী ছেলে। অদ্বৈতাচার্যেব অত্যন্ত উপযুক্ত পুত্র। গায়ে ধূলা লেগে আছে, খেলা ছেড়েই চলে এসেছে। প্রভু এসেছেন শুনে তাঁকে দেখতে এসেছে। এসেই শিশু গৌবচন্দ্রেব শ্রীচবণে পড়ল। ধূলিমাখা অবস্থায়ই প্রভু তাকে কোলে নিলেন। প্রভু তাকে বললেন,—অচ্যুত, আচার্য আমাব পিতৃতুল্য, সেই হিসেবে তুমি আমাব ভাই হও। অচ্যুতানন্দ তাব উত্তবে বললেন,—জগৎবাসীব সৌভাগ্যেব ফলে তুমি তাদেব বন্ধুরূপে জগতে জন্মগ্রহণ কবেছ। তোমাব পিতা যে কে বেদাদি শাস্ত্রেও তা লেখা নেই। প্রভু এবং ভক্তগণ সকলেই অচ্যুতেব কথায় হাসছেন, তাঁব কথা শুনে সকলেই মহা বিস্মিত হলেন। এসব কথা তো একজন সাধাবণ শিশুব হতে পাবে না। অদ্বৈতেব ঘবে কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ কবেছেন নিশ্চয়।

এমন সময় ভক্তবৃন্দ সহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপ থেকে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রভুকে দেখে প্রভুব হবিধ্বনি কবতে থাকলেন। ভক্তবা দণ্ডবৎ হয়ে প্রভুব চবণ ধবে কাঁদতে থাকেন। প্রভু সকলকে একে একে তুলে আলিঙ্গন দান কবলেন, সকলেই প্রভুব নিজেব প্রাণেব সমান। তাঁবা আর্তনাদ কবে কাঁদছেন, সেই কান্না শুনে সাবা পৃথিবী পবিত্র হচ্ছে। ভক্তদেব কৃষ্ণপ্রেমানন্দেব কান্না শুনলে সমস্ত সংসাববন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। এমন প্রেমানন্দ শ্রীচৈতন্যেব কৃপাতেই ব্যক্ত হয়েছে পৃথিবীতে, ব্রহ্মাব দুর্লভ বস্তু যে সে উপভোগ কবছে। ভক্তগণকে দেখে প্রভু স্বীয় কৃষ্ণস্বরূপ-বিষয়ক প্রেমানন্দে নৃত্য আবম্ভ কবে দিয়েছেন। ভক্তগণও তৎক্ষণাৎ কীর্তন আবম্ভ কবে দিলেন। প্রভু ঘন ঘন কেবল 'বোল বোল' বলে গর্জন কবে উঠছেন। নিত্যানন্দ তাকে ধবে তাব সঙ্গে সঙ্গে ঘুবছেন, অদ্বৈত অলক্ষিতে প্রভুব পদধূলি নিলেন। প্রভুব অঙ্গে এখন অশ্রু, কম্প, পুলক, হুঙ্কাব, অট্টহাস্য এসব অদ্ভুত ভাব প্রকাশিত হচ্ছে। প্রভুব হস্ত-পদাদি চালনা সবই অত্যন্ত মধুব মহিমা প্রকাশ কবছে। তিনি আনন্দে বাহুতুলে 'হবি হবি' বলছেন, সেই প্রেম-মাধুবীব কথা বলে প্রকাশ কবা যাবে না। সেই বসময় নৃত্য অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপাব। ভক্তগণ তা দেখে পবমানন্দে মগ্ন হচ্ছেন। ভক্তগণ প্রভুকে হাবিয়ে ফেলেছিলেন, তিনি আবাব এসে নিজেই দর্শন দিলেন। তাই সকলে মহা আনন্দে নিমজ্জিত হয়েছেন, প্রভুকে ঘিবে উল্লাসে নৃত্য কবে চলেছেন। কেউ কাবো গায়ে পড়ছেন, কেউবা অন্যকে ধবছেন, বুকে টেনে নিচ্ছেন, পায়ে পড়ছেন। অন্যকে ধবে কাঁদছেন,—কে কি বলবে, কোনো দিকে হুঁশ নেই, প্রেমানন্দে ভেসে চলেছেন। পার্ষদগণকে নিয়ে স্বয়ং বৈকুণ্ঠপতি নৃত্য কবছেন, পৃথিবীতে এমন অপূর্ব ঘটনা আব কখনো ঘটে নি। 'হবি বোল হবি বোল হবি বোল ভাই।' —এ ছাড়া আব কোন কথাই শোনা যাচ্ছে না। অদ্বৈতভবনে সেদিন কেমন আনন্দ হয়েছিল তা একমাত্র অনন্তদেবই জানেন। প্রভু প্রত্যেক বৈষ্ণবকে ধবে ধবে আলিঙ্গন কবলেন। ভগবানেব আলিঙ্গন লাভ কবে ভক্তগণ বিশেষ আনন্দে মত্ত হয়ে পড়েন। হবিধ্বনি কবে উঠছেন সকলে মত্ত, আনন্দে আত্মহাবা হয়ে যাচ্ছেন ভক্তগণ। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে প্রভু নাচছেন, পদভবে বসুমতী টলমল কবছে। নিত্যানন্দ প্রভুকে ঘিবে বয়েছেন যাতে তিনি পড়ে না যান। অদ্বৈত তাব আনন্দে হুঙ্কাব কবে নাচছেন, যে যাঁব পাবছেন পায়েব ধুলো নিচ্ছেন। নৃত্য গীত বিলাসেব প্রকাশে চাবদিক আনন্দে ভবে গেল।

প্রভু এবাবে শ্রীকৃষ্ণভাবে বিষ্ণুব সিংহাসনে বসলেন। সকলে চাবদিকে জোড়হাত কবে বয়েছেন। প্রভু নিজতত্ত্ব প্রকাশ কবতে লাগলেন অর্জুন কহেছেন,—আমি কৃষ্ণ,

রাম, নারায়ণ। আমিই মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, হয়গ্রীব, মহেশ্বর, বৌদ্ধ, কল্কি, হংস হলধর। আমি নীলাচলচন্দ্র, কপিল এবং নৃসিংহ। প্রাকৃত অপ্রাকৃত, দৃশ্য-অদৃশ্য সবই আমার চরণকমলের ভ্রমর। সমস্ত বেদ আমারই গুণগান করে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আমাকেই সেবা করে। ভক্তগণ ব্যতীত অপর সকলের পক্ষেই আমি কালস্বরূপ সংহারকর্তা, আমার স্মরণে সকল আপদ কেটে যায়। আমি দ্রৌপদীকে লজ্জা থেকে উদ্ধার করেছি, আমিই জতুগৃহে পঞ্চপাণ্ডবকে রক্ষা করেছি। বকাসুরকে বধ করে আমি শঙ্করকে রক্ষা করেছি, আমার সেবক গজেন্দ্রকে আমি রক্ষা করেছি। প্রহ্লাদকে বিপদ থেকে আমি উদ্ধার করেছি, ব্রজবাসী গোপগণকে আমি নানা আপদ থেকে রক্ষা করেছি। পূর্বে আমিই অমৃতমন্থন করেছি এবং অসুরদের বঞ্চিত করে দেবতাদের রক্ষা করেছি। আমার ভক্তদ্রোহী কংসকে আমি বধ করেছি, দুষ্ট রাবণকে আমি নির্বংশ করেছি। আমি বাম হাতে গোবর্ধন ধারণ করেছি, কালিয়নাগকে দমন করেছি। আমিই সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে পূজাধর্ম প্রচার করেছি। আমি যে কতবার অবতীর্ণ হয়েছি বেদও তা পুরো জানে না। এবারে এসেছি কীর্তন প্রচার করার জন্য। সমস্ত বেদ পুরাণ আমার অন্বেষণ করে, আমি কিন্তু সর্বদা ভক্তের আশ্রয়ে এবং ভক্তের আশ্রয়েই থাকি। ভক্ত ভিন্ন আমার আর কেউ নেই, ভক্তই আমার পিতা মাতা বন্ধু ভাই এবং পুত্র সবই। আমি স্বতন্ত্র হলেও ভক্তবশ্যতাই আমার স্বভাব। তোমরা আমার জন্মজন্মান্তরের, তোমাদের কারণেই আমার সমস্ত অবতার। আমার সত্যি কথা শুনে নাও, তোমাদের ছেড়ে এক নিমেষও আমি অন্য কোথাও থাকি না। প্রভু এইভাবে করুণা করে স্বীয় তত্ত্ব বললেন, শুনে ভক্তগণ উচ্চ রবে কাঁদতে লাগলেন। ভক্তগণ বারে বারে দণ্ডবৎ করে উঠে পড়ে আবার কাকুতি মিনতি করে কাঁদেন। অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে অপার আনন্দ হল, এমন আনন্দ সন্ন্যাসের আগে হয়েছিল নবদ্বীপে। ভক্তদের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়েছে, এতদিনে তাদের সব দুঃখ ঘুচে গেল। ভক্তের দুঃখ কি করে মোচন করতে হয় প্রভু তা ভালই জানেন। এমন প্রভুকে দুঃখী জীবেরা না ভজনা করে কি থাকতে পারে? করুণাসাগর গৌরচন্দ্র কারো দোষ বিচার করেন না, তিনি কেবলই সকলের গুণটুকু গ্রহণ করেন। একটু পরেই প্রভু ঐশ্বর্য সম্বরণ করে বাহ্যভাব প্রকাশ করে স্থির হলেন।

সকলকে নিয়ে এবারে তিনি গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন, স্নানের সময় নানা রকম জলক্রীড়াও করলেন। স্নান করে এসে তুলসীকে প্রদক্ষিণ করে জলদান করলেন। বিষ্ণুগৃহে বিগ্রহকে প্রদক্ষিণ এবং নমস্কার করে সকলকে নিয়ে প্রভু ভোজন করতে বসলেন। নিত্যানন্দকে নিয়ে গৌরহরি মাঝখানে বসলেন, আর সকলে চারদিকে ঘিরে বসলেন। প্রভুর সর্বাঙ্গে চন্দন, প্রভু বেশ আনন্দিত মনেই আছেন। ভক্তগণ চারদিকে ঘিরে বসে ভোজন করছেন। বৃন্দাবনে রাখাল বালকদের সঙ্গে, গোপগণের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম যেভাবে ভোজন করতেন এও ঠিক সে রকম হল। সে সব কথা সকলকে বলতে বলতে প্রভু আনন্দে ভোজন করছেন। এসব ঠিক মত বর্ণনা করা তো সম্ভব নয়, প্রভু কৃপা করে যাঁকে বলান, তিনিই বলতে পারবেন। প্রভু ভোজন করে উঠতেই ভক্তগণ শেষপাত্র লুটেপুটে খেয়ে নিলেন। বয়স্ক সম্ভ্রান্ত লোকদেরও সব শিশুদের মত ব্যবহার,—বিষ্ণুভক্তির এই ক্ষমতা। যে ভাগ্যবান লোক এসব কাহিনী শোনেন তিনি গৌরচন্দ্রকে লাভ করতে পারেন। প্রভুকে আবার ভক্তগণ-সঙ্গে ঐশ্বর্য-আবেশে কীর্তন করতে দেখা গেল। প্রভু যে সকল বৈষ্ণবদের সঙ্গে ভোজন করেছেন সে-কথা যে মন দিয়ে শুনবে তারও কৃষ্ণপ্রেম

লাভ হবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ জানেন যে তাঁদের পদপ্রান্তে গান করে চলেছেন শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর।

৩/২ দুষ্টদের ভয়ের কারণ, শিষ্টদের ত্রাণকর্তা, অনন্তদেব, ব্রহ্মা, শিব এবং লক্ষ্মীদেবীর ঈশ্বর, কৃপাসিন্ধু, সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রাণ গৌরচন্দ্রের জয় হোক, ভক্তগোষ্ঠী সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের জয় হোক। প্রভু, কৃপা কর যেন তোমাতেই মতি থাকে।

শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে অনেক লীলা প্রকাশ করলেন। প্রভু নিজের তত্ত্ব-কথা প্রকাশ করে ভক্তগণের সঙ্গে রাত কাটিয়ে দিলেন। রাত শেষ হয়ে গেলে নিত্যকৃত্য সেরে এসে বসলেন, ভক্তগণও তাঁকে ঘিরে রইলেন আবার। প্রভু বললেন,—আমি নীলাচলে চললাম, তোমরা দুঃখ করো না। জগন্নাথ দর্শন করে আবার তোমাদের সঙ্গে থাকব। তোমরা মনের আনন্দে বাড়িতে গিয়ে কীর্তন কর, তোমরা জন্মে জন্মেই আমার জীবনস্বরূপ। ভক্তগণ বললেন,—প্রভু তোমার ইচ্ছায় তো কেউ বাধা দিতে পারবে না। তবু বলছি, এখন উড়িষ্যায় গণ্ডগোল চলছে, এখন কেউ ওদিকে যায় না। দুই রাজার মধ্যে মাঝে মাঝেই লড়াই হচ্ছে, কখন কোথায় কি বিপদে পড়বে তার ঠিক নেই। যুদ্ধ থেমে গেলে তারপরে যেয়ো। প্রভু বললেন,—যা-ই উৎপাত হোক আমি যাবই। অদ্বৈতাচার্য বুঝতে পারলেন যে প্রভু নীলাচলে না গিয়ে ছাড়বেন না। তিনি হাত জোড় করে বললেন,—তোমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। বিপদ হচ্ছে তোমার দাসের দাস, কে তোমার বিপদ ঘটাবে? তুমি নীলাচল যাওয়া মনস্থ করেছ, অবশ্যই তুমি যাবে। —অদ্বৈতের কথা শুনে প্রভু খুশি হলেন এবং নীলাচলের দিকে শুভ যাত্রা করলেন। প্রভু দ্রুত গতিতে হেঁটে চলেছেন, ভক্তগণকে প্রবোধ দিয়ে মধুর ভাবে বললেন,—তোমরা কেউ মনে দুঃখ ক'রো না। তোমাদের কিছুতেই আমি ছাড়তে পারব না। তোমরা ঘরে বসে হরিনাম কর, আমি কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসব। —এই বলে মহাপ্রভু প্রত্যেক বৈষ্ণবকে ধরে ধরে আলিঙ্গন করলেন। প্রভুর নয়নজলে ভিজে গিয়ে ভক্তরা আরো কাঁদতে থাকেন। প্রভু তখন আবার সকলকে প্রবোধ দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলতে থাকলেন। প্রেমে সব ভক্তগণ কেঁদে কেঁদে আছাড়ে পড়ছেন কেবলই। কৃষ্ণ মথুরা চলে গেলে গোপীগণ যেমন মহা শোক-সমুদ্রে পড়েছিলেন, ভক্তগণের অবস্থাও তেমনি হল। প্রভু সেই শ্রীকৃষ্ণই, প্রভুর ভক্তগণও সেই গোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে গোপীগণ যেমন দুঃখ পেয়েছিলেন, এখন প্রভু নীলাচলে যাত্রা করলে ভক্তগণও তেমনি দুঃখ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা না হলে বিষ খেয়েও মানুষ মরে না, অমৃত পান করেও বাঁচে না, শ্রীকৃষ্ণ যা মনে করেন, তাঁর ইচ্ছায় তাই হয়। কৃষ্ণ যাকে ইচ্ছা রাখেন, যাকে ইচ্ছা মারেন, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হবার উপায় নেই।

নিজের আনন্দে গৌরসুন্দর নীলাচলে চলে এলেন। সঙ্গে আছেন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ। পথে প্রভু সকলকে পরীক্ষা করবার জন্য বললেন,—কার সঙ্গে কি আছে বল, পথের জন্য কে কি দিয়েছে? আমাকে সব খুলে বল। সকলে উত্তর করলেন,—প্রভু, তোমার আদেশ না নিয়ে আমরা অন্যের জিনিস নেব কেন? প্রভু শুনে খুব খুশি হলেন এবং বুঝিয়ে বললেন,—তোমরা যে কারো কাছ থেকে কিছু নাও নি, তাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। বনে এলেও মানুষের কপালে যা থাকবে তা ঠিকই জুটে যাবে। ভগবান যদি না দেখেন তা হলে রাজপুত্রও

অনাহারে থাকবে। খাবার জিনিস জোগাড় থাকলেও অনেক সময় খাওয়া যায় না, হয়তো কারো সঙ্গে হঠাৎ ঝগড়াই লেগে যায়। রাগ করে 'ভাত খাব না' বলে মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে বসে থাকে। অথবা সব খাবারেব জিনিস জোগাড আছে কিন্তু শরীরে জ্বর এসে গেল। অসুখের মধ্যে খাওয়া চলে না, তাই দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কিছু হবার উপায় নেই। ত্রিভুবনে সকল স্থানেই ভগবান উপযুক্ত খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে যে-কোন জায়গাতেই খাবাব জুটে যায়। —প্রভু এই কথা বলে সকলকে উপদেশ করলেন, এতে যে বিশ্বাস বাখতে পাবে সেই সুখী হতে পাবে। যত চেষ্টাই করা যাক, ঈশ্বরেব ইচ্ছা হলেই তবে ফল পাওয়া যাবে।

এই সব আলোচনা করতে কবতে প্রভু আটিসাবা গ্রামে এসে পৌঁছলেন। মহা ভাগ্যবান অনন্ত সাধু সেখানে থাকতেন। প্রভু এসে তাঁব বাড়িতেই থাকলেন। তাঁব অসম্ভব ভাগ্য। পরম উদাব অনন্ত পণ্ডিত প্রভুকে পেয়ে আনন্দে আত্মহাবা হয়ে গেলেন। স্বয়ং ভগবান এসে অতিথি হয়েছেন, তাই মহানন্দে তিনি ভোজনেব ব্যবস্থা কবতে লাগলেন। সকল সঙ্গীগণকে নিয়ে প্রভু ভোজন কবলেন এবং তিনি সকলকে এই কথাই শিক্ষা দিলেন যে সন্ন্যাসীব পক্ষে কিছুই আগে থেকে সংগ্রহ কবতে নেই, যখন যা জোটে তাতেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এই হচ্ছে সন্ন্যাসীব ভিক্ষা-ধর্ম। প্রভু অনন্ত পণ্ডিতেব বাড়িতে সাবা রাত কৃষ্ণকথা আলাপ কবে কাটিয়ে দিলেন। প্রভু প্রভাতে অনন্ত পণ্ডিতকে আশীর্বাদ কবে 'হরি' বলে আবাব চললেন। গঙ্গাব পাব ধবে হাঁটতে হাঁটতে প্রভু ছত্রভোগ গ্রামে চলে এলেন। ছত্রভোগেব কাছেই গঙ্গা শতমুখ ধাবণ করেছে। গঙ্গাতীরেব কাছে, ঘাটেব পাশে জলেব মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে, লোকেবা বলে 'অম্বুলিঙ্গঘাট'।

শিব কেন অম্বুলিঙ্গ হলেন, তা বলা হচ্ছে। মন দিয়ে শোনা প্রয়োজন। পূর্বকালে বংশ-উদ্ধাব কবাব জন্য ভগীরথ আরাধনা করে গঙ্গাকে এনেছিলেন। শিব গঙ্গাব বিরহে বিহ্বল হয়ে তাঁকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিলেন, শেষে ছত্রভোগে তাঁকে পেয়ে শিব গঙ্গার প্রেমে মত্ত হয়ে গেলেন। গঙ্গাকে দেখা মাত্র শিব ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে মিশে গেলেন। জগন্মাতা জাহ্নবীও শঙ্করকে দেখে ভক্তিভবে বড় কবে পূজা করলেন। শিব গঙ্গাভক্তিব মহিমা এবং গঙ্গা শিবভক্তিব মহিমা যথেষ্ট জানেন। গঙ্গাজল স্পর্শ করে শিব জলময় হলেন এবং গঙ্গা শিবকে পেয়ে বিনয়-ব্যবহাব কবলেন। জলরূপে শিব সেখানে থেকে গেলেন, সেই থেকে লোকে 'অম্বুলিঙ্গ ঘাট' বলে। গঙ্গা ও শিবেব প্রভাবে ছত্রভোগ গ্রাম মহাতীর্থ হয়ে গেল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রেব চবণ-বিহারেব ফলে স্থানটি আবো বিশেষ মহিমা লাভ কবল।

প্রভু ছত্রভোগে গিয়ে কাছেই অম্বুলিঙ্গ ঘাট দেখলেন। তিনি আনন্দে হরিধ্বনি করে উঠলেন দেখে। প্রভু হুঙ্কারে কোলাহলে নিত্যানন্দকে নিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লেন, ভক্তগণ হরি হরি বলে জয়ধ্বনি করে উঠলেন। প্রভু সকলকে নিয়ে আনন্দ-আবেশে সেই ঘাটে চান কবলেন। অনেক কৌতুক করে প্রভু স্নান কবলেন, বেদব্যাস ভবিষ্যতে তা পুরাণে লিখে বাখবেন। প্রভু চান করে তীরে উঠলেন কিন্তু যে বস্ত্রই পবছেন অমনি তা প্রেমাশ্রুতে ভিজে যাচ্ছে। এখানে গঙ্গা শতধাবা হয়েছেন, আর প্রভুব নয়ন থেকেও শতধাবা বইছে। মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের এই অপূর্ব প্রেমক্রন্দন দেখে ভক্তগণ আনন্দে অধীব হয়ে পড়েছেন। সেই গ্রামের জমিদার রামচন্দ্র খান বিষয়ী লোক হলেও মহা ভাগ্যবান। তা না হলে প্রভুর সঙ্গে তাঁর হঠাৎ কেনই বা দেখা হবে। প্রভুর তেজ দেখে তিনি ভয়ে দোলা থেকে

নেমে পড়লেন। তিনি প্রভুকে দণ্ডবৎ কবলেন কিন্তু প্রভু প্রেমানন্দ-জলে নিমগ্ন, বাহ্যজ্ঞান কিছু নেই। প্রভু 'হা জগন্নাথ' বলে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি কবছেন, কাঁদছেন। প্রভুব আর্তি দেখে সজ্জন বামচন্দ্র খানেব অন্তব বিদীর্ণ হযে গেল। তিনি কেঁদে কেঁদে ভাবছেন,—কি কবে প্রভুব আর্তি সম্ববণ হতে পাবে। প্রভুব কান্না দেখে কাষ্ঠ কিম্বা পাথব পর্যন্ত গলে যাবে—এমন অবস্থা। প্রভু এবাবে কিছু স্থিব হযে বামচন্দ্র খানকে জিজ্ঞাসা কবলেন,—তুমি কে? তিনি সম্ভ্রমে কবজোড কবে বললেন,—প্রভু, আমি তোমাব দাসানুদাস। উপস্থিত সব লোকেবা প্রভুকে জানালেন,—ইনিই দক্ষিণ বাজ্যেব জমিদাব। তখন প্রভু বললেন,—ভালই হলো, এখন বল, কি কবে তাডাতাড়ি নীলাচলে যে- পাবি? প্রভু 'নীলাচলচন্দ্র' কথাটি বলতে বলতে আনন্দাশ্রুতে ভেসে গিযে মাটিতে পডে গেলেন। বামচন্দ্র খান বললেন,—প্রভু, তোমাব আজ্ঞা পালন কবাই আমাব একমাত্র কর্তব্য কিন্তু এখন সময বড খাবাপ, দুই দেশেব মধ্যে পথ এখন বন্ধ আছে। মাঝে মাঝে ত্রিশূল পোঁতা বযেছে। কাউকে হাঁটতে-চলতে দেখলেই বাজকর্মচাবীবা তাকে গোযেন্দা ভেবে বধ কবে ফেলে। তোমাকে পাঠাতে তাই ভয পাচ্ছি। আমিও বাজকর্মচাবী, আমাকে ধবতে পাবলে প্রাণে মাববে। তবু যেভাবেই হোক, তোমাব আজ্ঞা অবশ্যই পালন কবব। তুমি যদি আমাকে তোমাব সেবক বলে মনে কব তবে সকলকে নিযে আজ এখানে ভোজন কব। আমাব জাত যাক, ধন প্রাণ যাক, যেভাবেই হোক, আজ বাতে তোমাকে পাঠাবাব ব্যবস্থা কববই। প্রভু এ কথা শুনে খুশ হযে তাঁব প্রতি মাঙ্গলিক দৃষ্টিতে তাকালেন। প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ কবে এক ব্রাহ্মণেব বাড়িতে বাত কাটালেন। ব্রাহ্মণ যেন হাতে হাতে তাঁব সৎকর্মেব ফল পেলেন প্রভুব উপস্থিতিতে। অত্যন্ত ভক্তিব সঙ্গে প্রভুত যত্নে বিপ্র প্রভুব জন্য বান্না কবলেন। প্রভু নামমাত্রই ভোজন কবলেন। তিনি নিজস্বরূপে আবিষ্ট আছেন। প্রিযবর্গেব সন্তোষার্থে প্রভু কিছু ভোজন কবলেন। পাবমার্থিক আনন্দই প্রভুব ভোজন। সেই আনন্দেব আস্বাদনে প্রভুব ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না। প্রভু নীলাচলে যাত্রা কবেই নাম মাত্র ভোজন কবেন। জগন্নাথে তাঁব মন পডে বযেছে, তিনি বেহুঁশেব মত পথ হেঁটে চলেছেন। দিন বাত, পথ-ঘাট, জল স্থল, এপাব-ওপাব কিছুই জানতে পাবছেন না, তাঁব সঙ্গী প্রিযভক্তগণই তাঁব পাশে থেকে সর্বদা তাঁকে বক্ষা কবছেন। একমাত্র বেদব্যাস ব্যতীত প্রভুব এই আবেশেব বিষযে আব কেউ সঠিক বলতে পাববেন না। কৃষ্ণ কখন কিরূপে বিহাব কবেন তা কে বলতে পাবে? কেনই বা তাঁব এত আর্তি, কাব জন্যেই বা কাঁদছেন, এসবেব মর্ম একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দই জানেন। বৈকুণ্ঠপতি নিজবসে ডুবে নিজেব লীলাব খবব নিজেই জানেন না। প্রভু নিজেই জগন্নাথ; তবু জগন্নাথেব জন্য ভক্তি প্রদর্শন কবে তিনি জীবকে ভক্তি শিক্ষা দিচ্ছেন। প্রভু কৃপা কবে যদি লোকদেব বুঝিযে না দেন তবে লোকেবা জানবে কি কবে?

নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণকে নিযে প্রভু গিযে ভোজন কবতে বসলেন। গৌবহবি অল্পমাত্র ভোজন কবেই হুঙ্কাব কবে উঠলেন। প্রভু আচমন কবেই আবিষ্ট হযে পডে বাবে বাবে বলতে লাগলেন,—জগন্নাথ আব কতদূব? উপায না দেখে মুকুন্দ কীর্তন আবম্ভ কবলেন, প্রভুও উঠে নাচতে লাগলেন। ছত্রভোগেব লোকেবা বৈকুণ্ঠবিহাবীদেব নৃত্য দেখে তৃপ্ত হলেন। প্রভুব অশ্রু, কম্প, হুঙ্কাব, পুলক, স্তম্ভ, ঘর্ম দেখা দিল। এসব লক্ষণ কে বুঝতে পাবে? ভাদ্রমাসেব গঙ্গাব স্রোতেব মত প্রভুব প্রেমাশ্রুধাবা বইতে লাগল। প্রভু ঘুবে ঘুবে নাচছেন, তাঁব চোখেব জলে লোকেবা একেবাবে ভিজে গেল। এই হচ্ছে

প্রেমময় অবতার,—শ্রীরাধার প্রেমসম্পত্তিযুক্ত ভগবৎ-স্বরূপ। শ্রীচৈতন্যব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যেই এই প্রেমশক্তি নেই, থাকতেও পারে না। এভাবে রাতের তিন প্রহর কেটে গেলে প্রভু স্থির হলেন। লোকেদের মনে হলো যেন সবে সন্ধ্যা হয়েছে, তেমন কিছু রাত হয় নি, কোথা দিয়ে সময় কেটে গেছে কেউ টের পায় নি। শ্রীচৈতন্যের কৃপায় সকলেই দুর্লভ ব্রজপ্রেম লাভ করে সংসারবন্ধন থেকে উদ্ধার পেলেন। এমন সময় রামচন্দ্র খান এসে জানালেন,—নৌকা ঘাটে এসে গেছে। প্রভু 'হরি' বলে গিয়ে নৌকায় উঠলেন। সকলকে আশীর্বাদ করে প্রভু নীলাচলে-স্বস্থানে চললেন। প্রভুর আদেশে মুকুন্দ নৌকায় বসে 'নৌকাবিলাস' গাইতে লাগলেন। মাঝি আপত্তি করে বলে উঠল,—বুঝতে পেরেছি, আজ আর প্রাণে বাঁচব না। জলে থাকলে কুমীরে খাবে, ডাঙ্গায় উঠলে বাঘের পেটে যেতে হবে। নৌকাপথে ডাকাতরা ঘুরে বেড়ায়, এবার পেলে ধনেপ্রাণে শেষ করে দেবে। তাই বলছি, উড়িষ্যায় পৌঁছান পর্যন্ত তোমরা একটু চুপ করে থাক। মাঝির কথায় সকলেই ভয় পেল, কিন্তু প্রভু প্রেমাশ্রুতে ভেসে যাচ্ছেন। হঠাৎ প্রভু হুঙ্কার করে বলে উঠলেন,—কাকে ভয় পাচ্ছ? দেখছ না সামনে সুদর্শনচক্র ঘুরছে, বৈষ্ণবগণকে রক্ষা করাই এর কাজ। দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কৃষ্ণনাম কর, দেখছ না,—সুদর্শনচক্র ঘুরছে।—প্রভুর কথায় ভক্তগণ মহানন্দে কীর্তন করতে লাগলেন। এই উপলক্ষে প্রভু সকলকে বললেন,—সুদর্শন সর্বদা ভক্তবৃন্দকে রক্ষা করে। যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবদের নিন্দা করে সে সুদর্শনের জ্বালায় পুড়ে মরে। বিষ্ণুচক্র সুদর্শন থাকতে কেউ ভক্তদের অনিষ্ট করতে পারবে না। —শ্রীগৌরচন্দ্রের এই গোপন-বার্তা তাঁর কৃপা হলেই জানতে পারা যায়।

কীর্তন করতে করতেই তিনি এসে শ্রীউৎকলদেশে প্রবেশ করলেন। নৌকা প্রয়াগঘাটে পৌঁছে গেল, প্রভু তটে উঠলেন। তিনি এবারে উড়িষ্যায় প্রবেশ করলেন, খবর পেয়ে সকলেই প্রেমানন্দে ভাসতে লাগলেন। গঙ্গাকে প্রণাম করে গঙ্গার ঘাটে সকলকে নিয়ে প্রভু স্নান করলেন। সেখানে যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহেশ আছেন, প্রভু তাঁকে নমস্কার করলেন। উড়িষ্যায় প্রবেশ করে সঙ্গীরাও সকলেই আনন্দিত হলেন। সঙ্গীদের সকলকে একটি মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়ে রেখে প্রভু ভিক্ষায় বেরোলেন। তিনি যার দরজায় গিয়ে উপস্থিত হন অমনি সেই গৃহস্থ তাঁকে দেখে মোহিত হয়ে যান,—এমনই তাঁর রূপামৃত। শ্রীগৌরসুন্দর আঁচল পাতেন, লোকেরা যথাসাধ্য সত্বর তাঁর আঁচল ভরে দেন। যাঁর ঘরে যত ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য আছে, সকলেই এনে দিচ্ছেন। লক্ষ্মীরূপে অন্নপূর্ণাই তাঁর পাদপদ্মে স্থান চান, সেই প্রভু সন্ন্যাসী হয়ে লোকেদের ঘরে ঘরে গিয়ে ভিক্ষা চেয়ে তাদের জীবন ধন্য করে দিলেন। প্রভু ভিক্ষা করে ভক্তগণের কাছে চলে এলেন খুশি হয়ে। এত খাবার জিনিস জোগাড় হয়েছে দেখে ভক্তগণ বললেন,—প্রভু, সত্যি তুমি আমাদের সকলকে পালন-পোষণ করতে পারবে দেখছি। জগদানন্দ খুশি হয়েই রান্না করলেন, সকলের সঙ্গে প্রভু ভোজন করলেন। সারা রাত সেই গ্রামে কীর্তন করে কাটিয়ে ভোরবেলা প্রভু আবার চলতে লাগলেন।

কিছু দূর যেতেই দুরাচার রাজকর্মী মাশুলের জন্য সকলকে আটকে রাখল। মাশুল-আদায়কারীর প্রভুর দিকে নজর পড়তেই তাঁর তেজোদ্দীপ্ত ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—এরা কি সকলেই তোমার সঙ্গের লোক? প্রভু জানালেন,—জগতে আমার কেউ নয়, আমি কারো নই। আমি একা, দ্বিতীয় কেউ নেই। —বলতে বলতে

প্রভু প্রেমাশ্রুতে ভেসে যান। মাশুলের লোকটি বললে,—কর্তা, তুমি যাও। এদের মাশুল পেলে তবে ছাড়ব। প্রভু 'গোবিন্দ' বলে চলে গেলেন। সকলকে ছেড়ে কিছুদূর গিয়ে তিনি বসলেন। সঙ্গীগণ আনন্দে এবং দুঃখে সেখানে রয়ে গেলেন। প্রভুর এই নিরপেক্ষ ব্যবহার দেখে তাঁরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে লাগলেন। প্রভু যদি এখন সকলকে ছেড়ে চলে যান,—এই কথা ভেবে তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। শ্রীনিত্যানন্দ সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—কোন চিন্তা ক'রো না। তিনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না। মাশুল আদায়কারী বললে,—তোমরা তো সন্ন্যাসীর সঙ্গের লোক নও। তোমরা তোমাদের মাশুল আমাকে চুকিয়ে দাও। —প্রভু দূরেই রয়েছেন, তিনি সব সঙ্গীদের ছেড়ে মাথা হেঁট করে বসে কাঁদছেন। সেই কান্না শুনে কাঠ এবং পাথর পর্যন্ত গলে যায়। মাশুলের লোকটি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবছে,—এই লোকটি কখনো মনুষ্য নয়। মানুষের চোখে কি কখনো এত জল থাকে? সে প্রণাম করে সকলকে জিজ্ঞাসা করে,—তোমরা কে, কার লোক, খুলে বল তো দেখি! সকলে মিলে বললেন,—ইনিই সকলের ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম শুনেছ তো? আমরা সবাই এঁর ভক্ত। —বলতে বলতে সকলের চোখ দিয়ে জল বয়ে পড়তে লাগল। মাশুলকর্মী সকলের এই প্রেমভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁরও দু-চোখ বেয়ে পানি ঝরতে লাগল। তিনি তখন প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ হয়ে বিনীত ভাবে বললেন,—কোটি জন্মের পুণ্যের ফলে তোমার দর্শন পেয়েছি আজ। দয়ার সাগর, আমার অপরাধ নিও না, শীঘ্র নীলাচল চলে যাও। মাশুল আদায়কারীকে আশীর্বাদ করে প্রভু 'হরি' বলে আবার চললেন। বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচারদের বাদ দিয়ে প্রভু সকলকেই উদ্ধার করবেন। চৈতন্যের গুণনামে অসুর পর্যন্ত ভাল হয়ে গেল, অতীব দুষ্কৃতি পাপীরাই কেবল মানল না। এই ভাবে প্রভু সকলকে আশীর্বাদ করে নীলাচলে চললেন। দিনরাত প্রেমরস পান করে বিহ্বল হয়ে আছেন, নিজপ্রেমের আনন্দে তিনি অস্থির, পথ দেখতেও পান না।

কয়েক দিনের মধ্যেই প্রভু সুবর্ণরেখার তীরে এসে পৌঁছলেন এবং সুবর্ণরেখা নদীর নির্মল জলে সকল বৈষ্ণবগণকে নিয়ে তিনি স্নান করলেন। সুবর্ণরেখাকে ধন্য করে তিনি আবার চললেন সামনের দিকে। নিত্যানন্দ এখন অনেক পেছনে পড়ে গেছেন, শুধু জগদানন্দ সঙ্গী আছেন। কিছুদূরে গিয়ে প্রভু নিত্যানন্দের জন্য অপেক্ষা করলেন। নিত্যানন্দ এদিকে চৈতন্য-আবেশে সব সময়ই বিহ্বল হয়ে থাকেন। তিনি কখনো হুঙ্কার-গর্জন-অট্টহাস্য করেন আবার কখনো বা কাঁদতে থাকেন। কখনো নদীতে ঝাঁপিয়ে সাঁতার কাটেন আবার কখনো সারা গায়ে ধুলো মেখে বসে থাকেন। আবার এমন আছাড়ে পড়েন, মনে হয় যেন সারা শরীর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। কখনো নিজে নিজেই নাচতে থাকেন, নাচের চাপে পৃথিবী টলমল করে। অনন্তদেব বলরামই নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে এসব কিছুই অসম্ভব নয়।

নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বাস করেন তিনি নিত্যানন্দকৃপায় অপূর্ব প্রেমবিহ্বলতা লাভ করতে পারেন। শ্রীনিত্যানন্দকে এক স্থানে বসতে বলে জগদানন্দ পণ্ডিত ভিক্ষায় বেরোলেন। ঠাকুরের দণ্ডটিও জগদানন্দ নিত্যানন্দের কাছে রেখে দিলেন এবং বললেন,—আমি ভিক্ষা করে শীঘ্রই ফিরে আসব, তুমি প্রভুর দণ্ডটির দিকে লক্ষ্য রেখ। শ্রীনিত্যানন্দ দণ্ডটি ধরে সেখানে বসলেন। তিনি দণ্ডের কথা আলাপ করতে আরম্ভ করলেন,—ওরে দণ্ড, আমি যাঁকে হৃদয়ে বহন করি, সে তোমাকে অন্তরে বহন করবে,

এতো আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। —এই বলে বলরাম দণ্ডটি তিন টুকরো করে ভেঙ্গে ফেললেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা ঈশ্বরই জানেন। তিনি কেন-যে দণ্ডটি ভাঙলেন তা বোঝা বড়ই মুস্কিল। নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের অন্তরের কথা জানেন, গৌরচন্দ্র আবার নিত্যানন্দকে ভাল জানেন। ত্রেতাযুগে যেমন দুইভাই রাম-লক্ষ্মণ দুজন-দুজনকে আন্তরিক ভাবে জানতেন এও তেমনি। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ তত্ত্বত একই বস্তু, জগতের জীবকে ভক্তির রহস্য জানাবার জন্য দুই রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। বলরাম ব্যতীত অন্য কে পারবে চৈতন্যের দণ্ড ভাঙতে? গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ কর্তৃক দণ্ড ভাঙ্গার দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁরা উভয়েই উভয়কে প্রকৃষ্ট ভাবে জানেন। এই মর্ম যে জানে সে সুখে পার হয়ে যেতে পারে। নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ড ভেঙ্গে বসে আছেন, খানিক পরেই জগদানন্দ এলেন। তিনি ভাঙা দণ্ড দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কে দণ্ড ভাঙ্গল? নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন,—যিনি দণ্ড ধারণ করেন তিনিই ভেঙ্গেছেন। প্রভু নিজের দণ্ড নিজেই ভেঙ্গেছেন, তার দণ্ড কি অন্য কেউ ভাঙ্গতে পারে? পণ্ডিত এই কথা শুনে কোন উত্তর না দিয়ে ভাঙ্গা দণ্ড নিয়ে চলে গেলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সামনে তিনি ভাঙ্গা দণ্ডটি রাখলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—দণ্ড কি করে ভাঙ্গল? পথে কি কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করেছ নাকি? শ্রীনিত্যানন্দই যে প্রভুর দণ্ডটি ভেঙ্গেছেন জগদানন্দ পণ্ডিত তা সবই বিস্তারিত প্রভুকে জানালেন। তখন প্রভু নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন,— দণ্ড কেন ভেঙ্গেছ বল দেখি। নিত্যানন্দ জানালেন, - একখানি বাঁশ মাত্র ভেঙ্গেছি, তা যদি ক্ষমা করতে না পার তবে উপযুক্ত শাস্তি দাও। প্রভু বললেন, - সন্ন্যাসীর দণ্ডে সর্বদেবের অধিষ্ঠান, তোমার কাছে সেটা কি কেবল মাত্র এক খণ্ড বাঁশ? গৌরসুন্দরের লীলা কে বুঝতে পারবে? তিনি মনে এক রকম ভাবেন আর প্রকাশ করেন অন্যভাবে। যে ব্যক্তি বলে যে, আমি শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলা সবই জানি, মনে করবে সেই আসল নির্বোধ। তিনি যাকে মারলেন, তার প্রতিও বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, তাকে তিনি ভালবাসেন। আবার যাদের তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসেন, বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, তাঁদের প্রতি তিনি মমতাবর্জিত, নিরপেক্ষ। প্রভুর এই অচিন্ত্য লীলা একমাত্র তাঁর অনুগ্রহে তাঁর কৃপাপাত্ররাই বুঝতে পারেন। নিত্যানন্দের দ্বারা দণ্ড ভাঙ্গিয়ে গৌরহরি শেষে আবার নিত্যানন্দের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন, —আমার একমাত্র সম্বলের মধ্যে ছিল একটি দণ্ড, তাও আজ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ভাঙ্গল। তাই বলছি, তোমাদের কারো সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার সঙ্গে তোমরা কেউ যাবে না, হয় তোমরা আগে আগে যাও, না হয় আমাকে একলা আগে যেতে দাও। মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। শেষে মুকুন্দ বললেন, প্রভু, তুমিই আগে যাও। আমাদের কিছু কাজ আছে, আমরা পরে যাচ্ছি। এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে প্রভু মত্ত সিংহের মত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললেন। তাঁকে আর দেখাও যাচ্ছে না।

অল্প সময়ের মধ্যেই প্রভু জলেশ্বর গ্রামে গিয়ে জলেশ্বরদেবের মন্দিরে উপস্থিত হলেন। পূজারি ব্রাহ্মণগণ গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-মাল্যাদি দিয়ে পূজা করছেন। নাচ গান বাজনা হচ্ছে, নানা কোলাহলের মধ্যেও মঙ্গলধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। এসব দেখে প্রভু রাগের কথা ভুলে গেলেন। বাজনার শব্দে প্রভুর প্রেমভাব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। প্রভুর প্রিয়ভক্ত শিবের প্রীতিময় পূজার্চনাদি দেখে তিনি মহা আনন্দে নাচতে লাগলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শিবের গৌরব বুঝালেন, তাই সব ভক্তগণই শঙ্করের প্রিয়। শ্রীচৈতন্য প্রদর্শিত পথ না মেনে

নিজেদের বৈষ্ণব বলে পরিচয় দেয় এবং শিবকে যদি অমান্য করে তাঁদের সব ব্যর্থ হবে। প্রভু মহা গর্জন করে পর্বত-ফাটানো নাচ নাচছেন। জলেশ্বরের শিবের ভক্তগণ সকলেই বিস্মিত হয়ে বললেন,—শিব নিজেই আবির্ভূত হয়েছেন। আনন্দে সকলেই মহা গীত-বাদ্য আরম্ভ করেছেন, প্রভুও সমানে নেচে চলেছেন, তাঁর বিন্দুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নেই। কিছু সময় পরেই ভক্তগণ এসে উপস্থিত হলেন, এসেই মুকুন্দ প্রমুখ কীর্তনীয়াগণ গান ধরলেন। ভক্তগণকে দেখে প্রভু আরো আনন্দ করে নাচতে লাগলেন। ভক্তবৃন্দও তাঁকে ঘিরে গাইছেন। প্রভুর চোখ দিয়ে গঙ্গাধারা বইছে। সব লক্ষণ বর্ণনা করাও অসম্ভব। প্রভুর নৃত্যে জলেশ্বর শিবের মন্দির সত্যি সার্থক হল। খানিক পরে প্রভু ভক্তদের নিয়ে শান্ত হ' বসলেন। তারপর সকলের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গন করলেন তিনি। এবারে সকলেরই ভয় কেটে গেল। প্রভু নিত্যানন্দকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন,—তুমি কোথায় আমার যাতে সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা হয় সেদিকে নজর রাখবে, তা নয় তুমি আরো আমাকে পাগল করে তুলেছ দেখছি। দিব্বি রইল, আর যদি এসব কর তবে আমার মাথা খাও। আমি সকলের সামনেই আজ বলে রাখলাম,—তুমি আমাকে যেমন করাও আমি তেমনি করি। প্রভু সকলকেই জানিয়ে রাখলেন,—নিত্যানন্দের বিষয়ে তোমরা সকলে খুব সাবধান থাকবে। আমার শরীরের চেয়ে নিত্যানন্দ বড়। আমি আজ এই কথা সকলকে বলে রাখলাম। নিত্যানন্দের প্রতি কারো যদি বিন্দুমাত্রও বিদ্বেষভাব থাকে তাহলে সে ভক্ত হলেও জানবে, আদৌ আমার প্রিয়পাত্র নয়। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর মুখে তাঁর প্রশংসা শুনে লজ্জায় মাথা হেঁট করে রয়েছেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দই মহা আনন্দ লাভ করলেন। এই সব লীলা করে চলেছেন শ্রীশচীনন্দন।

জলেশ্বর শিবের মন্দিরে রাত কাটিয়ে প্রভু সদলবলে ভোরবেলা আবার পথ ধরলেন। বাঁশধায় গ্রামে যাওয়ার পথে এক শাক্ত সন্ন্যাসী প্রভুকে নমস্কার জানালেন। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে প্রভু মধুর বচনে সম্ভাষণ করলেন,—তোমরা সকল কোথায় থাক? বহুদিন পরে বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। প্রভুর মায়াতে শাক্তসন্ন্যাসী মোহিত হয়ে নিজেদের খবর সবই বলতে লাগলেন। যেখানে যত শাক্ত সন্ন্যাসী আছেন তাঁদের সকলের কথাই তিনি বলতে থাকেন। প্রভু শুনে হাসছেন। শাক্ত বললেন,—আমার মঠে চল, সকলে মিলে আজ 'আনন্দ' পান করব। পাপী শাক্তগণ মদিরাকে বলে 'আনন্দ'। প্রভু এসব ব্যাপার শুনে হাসতে লাগলেন। প্রভু বললেন,—তুমি আগে গিয়ে ব্যবস্থা কর, আমরা পান করতে যাব। এই কথায় শাক্ত খুশি হয়ে গেল। প্রভুর গূঢ় তত্ত্ব কে বুঝবে? সর্ব শাস্ত্রেই বলে,—কৃষ্ণ পতিত-পাবন। তাই প্রভু শাক্তের সঙ্গেও কথা বলেন। ব্যাপার দেখে লোকেরা বলতে লাগল,—এ শাক্তটি আজ সত্যি উদ্ধার পেয়ে গেল। এর স্পর্শে অন্য শাক্তরাও নিস্তার লাভ করবে। এইভাবে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর নানা প্রকারে সমস্ত জীবকে পরিত্রাণ করলেন।

শাক্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে মজা করে প্রভু রেমুনা গ্রামে এসেছেন। রেমুনায় নিজমূর্তি গোপীনাথকে দেখে ভক্তগণের সঙ্গে খুব নাচলেন। প্রভু নিজেকে ভুলে গিয়ে নিজের প্রেমে, অতি করুণ স্বরে কাঁদলেন। এই অবস্থা দেখে পাথরও গলে যায় কিন্তু তবু ধর্মধ্বজিরা গলে না। এর কিছুদিন পরে প্রভু ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান যাজপুরে এলেন। এখানে আদি বরাহ-দেবের মূর্তি আছে। এই বিগ্রহ দর্শন করলে সব বন্ধন মোচন হয়। এটি মহাতীর্থ, এখানে বৈতরণী প্রবাহিতা। দর্শনে পাপ নষ্ট হয়। কোন জন্তুও এই নদী পার হলে দেবগণ

তাঁকে বৈকুণ্ঠপার্ষদ চতুর্ভুজরূপধারী দেখেন। এই স্থানকে 'নাভিগয়া' বা 'বিরজাক্ষেত্র' বলে। এখান থেকে শ্রীক্ষেত্র আশিমাইল দূরে। যাজপুরে বহু দেবমন্দির আছে, তা শুনে শেষ করা অসম্ভব। যাজপুরে সর্বত্রই দেবালয়। প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রভু ভক্তবৃন্দসহ স্নান করলেন। তারপর তিনি আদি বরাহ দেবকে প্রণাম করতে গিয়ে সেখানেও প্রচুর নৃত্যগীত করলেন। যাজপুরে এসে প্রভু খুবই আনন্দিত হলেন। তাঁর মনে কি ইচ্ছা আছে কে জানে? তিনি সকলকে ছেড়ে একাই চললেন। প্রভুকে না দেখে সকলেই অস্থির হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ তাঁকে মন্দিরে মন্দিরে খুঁজতে লাগলেন। কোথাও না পেয়ে তারা মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তখন নিত্যানন্দ বললেন,—তোমরা অস্থির হয়ো না। তিনি যাজপুরের সব মন্দির একা একা দেখতে চান। আজ আমরা সকলেই এখানে ভিক্ষা করব। কাল প্রভুর সঙ্গে এখানেই দেখা হবে। কথামত কাজ হল। ভিক্ষা করে এনে সকলে মিলে ভোজন করলেন। পরদিন প্রভুও সব মন্দির দেখে ভক্তদের কাছে চলে এলেন। এবারে সকলে মিলে হরিনাম করতে করতে মহানন্দে যাজপুর ছেড়ে এগিয়ে চললেন। যাজপুর প্রভুর পাদস্পর্শে ধন্য হল।

এরপর প্রভু কটক নগরে এসে মহানদীতে স্নান করে সাক্ষীগোপালে এলেন। সাক্ষীগোপাল বিগ্রহের মোহন লাবণ্য দেখে প্রভু আনন্দে হুঙ্কার গর্জন করলেন। বিগ্রহকে নমস্কার করে, তাঁর স্তব করে প্রভু অদ্ভুত আনন্দে প্রেমক্রন্দন করলেন। যে শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে কাষ্ঠ-ধাতু-পাষাণাদি নির্মিত বিগ্রহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়, তিনিই স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করেছেন। তথাপি তিনি সর্বদা দাস্যভাবেই থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হন তখন তিনি এই লীলাই করেন। প্রভু তারপরে ভুবনেশ্বরে এলেন। এই ভুবনেশ্বরকে গুপ্তকাশী বলা হয়। এখানে শ্রীশঙ্কর বাস করেন। সমস্ত তীর্থ থেকে বিন্দু বিন্দু জল এনে শিব এখানে 'বিন্দুসরোবর' সৃজন করেছেন। এই সরোবর শিবের প্রিয়, তাই মহাপ্রভু এখানে স্নান করে সরোবরকে ধন্য করলেন। প্রভু দেখলেন, এখানে শিব প্রকট আছেন, চারদিকে শিবভক্তগণ 'শিব শিব' ধ্বনি করছেন। সব দিক ঘিরে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে, জলে সর্বদা অভিষেক হচ্ছে। নিজের প্রিয় শিবের প্রভাব দেখে প্রভু নিজে এবং তার সঙ্গী সব বৈষ্ণবগণ খুশি হলেন। যাঁর প্রতি ভক্তির ফলে শিবের বাহ্যজ্ঞান থাকে না তিনি নিজেই শিবের সামনে আজ নাচছেন। শিবের সামনে নাচ গান আনন্দ করে গৌরচন্দ্র সেই রাতটি সেখানেই কাটালেন। এই ভুবনেশ্বরে শিব কিভাবে অধিষ্ঠিত হলেন, স্কন্দপুরাণে তার বিবরণ রয়েছে। কাহিনীটি এই রকম—

পূর্বকালে কাশীধামে শিব এবং পার্বতী পরম নিভৃতে বাস করছিলেন। তারপর যখন তাঁরা কৈলাসে গেলেন তখন মনুষ্য রাজারা কাশীতে আমোদ প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত হলেন। কাশীরাজ নামে এক রাজা শিবপূজা করে কাশীতে রাজত্ব করছিলেন। দুর্দৈববশে তাঁর কালের বন্ধন লাগল, তিনি কৃষ্ণকে পরাজিত করার জন্য উগ্রতপস্যায় শিবকে আরাধনা করতে লাগলেন। রাজার তপস্যার প্রভাবে শিব প্রত্যক্ষ হলেন। শিব রাজাকে বললেন,—বর চাও। রাজা শিবের কাছে বর প্রার্থনা করলেন,—প্রভু, তোমার কাছে একটিই বর চাই, যেন কৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারি। ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র বড় গূঢ়, তিনি কাকে কিভাবে আশীর্বাদ করেন তা সহজে ধরা যায় না। শিব রাজাকে

বললেন,—রাজা, তুমি যুদ্ধ শুরু করে দাও। আমি তোমার পেছনে থাকব আমার সব লোকজন নিয়ে। তোমাকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। পাশুপত অস্ত্র নিয়ে আমি তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকব। সেই মূঢ় রাজা শিবের বল পেয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলল। শিবও তার পেছনে চললেন দলবল নিয়ে। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তখনই সব জানতে পারলেন। তাই তিনি সুদর্শন চক্র ছাড়লেন। সুদর্শনের কাছে কারো রক্ষা নেই, সে প্রথমেই কাশীরাজের মস্তক ছেদন করল। তারপর কাশীতে যা কিছু তার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল সবই পোড়ানো হল। পুড়িয়ে ছাই ভস্ম করে দেওয়া হল। মহেশ্বর বারাণসীকে পুড়তে দেখে ভয়ঙ্কর পাশুপত অস্ত্র ছাড়লেন। পাশুপত সুদর্শনের কিছুই করতে পারল না। সুদর্শনের তেজ দেখে পাশুপত পালিয়ে গেল। শেষে সুদর্শন চক্র মহেশ্বরের দিকে ধেয়ে গেলে মহেশ্বরও পালাতে লাগলেন। সুদর্শন চক্রের তেজ সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলল। শিব আর কোথাও পালাতেও পারছেন না। পূর্বে দুর্বাসা মুনি যেমন একবার পালিয়েছিলেন এবারে শিবের অবস্থাও তেমনি হল। শিব পরে বুঝতে পারলেন যে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত সুদর্শনের হাত থেকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। তাই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ত্রিলোচন শিব ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গোবিন্দের শরণ নিলেন। —হে দেবকীনন্দন প্রভু, তুমি সর্বজীবের আশ্রয়, তুমি সকলকে সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি দাও, তুমিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা, তুমি কারো দোষ বিচার কর না, কৃপার সমুদ্র, পাপীতাপীর একমাত্র বন্ধু, তুমি সব অপরাধ ক্ষমা কর, তোমার জয় হোক। আমি তোমার আশ্রয় চাই। —মহাদেবের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনের তেজ সংবরণ করে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। গোপীগণ পরিবেষ্টিত ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণরূপেই তিনি মহাদেবকে দর্শন দিয়েছিলেন, ক্রোধ থাকলেও হাসিমুখেই তিনি মহাদেবকে বললেন,—শিব, তুমি তো আমার প্রকৃত তত্ত্ব জান, এতকাল পরে তোমার এই বুদ্ধিভ্রংশ হল কেন? কাশীরাজ কে? তুমি তার জন্য আমার সঙ্গে যুদ্ধ করছ? আমার এই সুদর্শন চক্রের পরাক্রম তোমাকেও ভয় পায় না। ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপত অস্ত্র কিছুই এর কাছে দাঁড়াতে পারে না। যাঁর অস্ত্র তাঁকেই সে সংহার করতে চায়। তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে আমাকে আর কেউ অনাদর করে না। —প্রভুর রাগের কথা শুনে শিব ভয় পেলেন। তারপর তিনি প্রভুর শ্রীচরণ ধরে আত্মনিবেদন করে বললেন,—প্রভু, সকল সংসার তোমার অধীন, কেউ তো স্বাধীন নয়। হাওয়াতে যেমন শুকনো ঘাসকে নাড়ায়, এও তেমনি, সবই তোমার ইচ্ছায় হচ্ছে। তুমি যা করাও, জীব তাই করে। তোমার মায়া থেকে কারো রেহাই নেই। তুমি আমাকে বিশেষ অহঙ্কার দিয়েছ, আমি নিজেকে সবার চেয়ে বড় মনে করি। তোমার মায়াই আমাকে দুর্গতিতে ফেলছে। আমার বুদ্ধি তোমার মায়ার অধীন। তোমার পাদপদ্মই হচ্ছে আমার একান্ত জীবন, তোমার চরণ চিন্তা করতে করতে অরণ্যে বাস করাই আমার কর্তব্য অথচ, তুমি আমাকে অহঙ্কার দিয়েছ। তোমার ইচ্ছামত তুমি আমাকে দিয়ে কাজ করাও, আমি কি করতে পারি, প্রভু? তা সত্ত্বেও আমি অপরাধ করেছি। তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমার প্রতি সদয় হয়ে আমাকে এমন আশীর্বাদ কর যাতে আর কখনও এই দুর্বুদ্ধি না হয়। যেমন অহঙ্কার করে অপরাধ করেছি তেমনি তার শাস্তি হয়েছে। এখন বল, আমি কোথায় থাকব? তোমার চরণ ভিন্ন তো আমার কোথাও স্থান নেই। —শিবের কথা শুনে ঈষৎ হেসে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে বললেন,—শিব, তোমাকে দিব্য

স্থান দিলাম, সকলকে নিয়ে সেখানে চলে যাও। একাম্রকবন ভুবনেশ্বরে কোটিলিঙ্গেশ্বর হয়ে থাক। সেও বারাণসীর মতই সুরম্য নগরী। সেখানে আমার গোপন পুরী আছে। আমি তোমাকে আজ সেখানকার কথা বলব, ঐ পুরীর কথা আর কেউ জানে না।

সমুদ্রতীরে বটমূলে নীলাচল শ্রীক্ষেত্র অতি রম্যস্থান শ্রীপুরুষোত্তম রয়েছে। মহাকাল যখন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সংহার করে তখনও সেই স্থানের কিছু হয় না। আমি সর্বদা সেখানে থাকি। সেখানে প্রতিদিন আমার বিশেষ ভোজনের ব্যবস্থা আছে। সে-স্থানের প্রভাবে তার চতুর্দিকে দশ যোজন পর্যন্ত যত জীব-জন্তু-কীটাদি আছে, তাদের সকলকে দেবতারা রক্ষা করছেন, ওখানে মরলেও পারমার্থিক মঙ্গল হয়। ঐ স্থানে শয়ন করলেই প্রণামের ফল পাওয়া যায়, ওখানে ঘুমুলে সমাধির ফল হয, ভ্রমণ করলে প্রদক্ষিণের পুণ্য অর্জন করা যায়, ওখানে যে-কোন কথাই আমার স্তব বলে গৃহীত হয়। ঐ তীর্থে মাছ খেয়েও হবিষ্যের ফল পাওয়া যায়। আমার নিজের নামে ঐ স্থানের নাম শ্রীপুরুষোত্তম, আমার অত্যন্ত প্রিয় স্থান। সেখানে যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা সকলেই আমার মত মায়াতীত। সেখানে যমরাজা কিছু করতে পারেন না, আমিই সকলের ভাল-মন্দ বিচার করি। এমন যে আমার স্থান, তার উত্তর দিকে তোমাকে থাকতে দিলাম। ভুক্তিমুক্তি-প্রদ সেই স্থানের নাম শ্রীভুবনেশ্বর। —অদ্ভুত স্থান-মাহাত্ম্য শুনে মহাদেব আবার শ্রীকৃষ্ণের চরণ ছুঁয়ে বললেন,—প্রাণনাথ, আমার একটি নিবেদন আছে, আমি সব সময়ই অহঙ্কারে মজে আছি, তাই তোমাকে ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকলে আমার বিপদ ঘটবারই কথা। তোমার কাছে থাকতে চাই এইজন্য যে তাহলে অসৎ সঙ্গে আমার দুর্বুদ্ধি হবে না। তুমি যদি আমাকে তোমার ভৃত্য বলে, ভক্ত বলে মনে কর তবে তোমার নিজক্ষেত্রেই আমাকে থাকতে দাও। তোমার মুখে ক্ষেত্রমহিমা শুনে সেখানে থাকতেই আমার বড় ইচ্ছা। আমি তোমার সেবা করব দীনভাবে, আমাকে একটু স্থান দাও। ক্ষেত্রবাসে আমার বড় ইচ্ছা। —এই বলে মহেশ্বর ক্রন্দন করছেন। শিবের কথায় তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন,—শিব, তুমি আমার নিজদেহ-তুল্য। যে তোমার প্রিয়, জানবে সে আমারও প্রিয়তম। তুমি যেখানে থাকবে আমিও সেখানেই থাকব, সর্বত্র তোমাকে আমি থাকতে দিলাম। তুমিই শ্রীক্ষেত্রের পালক। তোমাকে যে একাম্রক-বন দিলাম, সেখানেই তুমি পরিপূর্ণভাবে থাক। সে স্থানটি আমার বড় প্রিয়, আমার প্রীতির জন্যই তুমি সেখানে থাক। যে আমার ভক্ত হয়ে তোমার সমাদর করে না, সে আমার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। —এই ভাবে শিব সেই স্থানটি লাভ করলেন, আজও তার নাম ভুবনেশ্বর, এই নামেই স্থানটি এখনও সর্বপরিচিত। শ্রীকৃষ্ণ শিবের বড়ই প্রিয়। একথা জানাবার জন্যই শ্রীগৌরহরি শিবের সামনে নৃত্য করছেন সানন্দে। পুরাণে যা উল্লেখ আছে একত্রে প্রভু তা সবই সাক্ষাতে দেখাচ্ছেন। প্রভু 'শিব-রাম-গোবিন্দ' বলে হাতে তালি দিয়ে নাচছেন। গৌরচন্দ্র ভুবনেশ্বরে গিয়ে ভক্তবৃন্দকে নিয়ে শিবপূজা করলেন। শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে মান্য করে না সে নিজদোষে অবশ্যই দুঃখ পাবে। সেই শিবস্থানে প্রভু ভক্তবৃন্দকে নিয়ে শিবলিঙ্গ দেখছেন ঘুরে ঘুরে। পরম নিভৃত শিবস্থান দেখে প্রভু খুবই খুশি হলেন। প্রভু সেখানকার সব কটি মন্দিরই দেখলেন।

মহাপ্রভু এইবারে এসে পৌঁছলেন কমলপুরে। দূর থেকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা দেখে তিনি আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেলেন। অকথ্য অদ্ভুত হুঙ্কার করলেন, বিশাল গর্জন করলেন এবং সারা দেহ জুড়ে কম্পন এসে গেল। মন্দিরের দিকে তাকাতে তাকাতে

তিনি শ্লোক আবৃত্তি করে চলেছেন। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আমাদের শোনা উচিত,—দেখ দেখ, ফোটা পদ্মের মত সুন্দর মুখাবয়বে স্মিত হেসে বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সামনে দেখে মন্দিরের উপরে বসে আছেন। —প্রভু বললেন,—দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে শ্রীবালগোপাল আমাকে দেখে হাসছেন। বারংবার এই শ্লোক পড়ে প্রভু বিবশ হয়ে আছাড় খেয়ে পড়ছেন। সেই আর্তি এবং ক্রন্দন একমাত্র অনন্তদেবই বর্ণনা করতে পারেন। তিনি শুধু চক্রের দিকে তাকিয়ে শ্লোক পড়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েছেন। সারা পথ দণ্ডবৎ করতে করতে তিনি আসছেন। অপূর্ব প্রেমের প্রকাশ। এই শক্তি চৈতন্যদেব ছাড়া আর কারো নেই। তাই তাঁকে প্রেমময় অবতার বলা হয়। পথে যত ভাগ্যবান লোক তাঁকে দেখছেন তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলছেন,—এই ত সাক্ষাৎ নারায়ণ। ভক্তগণ চারদিকে ঘিরে আসছেন, সকলেরই চোখে আনন্দাশ্রু। মাত্র চার দণ্ডের পথ আসতে প্রভুর প্রেমের আবেশে তিন প্রহর লেগে গেল। আঠার নালায় এসেই প্রভু সব সম্বরণ করে নিলেন। প্রভু স্থির হয়ে সকলকে নিয়ে বসে বললেন,—আমাকে নিয়ে এসে জগন্নাথ দর্শন করিয়ে তোমরা আমার বন্ধুর মত কাজই করেছ। এখন তোমরা আগে যাবে না আমি আগে যাব, আমাকে বল। তখন মুকুন্দ বললেন,—তুমি আগে যাও। শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন,—তাই হবে। পাগলা সিংহের মত দৌড়ে চলেছেন প্রভু পুরীর দিকে। প্রভু নীলাচলে এসে পৌঁছেছেন,—একথা যে শুনছে সেই আনন্দিত হচ্ছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় তখন সার্বভৌম জগন্নাথ দর্শন করছিলেন। দেখা মাত্র তিনি মহা হুঙ্কার করে উঠলেন এবং তাঁর ইচ্ছে হল জগন্নাথকে একবার কোলে নেবেন। প্রভু আনন্দে বিহ্বল হয়ে লাফ দিলেন আর তাঁর অশ্রু ছুটে চলল চারদিকে। তৎক্ষণাৎ তিনি আনন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ঈশ্বরের অগাধ চরিত্র বুঝে ওঠা বড়ই কঠিন। অজ্ঞ ছড়িদারেরা তাঁকে মারতে উদ্যত হল, সার্বভৌম এসে বাধা দিলেন। সার্বভৌম ভাবলেন,—এমন প্রেমলক্ষণ মনুষ্যে সম্ভবে না। এই হুঙ্কার, এই গর্জন, এই প্রেমাশ্রুধারা, এমন শক্তির বিকাশ,—এ ব্যক্তি নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হবেন, সার্বভৌমের এই রকম মনে হল। সার্বভৌম বারণ করায় ছড়িদারেরা ভয় পেয়ে দূরে সরে গেল। নিজ-প্রিয়-কায় জগন্নাথের দর্শনমাত্র প্রভু প্রায় অচেতন হয়ে পড়লেন। প্রভু যে আনন্দে মগ্ন হয়ে গেলেন, শাস্ত্রেও তার তত্ত্ব খুব গূঢ় ভাবে বলা হয়েছে। প্রভু গৌরচন্দ্র নিজেই জগন্নাথ মন্দিরে সিংহাসনে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা ও সুদর্শন—এই চাররূপে বসেছেন। সেই প্রভু নিজেই আবার ভক্তভাবে জগন্নাথকে ভক্তি করছেন। ঈশ্বরের শক্তি কে বুঝতে পারে? নিজের তত্ত্ব তিনি নিজেই জানেন, বেদে ভাগবতে এই রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবার, প্রভু যখন যে লীলা করেন তা জীব উদ্ধারের জন্য, বেদেই বলা হয়েছে। প্রভু ভক্তভাবের আবেশে মগ্ন হয়েছেন, তাঁর বাহ্যজ্ঞান নেই, তিনি প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাসছেন। সার্বভৌম নিজের দেহ দিয়ে প্রভুকে ঢেকে রয়েছেন। প্রভুর আনন্দমূর্ছা কিছুতেই ভাঙছে না। শেষে সার্বভৌম প্রভুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য ছড়িদারদের বললেন,—এই মহাপুরুষকে তোমরা সকলে মিলে তুলে নাও। পাণ্ডুবিজয়ের সময় জগন্নাথের যে ভক্তগণ বিগ্রহকে রথে তোলেন তাঁরা সকলে মিলে প্রভুকে সার্বভৌমের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাঁরা সকলে মিলে মহানন্দে হরিধ্বনি করতে করতে প্রভুকে নিয়ে চলেছেন। এমন সময় ভক্তগণ সকলে মিলে মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা এসেই এই মজার দৃশ্যটি দেখছেন যে পিঁপড়ের দল যেভাবে একটি ভাতকে বয়ে নিয়ে যায় তেমনি প্রভুকেও অনেক লোক

আনন্দে বয়ে নিয়ে চলেছেন। ভক্তরা তাই সিংহদ্বার থেকেই মন্দিরে নমস্কার করে প্রভুর পেছন পেছন চললেন। প্রভুকে নিয়ে আসা হলে দরজায় খিল দেওয়া হল। ভক্তগণ এসে গেছেন দেখে সার্বভৌম খুশি হলেন। সকলকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে পণ্ডিত তাঁর বাড়িতে ভক্তগণকে বসালেন এবং তাঁদের কাছে সব শুনে সার্বভৌমের মনের সন্দেহ কেটে গেল। সার্বভৌম খুশি হলেন, সত্যি, তাঁর সৌভাগ্যের কথা বলে শেষ করা যায় না। সর্ববেদ যাঁর কীর্তি ব্যাখ্যা করে, তিনি নিজেই সার্বভৌমের ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। নিত্যানন্দকে দেখে সার্বভৌম বিনয় প্রকাশ করে তাঁর পদধূলি নিলেন। ভক্তদের সঙ্গে লোক দিয়ে দিলেন সার্বভৌম, সকলে তখন জগন্নাথ দর্শনে গেলেন।

সঙ্গের লোকেরা ভক্তগণকে বিনীত ভাবে বললেন,—সুস্থির মত জগন্নাথ দর্শন কর, আগের সন্ন্যাসীঠাকুরের মত কেউ করবে না কিন্তু। তোমাদের তো ব্যাপার-স্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না, সুস্থির হয়ে দেখবে বল তবেই দেখাতে নেব। ঐ সন্ন্যাসীঠাকুর যেমন করলেন তাতে জগন্নাথের সিংহাসনে থাকাই দায় হয়ে পড়েছিল। বিশেষ আর কি বলব। তাঁর আছাড় খেয়ে পড়া যে দেখেছে তার পক্ষেও দেহে প্রাণ রক্ষা করা কঠিন। তাই বলছি, তোমরা কিন্তু সকলে খুব সাবধানে দর্শন করবে। এই কথা শুনে ভক্তগণ হাসতে লাগলেন। চিন্তার কোন কারণ নেই,—বলে তাঁরা এগিয়ে যেতে লাগলেন। এসে তাঁরা জগন্নাথদেবের পরমানন্দ চতুর্ব্যূহ মূর্তি দেখলেন। ভক্তগণ দর্শন করেই কাঁদতে লাগলেন এবং দণ্ডবৎ প্রদক্ষিণ স্তব করলেন। পূজারী ব্রাহ্মণ বিগ্রহের গলার মালা এনে সকলকে পরিয়ে দিলেন।

আজ্ঞা-মালা পেয়ে সকলে আনন্দিত মনে সার্বভৌম মশায়ের বাড়িতে চলে এলেন। প্রভুর এখনো বাহ্যজ্ঞান আসে নি, তিনি আনন্দ মূর্ছায় নিমগ্ন আছেন। সার্বভৌম প্রভুর পদতলে বসে রয়েছেন। ভক্তগণ প্রভুকে ঘিরে রাম-কৃষ্ণ-নাম কীর্তন করছেন। তিন প্রহর কেটে গেল, তবু প্রভুর বাহ্যজ্ঞান আসছে না। তার পরে হঠাৎ তিনি উঠে বসলেন। ভক্তগণ তখন হরিধ্বনি দিতে লাগলেন।

প্রভু স্থির হয়ে বসে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন,—সব কথা বিস্তারিত বল দেখি, আজ আমার কি হয়েছিল? শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তখন বলতে লাগলেন,—জগন্নাথদেবের বিগ্রহ দেখেই তুমি মূর্ছিত হয়ে পড়েছ। দৈবাৎ সার্বভৌম মশায় তখন সেখানে ছিলেন, তাই তিনি লোকজন জোগাড় করে তাঁর বাড়িতে তোমাকে নিয়ে এলেন। বাহ্যজ্ঞান-বঞ্চিত হয়ে তুমি তিন প্রহর সময় পর্যন্ত মহানন্দে আবিষ্ট ছিলে। এই যে তোমাকে নমস্কার করছেন, ইনিই বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম।—এই কথা শুনেই প্রভু সার্বভৌমকে কোলে নিলেন। নিয়ে বললেন,—জগন্নাথদেবের বড়ই কৃপা বলতে হবে যে তিনি আমাকে সার্বভৌম মশায়ের বাড়িতে আনলেন। আমার মনে অনেক সন্দেহ ছিল, তাই এতদিন তোমার সাক্ষাৎ পাই নি। এবারে শ্রীকৃষ্ণ তা অনায়াসে পূর্ণ করলেন। —এই কথা বলে প্রভু সার্বভৌমের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। প্রভু বললেন,—আমার কাহিনী শোন, আমি আজ প্রত্যক্ষ জগন্নাথ দর্শন করলাম; আমার তখন মনে হল, আমি জগন্নাথকে আমার বুকের মধ্যে পুরে রাখি। আমি তাই জগন্নাথদেবকে ধরতে গিয়েছিলাম। তারপর কি হল আর কিছু জানি না। আজ দৈবাৎ সার্বভৌম মশায় সেখানে ছিলেন, তাই আমি রক্ষা পেয়ে গেছি। তাই আমি ঠিক করেছি, আমি আর ভেতরে যাব না, বাইরে দাঁড়িয়ে গরুড়ের পাশ থেকে বিগ্রহ দর্শন করব। ভাগ্যে আমি জগন্নাথদেবকে স্পর্শ করি নি,

না হলে তো আজ ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত হত। —তখন নিত্যানন্দ বললেন,—আজ খুব রক্ষা পেযে গেছ। বেশি বেলা নেই, তাডাতাডি চান কবে নাও। প্রভু বললেন,—নিত্যানন্দ, তুমি আমাকে সামলাবে। আমাব এই দেহ আমি তোমাকে সমর্পণ কবলাম। তাবপব প্রভু স্নান কবে সকলের সঙ্গে হাসিমুখে বসলেন। সার্বভৌম অনেক বকমেব প্রসাদ এনে প্রভুব সামনে বাখলেন। সকলকে নিয়ে ভোজন কবতে বসে প্রভু বললেন,—আমাকে লাবডা বেশি কবে দাও, পিঠা-পানা-ছানাবডা তোমবা নিযে নাও। —এই কথা বলে প্রভু মহা আনন্দ কবে লাবডা খেতে লাগলেন, দেখে ভক্তগণ হাসছেন। সার্বভৌম জন্মজন্মান্তবে প্রভুব পার্ষদ, তা না হলে এমন সৌভাগ্য কখনও হতে পাবে না। সার্বভৌম নিজে হাতে কবে সোনাব থালায প্রভুকে পবিবেশন কবছেন এবং প্রভু ভোজন কবছেন। সেই ভোজনে প্রভুব যে আনন্দ হযেছে তা একমাত্র ব্যাসদেবই সঠিক বর্ণনা কবতে পাবেন। ভোজন কবে প্রভু ভক্তগণকে নিয়ে বসলেন। নীলাচলে প্রভুব এই ভোজনলীলাব কথা শুনলেও শ্রীচৈতন্যেব সঙ্গ লাভ কবা যায। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শেষ খণ্ডে প্রভুব নীলাচলে আসাব বর্ণনা বযেছে, এ কাহিনী শুনলে ভক্তজন প্রেমজলে ভাসেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভালই জানেন যে শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুব তাঁদেব শ্রীচবণপ্রান্তেই এই গুণকীর্তন নিবেদন কবছেন।

৩/৩ শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপেব প্রাণ, গুণধাম, বৈকুণ্ঠনাযক, কৃপাসিন্ধু, ন্যাসিচডামণি, দীনবন্ধু শ্রীগৌবাঙ্গেব ভক্তগণসহ জয গান কবছি। চৈতন্যকথা শুনলে ভক্তি লাভ হয।

শ্রীগৌবসুন্দব কেমন ভাবে বিহাব কবছেন তা এক মনে শোনা দবকাব। চৈতন্যচন্দ্রেব কথা অমৃতেব অমৃত, ব্রহ্মা শিব পর্যন্ত এই অমৃত সর্বদা বাঞ্ছা কবেন। শ্রীচৈতন্যকথা শ্রবণে সকলেবই সন্তোষ হয, একমাত্র মহা দস্যুগণেবই হয না। শ্রীচৈতন্যভাগবতেব শেষ খণ্ডে চৈতন্যবহস্য শুনলে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ কবা যায।

শ্রীগৌবসুন্দব নীলাচল ধামে আত্মগোপন কবে মহানন্দে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি নিজে যদি নিজেকে ব্যক্ত না কবেন তবে কাব সাধ্য আছে যে তাকে জানতে পাবে? প্রভু একদিন সার্বভৌমকে নিযে নির্জনে বসে বললেন,—আমি যে জগন্নাথ দর্শন কবতে এসেছি তাব মূল কাবণ হল, তুমি এখানে বযেছ। জগন্নাথদেব আমাকে কি বলবেন? তুমিই তো আমাব সব বন্ধন খণ্ডন কববে। তোমাব মধ্যে শ্রীকৃষ্ণেব পূর্ণ শক্তি বযেছে, তুমিই কৃষ্ণভক্তি দান কবতে পাব। তাই আমি তোমাব আশ্রয গ্রহণ কবেছি, যাতে আমাব মঙ্গল হয তাই কব। আমি কি কবে সংসাবকূপ থেকে উদ্ধাব পেতে পাবি, সে জন্যে আমাব কি কবা দবকাব, কেমন ভাবে চলা উচিত সেসব তুমি আমাকে বিস্তাবিত ভাবে উপদেশ দাও। তুমি সর্বদা আমাকে তোমাব নিজেব লোক বলে মনে কববে। যোগমাযা বিস্তাব কবে মহাপ্রভু এভাবে সার্বভৌমেব সঙ্গে কথা বললেন। সার্বভৌম ঈশ্ববেব মর্ম না জেনে জীবেব ধর্ম বিষযে নানা কথা বলতে লাগলেন। সার্বভৌম বললেন,— তুমি ঠিকই বলেছ। তোমাব মধ্যে অপূর্ব ভক্তিব উদয হযেছে, তা বলে শেষ কবা যায না। তোমাব প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বডই কৃপা কবেছেন, তবে একটি কাজ তুমি ভাল কব নি। তুমি এমন বুদ্ধিমান হযে সন্ন্যাস নিলে কেন? চিন্তা কবে দেখ যে সন্ন্যাসেব মধ্যে এমন কি আছে? প্রথমেই তো অহঙ্কাবে পেযে বসে। প্রথমেই একখানি দণ্ড ধাবণ কবে নিজেকে মহাজ্ঞানী মনে কবে, কাবো সামনে হাতজোড কবে না। যাঁব পদধূলি নেওযা

উচিত তেমন লোক নমস্কার-প্রণাম করলেও সে ভয় পায় না। সন্ন্যাসী যে কেবল সকলের প্রণাম নেবে, কাউকে প্রণাম করবে না, ভাগবত অবশ্য তেমন কথাও বলে না। —অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সকল জীবের মধ্যেই ভগবান রয়েছেন, এই কথা ভেবে কুকুর, চণ্ডাল, গরু-গাধা পর্যন্ত সমস্ত জীবকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হয়ে প্রণাম করবে। —সকলকে প্রণাম করাই বৈষ্ণবধর্ম। এই কথায় যার মন বসে না সে নিতান্তই ধর্মধ্বজী, কপট ধার্মিক অথবা বলা যায় ধর্মধ্বংসী, ধর্মের ধ্বংসকারী। ব্রাহ্মণের শিখা-সূত্র ত্যাগ করে লাভের মধ্যে এই হল যে মহামহোপাধ্যায়গণও নমস্কার করেন। এই এক কথা বললাম, আরো কি কি বুদ্ধিক্ষয় এবং সর্বনাশ হয়, তাও বলছি। জীবের স্বভাবধর্ম হচ্ছে ঈশ্বরের ভজনা করা, তা ছাড়া তারা নিজেদেরই নারায়ণ বলে প্রচার করে। ভগবান মানুষকে মাতৃগর্ভে রক্ষা করেন, তাঁর আশীর্বাদেই বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা লাভ হয়, অনন্তদেব-ব্রহ্মা-লক্ষ্মীদেবী এঁরা তাঁকে পেয়েও তাঁর সেবা করার কামনা জানান, তাঁর আজ্ঞাতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ঘটে, —সন্ন্যাসীরা নিজেদেরকে সেই প্রভু বলে পরিচয় দেয়। নিজে যে কে, নিদ্রিত অবস্থায় তাও জানে না, জানতে পারে না, অথচ মায়াবাদী সন্ন্যাসী নিজেকে নারায়ণ বলে থাকে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রই প্রচার করছে যে শ্রীকৃষ্ণই জগতের পিতা, পিতাকে ভক্তি করলেই সুপুত্র হওয়া যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,— আমিই এই জগতের জনক, জননী, কর্মফলদাতা এবং পিতামহ সবই। গীতাশাস্ত্রেই অর্জুনকে সন্ন্যাস-লক্ষণ বলতে গিয়ে ভগবান বলেছেন, —কর্মফলের আশা না করে যে কর্তব্যরূপে নিত্যকর্ম করে সেই সন্ন্যাসী এবং যোগপরায়ণ, অগ্নিহোত্রাদি এবং তপস্যা-দান ইত্যাদি ত্যাগ করলেই তাকে সন্ন্যাসী বলা যায় না। —নিষ্কাম হয়ে যে কৃষ্ণভজন করে তাকেই সন্ন্যাসী বা যোগী বলা যায়। বিষ্ণুক্রিয়া না করে অর্থাৎ কৃষ্ণভজনা না করে কেবল পরের অন্ন ধ্বংস করলেই মল কাজের কাজ কিছু হয় না, বৈদিক শাস্ত্র একথা স্পষ্ট করেই বলেছেন। ভাগবতে আছে, —যা শ্রীহরির সন্তোষ বিধান করে তাই কাজ, অর্থাৎ কর্ম। যার দ্বারা শ্রীহরিতে মতি জন্মে তাই বিদ্যা। কারণ, শ্রীহরিই হচ্ছেন দেহধারী জীবগণের আত্মা। তিনি অন্য কারো উপর নির্ভর করেন না। তিনি নিজেই সবকিছুর কারণ স্বরূপ এবং ঈশ্বর। —তাকেই ধর্ম কর্ম সদাচার বলা হয় যাতে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি জন্মে। কৃষ্ণপাদপদ্মে যার দ্বারা মনকে স্থির করায় তাকেই বিদ্যামন্ত্র অধ্যয়ন বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণই সকলেরই পিতা, সেই শ্রীকৃষ্ণকে যে ভজনা করে না তার সবই বৃথা, সবই ব্যর্থ। যদি বল যে শঙ্করের মত এরকম নয়, তাও চলবে না, তাঁরও বক্তব্য হচ্ছে দাস্যভাব বা ভক্তি। তিনি নিজেই ষট্‌পদী স্তোত্রে বলেছেন,—হে নাথ, জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকলেও আমি তোমারই কিন্তু তুমি আমার নও। যদিও জগতে এবং ঈশ্বরে ভেদ নেই, জগৎরূপে পরিণত হয়েও তিনি পরিপূর্ণই আছেন তবু তোমার থেকেই আমি হয়েছি, আমা থেকে তুমি কখনো হও নি। সমুদ্রের তরঙ্গই লোকে বলে, কোনকালেই তরঙ্গের সমুদ্র হয় না। তাই, জগৎ তোমার, তুমি নিত্য, ইহলোকে পরলোকে তুমিই রক্ষা কর। যার থেকে জন্ম হয়, যে পালন করে, তাকে যদি কেউ ভজন না করে তবে তাকে বর্জন করাই উচিত। শঙ্করের এই শ্লোকের এই তাৎপর্য, তাঁর এই অভিপ্রায়। এসব না বুঝে কেবল মাথা ন্যাড়া করে সন্ন্যাসী হলেই হয় না। সন্ন্যাসী হয়ে প্রেমভক্তি-যোগে সর্বদা নারায়ণের নাম উচ্চারণ করবে, নারায়ণকে স্মরণ করবে, এই সন্ন্যাসীর কর্তব্য। আমি নারায়ণ—বলা সন্ন্যাসীর কর্তব্য নয়। আচার্য শঙ্করের

মনোভাব না বুঝে, ভক্তি ত্যাগ করে, সন্ন্যাসী হয়ে কেবল দুঃখই পায়। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি না বুঝে-সুজে কেন এ পথে এলে? যদি কৃষ্ণভক্তি দ্বারা উদ্ধার পাওয়া যায় তবে শিখা এবং যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করে কি লাভ? যদি বল মাধবেন্দ্র প্রমুখ আচার্যবৃন্দ শিখা এবং যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করেছিলেন, তাহলেও বলব,—তোমার এই কচি বয়সে সন্ন্যাস নেওয়া ঠিক হয় নি। সে-সব মহাত্মাগণ পূর্ণ বয়সের তৃতীয় অংশে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন। তুমি সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছ, এখনই তোমার সন্ন্যাসী হওয়া উচিত হয় নি। সন্ন্যাস তো পরমার্থ লাভের পক্ষে এমন কিছু সহায়ক নয়, তোমার শরীরে যে ভক্তিলক্ষণাদি দেখছি, যোগেন্দ্রগণেরও তা দুর্লভ। তবু তুমি এই ভুল কেন করলে? প্রভু-গৌরসুন্দর সার্বভৌম ভট্টাচার্য মশায়ের এই ভক্তি বিষয়ক উক্তি শুনে খুবই খুশি হলেন।

প্রভু ভট্টাচার্যকে বললেন,—আমাকে ঠিক সন্ন্যাসী বলে ধরবে না, আমি কৃষ্ণবিরহে ক্ষিপ্ত হয়ে শিখা-সূত্র ত্যাগ করেছি। আমাকে সন্ন্যাসী বলে মনে না করে যাতে আমার কৃষ্ণে মতি হয় সেই কৃপা কর। স্বয়ং ভগবান এভাবে তাঁর দাসকে মোহিত করলে, মায়ার ছলনা কাটিয়ে ভক্ত তাঁকে চিনবেন কি করে? তিনি যদি নিজেকে না জানান তবে কি করে তাঁকে জানতে পারা যাবে? তাঁকে না চিনতে পেরে ভক্ত তাঁর সঙ্গে যেভাবে কথা বলছেন তাতেও তিনি খুশিই হচ্ছেন। তিনি চিরকালই ভক্তের সঙ্গে লীলা করেছেন, ভক্তের কারণে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। ভক্ত যেভাবে ভগবানকে ভজনা করেন, ভগবান সেভাবেই তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকেন। ভগবান স্বরূপগত ভাবেই ভক্তবৎসল, এবিষয়ে তাঁকে কেউ বিরত করতে পারে না। প্রভু সার্বভৌমের দিকে তাকিয়ে হাসছেন কিন্তু সার্বভৌম মায়ামুগ্ধ বলে কিছুই ধরতে পারছেন না। সার্বভৌম বললেন,—তুমি সন্ন্যাসী, তাই তুমি আমার পূজ্য। তুমি আমাকে নমস্কার করলে আমার অপরাধ হবে। প্রভু উত্তর করলেন,—এসব ছল-চাতুরি ছাড়, আমি সর্বভাবে তোমার আশ্রয় নিলাম। এইভাবে প্রভু ভক্তের সঙ্গে লীলা করছেন, গৌরসুন্দরের লীলা কে বুঝতে পারে? সার্বভৌম ভট্টাচার্য মশায় বললেন,—আমি জানি তুমি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ভাগবতের কোন্ শ্লোকের অর্থ জানতে চাও? তবে সাধুদের উচিত হচ্ছে নিজেদের মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করা। বল দেখি, তোমার কি বুঝতে হবে? যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করব। ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ ভাগবতের একটি আট শব্দের শ্লোক বললেন,—আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।

কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

যাঁরা সর্বদা আনন্দস্বরূপ আত্মাতেই রমণশীল, সেই আত্মারাম মুনিগণও, সমস্ত মায়াগ্রন্থি ছিন্ন হওয়া সত্বেও তাঁরা বিধিনিষেধের অতীত হয়েও বিপুল-বিক্রম ভগবানে অহৈতুকী ভক্তির অনুষ্ঠান করে থাকেন। কারণ, শ্রীহরির গুণরাশি স্বভাবতই এইরূপ।

সরস্বতীপতি গৌরচন্দ্রকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মশায় এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করতে লাগলেন,—সকলেরই মূল বিষয় হচ্ছে কৃষ্ণপদে ভক্তি। যাঁরা সর্বভাবে পরিপূর্ণ, অন্তরে-বাইরে কোনো বন্ধন নেই এমন মুক্ত পুরুষেরাও কৃষ্ণভক্তি চর্চা করেন, কৃষ্ণগুণের স্বাভাবিক মহাশক্তিই এই রকম। সর্ববিষয়ে মুক্ত পুরুষেরাও কৃষ্ণনাম-গুণ কীর্তন করেন, এর অনাদর করলে সর্বনাশ হয়। —বিভিন্ন রকম প্রশ্ন তুলে, তার উত্তর দিয়ে সার্বভৌম ব্যাখ্যা করে আবিষ্ট হয়ে পড়েন। তেরো রকমের ব্যাখ্যা করে ভট্টাচার্য বললেন যে তিনি আর এর বেশি জানেন না। প্রভু-গৌরচন্দ্র তখন ঈষৎ হেসে বললেন,—তুমি যা ব্যাখ্যা

করলে তা সবই ঠিক। এবারে আমি কিছু বলছি, শোন। শুনে বলবে, ঠিক হচ্ছে কি না। তখন ভট্টাচার্য বিস্মিত হয়ে ভাবলেন,—আরো অর্থ করা কি মানুষের সাধ্য আছে? কেউ কখনো যা ভাবতেও পারে না তেমনি ভাবে প্রভু অর্থ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ব্যাখ্যা শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মশায় ভাবছেন,—তবে কি সন্ন্যাসীর বেশে ঈশ্বরই নেমে এলেন? প্রভু হুঙ্কার করে শ্লোক ব্যাখ্যা করছেন আর স্বীয় ঈশ্বর ভাবে আবিষ্ট হয়ে ষড়ভুজ-রূপ প্রকটিত করলেন। প্রভু তখন জিজ্ঞাসা করলেন,—কি বল, পণ্ডিত? আমার কি সন্ন্যাসে অধিকার নেই? তুমি কি আমাকে একজন সাধারণ সন্ন্যাসী ভাবছ? আমি তোমার জন্যই এখানে উপস্থিত হয়েছি। তুমি বহু জন্ম ধরে আমার ভজনা করেছ, তাই আমি তোমাকে দর্শন দিলাম। সঙ্কীর্তন-আরম্ভে আমি অবতীর্ণ হয়েছি, অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে আমি ছাড়া আর কিছু নেই। জন্মে জন্মে তুমি আমার বিশুদ্ধ প্রেমিক ভক্ত, তাই তোমাকে দেখা দিলাম। আমি সাধুদের উদ্ধার করব, দুষ্টদের বিনাশ করব, তোমার কোন চিন্তা নেই, তুমি আমার স্তব পাঠ কর। সার্বভৌম কোটি সূর্যময় অপূর্ব ষড়ভুজ মূর্তি দেখে মূর্ছা গেলেন। প্রভু ষড়ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ আনন্দে বিশাল হুঙ্কার গর্জন করছেন। প্রভু মনে মনে সার্বভৌমের প্রতি খুশি হয়ে তাঁর মাথায় হাত ছুঁইয়ে বললেন,—ওঠ। প্রভুর হস্তস্পর্শে ব্রাহ্মণ জ্ঞান ফিরে পেলেন কিন্তু আনন্দে হতভম্ব হয়ে আছেন, মুখে কথা নেই। করুণাসাগর প্রভু গৌরসুন্দর তার বুকের উপরে পা তুলে দিলেন।

সার্বভৌম প্রভুর শ্রীচরণ পেয়ে পরমানন্দ লাভ করলেন। তিনি অতি প্রেমে প্রভুর পাদপদ্ম জড়িয়ে ধরে বললেন, —আমার মনকে যিনি হরণ করেছেন, আজ তাঁকে পেলাম। লক্ষ্মীদেবীর ধনস্বরূপ অপূর্ব পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করে সার্বভৌম আনন্দে রোদন করে বললেন, প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ ধর্ম না জেনেই তোমাকে আমি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। তোমার মায়াতে মহা যোগেশ্বরও মোহপ্রাপ্ত হয়। সেই তুমি যে আমাকে মোহগ্রস্ত করবে তা আর এমন বেশি কি? এখন তোমার চরণে প্রেমভক্তি দাও। বেদ, বিপ্র, সাধু ও ধর্মের ত্রাণকর্তা, সর্বপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় হোক। বৈকুণ্ঠাদি লোকের ঈশ্বর, শুদ্ধ সত্যরূপ ন্যাসাবর প্রভুর জয় হোক। পরম সুবুদ্ধি মহাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই বলে স্তুতিপাঠ করতে লাগলেন,—কালপ্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ পুনরায় জগতের জীবকে জানাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে অবতীর্ণ হয়েছেন, তার চরণকমলে আমার চিত্তভ্রমর অত্যন্ত গাঢ়ভাবে লীন হোক। — কালবশে দিনে দিনে ভক্তি লয় প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, পুনরায় তিনি নিজভক্তি প্রকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর পাদপদ্মে যেন আমার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে। বৈরাগ্য, বিদ্যা এবং স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ জগতের জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একমাত্র এবং করুণাসাগর, অনাদিকাল থেকে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহধারী ত্রিকালসত্য যে পুরুষ, আমি তাঁর শরণাপন্ন হই। বৈরাগ্য সহ নিজের নিজের ভক্তি বুঝিয়ে দেবার জন্য প্রভু কৃপা করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিয়ে এসেছেন, ত্রিভুবনে তার সমান কেউ নেই। সেই কৃপাসিন্ধুর চরণ-গুণ-নাম আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হোক। —এইভাবে মহাপণ্ডিত সার্বভৌম একশত শ্লোকের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম ধরে কাকুতি-মিনতি করে বলছেন,—পতিতকে তারণ করার জন্যই তোমার অবতার, তাই আমার মত পতিত জনকে তুমি কৃপা করে উদ্ধার কর। তুমি আমাকে বিদ্যা, ধন, বংশ ইত্যাদি দিয়ে নানা

ভাবে বন্ধন করেছ, আমি কি করে তোমাকে জানব? হে সর্বজীব-নাথ, এবারে আমাকে কৃপা কর, সর্বদা যেন তোমাতে আমার মন থাকে। তোমার অচিন্ত্য লীলাদি তুমি নিজে না জানালে কেউ জানতে পারবে না। তুমি নিজে দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে বহুবার ভোজনের আনন্দে বসে আছ। তুমি নিজেই নিজের প্রসাদ নিচ্ছ, তোমাকে দেখে তুমি কাঁদছ, নিজেকে দেখে নিজে মহামত্ত হও, তাই তোমার মহত্ব কেউ জানতে পারে না। তুমি নিজেই তোমাকে জান, আর যে-ব্যক্তি তোমার কৃপা লাভ করেছে সে তোমাকে জানে। ব্রহ্মা-শিব-দেবগণ পর্যন্ত তোমার তত্ত্ব কিছুই জানতে পারে না, আমি অতি ক্ষুদ্র, তোমাকে কি করে জানব? —সার্বভৌম প্রভুর আশীর্বাদ লাভ করে এই রকম নানা ভাবে কাকুতি-মিনতি করছেন।

তখন ষড়ভূজ নারায়ণ সামান্য হেসে সার্বভৌমকে বললেন,—তুমি আমার পার্ষদ বলেই এই অপর্ব দৃশ্য দেখতে পেয়েছ। তুমি আমার অনেক আরাধনা করেছ, তোমার জন্যই আমার এখানে আসা। তুমি যেভাবে ভক্তির মহিমা ব্যাখ্যা করলে তাতে আমি খুবই খুশি হলাম। তোমার মুখে তো নিশ্চয় এসব উচ্চারিত হবে, তুমি ঠিকই বলেছ সব। তুমি যে শতশ্লোকে আমার স্তব করলে, যে ব্যক্তি তা পাঠ বা শ্রবণ করবে, আমার প্রতি তাঁর অবশ্যই ভক্তি হবে। ভবিষ্যতে 'সার্বভৌমশতক' বলে এর নাম হবে। তুমি যা দেখলে তা অত্যন্ত গোপন রাখবে, কেউ যেন জানতে না পারে। যতকাল আমি এই দেহে পৃথিবীতে থাকব ততদিন কাউকে বলবে না, বারণ করে দিলাম। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আমার দ্বিতীয় দেহ, ভক্তি করে তাঁর শ্রীচরণ সেবা করবে। তার নিগূঢ় তত্ত্বও কেউ জানে না, আমি কাউকে জানালে তবেই সে জানতে পারে। —প্রভু এই সকল তত্ত্ব সার্বভৌমকে বলে স্বকীয় ঐশ্বর্য সম্বরণ করে থাকলেন। নিজের ইষ্টদেবতাকে চিনে সার্বভৌম বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পরমানন্দে অভিভূত হলেন। শ্রীচৈতন্যের সব গুণাবলী শুনলে তাঁর সংসারবন্ধন কেটে যায়, তিনি চৈতন্যধামে গমন করেন। এ সকল কৃষ্ণকথা পরম নিগূঢ়, শুনলে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়।

সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে উদ্ধার করে মহাপ্রভু নীলাচলে কীর্তন প্রচার করতে লাগলেন। সর্বদা আনন্দ-আবেশে নৃত্যগীতে থেকে, কোথা দিয়ে রাত দিন কেটে গেল তাও প্রভুর খেয়াল নেই। নীলাচলের লোকেরা এই সব অপূর্ব ব্যাপার দেখে সকলেই উচ্চরবে হরিনাম নিতে আরম্ভ করলেন। প্রভুকে দেখে সকলেই বিমুগ্ধ হয়ে যায়, লোকেরা বলতে থাকে,—এই ত সচল জগন্নাথ। প্রভু যে পথে হাঁটেন তার চারদিকে কেবলই হরিধ্বনি শোনা যায়। যেখানে প্রভুর চরণদুখানি পড়ে, সেখান থেকেই লোকেরা ধুলো তুলে নেয়। যে একটু ধুলো পায় সেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে এবং মনে মনে অতীব আনন্দিত হয়। প্রভুর অনুপম সৌন্দর্য দেখে সকলেরই চিত্ত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। নিরবধি আনন্দাশ্রু ধারা বইছে, মুখে কেবল 'হরেকৃষ্ণ'। শরীর চন্দনে মালায় ঢেকে গিয়েছে, মত্তসিংহের চেয়েও তাঁর চলন অতি মনোরম। পথে চলেন কিন্তু প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নেই, তিনি ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে আছেন।

কিছু কাল কেটে গেল। পরমানন্দ পুরী তীর্থ পর্যটন করে এসেছেন। প্রভু তাঁকে দূর থেকে লক্ষ্য করেই উঠে দাঁড়ালেন। প্রিয় ভক্তকে দেখে প্রভু মহা-আনন্দে, মহা-প্রেমে নৃত্য করে স্তুতি জানালেন। তিনি বাহু তুলে বললেন, পরমানন্দ পুরীকে সাক্ষাৎ দর্শন করে চোখ জুড়ালো, জন্ম সফল হল, আমার সব ধর্ম সফল হল, আমার সন্ন্যাসও

আজ ধন্য, আমি মনে করি আজ মাধবেন্দ্র পুরীই আমার সামনে উপস্থিত হয়েছেন। —এই বলে প্রিয় ভক্তকে কোলে নিয়ে অশ্রুতে তাঁর গা ভাসিয়ে দিলেন। পুরীজী প্রথমেই প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছেন। তারপর তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম করলেন। প্রভু তাঁকে পেয়ে পার্ষদরূপে নিজের কাছেই রেখে দিলেন। পরমানন্দ পুরীও নিজপ্রভুকে চিনতে পেরে তাঁর পাদপদ্ম সেবা করে আনন্দেই থাকলেন। এই পরমানন্দপুরী হচ্ছেন শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীজীর শিষ্য। কিছুদিন পরে স্বরূপদামোদরও এসে উপস্থিত হলেন, ইনি সর্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকতেন। দামোদরস্বরূপের গলাটি ছিল সঙ্গীতরসময়, তার ধ্বনি শুনলেই প্রভু নেচে উঠতেন। পরমানন্দপুরী এবং স্বরূপদামোদর—এই দুজনই প্রভুর শেষ লীলায় সঙ্গে থাকার অধিকার লাভ করেছিলেন। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে সব ভক্তগণ নীলাচলে এসে উপস্থিত হলেন। পার্ষদগণের মধ্যে যাঁরা উৎকলে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরাও ক্রমান্বয়ে এসে মিলিত হলেন। দুই মহাধীর,—প্রেমময় প্রদ্যুম্ন মিশ্র এবং পরমানন্দ রামানন্দ রায় এসে মিলিত হলেন। আরো এলেন দামোদর পণ্ডিত এবং শঙ্কর পণ্ডিত। নৃসিংহদেবের ভক্ত প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী এই জেনে এসেছেন যে তাঁর ইষ্টদেব নৃসিংহই সন্ন্যাসীরূপে পুরীধামে এখন নৃত্যকীর্তনাদি করছেন। তাই তিনিও এসে কাছে থাকলেন। ভগবান আচার্য কখনো বিষয়-আশয়ের কথা কানে শুনতেই চাইতেন না, তিনিও এলেন। যেখানে যত ভক্ত ছিলেন, এভাবে আস্তে আস্তে সকলেই প্রভুর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। প্রভুকে দেখে সকলেরই দুঃখ ঘুচে গেল, সকলেই প্রভুর সঙ্গে কীর্তনাদিতে মত্ত হলেন। বৈকুণ্ঠের অধিপতি সন্ন্যাসীরূপে সকল ভক্তের সঙ্গে কীর্তন করছেন।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মহাধীর হলেও শ্রীচৈতন্যের প্রেমবসে মহা অস্থির, কখনও তিনি এক স্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারেন না। জগন্নাথদেবকে দর্শন করে তাঁকে ধরতে যান, পড়িছারা ধরে রাখতে পারেন না। তিনি একদিন সোনার সিংহাসনে উঠে বলরামকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। তিনি উঠতেই পড়িছারা তাঁর হাত ধরে বাধা দিলেন, তার ফলে তিনি পাঁচ-সাত হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লেন। মালা পরে তিনি আস্তে আস্তে হাঁটছেন। তখন পড়িছাগণ ভাবলেন,—এ অবধূত কখনো মনুষ্য নয়, বলরামের স্পর্শে কি অন্যের শরীর ঠিক থাকতে পারে? আমি পাগলা হাতি ধরে রাখতে পারি, আমার হাত ছাড়িয়েও কোনো মানুষ যেতে পারে না। সেই আমি আচ্ছা করে ধরলাম আর তৃণের মত গিয়ে কোথায় পড়লাম? —পড়িছা এই সব কথা ভেবে শ্রীনিত্যানন্দকে দেখলেই তিনি খুব সম্ভ্রম করে কথা বলতেন। শ্রীনিত্যানন্দ বাল্যভাবের স্বভাবেই বিগ্রহের সঙ্গে পরম অনুরাগে আলিঙ্গন করেছেন।

কিছুদিন পরে প্রভু এসে সমুদ্রের কাছে বাস করতেন। সমুদ্রপারের মনোহর দৃশ্য দেখে প্রভু বড় খুশি হলেন। জ্যোৎস্না রাত, দক্ষিণে হাওয়া বইছে, প্রভু সমুদ্রের পারে বসলেন। তাঁর সারা গায়ে চন্দন শোভিত, মুখে সর্বদা 'হরেকৃষ্ণ' নাম। মালায় বুক ভরে গেছে, খুব সুন্দর, ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। রাতে সমুদ্রের ঢেউয়ের অপূর্ব শোভা হয়, প্রভু সেদিকে তাকিয়ে হাসছেন। এতকাল গঙ্গা-যমুনা যে সৌভাগ্য লাভ করেছিল, এখন সমুদ্র তাই পেল। প্রভু সমুদ্রতীরেই ভক্তবৃন্দকে নিয়ে থাকেন। আনন্দ-কীর্তনে সারা রাত কাটিয়ে দেন। প্রভু তাণ্ডব নৃত্যে বড় নিপুণ। তিনি নিজপ্রেম-রসে

তাণ্ডব করছেন দেখে সকলেই খুশি। অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, গর্জন, স্বেদ, রোমহর্ষ, নানা বর্ণধারণ—যত রকমের ভক্তিবিকার আছে সবই প্রভুর শরীরে এক সঙ্গে দেখা দিচ্ছে। সমস্ত রকমের ভক্তিলক্ষণই ঈশ্বরের শক্তি বা অংশ এবং তা চেতনাময়। প্রভু ভক্ত-আবেশে নাচছেন, তাই সকলেই পাশে থাকছেন। অল্পমাত্র সময়ের জন্যও কৃষ্ণপ্রেম থেকে প্রভুর বিচ্ছেদ হয় না। লীলার পূর্ণতম আবেশের সময়ে প্রভুর মধ্যে যে-শক্তির বিকাশ হয়, অন্যত্র তা কখনো সম্ভব নয়। এর থেকে প্রভুর স্বরূপতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। ঈশ্বর গৌরচন্দ্রের এইরূপ বৈশিষ্ট্যময় তত্ত্বই সমস্ত বেদে উল্লিখিত আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে প্রেম প্রকাশ করছেন তাছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কিছু নেই। এই জন্য তাঁর উপমা একমাত্র তিনিই, তাঁকে ছাড়া আর কারো সঙ্গে তাঁর উপমা দেওয়া চলে না। তাঁর আশীর্বাদ হলেই তাঁর তত্ত্ব জানা যেতে পারে, নতুবা নয়। সর্বভাবে ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করলে সংসারবন্ধন খণ্ডন হয় এবং ভক্তি লাভ করা যায়। ব্রহ্মা-শিব প্রমুখ দেবগণ পূর্ণকাম হয়েও সর্বদা তাঁকে ভজনা করেন, তিনিই এখন আবার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে প্রেমলীলায় নৃত্য করছেন। গৌরচন্দ্রের সঙ্গে যে সকল ভক্ত নৃত্য কীর্তনাদি করেছেন তাঁদের চরণে নমস্কার জানাই।

সমুদ্রপারে সারারাত প্রভু নৃত্যকীর্তনাদি করছেন। গদাধর সর্বদা সঙ্গে আছেন, তিনি কখনো প্রভুকে ছেড়ে যান না। ভোজনে, শয়নে, পর্যটনে সর্বদা গদাধর প্রভুর সঙ্গেই থাকেন। গদাধর প্রভুর সামনে বসে ভাগবত পড়েন, প্রভু শুনে প্রেমে মেতে ওঠেন। প্রভু গদাধরের কথা শুনতে ভালবাসেন, গদাধরের সঙ্গেই তিনি বৈষ্ণবদের বাড়িতে যান।

একদিন প্রভু পুরী গোঁসাইর মঠে গিয়ে তাঁর কাছে বসেছেন। রূপপুরের কৃষ্ণানন্দের মতই প্রভু তাঁর পুরীজীর প্রীতি। পুরীজীর সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপনে প্রভু সর্বদা আনন্দে থাকেন। পুরীজীর আশ্রমের কুয়োর জল ভাল ছিল না, অন্তর্যামী প্রভু তা জানতেন। প্রভু পুরীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—কুয়োর জল কেমন হয়েছে? পুরীজী উত্তর করলেন,—জল হয়েছে ঘোলা কাদাময়। শুনে প্রভু দুঃখ করে বললেন, —জগন্নাথ কৃপণ হয়েছেন। পুরীজীর কুয়োর জল যে ছোঁবে তার সমস্ত পাপ কেটে যাবে। জগন্নাথের মায়াতে কুয়োর জল খারাপ হয়ে গেছে, এই জল কারো খাওয়া উচিত নয়। — এই কথা বলে প্রভু উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে আবার বললেন,—জগন্নাথদেব, আমাকে এই আশীর্বাদ দাও যেন গঙ্গা এসে কুয়োতে প্রবেশ করেন। পাতালে প্রবাহিতা ভোগবতী গঙ্গা যাতে এই কুয়োতে প্রবেশ করেন, প্রভু, তুমি সেই ব্যবস্থা কর। প্রভুর শ্রীমুখের এই উচ্চারণ শুনে সর্বভক্তবৃন্দ উচ্চ স্বরে হরিধ্বনি করে উঠলেন। তারপর প্রভু ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করলেন, ভক্তরাও চলে গেলেন। গঙ্গাদেবী তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে কুয়োতে এসে প্রবেশ করলেন। সকলে উঠে দেখলেন যে কুয়ো নির্মল জলে পরিপূর্ণ। আশ্চর্য ব্যাপার দেখে ভক্তগণ হরিধ্বনি করে উঠলেন, পুরীজী আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। মা-গঙ্গা কুয়োর ভেতরে এসেছেন জেনে সকলে কুয়ো প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। প্রভু সেই খবর শুনে দেখতে এসে ভক্তগণকে বললেন,—এই কুয়োর জলে স্নান করলে বা খেলে তাঁর গঙ্গাস্নানের ফল হবে, এবং তাঁর কৃষ্ণভক্তি লাভ হবে। ভক্তবৃন্দ প্রভুর কথা শুনে উচ্চস্বরে হরিধ্বনি করে উঠলেন। পুরীগোস্বামীর প্রীতির জন্য প্রভু সেই জলে মহানন্দে স্নান-পান করলেন। প্রভু বললেন,—আমি পুরীগোস্বামীর প্রীতির

জন্যই পৃথিবীতে আছি। আমি পুবীগোস্বামীব থেকে আলাদা কিছু নই। পুবীজীকে দর্শন কবলেই শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ কবা যায। পুবী গোস্বামীব মহিমা বলে এবং কৃপকে ধন্য কবে তিনি নিজেব স্থানে চলে এলেন।

কি কবে ভক্তমহিমা প্রচাব কবা যায তা প্রভু ভালই জানেন। কৃতঘ্ন হলে সে এমন প্রভুকেও না ভজে থাকে। ভক্তকে বক্ষা কবাব জন্যই প্রভু অবতীর্ণ হযেছেন, ভক্তসঙ্গেই তিনি সর্বদা লীলাদি কবেন। সেবকেব বক্ষাব জন্য যে প্রভু অকর্তব্যও কবেন তাব প্রমাণ সুগ্রীবেব জন্যে বালিকে বধ কবা। প্রভু নিজেব আনন্দেই সেবকেব দাস্য কবেন, ভক্তবৃন্দও অজয চৈতন্যসিংহকে জয কবে থাকেন। বৈকুণ্ঠনাথ সমুদ্রতীবে ভক্তগণকে সঙ্গে নিযে কীর্তন কবছেন। এই সমুদ্র থেকেই লক্ষ্মীদেবীব জন্ম হযেছে, তাই এই অবতাবে প্রভু সমুদ্রকে কৃতার্থ কবছেন। নীলাচলবাসী লোকেবা কিছু পাপ কবলে সমুদ্রস্নানেই তা ধুযে মুছে যায। ভাগ্যবতী গঙ্গাদেবী সবেগে ধেযে এসে তাই সিন্ধুব সঙ্গে মিলিত হযেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তাই সিন্ধুতীবে বাস কবে তাকে ধন্য কবলেন।

প্রভু যখন নীলাচলে এসেছিলেন তখন বাজা প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যায় ছিলেন না। যুদ্ধেব প্রযোজনে তিনি বিজযনগবে গিযেছিলেন। প্রভু কিছুদিন নীলাচলে থেকে আবাব গৌড়ে ফিবে এসেছিলেন। তিনি গঙ্গামাতাকে দর্শনেব জন্যই এসেছিলেন। ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে নিযে [illegible] সার্বভৌমেব ভাই বিদ্যাবাচস্পতিব বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি অতীব ধর্মপবাযণ পণ্ডিত ছিলেন। প্রভুকে অতিথিরূপে পেযে বিদ্যাবাচস্পতি প্রভুব পদপ্রান্তে দণ্ডবৎ হযে পড়লেন। বিপ্র এমনই আনন্দিত হলেন যে তিনি কী কববেন বুঝে উঠতে পাবলেন না। প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন কবে বললেন, আমাব মথুবা যাবাব ইচ্ছা। কিছুদিন এখানে থেকে গঙ্গাস্নান কবব। তুমি সেই কদিনেব মত আমাকে একখানি ঘবেব ব্যবস্থা কবে দাও। আমি একটু নিজেনে থাকতে চাই। আমাকে যদি পেতে চাও তাহলে অবশ্যই এ কাজটুকু কববে। বিদ্যাবাচস্পতি বিনয বচনে বললেন, —আমাব বংশেব সকলেব সৌভাগ্য যে তুমি এখানে পদধূলি দান কবলে। আমাব ঘব দুযাব সবই তোমাব, তুমি যে কদিন ইচ্ছা অনাযাসে থাক। কেউ কিছু জানবে না। প্রভু তাব কথায সন্তুষ্ট হযে কিছুদিনেব জন্য সেখানে থেকে গেলেন। সূর্যোদযেব সংবাদ যেমন কাউকে বলে দিতে হয না, লোকেবা জেনে গেল যে প্রভু এখানে আছেন। নদীযাব সর্বত্র খবব ছড়িযে পড়ল যে প্রভু এখন বাচস্পতিব বাড়িতে বযেছেন। লোকেবা মহা আনন্দে সংসাব ভুলে গিযে সকলে মিলে দলবেঁধে প্রভুকে দর্শন কবতে আসতে লাগল। সকলেই উৎকণ্ঠিত, কেউ কাবো সঙ্গে একটু কথাও বলছে না পথে। প্রভুব দর্শনেব জন্য অসংখ্য অগণিত লোক আসতে লাগল। পথ দিযে সকলে আসতে পাবছে না, এতই লোকেব ভিড়। কেউ কেউ ডাল ভেঙ্গে, বন জঙ্গল মাড়িযে তাব মধ্য দিযেই চলেছে। কিন্তু তবু তাদেব মনে কোন দুঃখ নেই। বহু লোকেব হাঁটাব ফলে গভীব বনেব ভেতব দিযেই পথ হযে গেল। নানা দিক থেকে বহু বহু লোক আসতে লাগল। কেউ বলছে,— আমি তাঁব চবণ ধবে প্রার্থনা জানাব যাতে আমাব সংসাব বন্ধন খণ্ডন হয। কেউ বলছে,—তাঁব কাছে কিছু চাইব না, তাঁকে শুধু চোখে দেখলেই আমাব সব কিছু পাওযা হযে যাবে। আবাব কেউ বলছে,—আমি তাঁব মহিমা না জেনে কত-না নিন্দা কবেছি। এখন তাঁব কাছে শুধু এই কামনাই জানাব যে আমাব সেই পাপ থেকে যেন মুক্তি পাই। কেউ বলছে,—আমাব ছেলে মহা-জুযাড়ী, ছেলে যেন আব জুযা না খেলে, তাঁব কাছে সেই প্রার্থনাই জানাব।

কেউ বলে,—আমি আশীর্বাদ চাইব যেন তাঁর পাদপদ্মে চিরদিনের জন্য আশ্রয় লাভ করতে পারি। কেউ আবার বলছে,—আমি যেন শ্রীগৌরসুন্দরকে কখনো না ভুলি, এই আমার কামনা। এইসব কথা আলাপ করতে করতে আবার বহুলোক চলেছেন। হঠাৎ এত লোক খেয়াঘাটে এসে উপস্থিত হওয়াতে খেয়াঘাটের মাঝি বড়ই বিপদে পড়ে গেল। শয়ে শয়ে লোক একটি নৌকাতে উঠে বসছে আর নৌকা ভেঙ্গে পড়ছে। কোথাও বা আবার লোকেরা মাঝিকে একখানা কাপড় দিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়া পার হয়ে যায়। নৌকা না পেয়ে কেউ কেউ কলসী ধরে সাঁতরিয়ে গঙ্গা পার হচ্ছে। কেউ সাঁতার কেটে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার কলাগাছ দিয়ে ভেলা তৈরি করে তাতে পার হচ্ছে। চতুর্দিক থেকে লোকেরা হরিধ্বনি করে এসে উপস্থিত হতে থাকে। বাচস্পতি মশায় এসে অনেক নৌকার ব্যবস্থা করলেন। নৌকার জন্য বসে না থেকে যে যেমন ভাবে পারে, চলে এসেছে। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান না হলে এত লোককে আকর্ষণ করলেন কি করে? গঙ্গা পার হয়ে সকলেই বাচস্পতিকে অনুনয় করে বলতে লাগলেন,—তুমি খুবই ভাগ্যবান তাই প্রভু তোমার বাড়িতে এসে উঠেছেন। এখন আমাদের নিস্তারের ব্যবস্থা কর। আমরা সংসারের মায়াবন্ধনে অন্ধ হয়ে আছি, তাই এক গ্রামে বাস করেও তাঁকে চিনতে পারি নি। এখন তাঁর চরণযুগল দর্শনের ব্যবস্থা করে দাও, তাহলে আমাদের মুক্তি হতে পারে। বিদ্যাবাচস্পতি এত লোকের এমন আর্তি দেখে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। সকলকে নিয়ে নিজের বাড়িতে এসে তিনি দেখলেন সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক হরিধ্বনি দিচ্ছে। আর অন্য কোন কথা কারো মুখে নেই। করুণাসাগর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সকলকে উদ্ধার করার জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন। প্রভু হরিধ্বনি শুনে খুশি হয়েই বেরিয়ে লোকদের দর্শন দিলেন।

প্রভুর শরীরের অপূর্ব মনোহর সৌন্দর্য দেখলেন লোকেরা। শ্রীমুখ সদাপ্রসন্ন, নয়নদ্বয় আনন্দধারায় পূর্ণ। ভক্তগণ তাঁর সারা গায়ে চন্দন লেপে দিয়েছেন, ফুলের মালায় বুক ঢেকে গিয়েছে। তিনি আস্তে আস্তে হাঁটছেন। প্রভু আজানুলম্বিত ভুজ দুটি তুলে সিংহগর্জনে 'হরি' বলে উঠছেন। প্রভুকে দেখে ঐ অসংখ্য লোক 'হরি' বলে নাচতে শুরু করেছেন। তাঁরা দু হাত তুলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানায়,—প্রভু, আমরা পাপিষ্ঠ, তুমি আমাদের উদ্ধার কর। প্রভু ঈষৎ হেসে সকলকে উদ্দেশ করে বললেন,—তোমাদের কৃষ্ণে মতি হোক, কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ ভজন কর, কৃষ্ণনাম শোন, কৃষ্ণকেই একমাত্র জীবন-ধন-প্রাণ বলে জ্ঞান কর। তখন সকলে মিলে হরিধ্বনি করে পুনঃপুনঃ প্রভুর স্তুতিবাদ করতে লাগলেন,—প্রভু, তুমি জগৎ-উদ্ধারের জন্য নবদ্বীপে শচীগৃহে অবতীর্ণ হয়েছ। আমরা অতীব পাপিষ্ঠ, তোমাকে চিনতে না পেরে অন্ধকূপে ডুবে রয়েছি। তুমি করুণাসাগর এবং পরহিতকারী। আমাদের কৃপা কর, তোমাকে যেন আর কখনো না ভুলি।—এইভাবে চতুর্দিকে লোকরা তাঁর স্তুতি করছেন। প্রভুর কী লীলা। মানুষে মানুষে সারা তল্লাট ভরতি হয়ে গেছে, পথে, প্রান্তরে, হাটে—কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। একবার দেখে চোখ জুড়ায় না, লোকেরা আবার প্রভুকে দেখতে চায়। এককেটা গাছে অনেক লোক উঠে পড়ছে প্রভুকে দেখবার জন্য। অনেকে আবার ঘরের চালে উঠে বসেছে। ভগবানের আশীর্বাদেই বেঁচে যায়, তা না হলে ঘর ভেঙ্গেই পড়বার কথা। লোকেরা শ্রীমুখ দেখা মাত্র হরিধ্বনি করছে। ক্রমেই লোকের ভীড় বাড়ছে। প্রভুকে দর্শন করে আর কেউ ঘরে ফিরতে পারছে না। লোকের ভীড় কেবলই বেড়ে চলেছে। শ্রীগৌরসুন্দরের কত

লীলা! হঠাৎ তিনি কিছু না বলে কুলিয়ানগরে চলে গেলেন। বাচস্পতিও কিছু জানেন না। শ্রীনিত্যানন্দ এবং আর দু-চারজনকে নিয়ে তিনি চলে এলেন। প্রভু তো কুলিয়াগ্রামে কিন্তু ওদিকে বাচস্পতির বাড়িতে লোকেরা হুতাশ হয়ে পড়েছে। বাচস্পতি প্রভুকে খুঁজতে লাগলেন। প্রভু কোথায় গেছেন, তিনি জানেন না। বিপ্র প্রভুকে দেখতে না পেয়ে মুখ তুলে কাঁদতে লাগলেন। সকলেই ভাবছে,—প্রভু বাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে আছেন। প্রভু হরিনাম শুনলেই বোধহয় আসবেন, এই ভেবে লোকেরা প্রাণপণ চীৎকার করে হরিনাম করতে আরম্ভ করল। কিছু সময় পরে বাচস্পতি বাইরে এসে জানালেন,—প্রভু রাত্রেই আমাকেও কিছু না বলে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন তা আমিও জানি না।

বাচস্পতি যতই লোকদের বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছেন কিন্তু লোকেরা কিছুতেই বিশ্বাস করছে না। সকলেই মনে মনে ভাবছে, প্রভু এত লোকের ভীড় দেখে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে আছেন, বাচস্পতি সত্যি কথা বলছেন না। কেউ কেউ বাচস্পতিকে গোপনে বলছেন,—আমি শুধু একাই দেখতে চাই, আমাকে একটু ব্যবস্থা করে দাও। -সকলেই বাচস্পতিকে বলছেন,—একবার মাত্র একটু দেখতে চাই, তবেই চলে যাব। প্রভুকে আমাদের কথা জানাও,—আমরা তাঁর কথা অমান্য করব না, আমরা কেবল মাত্র একটি বার তাঁর দর্শন চাই। -বাচস্পতি যত বোঝাচ্ছেন, কেউ কিছুতেই কিছু শুনতে চায় না, বুঝতে চায় না। লোকেরা বিরক্ত হয়ে বাচস্পতিকে মুখ করতে আরম্ভ করল বলল,—প্রভুকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলছ। আমরা উদ্ধার পেলে তোমার কি কিছু ক্ষতি হবে? তুমি শুধু নিজেই তরে যাবে, এতেই তোমার আনন্দ! কেউ বলছেন, —সকলে যাতে উদ্ধার পায় সেই চেষ্টা করাই সৎলোকের উচিত। নিজের ভাল করতে সকলেই চায় কিন্তু সাধুপুরুষেরা নিজেকে বাদ দিয়েও অন্যের উপকার করেন। কেউ বললেন,—ভাল জিনিস একা ভোগ করলে অধর্ম হয়। ত্রিভুবনের মধ্যে এমন উৎকৃষ্ট বস্তু কি একা উপভোগ করতে আছে? কেউ আবার বলছে, —ব্রাহ্মণ কপট-হৃদয়, পরোপকারের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। বাচস্পতি একে প্রভুর বিরহে কাতর হয়েছেন, তার উপরে আবার লোকের কাছে এইসব কটু কথা শুনতে হচ্ছে। বাচস্পতি মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন, কি করে এর থেকে উদ্ধার পাবেন তা কিছুই বুঝতে পারছেন না। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ এসে বাচস্পতির কানে কানে বললেন, —প্রভু কুলিয়াতে চলে গেছেন, এই খবর দিলাম, এখন কি করবে ভেবে দেখ। এই কথা শুনেই বাচস্পতি ব্রাহ্মণকে আনন্দে আলিঙ্গন করলেন। তারপর বাড়ির সামনে এসে লোকেদের সামনে বললেন,— তোমরা কিছুই না জেনে আমাকে দোষারোপ করছ। ভেবেছ, আমি প্রভুকে লুকিয়ে রেখেছি। এই মাত্র একজন ব্রাহ্মণ এসে আমাকে খবর দিলেন —প্রভু কুলিয়ানগরে চলে গেছেন। চল, আমরা সকলে মিলে কুলিয়াতে যাই, যদি আমার কথা সত্যি হয় তবেই আমাকে ব্রাহ্মণ বলে জানবে।

তৎক্ষণাৎ সকলে মিলে কুলিয়ার দিকে চললেন। চারদিকে অমনি খবর রটে গেল যে প্রভু কুলিয়াতে চলে গেছেন। নদীয়া থেকে কুলিয়ায় যেতে হলে গঙ্গা পার হতেই হবে। সকলে সেই পথেই চলল। বাচস্পতির গ্রামের ভীড়ের চেয়েও এখানে আরো বেশি ভীড় হল। কুলিয়াগ্রামের প্রতি লোকের যে কি পরিমাণ আকর্ষণ তা বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্য নয়। লক্ষ লক্ষ নৌকা যে কোথা থেকে এল তা কেউ বলতে পারবে না। নানা লোক নানাভাবে আসছে। গঙ্গায় কিছু কিছু নৌকা ডুবেও গেল কিন্তু কোন

লোকজন মারা গেল না। নৌকা ডুবলেই দেখা যায় সেখানে জল কম। শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহেই এসব হচ্ছে। প্রভুর নাম করলেই সংসার পার হওয়া যায়। প্রভুর সাক্ষাতের জন্য যারা আসছে তারা তো অবশ্যই গঙ্গা পার হতে পারবে। বহু লোক গঙ্গায় ভেসেও চলে আসছেন। লোকেরা গঙ্গা পার হয়ে নিজেদের মধ্যে কোলাকুলি করে হরিধ্বনি করছে। মাঝিদেরও অনেক রোজগার হল। খেয়াঘাটে বলতে গেলে হাট বসে গেছে। চারদিকে ঘুরে ঘুরে যার যা ইচ্ছা কেনাকাটা করছে, কে যে এসব করাচ্ছে কে জানে? কিছুক্ষণের মধ্যেই কুলিয়াগ্রামের মাঠ ময়দান সব লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। হাজার হাজার লোক হরিধ্বনি করছে কিন্তু সন্ন্যাসী বেরুচ্ছেন না, পালিয়ে রয়েছেন। বাচস্পতি এসেও প্রভুর খোঁজ পেলেন না। একটু পরে বাচস্পতিকে একা ডেকে আনলেন প্রভু। মহেশ্বর বিশারদের পুত্র প্রভুকে দেখেই দণ্ডবৎ করলেন। চৈতন্যের অবতারের বিষয় বর্ণনা করে করে বিপ্র শ্লোক পড়তে লাগলেন। —পতিত লোকদের ভবকূপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। কৃপাসমুদ্র গৌরসুন্দরের পায়ে জন্ম জন্ম আমার চিত্ত সংলগ্ন হোক। সমস্ত লোক সংসারে মগ্ন দেখে তিনি কৃপা করে প্রেম বর্ষণ করছেন। এই কৃপাময় গৌরচন্দ্র সর্বদা আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হোক। —এই ভাবে পুনঃপুনঃ দণ্ডবৎ হয়ে বাচস্পতি-বিপ্র প্রভুর স্তব করছেন। মহেশ্বর বিশারদকে নমস্কার জানাই, তাঁরই দুই পুত্র বিদ্যাবাচস্পতি এবং বাসুদেব সার্বভৌম। বাচস্পতিকে দেখে প্রভু তাঁকে বসতে বললেন। তিনি দাঁড়িয়ে থেকেই হাত জোড় করে বললেন,—আমার একটি নিবেদন আছে, তুমি সচ্ছন্দ পরমানন্দ, তোমার ইচ্ছায়ই সব কাজ হয়। তুমি নিজের ইচ্ছাতেই থাক, নিজের ইচ্ছাতেই চল, তুমি নিজে লোককে জানাও, তাই লোকে তোমাকে জানে। তুমিই তোমার কাজের প্রমাণ, তোমাকে কেউ বিধিনিষেধ দিতে পারে না। লোকেরা সব কথা না জেনেই আমাকে নিষ্ঠুর বলে তিরস্কার করছে। তারা বলে, আমি তোমাকে আমার ঘরে লুকিয়ে রেখেছি, তাদের দেখতে দিই না। তুমি একটু বেরিয়ে দেখা দিলে তবেই লোকে আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করবে। প্রভু বিপ্রের কথা শুনে একটু হেসে তাঁর ইচ্ছা মত কাজ করলেন।

যেইমাত্র প্রভু বেরিয়ে দর্শন দিলেন, অমনি লোকেরা মহানন্দে মগ্ন হলেন। চারদিক থেকে লোকেরা দণ্ডবৎ হয়ে পড়েছে, যার যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে স্তুতি পড়তে লাগল। অসংখ্য লোক হরিধ্বনি করছে। বহু বহু কীর্তনের দল নানা জায়গায় পরমানন্দে গান গাইতে লেগেছে। প্রভু রাতদিন কৃষ্ণনামের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ভরে দিলেন। ব্রহ্মলোক শিবলোক পর্যন্ত সকলেই এর বিন্দুমাত্র লাভ করে সমস্ত দুঃখ ভুলে যান। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ পর্যন্ত যে সুখের একটু অংশ পেলেই খুশি হন, প্রভু সন্ন্যাসী বেশে পৃথিবীবাসীকে তাই দান করে চলেছেন। এই সর্বশক্তিমান ভগবানকে যে পাপী মায়ামুগ্ধ হয়ে বিশ্বাস না করে তার জন্ম-কর্ম-বিদ্যা ব্রাহ্মণাচার সবই মিথ্যা এবং সে সকলের করুণার পাত্র। সকলে মিলে তাই শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণ বন্দনা কর, তাঁর কথা শুনলেও অবিদ্যা খণ্ডন হয়ে যায়। তাঁকে ভজনা করলে সব সন্তাপ দূরীভূত হয়। চতুর্দিকে সঙ্কীর্তন হচ্ছে। প্রভু সকলকে নিয়ে আনন্দে ভাসছেন। শ্রীগৌরসুন্দর আনন্দধারায় পূর্ণ। এই অবতারে তিনি সর্বদা সঙ্কীর্তন-আনন্দে বিহ্বল থাকেন। প্রভু যে লোককে সামনে দেখেন তাদের সঙ্গেই আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন। লোকেরা তাতে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। মহাবিহ্বল শ্রীনিতাই কখনো আবার প্রভুকে ধরে নাচেন, তিনি নিজেও

মাঝেমাঝে প্রভুর সঙ্গে নাচছেন। নিজের লীলাতে নিজেই বিহ্বল। মহাপ্রভু সিংহনাদ করে নাচছেন, সেই হুঙ্কার শুনলেই মনের সব অবসাদ কেটে যায়। ভগবান শঙ্কর যার প্রেমে মত্ত হয়ে বস্ত্র পরতেও ভুলে যান, তিনিই এখন বহুলোকের মধ্যে নাচছেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার শক্তির বশীভূত তিনিই এখন প্রেমানন্দে পৃথিবীর বুকে নাচছেন। সকল শাস্ত্রেই তাঁকে কামনা করা হয়েছে, তিনি এখন চৈতন্যরূপে সংসারকে উদ্ধার করছেন। চারদিক থেকে যত লোক আসছে, সবাই এসে দেখছে প্রভু নৃত্য করছেন। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নেই, তিনি প্রেমে আকুল। কুলিয়া গ্রামে এবং তার আশেপাশে যত ছোট-বড় পাপী ছিল সকলেই পার হয়ে গেল। কুলিয়াগ্রামে চৈতন্যপ্রভুর প্রকাশের কথা শুনলে সকল কর্মপাশ কেটে যায়। প্রভু সকলকে দর্শন দিয়ে, সকলকে আনন্দ দান করে পার্ষদগণকে নিয়ে বাহ্যজ্ঞান লাভ করে বসলেন।

এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে জোর করে প্রভুর চরণ ধরে বললেন, —প্রভু, আমার একটি কথা আছে, তুমি যদি শোন তাহলেই বলতে পারি। আমি পাপী, ভক্তির বিষয় কিছু না জেনে তোমার অনেক নিন্দা করেছি। তাতে আমি নিজেরই ক্ষতি করেছি। কলিযুগে আবার কিসের বৈষ্ণব, কিসের কীর্তন—এই রকম অনেক কথা বলেছি। সেসব পাপ কাজের কথা মনে পড়লেও এখন আমি মনে বড় কষ্ট পাই। তোমার প্রতাপ সংসার-সমুদ্র থেকে জীবকে উদ্ধার করবার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ। এখন আমাকে তুমি বল, আমি কি করে সেই পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি। -ব্রাহ্মণের এই আন্তরিক আবেদন শুনে প্রভু তাকে উপায় বলে দিলেন,—যে মুখে আমরা বিষ গ্রহণ করি সে মুখেই যদি আমরা অমৃত খাই তাহলে বিষও হজম হয়ে যায় আর দেহও অমর হয়। তুমি না জেনে যত নিন্দা করেছ তাই তোমার পক্ষে বিষ খাওয়া, এখন সেই মুখে সর্বদা কৃষ্ণগুণ গান কর। যে মুখে বৈষ্ণবনিন্দা করেছ, এখন সেই মুখেই বৈষ্ণববন্দনা কর। ভক্তের মহিমা প্রকাশ করে গান এবং কৃষ্ণগুণ-নাম-ভক্তির মহিমা বিষয়ে কবিতা রচনা কর গিয়ে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যার পরমানন্দরূপ অমৃতের প্রভাবে তোমার যত সব ভক্তনিন্দার বিষ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। কেবল তোমাকে নয়, তোমার উপলক্ষে আমি এই কথা সকলকেই বললাম। না জেনে যারা নিন্দা করেছে তাদের সকলের জন্যই এই উপদেশ। আর যদি কখনো নিন্দা না করে, সর্বদা বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের গুণকীর্তন করে তবেই পাপ কেটে যাবে। তা না হলে কোটি প্রায়শ্চিত্ত করলেও কোন ফল হবে না। বিপ্র, যাও,—এখন থেকে গিয়ে ভক্তি ব্যাখ্যাদি কর তবেই তোমার সর্বপাপ বিমোচন হবে। —বৈষ্ণবগণ প্রভুর শ্রীমুখের বাণী শুনে হরিধ্বনি ও জয়ধ্বনি করেন। নিন্দক-পাপীদের এই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করলেন প্রভু। এই আদেশ পালন না করে যারা সাধুদের নিন্দা করে সেই পাপীরা চিরকাল দুঃখ পায়। শ্রীচৈতন্যের আদেশকে যে যে বেদের সারকথা বলে মান্য করে তারা সবাই অনায়াসে ভবসিন্ধু পার হয়ে যায়।

বিপ্রকে তত্ত্ব-উপদেশ করবার একটু পরেই পণ্ডিত-দেবানন্দ এলেন। গৌরচন্দ্র যখন গৃহবাসে ছিলেন তখন তাঁরা কত আনন্দ করেছেন। তখন কিন্তু দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে বিশ্বাস ছিল না, তাই তিনি দেখতেও পান নি। দেখবার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি দেখতে পেলেন না। প্রভু যখন সন্ন্যাস নিয়ে নবদ্বীপ ছেড়ে চলেছেন তখন দেবানন্দের সৌভাগ্যবশত বক্রেশ্বর পণ্ডিত এসে উপস্থিত হলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের প্রিয়পাত্র, তাঁর স্মরণে সকলেই পবিত্র হয়। বক্রেশ্বরের কৃষ্ণপ্রেমময় দেহ সর্বদা কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে

বিহ্বল থাকে। তাঁর নৃত্য দেখে দেবতা অসুর সকলেই মোহিত হয়। অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হাস্য, পুলক, হুঙ্কার, বিবর্ণতা, আনন্দমূর্ছা—এসব ভক্তিলক্ষণ সবই প্রভুর কৃপায় তাঁর দেহে প্রবেশ করে, তিনি নৃত্য করলেই এসব হয়। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রচণ্ড ভক্তিলক্ষণাদি সব প্রকাশ করা অসম্ভব। সৌভাগ্যবশে দেবানন্দ পণ্ডিত তাঁর আশ্রমে কিছু দিন ছিলেন। আনন্দেই কাটিয়েছিলেন। তাঁর দ্যুতিময় শরীর দেখে এবং অনুপম বিষ্ণুভক্তি লক্ষ্য করে দেবানন্দ পণ্ডিত খুবই আনন্দিত হয়েছেন। তিনি নিজেও প্রাণ খুলে সেই প্রেমানন্দ উপভোগ করেছেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত যতক্ষণ নৃত্য করেন তিনি ততক্ষণই হাতে বেত নিয়ে ঘুরতে থাকেন। সব লোকদের এক দিকে সরিয়ে রাখেন। তিনি পড়ে গেলে তাঁকে ধরে কোলে তুলে নেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কাছে থেকে এবং তাঁর কাছে প্রভুর অবতীর্ণ হওয়ার কথা শুনে তবে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে। পুরাণাদি গ্রন্থে বৈষ্ণবসেবার ফল লেখা আছে, তার প্রমাণ এবারে পাওয়া গেল। দেবানন্দ পণ্ডিত আজন্ম ধার্মিক এবং জ্ঞানবান, তিনি সর্বদা ভাগবত পাঠ করেন। তিনি শান্ত, নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয় ইত্যাদি গুণে ভূষিত, তথাপি কিন্তু গৌরচন্দ্রে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। বক্রেশ্বরের আশীর্বাদে সেই অবিশ্বাস কেটে গেছে। কুবুদ্ধির বিনাশ হয়েছে। ভাগবতাদি গ্রন্থে বলা হয়েছে,—কৃষ্ণসেবা থেকেও বৈষ্ণবসেবা শ্রেষ্ঠ। বরাহপুরাণে আছে,—ভক্তের সেবা না করে যে কেবল অচ্যুত ভগবানের সেবাই করে তার সিদ্ধি হয় না, মনে সন্দেহ থাকে। কিন্তু যাঁদের চিত্ত ভগবানের ভক্তদের পরিচর্যায় রত থাকে, তাঁদের অভীষ্ট লাভে কোন সন্দেহের কারণ নেই।

তাই বৈষ্ণবসেবাই হচ্ছে আসল পথ। ভক্তসেবার দ্বারাই কৃষ্ণকে লাভ করা যায়। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গ-প্রভাবে দেবানন্দ পণ্ডিত অনুরাগ নিযে গৌচন্দ্রকে দেখতে চললেন। প্রভু বসে আছেন, এমন সময দেবানন্দ পণ্ডিত এসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রভুকে দণ্ডবৎ করে এক পাশে সঙ্কোচিত হযে বসে আছেন। প্রভু তাঁকে দেখে খুশি হয়েছেন, তিনি পণ্ডিতকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বসলেন। পণ্ডিতের আগেকার যা কিছু অপরাধ ছিল প্রভু সব ক্ষমা করে বললেন,—তুমি বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবা করেই আমার কাছে আসতে পেরেছ, বক্রেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, ভক্তিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। বক্রেশ্বরের হৃদয়ে কৃষ্ণ বাস করেন, বক্রেশ্বর নৃত্য করলে তাঁর ভেতরে থেকে কৃষ্ণও নাচেন। বক্রেশ্বর যেখানে যান সে-স্থানই সর্বতীর্থময় হযে যায। —দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর কথা শুনে হাত জোড় করে স্তব করতে লাগলেন,—প্রভু, তুমি জগতকে উদ্ধার করার জন্য নবদ্বীপে এসে অবতীর্ণ হয়েছ। আমি পাপী তাই তোমার তত্ত্ব জানতাম না, তোমার পরমানন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তুমি সকলকেই কৃপা কর। প্রার্থনা করি যেন তোমাতে আমার অনুরাগ জন্মে। তোমার কাছে আমার একটি নিবদেন আছে, তুমি তার উপায় করে দেবে। আমি নিজে অজ্ঞ হয়ে সর্বজ্ঞ ভগবানের কথা কি করে ব্যাখ্যা করব? —প্রভু গৌরাঙ্গ তাঁর কথা শুনে ভাগবতের প্রমাণ বলতে লাগলেন,— ভাগবত গ্রন্থে ভক্তি ছাড়া আর কিছু ব্যাখ্যা করবে না। ভাগবতের আদ্য মধ্য অন্ত্য সর্বত্র এই একই কথা বলা হয়েছে যে বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ, অক্ষয় এবং অব্যয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিষ্ণুভক্তিই সনাতন সত্য, মহাপ্রলয়েও তাঁর পূর্ণ শক্তি থাকে। নারায়ণ মোক্ষ দান করে ভক্তিকে গোপনে রাখেন, সেই ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-ভিন্ন লাভ করা যায় না। ভাগবতে সেই ভক্তির বিষয় বিস্তারিত বলা হয়েছে, সেইজন্যই ভাগবতের সঙ্গে অন্য কোন শাস্ত্রেরই তুলনা পর্যন্ত চলে না। মৎস্য-কূর্ম অবতারাদি যেমন নিত্য, কখনো কখনো ব্রহ্মাণ্ডে

তাঁদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়ে থাকে তেমনি শ্রীমদ্‌ভাগবতও কোন ব্যক্তিবিশেষের রচিত নয়, নিত্যবস্তু। নিজেই জগতে আবির্ভূত হন আবার তিরোভাব প্রাপ্তও হন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিযোগের দ্বারা ব্যাসদেবের মুখে ভাগবত স্ফুরিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব যেমন বুঝা যায় না, তেমনি ভাগবতের তত্ত্বও বুঝতে পারা যায় না। যে মনে করে ভাগবত জানে আসলে সে ভাগবত সম্পর্কে কিছুই জানে না। অজ্ঞ হয়েও যে ব্যক্তি ভাগবতের শরণ নেয় সে ভাগবতের দর্শন পেয়ে থাকে। প্রেমময় ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, তাতে শ্রীকৃষ্ণের গোপনীয় লীলাদি বর্ণিত হয়েছে। বেদ শাস্ত্র পুরাণাদি বলেও বেদব্যাস মনে শান্তি পেলেন না, যখন ভাগবত স্ফূর্তি পেল তখনই তিনি আনন্দ লাভ করতে পারলেন। এই গ্রন্থ পড়ে কেউ কেউ সঙ্কটে পড়তেই পারে। তবে তোমাকে আমি খুলে বলছি, তুমি ভাগবত গ্রন্থের সর্বত্র কেবল ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা করবে। তাহলে আর তোমার কোন অপরাধ হবে না এবং মনেও শান্তি পাবে। সব শাস্ত্রেই কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা হযেছে, তবে তাবমধ্যেও আবাব ভাগবত বিশেষ ভাবে ভক্তি রসাশ্রিত। তুমি গিয়ে অধ্যাপনা শুরু কারে দাও আবার। এবং সকলকে কৃষ্ণভক্তির অমৃত বুঝিযে দেবে। —দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর কথা শুনে নিজেকে ভাগ্যাবান মনে করলেন এবং প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রভুর চরণ মনে ধ্যান করতে করতে চললেন। প্রভু গৌরসুন্দর সকলকেই ভাগবতের কথা বললেন এই উপলক্ষ্যে। ভাগবতে একমাত্র ভক্তিযোগই প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে শেষে বা মধ্যে কোথাও আর কিছু বক্তব্য নেই। ভাগবত পডায কিন্তু ভক্তি ব্যাখ্যা করে না—এই রকম লোকের কথা বলাই বৃথা, তাতে অপরাধ বাড়ে। যিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেবলমাত্র তিনিই বুঝতে পারেন যে শ্রীমদ্‌ভাগবত ভক্তিরসের মূর্তরূপ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের সর্বত্রই ভক্তিরসের কথা বলা হয়েছে। যাঁর ঘরে ভাগবত গ্রন্থ থাকে তাঁর কোন অমঙ্গল হতে পারে না। ভাগবতকে পূজা করলে কৃষ্ণপূজা হয, ভাগবত পড়লে অথবা শুনলে ভক্তি লাভ করা যায়। দুটি স্থানে ভাগবত শোনা যায়, এক গ্রন্থ ভাগবত আর হচ্ছে কৃষ্ণের কৃপাপাত্র ভাগবত। ভাগবতের নিত্যপূজা করলে বা পড়লে অথবা শুনলে সেইব্যক্তিও ভাগবত হয়ে যায়। এমন যে ভাগবত গ্রন্থ তা পাঠ করে যদি কেউ তত্ত্ব না জেনে নিত্যানন্দপ্রভুর নিন্দা করে তবে সে রসাতলে যাবে। শ্রীনিত্যানন্দ যে ভাগবত-রসের মূর্তিমন্ত রূপ একথা কেবল ভাগ্যবান ভক্তই জানতে পারে। শ্রীনিত্যানন্দ সর্বদা সহস্রবদনে ভাগবত কীর্তন করেন। যদিও শ্রীনিত্যানন্দ নিজেই অনন্ত তবু অনাদিকাল থেকে ভাগবত বর্ণনা করেও আজ পর্যন্ত অন্ত পাচ্ছেন না। ভাগবত এমনই অনন্ত এবং অপার, এতে ভক্তিরসের বিষয় সবই বলা হয়েছে। প্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করে সকলকেই ভাগবতের অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। এই ভাবে যারাই বুঝতে এসেছে প্রভু প্রত্যেককেই সুন্দর ভাবে ভবব্যাধি থেকে মুক্ত করে দিলেন।

কুলিয়াগ্রামে এসে প্রভু সকলকেই কৃতার্থ করেছেন। প্রভুকে দেখে সবাই আনন্দ লাভ করেছে তবু বারবার আবার দেখছে, যেন চোখের তৃষ্ণা মিটছে না। প্রভুকে দেখে যার যা মনোবাসনা সবই পূর্ণ হচ্ছে, লোকেরা দুঃখ ভুলে গিয়ে আনন্দে ভাসছে। প্রভুর এইসব লীলাকথা যে খুশিমনে শোনে তারা অবশ্যই শ্রীচৈতন্যের সঙ্গ লাভ করতে পারে। কৃষ্ণগুণগান শুনলে লোক অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, তার জন্ম যেখানেই হোক তাতে কিছু যায় আসে না। শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র জানেন যে বৃন্দাবনদাস তাঁদেরই পদযুগলের সমীপে গান গেয়ে যাচ্ছেন অনবরত।

৩/৪ সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ কৃপাসিন্ধু গৌরচন্দ্রের পদযুগলে সমস্ত মঙ্গল বিরাজিত। তাঁর পদদ্বয়ের সেবাতেই সমস্ত মঙ্গল লাভ হতে পারে। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর ভক্তসমাজের জয় হোক।

বহু লোককে উদ্ধার করে প্রভু ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে মথুরায় চলেছেন। প্রভু গঙ্গার তীর ধরেই চলছেন। প্রভু-যে গঙ্গাজল পান করছেন, গঙ্গায় স্নান করছেন তাতেই গঙ্গাদেবীর মনোরথ পূর্ণ হচ্ছে। গৌড়ের কাছে গঙ্গাতীরে একটি ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম আছে, তার নাম রামকেলি, প্রভু সেখানে এসে তিন-চারদিন থাকলেন, কেউ জানতে পারে নি। তিনি প্রায় গোপনেই আছেন কিন্তু সূর্যোদয়ের খবর কি কাউকে পৌঁছে দিতে হয়? সকলেই জেনে গেল যে শ্রীচৈতন্য এখানে এসেছেন। বাল-বৃদ্ধ-বণিতা, সজ্জন-দুর্জন সকলেই খুশি হয়ে তাঁকে দেখতে আসে। প্রভু সর্বদা আবেশে আছেন, তাঁর প্রেমভক্তি ভিন্ন আর কোন লীলা নেই। হুঙ্কার, গর্জন, কম্প, পুলক, ক্রন্দন—এসব চলছে, বারে বারে আছড়ে পড়ছেন। ভক্তরা কীর্তন করেই চলেছেন, মোটেই থামছেন না এবং আর অন্য কোন কাজও করছেন না। প্রভু এমনই ডাক ছেড়ে কাঁদেন যে মাইল দুয়েক দূর থেকেও লোকেরা শুনতে পায়। যদিও সাধারণ লোকে ভক্তিশাস্ত্রের তত্ত্ব কিছুই তেমন জানে না তবু প্রভুকে দেখে কিন্তু সকলেই আনন্দ পাচ্ছে। দূর থেকে প্রভুকে তাঁরা দণ্ডবৎ প্রণাম করে সকলে মিলে উচ্চস্বরে হরিধ্বনি দেয়। লোকেদের মুখে হরিনাম শুনে প্রভুর মনে বড়ই আনন্দ হয়। প্রভু তখন বাহু তুলে 'বল বল' বলেন, তাতে লোকেরা আনন্দিত হয়ে আরো হরিধ্বনি করতে থাকে। প্রভু চারদিকে এমনই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন যে এখন যবনের মুখেও হরিনাম শোনা যায়, অন্য লোকের তো কথাই নেই। গৌর অবতারের এমনই করুণা যে যবনেও দূর থেকে নমস্কার জানায়। আর কোন কাজ নেই, কেবলই সঙ্কীর্তন, প্রভু নিজেও করছেন, অন্যদেরও করাচ্ছেন। চারদিক থেকে কেবলই লোক আসছে, এসে তাঁকে একবার দেখে আর কেউ যেতে চাইছে না। সকলে মিলে আনন্দে হরিধ্বনি করছে, কেবল চারদিকে এই একই শব্দ আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

কাছেই পরাক্রান্ত যবন রাজা কিন্তু তাতেও কারো মনে কোন ভয় নেই। দুঃখ-শোক, ঘর-সংসার সব ভুলে গিয়ে নির্ভয়ে সকলে কেবলই হরিধ্বনি দিচ্ছে। কোতোয়াল গিয়ে রাজাকে খবর দিল,—রামকেলি গ্রামে একজন সন্ন্যাসী এসেছে। সব সময় হিন্দুদের সঙ্কীর্তন করছে, তার কাছে যে কত লোক এসেছে তা বলতে পারব না। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন,—বল তো, কেমন সন্ন্যাসী, কি নাম, কি খায়, দেখতে কেমন? কোতোয়াল উত্তর দেয়,—এমন অদ্ভুত ব্যাপার আগে আর দেখি নি, সন্ন্যাসী দেখতে কামদেবের রূপকেও হার মানায়। প্রকাণ্ড শরীর, সোনার মত রং, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হাত, গভীর নাভি, সিংহের গ্রীবা, গজের স্কন্ধ, পদ্মফুলের মত চোখ, কোটি চন্দ্রও তাঁর মুখের সৌন্দর্যের কাছে কিছুই নয়। ওষ্ঠ লালবর্ণ, মুক্তোর চেয়ে সুন্দর দাঁতের পংক্তি, ভ্রূ দেখলে মনে হবে যেন কামদেবের ধনু। সুন্দর বিস্তৃত বক্ষে চন্দন লিপ্ত আছে, কোমরে অরুণ বসন শোভা পাচ্ছে। চরণ দুটি যেন পদ্মফুল, দশটি নখ যেন দশটি নির্মল দর্পণ। মনে হয় কোন রাজ্যের কোন রাজার ছেলে দিব্যজ্ঞান লাভ করে সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। সারা গা মাখনের চেয়েও নরম, তা আবার আছাড় খেয়ে পড়ছেন। একটু সময়ের মধ্যেই কয়েক বার আছাড় খেয়ে পড়ছেন, তাতে পাথরও ভেঙ্গে যাওয়ার কথা কিন্তু তাঁর শরীর

তো ভাঙ্গছে না। সন্ন্যাসীর গায়ের লোম খাড়া হয়ে আছে, দেহে পুলকের চিহ্ন কাঁঠালের মত। সন্ন্যাসী প্রায়ই এমন কেঁপে ওঠেন যে কয়েক শো লোক মিলে ধরেও তাঁকে সামলাতে পারে না। দুই চোখ দিয়ে যে জল গড়িয়ে পড়ে তাতে কয়েকটা নদী হয়ে যাওয়ার কথা। সন্ন্যাসী আবার কখনো এমনই অট্টহাস্য আরম্ভ করেন যে এক প্রহর ধরে চলে, থামে না। কখনো কীর্তন শুনে তিনি মূর্ছিত হন, শরীরে কোন চেতনা থাকে না, সঙ্গীরা সকলেই ভয় পেয়ে যায়। কেবল বাহু তুলে হরিনাম করছে, খাওয়া শোওয়া সব কাজ বন্ধ। চারদিক থেকে লোক দেখতে আসছে, কারোই বাড়িতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। আমি অনেক সাধু সন্ত জ্ঞানী দেখেছি এ জীবনে কিন্তু এমন অদ্ভুত কাণ্ড দেখিও নি এবং শুনিও নি। মহারাজ, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, এই মহাপুরুষের শুভ আগমনে দেশ ধন্য হয়েছে। কারো কাছ থেকে কিছু নেয় না, কিছু খায় না, কারো সঙ্গে কোন কথা বলে না, শুধু এক কীর্তন করেই চলেছে।

যদিও যবন রাজা দুর্দমনীয় পরাক্রান্ত তবু এই সন্ন্যাসীর কথা শুনে খুব আশ্চর্য হলেন। কেশব খানকে ডেকে এনে রাজা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কেমন লোক আমাকে বল তো। তাঁর কথাবার্তাই বা কেমন? চারদিক থেকে তাঁকে দেখতে এত লোক আসে কেন? কারণ কি? ঠিক করে বল দেখি। পরম সজ্জন কেশব খাঁন বাদশার কথা শুনে মনে মনে ভয় পেয়ে গেছেন, তাই তিনি আসল কথা গোপন করে বললেন,—ওসব বাজে কথা। এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী এসেছে ঠিকই, সে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, গরীব মানুষ, গাছতলায় থাকে। বাদশা বললেন,—তাকে গরীব বলবে না, একথা কানে শুনতেও নেই। হিন্দুরা যাকে 'কৃষ্ণ' বলে, মুসলমানেরা যাঁকে 'খোদা' বলে, এই লোকটি হচ্ছে তাই, সবাই তাই জানে। আমার আদেশ তো আমার রাজ্যে চলে, তাঁর আদেশ চলে সর্বত্র। আমার রাজ্যেই দেখ কত লোক আমাকে গোপনে নিন্দা করে, আর তাঁকে দেখ সব দেশে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর বলে মানছে, তা নইলে বিনা পয়সায় তাঁকে ঈশ্বর বলে পূজা করছে কেন? আমি যদি ছ মাস মাইনে না দিই তাহলে আমার কর্মচারীরাই আমার বিরুদ্ধে যাবে। অথচ নিজের ঘরে খেয়ে লোকেরা তাঁকে সেবা করতে যায়, তাও ভালমত পাচ্ছে না। —আমি বলে দিচ্ছি, কেউ তাঁকে কোন ভাবে বিরক্ত করবে না, তাঁর যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবেন, থাকবেন। নিজের শাস্ত্রবোধ-মত তিনি চলুন। তিনি বহুলোক নিয়ে কীর্তন করুন বা নির্জনে থাকুন, তাঁর যা ইচ্ছা তাই করুন। কাজী কিংবা কোতোয়াল তাঁকে যেন কিছু না বলে, তাহলে আমি শাস্তি দেব —এই আদেশ জারি করে বাদশা ভিতরে চলে গেলেন। প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর এই ভাবে লীলা করছেন। যে হুসেন শাহ উড়িষ্যার সব দেবমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করলেন তিনি পর্যন্ত শ্রীগৌরচন্দ্রকে মান্য করছেন কিন্তু যারা অজ্ঞানে অন্ধ তারা এখনো অন্ধকারেই রয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মস্তক মুণ্ডন করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাঁর যশ-খ্যাতি শুনে নিন্দুকদের হৃদয় পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। ভগবানের যশ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পূর্ণ হয়ে আছে, তার যশে অবিদ্যা নষ্ট হয়, তাঁর যশে অনন্তদেব, ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত মত্ত হয়ে আছেন, চার বেদ তাঁর যশ কীর্তন করে। শ্রীচৈতন্যদেবের যশে যে অসন্তুষ্ট হবে তার বহু গুণ থাকলেও সবই দোষ বলে গণ্য হবে। সর্বগুণহীন ব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যের চরণ স্মরণ করলে বৈকুণ্ঠে স্থান পায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের শেষ খণ্ডে প্রভুর এই অপূর্ব কীর্তন লীলা বলা হয়েছে। বাদশার মুখে সত্যি কথা শুনে সাধু-সজ্জনেরা খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তখন অনেকে

মিলে একত্রে বসে পরামর্শ করলেন,—যবন রাজা স্বভাবেই মহাকালস্বরূপ, তমোগুণে ভরা, ওড়িষ্যার বহু বিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংস করেছে। দৈবাৎ তার মন ভাল ছিল, আমাদের সামনে ভাল কথা বলেছে, কোন লোক এসে কুমন্ত্রনা দিলেই আবার কুবুদ্ধিতে পেয়ে বসবে। হয়তো বাদশা বলবেন,—সন্ন্যাসীকে একবার আমার কাছে নিয়ে এস, তাই প্রভুকে বলে পাঠাতে হবে যে—বাদশার কাছাকাছি স্থানে থাকার দরকার নেই। সকলে মিলে এই যুক্তি করে একজন সৎব্রাহ্মণকে প্রভুর কাছে গোপনে খবর দিয়ে পাঠালেন। প্রভু সর্বদা নিজের আনন্দে মগ্ন থাকেন, প্রেমে হুঙ্কার গর্জন করেন। লক্ষকোটি লোক মিলে হরিধ্বনি করে, প্রভু আনন্দে নৃত্য করেন। অন্য কাজ আর কিছু নেই, সব সময় কেবলই নিজেও কীর্তন করেন, অন্যকেও কীর্তন করান। ব্রাহ্মণ এসে এসব দেখে বড়ই বিস্মিত হলেন কিন্তু প্রভুকে খবরটি বলবার মত কোন সুযোগ পাচ্ছেন না। প্রভু অন্যের সঙ্গে কি কথা বলবেন, নিজের পারিষদগণের সঙ্গেই কোন কথা বলছেন না। প্রভুর এখন দিবানিশি, জলস্থল, আপনপর, গ্রামপ্রান্তর কিছুই হুঁশ নেই, তিনি স্বীয় শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ বিষয়ে প্রেমানন্দে ভেসে চলেছেন। প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে না পেরে ব্রাহ্মণ ভক্তদের কাছে বললেন,—তোমরা সকলে প্রভুর সঙ্গী, সুযোগ বুঝে প্রভুকে বলবে যে বাদশাহের রাজধানীর কাছে থাকা ঠিক নয়। একথাই আমাকে বলবার জন্য সকলে মিলে পাঠিয়েছেন। —এই কথা বলে ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। এই খবর শুনে প্রভুর সঙ্গীরা কিছু চিন্তিত হলেন। প্রভুর কাছে বলতেও পারছেন না, প্রভু কেবলই 'হরিবোল হরিবোল' বলে চলেছেন দু বাহু তুলে। তাঁকে ঘিরে অজস্র অসংখ্য লোক হাতে তালি দিয়ে হরিনাম করছেন। যাঁর সেবকের নাম স্মরণ করলেই সর্ববিঘ্ন দূর হয় বন্ধন খণ্ডন হয়, যাঁর শক্তিতে জীব কথা বলে চলাফেরা করে, বেদে যাঁকে পরম ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ বলা হয়েছে যাঁর মায়াতে জীবগণ নিজেকে ভুলে বদ্ধ হয়ে সংসারে জড়িয়ে পড়েছে সেই প্রভু নিজে সকল জীবকে উদ্ধার করবার জন্য প্রেমভক্তি স্বীকার করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর কাছে রাজাও কেউ নয়, তিনি কাউকে ভয়ও করেন না। শাস্ত্রে বলে যম মহাকাল সবই তাঁর ভৃত্য। তাই তিনি সকল লোকদের নিয়ে স্বচ্ছন্দে কীর্তন করছেন। তাঁকে যাঁরা দেখতে আসছেন চারদিক থেকে তাঁরাই রাজাকে ভয় করছেন না,—কারণ প্রভু তাঁদের মনে আনন্দ দিয়ে রেখেছেন। যদিও সাধারণ লোকেরা তাঁর পরম তত্ত্ব কিছুই জানে না তথাপি তাঁরাও প্রভুকে দেখে মনে এমনই আনন্দ লাভ করেন যে যমকে পর্যন্ত ভয় করেন না, রাজাকে আর কি ভয় পাবেন! সকলেই সব সময় কেবল হরিধ্বনি দিচ্ছেন কারো মুখে আর কোন কথা নেই। প্রভু এই ভাবেই সকলকে নিয়ে কীর্তনে মেতে আছেন। ভক্তগণ যে মনে ভয় পেয়েছেন, প্রভু তা জানতে পারলেন, তিনি অন্তর্যামী। ঈষৎ হেসে প্রভু বললেন,—রাজা আমাকে দর্শন করতে ডেকে নেবেন, এইভেবে তোমরা ভয় পাচ্ছ? আমি চাই যে লোকেরা আমাকে দেখতে আকাঙ্ক্ষা করুক, কিন্তু আমাকে দেখতে চাইলে আমি অবশ্যই যাব। রাজা কোন্ পুণ্যবলে আমাকে দেখতে চাইবেন? আমি যদি ভেতর থেকে তাকে বলাই তবে তো সে দেখতে চাইবে! বাদশা আমাকে কি দেখবে? বেদ আমাকে খুঁজে পাচ্ছে না। পুরাণ কাহিনীতে পাবে, দেবর্ষি-রাজর্ষিগণ অন্বেষণ করেও আমাকে পান না। সংকীর্তন প্রচারের জন্য আমি অবতীর্ণ হয়েছি, সংসারের সমস্ত পতিত লোককে আমি এবারে উদ্ধার করব। যবন, দৈত্য— যারা আমাকে মানে না, এই অবতারে তারাও আমার জন্য কাঁদবে। যত অস্পৃশ্য দুষ্ট

যবন চণ্ডাল স্ত্রী-শূদ্র আদি অধম বাখাল—সকলকেই আমি এবাবে ভক্তিযোগ দান কবব। মুনি-ঋষি, দেবতা ও সিদ্ধাচার্যগণ যা কামনা কবেন সেই ভক্তি যোগ দেব। সকলকেই দেব। বিদ্যা-ধন-কুল-তপস্যাব জোবে যাবা আমাব ভক্তেব কাছে অপবাধ কবে, তাবা এই যুগে বঞ্চিত হবে, তাবা আমাব আচবণ মান্য কবে না। পৃথিবীতে যত দেশ গ্রাম আছে সব জাযগায আমাব নাম প্রচাবিত হবে। আমাকে যে খোঁজে, আমিও তাঁকে খুঁজছি, কিন্তু তেমন লোক পাচ্ছি না। তোমাদেব সকলেব কাছেই আমি বলছি, শোন, বাজা আমাকে কখনো দেখতে চাইবে না, তাঁব তেমন সুবুদ্ধি হবে না। —এই কথা বলে প্রভু বাহ্যজ্ঞান প্রকাশ কবলেন। সমস্ত ভক্তগণ তা শুনে খুশি হলেন।

প্রভু সেই গ্রামে থেকেই কীর্তন কবে চলেছেন। ঈশ্বরেব ইচ্ছা কে বুঝতে পাবে? তিনি মথুবা গেলেন না, আবাব ফিবলেন। ভক্তবৃন্দকে বললেন,—আমি নীলাচলেই চললাম। এই বলে তিনি গঙ্গাতীব ধবে কযেকদিনেব মধ্যেই অদ্বৈতাচার্যেব বাড়িতে শান্তিপুবে এলেন। অদ্বৈত তাঁব পুত্রেব মহিমা দেখে সব কাজকর্ম ছেড়ে দিযে বসে আছেন। তখনই গৌবচন্দ্র সেখানে এলেন। অদ্বৈতাচার্যেব ছেলেব নাম অচ্যুতানন্দ। এক দিন এক সন্ন্যাসী অদ্বৈতেব কাছে এসেছিলেন। অদ্বৈত তাঁকে ভোজনেব জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সন্ন্যাসী বললেন,—তোমাব কাছে আমাব কিছু জানবাব আছে, তুমি বলতে বাজি আছ? অদ্বৈত বললেন,—আগে ভোজন কব, তাবপব তোমাব কথা শুনব। সন্ন্যাসী বললেন,—আমি আগেই বলতে চাই। আচার্য বললেন,—আচ্ছা, তাই বল। তখন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা কবলেন, কেশবভাবতী শ্রীচৈতন্যেব কে হন? প্রশ্ন শুনে অদ্বৈত মনে মনে ভাবলেন, একটা ব্যবহাবিক সম্পর্ক, আব একটা পবমার্থ সম্পর্ক। যদিও ভগবানেব মাতা পিতা কিছুই নেই তবু 'দেবকীনন্দন' বলা হয তাঁকে। পাবমার্থিক অর্থে তাঁব কেউ গুরু নেই, লৌকিক লীলায প্রভু যা কবেন সাধাবণত তাই বলা হয। পাবমার্থিক কথা না বলে লৌকিক কথা বলেই সন্ন্যাসীকে উত্তব দেওযা ভাল। এই ভেবে অদ্বৈতাচার্য বললেন,—দেখতেই পাচ্ছ, কেশব ভাবতী শ্রীচৈতন্যেব গুরু। আবাব জিজ্ঞাসা কবাব কি আছে? অদ্বৈতাচার্য এই কথা বলতেই সেখানে সুন্দব পাঁচ বছবেব উলঙ্গ বালক অচ্যুতানন্দ ধেযে এল, তাব সাবা গাযে ধূলো। ঠিক যেন কার্তিকেযেব মত চেহাবা, সর্বজ্ঞ, পবম ভক্ত, সর্বশক্তিধব। চৈতন্যেব গুরু আছে শুনে বেগে গিযে হেসে হেসে বলল,– বাবা, তুমি কি বললে? আবাব বল তো! এই তোমাব বিচাব যে, চৈতন্যেব গুরু আছে? বাবা, তুমি কোন্ সাহসে এই কথা মুখে উচ্চাবণ কবলে? কলিকাল বলেই তুমি তা পাবলে! অথবা, চৈতন্যেব দুস্তব মাযাতে ব্রহ্মা শঙ্কব প্রমুখ দেবতাবাও মোহিত হন। বুঝলাম, তুমি বিষ্ণুমাযাতে আবদ্ধ হযেছ, তাই চৈতন্যেব মাযা থেকে উদ্ধাব পাও নি। মাযাবশে না থাকলে, শ্রীচৈতন্যেব গুরু আছে, কি কবে বলতে পাবলে? চৈতন্যেব ইচ্ছায অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চৈতন্যেব লোমকূপে মিশে যায। প্রভু-চৈতন্য জলক্রীড়ায আনন্দ পান, নিজেতেই নিজে আনন্দিত থাকেন, তিনি স্বযংসিদ্ধ সজাতীয-বিজাতীয ভেদশূন্য। মহাপ্রলয-কালে অভিমানী মহামুনিদেব পর্যন্ত কোন খোঁজ থাকে না। আবাব শ্রীচৈতন্যেব ইচ্ছায তাঁবই নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ কবেন। জন্মেও ব্রহ্মাব কিছু দেখবাব শক্তি থাকে না, তখন ব্রহ্মা একান্তভাবে ভক্তিব আশ্রয গ্রহণ কবেন। তাঁব ভক্তিতে তুষ্ট হযে প্রভু তাঁকে তত্ত্ব উপদেশ কবেন। ব্রহ্মা প্রভুব আজ্ঞা শিবোধার্য কবে সৃষ্টি কবেন এবং সকলকে সেই জ্ঞান দান কবেন। সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাব কাছ থেকে সেই জ্ঞান লাভ

করে জগতে প্রচার করেন। এভাবে যাঁর থেকে জ্ঞান প্রচারিত হয় তাঁর আবার গুরু থাকে কি করে'? বাবা, কোথায় তোমার কাছ থেকে আমরা শিখব, আর তুমি নিজেই অন্য কথা বলছ? —এই বলে অচ্যুতানন্দ থামলেন এবং শুনে অদ্বৈত খুবই খুশি হলেন। পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে অদ্বৈত প্রেমাশ্রুতে তাঁকে সিক্ত করে দিলেন। আর বললেন,—তুমিই পিতা, আমি পুত্র। আমাকে শিক্ষা দেবার জন্যই আমার ঘরে পুত্ররূপে এসেছ। আমি অপরাধ করেছি, ক্ষমা কর। এমন কথা আর কখনো বলব না। প্রশংসা শুনে শ্রীমান্ অচ্যুতানন্দ লজ্জায় মুখ নীচু করে থাকলেন। সন্ন্যাসী এই সব কথা শুনে অচ্যুতানন্দকে প্রণাম করে বললেন,—পিতার উপযুক্ত পুত্র। ঈশ্বরের শক্তি ছাড়া এইটুকু বালকের মুখে কি এমন কথা কখনো উচ্চারিত হতে পারে'? শুভক্ষণে আমি আচার্যের গৃহে এসেছিলাম, নিজের চোখে অদ্ভুত মহিমা দেখে গেলাম। —পিতা-পুত্র দুজনকেই প্রণাম জানিয়ে সন্ন্যাসী 'হরি হরি' বলতে বলতে বিদায় নিলেন। এই অদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে একান্ত শরণ গ্রহণ করেছিলেন। অদ্বৈতকে ভজনা করে গৌরচন্দ্রকে হেলা করলে, তিনি অদ্বৈতের পুত্র হলেও তার রক্ষা থাকবে না।

পুত্রের মহিমা দেখে অদ্বৈতাচার্য পুত্রকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন সব কাজকর্ম ছেড়ে। পুত্রের পায়ের ধূলো গায়ে লেপে দিয়ে আনন্দে বলতে লাগলেন, — শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ আমার ঘরে জন্মেছে। — এই কথা বলে তিনি হাতে তালি দিয়ে নাচছেন। ত্রিভুবনে তার ভাগ্যের তুলনা হয় না। পুত্রের মহিমা দেখে তিনি বিহ্বল হয়েছেন। তাঁর গৃহে তখন সব মঙ্গল উপস্থিত। ঠিক তখনই পার্ষদগণকে নিয়ে শ্রীগৌরসুন্দর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ইষ্টদেবতাকে দেখে অদ্বৈত দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলেন। 'হরি' বলে অদ্বৈত হুঙ্কার ছাড়লেন এবং পরমানন্দে আনন্দের উল্লাসে দেহজ্ঞান হারালেন। বাড়ির মহিলারা উলুধ্বনি দিচ্ছেন। অদ্বৈত-ভবনে পরমানন্দের উচ্চধ্বনি উঠল। প্রভুও অদ্বৈতকে কোলে নিয়ে প্রেমাশ্রুতে তাঁকে সিক্ত করলেন। অদ্বৈত প্রভুর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করে কেঁদে আকুল হলেন। চারদিকে ঘিরে ভক্তেরাও কাঁদছেন, কি অদ্ভুত প্রেমের দৃশ্য যে রচিত হয়েছিল তা লিখে বোঝানো যাবে না। খানিক পরে অদ্বৈত সুস্থির হয়ে প্রভুকে বসতে আসন দিলেন। প্রভু উত্তম আসনে বসলেন, চারদিক ঘিরে পার্ষদগণ শোভা পাচ্ছেন। অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ কোলাকুলি করলেন, দুজনেই দুজনকে পেয়ে মহা আনন্দিত। ভক্তবৃন্দ আচার্যকে নমস্কার করলেন, আচার্য সকলকে প্রেমালিঙ্গন দান করলেন। আজ অদ্বৈতাচার্যের ঘরে যে আনন্দ হল তা একমাত্র বেদব্যাস ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করতে পারবেন না। হঠাৎ অচ্যুতানন্দ এসে প্রভুকে নমস্কার করলেন। প্রভু তাকে কোলে তুলে নিয়ে প্রেমাশ্রুতে সিক্ত করলেন। প্রভু তাকে বুক থেকে ছাড়ছেন না, অচ্যুতও এই অবসরে প্রভুর দেহে প্রবেশ করলেন। অচ্যুতের প্রতি প্রভুর কৃপা দেখে ভক্তগণ প্রেমে কাঁদতে লাগলেন। প্রভুর পারিষদবর্গ সকলেই অচ্যুতের প্রিয়। তিনি শ্রীনিত্যানন্দের প্রাণতুল্য, এবং গদাধর পণ্ডিতের প্রধান শিষ্য। অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র পিতার মতই অতি উপযুক্ত। অদ্বৈতের গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রভু আনন্দে ডুবে আছেন। প্রভু অদ্বৈতের অনুরোধে কিছুদিন তাঁর গৃহে থেকে গেলেন। থেকে কীর্তন করলেন। প্রাণনাথকে নিজের কাছে পেয়ে আচার্য অত্যন্ত আনন্দে দিন কাটালেন। একটু সুস্থির হয়ে আচার্য শচীমাতার কাছে লোক পাঠালেন নবদ্বীপে। দোলা নিয়ে গিয়ে লোকেরা তাঁকে নিয়ে এল।

শচীমাতা বাৎসল্যপ্রেমে ডুবে গিয়েছেন, তাঁর বাহ্যজ্ঞান নেই। শ্রীনিত্যানন্দ ... মনে

পান, জিজ্ঞাসা করেন,—মথুরার খবর বল আমাকে। কৃষ্ণ, বলরাম মথুরায় কেমন আছে? পাপী কংস কি করছে? চোর অক্রূরের খবর কিছু জান কি? আমার কৃষ্ণ বলরামকে তো সেই চুরি করে নিয়ে গেছে? শুনলাম কংস মারা গেছে? তবে কি উগ্রসেন মথুরার রাজা হয়েছেন? তিনি আবার কখনো কৃষ্ণ বলরামকে ডেকে বলেন,---তাড়াতাড়ি দুধ দুইয়ে দাও, আমি দুধ বেচতে যাব। কখনো বা তিনি লাঠি হাতে নিয়ে বলেন,—ঐ যে ননীচোরা যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি ধর সকলে মিলে, আজ আর ছাড়ব না, বেঁধে রাখব। —এই কথা বলে শচীমাতা আবিষ্ট হয়ে ছোটেন। কখনো পুত্রকে সামনে দেখে তিনি বলেন,—চল, যমুনায় গিয়ে স্নান করে আসি। কখনো আবার তিনি এমন চিৎকার করে কাঁদেন যে তা শুনে সকলেই বড় ব্যথিত হয়। চোখ দিয়ে অবিরাম ধারা বইতে থাকে। তাঁর বিলাপ শুনে কাঠ এবং পাথর পর্যন্ত বিদীর্ণ হয়। কখনো বা শচীমাতা ধ্যানে কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করে অট্টহাস্য করেন। তার সেই পরম অদ্ভুত আনন্দের হাসিতে পুরো একটি বেলা কেটে যায়। কখনো তিনি এমনই মূর্ছিত হন যে তার শরীরে বিন্দুমাত্র বাহ্যের চিহ্ন থাকে না। আবার কখনো তার এমনই কম্প হয় যেন পৃথিবীকে তুলে আছাড় দিচ্ছে কেউ। শচীমাতার কৃষ্ণাবেশের তুলনা তিনি নিজেই। তার এই ভাবের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না। শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি গৌরচন্দ্রের যে কৃষ্ণভক্তি, প্রভু মাকেও সেই শক্তি দান করেছেন। তাই শচীমাতার ভক্তিলক্ষণ বর্ণনা করা অসম্ভব। শচীমাতা দিনরাত মহানন্দে বাৎসল্য সাগরের তরঙ্গে ভাসছেন। শচীমাতা জ্ঞান পেয়ে দিক-বিদিক দেখে নেন, আবার তন্ময় হয়ে পড়েন। এভাবে শচীমাতা বসে আছেন, এমন সময় খবর এল,—শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে এসেছেন, তাড়াতাড়ি তাঁকে দেখতে চান। খবর পেয়ে শচীমাতা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এই খবর পেয়ে প্রভুর প্রত্যেক ভক্তই খুশি হলেন। প্রভুর প্রিয়পাত্র গঙ্গাদাস পণ্ডিত তখনই শচীমাতাকে নিয়ে চললেন। মুরারি গুপ্ত প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সকলেই শচীমাতার সঙ্গে এলেন।

শচীমাতা শান্তিপুরে এসেছেন শুনেই গৌরসুন্দর গিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। বারবার মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে প্রভু স্তব করে বললেন,-তুমি ভক্তিময়ী বিশ্বজননী। তুমি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা। তুমি জীবের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করলে তবে জীবের কৃষ্ণে ভক্তি জন্মে। তুমি মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি, তোমার থেকে সব হয়, তুমি পরাশক্তি। তুমিই গঙ্গা, দেবকী, যশোদা, দেবহুতি, পৃশ্নি, অনসূয়া, কৌশল্যা, অদিতি। তোমা থেকে সব কিছু জন্মায়, তুমিই পালন কর আবার তোমাতেই লীন হয়। তোমার প্রভাবের বিষয় বলে শেষ করা যায় না, সকলের হৃদয়েই তোমার অধিষ্ঠান। —প্রভু এই ভাবে স্তবের শ্লোক পাঠ করে মাতাকে দণ্ডবৎ করলেন। স্বয়ং কৃষ্ণ ব্যতীত মাতা শচীকে আর কেউ এমন ভক্তি করতে পারেন না। প্রভুর সারা শরীর আনন্দাশ্রু ধারায় সিক্ত হয়ে গেল। শচীমাতা পুত্রের মুখ দর্শন করা মাত্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন, শরীর অচৈতন্য-অসাড়। পুতুলের মত বসে আছেন। প্রভু স্তব করে চলেছেন,-আমি যা কিছু বিষ্ণুভক্তি লাভ করেছি তা সবই তোমার আশীর্বাদে। তোমার দাস থেকে কোটি কোটি জন্ম পরবর্তী যে-ব্যক্তির সঙ্গে তোমার দাসের সম্বন্ধ থাকবে সেই ব্যক্তিও আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তোমাকে যে একবার মাত্র স্মরণ করবে তার কখনো সংসার-বন্ধন থাকবে না। যে-গঙ্গা এবং তুলসী সব কিছুকে পবিত্র করেন, তাঁরা পর্যন্ত তোমার স্পর্শে ধন্য হন। তুমি আমাকে -যে পালন-পোষণ করেছ, আমার সাধ্য নেই সেই ঋণ শোধ করার। আমি তোমার

নিকটে চিরঋণী থেকেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করব এবং তোমার সদ্‌গুণরাশির স্মরণ করে পরম আনন্দ উপভোগ করব, তোমার পুত্র বলে নিজেকে ধন্য মনে করব।—প্রভু মহানন্দে এভাবে স্তুতি করলেন। ভক্তবৃন্দ শুনে খুবই খুশি হলেন। শচীমাতা জানেন যে, নারায়ণ অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর যখন যা ইচ্ছা তখন তিনি তাই করছেন। অনেক ক্ষণ পরে, শচীমাতা এবারে বললেন,— তোমার কথা খুব কম লোকেই বুঝতে পারে। সমুদ্রে মৃত লোককে যেমন স্রোতে যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যায় তেমনি সংসারসাগরে সকল জীবকে তুমি যা করাও তারা তাই কারে। শুধু তোমাকে এটুকু বলি যে যাতে ভাল হয় তাই কর। স্তুতি-প্রদক্ষিণ কিংবা নমস্কার প্রণাম যাই কর, আমি ওসব কিছুই বুঝি না, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। মহাভক্ত বৈষ্ণবগণ শচীমাতার কথা শুনে জয়ধ্বনি করে উঠলেন। শচীমাতার ভক্তির পরিমাপ করা সহজ নয়, স্বয়ং গৌরচন্দ্র তাঁর জঠরে অবতীর্ণ হয়েছেন। লৌকিক জগতের কথাবার্তা উপলক্ষেও যে 'মা' বলে ডাকবে তার কোন দুঃখ থাকবে না।

প্রভুকে দেখে শচীমাতা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। ভক্তরাও আনন্দে আত্মহারা। এখন যে আনন্দ হয়েছে তা বর্ণনা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ শচীমাতাকে খুশি দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। অদ্বৈতাচার্য দেবকীর স্তুতি পাঠ করে শচীমাতাকে দণ্ডবৎ করলেন। হরিদাস, মুরারি, শ্রীগর্ভ, নারায়ণ, জগদীশ, গোপীনাথ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সকলেই শচীমতার সন্তুষ্টি লক্ষ্য করে খুবই আনন্দিত হলেন। এই সকল আনন্দসংবাদ যে পাঠ করে অথবা শোনে সে অবশ্যই প্রেমভক্তি লাভ করতে পারে।

অদ্বৈতাচার্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কাছে অনুমতি চেয়ে নিলেন যে শচীমাতা তাঁর জন্য রান্না করবেন। গৌরচন্দ্রকে নারায়ণ মনে করে শচীমতা রান্নার কাজে গেলেন। তিনি যত পদ রেঁধেছিলেন তার নামও অনেকে জানে না। মা জানেন যে প্রভু শাক ভালবাসেন, তাই কুড়ি রকমের শাক রান্না হল। মনের আনন্দে শচীদেবী এক তরকারিকেই দশ-বিশ রকম করে রাঁধলেন। নানা রকম রান্না করে খাবার জায়গায় রাখলেন। অন্নব্যঞ্জন সব সাজিয়ে তার উপরে তুলসীমঞ্জরী দিলেন। চারদিকে অন্ন-ব্যঞ্জন থরে-বিথরে সাজিয়ে মাঝখানে বসবার জন্য আসন পেতে দিলেন। এবারে মহাপ্রভু সকলকে নিয়ে ভোজন করতে এলেন। প্রভু সাজানো অন্ন-ব্যঞ্জন দেখে নমস্কার করলেন। প্রভু বললেন,—এসব খাবার দরকার নেই, দেখলেই সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়। রান্নার কথা তো বলে কিছু শেষ করা যাবে না, এর গন্ধেও কৃষ্ণভক্তি জন্মে। বুঝলাম যে শ্রীকৃষ্ণ সপরিবারে এই অন্ন গ্রহণ করেছেন। -এই কথা বলে শ্রীগৌরহরি অন্নকে প্রদক্ষিণ করে ভোজনে বসলেন। প্রভুর আজ্ঞায় পারিষদগণ চারদিক ঘিরে বসলেন ভোজন দেখবার জন্য। প্রভু ভোজন করতে লাগলেন, শচীদেবী নয়নভরে দেখছেন। প্রভু প্রত্যেকটি রান্না অত্যন্ত আস্বাদন করে খেলেন। শ্রীশাকই সব চাইতে ভাগ্যবন্ত কারণ তিনি বারেবারে শাকই চেয়ে খাচ্ছেন। শাকের প্রতি তাঁর এত ঝোঁক দেখে ভক্তরা হাসছেন। সকলকে শাকের গুণ বুঝিয়ে দিয়ে প্রভু ঈষৎ হেসে ভোজন করতে লাগলেন। প্রভু বললেন—এই অচ্যুতা নামে কচুর শাক, এ খেলে কৃষ্ণে অনুরাগ জন্মে। পটোল-বাস্তুক-কাল-শাক বেশি খেলে জন্ম জন্ম বৈষ্ণব-সঙ্গ লাভ করা যায়। সালিঞ্চা-হিলঞ্চা শাক খেলে শরীর ভাল থাকে, তাতেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায়। এই ভাবে শাকের মহিমা বলে বলে প্রভু আনন্দে ভোজন

করতে লাগলেন। এ দিনের ভোজনে যে আন্দ হল অনন্তদেব তা যথার্থ জানেন। কলিযুগে তিনিই অবধূতশ্রেষ্ঠ শ্রীনিত্যানন্দ, আমি তাঁরই আদেশে সূত্রাকারে এসব লিখছি। বেদব্যাস প্রমুখ মুনিগণ সকলেই এই যশ বর্ণনা করেছেন। এই যশ-কথা পাঠ করলে বা শুনলে জীবের অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডন হয়।

প্রভু ভোজন-শেষে আচমন করে গিয়ে বসলেন। ভক্তগণ গিয়ে খাবার জায়গায় পাত্রের অবশিষ্ট সংগ্রহ করতে লাগলেন। কেউ বললেন, - ব্রাহ্মণ কেন এঁটো খাবে? আমি শূদ্র, আমি এঁটো নেব। আর কেউ বলছে, -আমি ব্রাহ্মণ নই। -কেউ বা পেছন থেকে প্রসাদ নিয়ে পালিয়ে যায়। কেউ বলে,- শূদ্র কেন ভগবানের প্রসাদ নেবে? উচিত কিনা সেটা শাস্ত্র-বিচার করে দেখ। কেউ বললে.— আমি অবশেষ চাই না, শুধু পাতাখানি নিয়ে যাব। কেউ বলছে,- চিরকাল আমিই পাতা ফেলছি, তোমরা আমাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করছ কেবল তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে। এইভাবে ভক্তবৃন্দ চপলতা ও কৌতুক করে ঈশ্বরের অধরামৃত ভোজন করছেন। শচীমাতার রান্না এবং প্রভুর প্রসাদ, এতে সকলেরই লোভ রয়েছে। মহানন্দে ভক্তগণ ভোজন করে প্রভুর সামনে এলেন। শ্রীগৌরসুন্দর মাঝখানে বসে আছেন, তাঁকে ঘিরে ভক্তবৃন্দ চারদিকে বসলেন।

প্রভ মবাবি গুপ্তকে সামনে পেয়ে ঈষৎ হেসে তাঁকে বললেন,- তুমি রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করে আটটি শ্লোক রচনা করেছ, আমি শুনেছি, তা পড়ে শোনাও তো আমাকে। প্রভুর আদেশ পেয়ে মুবারিগুপ্ত ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন,- শ্রীরামচন্দ্র অনুচরগণকে নিয়ে খর এবং ত্রিশিরা দুটি রাক্ষসকে এবং কবন্ধকেও বধ করে দণ্ডকারণ্যকে দূষণ রাক্ষসের হাত থেকেও মুক্ত করে, সুগ্রীবের শত্রু বালিকে বধ করে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করেছিলেন, আমি সর্বদা সেই ত্রিজগতের গুরু রামচন্দ্রকে ভজনা করি। শ্রীরামচন্দ্রের সামনে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী, স্বর্ণোজ্জ্বলকান্তি, অগ্রজের নিত্যসেবক, উত্তমভূষণে বিভূষিত শেষ নামক অনন্তদেব তাঁর এক স্বরূপ, তিনি শেষের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, সেই লক্ষ্মণ রয়েছেন। আমি সেই ত্রিজগতের গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বদা ভজনা করি। —-এই ভাবে আটটি শ্লোক পড়ে প্রভুর আজ্ঞায় তার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। -শ্রীরামচন্দ্র দূর্বাদল শ্যামল, ধনুর্বিদ্যার শিক্ষক, ভক্তবৃন্দের নিকট বাঞ্ছাতীত কল্পতরু অর্থাৎ তারা কিছু না চাইতেই তিনি তাদের সব দান করেন। তিনি হাস্যমুখে শ্রীজানকী দেবীকে বামে নিয়ে রত্নময় রাজসিংহাসনে বসে আছেন। সামনে রয়েছেন মহা ধনুর্ধর ছোটভাই লক্ষ্মণ, সোনার মত শরীরে সোনার অলঙ্কারে সুশোভিত। অনন্তদেব যাঁর এক অংশ তিনি লক্ষ্মণ নাম নিয়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেবায় যুক্ত আছেন। মহাগুরু মনে করে আমি জন্মজন্ম শ্রীরঘুনন্দনের চরণ সেবা করি। ভরত এবং শত্রুঘ্ন চামর নাড়ছেন, সামনে কপীন্দ্রগণ পুণ্যকীর্তি গাইছেন। যে প্রভু গুহক-চণ্ডালকে মিতা করেছেন, আমি জন্ম জন্ম তাঁকে ভজনা করি। গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য করে নিজরাজ্য ছেড়ে তিনি দেবতাদের রক্ষার জন্য বনে বনে ভ্রমণ করেছেন। বালিকে মেরে সুগ্রীবকে রাজ্যভার দিয়ে তাঁকে দয়া করে বন্ধু করলেন। তিনি অহল্যাকে উদ্ধার করেছেন, আমি সেই ত্রিভুবনের গুরুর চরণ বন্দনা করি। লক্ষ্মণের সহায়তা নিয়ে বানরদের দিয়ে তিনি সমুদ্রকে বেঁধেছিলেন। ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারাও রাবণকে পরাজিত করতে পারতেন না, প্রভু রামচন্দ্র সেই রাবণকে সবংশে নিহত করলেন। তাঁর কৃপাতেই বিভীষণ ধর্মপরায়ণ হয়েছেন, ইচ্ছা না থাকলেও লঙ্কার রাজা হয়েছেন। যবনেরাও তাঁর কীর্তিকথা শ্রদ্ধা

নিয়ে শ্রবণ করে, আমি সেই রাঘবেন্দ্রের চরণ সেবা করি। দুষ্টগণকে নিধন করার জন্য তিনি ধনুর্ধর হয়েছেন, পুত্রের সমান স্নেহে প্রজাগণকে পালন করেছেন। তাঁর কৃপাতেই অযোধ্যার লোকেরা সশরীরে বৈকুণ্ঠবাসী হলেন। দেবাদিদেব শিব তাঁর নাম নিয়েই দিগম্বর হয়েছেন এবং লক্ষ্মীদেবী সর্বদা তাঁর পাদপদ্ম সেবা করেন। বেদ বলছেন, তিনিই পরমব্রহ্ম জগন্নাথ, সেই জগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম আমি ভজনা করি।

শ্রীমুরারি গুপ্ত স্বরচিত রামামৃত মহিমার আটটি শ্লোক পড়লেন। শ্রীগৌরসুন্দর শুনে খুশি হয়ে তাঁর মাথায় পা ঠেকিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন,- তুমি চিরজন্ম রামভক্ত হয়ে থাক। একটু সময়ের জন্যও যে তোমাকে আশ্রয় করবে সে নিশ্চয় শ্রীরামের পাদপদ্ম লাভ করবে। শ্রীচৈতন্য মুরারী গুপ্তকে আশীর্বাদ করেছেন শুনে ভক্তগণ মহা জয়ধ্বনি করে উঠলেন।

সেই সময় একজন কুষ্ঠরোগী এসে উপস্থিত হল। দণ্ডবৎ করে দু বাহু তুলে কেঁদে আর্তনাদ করে বলল,- তুমি সকলকে উদ্ধার করবার জন্য সংসারে এসেছ। তুমি অন্যের দুঃখে কাতর হও, তাই জেনে তোমার কাছে এসেছি। আমি কুষ্ঠরোগের যন্ত্রণায় সঙ্ঘাতিক কষ্ট পাচ্ছি। প্রভু, আমি কি করে উদ্ধার পাব তুমি বলে দাও। -কুষ্ঠরোগীর কথা শুনে মহাপ্রভু রেগে বললেন,- তুই অমাব সামনে থেকে দূর হয়ে যা, তোকে দেখলেও পাপ হয়। পরম ধার্মিক লোকও তোকে দেখলে দুঃখে পড়বে। তুই বৈষ্ণবনিন্দক পাপী দুরাচার, তাই তোর আজ এ অবস্থা। এই টুকু কষ্টই সহ্য করতে পারছিস্ না। তাহলে কুম্ভীপাপে জীবন কাটবি কি করে? বৈষ্ণবের নামে সারা সংসাব পবিত্র হয়, ব্রহ্মাদি দেবতাবাও বৈষ্ণবচরিত্র কীর্তন করেন, যে বৈষ্ণবকে ভজনা কবলে শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত পাওয়া যায়, সেই বৈষ্ণবপূজার চেয়ে বড় আর কিছু নেই। অনন্তদেব, ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মীদেবী এমন কি নিজের দেহের চেয়েও বৈষ্ণব বেশি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের কাছে। ভাগবতে একথার উল্লেখ রয়েছে একাদশ স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে। সেই বৈষ্ণবকে যে নিন্দা করবে সে জন্মে জন্মে কষ্ট পাবে। যে সব পাপীরা বৈষ্ণবের নিন্দা করবে তাদের বিদ্যা, কুল, তপস্যা সবই ব্যর্থ হবে। শ্রীকৃষ্ণ তার পূজাও গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবের নৃত্যে পৃথিবী ধন্য হয়, তাঁর দৃষ্টিমাত্রে দশ দিকে পাপ কেটে যায়। বৈষ্ণবরা হাত তুলে নাচলে স্বর্গের বিঘ্নও কেটে যায়। মহাভাগবত শ্রীবাসপণ্ডিতকে তুই নিন্দা করেছিলি। তোর কুষ্ঠরোগ তো কিছুই নয়, এর পরে তো যমরাজের শাস্তি রয়েছে আবার। তাই তোকে আমি কিছুই করতে পারব না। - কুষ্ঠরোগী প্রভুর এই কথা শুনে দন্তে তৃণ নিয়ে কাতর হয়ে বলল,- আমি না জেনে পাগলের মত বৈষ্ণবের নিন্দা করে নিজেরই ক্ষতি করেছি। তার জন্য উচিত শাস্তিও পেয়েছি। প্রভু, এবার তুমি আমাকে উদ্ধার কর। দুঃখিতকে উদ্ধার করাই সাধুর কাজ, অপরাধীকেই সাধুরা দয়া করেন। তাই আমি তোমার শরণ নিলাম, তুমি উপেক্ষা করলে আমার আর নিস্তার নেই। কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তুমি তা সবই জান, আমাকে বলে দাও, তুমি যা বলবে আমি তাই করব। তুমি সকলের পালনকর্তা। যেমন বৈষ্ণবের নিন্দা করেছিলাম, তেমনি উচিত শাস্তিও পেয়েছি। -প্রভু বললেন,- বৈষ্ণবের নিন্দা করলে কেবল কুষ্ঠরোগই নয়, আরো আছে। আপাতত মাত্র কিছু দুঃখ পেলে। এর পর রয়েছে যমযাতনা। পরলোকে চুরাশি হাজার যমযাতনা আছে। বৈষ্ণবের নিন্দককে এগুলো সবই ভোগ করতে হয়। তবে শ্রীবাসের বাড়িতে গিয়ে

তাঁকে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে দেখতে পার। তুমি তাঁর কাছে অপরাধ করেছ, তিনি অশীর্বাদ করলেই তোমার নিষ্কৃতি হতে পারে। মুখে কাঁটা ফুটলে মুখ থেকেই তুলতে হয়, পায়ে কাঁটা ফুটলে কি কাঁধ থেকে বের করা যায়? তোমাকে উপায় বলে দিলাম, শ্রীবাস পণ্ডিত ক্ষমা করলে অবশ্যই তোমার দুঃখ দূর হবে। তিনি অতি পবিত্র ব্যক্তি, তাঁর কাছে গেলে তিনি নিশ্চয় তোমাকে ক্ষমা করবেন। -প্রভুর কথা শুনে ভক্তগণ হরিধ্বনি করে উঠলেন। কুষ্ঠরোগীও প্রভুকে প্রণাম করে তখনই চলল। সেই কুষ্ঠরোগী শ্রীবাস পণ্ডিতের আশীর্বাদ পেয়েছিল এবং তার সব অপরাধ খণ্ডন হয়েছিল, সে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

বৈষ্ণবের নিন্দা করলে কি ক্ষতি হয় তা ঠাকুর নিজমুখে সবই বলেছেন। তবু যে বৈষ্ণবের নিন্দা করবে তাকে ভগবান অবশ্যই শাস্তি দিবেন। বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈষ্ণবের যে ঝগড়া তা বাস্তবিক কলহ নয়, তা প্রীতি-কোন্দল। সত্যভামা এবং রুক্মিনীর মধ্যে যে ঝগড়া তা নিতান্তই বাহ্যিক কারণ তারা দুজনই তত্ত্বত এক। তেমনি, বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈষ্ণবেরও কোন ঝগড়া নেই, শ্রীচৈতন্য মজা করে এসব করান। এতে যে লোক এক জন বৈষ্ণবের পক্ষ নিয়ে অন্য বৈষ্ণবকে নিন্দা করে, সে রসাতলে যায়। এক হাতে ঈশ্বরকে সেবা করে অন্য হাতে বিরুদ্ধ কাজ করলে কি ভাল হয়? সকল ভক্তই শ্রীকৃষ্ণের নিজের শরীর, একথা যে জানে সেই জ্ঞানী। অভেদ দৃষ্টিতে সকল বৈষ্ণবকে পূজা করে শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজনা করলে সে উদ্ধার পেয়ে যায়। এ সকল কথা যে প্রচার করে অথবা যে শোনে উভয়েরই আর বৈষ্ণবাপরাধ হয় না।

শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে মহা আনন্দেই রয়েছেন। এমন সময়ে মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর আরাধনা-তিথি উপস্থিত হল। মাধবেন্দ্র এবং অদ্বৈতাচার্যে কোন ভেদ নাই ঠিকই তবু অদ্বৈত মাধবেন্দ্রের শিষ্য বটে। শ্রীগৌরসুন্দব মাধবেন্দ্র পুরীর দেহে অবস্থান করেন। মাধবেন্দ্রপুরীর বিষ্ণুভক্তির কথা বলে শেষ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে তা পূর্ণ শক্তিবিশিষ্ট। অদ্বৈতাচার্য কি করে তাঁর শিষ্য হলেন সেই শুভ কাহিনীটি মনোযোগ দিয়ে শুনবার মতন।

শ্রীচৈতন্যের অবির্ভাবের পুর্বে সমাজে বিষ্ণুভক্তি ছিল না বললেই হয। তখনও চৈতন্যকৃপায় মাধবেন্দ্র প্রেমানন্দসমুদ্রে সর্বদা ভাসতেন। তাঁর দেহে সর্বদা রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, গর্জন, মহাহাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম। গোবিন্দের ধ্যানে আত্মহাবা হযে থাকেন সর্বদা। পথে চলতে চলতে তিনি মনের আনন্দে হরিধ্বনি কবতেন। কখনও এমন মূর্ছা হয় যে দু-তিন প্রহরেও জ্ঞান আসে না। কখনো বিরহে এমন কাঁদতে থাকেন যে চোখ দিযে গঙ্গাধারার মত অশ্রু বইতে থাকে। তিনি কখনও অট্টহাস্য করেন, আবার কখনো পরমানন্দরসে কাপড়-চোপড়ও খুলে পড়ে যায়। এই ভাবে মাধবেন্দ্র পুরী কৃষ্ণসুখে সুখী থাকেন, অভক্ত দেখলে মনে দুঃখ পান। দিনরাত কৃষ্ণযাত্রা, কৃষ্ণসঙ্কীর্তন করেন, সাধারণ লোকেরা তার মানে কিছুই বুঝতে পারে না। ধর্মকর্ম বলতে লোকেরা জানে মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে রাত জাগা। দেবতা বলতে কেবল ষষ্ঠী আর বিষহরি জানে, তাও আবার পূজা করে অত্যন্ত অহঙ্কার নিয়ে। পূজার মূল কামনা হচ্ছে ধনবৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি। কেউ কেউ আবার মদ-মাংস দিয়ে দানবের পূজাও করে। যোগিপাল, ভোগিপাল আর মহীপালের কাহিনী কথা শুনতে সকলে ভালবাসে। এর মধ্যেই যে অত্যন্ত ভাগ্যবান সে স্নানের

সময়ে এক বারের জন্যে গোবিন্দ-পুণ্ডরীকাক্ষের নাম উচ্চারণ করে। বৈষ্ণব, সঙ্কীর্তন, কৃষ্ণের নৃত্য, ভাবাবেশে ক্রন্দন, -লোকেরা বিষ্ণু মায়ায় আবদ্ধ ছিল, তাই এসব কিছুই জানত না। মানুষ মহা তমোগুণে আবদ্ধ ছিল। মাধবেন্দ্র পুরী লোকজনকে দেখে মনে দুঃখ পেতেন, এমন একজন লোক ছিল না যার সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপ করা যায়। সন্ন্যাসীরা আবার নিজেদেরই নারায়ণ মনে করতেন। এই দুঃখে তিনি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ করতেন না। কৃষ্ণভক্তি বিষয়ে কোথাও আলোচনা শোনা যেত না। জ্ঞানী, তপস্বী, বৈরাগ্যবান, যোগীপুরুষ কারো মুখেই দাস্যভক্তির কথা শোনা যায় না। অধ্যাপকগণ নানা রকমের তর্ক করতেন কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বীকার করেন না। এসব দখে মাধবেন্দ্রপুরী মনে মনে ভাবছেন, -লোকসমাজে বৈষ্ণবের দেখা পাওয়া যাবে না, বরং বনবাসেই চলে যাই। বনে মানুষ জন থাকে না। বনে অবৈষ্ণবের সঙ্গে কথা বলতে হবে না, তাই এর চেয়ে বনই ভাল। এই রকম ভাবতে ভাবতে ভগবানের ইচ্ছায় অদ্বৈতের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। অদ্বৈতাচার্যও জগতে বিষ্ণুভক্তিশূন্য ভাব দেখে খুবই মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছিলেন। তবু তিনি দৃঢ়তাব সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করতেন। সর্বদা গীতা-ভাগবত পাঠ করে গ্রন্থের মূল ভাব নিযে ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করতেন। এমন সময়ে মাধবেন্দ্র অদ্বৈতের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মধ্যে বৈষ্ণবলক্ষণ দেখে অদ্বৈত তাঁকে প্রণাম করলেন। মাধবেন্দ্র তাঁব সঙ্গে সপ্রেম আলিঙ্গন করলেন। পরস্পর কৃষ্ণকথা আলাপ করতে করতে কারোই আর হুঁশ নেই। মাধবেন্দ্রেব প্রেম অসম্ভব, তিনি মেঘ দেখলেই মূর্ছিত হন। কৃষ্ণনাম শুনলেই হুঙ্কার করেন, তখনই হাজার রকমেব কৃষ্ণপ্রেম-বিকারচিহ্ন দেখা দেয়। তাঁর বিষ্ণুভক্তি-লক্ষণ দেখে অদ্বৈত বড় খুশি হলেন। তখন অদ্বৈত মাধবেন্দ্রের কাছে উপদেশ গ্রহণ করলেন। এইভাবে দুজনের মিলন হল।

অদ্বৈতাচার্য বিশেষ ভাবে মাধবেন্দ্রপুরীব তিরোধান উৎসব পালন করেন। হঠাৎ সেই তিথি এসে গেছে, তাই অদ্বৈত নানাবিধ ব্যবস্থা করছেন। এই পুণ্য তিথিতে শ্রীগৌরসুন্দর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে খুব আনন্দ করলেন। আচার্যও এই তিথি উদ্যাপনের প্রচুর ব্যবস্থা করেছিলেন। চারদিক থেকেই লোকেরা নানাবিধ দ্রব্যাদি নিযে আসতে লাগল। মাধবেন্দ্র পুরীর প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা ছিল, তাই সকলেই সেভাবে সেবার ভার নিলেন। শচীমাতা পুরো রান্নার দায়িত্ব নিলেন, তাঁর সঙ্গে আছেন সব বৈষ্ণবগণের পরিবারের মেয়েরা। শ্রীনিত্যানন্দও নিজেই আনন্দের সঙ্গে বৈষ্ণবসেবার কাজে যোগ দিলেন। কেউ বলছেন,-পুরো চন্দনটা আমি ঘষে দেব। কেউ বললেন,- আমি মালা গাঁথব। আর একজন বললেন,- জল আনবার ভার আমার। কেউ বললেন,- খাবার জায়গা পরিস্কার করে দেব আমি। কেউ বা বললেন,- বৈষ্ণবগণের পা ধুইয়ে দেব কিন্তু আমি। কেউ পতাকা বাঁধছেন, কেউ চাঁদোয়া টানাচ্ছেন, কেউবা ভাঁড়ারের দায়িত্ব নিয়েছেন, কেউ জিনিষপত্র আনা-নেওয়ার ভার নিলেন। অনেকে আবার নৃত্য-কীর্তনে লেগে গেছেন, কেউ হরিধ্বনি দিচ্ছেন, কেউ শঙ্খ-ঘন্টা বাজাচ্ছেন। অনেকে তিথিপূজার সামগ্রী গুছিয়ে দিতে লাগলেন, কেউবা আচার্যের কাজ করলেন। এই ভাবে সব ভক্তগণ আনন্দিত মনে যিনি যা ভালবাসেন তাই করলেন। চারদিকেই কেবল আনো-নাও-খাও এই রব আর হরিধ্বনি, অন্য কোন শব্দ শোনা যায় না। শঙ্খ, ঘন্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল সমানে বেজে চলেছে সঙ্কীর্তনের সঙ্গে। আনন্দে আত্মহারা সকলেই, কারো বাহ্যজ্ঞান

নেই। অদ্বৈতাচার্যের বাড়ি আজ যেন বৈকুণ্ঠধাম হয়ে উঠেছে। শ্রীগৌরচন্দ্র চারদিকের সমস্ত ব্যবস্থা দেখে খুবই খুশি হয়েছেন। দু-চারটি ঘর ভরতি, দু-তিন ঘর ভরে রয়েছে কেবল ছড়ানো মুগ, পাঁচ-সাতটি ঘরে রয়েছে কাপড়-চোপড়, খোলা এবং পাতা রয়েছে দশ-বারটি ঘরে, দু-তিন খানা ঘর ভরতি আছে চিঁড়ে, হাজার হাজার কাঁদি কলা। প্রচুর নারকেল, সুপুরি আর পান এসেছে কোথা থেকে কে জানে! কয়েকটি ঘর বোঝাই রয়েছে পটল, বাস্তুশাক, থোড়, আলু আর মানকচু। হাজার হাজার ঘড়া দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর। ইক্ষুদণ্ড আছে, অঙ্কুরিত মুগ রয়েছে। তেল, নুন, গুড় প্রচুর। লিখে শেষ করা যাবে না। প্রভু এই বিরাট বিশাল আয়োজন দেখে খুশি হলেন। প্রভু আশ্চর্য হয়ে বললেন, —মনে হয় অদ্বৈতাচার্য মহাদেব, কারণ মানুষের দ্বারা কখনো এত সম্ভব হয় না। এত সম্পত্তি কেবল মহাদেবেরই থাকতে পারে। বুঝলাম, আচার্য হচ্ছেন শিবের অবতার। -বারেবারেই প্রভু সাহাস্যে এই কথা বলছেন। প্রকারান্তরে প্রভু অদ্বৈতের তত্ত্ব বললেন, ভাগ্যবান লোক তা গ্রহণ করতে পারেন, সকলেই পারবে না। মহাপ্রভুর কথা যে বিশ্বাস করে না, অদ্বৈত তাকে ক্ষমা করেন না। যদিও অদ্বৈত নিতান্তই শান্ত প্রকৃতির লোক কিন্তু যে চৈতন্যের বিরুদ্ধবাদী তার পক্ষে মহাকাল। যে ব্যক্তি শিবের তত্ত্ব না জেনেও একবার শিব নাম নেয় তার সব পাপ কেটে যায়। বৈদিক শাস্ত্রাদিতে, বিশেষ করে ভাগবতে এই কথা বলা হয়েছে। সেই শিবের নাম শুনে যার ভাল লাগে না সে অবশ্যই দুঃখের সমুদ্রে হাবুডুবু খায়। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলছেন, -যে শিবপূজা করে না সে আমার পূজা করে কোন ফল পাবে না। অমার প্রিয়পাত্র শিবকে অনাদর করে আমার প্রতি ভক্তি দেখাবে কি করে? স্কন্দপুরাণে আছে সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণপূজা করে শিবপূজা করবে, তারপর অন্য সব দেবতার পূজা করবে।

শ্রীচৈতন্যের প্রেরণাতেই সাধুগণ অদ্বৈতাচার্যকে শিবতত্ত্ব বলে জানতে পেরেছেন। মূর্খগণ এসব না জেনে অকারণে কলহ করে। অদ্বৈতের মায়া না জেনে কপালদোষে মরে। তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে এই সুবৃহৎ ব্যবস্থা দেখে মহাপ্রভু আচার্যের খুব প্রশংসা করলেন। সব দ্রব্যাদি দেখে প্রভু এবারে কীর্তন-প্রাঙ্গনে এলেন। তাঁর উপস্থিতিতে সকলেই মনে খুব জোর পেলেন। তাই নাচে-গানে খুবই আনন্দ উথলে পড়তে লাগল। সকলেই 'জয় জয় বোল হরিবোল' বলে মহা হরিধ্বনি করতে লাগলেন। সকল বৈষ্ণবগণের শরীর চন্দনে ভূষিত, বুকে মালা শোভা পাচ্ছে। প্রভুর প্রধান পারিষদগণ সকলেই প্রভুর সামনে নাচতে লাগলেন। হরিসঙ্কীর্তনের মহারবে অনন্ত ভুবন পবিত্র হয়ে গেল। মহামল্ল প্রেমসুখময় শ্রীনিত্যানন্দ বাল্যভাবে খুব নাচলেন। অদ্বৈতও বিহ্বল হয়ে গেলেন নাচতে নাচতে। ঠাকুর-হরিদাসও খুব নাচলেন, আনন্দে সবাই নাচলেন, কেউ বাকি নেই। সর্বশেষে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর বিশেষ ভাবে নৃত্য করলেন। সকল পারিষদবর্গকে আগে নাচিয়ে তবে সকলকে নিয়ে তিনি নিজে নাচলেন। ভক্তগণ গোল হয়ে নাচছেন, প্রভু নাচছেন মাঝখানে, এইভাবে সারাদিন নেচে গেয়ে প্রভু সকলকে নিয়ে কাটালেন। তারপর অদ্বৈতাচার্য প্রভুর কাছে আদেশ নিয়ে ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। মহাপ্রভু ভোজন করতে বসলেন, তিনি মাঝখানে, ভক্তরা সব চারদিকে ঘিরে বসেছেন। তারাপূর্ণ আকাশের মাঝখানে যেন কোটিচন্দ্রের আলো নিয়ে তিনি উদিত হয়েছেন। এই মাধবেন্দ্রপুরীর স্মরণোৎসবে শচীমাতা রান্না করেছেন দিব্য অন্ন এবং বহুবিধ ব্যঞ্জন ও পিষ্টক। মাধবেন্দ্রপুরীর গুণকথাদি আলোচনা করতে করতে প্রভু সকলকে নিয়ে ভোজন করছেন। প্রভু বললেন, -মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর আরাধনা তিথিতে এই ভাবে সকলে মিলে ভোজন করলে গোবিন্দে

ভক্তি জন্মে। নানা কথা আলাপ করতে করতে ভোজন করে প্রভু আচমন করে গিয়ে বসলেন। অদ্বৈত তখন দিব্য সুগন্ধি চন্দন মালা প্রভুর সামনে এনে রাখলেন। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে দিলেন। তারপর সকল বৈষ্ণবকে জনে জনে তিনি নিজের হাতে মালা চন্দন পবিযে দিলেন। ভক্তগণ প্রভুর নিজের হাতের প্রসাদ পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন। সকলেই উচ্চ হরিধ্বনি করলেন, অত্যন্ত আনন্দ হল। কী যে আনন্দ হল বলে শেষ কবা যায না। অদ্বৈতেরও আনন্দের সীমা নেই। তাঁর ঘরে এখন ঈশ্বর স্বযং বয়েছেন।

প্রভু এভাবে যত লীলা করলেন তা সঠিক বর্ণনা কবা মানুষের সাধ্য নয়। একদিনে প্রভু যেসব লীলা কবেন তা কোটি বৎসরেও বর্ণনা করা যায না। পাখী যেমন উড়ে উড়ে আকাশেব অন্ত পায না, তেমনি চৈতন্যযশেরও অন্ত নেই। তিনি যেমন শক্তি দিচ্ছেন ততটাই কীর্তন করছি। কাঠেব পুতুলকে যেমন ইঙ্গিতে নাচানো হয তেমনি গৌবচন্দ্রও আমকে যেমন বলাচ্ছেন আমি তেমনি বলছি। সব ঘটনাব পবম্পরাও জানি না, ইচ্ছা মত চৈতন্যেব কীর্তি বর্ণনা কবছি। সকল বৈষ্ণবের চবণে নমস্কার জানাই, আমার অপবাধ নেবেন না। এ সকল পুণ্যকথা শ্রবণ কবলে অবশ্যই কৃষ্ণপ্রেমধন মিলবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ জানেন যে তাঁদেরই পদপ্রান্তে আমি কীর্তন কবে চলেছি, শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুব এই নিবেদন করছেন।

৩/৫ সর্বগুরু, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, সন্ন্যাসীশিবোমণি, প্রভু-বৈকুণ্ঠনাথ, তুমি জীবেব প্রতি শুভদৃষ্টিপাত কব। হে করুণাসিন্ধু, দযাময, শ্রীগৌরাঙ্গ, ভক্তবৃন্দ সহ তোমাব জয হোক।

শ্রীগৌবসুন্দব কিছুদিন অদ্বৈতাচার্যেব বাড়িতে থেকে পবে কুমারহট্ট বা হালিশহবে শ্রীবাস পণ্ডিতেব বাড়িতে এলেন। শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে আনন্দ পান। হঠাৎ দেখলেন ধ্যানেব বস্তু সামনে উপস্থিত। ইষ্টদেবতাকে দেখে শ্রীবাস পণ্ডিত দণ্ডবৎ প্রণাম কবলেন। প্রভুব পদযুগল বুকে ঠেকিযে পণ্ডিত প্রচুব কাঁদলেন। প্রভু শ্রীবাসকে কোলে নিযে অশ্রুতে তাঁব গা ভিজিযে দিলেন। শ্রীবাসের পবিবাবেব সকলেবই সৌভাগ্য, তাঁবা প্রভুকে দেখে ঊর্ধবাহু হযে কাঁদতে লাগলেন। শ্রীবাস বৈকুণ্ঠপতিকে নিজেব ঘরে পেযে বড়ই উল্লসিত হলেন। তিনি নিজে মাথায কবে এনে প্রভুকে উত্তম আসন দিলেন বসতে। ভক্তগণ চাবদিকে ঘিরে বসেছেন প্রভুকে, সকলেই কেবল কৃষ্ণনাম কীর্তন করছেন। বাড়িব ভেতব থেকে মহিলাবা উলুধ্বনি কবছেন, সব মিলিযে শ্রীবাস পণ্ডিতেব বাড়ি উৎসবেব আনন্দে পবিপূর্ণ হল। প্রভু এখানে এসেছেন খবর পেযেই পুবন্দব আচার্য এসেছেন। প্রভু তাঁকে দেখেই পিতা বলে সম্বোধন করে কোলে তুলে নিলেন। পবম ভাগ্যবান পুবন্দব আচার্য প্রভুকে দেখে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। তখনই বাসুদেব দত্ত এলেন, পবিবাবেব লোকজনকে নিযে শিবানন্দ সেন এলেন। বাসুদেব দত্ত প্রভুব পবম প্রিযপাত্র, তিনি প্রভুব সর্বতত্ত্ব জানেন, সর্বভূতে কৃপালু, জগতেব হিতকারী, সকলের গুণগ্রাহী, অদোষদর্শী এবং ঈশ্বরে ও বৈষ্ণবে যথেষ্ট ভক্তি আছে। প্রভু বাসুদেব দত্তকে দেখেও খুব কাঁদলেন। বাসুদেব দত্তও প্রভুব চরণ ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তাঁব কান্নায বোলে শুকনো কাঠ এবং পাথব পর্যন্ত গলে যায। বাসুদেবেব গুণাবলীব শেষ নেই, তাব সঙ্গে কাবো উপমাও চলে না। প্রভু তাঁকে এতই ভালবাসেন যে একবাব বললেন,- আমি নিশ্চয বাসুদেবেব। তিনি বাববাব বললেন- আমার এই শরীরের মালিক বাসুদেব দত্ত,সে আমাকে যেখানে বেচবে আমি সেখানেই বিকোব, এতে অন্যথা হবে না। যার গায়ে বাসুদেব দত্তের

বাতাস লেগেছে তাকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করবেন। বৈষ্ণবগণকে আমি বলছি, তোমরা জেনে রাখ, আমার এ দেহ কেবল বাসুদেবের। বাসুদেব দত্তের প্রতি প্রভুর কৃপার কথা শুনে বৈষ্ণবগণ জয়ধ্বনি করলেন। প্রভু ভক্তবৃন্দেব গৌরব প্রচার করতে ভালবাসেন। এভাবে শ্রীবাসের বাড়িতে প্রভুর দিন কাটছে। শ্রীবাস এবং রামাই কীর্তন করছেন, প্রভু বিহ্বল হয়ে নাচছেন। দুজনই প্রভুর খুব প্রিয় পাত্র। শ্রীবাস পণ্ডিত কীর্তন করে, ভাগবত পাঠ করে, বিদূষকের মত নানা মজা করে সর্বদা প্রভুকে আনন্দ দান করেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতেই প্রভুর সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ হযেছিল।

একদিন প্রভু শ্রীবাসের সঙ্গে কিছু সাংসারিক কথা আলাপ করলেন। তিনি বললেন,- আমি লক্ষ্য করছি যে তুমি কোথাও যাওনা, কিছুই কব না, সংসার খরচ চালাও কি কবে? শ্রীবাস উত্তর দিলেন,- প্রভু, আসল কথা কি, আমাব কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। প্রভু বললেন,- তোমার সংসাব তো বড়, চলবে কি কবে? শ্রীবাস বললেন,- অদৃষ্টে থাকলে যে কোন ভাবে চলে যাবে। প্রভু বলছেন তখন,- সন্ন্যাস নেবে না, কাবো দুয়াবে গিযে ভিক্ষেও চাইবে না, তাহলে পবিবাবের ভবণপোষণ কববে কি কবে? তোমাব কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পাবছি না। নিজে থেকে তো আব একটা পযসাও ঘবে আসবে না! যদি এসে না জোটে তাহলে কি কববে বল দেখি!- শ্রীবাস হাতে তিন তালি দিযে বললেন,- এক, দুই, তিন—এই ভেঙ্গে বললাম। প্রভু বললেন আমি তোমাব এই তিন তালিব অর্থ কিছুই বুঝলাম না। -শ্রীবাস বললেন,- আমাব এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে যদি তিন দিন উপোস কবেও কিছু না জোটে তাহলে গলায কলসী বেঁধে গঙ্গায ডুবে মবব।- শ্রীবাসেব এই কথাটি শোনামাত্র প্রভু হুঙ্কাব কবে বলে উঠলেন,- পণ্ডিত, তুমি কি বললে? ভাতেব অভাবে উপোস দেবে? যদি লক্ষ্মীদেবী নিজেও ভিক্ষে কবে তবু তোমার ঘবে জানবে কোন দিন অভাব থাকবে না। আমি গীতায কি বলেছি তা কি তুমি ভুলে গেছ?- যাঁবা অন্য কামনা ত্যাগ কবে একমাত্র আমাবই কথা ভাবেন সর্বদা আমাবই উপাসনা কবেন, সেই ভক্তদেব আমি ইহলোকে কল্যাণ ও পবলোকে মুক্তিব ব্যবস্থা কবে থাকি। যে অনন্য হযে আমাকে চিন্তা করে, তাকে নিজে মাথায কবে বযে নিযে এসে খাবাব জুটিযে দিই। যে আমাকে চিন্তা কবে কারো দুযাবে যায না, নিজেথেকে এসে তাঁব সর্বসিদ্ধি মিলে যায। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ নিজেথেকেই আসে, কিন্তু আমাব ভক্ত তা চাযও না এবং নেযও না। আমাব সুদর্শনচক্র আমাব ভক্তকে বক্ষা কবে, মহাপ্রলযেব সমযেও তাব বিনাশ হয না। অমাব ভক্তকেও যে স্মরণ করে, আমি তাঁকেও পালন-পোষণ কবি। যে আমাব ভক্তেব ভক্ত, তাকে আমি খুবই ভালবাসি, সে অবশ্যই অনাযাসে আমাকে পায। আমাব ভক্তেব কক্ষনো খাবাব অভাব হয না, আমিই উপব থেকে তাকে সব যুগিযে যাই। শ্রীবাস, তুমি নিশ্চিন্তে বসে থাক, তোমাব ঘবে সবই নিজেথেকে এসে জুটে যাবে। অদ্বৈতাচার্যকে এবং তোমাকে আবো একটা বব দিচ্ছি যে তোমাদেব শবীব কখনো জবাগ্রস্ত হবে না। বার্ধক্যেও তোমাদেব শবীব সুস্থ থাকবে। শ্রীবাম পণ্ডিতকে ডেকে শ্রীবাস বললেন, তুমি শ্রীবাসেব বড ভাই, কিন্তু শ্রীবাসকে ঈশ্ববর্বুদ্ধিতে সেবা কববে, এই আমাব আজ্ঞা। তোমাকে আমি প্রাণেব মত ভালবাসি, তাই বলছি, তুমি কখনো শ্রীবাসেব সেবা করতে ছেড়ো না। প্রভুর কথা শুনে শ্রীবাস এবং শ্রীরাম দুজনেই খুব আনন্দিত হলেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপায় শ্রীবাসের ঘবে কখনো কিছুর অভাব হয নি, তিনি সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। শ্রীবাসের উদার চরিত্রের

বিষয় বলে শেষ করা যায় না, তাঁকে স্মরণ করলে ত্রিভুবন পবিত্র হয়। শ্রীবাসের আতিথ্যে আপ্যায়নে প্রভু খুবই প্রীত ছিলেন, তাঁর গৃহে অনেক লীলা করেছেন তিনি। তিনি শ্রীবাসের আগ্রহে তাঁর বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। প্রভুকে নিয়ে শ্রীবাসের পরিবারের লোকেরা অনেক দিনই বেশ আনন্দে ছিলেন।

এখান থেকে প্রভু পানিহাটিতে রাঘবের ঘরে গেলেন। রাঘব পণ্ডিত কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত আছেন, এমন সময় দেখলেন শ্রীগৌরচন্দ্র সামনে উপস্থিত। ইষ্টদেবতাকে দেখে রাঘব দণ্ডবৎ করলেন। প্রভুর পদযুগল ধরে রাঘব আনন্দে কেঁদে ফেললেন। প্রভুও রাঘবকে কোলে নিয়ে প্রেমাশ্রুতে তাঁর শরীর ভিজিয়ে দিলেন। রাঘব আনন্দে অস্থির হয়ে পড়লেন, কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। প্রভু রাঘবের ভক্তি দেখে তাঁর প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করে বললেন,- এখানে এসে রাঘবকে দেখে আমি সব দুঃখ ভুলে গেলাম। রাঘবের বাড়িতে আমি নির্মল গঙ্গাস্নানের আনন্দ পেলাম। শ্রীকৃষ্ণের ভোগেব জন্য গিয়ে তাড়াতাড়ি রান্না চাপিযে দাও।- রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে আনন্দে রান্নার কাজে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণ প্রাণভরে, খুশি মত প্রভুর জন্য রান্না করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ এবং অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে প্রভু ভোজন করতে এলেন। প্রভু সকল ব্যঞ্জন ভোজন করে প্রশংসা করে বললেন,- রাঘবের-রান্না-শাকের মত এত চমৎকার শাক আমি আর কোথাও খাই নি।- রাঘাবও জানতেন যে প্রভু শাক খেতে ভাল বাসেন, তাই নানা রকম শাক এনে রেঁধেছেন। প্রভু ভোজনের পরে আচমন করে এসে বসলেন। রাঘবেব বাড়িতে প্রভু এসেছেন শুনে গদাধরদাস ছুটে চলে এলেন। গদাধর দাস প্রভুব খুবই প্রিয় পাত্র। তাঁব দেহ যে ভক্তিসুখে পরিপূর্ণ তা বাইরে থেকেও বুঝতে পারা যায়। প্রভু ভাগ্যবান গদাধরকে দেখে তাঁর মাথায় শ্রীচরণ তুলে দিলেন। পুরন্দর পণ্ডিত এবং পরমেশ্বব দাসেব শবীরেও প্রভু প্রকাশিত হয়েছেন। তাঁরা দুজনেও তখনই চলে এসেছেন এবং প্রভুকে দেখে আনন্দে কেঁদে দিয়েছেন। পবম বৈষ্ণব মহাগুণী রঘুনাথ বৈদ্যও এসেছেন। যেখানে যত বৈষ্ণব ছিলেন সকলেই প্রভুর কাছে চলে এসেছেন। প্রভুর আগমনে পানিহাটিতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। প্রভু রাঘব পণ্ডিতকে গোপনে বললেন,- রাঘব, তোমাকে আমি একটি গোপন কথা বলছি, শ্রীনিত্যানন্দ ব্যতীত আমার দ্বিতীয় কেউ নেই। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যা করান আমি তাই করি। তোমাকে খুলে বললাম, নিত্যানন্দই আমার সব। আমার এবং নিত্যানন্দেব মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তোমার বাড়িতে শিগগিরই তার প্রমাণ পাবে। মহাযোগেন্দ্রও যা পায়না, নিত্যানন্দের কাছে তাও পাওয়া যায়। তাই বলছি, তুমি খুব সাবধানে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সেবা করবে।- প্রভু আবার মকরধ্বজ করকে বললেন,- রাঘব পণ্ডিতকে ভাল ভাবে সেবা যত্ন করবে। তুমি যেমন রাঘব পণ্ডিতকে ভক্তি-শ্রদ্ধা কর, আমিও তাঁকে ঠিক তেমনি ভালবাসি। এই ভাবে পানিহাটি গ্রামকে ধন্য করে শ্রীগৌবহবি কিছুদিন সেখানে কাটিয়েছিলেন।

এরপর প্রভু বরাহনগরে এক মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসেছিলেন। সেই বিপ্র ভাগবতে মহাপণ্ডিত ছিলেন, প্রভুকে দেখেই ভাগবত পাঠ আরম্ভ করে দিলেন। তাঁর ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা শুনে প্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি 'বোল বোল' বলে হুঙ্কার গর্জন কবতে লাগলেন। বিপ্রও মহানন্দে পড়ছেন আর প্রভুও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে নেচে চলেছেন। শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভক্তির মহিমা শুনতে শুনতে তিনি বারেবারে কেবলই আছাড় খেয়ে পড়ছেন। প্রভুর প্রেম প্রকাশে আছাড় পড়া দেখে লোকেরা ভয় পেয়ে গেল।

এই ভাবে রাতের তিন প্রহর পর্যন্ত প্রভু ভাগবত শুনে কেবলই নাচলেন। বাহ্যজ্ঞান লাভ করে প্রভু বিপ্রকে আলিঙ্গন করে বললেন,- আমি এর আগে আর কারো মুখে এমন ভাগবত পাঠ শুনি নি। তাই আমি খুশি হয়ে তোমাকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দিলাম, তুমি এখন থেকে ভাগবত পাঠ ছাড়া আর কোন কাজ করবে না। প্রভু বিপ্রকে নিতান্ত উপযুক্ত পদবী দান করেছেন, তাই সকলে মহানন্দে জয়ধ্বনি হরিধ্বনি করতে লাগলেন।

প্রভু এই ভাবে গঙ্গাতীরে প্রতি গ্রামে ভক্তদের গৃহে থেকে সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে পুনরায় নীলাচল ধামে ফিরে এলেন। প্রভুর এই দ্বিতীয় বারের গৌড়-ভ্রমণ-কথা শুনলে তার আর কোন দুঃখ থাকে না। প্রভু আসা মাত্র সারা নীলচলে সাড়া পড়ে গেল। মহানন্দে সকলে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন এবং বললেন,- সচল-জগন্নাথ নীলাচলে এসেছেন। খবর পেয়েই উৎকলের পারিষদগণ, সার্বভৌম প্রমুখ সকলেই তৎক্ষণাৎ চলে এলেন। অনেক দিন পর প্রভুকে দেখে ভক্তগণ আনন্দে কাঁদতে লাগলেন। প্রভুও সকলকে মহাপ্রেমে কোলে নিয়ে নয়নের জলে সকলকে ভিজিয়ে দিলেন। প্রভু এই ভাবে কাশীমিশ্রের বাড়িতে আছেন। তিনি সর্বদা নৃত্যগীত আনন্দ আবেশে রয়েছেন, সারা দেশ তা দেখছে। নিজের আনন্দে প্রভুর বিন্দুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নেই। তিনি কখনো জগন্নাথদেবের সামনে নাচছেন, কখনো বা কাশীমিশ্রের বাড়িতে, কখনো সমুদ্রতীরে নাচেন। সর্বদাই প্রভুর প্রেমের বিলাস চলছে, অন্য কাজকর্ম সবই বন্ধ আছে। ভোররাত্রে শঙ্খের শব্দ শুনেই শয্যাত্যাগ করেন এবং মন্দিরের দরজা খুললেই জগন্নাথ-দর্শনে যান। জগন্নাথকে দেখেই প্রভু প্রেম প্রকাশ করেন, গঙ্গাধারার মত তাঁর প্রেমাশ্রুধারা বইতে থাকে, অত্যন্ত অদ্ভুত, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। উৎকলের লোকেরা এই দৃশ্য দেখে সকলেই দুঃখ শোক সব ভুলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যেদিকেই যান, তাঁর পেছন পেছন দলে দলে লোক হরিনাম করে চলতে থাকেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র খবর পেয়ে গেছেন যে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে এসেছেন। শুনেই তিনি কটক থেকে পুরীতে চলে এলেন। প্রভুকে দেখবার তাঁর খুব ইচ্ছে কিন্তু কেউ ভয়ে প্রভুর কাছে এ প্রস্তাব রাখতে পারছেন না। প্রতাপরুদ্র বললেন, -তোমরা যদি এতই ভয় পাও তাহলে আমাকে গোপনে দেখিয়ে দাও। রাজার এতটা আগ্রহ দেখে ভক্তগণ ঠিক করলেন, যখন প্রভু নৃত্য করেন তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, পরম ভক্ত রাজা সেই অবসরে লুকিয়ে দূর থেকে প্রভুকে দেখবেন। রাজাকে এই পরামর্শ দিলে তিনি বললেন,- যে কোন প্রকারে তাঁকে দর্শন করতে পারলেই হল। একদিন প্রভুর নৃত্যের সময় রাজা এসেছেন, তিনি আড়াল থেকে প্রভুর নৃত্য দেখছেন। পরম -আশ্চর্য-এই-দৃশ্য তিনি আগে কখনো দেখেন নি। প্রভুর চোখ দিয়ে অবিচ্ছিন্ন ধারা বইছে, মাঝেমাঝেই কম্প-স্বেদ-পুলক-বিবর্ণতা দেখা যাচ্ছে। এমন ভাবে প্রভু মাটিতে আছড়িয়ে পড়ছেন যে দেখে সকলেই ভয় পেয়ে যাচ্ছেন। কেউ তাকাতে পারছেন না। প্রভুর হুঙ্কার গর্জন শুনে প্রতাপরুদ্র কান চেপে ধরেন। প্রভু কৃষ্ণবিরহে এমনই কাঁদছেন, রাজা দেখছেন যেন নদীর ধারা বয়ে চলেছে। প্রভুর এই রকম কত প্রেমবিকার যে হচ্ছে আর যাচ্ছে তা লিখে শেষ করা যায় না। প্রভু তাঁর সুদীর্ঘ বাহুদুটি তুলে সর্বদা আনন্দে 'হরিবোল' বলে নাচছেন। এই ভাবে নেচে খানিক পরে প্রভু বাহ্যজ্ঞান লাভ করে সকলের মধ্যে বসে পড়লেন। রাজা মহানন্দে প্রভুর নৃত্য দেখে এবারে সকলের

অলক্ষ্যে চলে গেলেন। রাজা প্রভুর নৃত্য দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছেন কিন্তু মনে একটু সন্দেহও হয়েছে। হয়তো প্রভুর অনুগ্রহ লাভের জন্যই তা হয়েছে। নৃত্যের সময়ে প্রভুর নাক মুখ দিয়ে যে লালা ঝরে পড়ে, কীর্তনের সময়ে ধূলোয়- লালায় তা সারা গায়ে মাখামাখি হয়ে যায়। এই সব কৃষ্ণপ্রেমবিকার রাজা বুঝতে না পারায় তাঁর মনে স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহ হয়েছে। রাজা এসব কথা কাউকে কিছু বললেন না, নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। প্রভুকে দেখে রাজা খুশি হয়েছেন। রাত্রে তিনি শুয়ে আছেন। শ্রীজগন্নাথ নিজেই যে সন্ন্যাসীর রূপ ধরে জগতে অবতীর্ণ হয়ে নিজেই সঙ্কীর্তন লীলা করছেন, ঈশ্বরের মায়ায় রাজা সেই মর্ম জানতেন না। সেই প্রভু জগন্নাথই রাজাকে তা জানাতে লাগলেন। ভাগ্যবান প্রতাপরুদ্র রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি জগন্নাথদেবের সামনে গেছেন, জগন্নাথের দেহ ধূলোমাখা, দু চোখ দিয়ে গঙ্গাধারা বইছে। দু নাক দিয়ে জল পড়ছে, মুখ দিয়ে লালা পড়ছে, সারা গা ভিজে গেছে। স্বপ্নের মধ্যেই রাজা ভাবছেন,- জগন্নাথের এই কেমন লীলা তা তো কিছুই বুঝতে পারলাম না। রাজা জগন্নাথের চরণ স্পর্শ করতে চাইছেন। জগন্নাথ বলছেন,- রাজা, আমার পা ছোঁয়া তো তোমার উচিত নয়। তোমার শরীর কস্তুরী, কুঙ্কুম, গন্ধ চন্দন, কর্পূর লেপিত- সুগন্ধ মাখানো। আমার শরীর ধূলা এবং লালায ভরা, তাই আমাকে তোমার ছোঁয়া ঠিক হবে না। আমার নৃত্য দেখতে গিয়ে অমার গাযে লালা এবং ধূলা দেখে তুমি ঘৃণা করেছিলে। এখনো আমার গায়ে সেই নোংরা লেগে রয়েছে. তুমি মহারাজকুমার এবং নিজেও মহারাজা। আমাকে তোমার ছোঁযা ঠিক নয।- এই কথা বলে দয়াময় প্রভু ভক্তের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। রাজা তখন আবার দেখছেন, —চৈতন্যমহাপ্রভু সিংহাসনে বসে আছেন। সেই রকমই অঙ্গে ধূলো মাখা, তিনি রাজাকে বলছেন, -তখন আমাকে ঘৃণা করে চলে গেছ, এখন আবার ছোঁবে কেন? -এই ভাবে রাজা প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করলেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। তারপর রাজা জেগে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন, -আমি পাপী, দুরাচার, অপরাধী। শ্রীচৈতন্য যে ঈশ্বব অবতার তা আমি জানতাম না। যাঁর মাযাতে ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্যন্ত মোহিত হন তাঁকে মানুষ কি করে চিনতে পারবে? প্রভু, আমার অপরাধ ক্ষমা কব, নিজের ভক্ত বলে গ্রহণ করে আশীর্বাদ দাও। -রাজা বুঝতে পারলেন যে স্বয়ং জগন্নাথে এবং শ্রীচৈতন্যে কোনো প্রভেদ নেই। প্রভুকে দেখবার জন্য রাজা বিশেষ ব্যাগ্র হলেন, কিন্তু কেউ ব্যবস্থা করতে পারল না। প্রভু একদিন পুষ্পোদ্যানে পারিষদগণকে নিয়ে বসে আছেন। প্রতাপরুদ্র নিজেই গিয়ে সেখানে লম্বা হয়ে প্রভুর চরণে পড়লেন। রাজাব শরীরে এখন অশ্রু কম্প পুলক উপস্থিত , তিনি সেখানে আনন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। রাজাব শরীরে বিষ্ণুভক্তি-চিহ্ন দেখে প্রভু তাঁর গায়ে হাত রেখে বললেন, -ওঠ। প্রভুর হাতের ছোঁয়া পেয়ে চেতনা লাভ করে রাজা কাঁদতে লাগলেন,- তুমি কৃপাসিন্ধু, সর্বজীবনাথ, আমার মত পতিতদের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত কর। দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তুমি স্বেচ্ছাবিহারী এবং কৃপার সাগর। তুমি আমাকে ত্রাণ কর। তুমি ভক্তজন-বল্লভ রমাকান্ত, সর্ববেদগোপ্য, আমাকে উদ্ধার কর। তুমি পরম পবিত্র শুদ্ধসত্ত্বরূপধারী, সঙ্কীর্তন তোমার বড়ই প্রিয়, তোমার তত্ত্ব-গুণমহিমা নামমহিমা কেউ জানে না, পরম কোমল গুণাধার, ব্রহ্মা এবং শিব তোমাকে বন্দনা করেন, তুমি সন্ন্যাসধর্মের অলংকার, শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু, আমাকে ত্রাণ কর। তুমি কৃপা করে আশীর্বাদ কর যে তুমি কখনো আমাকে ত্যাগ করবে না। -প্রতাপরুদ্রের এই কাকুতি মিনতি শুনে

প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করলেন,- তুমি কৃষ্ণভক্তি লাভ কর। কৃষ্ণের কাজ ছেড়ে তুমি আর কিছু করবে না। সর্বদা কৃষ্ণনাম কর, শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্রই তোমাকে রক্ষা করবেন। সার্বভৌম ভট্ট চার্য, রামানন্দ রায় এবং তুমি, —এই তিন জনের জন্যই আমি এখানে এসেছি। আমার একটি কথা রাখবে, আমার বিষয় কিছু প্রচার করবে না। তুমি যদি আমার এই কথা না রাখ তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব। -এই বলে প্রভু রাজাকে গলার মালা খুলে দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করে বিদায় নিলেন। প্রতাপরুদ্র প্রভুকে বারংবার প্রণাম করে, আজ্ঞা শিরোধার্য করে চললেন। প্রভুকে দেখে রাজার মনস্কাম পূর্ণ হল এবং তিনি সেই থেকে সর্বদা চৈতন্যপদ-ধ্যান করতে লাগলেন। প্রভুর সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের মিলন কথা যে শোনে তাঁর প্রেমধন লাভ হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে আনন্দে কীর্তন-বিহার করছেন। উৎকলে যত ভক্ত জন্মে ছিলেন তাঁরা সকলেই প্রাণের ঈশ্বরকে চিনতে পারলেন। কৃষ্ণসুখের সাগর, প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে প্রভু আত্মপদ দিয়েছিলেন। পরমানন্দ মহাপাত্রের তনু চৈতন্যভক্তিরসে আপ্লুত। কাশী মিশ্র কৃষ্ণভক্তিতে মহা বিহ্বল, প্রভু তাঁর বাড়িতেই থাকতেন। এই সকল ভক্তবৃন্দকে নিয়ে প্রভু সর্বদা কীর্তনে মেতে থাকতেন। প্রভুর ভক্তদের মধ্যে যাঁরা সন্ন্যাসী ছিলেন, সকলেই এসে নীলাচলে বাস কবতে লাগলেন। অত্যন্ত প্রেমোদ্দাম নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সারা নীলাচল আলো করে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, তাঁর স্বরূপতত্ত্ব কেউ জানেন না। তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জপ করেন, স্বপ্নেও অন্য কিছু মুখে আনেন না। রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের যে রতি-মতি ছিল, শ্রীচৈতন্যের প্রতি নিত্যানন্দেব তেমনই ছিল। নিত্যানন্দের প্রসাদেই সকল সংসাব আজ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য অবতারের কথা কীর্তন করছে। এভাবেই চৈতন্য-নিতাই দুভাই নবদ্বীপে বাস করছেন।

নিভৃতে বসে একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে বললেন,- শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, তুমি নবদ্বীপে চলে যাও। আমি নিজমুখে প্রতিজ্ঞা করেছি যে মূর্খ নীচ দরিদ্র সকলকে প্রেমানন্দে ভাসাব, তুমি যদি তোমার স্বাভাবিক উদ্দাম ভাব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে থাক তাহলে সংসারের পতিতদের কে উদ্ধার করবে? তুমি প্রেমভক্তিদাতা, তুমিই যদি চুপচাপ বসে থাক তাহলে আর অবতীর্ণ হযেছিলে কেন? আমার প্রতিজ্ঞা যদি সার্থক করতে চাও তাহলে অবিলম্বে গৌড়দেশে চলে যাও। মূর্খ নীচ পতিত দুঃখী সকলকে ভক্তি দান করে মুক্ত কর। -শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞা পেযে নিজভক্তদের নিয়ে গৌড়দেশে চললেন। রামদাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ বৈদ্য, রঘুনাথ উপাধ্যায, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত - নিত্যানন্দ স্বরূপেব ভক্তগণ সকলেই তাঁব সঙ্গে গৌড়ে চলে এলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তগণকে নিয়ে আসাব সময়ে পথেই তাঁদের সকলকে প্রেমভক্তিতে আপ্লুত করলেন। ভক্তগণ সকলেই নানা ভক্তি ভাবে আপ্লুত হয়ে আত্মবিস্মৃত হযে গেলেন। প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস ব্রজরাখালের ভাবে আবিষ্ট হয়ে পথের মধ্যে ত্রিভঙ্গ হয়ে প্রহর তিনেক বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ছিলেন। গদাধর দাস রাধিকা ভাবে 'দধি কে নিবি' বলে অট্টহাস্য করতে লাগলেন। রঘুনাথ উপাধ্যায় রেবতীভাবে আবিষ্ট হলেন। কৃষ্ণদাস এবং পরমেশ্বর দাস দুজনে গোপালভাবে সর্বদা হৈ চৈ করতেন। পুরন্দর পণ্ডিত গাছে উঠে, —আমি অঙ্গদ,- বলে লাফ দিয়ে পড়ছেন। এই ভাবে অনন্তদেব শ্রীনিত্যানন্দ সকলকেই মহা উদ্দাম প্রেম দান করলেন। আত্মভোলা ভাবে সকলেই সোজা পথ ছেড়ে ডাইনে-বামে

যেতে লাগলেন। খানিক বাদে লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন,- গঙ্গাতীরে কি করে যাব? লোকেরা বললে,- অনেকটা পেছনে চলে এসেছ, ভুল পথ ধরেছ। লোকেদের কথা শুনে ঠিক পথ ধরলেন। আবার ভুল পথে রাস্তার লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল,- কুড়ি মাইল বামে যেতে হবে। আবার তাঁরা আনন্দে ঠিক পথের দিকে চললেন। নিজের শরীরের সঙ্গেই সম্পর্ক নেই, পথ ঠিক হবে কি করে! পরম প্রেমে আপ্লুত তাঁদের কারোই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-দুঃখ পর্যন্ত বোধ নেই। পথে শ্রীনিত্যানন্দ আরও যেসব লীলা করলেন তা একমাত্র অনন্তদেবই বর্ণনা করতে পারেন, আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

গঙ্গাতীর ধরে শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে এসে পার্ষদগণকে নিয়ে সর্বাগ্রে রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে উঠলেন। এঁদের পেয়ে রাঘব পণ্ডিত এবং মকরধ্বজ কর সপরিবারে আনন্দিত হলেন। সদলবলে নিত্যানন্দ পানিহাটিতেই থাকলেন। প্রেমবিহ্বলতায় তিনি সর্বদা কেবলই হুঙ্কার করছেন। পরে তাঁর নৃত্য করবার ইচ্ছা হল, গায়কেরাও এসে জুটে গেলেন। ভাগ্যবান মাধব ঘোষের মত কীর্তনীয়া কমই হয়। ইনি নিত্যানন্দের অতি প্রিয়পাত্র। নিত্যানন্দ এঁকে বৃন্দাবনের গায়ক বলেন। মাধব, গোবিন্দ এবং বাসুদেব তিন ভাই গাইতে লাগলেন, নিত্যানন্দ নৃত্য আরম্ভ করলেন। মহাবল অবধূতের নৃত্যে মেদিনী টলমল করে উঠল। শ্রীনিত্যানন্দ সর্বদা 'হরি' বলে হুঙ্কার করছেন আর এমন আছাড় খেয়ে পড়ছেন যে লোকেরা দেখে চমকে উঠছে। তিনি নাচতে নাচতে যাঁর দিকে তাকান, তিনিই ঢলে পড়ে যান। পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ সংসারকে উদ্ধার করার জন্য শুভারম্ভ করেছেন। প্রেমভক্তির যত প্রকার বিকার-চিহ্ন আছে তিনি সবগুলো প্রকাশ করে অপার নৃত্য আরম্ভ করলেন। খানিক পরে তিনি সিংহাসনে বসে বললেন,- অভিষেক কর। রাঘব পণ্ডিত প্রমুখ পার্ষদগণ অভিষেক কার্য আরম্ভ করলেন। হাজার হাজার ঘড়া গঙ্গাজল এনে সুবাসিত করলেন। সকলে মিলে মহানন্দে শ্রীনিত্যানন্দের মাথায় জল ঢেলে তাঁকে ঘিরে হরিধ্বনি দিয়ে ওঠেন। তাঁর অভিষেক-মন্ত্র পাঠ করে কীর্তন আরম্ভ করলেন। নূতন বসন পরিয়ে, শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করে, তুলসী ও ফুলের মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দিলেন। সিংহাসন সোনা দিয়ে সাজিয়ে শ্রীনিত্যানন্দকে তাতে বসালেন। রাঘব শিরে ছত্র ধরলেন। ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনি করতে লাগলেন, চারদিকে মহা আনন্দ উল্লাস চীৎকার আরম্ভ হল। ভক্তগণ বাহু তুলে বলতে লাগলেন,- আমাদের উদ্ধার কর, ত্রাণ কর প্রভু। আর কারো বাহ্যজ্ঞান নেই। শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপগত ভাবে সকলের দিকে তাকিয়ে রাঘব পণ্ডিতকে আদেশ করলেন,- শীঘ্র কদম্বের মালা গেঁথে নিয়ে এস। আমি কদম্ব ফুল খুব ভালবাসি, আমি কদম্ব বনেই থাকি। হাতজোড় করে রাঘবানন্দ বললেন,- প্রভু, এখন তো কদম ফুল পাওয়া যায় না। -প্রভু বললেন, - ঘরের বাইরে গিয়ে ভাল করে দেখ, দু-একটা হয়তো কোথাও ফুটেও থাকতে পারে। ভেতর-বাড়িতে গিয়ে রাঘব পণ্ডিত সেই ফুল দেখে আনন্দে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তিনি কোনপ্রকারে নিজেকে সামলিয়ে মালা গেঁথে নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে নিয়ে এলেন। তিনি আনন্দে মালা গলায় পরলেন। কদম ফুলের গন্ধে বৈষ্ণবগণ সকলেই বিহ্বল হয়ে পড়লেন। খানিক পরে আরো আশ্চর্য ব্যাপার হল যে দমনক ফুলের গন্ধে সারা বাড়ি ছেয়ে ফেলল। শ্রীনিত্যানন্দ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,- বলতো কিসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে?- সকলেই হাতজোড় করে জানালেন,- চারদিকে দমনক ফুলের অপূর্ব গন্ধ পাচ্ছি।

সকলের কথা শুনে নিত্যানন্দপ্রভু কৃপাপূর্বক বলতে লাগলেন,- পরম গোপনীয় রহস্য শোন, শুনলেই বুঝতে পারবে। শ্রীচৈতন্য আজ কীর্তন শুনতে নীলাচল থেকে এখানে এসেছিলেন। দনার মালা পরে তিনি একটি বৃক্ষ অবলম্বন করে ছিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গের সেই দমনক ফুলের গন্ধে চারদিক আমোদিত করছে। তোমাদের নৃত্য কীর্তন দেখবার জন্য প্রভু নীলাচল থেকে এখানে এসেছেন। তাই, তোমরা সকলে সবকাজ ফেলে রেখে, সব কিছু ভুলে গিয়ে কেবল কৃষ্ণকীর্তন কর। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আশীর্বাদে তোমাদের সকলের শরীর প্রেমপূর্ণ হোক। -এই কথা বলে শ্রীনিত্যানন্দ হরিনাম নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে দশদিকে কৃষ্ণপ্রেম বিস্তার করে দিলেন। শ্রীনিতাইযের প্রেমদৃষ্টিপাতে সকলেই আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন।

তিনি যেভাবে জগতকে ভক্তি দান করলেন সেই নিত্যানন্দশক্তির কথা শুনবার যোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে যে গোপীপ্রেমের কথা বলা হযেছে তা নিত্যানন্দ থেকেই সকলে লাভ করেছেন। শ্রীনিতাই সিংহাসনে বসে আছেন, পারিষদগণ সামনে নাচছেন। কেউ গিযে গাছেব উপরের ডালে উঠে পাতায় পাতায ঘুরে বেড়াচ্ছেন তবু পড়ছেন না। কেউ অবার গোড়া ধরে টেনে উপড়ে ফেলছেন। কেউ বা সুপুরি বাগানে গিয়ে একটানে পাঁচ-সাতটি সুপুরি গাছ উপড়ে ফেলছেন। প্রেমবলে তাঁরা ঘাসের মত করে গাছ উপড়ে ফেলছেন। অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম, পুলক, হুঙ্কার, স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ, সিংহেব মত গর্জন, আনন্দ, মূর্ছা ইত্যাদি যত প্রেমানন্দের বন্যা বযে যায়। প্রভু খাটে বসে হাসেন। নিত্যানন্দের প্রধান পাবিষদগণ সকলেই বাক্‌সিদ্ধ হলেন এবং দেখতেও পরম সুন্দর হলেন। তাঁবা যাকে স্পর্শ করেন সে-ই সব ভুলে গিযে বিহ্বল হযে পড়ে। এইভাবে শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটীতে তিন মাস থেকে ভক্তিধর্ম প্রচাব করলেন। এই তিন মাস সকলেই সব কাজকর্ম ভুলে গিযেছেন। আত্মবিস্মৃত হযে আছেন। তিন মাস ধবে কারো আহার নিদ্রা নেই, সকলেই কেবল প্রেমানন্দে নৃত্য করে চলেছেন। তখন পানিহাটিতে যে প্রেমানন্দেব জোয়ার বয়ে গিযেছিল তা চাব বেদে বর্ণনা করবেন। নিত্যানন্দ এক দণ্ডে যে লীলা করতেন তাও কারো পক্ষে বর্ণনা করে ওঠা সম্ভব নয। তিনি প্রায প্রাযই ভক্তদের নিযে নৃত্য করতে থাকেন। কখনো তিনি নিজে বীরাসনে বসে থেকে ভক্তবৃন্দকে নাচিযে ছাড়েন। একেক জন সেবকের নৃত্যের সময় সকলেই প্রেমে ভাসতে থাকেন। ঝড়ে যেমন কলাবন পড়ে যায় তেমনি সকলেই প্রেমানন্দে দশা পড়ছেন। শ্রীনিত্যানন্দ সকলকেই নিজের মত প্রেমোন্মাদ করে তুললেন। তিনি সর্বদা শ্রীচৈতন্যের সংকীর্তন নিজেও করেন, অন্যকেও করান। শ্রীনিত্যানন্দ এমনই প্রেমপ্রকাশ করতে লাগলেন যে লোকেরা এসে দেখেই বিহ্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। যে ভক্ত যখন যা মনে ভাবেন তাই এসে উপস্থিত হয়। এইভাবে কোথা দিয়ে তিনটি মাস কেটে গেল তা কেউ টেরও পেল না।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অলঙ্কার পরতে ইচ্ছে করল। ইচ্ছামাত্র বহু অলঙ্কার এসে গেল। ভাগ্যবানেরা মনিমুক্তা, প্রবাল, মুক্তাহার, পশমী কাপড ইত্যাদি দিয়ে প্রণাম করছেন। কিছু অলঙ্কার তৈরী করা ছিল আর কিছু তিান তৈরি করলেন। তারপর তিনি ইচ্ছামত পরলেন। মোটা করে চুড়ি বালা বাজু করিয়ে দু হাতে পরলেন। রত্ন বসানো সোনার আংটি পরলেন দশ আঙ্গুলে। মনি মুক্তা প্রবালের বহু দিব্যহার গলায় পরলেন। মহাদেবের প্রীতির জন্য তিনি রুদ্রাক্ষ ও রিড়ালাক্ষ সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে গলায় পরেছেন। সোনা, কষ্টিপাথর ও মুক্তোর সুন্দর মাকড়ি পরলেন কানে। পায়ে রূপোর নূপুর পরে তার উপর

চমৎকার মল পরলেন। শাদা নীল হলুদ নানা রংয়ের কাপড় পরলেন। মালতী-মল্লিকা-যুঁই-চাপার মালা বুকের উপরে দুলতে লাগল। গোরোচনার সঙ্গে চন্দন দিয়ে দিব্যগন্ধ তৈরী করে সারা গায়ে মেখেছেন। মাথায় নানা রংয়ের কাপড়ের পাগড়ী পরেছেন, তাতে বহুবিধ ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। কোটি চন্দ্রের চেয়েও সুন্দর মুখে সর্বদা হরিধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। দুটি চোখ দিয়ে তিনি যেদিকে তাকান সেদিকই প্রেমানন্দে ভাসতে থাকে। রূপোর মত উজ্জ্বল লোহার লাঠির দুদিকে সোনা দিয়ে বাঁধান, সেটি সর্বদা বলরামের মুষলের মত হাতে রয়েছে। পারিষদবর্গও তাঁব মত অলঙ্কার পরেছেন। বাজু. বালা, মল, নূপুর, হার, শিঙ্গা, বেত, বাঁশি, গুঞ্জামালা এবং ছাঁদনদড়ি। নিত্যানন্দের পার্ষদগণ সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলা। এইভাবে নিত্যানন্দ নিজের তত্ত্ব অনুভবের আনন্দে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে লীলা করে চলেছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ পর্ষদগণকে নিয়ে ভক্তবৃন্দের বাড়ি বাড়ি যেতেন। গঙ্গার দু পাশে যত গ্রাম আছে তার প্রায সব জায়গাতেই তিনি গেলেন। তাঁর নাম এবং তনু দুই-ই রসময, লোকেরা দেখা মাত্র মুগ্ধ হয়। পাষণ্ডীরাও তাঁকে দেখামাত্র স্তুতি করে এবং তাঁকে সর্বস্ব দিয়ে দিতে চায়। মধুর চরিত্রের নিত্যানন্দ সকলের প্রতিই কৃপাদৃষ্টিপাত করেন। ভোজনে শয়নে পর্যটনে সর্বদা তিনি সঙ্কীর্তন করেন। তাঁর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তনের ফলে শতশত লোক বিহ্বল হয়ে পড়ে। গ্রামের ছেলেপুলেরা তেমন কিছু জানে না কিন্তু তারাও হুঙ্কার করে বড় বড় গাছ উপড়ে ফেলে বলে বেড়ায়,- আমিই গোপাল। একেকটি ছেলের গায়ে এত শক্তি যে একশো লোকে মিলেও ধরে রাখতে পারে না। ছোট ছোট ছেলে মহানন্দে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ' বলে সিংহনাদ করে। শিশুদেব প্রাণের বন্ধু শ্রীনিত্যানন্দ এই ভাবে তাঁদের তাতিয়ে মাতিয়ে তুললেন। একেকটি ছেলে মাসখানেকের জন্যে খাওয়া-দাওযা ভুলে গেছে। লোকেরা তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন। ভক্তগণ সকলে বিস্মিত হলেন, কি ব্যাপর কিছুই বুঝতে পারছেন না। নিত্যানন্দই সকলকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করলেন। তিনি সকলকে পুত্রস্নেহে নিজের হাতে খাইযে দিতে লাগলেন। কাউকে আবার নিজের কাছে বেঁধে রাখেন। তিনি বাঁধছেন মারছেন তবু তারা কিন্তু মহা আনন্দে নিমগ্ন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রীতি প্রকাশ করার জন্য একদিন গদাধর দাস পণ্ডিতের বাড়িতে এলেন। গদাধরদাস গোপীভাবে মহানন্দে রয়েছেন, ঘড়া করে মাথায গঙ্গাজল নিয়ে এসে সকলকে ডেকে বলছেন,- কে দুধ কিনবে, এসো। গদাধরের বাড়ির মন্দিরে শ্রীবালগোপালমূর্তি পূজিত হন। বিগ্রহ পরম লাবণ্যময়। নিত্যানন্দ গোপালের মনোহর মূর্তি দেখে তাঁকে বুকের উপরে তুলে নিলেন। অনন্তদেবের হৃদয়ে গোপালকে দেখে সকলে উচ্চস্বরে হরিধ্বনি করে উঠলেন। তখন নিত্যানন্দও হুঙ্কার করে গোপাল-লীলায় নৃত্য করতে লাগলেন। মাধবানন্দ ঘোষ আবার শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা গাইতে লাগলেন, প্রভু শুনে মহা খুশি। ভাগ্যবান মাধব ঘোষের কীর্তনে শ্রীনিত্যানন্দ খুবই সন্তুষ্ট হলেন। গদাধর দাসকে নিয়ে এবারে নিত্যানন্দই গানের সঙ্গে নাচতে শুরু করলেন। গদাধর সর্বদা গোপীভাবেই রয়েছেন, তাঁর বাহ্যজ্ঞান নেই। নিত্যানন্দ দানখণ্ড লীলা গানের সঙ্গে যে নৃত্য করলেন তা বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রেমভক্তির যাবতীয় চিহ্ন প্রকাশ করে তিনি নাচলেন। বাহু তুলে অদ্ভুত ভাবে হাত নেড়ে তিনি নৃত্যভঙ্গিমায় বিদ্যুৎগতি আনলেন। নয়নভঙ্গী, সুন্দর হাস্য, শির-কম্পন-সবই তাঁর অদ্ভুত লীলা-বিলাস। সুন্দর দুই চরণ একত্র করে জোরে

জোরে অদ্ভুত মনোহর লাফ দিচ্ছেন। নিত্যানন্দ যে দিকে তাকান সেদিকেই নারী-পুরুষ সকলে কৃষ্ণানন্দে ভাসতে থাকেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তির প্রভাবে কারো দেহস্মৃতি থাকে না। যোগীন্দ্র প্রমুখ মুনিগণ যে ভক্তি বাঞ্ছা করেন, নিত্যানন্দের কৃপায় তা অতি সাধারণ লোকেরাই উপভোগ করে। হাতির মত বিরাটকায় বলবান লোকও তিন দিন না খেয়ে থাকলে চলতে পারে না, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ছোট ছেলেরা মাস খানেক ধরে না খেয়ে রয়েছে তাও সিংহের মত চলাফেরা করছে। নিত্যানন্দের এই সব শক্তি-প্রকাশ দেখেও চৈতন্যমায়ায় কেউ মূল তত্ত্ব ধরতে পারছে না। এই ভাবে প্রেমানন্দ বিলিয়ে শ্রীনিত্যানন্দ কিছুদিন গদাধরদাসের গৃহে থাকলেন। গদাধর সর্বদা লোকদের হরিনাম বিতরণ করছেন, তাঁর কিছু মাত্র বাহ্যজ্ঞান নেই।

সেই গ্রামে একজন দুর্ধর্ষ কাজী থাকেন, তিনি আদৌ কীর্তন পছন্দ করেন না, বিদ্বেষ করেন। আনন্দ-বিহ্বল গদাধর এক রাতে সেই কাজীর বাড়িতে চলে গেলেন। যে কাজীর ভয়ে লোকে পালায় গদাধর রাতের বেলায় হরিধ্বনি দিতে দিতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। কাজীর লোকেরা তাঁকে দেখেও কেউ কিছু বলছে না, যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। গদাধর তখন বললেন, -কাজীবেটা কোথায় গেল? শীঘ্র কৃষ্ণ বল, না হলে শিরশ্ছেদ হবে। কাজী রেগে আগুন। বেরিয়ে এসেই কিন্তু শান্ত হয়ে বললেন,- গদাধর, তুমি কেন এখানে এসেছ? গদাধর বললেন,- কিছু কথা বলবার আছে তাই এসেছি। শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে জগতকে হরিনাম নেওয়ালেন। কেবল তুমি হরিনাম নিলে না, তাই তোমাকে হরিনাম বলাতে এসেছি। তুমি পরম-মঙ্গল হরিনাম উচ্চারণ কর, আমি তোমার সব পাপের ভার নিলাম। যদিও কাজী খুব হিংসুক-স্বভাবের লোক, তবু তিনি চুপ করে থেকে একটু পরে বললেন,- গদাধর আগামী কাল হরিনাম নেব, আজ তুমি চলে যাও। কাজীর মুখে এভাবে একবার মাত্র হরিনাম উচ্চারণ শুনে গদাধরদাস প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে গেলেন। গদাধর বললেন,- আবার কাল কেন? এই তো মাত্র নিজের মুখেই হরি বললে। যখন একবার হরিনাম নিয়েছ, তোমার আর কোনো অমঙ্গল হবে না। -এই বলে পরমোন্মাদ গদাধর হাতে তালি দিয়ে নানা রকম নাচতে লাগলেন। কিছু সময় পরে নিজের বাড়িতে চলে এলেন। গদাধরের শরীরে শ্রীনিত্যানন্দ অধিষ্ঠিত।

শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ গদাধরদাসের অপার মহিমা। নদীয়ার কোন ভক্তে কাজীর ধারে কাছে যান না, সাধুদের দেখলেই কাজী জাতি নষ্ট করার চেষ্টা করে। সেই লোকটি আজ হিংসা ভুলে গিয়েছেন। কৃষ্ণভক্তির এই শক্তি। যাঁর সত্যি কৃষ্ণভক্তি রয়েছে তাঁকে সাপ-বাঘ-আগুনে কিছুই করতে পরে না। যে কৃষ্ণভক্তি ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণ কামনা করেন, গোপীগণে যে অনুরাগ ব্যক্ত, শ্রীনিত্যানন্দ তা অনায়াসে সকলকে বিলিয়ে দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের চরণ ভজনা করলে তাঁর আশীর্বাদে শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় লাভ করা যায়।

শ্রীনিত্যানন্দ শচীদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। পারিষদ বর্গকে নিয়ে তাই নবদ্বীপের দিকে যাত্রা করলেন। পথে খড়দহে পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় পড়ে। সেখানে নিত্যানন্দ প্রচুর নৃত্য করলেন। পুরন্দর পণ্ডিত মহা উন্মাদ, প্রেমোন্মাদ, গাছের উপরে উঠে সিংহনাদ করেন। চৈতন্যদাসের বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তিনি বনের মধ্যে বাঘকে তাড়িয়ে যান। কখনো বাঘের পিঠে চড়ে বসেন। কৃষ্ণকৃপায় তাঁর কিছুই হয় না । চৈতন্যদাস মহা অজগর সাপকে কোলে নিয়ে খেলা করেন, বাঘকে ভয় পান না, তার সঙ্গেও খেলা

করেন। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাতেই শ্রীচৈতন্যদাসের এই শক্তি। সেবকবৎসল শ্রীনিত্যানন্দ অনায়াসে ব্রহ্মার দুর্লভ ভক্তি দান করেন। চৈতন্যদাস সর্বদা আত্মবিস্মৃত থাকেন, একা একা নিজের মনে কথা বলেন। দু-তিন দিন ধরে জলের নিচে ডুব দিয়ে থাকেন। তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। তাঁর সিংহের মত শক্তি থাকলেও কিন্তু পোষাক আষাক এবং স্বভাবে চরিত্রে বোকার মত। চৈতন্যদাসের শরীরে সব ভক্তিলক্ষণ প্রকটিত। মুরারি পণ্ডিতও একজন অত্যন্ত ভক্তলোক, শ্রীচৈতন্যের ভক্ত। তাঁর কাছে থাকলেই কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি ঘটে। আজকাল অনেকে নিজেকে চৈতন্যভক্ত বলে পরিচয় দেয় কিন্তু ভুলেও শ্রীচৈতন্যগুণকথা উচ্চারণ করে না। অদ্বৈতাচার্যের ইষ্টদেবতা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অদ্বৈত তাঁর ভক্তিগুণে ধন্য হয়েছেন। অদ্বৈত অনেক পাষণ্ডীকে ভক্তিপথে এনেছেন, অদ্বৈতের চৈতন্যভক্তির জয় হোক। সাধুগণ এভাবেই অদ্বৈতাচার্যের গুণকীর্তন করেন কিন্তু কেউ কেউ তাকে অদ্বৈতের নিন্দা বলে মনে করে। সেও আবার নিজেকে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত বলে প্রচার করে কিন্তু সে কখনও অদ্বৈতাচার্যের কাছেও যেতে পারে না। কারণ, অদ্বৈত তেমন লোককে পছন্দ করেন না। এসব লোককে আবার যারা অদ্বৈতের ভক্ত বলে প্রচার করে তারা আসলে অদ্বৈতাচর্যকে কিছুই জানে না। রাক্ষসের যেমন অন্য নাম 'পুণ্যজন', এরাও তেমনি চৈতন্যভক্ত।

শ্রীনিত্যানন্দ কিছুদিন খড়দহে থেকে তারপর ভক্তবৃন্দকে নিয়ে সপ্তগ্রামে এলেন। এই সপ্তগ্রামে সপ্তঋষিস্থান আছে। তাকে বলে ত্রিবেণী ঘাট। এই গঙ্গাঘাটে পূর্বকালে সপ্তঋষি তপস্যা করে গোবিন্দচরণ লাভ করেছিলেন। তিনি দেবী জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতী তিনটি নদীরূপে এখানে মিলিত হয়েছেন। এই সঙ্গমস্থলকে ত্রিবেণীঘাট বলে, এর দর্শনেও সর্বপাপ ক্ষয় হয়। শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তবৃন্দকে নিয়ে মহানন্দে সেই ঘাটে স্নান করলেন। ত্রিবেণীর তীরে উদ্ধারণদত্তঠাকুরের বাড়িতে তিনি থাকলেন। উদ্ধারণ অকপটে শ্রীনিত্যানন্দের চরণ-সেবা করলেন। উদ্ধারণ নিত্যানন্দের চরণসেবার সৌভাগ্য লাভ করলেন। উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন নিত্যানন্দের নিত্যপার্ষদ। নিত্যানন্দ জগতে অবতীর্ণ হলে উদ্ধারণও অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। সুবর্ণবনিক বংশে উদ্ধারণের আবির্ভাব হয়েছিল, শ্রীউদ্ধারণের নিত্যানন্দ-ভক্তির প্রভাবেই বণিককুল পবিত্র হয়েছে। বণিককুলকে উদ্ধার করার জন্যই শ্রীনিত্যানন্দ তাঁদের প্রেমভক্তির অধিকার দান করেছেন। সপ্তগ্রামে বণিকদের প্রত্যেকটি গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন করেছেন। বণিকরা সকলেই তাঁর আশ্রয় নিয়ে চরণ সেবা করেছেন। সারা দেশ বণিকদের ভক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছে। শ্রীনিত্যানন্দের অপার মহিমা, তিনি অধম মূর্খ বণিকদেরও উদ্ধার করেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে ভক্তদের নিয়ে কীর্তনলীলা করেছেন। তিনি সপ্তগ্রামে যে কীর্তনের ধূম বইয়ে দিয়েছিলেন তা একশো বছর ধরে বর্ণনা করেও শেষ করা যাবে না। আগে নবদ্বীপে যেমন আনন্দ হয়েছিল ঠিক তেমনি হল সপ্তগ্রামেও। দিন রাত লোকেরা খিদে তেষ্টা ভুলে গিয়ে কেবলই কীর্তন করছেন, চার দিক কীর্তনের আনন্দে ভরে গেল। প্রতিটি মোড়ে, প্রতিটি ঘরে নিত্যানন্দ কীর্তন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আবেশ দেখে সবাই বিহ্বল হলেন। বিষ্ণুদ্রোহী যবনগণ পর্যন্ত তাঁর পাদপদ্মে শরণ নিলেন। যবনের প্রেমাশ্রুপাত দেখে ব্রাহ্মণগণ নিজেদের ধিক্কার দিতে থাকলেন। শ্রীনিত্যানন্দের জয় হোক, তাঁরই কৃপাতে এসব হচ্ছে। সপ্তগ্রামে এবং অম্বিকা-কালনাতে শ্রীনিত্যানন্দ এভাবে কীর্তনানন্দে ভাসিয়ে দিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীনিত্যানন্দ শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বাড়িতে এলেন। অদ্বৈতাচার্য

নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে অতীব আনন্দিত হলেন। তাঁকে প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবত করে 'হরি' বলে হুঙ্কার ছাড়লেন। শ্রীনিত্যানন্দও শ্রীঅদ্বৈতকে কোলে জড়িয়ে ধরে প্রেমাশ্রুতে তাঁকে ভিজিয়ে দিলেন। দুজনেই দুজনকে দেখে আত্মস্মৃতি-হারা হলেন এবং বড়ই আনন্দিত হলেন। দুজনে দুজনকে ধরে উঠোনে গড়াগড়ি যাচ্ছেন এবং দুজনেই দুজনের চরণ ধরতে চাইছেন। কোটি সিংহের চেয়েও উচ্চ রবে দুজনে চীৎকার করছেন, দুই প্রভুরই প্রেমোন্মাদ ভাব থামছে না। খানিক পরে দুজনে স্থির হয়ে বসলেন। অদ্বৈত করজোড় করে নিত্যানন্দের স্তুতি শুরু করলেন,- তুমি ত্রিকালসত্য অপ্রাকৃত চিন্ময় পরমানন্দের মূর্তবিগ্রহ, নিত্য-পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের গুণাবলীর মূর্তরূপ। তুমিই সকল জীবকে পরিত্রাণের কারণ, মহাপ্রলয়-কালেও তুমি ধর্মসেতুর কাজ কর। তুমিই শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি বুঝিয়ে দাও, তুমিই জগতের হিতের জন্য শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে প্রেমপ্রচারের পূর্ণ শক্তিকে রক্ষা কর, কখনও স্তিমিত হতে দাও না। তোমার সদুপদেশ লাভ করেই ব্রহ্মা-শিব-নারদ প্রমুখ ভক্তি লাভ করেছেন। তোমার কাছ থেকেই সকলে বিষ্ণুভক্তি লাভ করে কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই। তুমি কোন কিছুতেই দোষ দেখ না, তুমি পতিতপাবন, বহু পুণ্যের ফলেই লোকে তোমাকে জানতে পারে। তোমার এই শরীর সর্ববস্তুময়, তোমাকে স্মরণ করলে মানুষের অবিদ্যা খণ্ডিত হয়। কিন্তু তুমি নিজে তোমাকে প্রকাশ না করলে কেউ শত চেষ্টাতেও তোমাকে জানতে পারে না। তুমি অক্রোধ পরমানন্দ সহস্রবদন আদিদেব মহীধর। তুমি রাক্ষসবংশধ্বংসকারী শ্রীলক্ষ্মণ, তুমি গোপ-তনয় শ্রীবলরাম। মূর্খ নীচ অধম পতিত ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করবার জন্যই তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ। স্বয়ং যোগেশ্বর যে ভক্তি বাঞ্ছা করেন, তোমার কাছ থেকে তা নির্বিচারে সকলেই পেয়ে গেল। -অদ্বৈতাচার্য নিত্যানন্দের মহিমা কীর্তন করতে করতে নিজেকে ভুলে গেলেন। অদ্বৈতাচার্য-যে নিত্যানন্দের প্রভাব সম্যক জানেন, একথা খুব স্বল্প সংখ্যক সৌভাগ্যবান লোকেই জানেন। তবু যে দুজনের মধ্যে কলহ দেখা যায়, তা কেবল আনন্দ উপভোগ করবার জন্য। এই কলহ নিতান্তই বহিরঙ্গ ব্যাপার। অদ্বৈতাচার্যের সব কথা যিনি বুঝতে পারেন তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি আছে ধরে নিতে হবে। দুই মহাপ্রভু মাঙ্গলিক কৃষ্ণকথা আলোচনা করে সময় অতিবাহিত করছেন। -শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে অদ্বৈতাচার্যকে প্রীত করে, তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নবদ্বীপে এলেন।

সর্বপ্রথম শচীমাতাকে প্রণাম করলেন। নিত্যানন্দকে দেখে শচীমাতা অতীব আনন্দিত হয়ে বললেন, -বাপু, তোমাকে দেখতে বড়ই ইচ্ছে করছিল। তুমি অন্তর্যামী, আমার মনের কথা জেনে তাড়াতাড়ি চলে এসেছ। এ সংসারে তোমাকে কেউ চিনতে পারছে না। তুমি কিছুদিন নবদ্বীপে থাক, আমি তোমাকে দশ দিন -পনেরো দিন -মাস খানেক দেখতে চাই। তুমি তো জান, আমি বড়ই দুঃখী। তোমাকে আমার খুবই দেখার ইচ্ছা। দৈবাৎ তুমি আমাকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করতে এসেছ। -নিত্যানন্দ শচীমাতার প্রভাব জানেন, তাই তিনি হেসে বললেন, -তুমি জগন্মাতা, তোমার দর্শনের জন্যই আমি এখানে এসেছি। নবদ্বীপেই থাকবার ইচ্ছা আমার, তুমিও বলছ থাকতে, তাই নবদ্বীপেই থেকে গেলাম। -নিত্যানন্দ শচীমাতাকে এই কথা বলে আনন্দে নবদ্বীপে ঘুরতে লাগলেন। প্রতি বাড়িতে তিনি তাঁর পারিষদবর্গকে নিয়ে কীর্তন করছেন। এখানে এসে তিনি কীর্তন করে খুবই আনন্দে কাটাচ্ছেন। মাথায় সুন্দর রেশমী পাগড়ী, তাতে মালা দিয়ে সাজানো। গলায় মণিমুক্তা, সোনার হার। কানে মুক্তোর দুল। হাতে সোনার বালা, বাজু। বুকে

উপরেও অনেক মালা দুলছে। সর্বাঙ্গে গোরোচনা এবং চন্দন। নিত্যানন্দ সর্বদা বালগোপাল-বেশে আছেন। তাঁর হাতে অপূর্ব লৌহদণ্ড। দশ আঙ্গুলে দশটি সোনার আংটি। তিনি শাদা, নীল, হলুদ নানা রংয়ের পশমী কাপড় পরেন। পেটের সামনে কোমরের কাপড়ে গোঁজা রয়েছে বেত, বাঁশী এবং ছড়ি। নিত্যানন্দের এই রূপ দর্শনে এবং ধ্যানে জগতবাসীর মন লুব্ধ হয়। তাঁর পায়ে রূপোর নূপুর এবং মল, হাঁটার সময়ে সুন্দর শব্দ হয়। নিত্যানন্দ যেদিকে তাকান সেদিকেই কৃষ্ণভক্তি রূপ লাভ করে। শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপে নিত্যানন্দ এভাবেই আছেন। রাজধানী মথুরার মতই নবদ্বীপের অবস্থা। কত লোক আসছে যাচ্ছে। এমন সব সাধুগণ আসেন, তাঁদের দেখলেও পাপ কেটে যায়। এর মধ্যে আবার অনেক দুর্জনও আছে, তাদের ছায়া মাড়ালেও ধর্ম নষ্ট হয়। তারাও নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাতে অনায়াসে আন্তরিক ভাবে কৃষ্ণভক্তি লাভ করেছে। শ্রীচৈতন্য নিজেও অনেক উদ্ধার করেছেন, নিত্যানন্দের দ্বারাও অনেক উদ্ধার হয়েছে। চোর দস্যু পতিত অধম নানা শ্রেণীর লোককে শ্রীনিত্যানন্দ নানা প্রকারে উদ্ধার করেছেন।

নিত্যানন্দপ্রভু কি করে চোর-দস্যুদের উদ্ধার করেছেন সে সব কাহিনীও শুনবার মত। নবদ্বীপে একটি ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল, তার মত চোর দস্যু বড় কম দেখা যায়। সে ছিল বহু চোর-ডাকাতের সর্দার। নামেই ব্রাহ্মণ কিন্তু কাজেকর্মে নচ্ছার। নরহত্যায় সে সিদ্ধহস্ত, শরীরে বিন্দুমাত্র দয়ামায়া নেই। সব সময় ডাকাতদের সঙ্গেই থাকে। শ্রীনিত্যানন্দের গায়ে স্বর্ণ প্রবাল মনি মুক্তোর চমৎকার গয়না, গলায় হার -এই সব দেখে সেই ব্রাহ্মণপুত্রের ইচ্ছা হল এগুলো চুরি করে নেবে। তাই সে সাধু সেজে নিত্যানন্দের সঙ্গে ঘুরতে লাগল। অন্তর্যামী নিত্যানন্দ চোরের মনের কথা জানতে পরলেন। হিরণ্যপণ্ডিত নামে এক জন সদ্ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে বাস করতেন, তিনি ভক্ত ছিলেন এবং দরিদ্র ছিলেন। নিত্যানন্দ একদিন তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। দুষ্ট ব্রাহ্মণপুত্র ডাকাতদের সঙ্গে পরামর্শ করল, -অবথা দুঃখ পাওয়ার আর কোন দরকার নেই। মা চণ্ডী যখন মিলিয়ে দিয়েছেন তখন আর কি কথা! অবধূতের গায়ে সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তা, কষ্টিপাথর -কত লক্ষ টাকার গহনা রয়েছে কে জানে। মা-চণ্ডী এসব মিলিয়ে দিয়েছেন। হিরণ্যপণ্ডিতের খালি বাড়ি, চোখের পলকে সব ছিনিয়ে নিয়ে আসব। ঢাল খাঁড়া নিয়ে তোমারা প্রস্তুত থাকবে. আজ রাত্রে গিয়ে হানা দেব। -এই যুক্তি করে ডাকতেরা রাত্রে এসে হাজির হল। নিত্যানন্দ যেখানে ছিলেন সেখানে তারা খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল নিয়ে প্রস্তুত। ডাকাতেরা এক জায়গায় জড় হয়েছে, আগে একজন চর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভক্তরা চারদিকে হরিনাম করছেন। নিত্যানন্দপ্রভু ভোজন করছেন। প্রভুর ভক্তরা কেউ করতালি দিয়ে অট্টহাস্য করছেন। চর এসে ডাকাতদের কাছে খবর দিল, -লোকেরা সকলেই জেগে আছে, অবধূত ভাত খাচ্ছে। ডাকাতেরা বললে- আমরা একটু বসি, সকলে শুয়ে পড়ুক, তখন গিয়ে হানা দেব। ছিনিয়ে কত সোনা-দানা পাবে, এই আনন্দে ডাকাতেরা গাছের তলায় মজায় বসে রয়েছে। কেউ বলছে,- আমি সোনার তাড় বালা নেব। কেউ বলছে, -আমি মুক্তোর মালাগাছি নেব। কেউ বলছে, -কানের গয়নাটা আমার চাই। আবার একজন বলছে, -হারগুলো আমার দরকার। কেউ বলছে- রূপোর নূপুর আমি নেব। সকলেই এভাবে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিয়ে যাচ্ছে। এমন সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায় ভগবতী-নিদ্রা এসে সকলের চোখ জুড়ে বসলেন। ডাকাতেরা ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। রাত পোহালেও তাদের হুঁশ হল না। কাকের ডাকে জেগে গিয়ে

রাত নেই দেখে ডাকাতেরা মন খারাপ করল। তাড়াতাড়ি ঢাল খাঁড়া জঙ্গলে ফেলে রেখে তারা গঙ্গায় চান করে নিল। এবারে নিজের আড্ডায় গিয়ে তারা পরস্পরকে দোষারোপ করে গালিগালাজ করতে লাগল। কেউ বলছে, -তুই আগে ঘুমিয়ে পড়েছিলি। কেউ আবার বলছে, -তুই যেন ভারি জেগে ছিলি আর কি! ডাকাতদের সর্দার সেই ব্রাহ্মণপুত্র বললে, -অযথা তোমরা কেন ঝগড়া ঝাঁটি করছ? চণ্ডীর ইচ্ছায় যা হয়েছে। এক দিন গেল কি হল? আর কি দিন নেই? মা-চণ্ডীই আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। চণ্ডীপূজা না দিয়েই গিয়েছিলাম কিনা? আজ ভাল করে সকলে মিলে এক জায়গায় মদ-মাংস দিয়ে চণ্ডীর পূজা দেব। -এই রকম পরামর্শ করে ডাকাতেরা মদ-মাংস দিয়ে চণ্ডীর পূজা করল।

পরের দিন ডাকাতেরা মালকোচা মেরে কাল কাপড় পরে এল। বেশি রাতে সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন ডাকাতেরা চার দিকে ঘিরে ফেলল। ডাকাতেরা কাছে এসে দেখল বাড়ির চার দিকে পাহারাদারেরা রয়েছে। তারা হরিনাম করে পাহারা দিচ্ছেন। সকলেরই বিরাট বিরাট চেহারা, তাদের হাতে নানা অস্ত্র। ডাকাতেরা তাকিয়ে দেখে বুঝল, তার একেক জন একশো জনকেও ঘায়েল করতে পারবে। সকলেরই গলায় মালা, গায়ে চন্দন, মুখে সঙ্কীর্তনের ধ্বনি। নিত্যানন্দপ্রভু শুয়ে আছেন, পাহারাদারেরা কৃষ্ণগীত গাইছে। ডাকাতেরা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, তারা সরে গিয়ে অন্য জায়গায় বসল। ডাকাতেরা ভাবল, -এসব পদাতিক এল কোথা থেকে? তাদের মধ্যে একজন বললে,- অবধূত জানতে পেরে কারো কাছথেকে চেয়ে এদের নিয়ে এসেছে। আবার কেউ বলছে,- লোকে বলে অবধূত নাকি খুব জ্ঞানী। নিজেই তিনি সশস্ত্র পদাতিকরূপে নিজেকে রক্ষা করছেন। তা না হলে, এই পদাতিকদের এক জনকেও তো সাধারণ মানুষের মত দেখছি না। এই সব কারণে লোকে তাঁকে ভগবান বলে মান্য করে। অন্য একজন বলে, -তুমি তো বোকার মত কথা বলছ? যে খায়, কাপড় পরে সে আবার কেমন ভগবান? ডাকাতের সর্দার ব্রাহ্মণটি বললে, -সব এখন বুঝতে পেরেছি। বড় বড় লোকেরা চারদিক থেকে অবধূতকে দেখতে আসে, এর মধ্যেই হয়তো কোন বড় রাজকর্মচারী এসেছে তার সঙ্গেই এই পদাতিকেরা এসেছে। পদাতিকেরাও ভাবপ্রবণ লোক, তাই হরিনাম জপ-কীর্তন করছে। আর তা না হলে, যদি ভাড়া করা সৈন্য এনে থাকে, তাহলে কতদিন এভাবে চলবে? কাজেই, চল আজ ঘরে ফিরি, দিন দশেক চুপচাপ থাকি গিয়ে। -এই কথা বলে ডাকাতেরা চলে গেল। অবধূত-প্রভু স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন। যাঁরা নিত্যানন্দচরণ ভজনা করেন তাঁদের স্মরণ নিলেই সব দুঃখ কেটে যায়। সেই নিত্যানন্দপ্রভু নিজে বিহার করছেন, তাঁকে তো কেউ কোনো বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না, -এতো সোজা কথা। যাঁর ভক্তের স্মরণ করলেই অবিদ্যা খণ্ডন হয় সেই প্রভুর বিঘ্ন ঘটাবে কে? গণপতি সপরিবারে শ্রীনিত্যানন্দের ভক্ত, রুদ্র নিত্যানন্দের অংশ, নিত্যানন্দপ্রভু কাকে ভয় করবেন? তিনি সারা নবদ্বীপে আপন ইচ্ছা মত ভোজন করছেন, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর সারা গায়ে দামি দামি সব অলঙ্কার, ঠিক যেন নন্দরাজার পুত্র বলরাম। প্রভুর কর্পূর সহযোগে তাম্বুল ভোজনের অভ্যাস, তিনি ঈষৎ হেসে সর্বজগতকে মোহিত করেন। প্রভু মহানন্দে ভক্তদের সঙ্গে বিহার করেন, সকলেই তাঁকে অভয় পরমানন্দ বলেই জানেন। আবার ডাকাতেরা বুদ্ধি খরচা করে প্রভুর বাড়ির কাছে এল। সেদিন ছিল ঘোর অমাবস্যা, লোকজনও কেউ ছিল না। ডাকাতেরা প্রত্যেকেই

একাধিক অস্ত্রে সেজে এল। কিন্তু তারা বাড়ির ভেতরে ঢুকেই অন্ধ হয়ে গেল, কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তারা সকলেই আচম্বিতে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কেউ কেউ গিয়ে গড়খাইর মধ্যে পড়ল, পোক-জোঁকের কামড় খেতে লাগল। এঁটো গর্তের মধ্যে পড়ে কেউ কেউ বিছার কামড় খেল। কেউ আবার কাঁটাঝোঁপে পড়ে গায়ে-পায়ে, কাঁটা ফুটে নড়তে-চড়তে পারছে না। কয়েক জন অবার খালের মধ্যে পড়ে হাত-পা ভাঙ্গল, কাঁদতে লাগল। কারো কারো গায়ে জ্বর এসে গেল সেখানেই, সবাই খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। এমন সময় পরম কৌতুকী ইন্দ্র ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ করে দিলেন। ডাকাতেরা এই অবস্থায় পোক-জোঁকের কামড় খেয়ে আবার ঝড়বৃষ্টিতে পড়ে গেল। এর মধ্যেই শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হল। তারা প্রাণে মরল না, কিন্তু মহা বেগতিকে পড়ে গেল। তখনই একটা অদ্ভুত ভয়ঙ্কর ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ওরা মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ডাকাতেরা অঝোর বৃষ্টিতে ভিজে এখন শীতে কাঁপছে। চোখেও দেখতে পাচ্ছে না, মহা মুস্কিল হয়েছে। এরা নিত্যানন্দের প্রতি শত্রুতা আচারণ করার জন্য এসেছে বলেই তাদের এই অবস্থা হয়েছে, ইন্দ্র তাদের কষ্ট দিচ্ছেন। খানিক ক্ষণ পরে সৌভাগ্যবশত ডাকাতদলের সর্দার ব্রাহ্মণটির মনে হল, -শ্রীনিত্যানন্দ মনুষ্য নন্‌, লোকেরা ঠিকই বলছে যে তিনি ভগবান। একদিন তিনি আমাদের সকলকে ঘুমে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন তবু আমরা মায়ার ছলনায় তা বুঝতে পারি নি। আর একদিন অদ্ভুত পদাতিকগণকে দেখলাম, তাও বুঝতে পারলাম না। আমার মত পাপিষ্ঠের পক্ষে এ উচিত সাজা হয়েছে, প্রভুর ধন হরণ করতে এসেছিলাম কিনা! এখন এই মহাবিপদ থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? শ্রীনিতাই ছাড়া তো আর উপায় দেখছি না। -এই সব কথা চিন্তা করে ব্রাহ্মণ শ্রীনিত্যানন্দের চরণে আশ্রয় নিল। এই শ্রীচরণ চিন্তা করলে তো আর কোন আপদ থাকতে পারে না। তৎক্ষণাৎ কোটি অপরাধের নিস্তার হয়।

তারা তখন স্তুতি করতে লাগল, -শ্রীবালগোপাল নিত্যানন্দ, তুমি আমাদের রক্ষা কর। তুমি সর্বজীবপাল, তুমি আমাদের রক্ষা কর। যে ব্যক্তি মাটিতে পা পিছলে পড়ে যায় সে মাটি ধরেই আবার ওঠে। তেমনি যে তোমার কাছে অপরাধ করে সেও তোমাকে স্মরণ করেই দুঃখ থেকে পার পায়। তুমিই সকল জীবের সব অপরাধ ক্ষমা কর, পতিত লোককেও তুমি আশীর্বাদ কর। প্রভু, আমি ব্রহ্মহত্যা করেছি, গোবধ করেছি, আমার চেযে বড় অপরাধী আর কেউ নেই। সর্বপ্রকারে মহাপাতকীও তোমার শরণ নিলে তার সব পাপ খণ্ডন হয়। জন্মাবধি তুমি জীবের প্রাণ রক্ষা করে আসছ, শেষ কালেও তুমিই রক্ষা করবে। এই ঘোর বিপদ থেকে তুমি রক্ষা কর, যদি প্রাণে বাঁচি তবে এই জন্মের মত শিক্ষা হল। জন্মে জন্মে তুমি আমার প্রভু হও, ইষ্টদেবতা হও, আমি তোমার দাস হই, এই আমি চাই। অন্তর্যামী শ্রীনিত্যানন্দ ডাকাতদলের সর্দারের কাতর আবেদনে ডাকাতদের সকলকে উদ্ধার করলেন।

৩/৬ শ্রীনিত্যানন্দ সম্পর্কে, তাঁর মহিমা বিষয়ে চিন্তা করতে করতে তাদের অন্ধতা ঘুচে গেল, তারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। নিত্যানন্দপ্রভুর স্মরণের প্রভাবে আর কারো গায়ে ঝড়বৃষ্টিও লাগছে না। ডাকাতেরা সব আধমরা হয়ে বাড়ি ফিরল। অভ্যাস মত তারা গঙ্গাতেও নেয়ে গেল। ডাকাত দলের সর্দার সেই ব্রাহ্মণটি নিত্যানন্দ-প্রভুর কাছে

এল। পতিতজনের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করে বিশ্বনাথ-নিত্যানন্দ বসে আছেন। চার দিকে ভক্তগণ হরিধ্বনি করছে, অবধূতমণি আনন্দে হুঙ্কার করছেন। এমন সময় মহাদস্যু বিপ্র বাহু তুলে 'ত্রাহি' বলে প্রভুর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ল। তার সর্বঅঙ্গ আপাদমস্তক পুলকিত, নিরবধি অশ্রুধারা বইছে, শরীরে মহাকম্প হচ্ছে। বিপ্র কেবলই হুঙ্কার-গর্জন করছে, বাহ্যজ্ঞান নেই, আনন্দসাগরে ডুবে রয়েছে। প্রভুর প্রভাব দেখে সে নিজের মনের খুশিতে নেচে যাচ্ছে। বাহু তুলে বারে বারে চীৎকার করে উঠছে,- পতিতপাবন নিত্যানন্দ, উদ্ধার কর। -সকলেই দেখে আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করছেন, -এত বড় ডাকাতের এ অবস্থা হল কি করে'? কেউ কেউ বলছে,- ওরা হয়তো ভণ্ডামি করছে, চুরি বাটপাড়ি করার বদ মতলবেই হয়তো এসেছে। কেউ আবার বলছেন,- নিতাই হচ্ছেন পতিতপাবন তাঁর কৃপাতেই এদের মন ভাল হয়ে গেছে। বিপ্রের ভক্তভাব লক্ষ্যকরে নিত্যানন্দ ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, -কি ব্যাপার ব্রাহ্মণ, তোমার তো বড়ই অদ্ভুত চরিত্র দেখছি। কি দেখলে, কি বুঝলে, সব খুলে বল দেখি। -প্রভুর বাক্য শুনে বিপ্র মুখে কিছুই বলতে পারছে না, কেবলই কাঁদছে। সারা উঠোনে গড়াগড়ি করছে আর আপন মনে হাসছে কাঁদছে নাচছে গাইছে। খানিক পরে সুস্থির হয়ে বিপ্র প্রভুকে বলতে লাগল, -প্রভু, আমি এই নবদ্বীপেই থাকি, নামেই ব্রাহ্মণ, আচার-আচরণে ব্যাধ বা চণ্ডাল। অসৎসঙ্গে কাল কাটাই, চুরি-ডাকাতি করছি। আজন্ম হিংসা ছাড়া আর কিছুই জানি না। আমাকে দেখে সারা নবদ্বীপ কাঁপে, আমি করি নি এমন কোন পাপকাজ নেই। তোমার গায়ে দিব্য অলঙ্কার দেখে আমার ইচ্ছা হল তা চুরি করতে। আমার দলবল নিয়ে একদিন তোমার গায়ের গয়নাগুলো চুরি করতে এসেছিলাম। সেদিন তুমি আমাদের সকলকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলে, তোমার মায়াপ্রভাবেই তোমাকে চিনতে পারি নি। আর একদিন চণ্ডীপূজা করে খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল নিয়ে এসেছিলাম। সেদিন তোমার অদ্ভুত মহিমা দেখলাম, পদাতিকগণ তোমার বাড়ির চারদিক ঘিরে পাহারা দিচ্ছিল। সকলে হরিনাম করছে, তুমি আনন্দে ঘুমিয়ে ছিলে। আমরা এমন পাপিষ্ঠ যে তবু তোমার মহিমা বুঝতে পারিনি। হয়তো অন্য কোন লোকের পদাতিক এসেছে, -এই ভেবে সেদিন চলে গেলাম। তার কয়েক দিন পরে গতকাল এসেই তো চোখ দুটি গেল। বাড়িতে ঢুকেই আমার দলের সকলে অন্ধ হয়ে গেল। জোঁক, পোকা, ঝড়, বৃষ্টি। শিলাপাতে সকলেই দিশেহারা, চলবার শক্তি পর্যন্ত নেই। মহা যমযাতনা ভোগ করে তারপরে ভক্তি লাভ করলাম। শেষ পর্যন্ত তোমার কৃপাতে সকলেই তোমার শ্রীচরণ স্মরণ করলাম। তোমার এমনই মহিমা, সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি ফিরে এল। তোমাকে স্মরণের মহিমায় আমাদের সব যাতনা দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল। তোমাকে স্মরণ করলে অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডন হয়ে যায়, লোকে অনায়াসে বৈকুণ্ঠে চলে যায়। -এই কথা বলতে বলতে বিপ্র চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। এ সবই প্রভুর কৃপা। উপস্থিত সকলেই এই কাহিনী শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য হল। সকলে ব্রাহ্মণকে তখন প্রণাম করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, -প্রভু, তোমার চরণ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি আর এ দেহ রাখব না। তোমাকে আমি হিংসা করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গঙ্গায় ডুবে মরব। বিপ্রের এই কথা শুনে প্রভু এবং ভক্তগণ সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। নিত্যানন্দ বললেন, -বিপ্র তুমি বড় ভাগ্যবান, তুমি জন্মজন্মান্তরের কৃষ্ণভক্ত। তা না হলে প্রভু এমন কৃপা করবেন কেন তোমাকে? ভক্ত ছাড়া কি এমন প্রকাশ

কেউ দেখতে পায়? সমস্ত পতিত লোকদের উদ্ধার করার জন্যই শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। তুমি এপর্যন্ত যা পাপ করেছ, আর যদি পাপাকাজ না কর, তাহলে তোমার পাপের ভার সবই আমি নিলাম। অন্যাকে হিংসা করা, চুরি ডাকাতি অনাচার —এসব ছেড়ে দাও। ধর্মপথে থেকে তুমি হরিনাম নাও, তবেই অন্যকেও তুমি পরিত্রাণ করবে। তোমার চেনা-জানা যত চোর-ডাকাত আছে সকলকে ডেকে এনে ধর্মপথে চালিত কর। -এই বলে শ্রীনিত্যানন্দ খুশি হয়ে ব্রাহ্মণের গলায় নিজের মালা খুলে পরিয়ে দিলেন। তখন চারদিক থেকে মহা জয়ধ্বনি হল, বিপ্রের সর্ববন্ধন মোচন হয়ে গেল। সেই বিপ্র তখন প্রভুর চরণ ধরে চীৎকার করে কেঁদে কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন, -প্রভু নিত্যানন্দ, তুমি পতিতপাবন, আমার মত পাতকীকে তুমি তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় দাও। আমি তোমার ক্ষতি করতে চেয়েছিলাম, আমার মত পাপিষ্ঠের কি গতি হবে? তখন করুণাসাগর নিত্যানন্দ বিপ্রের মাথায় শ্রীচরণ ঠেকালেন। মাথায় পাদপদ্মের আশীর্বাদ পেয়ে বিপ্রের সকল অপরাধ খণ্ডন হয়ে গেল। বহু চোর-ডাকাত সেই বিপ্রের দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরণে শরণের ধর্মপথ অবলম্বন করল। চুরি ডাকাতি অনাচার হিংসা ছেড়ে সকলেই সাধু ব্যবহার করতে লাগল। সকলেই লক্ষবার নামজপ করতে লাগলেন, সকলেই কৃষ্ণভক্তি-সাধনে দক্ষ হলেন। অন্য অবতারে লোকেরা তাঁর কাছ থেকে এত সহজে পরমার্থ বস্তু লাভ করতে পারে নি, কিন্তু এবারে শ্রীনিত্যানন্দ সর্বদা সকলকে শ্রীচৈতন্যের শরণ গ্রহণ করাচ্ছেন অনায়াসে। ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছায় না মানলে চোর-ডাকাতের পাল্লায় পড়ে মানতে হয়। স্বয়ং যোগেশ্বর যে প্রেমভক্তি বাঞ্ছা করেন, চোর ডাকাতও এখন তা পেয়ে গেল, নিত্যানন্দপ্রভুর এমনই পতিতপাবন-লীলা। নিত্যানন্দকে ভজনা করলেই গৌরচন্দ্রকে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান শুনলেই গৌরচন্দ্রকে লাভ করা যায়। ডাকাতদলের উদ্ধার-কাহিনী যে মন দিয়ে শুনবে সে অবশ্যই গৌরনিতাইয়ের সাক্ষাৎ লাভ করবে।

শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপগত আনন্দে পারিষদ্‌গণকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে কীর্তন করে চলেছেন। তিনি খানাজোড়া, বড়গাছি ও দোগাছিয়াতে যান, কখন আবার গঙ্গার ওপারে কুলিয়াগ্রামে যান। বড়গাছি গ্রামের খুবই সৌভাগ্য, কারণ নিত্যানন্দপ্রভু এখানে নানাবিধ লীলা করেছেন। নিত্যানন্দপ্রভুর পারিষদবর্গের সর্বদা মহানন্দে কীর্তন করা ভিন্ন আর কোন কাজ নেই। সকলেরই ব্রজরাখাল ভাব। বেত, বাঁশী, শিঙ্গা, ছাঁদন দড়ি, গুঞ্জাফুলের মালা, হাতে তাড় খাড়ু, পায়ে নূপুর, সকলেই এই রকম ভাবে সেজেছেন, শরীরে কৃষ্ণানুরাগের পুলকে অশ্রু কম্প। তাঁরা সৌন্দর্যে মদনতুল্য, সর্বদা কীর্তন করছেন। প্রভু- নিত্যানন্দকে প্রাণপতি রূপে পেয়ে তাঁদের আর কোন ভয় নেই, তাই তাঁরা সকলে সর্বদা আনন্দে মেতে আছেন। শ্রীনিত্যানন্দের ভক্তের মহিমা একশো বছর ধরে বললেও শেষ করা যাবে না। যাঁদের স্মরণ করলেই সংসারজ্বালা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় তাঁদের যে ক'জনের নাম মনে আসছে বলছি। নিত্যানন্দ যাঁদের সঙ্গে বিহার করেছেন তাঁরা সকলেই গোপরাজ শ্রীনন্দের পরিজন- গোপগোপী। নিত্যানন্দের নিষেধ আছে বলে তাঁদের পূর্বনাম গোপন রাখা হল। পরম পার্ষদ রামদাস সর্বদা ঈশ্বরভাবে কথা বলেন। তাঁর কথাবার্তা কেউ চট্ করে ধরতে পারে না, তিনি সর্বদা নিত্যানন্দকে ধ্যান করছেন। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তিনি তিন মাস যাবৎ শ্রীকৃষ্ণভাবে আবিষ্ট ছিলেন। প্রসিদ্ধ চৈতন্যভক্ত মুরারি পণ্ডিত বাঘ এবং

মহাসর্পের সঙ্গে খেলা করতেন। রঘুনাথ বৈদ্য এবং রঘুনাথ উপাধ্যায়ের শুভদৃষ্টি লাভ করলে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়। প্রেমভক্তিময় গদাধর দাসের দর্শন মাত্রে সর্বপাপ নাশ হয়। মহাপ্রেমিক সুন্দরানন্দ প্রভু নিত্যানন্দের প্রধান পার্ষদ। মহা উদ্যোগী কমলাকান্ত পণ্ডিতকে নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে বাস করার এবং সঙ্কীর্তন প্রচারের অধিকার দিয়েছিলেন। পরম ভাগ্যবান গৌরীদাস পণ্ডিত কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দকেই প্রাণানন্দ বলে জানেন। বড়গাছি নিবাসী কৃষ্ণদাসের বাড়িতে নিত্যানন্দ বিলাসাদি করেছেন। পরম শান্ত দ.স্ত পুরন্দর পণ্ডিত নিত্যানন্দের পরম বান্ধব। পরমেশ্বর দাসের শরীরে নিত্যানন্দ বিলাস করেছেন। মহা মহান্ত ধনঞ্জয় পণ্ডিতের হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্বদা বিরাজিত। প্রেমোন্মাদ বলরাম দাসের হাওয়া কারো গায়ে লাগলেই সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পায়। প্রেমিক যদুনাথ কবিচন্দ্রের হৃদয়ে নিত্যানন্দের বাস। পরম জ্যোতির্ধাম জগদীশ পণ্ডিত সপার্ষদ নিত্যানন্দকে প্রাণের প্রাণ বলে গণ্য করেন। পুরুষোত্তম পণ্ডিতের জন্ম নবদ্বীপে, তিনি নিত্যানন্দের মহাভক্ত। বিপ্র কৃষ্ণদাসের জন্ম রাঢ় অঞ্চলে, তিনি শ্রীনিত্যানন্দের পারিষদবর্গের মধ্যে একজন। প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাসকে স্মরণ করলে গৌরভক্তি লাভ হয়। মহাভাগ্যবান সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের সর্বদা বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তাঁর হৃদয়ে নিত্যানন্দের অবস্থান। মহাবৈষ্ণব উদার উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দ-সেবার প্রকৃত অধিকারী। পরম মহান্ত মহেশ পণ্ডিত এবং পরমানন্দ উপাধ্যায় একান্ত বৈষ্ণব। চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র গঙ্গাদাসের ঘরে নিত্যানন্দ আগে বিলাসাদি করেছেন। পরম উদার আচার্য বৈষ্ণবানন্দের নাম হল রঘুনাথ পুরী। বিখ্যাত পরমানন্দ গুপ্তের বাড়িতেও নিত্যানন্দ কীর্তনাদি করেছেন। কৃষ্ণদাস এবং দেবানন্দ এই দুজনও নিত্যানন্দের মহাভক্ত। গায়ক মাধবানন্দ ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষ দুজনেই অতি প্রেমিক ভক্ত। জীব পণ্ডিত, মনোহর, নারায়ণ -এমনি আরো যত ভক্ত আছেন শ্রীনিত্যানন্দের, একশো বছর ধরে বললেও তাঁদের নাম শেষ করা যাবে না। নিত্যানন্দের হাজার হাজার শিষ্য পরে আচার্যের কাজ করেছেন। চৈতন্যদেবের প্রতি সকলেরই অত্যন্ত ভক্তি, চৈতন্য- নিত্যানন্দ দুজনেই তাঁদের ধনপ্রাণ স্বরূপ। আমি যতটুকু জানি লিখলাম, পুরো জানেন একমাত্র বেদব্যাস। শ্রীচৈতন্যের সবশেষ পাত্র নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাস শ্রীনিত্যানন্দের সর্বশেষ শিষ্য। বৈষ্ণব সমাজে সকলেই এবিষয়ে অবগত আছেন।

৩/৭ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং তাঁদের ভক্তবৃন্দের জয় হোক। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভক্তদের সঙ্গে কীর্তনানন্দ করছেন। বৃন্দাবনে বলরাম যেমন লীলা করেছিলেন, নিত্যানন্দের আচরণাদিও তদ্রূপ। তিনি কৃপাবশত জগতের জীবকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি ভক্তিমান করে তুলছেন। সঙ্গে পারিষদগণও মহা উৎসাহে কাজে লেগেছেন। কর্পূর তাম্বুলে অধর রঞ্জিত, অলঙ্কার মালায় সারা শরীর ঢেকে রয়েছে। নিত্যানন্দপ্রভুর এই আচরণ দেখে কেউ কেউ আনন্দিত হন, আবার কারো কারো বিশ্বাস হয় না।

নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি কৈশোরে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে একই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতেন। শ্রীনিত্যানন্দের অলঙ্কার-বিলাসিতা দেখে তাঁর মনে অবিশ্বাস জন্মেছে। শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁর ভক্তি আছে কিন্তু তিনি শ্রীনিত্যানন্দের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত নন। কোন কারণে সেই ব্রাহ্মণ নীলাচলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন ছিলেন। তিনি প্রতি দিন শ্রীচৈতন্যের কাছে যান, প্রভুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে। একদিন তিনি প্রভুকে

নিভৃতে জিজ্ঞাসা করলেন, -প্রভু, আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, তোমার কাছে জানতে চাই। নবদ্বীপে গিয়ে নিত্যানন্দ অবধূত কি যে করছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। সকলেই বলে, তিনি সন্ন্যাসী, অথচ কর্পূর তাম্বুল ব্যবহার করছেন। সন্ন্যাসীর ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করা নিষেধ কিন্তু তিনি সারা গায়ে সোনা রূপো মুক্তো দিয়ে মুড়ে রেখেছেন। গেরুয়া বহির্বাস ছেড়ে পশমী কাপড়, চন্দন, মালা- এসব বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করছেন। বাঁশের লাঠি ছেড়ে তিনি লোহার লাঠি ব্যবহার করছেন, শূদ্রের বাড়িতে থাকেন। তিনি কিছুই শাস্ত্রবিধি মানছেন না, তাই আমার মনে প্রচুর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। সকলেই তাঁকে মহাপুরুষ বলে মান্য করে তবু তিনি আশ্রমাচার পালন করছেন না। প্রভু, যদি তুমি আমাকে তোমার ভৃত্য বলে মনে কর তাহলে আমাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ সুসময়ে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রভু অকপটে তাঁকে তত্ত্ব বুঝিয়ে দিলেন। প্রভু বললেন,- শোন বিপ্র, মহাঅধিকারী হলে তাঁর দোষগুণ কিছুই হয় না। ভাগবতে আছে, -যাঁদের চিত্ত রাগদ্বেষাদি-বিবর্জিত, যাঁরা সর্বত্র সমদর্শী, প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বরকে লাভ করেছেন, ভগবানের সেই ঐকান্তিক ভক্তগণের বিধি-নিষেধ পালন -অপালনের পাপ-পুণ্য ভোগ করতে হয় না। যেমন পদ্মপাতায় জল লাগে না, নিত্যানন্দস্বরূপও তেমনি নির্মল। তুমি নিশ্চিতরূপে জানবে যে তত্ত্বের বিচারে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁর শরীরে বিহার করেন। অধিকারী না হয়ে নিতাইচাঁদের মত আচরণ করলে তার পাপ হবে, সে দুঃখ-কষ্টে ভুগবে। ভগবান শিব ভিন্ন অন্যে বিষপান করলে মৃত্যু হবেই ––সমস্ত পুরাণই এই কথা স্বীকার করবেন। ভাগবত বলছেন,- লোকেরা কদাপি ঈশ্বরদের মত আচরণ করবে না। না জেনেও ঈশ্বরদের মত আচরণ করলে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। আরো কথা আছে, -শক্তিমানেরা যা পারবে সকলে তা পারবে না। আগুন সব কিছু খেয়ে হজম করতে পারে, অগ্নি সর্বভুক। কিন্তু সকলেই তা নয়। -তাই যে না জেনে তাঁকে নিন্দা করবে সে জন্ম-জন্ম দুঃখ পাবে। মহা-অধিকারী ব্যক্তি গর্হিত কাজ করলেও তাঁকে নিন্দা তো করবেই না, এমন কি হাসবেও না। বৈষ্ণব পাঠকের কাছে শুনে ভাগবত থেকে এই সব তত্ত্ব জানতে পারা যায়। মহান্তের আচরণে হাসলে কি হয় তা ভাগবতে উল্লেখ আছে। মন দিয়ে শোন সেই কাহিনী।

এক সময় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পড়তে গিয়েছিলেন। পড়া শেষ হলে তাঁরা বাড়ি ফিরবার কথা ভাবলেন। তখন গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, -কি দক্ষিণা দেব? গুরু গুরুপত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন, -আমাদের মৃতপুত্রকে বাঁচিয়ে দাও। তখন কৃষ্ণ-বলরাম যমের বাড়ীতে চলে গেলেন। পুত্রের সব কর্মফল ঘুচিয়ে দিয়ে তাঁরা যমালয় থেকে ছেলেটিকে নিয়ে এলেন। এই অদ্ভুত কাহিনী শুনে দেবকীও মৃত পুত্র ফিরে চাইলেন। দেবকী একদা রাম-কৃষ্ণকে বললেন, -তোমরা দুজনে যোগেশ্বরেশ্বর, আদি নিত্য এবং শুদ্ধ কলেবর। আমি জানি তোমরা দুজন সর্বজগতের পিতা, পরম-কারণ, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় হয় তোমাদের অংশের অংশ থেকে! তবু পৃথিবীর ভার হরণ করবার জন্য আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছ। যমালয় থেকে তোমরা তোমাদের গুরুপুত্রকে ফিরিয়ে এনেছ, কংসের করাগারে আমার যে ছয়টি পুত্র মারা গেছে, তাদের দেখতে আমার বড় ইচ্ছা করছে। অনেক দিন আগেই তোমাদের গুরুপুত্র মারা গিয়েছিল, তাকে তোমরা শক্তি প্রকাশ করে নিয়ে এলে। তেমনি মৃত ছয় পুত্রকে এনে দিয়ে আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর। -জননীর কথা শুনে কৃষ্ণ-বলরাম তখনই বলিমহারাজের আলয়ে সুতলে চলে

গেলেন। বলিমহারাজ ইষ্টদেবকে দেখে আনন্দিত হয়ে তৎক্ষণাৎ দেহ গেহ পুত্র বিত্ত সকল বান্ধব এনে তাঁদের কাছে হাজির করলেন। বলিমহারাজ পুলকাশ্রু পাত করে স্তুতি করতে লাগলেন, -অনন্ত সঙ্কর্ষণ ও গোকুলভূষণ কৃষ্ণচন্দ্রের জয় হোক। ব্রজগোপগণের গুরু বলরাম এবং ভক্তমনোবাঞ্ছা শ্রীকৃষ্ণ, শুদ্ধসত্ত্ব দেবর্ষিগণ তোমাদের দর্শন পান না, কিন্তু তমোগুণী অসুরকে তোমরা দেখা দিলে। তোমার শত্রুমিত্র কিছু নেই, বেদেও তাই বলে, সাক্ষাতেও তাই দেখলাম। স্তনে বিষ মাখিয়ে এল তোমাকে মারতে, তুমি তাকে পাঠালে বৈকুণ্ঠে। তোমার মনোভাব বেদ এবং যোগেশ্বরেরাও জানতে পারে না। যোগেশ্বরগণ যাঁর মায়া জানেন না, আমি অসুর হয়ে তা কি করে জানব? সর্বলোকনাথ, আমাকে এই কৃপা কর যেন সংসার-আসক্তির অন্ধকূপে পড়ে মৃত্যু না হয়। তোমার পাদপদ্ম দুটি হৃদয়ে চিন্তা করে গিয়ে গাছতলায় পড়ে থাকব। তোমার ভক্তবৃন্দের মধ্যে আমাকেও স্থান দাও, আমার মনে যেন আর কোন আশার সঞ্চার না হয়। -শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করে বলিমহারাজ এইভাবে স্তুতি করলেন। প্রভুর চরণোদক ভাগীরথীরূপে ব্রহ্মলোক এবং শিবলোক পবিত্র করছে। বলিমহারাজ সেই পুণ্যসলিল সপরিবারে পান করলেন এবং মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার পাদপদ্মে দিয়ে প্রণাম করলেন এবং স্তুতি করে বললেন, -প্রভু, যদি আমাকে তোমার সেবক বলে মনে কর তবে আজ্ঞা কর। তুমি নিজে আমাকে শিখিয়ে দাও। যে তোমার আজ্ঞা পালন করে তার বিধি-নিষেধ মানবার দরকার হয় না। -বলির স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে প্রভু বললেন,- বলিরাজ আমি তোমার নিকট আসার কারণ হল, আমার মায়ের ছটি পুত্র কংস হত্যা করেছে, সেই পাপে অবশ্য সেও মারা গেছে। মাতা দেবকী সেই শোকে প্রায়ই কাঁদেন। তোমার কাছে তাঁরা রয়েছেন, মায়ের কাছে তাঁদের নিয়ে যেতে হবে। প্রজাপতির পৌত্র এই সিদ্ধ দেবগণের দুঃখের কারণ শোন, ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তাঁর পুত্র এই ছয় জন। দৈবাৎ ব্রহ্মা কামশরে মোহিত হয়ে নির্লজ্জের মত কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তা দেখে এই ছয় জন হেসেছিলেন। তার জন্যেই এই অধঃপতন। মহান্তের কাজে ঠাট্টা করাতে অসুর যোনিতে জন্ম হয়েছে। ব্রহ্মার তনয় মরীচির সেই ছয় পুত্র তাঁদের দেবদেহ ত্যাগ করে হিরণ্যকশিপুর ঘরে জন্মেছিলে । সেখানেও ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে নানা দুঃখ পেয়ে মারা গেছে। তারপর যোগমায়া তাদের এনে দেবকীর গর্ভে স্থান দিলেন। ব্রহ্মাকে উপহাস করার জন্য সেই পাপে নানা রকম দুঃখ পেলেন। জন্মের পরেই নানা কষ্ট দিয়ে কংস মামা হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মারলেন। দেবকী এসব বিষয় না জেনে তাঁদের ছ-জনকে নিজের পুত্র মনে করে কাঁদছেন। সেই ছয় জনকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিতে হবে, তাই তোমার কাছে এসেছি। দেবকীর স্তন পান করে তাঁরা মুক্ত হয়ে যাবেন। -বৈষ্ণবকে উপহাস করলে এই শাস্তি হয়। তাঁরা সিদ্ধ মহাত্মা হয়েও তাঁদের এই অবস্থা, সাধারণের অবস্থা কি হবে বুঝে নাও। বৈষ্ণবকে নিন্দা করলে জন্ম জন্ম দুঃখ পায়। হে বলিরাজ, তুমিও এথেকে শিক্ষা নাও, কখনো বৈষ্ণবকে নিন্দা বা ঠাট্টা করবে না। আমাকে যে পূজা করে কিম্বা আমার নাম নেয় সেই আমার ভক্ত। আমার ভক্তের নিন্দা করলে তার বিঘ্ন হবেই। আমার ভক্তকে যে ভক্তি করে সে অবশ্যই আমাকে পাবে। বরাহপুরাণে আছে, -ভক্তের সেবা না করে যাঁরা কেবল অচ্যুত ভগবানের সেবাই করেন, তাঁরা অভীষ্ট ফল পাবেন কিনা তা সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু যাঁদের চিত্ত ভগবানের ভক্তের পরিচর্যায় নিরত থাকে, তাঁদের অভীষ্ট ফল ফলবেই, তাতে কোন

সন্দেহ নেই। -আমার ভক্তের পূজা করে না, আমার করে মাত্র, তাকে আমি দাম্ভিক মনে করি, সে আমার আশীর্বাদ পায় না। হরিভক্তিসুধোদয়ে রয়েছে, -যাঁরা সর্বতোভাবে গোবিন্দের পূজা করেও সেই গোবিন্দের ভক্তগণের অর্চনা করেন না, সেসব দাম্ভিকগণ শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহের পাত্র নন্। হে বলিরাজ, তুমি সর্ববিষয়ে আমার প্রিয়সেবক, তাই তোমাকে এই গোপন কথাটি বললাম।

প্রভুর শিক্ষার কথা শুনে বলিরাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সেই ছয় শিশুকে প্রভুর সামনে এনে উপস্থিত করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম সেই ছয় জনকে নিয়ে এসে মাতা দেবকীকে দিলেন। মাতা তাঁদের সস্নেহে স্তন্যদান করলেন। শ্রীকৃষ্ণের পানের পর তাঁরা ছয় জন দুগ্ধ পান করে তৎক্ষণাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। তাঁরা ঈশ্বরকে প্রণাম করলেন। সকলেই তা দেখলেন। প্রভু তখন কৃপা করে শিক্ষা দিলেন, -দেবগণ, তোমরা নিজস্থানে চলে যাও কিন্তু আর কখনো মহান্তকে উপহাস করবে না। ব্রহ্মা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান, তাই ব্রহ্মাও ঈশ্বরের তুল্য, তিনি মন্দ কাজ করলেও মন্দ নন্। তাঁকে উপহাস করেই এত দুঃখ পেলে। এমন কাজ আর কখনো করবে না। অপরাধের জন্য ব্রহ্মার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও তাহলেই মনে শান্তি পাবে। -ঈশ্বরের আজ্ঞা শিরোধার্য করে দেবগণ পিতা, মাতা এবং শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে প্রণাম করে নিজধামে চলে গেলেন।

হে ব্রাহ্মণ, এই ভাগবতকথা বললাম, এবারে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি সন্দেহ ত্যাগ কর। নিত্যানন্দস্বরূপ পরম অধিকারী, সামান্য ভাগ্যে তাঁকে জানতে পারা যায় না। তাঁর অলৌকিক কাজকেও মর্যাদার নজরে দেখলে ত্রাণ পাবে। পতিতগণকে উদ্ধার কবার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁব দ্বাবা সকলেই ত্রাণ লাভ করবে। সাধাবণ নিয়মকানুনেব বিচারে তাঁর আচরণকে বুঝতে পারা যাবে না। বিষ্ণুভক্তও যদি না বুঝে নিত্যানন্দকে নিন্দা করে তাহলে তাঁর বিষ্ণুভক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। হে ব্রাহ্মণ, তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে এই কথা প্রচার করে দাও। বুঝিয়ে বল। নিত্যানন্দের নিন্দা করলে যমের কাছে কিছুতেই পার পাবে না। নিত্যানন্দ প্রীত হলেই আমিও প্রীত হই, তোমাকে এই সত্য কথা বললাম। নিত্যানন্দ যদি যবনকন্যা কিংবা মদিরাও ধরে তাহলেও তিনি ব্রহ্মার পর্যন্ত বন্দনীয়।

সেই সৎব্রাহ্মণ প্রভুর কথা শুনে খুব আনন্দ পেলেন। শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি তাঁর বিশ্বাস জন্মাল, তিনি নবদ্বীপে নিজের বাড়ীতে চলে এলেন এবং প্রথমেই নিত্যানন্দের কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। শ্রীনিত্যানন্দ সব শুনে আশীর্বাদ করলেন।

শ্রীনিত্যানন্দের আচার-আচরণ অতীব অলৌকিক। পরমার্থ তত্ত্বের বিচারে শ্রীনিত্যানন্দ হচ্ছেন পরম যোগেন্দ্র এবং আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র। তিনি সহস্রবদন অনন্তদেবরূপে বিরাজিত, শ্রীচৈতন্যের কৃপা না হলে তাঁকে জানা যায় না। কেউ বলেন, নিত্যানন্দ ঠিক যেন বলরাম। কেউ বলেন, -তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বড় প্রিয় পাত্র। কেউ বলেন, -তিনি শ্রীচৈতন্যের অতিশয় তেজস্বী অংশ সুতবাং পরম অধিকারী। কেউ আবার বলেন, -কিছুই বুঝতে পারি না। শ্রীনিত্যানন্দকে কেউ বলেন জ্ঞানী, কেউ বলেন ভক্ত, যাঁর যা ইচ্ছা তাই বলছেন। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচৈতন্যের যাই সম্পর্ক হোক না কেন, তাঁর পাদপদ্ম যেন সর্বদা আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করে। আমি সকলের কাছে এই প্রার্থনা জানাই যে, তিনি যেন জন্মজন্ম অমার প্রভু থাকেন এবং আমি তাঁর দাস থাকতে পারি। এত কথার পরেও যদি কোন পাপী তাঁর নিন্দা করে তবে তাকে উপেক্ষাই করতে হয়। আমার মনের একটি বিশেষ ভরসা হচ্ছে যে, আমার প্রভুর প্রভু হচ্ছেন শ্রীগৌরসুন্দর।

গৌর-নিতাইকে ভক্তবৃন্দ দ্বারা বেষ্টিত দেখব, তেমন সৌভাগ্য কি আমার হবে? মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের জয় হোক, প্রভু নিত্যানন্দকে তুমিই দিলে আবার তুমিই নিলে। হে গৌরহরি, এই কৃপা কর যেন তোমাদের দুজনকে কখনো না ভুলি। তোমরা যেখানেই অবতীর্ণ হও তোমাদের দাসরূপে যেন সেখানে আমিও উপস্থিত থাকতে পারি। শ্রীগৌর-নিতাইয়ের শ্রীচরণযুগলে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এই মাত্র প্রার্থনা।

৩/৮ শ্রীনিত্যানন্দের সেবাবিগ্রহ অদ্বৈত-শ্রীবাসের প্রিয়ধাম, গদাধর-জগদানন্দের প্রাণ, পরমানন্দপুরীর জীবন, দামোদর স্বরূপের প্রাণধন, বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রিয়কারী, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চিত্তরঞ্জন, দ্বারপাল গোবিন্দের প্রভু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্রের জয় হোক। হে প্রভু, তুমি জীবের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত কর।

শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে ভক্তগণের সঙ্গে কীর্তন করে প্রেমভক্তির আনন্দসাগরে ভেসে বেড়াচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণগীত ও শ্রীকৃষ্ণনৃত্যই এখন সকলের ভজন। গোকুলে গোপশিশুদের সঙ্গে যেভাবে খেলা করতেন ঠিক তেমনি নবদ্বীপের ঘরে ঘরে গোকুলের আনন্দ বিলিয়ে দিচ্ছেন। এবারে শ্রীনিত্যানন্দেব ইচ্ছা হল, তিনি গৌরচন্দ্রকে দেখবেন। শচীমাতার কাছে বিদায় নিয়ে তিনি নীলাচলের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর পারিষদগণও মহা বিহ্বল। তাঁদের সঙ্গে নাম-কীর্তন করতে করতে এবং হুঙ্কার গর্জন নৃত্য-আনন্দ-ক্রন্দন করে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি নীলাচলে পৌঁছে গেলেন। কমলপুরে এসে জগন্নাথমন্দিরের চূড়া দেখেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। প্রেমাশ্রুপাত বন্ধ হচ্ছে না, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলে তিনি হুঙ্কার ছাড়ছেন। তিনি এসে একটি পুষ্পোদ্যানে থাকলেন। শ্রীচৈতন্য ব্যতীত তাঁর ইচ্ছাও কেউ বুঝতে পারেন না। নিত্যানন্দের আগমন অনুভব করে শ্রীচৈতন্য ভক্তগণকে ছেড়ে চলে এলেন। নিত্যানন্দ যেখানে বসে ধ্যান করছিলেন তিনি সেখানেই গেলেন। প্রভু এসে নিত্যানন্দকে ধ্যানস্থ দেখে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। শ্লোক পাঠ করে প্রভু নিত্যানন্দকে প্রদক্ষিণ করছেন, নিত্যানন্দ আনন্দিত হলেন। জানতে পেরে নিত্যানন্দ ধ্যান থেকে উঠে পড়লেন 'হরি' বলে। গৌরচন্দ্রকে দেখে নিত্যানন্দ অতীব আনন্দিত হলেন। 'হরি' বলে সিংহনাদ করে প্রেমানন্দে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ছেন। পুনরায় দুজনকে প্রদক্ষিণ করছেন, প্রণাম করছেন। দুজনে প্রেমালিঙ্গন করলেন, তারপর দুজন দুজনের গলা ধরে প্রেমানন্দে কাঁদলেন। পরম আনন্দে দুজনে গড়াগড়ি যাচ্ছেন, পাগলা সিংহের চেয়েও সাঙ্ঘাতিক গর্জন করে উঠছেন। পূর্বে শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের যে ভালবাসবার কথা শোনা গেছে তেমনি ভাব দুজনের মধ্যে। দুজনই শ্লোক পড়ে দুজনকে বর্ণনা করছেন এবং জোড় হস্তে নমস্কার করছেন। দুজনেরই সমানে অশ্রু কম্প হাস্য মূর্ছা পুলক বিবর্ণতা— কৃষ্ণভক্তির সব চিহ্ন। শ্রীচৈতন্যই সব করাচ্ছেন। ভক্তগণ নয়ন ভরে প্রেমভক্তির প্রকাশ উপভোগ করছেন। এবারে শ্রীগৌরহরি হাতজোড় করে নিত্যানন্দের স্তুতি করতে লাগলেন, -নাম রূপে তুমি মূর্তিমন্ত নিত্যানন্দ, তুমিই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, তুমিই অনন্ত ঈশ্বর। ভক্তিযোগই তোমার শরীরের অলঙ্কার। সোনা, রূপা, মুক্তা কাষ্টিপাথর, রুদ্রাক্ষ ইত্যাদি রূপে নববিধা ভক্তিকেই তুমি ধারণ করেছ। পতিত, নীচজাতিকে তুমি উদ্ধার করেছ। তুমি উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ বণিকগণকে যে উত্তমা ভক্তি প্রদান করেছ তা সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বর এবং দেবতাগণও বাঞ্ছা করেন। বৈদিক শাস্ত্র মতে ভগবান স্বেচ্ছাময়, তুমি ভক্তিপ্রভাবে তাকে বেচেও দিতে পার। তোমার মহিমা কেউ জানে না। তুমি হলে কৃষ্ণভক্তির বিগ্রহ। দিবানিশি

তোমার মুখে কেবলই কৃষ্ণকীর্তন, তোমার বাহ্যজ্ঞান নেই। তোমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কখনো ত্যাগ করেন না। এরপর শ্রীনিত্যানন্দ বিনীত ভাবে বললেন, -তুমি প্রভু হয়েও যে আমার স্তুতি করছ, এ হচ্ছে ভক্তের প্রতি তোমার বাৎসল্য। তুমি আমাকে প্রদক্ষিণ কর, নমস্কার কর, মার কিংম্বা রাখ, যা ইচ্ছা করতে পার। তোমার কাছে তো কিছুই অজানা নেই, তুমি দিব্যদৃষ্টিতে সবই দেখতে পাচ্ছ। তুমিই সকলের মন প্রাণ প্রভু ঈশ্বর। তুমি যা করাও তাই করি। তুমিই আমাকে সন্ন্যাসী করেছ আবার তুমি অলঙ্কার পরালে। আমি সন্ন্যাস ছেড়ে তাড় খাড়ু, বেত্র বাঁশী, সিঙ্গা, ছান্দডোরি ধরলাম। অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ তোমার প্রিয় ভক্তবৃন্দকে তুমি ভক্তি-তপস্যাদি দিলে আর আমাকে সন্ন্যাস ছাড়িয়ে কি করলে যে এখন লোকেরা দেখে ঠাট্টা করে। তুমি মজা করে আমাকে যেমন নাচাও আমি তেমনি নাচি। আমাকে নিগ্রহ করছ না অনুগ্রহ করছ তা তুমিই জান, তুমি একটা গাছকে দিয়েও ইচ্ছে করলে সবই করাতে পার।

প্রভু বললেন, -তোমার দেহের অলঙ্কার নয় প্রকারের ভক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। 'শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-নমস্কার ইত্যাদিই হচ্ছে তোমার চিরকালের অলঙ্কার। শিব যেমন সর্পরূপ অলঙ্কার ধারণ করেন তা সকলে বুঝতে পাবে না। বাস্তব বিচারে সহস্রবদন অনন্তদেব মহাদেবের জীবন তুল্য প্রিয। স্বীয় দেহে সর্প ধারণের ছলে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে অনন্তনাগকেই তিনি ধারণ করেন। তুমিও অলঙ্কার পরাব ছলে নয় রকমের ভক্তিকেই শরীরে ধারণ করেছ। লোকেরা না বুঝে মহাদেবকেও নিন্দা করে, এবং ফলে তাদেরই পাপ হয়। আমি তো তোমার দেহে বাক্যে মনে এবং অলংকারে ভক্তিভাব ভিন্ন অন্য কিছুই দেখি না। তুমি ব্রজে নন্দমহারাজের গোষ্ঠে বসে আনন্দে অলঙ্কার পরেছ। তোমার এ লীলা দেখে যে ভাগ্যবানেরা আনন্দ পাবেন তাঁরা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারবেন। বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, গুঞ্জাহার, মাল্য, গন্ধ- এসব চিরকালই তোমার শ্রীঅঙ্গের ভূষণ ছিল। তোমার সঙ্গী যুবকগণকেও আমার কাছে শ্রীদাম-সুদাম বলে মনে হয। তাঁবা যেন তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনলীলাই করছেন। তোমার সকল পার্ষদগণের দেহে সেই ভাব, সেই কান্তি, সেই শক্তি দেখতে পাচ্ছি। তাই তোমার সেবকগণকে এবং তোমাকে যে প্রীতি করে সে সত্যি আমাকেও প্রীতি করে। মুকুন্দ-শ্রীকৃষ্ণ এবং অনন্ত-বলরাম দুজনই নিজ অনুভবের আনন্দে কি ভাবে আলাপ করেছেন তা অন্যরা বুঝতে পারে না।

কিছু পরে দুই প্রভু বাহ্যজ্ঞান লাভ করে পুষ্পবনে গিয়ে নিভৃতে বসলেন। ঈশ্বর এবং পরমেশ্বর কি আলাপ করলেন তার তত্ত্ব বেদে রয়েছে। নিত্যানন্দে এবং চৈতন্যে যখন দেখা হয় তখন প্রায়ই আর কেউ থাকে না। তাঁরা দুজনে মিলে যে কি করেন তা কেউ জানে না, শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছাতেই এসব হচ্ছে। নিত্যানন্দও প্রভুর ইচ্ছা বুঝে তাঁর সঙ্গে একান্তেই দেখা করেন। শ্রীগৌরচন্দ্র নিজের তত্ত্বও গোপন রাখেন, তেমনি নিত্যানন্দের তত্ত্বও গোপন রাখতে চান। বেদ, শাস্ত্র, ব্রহ্মা এবং শিব — এরা সকলেই বলেন যে ঈশ্বরের হৃদয় হচ্ছে সুকোমল এবং দুর্বিজ্ঞেয়। সব শাস্ত্রই ঘোষণা করেন যে ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও বলেন যে তিনিও ঈশ্বরতত্ত্ব কিছুই বুঝতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও এই সব তত্ত্ব কারো কাছে কিছুই প্রকাশ করেন না। শ্রীচৈতন্যের এমনই লীলা যে সকলেই মনে করেন, তিনি আমাকে বেশি ভালবাসেন। আমাকেই তিনি সব গোপনীয় কথা বলেন, তাই আমি অন্য দিকে মন না দিয়ে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করব। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ কেন সন্ন্যাসধর্ম

ত্যাগ করে শিখিপুচ্ছ, গুঞ্জামালা, বেত্র, বংশী, ছাঁদনদড়ি ধরলেন ? -কেউ আবার বলেন, -সমস্ত রকম সন্ন্যাসধর্মের চেয়েও বৃন্দাবনের গোপলীলাই শ্রেষ্ঠ। ব্রজগোপ এবং ব্রজগোপীরূপে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত কৃপাপাত্রই কেবল গোকুলের গোপ-গোপীগণের তুল্য কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবও তাই কামনা করেন। ভাগবতে উদ্ধব বলেছেন, -নন্দব্রজের গোপ-গোপীগণের হরিকথার উচ্চকীর্তন ত্রিভুবনকে পবিত্র করে, তাই আমি তাঁদের চরণ-রেণু বারংবার বন্দনা করি।

যে বৈষ্ণব এভাবে চিন্তা করেন শ্রীচৈতন্য সর্বত্র তাঁকেই স্বীকার করেন। বৈষ্ণবদের পরস্পরের মধ্যে কলহ লাগিয়ে দিয়ে তিনি কখনো কখনো একটু মজা পান। কৃষ্ণকৃপায় সকলেই আনন্দবিহ্বল, মাঝেমাঝে আনন্দের কলহ হয়। এতে যে একজনের পক্ষ হয়ে অন্যকে নিন্দা করে, তার খুবই দুর্ভাগ্য বলতে হয়। হাত পা, আঙ্গুল যেমন দেহেরই অঙ্গ, তেমনি ভক্তগণও সকলেই ভগবানের সমান। ভাগবতে দক্ষের নিকট ভগবান বলেছেন, -মানুষ যেমন তার হাত পা তার শরীর থেকে ভিন্ন বলে মনে করে না, তেমনি আমার ভক্তও কদাপি 'অন্য জীব আমা থেকে ভিন্ন' মনে করে না। তথাপি সকল বৈষ্ণবই এই কথা স্বীকার করেন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সকলের ঈশ্বর। তিনিই স্রষ্টা, পালক এবং নিয়ন্তা এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব জীবের পক্ষে অবিজ্ঞাত। -সকলেই এই মহত্ত্ব ... কীর্তন করেন। গৌরচন্দ্র যে সব ভক্তের চিত্তে আবির্ভূত হন, কেবল তাঁদের অনুগ্রহতেই ভক্তি লাভ করা যায়। ভক্তগণের কল্যাণের জন্য তাঁদের সর্বশক্তি সর্বজ্ঞতা দিয়েও আবার শাস্তিও দিয়ে থাকেন। এর মধ্যেও বিশেষত্ব এই যে তিনি নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতকে কেবল সহিত করেন। লৌকিক জগতের দৃষ্টিতে গর্হিত কোন কাজ করলেও তিনি এই দুজনকে কিছুই বলেন না। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের সঙ্গে নানা কথা নানাবিষয় আলোচনা করে তারপর বিদায় নিয়ে নিজের স্থানে চলে গেলেন। শ্রীনিত্যানন্দও আনন্দিত হয়ে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে গেলেন। নিত্যানন্দ-চৈতন্যের মিলনকথা শ্রবণে সর্ববন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। জগন্নাথ দর্শন করে নিত্যানন্দ আনন্দে বিহ্বল হয়ে গড়াগড়ি করছেন। তিনি পাথরের উপরে আছড়ে পড়ছেন, শতজনে ধরেও রাখ... পারছে না। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ দেখে নিত্যানন্দ কাঁদতে লাগলেন। নি...নন্দের মহিমা জানতে পেরে পড়াব্রাহ্মণ বিগ্রহের গলার মালা এনে বারেবারে তাকে দিচ্ছেন। নিত্যানন্দকে দেখে জগন্নাথদেবের সেবকগণের অত্যন্ত আনন্দ হল। যে জানে না সে জিজ্ঞাসা করলে সকলে তাকে উত্তর দেন,—এ হচ্ছে কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই। নিত্যানন্দও তাঁদের সকলকে কোলে নিয়ে প্রেমাশ্রুতে ভিজিয়ে দিলেন। জগন্নাথ দর্শন করে আনন্দিত হয়ে সকলে মিলে গদাধরকে দেখতে গেলেন। নিত্যানন্দ এবং গদাধরের মধ্যে যে কি প্রীতিভাব তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। গদাধর যে সুন্দর গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা করেন তাকে দেখতে একেবারে নন্দরাজের তনয়ের মতই। শ্রীচৈতন্য নিজে সেই বিগ্রহকে কোলে নিয়েছেন, অতি পাষণ্ডীও তা দর্শন করলে ভুলে যাবে। শ্রীমুখকমল এবং অঙ্গের ভঙ্গিমা দেখে নিত্যানন্দের প্রেমাশ্রু যেন আর বাঁধ মানে না। নিত্যানন্দ উপস্থিত, শুনেই গদাধরপ্রভু ভাগবত পাঠ ছেড়ে উঠে এলেন। দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে গলা ধরে কাঁদতে লাগলেন। দুজন বলছেন,—আজ আমাদের চোখ বিশুদ্ধ হল। কেউ বললেন,—আজ আমাদের জন্ম সফল হল। দুজনের কারো শরীরেই বাহ্য জ্ঞান নেই, দুই প্রভুই আনন্দভরে সাগরে ভাসছেন। প্রেমভক্তির এমন প্রকাশ দেখে ভক্তবৃন্দ চারদিকে ঘিরে আনন্দে কাঁদছেন।

নিত্যানন্দ এবং গদাধররের মধ্যে বড়ই প্রেমপ্রীতি, কদাপি তাঁরা একে অন্যকে অপ্রিয় কথা বলেন না। গদাধর কখনো নিত্যানন্দ-নিন্দকের মুখ দর্শন করেন না। নিত্যানন্দের প্রতি যার ভক্তি নেই, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাকে দর্শনদান করেন না। দুই প্রভু স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে চৈতন্যমঙ্গল কীর্তন করতে আরম্ভ করলেন। তারপর গদাধরপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে তাঁর সেখানেই ভোজনের আমন্ত্রণ জানালেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর জন্য অতি সূক্ষ্ম পরিস্কার দেবভোগ্য এক মণ চাল গৌড় থেকে নিয়ে এসেছেন। একখানা রঙীন সুন্দর কাপড়ও এনেছেন। নিত্যানন্দ গদাধরকে বললেন,—এই চাল রেঁধে শ্রীগোপীনাথকে ভোগ দিয়ে তুমি প্রসাদ পাবে, ভোজন করবে। গদাধর পণ্ডিত বললেন,—এমন চাল তো কোন দিন চোখেও দেখি নি, এ কি তুমি বৈকুণ্ঠ থেকে গোপীনাথের ভোগের জন্য এনেছ? এমন চাল রাঁধেন লক্ষ্মীদেবী, শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করেন, তবে ভক্তগণ প্রসাদ পান। গদাধর আনন্দে চালের প্রশংসা করলেন এবং কাপড় নিয়ে গোপীনাথের কাছে গেলেন, গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে দিব্য রঙীন কাপড় দিয়ে শোভা দেখে তিনি আনন্দে ভাসছেন। তারপর তিনি নিজেই উঠোন থেকে শাক তুলে নিয়ে আনন্দে রান্না শুরু করে দিলেন। এই শাক কেউ লাগায় নি, নিজে থেকেই উঠোনের ধারে হয়েছে। কচি কচি তেতুঁল পাতা এনে বেঁটে তার সঙ্গে নুন এবং জল দিয়ে রেঁধে অম্বল হল। এই সব দিয়ে গোপীনাথের সামনে ভোগ লাগান হয়েছে, এমন সময়ে গৌরচন্দ্র চলে এলেন। মুখে তাঁর 'হরে কৃষ্ণ' নাম। গদাধরকে ডাকতে তিনি সামনে এলেন। তখন শ্রীচৈতন্য তাঁকে বললেন,—গদাধর, আমি কি নিমন্ত্রিত নই? আমি তো তোমাদের দুজনের থেকে আলাদা কিছু নই। তোমরা না দিলেও আমি কেড়ে খাই। নিত্যানন্দ এনেছেন, তুমি রেঁধেছ, গোপীনাথের প্রসাদ হয়েছে, এতে অবশ্যই আমার অধিকার আছে। প্রভুর কৃপাবাক্য শুনে নিত্যানন্দ ও গদাধর আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হলেন। গদাধর খুশি হয়ে গৌরচন্দ্র প্রভুর সামনে প্রসাদ রাখলেন। চালের সুগন্ধে বাড়ি ম ম করছে। প্রভু বললেন,—সমান তিন ভাগ করে নিয়ে আমরা এক সঙ্গে বসেই খাব। নিত্যানন্দের চাল বলেই প্রভু প্রীতি বশত ভোজন করতে বসলেন। ঈশ্বরের দু পাশে দুই প্রভু বসেছেন, ঈশ্বর অন্নব্যঞ্জনের প্রশংসা করছেন। তিনি বলছেন,—এই চালের গন্ধেও কৃষ্ণভক্তি হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গদাধর, তোমার রান্না কী চমৎকার, আমি তো কোথাও এমন শাক খাই নি। তেঁতুল পাতা দিয়েও তো খুব ভাল ব্যঞ্জন করেছ! বুঝলাম, তুমিই বৈকুণ্ঠে রান্না কর, তবে আর নিজেকে লুকিয়ে রাখছ কেন? —এইভাবে হাস্য পরিহাসে মহা আনন্দে তিন প্রভু প্রেমাবেশে ভোজন করছেন। এই তিনজনের মধ্যে কি রকম প্রেমভাব তা এঁরা তিন জনেই জানেন, গৌরচন্দ্র তা কারো কাছে প্রকাশ করছেন না। প্রভুত্রয় ভোজন করে উঠলে ভক্তবৃন্দ কলার পাতা কেড়ে নিলেন। এই আনন্দ ভোজনের কথা যে পড়ে কিম্বা শোনে সে কৃষ্ণভক্তিও লাভ করে এবং কৃষ্ণকেও লাভ করতে পারে। গদাধর শুভদৃষ্টি লাভ করলেই শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপকে জানতে পারা যায়। শ্রীনিত্যানন্দও যার প্রতি খুশি হয়ে গদাধরের শুভদৃষ্টিপাতের সুযোগ করে দেন, সেই জানতে পারে।

এইভাবে নিত্যানন্দপ্রভু গৌরচন্দ্রের সঙ্গে আনন্দে নীলাচলে থাকলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং গদাধর এই তিনজন সর্বদা একসঙ্গেই থাকেন। জগন্নাথদেবকে দর্শন করতেও এই তিন জন এক সঙ্গে যান এবং তিনজনই সঙ্কীর্তনের আনন্দে সর্বদা বিহ্বল থাকেন।

৩/৯ এবারে অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ প্রভুর সমস্ত প্রিয়পাত্রগণ রথযাত্রার সময় নীলাচলে এলেন। প্রভুর ইচ্ছা ছিল, প্রতি বৎসরই রথে যেন গৌড়ের ভক্তবৃন্দ আসেন। তাই অদ্বৈতের নেতৃত্বেই ভক্তগণ এলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত এসেছেন, তাঁর বাড়িতেই প্রভুর যত লীলা প্রকাশিত হয়েছে। চন্দ্রশেখর আচার্য এসেছেন, তাঁর বাড়িতে প্রভু দেবী ভাবে নৃত্য করেছিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত এসেছেন, তাঁর নাম স্মরণ করলেও কর্মবন্ধ নাশ হয়। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সানন্দে এসেছেন, প্রভু তাঁকে সব সময় বড় গলায় ডাকতেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কীর্তনের সঙ্গে প্রভু নৃত্য করতেন, তিনিও এসেছেন। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নৃসিংহদেব কথা বলেন, তিনিও চলেছেন। হরিদাসঠাকুর এবং ছোট-হরিদাসও এই সঙ্গে চলেছেন। মহাভক্ত বাসুদেব দত্ত চাললেন। কৃষ্ণকীর্তন-গায়ক মুকুন্দ দত্ত, দলবল সহ শিবানন্দ সেন, গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দ দত্ত, মূল কীর্তনীয়া প্রভু সেন, আখরিয়া বিজয় দাস,—এই বিজয় দাসের কাছেই প্রভু রত্নবাহু প্রকাশ করেছিলেন,—নিত্যানন্দ কিছুদিন যাঁর বাড়িতে ছিলেন সেই সদাশিব পণ্ডিত, প্রভুর অধ্যয়নসাথী পুরুষোত্তমসঞ্জয়, শ্রীমান পণ্ডিত—ইনি প্রভুর নৃত্যের সময় মশাল ধরতেন, যাঁর বাড়িতে নিত্যানন্দ প্রথম এসেছিলেন সেই নন্দন আচার্য, প্রভু যাঁর কাছে চেয়ে অন্ন খেয়েছেন সেই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, খোলাচেচা শ্রীধর—যাঁর বাড়িতে প্রভু ভাঙ্গাপাত্রে জল খেয়েছেন, মহা কৃষ্ণভক্ত ভগবানদাস পণ্ডিত গোপীনাথ পণ্ডিত, শ্রীগর্ভপণ্ডিত, সোনার হংস-মৃণাল দেখেছিলেন সেই বনমালী পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত—এই দুজনের ঘরে প্রভু শিশুকালে নৈবেদ্য খেয়েছিলেন, চৈতন্য-আজ্ঞা যিনি শিরোধার্য করে চলেন সেই বুদ্ধিমন্ত খান, প্রভু যাঁকে বাবা বলেন সেই পুরন্দর আচার্য, যাঁর ঘরে প্রভু গোপনে বিহার করেছেন সেই রাঘব পণ্ডিত, কবিরাজ মুরারি গুপ্ত, নামের ফলে যাঁর কাছে সাপের বিষও অকৃতকার্য হল সেই গরুড় পণ্ডিত, গৌরের অক্রূর গোপীনাথ সিংহ, শ্রীরাম পণ্ডিত, নারায়ণ পণ্ডিত, শচীমাতাকে দেখাশোনা করার জন্য দামোদর পণ্ডিত এসেছিলেন নীলাচল থেকে, তিনিও এই সঙ্গে চললেন। অসংখ্য চৈতন্যভক্ত, তাঁদের সকলের নাম বলা অসম্ভব, তাঁরা সবাই আনন্দ করে চললেন।

শচীমাতার কাছে সভক্তি বিদায় নিয়ে অদ্বৈতাচার্য এই সব ভক্ত কে নিয়ে নীলাচলের দিকে চলেছেন। প্রভুর প্রিয় যেসব বস্তু যথাসম্ভব সেসব সঙ্গে নেওয়া হয়েছে, প্রভু ভোজন করলে এঁরা আনন্দ পাবেন। আনন্দ-কীর্তন করতে করতে সমস্ত পথকে পবিত্র করে চলেছেন এঁরা। ভক্তগণ উৎফুল্ল হয়ে যে হরিধ্বনি করেন তাতে ত্রিভুবনে পুণ্য সঞ্চারিত হয়। অনেকেই স্ত্রী-পুত্র-দাসদাসীগণকেও সঙ্গে করে এনেছেন শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করতে। ভক্তগণ যেখানে এসে বিশ্রাম করেন সেই স্থানটিও বৈকুণ্ঠ হয়ে যায়।

সহস্রবদন অনন্তদেব মঙ্গল-আখ্যান গাইছেন। মহাপুরুষগণ সর্ববিষয়ে মঙ্গলমতে নীলাচলে এসে পৌঁছলেন। কমলপুর থেকেই মন্দিরের ধ্বজ-পতাকা দেখে সকলে মিলে দণ্ডবত হয়ে প্রেমাশ্রুপাত করলেন। ভক্তবৃন্দ এসেছেন শুনে প্রভুও এগিয়ে এলেন। অদ্বৈতকে প্রভু বিশেষ ভালবাসেন, তাই আগেই প্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন। অদ্বৈত কটক পর্যন্ত এসেই প্রসাদ পেয়ে গেলেন।—আমি ক্ষীরসাগরে শুয়ে ছিলাম, নাঢ়া-অদ্বৈত হুঙ্কার করে আমার ঘুম ভেঙে দিয়েছে। অদ্বৈতের কারণে আমার এবারের অবতার। প্রভু বারে বারে এই কথা বলছেন। সেইজন্যই ঈশ্বরকল্প মহান্তগণ সবাই অদ্বৈতাচার্যকে

ভক্তি করেন। অদ্বৈত আসছেন, শুনে প্রভু ভক্তবৃন্দ সহ এগিয়ে এলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, পরমানন্দপুরী আনন্দ করে এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের যেন বাহ্যজ্ঞান নেই, এমন অবস্থা। সঙ্গে রয়েছেন বাসুদেব সার্বভৌম, জগদানন্দ পণ্ডিত, কাশীমিশ্র, স্বরূপদামোদর, শঙ্কর পণ্ডিত, কাশীশ্বর পণ্ডিত, ভগবান আচার্য, ভক্তপ্রধান প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পরমানন্দ পাত্র, রামানন্দ রায়, চৈতন্যের দ্বারপাল গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, শিবানন্দ, নারায়ণ, অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দ, বাণীনাথ, শিখি মাহাতি,—অসংখ্য চৈতন্যভক্ত, সকলের নাম তো জানা নেই, ছোট-বড় সকলেই এসেছেন। সকলেই মহানন্দে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে আসছেন। অদ্বৈতাচার্য সকল সঙ্গীগণকে নিয়ে আঠারনালায় পৌঁছে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রভু নরেন্দ্র সরোবরের ধার দিয়ে এগিয়েছেন। দূর থেকে দেখেই দু-দল দু-দলকে দণ্ডবত হয়ে প্রণাম করতে লাগলেন, অদ্বৈতকে দূর থেকে দেখেই প্রভু দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। অদ্বৈতও দূর থেকে নিজের প্রাণনাথকে দেখে দণ্ডবৎ প্রণাম করছেন। এখন চারদিকে কেবলই অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার আর দণ্ডবত দেখা যাচ্ছে, আর কিছুই নয়। দুই দল কে কাকে দণ্ডবৎ করবে তার হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে, সকলেই শ্রীচৈতন্যের প্রতি ভক্তিতে আন্তরিক ভাবে বিহ্বল। ছোট-বড়, মূর্খ-জ্ঞানী কিছু ভেদাভেদ নেই, সকলেই কেবল দণ্ডবত করছেন আর হরিধ্বনি দিচ্ছেন। মহাপ্রভুও ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবৎ করছেন, অদ্বৈতাচার্যরাও তাই করছেন। এই ভাবে দণ্ডবত করতে করতে দুই দল এসে এক সঙ্গে মিলিত হলেন।

এখানে যে আনন্দ-দর্শন, আনন্দ-ক্রন্দন এবং উচ্চ হরিধ্বনি হল তা কোন মানুষের পক্ষে যথাযথ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। একমাত্র সহস্রবদন অনন্তদেব এবং বেদব্যাসের পক্ষেই তা সম্ভব। অদ্বৈতকে দেখে প্রভু কোলে নিয়ে তাঁর দেহ প্রেমাশ্রুতে ভিজিয়ে দিলেন। অদ্বৈতাচার্য শ্লোক পাঠ করে প্রভুকে প্রণাম করলেন আর আনন্দে ডুবে রইলেন। প্রভুকে পূজা করবার জন্য অদ্বৈত যত আয়োজন করেছিলেন, সবই ভুলে গেলেন। আনন্দে তিনি কেবল, 'আমি এনেছি, আমিই এনেছি' বলে চীৎকার করতে লাগলেন। সেই আনন্দধ্বনিতে সর্বলোক পরিপূর্ণ হয়ে গেল। শুধুমাত্র বৈষ্ণবগণ নয়, সাধারণ লোক যারা ভক্তির কিছুই জানে না তারাও হরিনাম করে কাঁদতে লাগলেন। ভক্তের দল পরস্পর একজন একজনের গলা ধরে আনন্দে হরি বলে কাঁদতে থাকেন। সকলে মিলে অদ্বৈতকে প্রণাম করলেন, তাঁর জন্যই শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। দুই দল মিলে অতি উচ্চ স্বরে হরিধ্বনি দিচ্ছেন। কোথায় কে নাচছে, কে গাইছে, কে গড়াগড়ি করছে তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। প্রভুকে দেখে সকলেই আনন্দে বিহ্বল হলেন, সর্বমঙ্গল প্রভুও সকলের মধ্যে নাচতে লাগলেন, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাচার্য কোলাকুলি করে মত্ত সিংহের মত নাচছেন। প্রত্যেক বৈষ্ণবকে ধরে ধরে প্রভু প্রীতমনে আলিঙ্গন করছেন। ভক্তনাথ, ভক্তবল, ভক্তজীবন প্রভু ভক্তের গলা ধরে কাঁদছেন। জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় তখনই সহস্র সহস্র মালা চন্দন এল। প্রসাদীমালা পেয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমেই অদ্বৈতের গলায় পরিয়ে দিলেন। প্রভু নিজহাতে সকল বৈষ্ণবকে মালা পরিয়ে ভরিয়ে দিলেন। ভক্তগণ প্রভুর কৃপা দেখে বাহু তুলে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন। সকলেই প্রভুর শ্রীচরণ ধরে প্রার্থনা জানালেন,—প্রভু, জন্মে জন্মে যেন তোমাকে ভুলে না যাই। মানুষ পশু পক্ষী যার ঘরেই জন্ম নিই, তোমার চরণের দর্শন যেন পাই। পতিব্রতা বৈষ্ণবপত্নীগণ দূরে

থেকে প্রভুকে দেখে কাঁদছেন। তাঁদের প্রেমাশ্রুধারার অন্ত নেই, সকলেই বিষ্ণুভক্তি পরায়ণা। ভগবান শ্রীচৈতন্য বলেছেন,—বৈষ্ণবগৃহিণীগণ সকলেই ভক্তিতে ও জ্ঞানে তাঁদের পতিদের তুল্য। নৃত্য গীত বাদ্য সঙ্কীর্তনে সকলেই প্রভুর সঙ্গে চলে আসছেন। এখন মহা প্রেমভক্তির উল্লাস দেখে সকলেই আনন্দিত হচ্ছেন। এভাবে আনন্দ-কীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু আঠারোনালা থেকে নরেন্দ্র সরোবরের কাছে এলেন।

এমন সময় শ্রীজগন্নাথের বিজয়বিগ্রহ রাম, কৃষ্ণ ও গোবিন্দ নৌকাভ্রমণ করার জন্য নরেন্দ্র সরোবরে এসে উপস্থিত হলেন। মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরি, জয়ঢাক বাজিয়ে হরিধ্বনি দিয়ে নৃত্যগীত আরম্ভ হয়ে গেল। চারদিকে হাজার হাজার ছত্র পতাকা চামর শোভা পাচ্ছে। কেবল হরিধ্বনি ও জয়ধ্বনি ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। জগন্নাথের বিগ্রহ রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ নরেন্দ্র সরোবরে এসে চৈতন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হলেন। দুই গোষ্ঠী একত্রে কীর্তন করে বৈকুণ্ঠের আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপাতেই এসব হচ্ছে। রাম-কৃষ্ণ-গোবিন্দ নৌকায় উঠলে চারদিকে ভক্তগণ চামর দোলাতে লাগলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেও আনন্দে ভক্তগণকে নিয়ে নরেন্দ্র সরোবরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। পূর্বকালে যমুনার জলে গোপবালকগণকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যেমন জলকেলি করতেন, এখানেও ঠিক তেমনি করতে লাগলেন। গৌড় দেশের জলকেলির মত 'কয়া কয়া' বলে বৈষ্ণবগণকে নিযে করতালি দিয়ে জলবাদ্য করতে লাগলেন। সকলেরই গোকুলের শিশুভাব হল, প্রভুরও গোপালভাব হল। কারো বাহ্য জ্ঞান নেই, সকলেই আনন্দে বিহ্বল, মহানন্দে নির্ভয়ে সকলে প্রভুর গায় জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। চৈতন্য এবং অদ্বৈতের মধ্যে জল ছোঁড়াছুড়ি হল। কখনো অদ্বৈত হারছেন, কখনো প্রভু হারছেন। চোখেও জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন পরস্পর। শ্রীনিত্যানন্দ, গদাধর এবং পুরীজীর মধ্যে জলযুদ্ধ চলছে। মুকুন্দ দত্ত এবং মুরারি গুপ্তের মধ্যেও বারেবারে জলযুদ্ধ লাগছে, তাঁরা আনন্দে হুঙ্কার করে উঠছেন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এবং স্বরূপদামোদর পরস্পরেব অত্যন্ত বন্ধু, তাঁদের মধ্যেও জল ছোঁড়াছুড়ি চলছে। শ্রীরাম, রামচন্দ্র, হবিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গঙ্গাদাস, গোপীনাথ, চন্দ্রশেখর আচাব—এঁরা পরস্পবকে জল ছিটিযে দিচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ লোক জলে নেমে রাম-কৃষ্ণ-গোবিন্দের নৌকাবিহার দেখছে। আজ নরেন্দ্রসরোবরে সংসারী লোক, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী চকলেই মহা আনন্দে জলক্রীড়ায় মেতে উঠেছেন। শ্রীচৈতন্যের এমনই মায়া বে সাধারণ লোকেরা কেউ সেখানে আসতেও পারে না, কিছু দেখতেও পায় না। শ্রীচৈতন্যের ভক্তবৃন্দ ভক্তির দ্বারাই এই অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছেন। ভক্তি না হলে, কেবল বিদ্যা বা তপস্যায় কিছুই হয় না, কেবল মাত্র দুঃখই পায়। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের এই সঙ্কীর্তনলীলা ভক্তিহীন বড় বড় সন্ন্যাসীগণও দেখতে পেলেন না। বরং তাঁরা আরো বলছেন,—বেদান্তপাঠ ছেড়ে চৈতন্যদেব অকারণ কীর্তনের হুড়োহুড়ি করছেন। সন্ন্যাসীর ধর্ম হচ্ছে সবদা প্রাণায়াম করা, নাচা-কাঁদা তো সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। এসব কথা শুনে শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীগণ বলছেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপুরুষ। কেউ বলছেন,—বিশাল জ্ঞানী। কেউ বলছেন,—মহাভক্ত। অনেকেই প্রশংসাও করছেন কিন্তু তাঁরা তত্ত্ব জানেন না। পূর্ব কালে দ্বারকায় যেমন জলকেলি হত তেমনি ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে জলকেলি করছেন। জাহ্নবী এবং যমুনার মতই নরেন্দ্র সরোবরও মহাভাগ্যবান। শাস্ত্রে আবির্ভাব তিরোভাব বলে উল্লেখ আছে কিন্তু মূলত এসব লীলার কোন ছেদ নেই,

সর্বদাই চলছে। জীবগণের উদ্ধারের জন্যই এসব লীলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই লীলাকথা পাঠ, শ্রবণ ও স্মরণ করলে কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়।

প্রভু জলক্রীড়া শেষ করে সকলকে নিয়ে জগন্নাথ দেবের দর্শনে গেলেন। জগন্নাথকে দেখে প্রভু এবং ভক্তগণ সকলেই প্রেমক্রন্দন করতে লাগলেন। দর্শন করে প্রভুর আনন্দধারায় সারা শরীর ভিজে গেছে। অদ্বৈত প্রমুখ ভক্তগণ তা দেখে আনন্দ সমুদ্রে ভাসছেন। একদিকে নিশ্চল জগন্নাথ এবং একদিকে সচল জগন্নাথ দেখে ভক্তগণ প্রণাম করছেন। জগন্নাথের গলার মালা এনে কাশীমিশ্র সকল ভক্তকে গলায় পরিয়ে দিলেন। প্রভু অতীব ভক্তি করে মালা নিলেন, নারায়ণই শিক্ষাগুরুর রূপ নিয়ে সন্ন্যাসী বেশে এসেছেন। বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, প্রসাদ—এসবের ভক্তি বিষয়ে প্রভুই জানেন, অন্যেরা তা জানেন না।

প্রভুর আচরণ সাক্ষাৎভাবে দেখা গেল, তিনি নিজে সন্ন্যাসী হয়েও গৃহী বৈষ্ণবগণকে প্রণাম করলেন, এই প্রকৃত ভক্তের ধর্ম। সন্ন্যাসী হলে পিতাও এসে পুত্রকে প্রণাম করে। সন্ন্যাসীকে সকলেই প্রণাম করবে। সন্ন্যাসী কেবল মাত্র সন্ন্যাসীকেই প্রণাম করবেন। তবু সন্ন্যাসীর নিয়ম ভঙ্গ করেও প্রভু বৈষ্ণবগণকে প্রণাম করছেন, তিনি এভাবে নিজে আচরণ করে জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

তুলসীদেবীর প্রতি কেমন ভক্তি প্রকাশ করা দরকার তাও প্রভু হাতেকলমে শিক্ষা দিলেন। একটি ছোট পাত্রে তুলসীচারা নিয়ে রোপণ করতে হবে। প্রভু বলেন,—তুলসী না দেখলে আমার মন ভাল থাকে না, জলে না থাকলে মাছের যেমন হয়, ঠিক তেমনি। প্রভু যখন সংখ্যানাম করতে থাকেন তখন সামনে সামনে কেউ একজন তুলসী নিয়ে থাকেন। পথে যেতে যেতেও প্রভু তুলসী দেখেন, দেখে তিনি আনন্দিত হন। প্রভু যেখানে বসে সংখ্যানাম করেন তার কাছেও তুলসী থাকে। তুলসী দেখে দেখে তিনি নামজপ করেন, এ ভক্তিতত্ত্বের কথা অন্য লোকে বুঝবে না। নামজপ শেষ করেও আবার তিনি তুলসীকে সামনে নিয়ে চলেন। শিক্ষাগুরু নারায়ণ যেমন শিক্ষা দিচ্ছেন তা মেনে চললে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এখন জগন্নাথকে দেখে নমস্কার করে তিনি দলবল নিয়ে বাসায় চললেন। যে ভক্তের যা মনোবাসনা প্রভু তা সবই পূরণ করেন। তিনি ভক্তগণকে পুত্রস্নেহে কাছে রেখে দিয়েছেন। ভক্তগণও তাঁর সান্নিধ্যে আনন্দেই আছেন। গৌড়ের এবং নীলাচলের সমস্ত ভক্তগণ কৃষ্ণকথার আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদেই নবদ্বীপের বৈষ্ণব ভক্তগণকে সকলে দর্শন করতে পেলেন। স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য বললেন,—এ সব বৈষ্ণবগণকে দেবতারাও দর্শন করতে পান না। ভক্তভাবময় শ্রীকৃষ্ণের অবতারকালে এই সমস্ত বৈষ্ণবকে অবতারিত করে সকলকে অগ্রবর্তী করে ভক্তভাবময় শ্রীকৃষ্ণ গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হন। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ যেমন অবতীর্ণ হয়েছেন এবং লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছেন, তেমনি বৈষ্ণবগণও প্রভুর আজ্ঞায় প্রভুর সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই বৈষ্ণবদেরও জন্ম-মৃত্যু নেই, সঙ্গে আসেন সঙ্গে যান। বৈষ্ণবদের কখনো কর্মবন্ধন জনিত জন্ম নয়, পদ্মপুরাণে আছে,—যেমন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও ভরত এবং যেমন সঙ্কর্ষণ প্রমুখ, তেমনি ভগবৎ-পার্ষদ বৈষ্ণবগণও ভগবানের সঙ্গে স্বেচ্ছাবশে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। ভগবানের সঙ্গেই ভগবানের নিত্যধামে চলে যান। ভরত-লক্ষ্মণ এবং সঙ্কর্ষণাদির ন্যায়

এই ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণববৃন্দেরও কর্মবন্ধনজনিত জন্ম হয় না। ভক্তগণ ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বদা প্রেমে পূর্ণ হয়ে থাকেন। যে ভক্তি করে এ সব কাহিনী শোনে তার ভক্তসঙ্গ লাভ হয় এবং তিনি পরিণামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন।

৩/১০ সর্ববৈষ্ণবের একান্ত বল্লভ, রমাকান্ত বৈকুণ্ঠনাথ, কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, তুমি জীবের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত কর।

ভক্তবৃন্দ প্রভুর সঙ্গে কীর্তনবিলাসে পরমানন্দে আছেন। শিশুকালে প্রভু কি জিনিস ভালবাসতেন বৈষ্ণবগণ তা জানেন। তাঁরা অতীব প্রেমভরে প্রভুর জন্য সেসব জিনিস এনেছেন। অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে সেসব রান্না করে তাঁরা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করছেন। যে-দিন যে-ভক্তের ঘরে নিমন্ত্রণ হয় প্রভু সেখানেই ভোজন করেন। লক্ষ্মী দেবীর অংশ বৈষ্ণবগৃহিণীগণ অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে রন্ধনক্রিয়া করেন। সকলেরই মুখে হরিনাম এবং নয়নে প্রেমধারা। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগৃহিণীগণ সকলেই জানেন যে প্রভু শিশুকালে কি ভালবাসতেন। তাঁরা প্রেমযোগে তাই রেঁধেছেন এবং প্রভুও তা খুব ভালবেসে ভোজন করলেন।

একদিন অদ্বৈতাচার্য প্রভুকে বললেন,—আজ আমার এখানে তুমি ভোজন করবে। মুঠো খানেক চাল আমি নিজের হাতে রাঁধব, তুমি খেলে আমার হাত ধন্য হবে, আমার শ্রম সার্থক হবে। প্রভু বললেন,—আচার্য, তোমার হাতে যে খাবে সে তো তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণভক্তি লাভ করবে এবং কৃষ্ণকেও পাবে। তোমার অন্ন আমার জীবন, তুমি খাওয়ালে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন হয়। তুমি রেঁধে যে নৈবেদ্য দাও, আমার তা চেয়ে খেতে ইচ্ছে হয়। প্রভুর ভক্তবৎসল বাণী শুনে অদ্বৈত অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। খুশি হয়ে বাড়িতে এসে তিনি প্রভুর ভোজনের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবীর জন্ম লক্ষ্মীর অংশে, তিনি সানন্দে কাজে হাত দিলেন। প্রভুর পছন্দের জিনিস যা কিছু গৌড়দেশ থেকে আনা হয়েছে সবই তাঁকে দিতে লাগলেন। চৈতন্যচন্দ্রকে মনে মনে স্মরণ করে অদ্বৈতাচার্য রাঁধতে লেগে গেলেন। সীতাদেবী তাঁর পছন্দমত পরিপাটি করে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করলেন। প্রভু শাক ভালবাসেন তাই দশ রকমের শাক এনে দিলেন। অদ্বৈত স্ত্রীকে বললেন,—আমি যা-কিছু আয়োজন করেছি প্রভু যদি একাকি এসে এসব ভোজন করেন কেবল তাহলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তিনি যদি সঙ্গে একদল বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী নিয়ে আসেন তাহলে তিনি আর কিইবা খেতে পারবেন? প্রভু যাঁদের ভালবাসেন তাঁরা সকলেই সঙ্গে আসবেন। এখানে ভোজন করবেন। প্রভু নিজেও তাই ভালবাসেন। আবার অদ্বৈত মনে মনে ভাবছেন, প্রভু যদি একা আসেন তবে তাঁকে আমি সব পদ খাওয়াতে পারি এবং তাহলেই একমাত্র কামনা সিদ্ধ হয়। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে তিনি রান্না করছেন। এদিকে প্রভুরও জপ শেষ হলে মধ্যাহ্ন ভোজনের কথা খেয়াল হল। যে সন্ন্যাসীরা প্রভুর সঙ্গে মধ্যাহ্ন করেন তাঁরাও প্রভুর সঙ্গেই ভোজন করতে চলেছেন। এমন সময় আচম্বিতে ঝড়বৃষ্টি শুরু হল, অদ্বৈতের দিকে তাকিয়েই যেন দেবরাজ ইন্দ্র এসব করলেন। ঝন্‌ঝন্ করে বাজ পড়ছে, শিলাপাত হচ্ছে, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, অসম্ভব বাতাস সেই সঙ্গে। ধূলোয় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে, হাওয়ার ঝাপটায় কেউ পথে চলতে পারছে না। ঝড়ের দাপটে কেউ ঠিক মত পা ফেলতে পারছে না, কাকে

কোথায় নিয়ে ফেলছে কে জানে? অদ্বৈত যেখানে রাঁধছেন সেখানে কিন্তু বৃষ্টিটা একটু কমই হচ্ছে। যাঁরা প্রভুর সঙ্গে ভোজন করেন সে সব সন্ন্যাসীগণ ঝড়ের মধ্যে যে কে কোথায় গেলেন তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এদিকে অদ্বৈতাচার্য রান্না শেষ করে অন্নব্যঞ্জন সাজিয়ে ঢেকে রেখেছেন। ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর, নবনী, পিষ্টক, সন্দেশ, কদলি দিয়ে সবার উপরে তুলসীমঞ্জরী রেখে সাজান হয়েছে। তারপর অদ্বৈত গৌরহরিকে আনবার জন্য ধ্যানে বসলেন। অদ্বৈত চাইছেন প্রভু যেন একাই আসেন। অদ্বৈতের ইচ্ছামতে গৌরচন্দ্র সত্যি একাই এলেন। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলতে বলতে তিনি এসে অদ্বৈতাচার্যের সামনে উপস্থিত হলেন। অদ্বৈত সসম্ভ্রমে পাদপদ্মে প্রণাম করে গৌরহরিকে বসতে দিলেন। প্রভুকে একা দেখে অদ্বৈত খুবই খুশি হলেন। তিনি সস্ত্রীক আনন্দে প্রভুর পাদপ্রক্ষালন করে চন্দন পরিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। মহাপ্রভু ভোজনে বসলে অদ্বৈত নিজে পরিবেষণ করতে লাগলেন। অদ্বৈত যত ভাত দিয়ে খুশি হচ্ছেন প্রভুও সবটাই খেয়ে নিচ্ছেন। ব্যঞ্জনও প্রভু সবই খেয়ে নেন কেবল সমস্ত রকম রান্না থেকে একটু একটু রেখে দিচ্ছেন। প্রভু ঈষৎ হেসে অদ্বৈতকে বললেন,—সব ব্যঞ্জনই কেন একটু একটু করে রাখলাম বলতে পার? কত রকম রান্না খেলাম তা পরে গুণে দেখতে হবে, তাই। তুমি এমন রান্না কোথায় শিখেছ? আমি তো এমন শাক কোথাও খাই নি। যত পদ রেঁধেছ সবই চমৎকার হয়েছে। অদ্বৈত যা দিচ্ছেন, প্রভু সবই খেয়ে নিচ্ছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ হচ্ছেন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। দধি দুগ্ধ ঘৃত সর সন্দেশ যা-ই দেওয়া হচ্ছে প্রভু সবই খেয়ে নিচ্ছেন। অদ্বৈতাচার্যের বাসনা পূরণের জন্য তিনি সব ভোজন করলেন। প্রভুর ভোজন শেষ হলে অদ্বৈত ইন্দ্রের স্তব আরম্ভ করলেন। বললেন,—হে ইন্দ্র, আজ তোমার প্রভাব আমি বুঝতে পারলাম, তুমি অবশ্যই বৈষ্ণব হবে। আজ থেকে আমি তোমাকে পূজা করব, তুমি আজ আমাকে কিনে নিলে। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন—ইন্দ্রের এত স্তব করা হচ্ছে কেন? অদ্বৈত বললেন,—তোমার তা জানার কি দরকার? প্রভু উত্তর দিলেন,—আচার্য তুমি না বললেও বুঝতে পারছি, এত ঝড়বৃষ্টির কারণ তুমিই। এখন তো ঝড়বৃষ্টির সময় নয়, তবু হঠাৎ এমন শিলাপাত হল। এসব তোমারই কাণ্ড তা আমি এখন বুঝতে পারলাম। তুমি কেন এসব করেছ তা বলছি,—তুমি ভেবেছ, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমি খেলে বিশেষ কিছু খাব না। আমি একা এলে তুমি আমাকে পেট পুরিয়ে খাইয়ে খুশি হবে। তাই এই সব উৎপাত আমদানি করে সন্ন্যাসীদের আসায় ব্যাঘাত ঘটালে। ইন্দ্র-যে তোমার কথা মত কাজ করেছেন, এ তোমার শক্তির আংশিক প্রকাশ মাত্র, এতে ইন্দ্রের সৌভাগ্য বুঝতে হবে যে তোমাকে সে ভক্তি করছে। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তোমার সাক্ষাতে আছেন, তিনিই তোমার কোন সঙ্কল্প পূরণ না করে থাকেন না। শ্রীকৃষ্ণ তোমার কথা পালন করেন, ইন্দ্র তোমার কথায় ঝড়বৃষ্টি করবেন—এ আর এমন বেশি কি? যম কাল মৃত্যু তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য করেন, নারদ প্রমুখ যোগেশ্বর মুনীশ্বরগণও তাই করেন। তোমার স্মরণে সর্ববন্ধন মুক্ত হয়, তাঁর কথায় ঝড়বৃষ্টি হবে, এ এমন বিশেষ কিছু নয়। তোমার তত্ত্ব কেউ জানে না, তোমার কৃপাতে ভক্তি লাভ হয়। অদ্বৈত বললেন,—প্রভু, তুমি সেবকবৎসল। আমি কায়মনোবাক্যে এই ভরসাতেই আছি। তোমার প্রতি ভক্তির জোরেই আমি শক্তিশালী। আমি তোমার কাছে কেবল এই বর চাই যে তুমি কখনো আমাকে ছাড়বে না।

দুই প্রভুর এই সব আলাপ-আলোচনার মধ্যেই আনন্দে ভোজন শেষ হল। অদ্বৈতাচার্যের শ্রীমুখের এসব কথা অতীব সত্য। যে এসব কথা শুনতে ভালবাসে না সে কখনো অদ্বৈতের দর্শন লাভ করে না। হরি-হরের প্রীতির কথা সাধারণ লোকেরা জানে না। হরিহরের মতই চৈতন্য এবং অদ্বৈত, এক জনের রোষে দুজনই রুষ্ট হন। জগতের ত্রাণের জন্য কৃপালুহৃদয় অদ্বৈত সর্বদা এ কথা বলছেন। অদ্বৈতের কথার উদ্দেশ্য যে বুঝতে পারে তাকে ঈশ্বরের অংশ মনে করতে হবে। ভক্তিভরে যে এসব কাহিনী শোনে তার কৃষ্ণভক্তি হয় এবং সর্বত্র কল্যাণ হয়। অদ্বৈতের মনস্কামনা পূর্ণ করে শ্রীচৈতন্য বাসায় চলে গেলেন। এভাবেই তিনি শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দের ঘরে ভোজন করে তাঁদেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। সব দলবল নিয়ে সর্বদা কীর্তনে প্রভু নিজেও নাচেন অন্যকেও নাচান।

দামোদর পণ্ডিত শচীমাতাকে দেখতে গিয়েছিলেন, দেখে এসেছেন। প্রভু দামোদরকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তাঁর বিষ্ণুভক্তি কেমন দেখলে? পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর এই প্রশ্ন শুনে রেগে গিয়ে বললেন,—শচীমাতার ভক্তির কথা তুমি কী জিজ্ঞাসা করছ? শচীমাতার আশীর্বাদেই তুমি বিষ্ণুভক্তি লাভ করেছ। তুমি যা কিছু পেয়েছ সব তাঁরই শক্তির ফল। তুমি তাঁর আশীর্বাদেই এখন বিষ্ণুভক্তি পেয়েছ, একথা কখনো ভুলে যেয়ো না। অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্ছা, পুলক, হুঙ্কার—এসব যা কিছু বিষ্ণুভক্তি লক্ষণ আছে, তা সবই সব সময় তাঁর দেহে উপস্থিত। তাঁর মুখে সর্বদা কৃষ্ণনাম। তুমি শচীমাতার ভক্তির কথা আবার আমার কাছে জিজ্ঞাসা করছ? তিনি নিজেই বিষ্ণুভক্তির প্রতিমূর্তি। এসব তুমি জেনেও আমাকে পরীক্ষা করার জন্য আবার জিজ্ঞাসা করছ। সাময়িক ভাবেও যে একবার মা-কে ডাকবে তার কোন দুঃখ থাকে না। দামোদরের মুখে মায়ের মহিমা শুনে শ্রীগৌরাঙ্গের আর আনন্দের সীমা নেই। খুশি হয়ে তিনি দামোদর পণ্ডিতের সঙ্গে বারেবারে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন,—তুমি আমার মনের কথাই বলেছ, আমি তোমার কাছে কেনা হয়ে রইলাম। মায়ের আশীর্বাদেই আমি বিষ্ণুভক্তি লাভ করেছি, তুমি ঠিকই বলেছ। তাঁর আশীর্বাদেই আমি বেঁচে আছি। আমি কখনো তাঁর ঋণ শোধ করতে পারব না। আমি মায়ের কাছে আবদ্ধ আছি, সব সময় সেকথা আমার ভাবা উচিত।

প্রভু দামোদর পণ্ডিতকে কৃপা করে ভক্তগণের সঙ্গে বসলেন। শচীমাতার বিষ্ণুভক্তি বিষয়ে প্রভু যে দামোদরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তা কেবল মাত্র জগতকে শিক্ষা দিবার জন্য। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর দেখা হলে যেমন জিজ্ঞাসা করা হয় সব কুশলে আছে কিনা, সেই রকমই প্রভু মায়ের কুশলবার্তা জানবার জন্যই জিজ্ঞাসা করলেন ভক্তি আছে কিনা। কৃষ্ণভক্তি থাকা মানেই কুশলে থাকা। ভক্তি থাকলে সকলেই কুশলে থাকে, ভক্তি না থাকলে রাজারও অমঙ্গল। ধন জন ভোগ সব থেকেও ভক্তি না থাকলে সবই অমঙ্গল। আজ কি খাবে তাও যার জোগাড় নেই, যে দরিদ্রেরও বিষ্ণুভক্তি থাকলেই তাকে ধনবান বলতে হয়। ভিক্ষার জন্য প্রভুকে কেউ আমন্ত্রণ করলে সেই উপলক্ষে প্রভু এই কথা বলতেন। প্রভুকে কেউ ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করলে তিনি বলতেন,—আগে গিয়ে লক্ষেশ্বর হও তারপর আমাকে খাওয়ার জন্য ডাকবে। আমি লক্ষেশ্বরের ঘরেই কেবল ভিক্ষা করি। এই কথা শুনে আমন্ত্রণকারী ব্রাহ্মণেরা চিন্তায় পড়ে যেতেন। বিপ্রগণ

বিনয়বচনে প্রভুকে জানাতেন,—লক্ষ কেন, সহস্রও তো নেই। তুমি আমার ঘরে ভোজন না করলে আমার সংসার পুড়ে যাক। তখন প্রভু বললেন,—আমি কাকে লক্ষেশ্বর বলি তা কি তুমি ধরতে পেরেছ? যে রোজ এক লক্ষবার নাম জপ করে তাকেই আমি লক্ষেশ্বর বলি। আমি তাঁর বাড়িতেই ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। প্রভুর কথা শুনে বিপ্রগণ আনন্দিত হয়ে বললেন,—তুমি ভিক্ষা কর প্রভু, আমরা লক্ষ নাম জপ করব। আমাদের কী ভাগ্য, তুমি এভাবে শিক্ষা দিচ্ছ। শ্রীচৈতন্যকে ভোজন করাবার জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন এক লক্ষবার নাম জপ করতে লাগলেন। এইভাবে লোকজনকে ভক্তিযোগ দান করে প্রভু আনন্দে মেতে আছেন। ভক্তি প্রচার করার জন্যই তাঁর অবতার গ্রহণ করা, তিনি ভক্তি ভিন্ন অন্য আলোচনা করেন না। প্রভু বলেন,—যার কৃষ্ণভক্তি আছে, সর্বদা কুশল-মঙ্গল তার কাছেই থাকে। যে ভক্তির মহত্ত্ব আলোচনা করে না, প্রভু তাকে এড়িয়ে চলেন।

একদিন প্রভু তাঁর গুরু শ্রীকেশব ভারতীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—জ্ঞান এবং ভক্তির মধ্যে বড় কে? ভারতীজী ভেবেচিন্তে বললেন,—মনে মনে তত্ত্ব বিচার করে দেখলাম, সব চেয়ে ভক্তির মহত্ত্বই বেশি বলে মনে করি। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো বলেন যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। ভারতীজী বললেন,—তাদের বিচার ঠিক নয়, মহাজনদের পথে অগ্রসর হওয়াই উচিত। বৈদিক শাস্ত্রে উপদেশ করা হয়েছে মহাজনদের পথ অবলম্বন করতে। অজ্ঞ লোকেরা তা ছেড়ে অন্য পথে যায়। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ, ব্যাসদেব, শুকদেব, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, প্রিয়ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, অক্রূর, উদ্ধব—এই সকল মহাজনগণ ঈশ্বরের চরণে ভক্তি প্রার্থনা করেন। জ্ঞান বড় হলে এরা ভক্তি চাইবেন কেন? এসব মহাজনগণ কি না ভেবেই মুক্তি ছেড়ে ভক্তি চেয়েছেন? তাঁদের কথা পুরাণশাস্ত্রে আছে। ভাগবতে ব্রহ্মা ভগবানকে বলেছিলেন,—আমি ব্রহ্মা হয়েই জন্মাই কিম্বা যা-ই হই, তোমার দাস হয়ে যেন তোমাকে সর্ববিষয়ে সেবা করতে পারি। সকল মহাপুরুষগণই সব কিছু ছেড়ে কেবল মাত্র ভক্তিই চেয়েছেন। বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ ভগবানকে বলেছেন,—হে অচ্যুত, আমি হাজার বার হাজার যোনিতে জন্মালেও যেন সর্বদা তোমাতে আমার নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি থাকে। হে হৃষীকেশ, আমার নিজের কর্মফলের দ্বারা আমি যে যোনিতেই যাই না কেন, তোমার প্রতি যেন আমার দৃঢ় ভক্তি থাকে। ভাগবতে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ উদ্ধবকে বলেছিলেন,—জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের কর্মফল অনুযায়ী আমরা যে যোনিতেই ভ্রমণ করি না কেন, মঙ্গল আচরণ এবং দানাদির ফলে ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে আমাদের যেন সর্বদা অনুরাগ থাকে। তাই বলছি, সর্বমতেই ভক্তি শ্রেষ্ঠ, সর্বশাস্ত্রে মহাজনপথের এই প্রমাণ। মহাভারতের বনপর্বে আছে,—তর্কের কোন শেষ নেই, শ্রুতিসমূহও ভিন্ন ভিন্ন, যাঁর মত ভিন্ন নয় তিনি ঋষিও নন, ধর্মের তত্ত্ব গিরিগুহায় নিহিত, দুর্জ্ঞেয়—সুতরাং মহাজনগণ যেপথে গমন করেছেন সে পথই অনুসরণ করা উচিত। শ্রীকেশব ভারতীর মুখে ভক্তি বড়—এই কথা শুনে প্রভু 'হরি' বলে আনন্দে গর্জন করে বললেন,—আমি কিছু দিনের জন্য পৃথিবীতে থেকে গেলাম। যদি তুমি জ্ঞানকে বড় বলতে তাহলে আজই সমুদ্রে ডুবে মরতাম। প্রভু আনন্দে গুরুর চরণ ধরলেন, গুরুও প্রভুকে প্রীতমনে নমস্কার করলেন। প্রভু বললেন,—যার মুখে ভক্তির কথা নেই তাঁর শিক্ষা-সূত্র, তপস্যা, ত্যাগ,

সবই বৃথা। দিনরাত প্রভুর ভক্তি ছাড়া আর কিছু আলোচনা করবার নেই। ভক্তরা আর কিছুই জানেন না, সর্বদা নৃত্য-কীর্তন-গর্জন করছেন।

আনন্দে মেতে উঠে একদিন অদ্বৈতাচার্য ভক্তবৃন্দকে বললেন,——তোমরা সকলে মিলে আজ শ্রীচৈতন্যের জয়ধ্বনি দাও। আজ আর অন্য কোন অবতারের গুণকীর্তন করা হবে না, সর্ব অবতারময় শ্রীচৈতন্যের কথাই শুধু বলা হবে। তিনিই সর্ব জগৎ উদ্ধার করেছেন, আমাদের সকলের জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর আশীর্বাদেই আমরা সর্বত্র সম্মান পাচ্ছি, তিনিই সঙ্কীর্তন প্রচার করেছেন। ভয় ত্যাগ করে সিংহগর্জনে শ্রীচৈতন্যের যশ কীর্তন কর, আমি তোমাদের সঙ্গে নাচব। প্রভু সর্বদা নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, সকলেই ভয় পাচ্ছেন——তিনি হয়তো রাগ করবেন। তবু অদ্বৈতাচার্যের কথা না রেখে পারলেন না, সকলে মিলে শ্রীচৈতন্য-অবতারের বিষয় কীর্তন করতে লাগলেন। চার দিকে সবাই চৈতন্যমঙ্গল গাইছেন আর অদ্বৈত নাচছেন। নতুন অবতারের নাম-যশ শুনে বৈষ্ণবগণ আনন্দে বিহ্বল হলেন। অদ্বৈতাচার্য নিজে গান রচনা করে গাইছেন এবং অন্যদের দিয়েও গাওয়াচ্ছেন,——নারায়ণ করুণাসাগর শ্রীচৈতন্য, দীনদুঃখিদের বন্ধু, তুমি আমাকে দয়া কর। শ্রীঅদ্বৈতের মুখের এই পদ কীর্তন করলে সম্পদ লব্ধি হয়। কেউ কেউ বলছেন,——শ্রীশচীনন্দনের জয়। কেউ বলছেন,——গৌরচন্দ্র নারায়ণের জয়, পাষণ্ডীগণের কাল এবং ভক্তিপ্রিয় ও সঙ্কীর্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপালের জয়। পরম উদ্দাম অদ্বৈত চৈতন্যের গুণ কর্ম-নাম নিয়ে নেচে চলেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে গাইছেন,——শ্রীচৈতন্য পুলকে গড়াগড়ি যাচ্ছেন, বৈকুণ্ঠনায়ক হরি দ্বিজ রূপে অবতীর্ণ হয়ে সঙ্কীর্তন-লীলা করছেন। সোনার চেয়েও উজ্জ্বল কান্তি, গলায় অজানুলম্বিত মালা, সন্ন্যাসীর রূপে আপন রসে সুখে নাচছেন। বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপচন্দ্র করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সম্প্রতি এসেছ, তুমি তোমার চরণকমলের ছায়া আমাদের দান কর। ভক্তগণ এই ভাবের কীর্তন করছেন এবং অদ্বৈত চৈতন্যচরণ চিন্তা করে নাচছেন। নতুন অবতারের যশকীর্তন শুনে বৈষ্ণবগণ উল্লাসে জয়ধ্বনি করছেন। এই কীর্তনে অত্যন্ত আনন্দ হয়েছে, শ্রীনিত্যানন্দই একমাত্র এ বিষয়ে বর্ণনা করতে পারেন। কীর্তনের পরম উদ্দাম ধ্বনি শুনে সন্ন্যাসীচূড়ামণি শ্রীচৈতন্য সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। প্রভুকে দেখে ভক্তবৃন্দ আরো আনন্দে গাইতে লেগেছেন, অদ্বৈতও হর্ষিত নাচছেন। সকলেই আনন্দে মগ্ন, প্রভুকে কেউ ভয় পাচ্ছেন না, তাঁর সামনেই শ্রীচৈতন্যের নাম-গুণ মহিমা কীর্তন করছেন। প্রভু সর্বদা দাস্যভাবে থাকেন, তিনি বলেন,——আমি কৃষ্ণদাস। কারো এমন শক্তি নেই যে তাঁর সামনে তাঁকে 'কৃষ্ণদাস' ব্যতীত 'ঈশ্বর' বলে উল্লেখ করেন। তবু অদ্বৈতাচার্যের সাহসে তাঁরা চৈতন্য-হরির কীর্তন করছেন। প্রভু এসব শুনে লজ্জা পেলেন। তিনি শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব নিয়েছেন তাই তিনি নিজের বিষয়ে কীর্তন শুনে বাসায় চলে গেলেন, সেখানে থাকলেন না। তবু কিন্তু কেউ ভয় পেলেন না, চৈতন্যবিজয় গেয়ে চলেছেন। আনন্দে কারো বাহ্যজ্ঞান নেই, সকলেই দেখছেন——প্রভু কীর্তনের মধ্যেই রয়েছেন। সকলেই মত্ত হয়ে চৈতন্যগান গাইছেন, ভাগ্যবানেরা শুনে খুশি হচ্ছেন, পাপীদের দুঃখ হচ্ছে। শ্রীচৈতন্যের যশকীর্তন শুনে যে আনন্দ পাবে না তার ব্রহ্মচর্য এবং সন্ন্যাসে কিছু ফল হবে না। ভক্তবৃন্দ অতি আনন্দে সর্বদা শ্রীহরিসঙ্কীর্তন করছেন। এই আনন্দকীর্তনের কাহিনী পাঠ করলে অথবা শ্রবণ করলেও এই ভক্তগোষ্ঠীতে এসে মিলিত হতে পারে।

মহাভক্তবৃন্দ আনন্দকীর্তন করে প্রভুকে দর্শন করতে এলেন। শ্রীচৈতন্য নিজবিষয়ে কীর্তন শুনে সকলকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে শুয়ে আছেন। প্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দ জানালেন,—বৈষ্ণবেরা দরজায় অপেক্ষা করছেন। প্রভু গোবিন্দকে আজ্ঞা করলেন সকলকে ভিতরে নিয়ে আসতে কিন্তু তিনি শুয়েই রইলেন, কারো দিকে তাকালেনও না। ভক্তরা ভয় পেয়ে গৌরচরণ চিন্তা করতে লাগলেন। একটু পরে ভক্তবৎসল প্রভু উঠে বললেন,—ওহে বৈষ্ণবগণ, ওহে শ্রীবাস পণ্ডিত, আজ তোমরা কি কাণ্ড করলে? তোমরা কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকীর্তন ছেড়ে কী গাইলে বলতো? মহাবক্তা শ্রীবাস বললেন,—বস্তুত জীবের কিছু মাত্রও স্বতন্ত্র শক্তি নেই। ঈশ্বর যা করিয়েছেন যা বলিয়েছেন তাই আমরা বলেছি। প্রভু বললেন,—তোমরা পণ্ডিত হয়ে এটা ঠিক করোনি, যে লুকিয়ে থাকতে চায় তাকে বাইরে জানিয়ে দিলে কেন? প্রভুর কথা শুনে শ্রীবাস পণ্ডিত হাতের আড়াল দিয়ে সূর্যের আলো ঠেকাতে চাইলেন। আর তিনি একটু একটু হাসছেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—হাত দিয়ে কি সঙ্কেত করলে বুঝিয়ে বল দেখি। শ্রীবাস উত্তর দিলেন,—হাত দিয়ে সূর্যকে ঢাকতে চেয়েছি। তবে তুমি জেনে রাখ যে হাত দিয়ে কখনো সূর্যকে ঢেকে রাখা যায় না, তেমনি তোমাকেও লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। সূর্যকে যদিও হাতে আড়াল করে রাখা যায় কিন্তু তোমাকে কখনো আড়াল করা যাবে না। তুমি ক্ষীরোদসাগরে লুকিয়ে থাকতে পারলে না, আর এখন পৃথিবীতে এসে কি করে লুকিয়ে থাকবে? সুমেরু পর্বত থেকে সেতুবন্ধ পর্যন্ত তোমার নির্মল যশে ভরে গেছে। সারা দুনিয়াতে তোমার খবর ছড়িয়ে পড়েছে, তুমি কত জনকে শাস্তি দেবে? ভগবান সব সময়ই ভক্তের মহিমা প্রচার করেন। শ্রীবাস পণ্ডিত যখন তাঁর কথা শেষ করলেন তখনই প্রভুর দরজায় এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা দিল। হাজার হাজার লোক জগন্নাথ দর্শন করে প্রভুকে দর্শন করতে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ত্রিপুরার, কেউ চট্টগ্রামের, কেউ শ্রীহট্টের, অন্যেরা পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানের। হাজার হাজার লোক শ্রীচৈতন্য অবতার বর্ণনা করে কীর্তন করতে লেগেছেন,—বৈকুণ্ঠবিহারী দ্বিজরাজ, নিজভক্তিরসকূতূহলী, পরমসন্ন্যাসীরূপধারী, সঙ্কীর্তনরসিক মুরারি, জগতের উপকারী, শচীনন্দন, বনমালী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় হোক। কত সহস্র লোক এই ভাবে গাইছে। শ্রীবাস বললেন,—প্রভু, এখন কি করবে? সকলেই তো গাইছে, লুকুবে কোথায়? আমি তো আর এদের সবাইকে শিখিয়ে দিই নি? সারা সংসারের লোক এখন এ রকমই গাইছে। তুমি অদৃশ্য এবং অব্যক্ত হয়েও করুণায় জীবের সাক্ষাৎ হয়েছ। তুমি নিজের ইচ্ছাতেই প্রকাশিত হও, আবার নিজের ইচ্ছাতেই অদৃশ্য হয়ে থাক, তুমি যাকে অনুগ্রহ কর কেবল সেই এসব বিষয় জানতে পারে। প্রভু শ্রীবাসকে বললেন,—তুমি নিজশক্তি প্রকাশ করে লোককে দিয়ে এসব বলাচ্ছ। তুমি সর্বশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত, তোমার কাছে আমি হেরে গেলাম। প্রভু সব সময়ই ভক্তের মহত্ত্ব বৃদ্ধি করেন, এই তাঁর স্বভাব, বেদে ভাগবতে তাই আছে। প্রভু হাসি মুখেই সকল বৈষ্ণবকে বিদায় জানালেন, সকলে বাসায় চলে গেলেন। শ্রীচৈতন্য এই রকমই ভক্তবৎসল, তাই সকলে তাঁকে কৃষ্ণ বলে মান্য করে। নিত্যানন্দ অদ্বৈতের মত মহান ব্যক্তিগণও বলছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান। দেবতুল্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতের কথা না মেনে যে অন্যকে কৃষ্ণ বলে মনে করে তার মত অভাগা নেই। অনন্ত শয্যায় শয়নকারী, শ্রীবৎসচিহ্ন ভূষিত, লক্ষ্মীদেবীর পতি, গরুড়বাহন, কৌস্তুভভূষণ—এ সবই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়, তাঁরই পাদপদ্ম থেকে গঙ্গার উৎপত্তি। শ্রীচৈতন্য ভিন্ন অন্যে তা সম্ভবে না, বেদে শাস্ত্রে বৈষ্ণবগণের

বাক্যে তাই পাওয়া যায়। সর্ববৈষ্ণবের বাক্যে যার শ্রদ্ধা আছে সেই সর্বত্র বিশেষ জয় লাভ করে।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর চন্দ্রমণ্ডলীর মত ভক্তবৃন্দকে নিয়ে বসে নিরবধি কৃষ্ণকথা আলাপ করছেন আর হরিধ্বনি দিচ্ছেন। এমন সময় দুই মহাভাগ্যবান এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। সনাতন আর রূপ দুই ভাই, প্রভু দুজনের প্রতিই কৃপাদৃষ্টিপাত করলেন। দন্তে তৃণ নিয়ে দুই ভাই দূর থেকে মিনতি করে বললেন,—দীনবৎসল, জগতহিতকারী, পরম-সন্ন্যাসী রূপধারী, সঙ্কীর্তনবিনোদ, সর্বলোকধন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জয় হোক। তুমি বৈষ্ণবরূপে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তি দিয়ে সারা পৃথিবীকে উদ্ধার করছ। আমরা তো আর পৃথিবীর বাইরের নই, আমাদেরও উদ্ধার কর। আজন্ম বিষয়ভোগে মত্ত হয়ে নিজহিতার্থেও তোমার চরণ ভজনা করি নি। তোমার ভক্তদের সঙ্গে মিশি নি, কীর্তন করি নি—শুনি নি। বড় রাজকর্মচারী করে দিয়ে আমাদের তুমি বঞ্চনা করেছ। তাহলে আমাদের মনুষ্য জন্ম কেন দিলে? দেবতারাও যে মনুষ্যজন্ম কামনা করেন, আমাদের সেই মানুষ করে গড়ে আবার বঞ্চনা করলে কেন? তুমি আমাদের অকপটে এই কৃপা কর যেন আমরা তোমার নাম নিয়ে গাছতলাতেও থাকতে পারি। তোমার যে প্রিয়ভক্ত তোমার নাম এবং কথা উপদেশ করেন, আমরা যেন তাঁর অবশেষ পাত্র হতে পারি। রূপ ও সনাতনের স্তুতি শুনে সদয় হয়ে প্রভু বললেন,—তোমরা দু ভাই বড়ই ভাগ্যবান, সংসার বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়তে পেরেছ। সংসারে সকলেই বিষয় বন্ধনে আবদ্ধ, তোমরা দুজন তা থেকে পার পেয়েছ। যদি প্রেমভক্তি চাও তাহলে অদ্বৈতাচার্যের চরণ ধরে পড়ে থাক। অদ্বৈত হচ্ছেন ভক্তির ভাণ্ডারী, এঁর কৃপা হলে কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায়। প্রভুর কথা শুনে দুজন অদ্বৈতকেই ধরলেন,—আমরা দু ভাই মহা পতিত, আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা কর। প্রভু তখন অদ্বৈতাচার্যকে বললেন—কলিকালে এমন বিষয়ে স্পৃহাহীন লোক তুমি চট্ করে পাবে না। এঁরা দুভাই রাজকর্মচারীর উচ্চপদ ত্যাগ করে দিয়ে, কাঁথা-করঙ্গ নিয়ে মথুরায় থেকে কৃষ্ণনাম নিচ্ছেন। অকপটে এই দুজনকে কৃষ্ণভক্তি দান কর যেন আর কোন জন্মেই শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে না যায়। তুমি ভক্তির আড়তদার, তুমি না দিলে কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত এবং কৃষ্ণভক্তি এরা পাবেন কি করে? অদ্বৈতাচার্য বললেন,—প্রভু, তুমিই সর্বদাতা, তুমি আজ্ঞা করলেই আমি দিতে পারি। মালিক হুকুম দিলেই আড়তদার দরজা খুলে দিতে পারে। যাকে দিতে বলবে তাকেই দেব। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—এই দু ভাইয়ের প্রেমভক্তি লাভ হোক। অদ্বৈতের কৃপাবাণী শুনে প্রভু উচ্চ হরিধ্বনি দিয়ে বাদশার একান্ত সচিব রূপকে বললেন,—তোমার, কৃষ্ণভক্তি পেতে আর কোন বাধা নেই। অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত, এঁর আশীর্বাদেই প্রেমভক্তি লাভ হয়। কিছুদিন এখানে থেকে জগন্নাথ দর্শন করে তারপর মথুরায় গিয়ে বাস কর। তোমরা পশ্চিম ভারতের রাজসিক তামসিক গুণ সম্পন্ন লোকদের মধ্যে ভক্তিধর্ম প্রচার করতে থাক। আমি মথুরায় গিয়ে দেখা করব, আমার জন্য একটি নির্জন স্থানের ব্যবস্থা করে রেখ। শাকর মল্লিক বা প্রধানমন্ত্রী নাম ঘুচিয়ে প্রভু নাম রাখলেন সনাতন। আজপর্যন্ত এই দুই ভাই মনুষ্য সমাজে রূপ সনাতন নামে বিখ্যাত। চৈতন্যদেব ভক্তগণের উপর ভক্তি মহিমা প্রচার করেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের মহত্ত্ব প্রভু নিজেই প্রচার করেছেন। সন্তুষ্ট হয়েই তিনি তা করেন। কোন্ ভক্ত আগে কি ছিলেন, কোথায় অবতীর্ণ হয়েছেন, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী কার কি অংশে জন্ম, কার কি মহত্ত্ব - শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

সবই ব্যক্ত করলেন।

একদিন প্রভু অদ্বৈত শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দকে নিয়ে বসে আছেন, এমন সময় তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা পণ্ডিত, বল তো, অদ্বৈতকে তুমি কি রকম বৈষ্ণব মনে কর? শ্রীবাস ভেবেচিন্তে বললেন,—আমার মনে হয় ইনি শুকদেব কিংবা প্রহ্লাদ। এই কথা শুনে প্রভু শ্রীবাসকে পুত্রস্নেহে এক চড় মেরে বললেন,—কি বললে? আমার নাড়াকে তুমি শুক বা প্রহ্লাদ মনে করলে? শুকদেব তো কালকের ছেলে, নাড়ার সঙ্গে তার তুলনা চলে না। শ্রীবাস, তুমি আমাকে বড় দুঃখ দিলে। এই বলে প্রভু রাগে মশালের লাঠি নিয়ে শ্রীবাসকে মারতে তাড়া করলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর হাত ধরে বললেন,—ত্রিভুবনের কারো প্রতিই তোমার ক্রোধ করা ঠিক নয়। বালককে স্নেহ-যত্নে শিখিয়ে দিতে হয়। আচার্যের কথায় প্রভু শান্ত হয়ে আবেশে বলতে লাগলেন,—তুমি একে ছেলের মত স্নেহ কর জেনে আমার রাগ চলে গেল। আমার নাড়ার তত্ত্ব কেউ জানে না। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে সেই আমাকে এই ব্রহ্মাণ্ডে এনেছে। তারপর প্রভু শ্রীবাসকে বললেন,—তুমি নাড়ার তত্ত্ব জান না, শুকদেব প্রমুখ এঁর কাছে বালক মাত্র। অদ্বৈতের কারণেই আমার এই অবতার। তাঁর হুঙ্কার শুনেই আমি ক্ষীরোদসাগর থেকে জেগে উঠেছি। সেই আমাকে এনেছে।

শ্রীবাস অদ্বৈতকে খুবই ভালবাসেন। প্রভুর কথায় তাই তিনি খুব খুশি হয়েছেন। ভয়ে কেঁপে শ্রীবাস বললেন,—প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার অদ্বৈত-তত্ত্ব তুমিই জান। তুমি জানালেই তোমার অন্য দাসেরা জানতে পারে। আমার সৌভাগ্য যে তুমি আজ আমাকে জানিয়ে আমার মঙ্গল সম্পাদন করলে। এখন আমি ভরসা করে বলতে পারি, অদ্বৈত যদি নিতান্ত গর্হিত কাজও করেন তবু তাঁকে আমি ভক্তি করব। প্রভু শ্রীবাসের কথায় খুশি হয়ে আবার আগের মত তিন জনে সানন্দে বসলেন। এ সকল পুণ্যকথা অতীব রহস্যময়, শুনলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

কার কেমন ভক্তি, কেমন শক্তি, কতটা প্রভাব—সর্বজ্ঞ প্রভু তা সবই জানেন। আর যে ভক্ত তাঁকে অকপটে ভজনা করেন তিনিও জানেন। বেদের কথা-মত বিষ্ণুতত্ত্ব যেমন মানুষে জানতে পারে না, তেমনি বৈষ্ণবের তত্ত্ব সাধারণে জানতে পারে না। সিদ্ধবৈষ্ণবের বিষম ব্যবহার বিষয়ে সাধারণ লোকেরা না জেনে নিন্দা করে নিজেরাই দুঃখ ভোগ করে। সিদ্ধবৈষ্ণবের বিষম ব্যবহারের কথা ভাগবতেই উল্লেখ আছে। ব্রহ্মার পুত্র শ্রেষ্ঠবৈষ্ণব ভৃগু দিবারাত্র যাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করেন সেই প্রভুর বক্ষেই তিনি পদাঘাত করলেন। তবু তিনি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। প্রসঙ্গত ভৃগুর সেই কাহিনীটি ভাগবত থেকে বলা হচ্ছে।

সরস্বতী নদীর পূর্বতীরে মহর্ষিগণ মহাযজ্ঞ পুরাণশ্রবণ আরম্ভ করলেন। তাঁরা সকলেই শাস্ত্রকর্তা, মহাতপস্বী। তাঁরা বিচার করতে লাগলেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—এই তিন জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? একেক জন একেক রকম কথা বলছেন। পুরাণেও নানা রকম বলা আছে। কোন পুরাণে শিবকে বড় এবং কোন পুরাণে নারায়ণকে বড় বলা হয়েছে। তাই ঋষিগণ সকলে মিলে ভৃগুকে সম্মান জানিয়ে গিয়ে বললেন,—তুমি ব্রহ্মার মানসপুত্র, তুমি সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সব তত্ত্ব তুমি জান। তুমি আমাদের সন্দেহ দূর কর। তুমি যা বলবে আমরা তাই মেনে নেব। এই কথা শুনে ভৃগু ব্রহ্মার কাছে গেলেন। অহংকার নিয়েই গেলেন। ব্রহ্মা খুশি হয়ে পুত্রকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু পুত্র পিতার

সত্ত্ব পরীক্ষা করার জন্য পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন না। সাধারণত পুত্র পিতাকে যেমন সম্মান দেখাবার কথা ভৃগু তা কিছুই করলেন না, প্রণাম পর্যন্ত করলেন না। ব্রহ্মা রাগে আগুন হয়ে গেলেন। পিতার ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে ভৃগু পালিয়ে গেলেন। সকলে মিলে ব্রহ্মাকে শান্ত করতে লাগলেন,—ছেলেকে কি এমন রাগ করতে আছে? ব্রহ্মা ঠাণ্ডা হলেন। ব্রহ্মার অবস্থা বুঝে নিয়ে ভৃগু এবারে কৈলাসে এলেন শিবকে পরীক্ষা করতে। ভৃগুকে দেখে মহেশ্বর আনন্দিত হয়ে পার্বতীকে নিয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করতে এগিয়ে এলেন। ত্রিলোচন ভৃগুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শিব অনুজকে আলিঙ্গন করতে এগোলেন। কিন্তু ভৃগু বলে উঠলেন,—মহেশ, আমাকে ছোঁবে না। যত রকম বেদবিরোধী বেশ আছে তুমি তা সবই ধারণ করেছ। ভূত প্রেত পিশাচ যত অস্পৃশ্য পাষণ্ডগণকে নিয়ে তুমি থাক। তুমি অশাস্ত্রীয় আচার-আচরণ কর। শ্মশানের ছাই আর হার-গোড় পরে থাকা কোন শাস্ত্রে আছে, বল? ভূতের রাজা, তুমি দূরে সরে থাক, তোমাকে ছুঁলে আমার চান করতে হবে। ভৃগুমুনি কখনো শিবনিন্দা করেন না, তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য মজা করে এসব বলেছেন। কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব ভৃগুমুণির কথায় ভীষণ রেগে গিয়ে ত্রিশূল তুলে নিলেন। দাদাকে যথার্থ সম্মান না দেখানোতে শঙ্কর সংহার মূর্তি ধারণ করলেন। শিব ত্রিশূল তুলতেই পার্বতী এসে তাঁর হাত ধরে ফেললেন। বাধা দিয়ে মহেশ্বরী তাঁকে চরণে ধরে বললেন,—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কি এতটা রাগ করা চলে? দেবীর কথায় শঙ্কর লজ্জা পেলেন, ভৃগুও বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণধামে চললেন। প্রভু রত্নসিংহাসনে শুয়ে রয়েছেন, লক্ষ্মীদেবী তাঁর শ্রীচরণ সেবা করছেন। এমন সময় ভৃগু এসে হঠাৎ প্রভুর বুকে পদাঘাত করলেন। ভৃগুকে দেখে প্রভু সম্ভ্রম জানিয়ে উঠে মহাপ্রীতিতে নমস্কার করলেন। সন্তুষ্ট মনে লক্ষ্মীদেবী ও প্রভু একত্রে ভৃগুর পাদপ্রক্ষালন করতে লাগলেন। উত্তম আসন এনে বসতে দিয়ে গায়ে চন্দন লেপন করলেন। প্রভু বিনয় বচনে ভৃগুকে নিবেদন করলেন,—তোমার শুভাগমন লক্ষ্য না করে আমি অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার এই পাদোদক পুণ্যজল এতই সুনির্মল যে এর দ্বারা তীর্থও মহাতীর্থে পরিণত হয়। আমার দেহের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং আমার সঙ্গে যত লোকপাল আছেন তাঁদের সকলকেই তুমি পাদোদক দিয়ে পবিত্র করলে। তোমার চরিত্র অক্ষয় হয়ে থাকুক। তোমার চরণচিহ্ন এবং চরণধূলি আমি সানন্দে বক্ষে রেখে দিলাম। বেদে যেমন আমাকে 'শ্রীবৎসলাঞ্ছন' বলে তেমনি,—ভৃগু 'ভগবান-বুকে এঁকে দিল পদচিহ্ন'—একথাও মনুষ্য সমাজে প্রচারিত হবে। তাই লক্ষ্মীর সঙ্গে এই পদচিহ্ন আমি বুকে স্থান দিলাম। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের অতীত প্রভুর এই বিনীত বাক্যে মহর্ষি ভৃগু লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে থাকলেন। ভৃগু স্বাভাবিক ব্যবহার করেন নি, মুনিগণের অনুরোধে ভগবত্তার পরীক্ষা করবার ভাবে আবিষ্ট হয়ে এই কাজ করেছেন। আবেশের বশে তিনি বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন, বাহ্যজ্ঞান পেয়েই ভৃগু নারায়ণের প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে নাচতে লাগলেন। মহাভাগবত ব্রহ্মার কুমার ভৃগু হাস্য কম্প ঘর্ম মূর্ছা পুলক এবং হুঙ্কারে মগ্ন হলেন। এবারে ব্রহ্মার নন্দন—'শ্রীকৃষ্ণ সকলের ঈশ্বর, সকলের জীবন' বলে নাচতে লাগলেন। ভৃগু শ্রীকৃষ্ণের শান্ত-বিনয় ব্যবহার দেখে ভাবছেন যে এমন বিপ্রভক্তি আর কোথাও দেখেন নি। ভৃগু প্রেমভক্তির প্রভাবে হতবাক্ হয়ে গেলেন, তাঁর চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ধারা বইতে লাগল। সর্বভাবে ঈশ্বরকে দেহ-মন সমর্পণ করে ভৃগু আবার সরস্বতীতীরে মহর্ষিদের সভায় ফিরে এলেন। ভৃগুকে দেখে সকলেই আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞাসা

করলেন,—বল ভৃগু, তুমি কার কি ব্যবহার দেখলে। তোমার কথাকেই আমরা প্রমাণ বলে মনে করি। ভৃগু তখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তিনজনের ব্যবহারের কথা বললেন। সব জানিয়ে শেষকালে ভৃগু বললেন,—আমি তিন সত্য করে বলছি, বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণই সর্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণই সকলের জনক, তিনিই সকলের ঈশ্বর। ব্রহ্মা এবং শিবও তাঁর আজ্ঞা পালন করেন। নারায়ণই সকলের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কর্তা, নিঃসন্দেহে তাই তোমরা গিয়ে তাঁর চরণ ভজনা কর। ধর্ম, জ্ঞান, পুণ্য, কীর্তি, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, নিজের শক্তি মধ্যবর্তী শক্তি ও শ্রেষ্ঠ শক্তি—যত কিছু ঐশ্বর্য আছে সবই শ্রীকৃষ্ণের, একথা নিশ্চিতরূপে জানবে। তাই বলছি, এখন থেকে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে তোমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা কীর্তন কর এবং তাঁকেই ভজনা কর। সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এবারের শ্রীচৈতন্য, সংকীর্তন লীলাকরে তিনি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। ভৃগুর কথা শুনে ঋষিগণ নিঃসন্দেহ হলেন যে, নারায়ণই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভৃগুকে সম্বর্ধনা জানিয়ে ঋষিবৃন্দ বললেন,—তুমি আমাদের মনের সন্দেহ কাটিয়ে পরম উপকার করেছ। আমাদের মনকে নির্মল করেছ। তখন সকলেই অত্যন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করলেন। তাঁরা সযত্নে ব্রহ্মা এবং শিবের পূজাও করেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিবকে কৃষ্ণভক্তরূপেই পূজা করেন।

ভৃগু-তুল্য সিদ্ধবৈষ্ণবগণের বিষম ব্যবহার সাধারণ লোকেরা ধরতে পারে না। আর কোন ভাবে কি নারায়ণকে পরীক্ষা করা যেত না, তার জন্যে লাথি মারবার দরকার হল? যাঁর অনুগ্রহে ভৃগু নিজেই সৃষ্ট হয়েছেন, কোন্ সাহসে, তাঁর বুকে পা ঠেকালেন? এ প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া যায়? উত্তর একটাই যে,—পরম ভক্তের ব্যবহার বুঝতে পারা যায় না। এ কথা ছাড়া আর কিছু বলবার নেই। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণই ভৃগুর হৃদয়ে প্রবেশ করে ভক্তির মহিমা প্রকাশ করলেন। ভৃগু সজ্ঞানে একাজ করেন নি, শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির উচ্চ অধিকারী ভক্তের উৎকর্ষ খ্যাপণ করেছেন। ব্রহ্মা এবং শিব কৃষ্ণের জয় ঘোষণা করার জন্যই ইচ্ছে করে ভৃগুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ভক্তগণ যেমন সর্বদা কৃষ্ণের উৎকর্ষ বা মহিমা কীর্তন করেন তেমনি কৃষ্ণও সর্বদা ভক্তের মহিমা প্রচার করে থাকেন। পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণের আচরণাদি না বুঝে নিন্দা করলে তার আর রক্ষা নেই। ভাগবতগণও অনেক সময় সাধারণের মত কাজ করেন। কৃষ্ণকৃপায় এসব বুঝতে পারা যায়, এই জাতীয় সঙ্কটে পড়ে অনেকে ডুবে যায়, কেউ কেউ উদ্ধারও পায়। এর প্রতিকারের পথ একটাই। তা কি? না, সকলের সঙ্গে বিনয় ব্যবহার করা। 'আমি অজ্ঞ' এই মনোভাব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিতে হবে এবং অতি মনোযোগ সহকারে ভাগবতগণের কথা শুনতে হবে। তাহলেই শ্রীকৃষ্ণ তাকে এমন বুদ্ধি যোগাবেন যে তিনি আর কোথাও ঠেকবেন না, সমস্ত রকমের বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবেন। ভক্তি করে যাঁরা চৈতন্য অবতার-কথা শুনবেন তাঁরা অবশ্যই সুখে নিস্তার লাভ করবেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং নিত্যানন্দচন্দ্র জানেন যে কবি বৃন্দাবনদাস সাক্ষাৎ তাঁদের পদকমলেই তার সমস্ত গীত নিবেদন করেছেন।

৩/১১ একদিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দে পরিবৃত হয়ে বসে কৃষ্ণকথাদি আলোচনা করছেন। এমন সময় অদ্বৈতাচার্য এসে সেখানে প্রভুকে প্রণাম করে বসলেন। প্রভু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি কাজ করে এলে? কোথা থেকে এলে? অদ্বৈত বললেন,—জগন্নাথ দর্শন করে তোমার কাছে এলাম। প্রভু [illegible] করলেন, [illegible] জগন্নাথ

দর্শন করে আর কি করলে তাই বল। অদ্বৈত উত্তর দিলেন,—জগন্নাথ দর্শন করে পাঁচ-সাত বার প্রদক্ষিণ করলাম। প্রভু প্রদক্ষিরের কথা শুনে হেসে বললেন,—তুমি হেরে গেছ। আচার্য বললেন,—আমি কি করে হারলাম সেটা বুঝিয়ে বল। প্রভু উত্তর করলেন,—প্রদক্ষিণ করার সময় যতক্ষণ পিঠের দিকে ছিলে ততক্ষণ দর্শন করতে পাও নি। আমি কিন্তু যখনই দর্শন করতে যাই, একদৃষ্টে চেয়েই থাকি, একবারও চোখ ফেরাতে পারি না। জগন্নাথের মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকি, ডাইনে-বামে কোথাও তাকাই না। করজোড় করে অদ্বৈতাচার্য বললেন,—তোমার কাছে এ কথা শুনে আমি অবশ্যই হার মানলাম। তুমি ছাড়া ত্রিভুবনে এমন কথা আর কেউ বলতে পারে না। তুমি এ ব্যাপারে একমাত্র অধিকারী, আর কারো এমন কথা বলার অধিকার নাই। তাই তোমার কাছে আমাকে অবশ্যই হার মানতে হয়। বৈষ্ণবগণ এই কথা শুনে ঈষৎ হেসে মাঙ্গলিক হরিধ্বনি করে উঠলেন। অদ্বৈতের সঙ্গে প্রভুর এই রকম নানা বিচিত্র কথাবার্তা হয়।

একদিন গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী মহাপ্রভুর সঙ্গে দীক্ষামন্ত্র পুনরুদ্ধার বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। গদাধর বললেন,—আমি অন্য লোকের কাছে ইষ্টমন্ত্র ব্যক্ত করেছি, সেই থেকে আমার চিত্তে ইষ্ট দেবতার মূর্তি স্ফুরিত হচ্ছে না। তাই তুমি আমাকে মন্ত্র পুনরুদ্ধার করে দাও, তাহলে আমার মন প্রসন্ন হবে। প্রভু বললেন,—তোমার মন্ত্রদাতা গুরু প্রকট থাকতে তা হয় না। অপরাধ হবে। তোমাকে মন্ত্র দেব কি? তোমার এবং আমার তো একই প্রাণ। তুমি আমি অভিন্নপ্রাণ। গদাধর বললেন,—আমার গুরু তো এখানে নেই। তাঁর পরিবর্তে তুমি কর। প্রভু বললেন,—তোমার দীক্ষাগুরু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভগবানের ইচ্ছায় শীঘ্রই এখানে আসবেন। সর্বজ্ঞ-চূড়ামণি প্রভু সবই জানেন। তিনি বললেন,—গদাধর, তুমি দেখবে, দিন-দশেকের মধ্যেই বিদ্যানিধি মশাই এখানে চলে আসবেন, আমাকে দেখতেই আসবেন। বিদ্যানিধির কথা আমারও সব সময় মনে পড়ছে। বুঝলাম, তুমিই তাঁকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসছ।

প্রভু এই ভাবে তাঁর প্রিয় গদাধরের সঙ্গে নানা আলাপ করেন এবং গদাধরের মুখে ভাগবত পাঠ শোনেন। গদাধর সামনে ভাগবত পাঠ করেন, প্রভু শোনেন। শুনে বারবার কৃষ্ণভাব প্রকাশ করেন। তিনি পুনঃ পুনঃ একাগ্রচিত্তে প্রহ্লাদচরিত্র এবং ধ্রুবচরিত্র শোনেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা শ্রবণই একমাত্র কর্তব্য স্থির করেছেন, আর কিছুই করছেন না। গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী ভাগবত পাঠ করছেন, স্বরূপদামোদর কীর্তন করছেন। স্বরূপদামোদর একাই গান করেন আর শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর সঙ্গে নাচেন। অশ্রু কম্প হাস্য মূর্ছা পুলক হুঙ্কার—যত কিছু প্রেমভক্তির চিহ্ন আছে সবই প্রকাশিত হয় প্রভুর। তিনি সেই প্রেমভক্তির ভাবেই নৃত্য করতে থাকেন। স্বরূপদামোদরের উচ্চ সঙ্কীর্তন শুনলে প্রভুর আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তিনি তখনই নৃত্য আরম্ভ করেন। প্রভুর যত সন্ন্যাসী পার্ষদবৃন্দ আছেন, স্বরূপদামোদরের সঙ্গে কারো তুলনা চলে না। পুরীগোস্বামী এবং স্বরূপদামোদরের প্রতি মহাপ্রভুর সমান প্রীতি। দামোদর পরম-মধুর সঙ্গীতে অত্যন্ত নিপুণ, তাঁর গান শুনলেই প্রভু নৃত্য করেন। স্বরূপদামোদরের বাইরের রূপ দেখে তাঁর চিত্তের গূঢ় ভাব কেউ জানতে পারত না। তাঁর কীর্তনের শক্তি ছিল কীর্তন-বিশারদ তুম্বুরু ও নারদের তুল্য, তিনি একা কীর্তন করেই প্রভুকে প্রেমোন্মত্ত করে নৃত্য করিয়ে থাকেন। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি থাকতে পারে? প্রভুর সঙ্গী সন্ন্যাসিদের মধ্যে একমাত্র শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী গোস্বামী ব্যতীত আর কেউ স্বরূপদামোদরের মত প্রভুর এমন

প্রিয়পাত্র ছিলেন না। প্রভুর সন্ন্যাসী পার্ষদগণের মধ্যে এই দুজনই প্রভুর অত্যন্ত প্রীতির অধিকারী ছিলেন। দুজন সর্বদা প্রভুর কাছে থাকেন, প্রভুর সন্ন্যাস নেবার কথা শুনে স্বরূপদামোদর বারাণসীতে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। পুরীগোস্বামী আগে থাকতেই সন্ন্যাসী ছিলেন। পুরীগোস্বামী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণে ধ্যানপরায়ণ, স্বরূপদামোদরের মুখ্য কাজ ছিল কীর্তন, প্রভুর সন্ন্যাসী-দেহের দুই বাহু ছিলেন এই দুজন। গৌরচন্দ্র অহর্নিশ সঙ্কীর্তনরঙ্গে স্বরূপদামোদরের সঙ্গে বিহার করতেন। শয়নে, ভোজনে, পর্যটনে প্রভু কখনো স্বরূপদামোদরকে ছাড়তেন না। সন্ন্যাস নেওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য আর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ছিল তাঁর প্রিয়সখা। প্রভু পথে যেতে যেতেও স্বরূপদামোদরের গানে বিহ্বল হয়ে নাচতে থাকেন। জলে-স্থলে, বনে-বাদাড়ে কোথায় প্রভু আনন্দে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গর্জন করতে থাকেন কেউ জানতেও পায় না, স্বরূপদামোদর সঙ্গে থাকেন বলেই তাঁকে ধরে তোলেন। কীর্তনও চলতে থাকে। এই অসীম অনুপম সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন শ্রীস্বরূপদামোদর।

একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হয়ে কুয়োর মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। অদ্বৈত প্রমুখ পার্ষদগণ এই অবস্থায় তাঁকে দেখে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে থাকেন। প্রভু এর কিছুই জানেন না, তিনি ছেলেদের মত কুয়োর মধ্যে ভাসছেন। প্রভুর লীলাশক্তির প্রভাবে তখনই কুয়োটি মাখনের মত কোমল হয়ে গেল, তাই প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কোনরূপ ক্ষত হয় নি। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার এমন কিছু নেই। কারণ, প্রভুর আশীর্বাদে কোন বৈষ্ণব কাঁটার পথে নাচলেও তাঁর গায়ে কাঁটা ফোটে না। আর প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঘাত লাগবে কি করে? অদ্বৈত প্রমুখ ভক্তগণ প্রভুকে ধরে কুয়ো থেকে তুললেন। কুয়োর মধ্যে যে পড়েছেন, প্রভু তা জানেন না। প্রভু নিজেই জিজ্ঞেস করছেন,—কি ব্যাপার, কি হয়েছে? প্রেমভক্তির প্রভাবে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। প্রভু সর্বজ্ঞ হয়েও যেন কিছুই জানেন না, সেভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর শ্রীমুখের অতি-অমৃত-বচন শুনে অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ ভক্তবৃন্দ আনন্দে ভাসতে থাকেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কথা প্রভু ভাবছিলেন, প্রভুর প্রভাবে বিদ্যানিধি তা আন্তরিক ভাবে উপলব্ধি করলেন। প্রভু তাঁর কথা ভাবতেই তিনি নীলাচলে এসে উপস্থিত হলেন। বিদ্যানিধিকে দেখেই প্রভু,—বাপ এসেছে, বাপ এসেছে, বলতে লাগলেন। বিদ্যানিধি এখন প্রেমনিধি হলেন, তাঁর হৃদয় আনন্দে ভরে গেল। ভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র প্রেমনিধিকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। বৈকুণ্ঠের সুখের মতই সুখ লাভ করে বৈষ্ণবগণ সকলে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। প্রভুর সঙ্গী ভক্তগণ সকলেই প্রেমনিধিকে ভক্তি করেন। স্বরূপদামোদর প্রেমনিধির বন্ধু ছিলেন। চৈতন্যের আগেই তাঁদের দুজনের দেখা হয়েছিল। দুজন দুজনকে ঠেলে ফেলে পরস্পরের পদধূলি নিতে চাইছেন। দুজনের গায়েই বেশ জোর আছে, কেউ কাউকে হারাতে পারছেন না। শ্রীগৌরাঙ্গই আমোদ করে এসব করাচ্ছেন। প্রভু বাহ্যজ্ঞান পেয়ে বিদ্যানিধিকে বললেন,—তুমি কিছুদিন নীলাচলে থেকে যাও। প্রেমনিধি সৌভাগ্য মনে করে কিছুদিন প্রভুর সান্নিধ্যে থেকে গেলেন। গদাধর পণ্ডিতও প্রেমনিধির কাছে ইষ্টমন্ত্র পুনরুদ্ধার করে নিলেন। গদাধর ছিলেন ব্রজলীলার প্রেমসীমা শ্রীরাধা, প্রেমসীমা-গদাধর যাঁর শিষ্য সেই প্রেমনিধির মহিমার কথা আর কি বলব? অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, হরিদাস ঠাকুর —এঁরাই তাঁর মহিমা কীর্তন করেন। সকল বৈষ্ণবই তাঁর মহিমার কথা আলোচনা করেন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও

কায়মনোবাক্যে সকল ভক্তের মহিমা খ্যাপন করেন। তাঁর দেহে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই, চৈতন্যের কৃপাপাত্র যে কী আশ্চর্য হতে পারে তা বুঝতে পারা যায় না। বিদ্যানিধি শ্রীকৃষ্ণের কেমন প্রিয়পাত্র সে বিষয়ে গদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখছি। মহাপ্রভু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে নিজের কাছে রাখবার জন্য সমুদ্রের ধারে যমেশ্বরটোটায় বাসা করে দিলেন। তিনি নীলাচলে থেকে নিয়মিত জগন্নাথদেবকে দর্শন করছেন। দুজনে একসঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করেন এবং কৃষ্ণকথা আলাপ করে আনন্দ পান।

'ওড়ন ষষ্ঠী' নামে জগন্নাথদেবের এক যাত্রা উৎসব এসে গেল। এই উৎসবে জগন্নাথ নতুন কাপড় পরেন। যদিও জগন্নাথ মাড়ুয়া কাপড়ই পরেন, ভগবানের ইচ্ছানুবর্তী ভক্তগণ ব্যবস্থা করেন। শ্রীগৌরসুন্দরও তাঁর ভক্তদের সঙ্গে করে জগন্নাথের নববস্ত্র পরিধানের উৎসব দেখতে এসেছেন। মৃদঙ্গ, মহুরি, শঙ্খ, দুন্দুভি, কাহাল, ঢাক, দগড়, কাড়া নাকাড়া বিশালভাবে বাজতে লেগেছে। ভগবান নিজে নানা বস্ত্র পরিধান করেন। অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই উৎসব চলে। কাপড় পরাতে পরাতে শেষরাত্র হয়ে গেল, প্রভু ভক্তবৃন্দসহ তা দেখে খুবই আনন্দ পাচ্ছেন। প্রভু নিজেই উপাস্য, আবার নিজেই নিজের উপাসক। তাঁর কৃপা না হলে এই সকল লীলা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। দারুব্রহ্ম রসময় জগন্নাথরূপে সিংহাসনে বসে আছেন, সন্ন্যাসীরূপে সেই জগন্নাথই রসময় পরব্রহ্মের প্রতি সর্বদা ভক্তিযোগ প্রকাশ করেন। শাদা ও নানা নানা বর্ণের রেশমী কাপড়, মোটা মিহি সুবর্ণ ইত্যাদি ভক্তগণ জগন্নাথকে দেন। জগন্নাথকে কাপড় পরাবার পরেই বস্ত্র, পুষ্পমালা ও পদ্মহার, গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নানা প্রকারে ভোগ লাগালেন। ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে প্রভু জগন্নাথ দর্শন করে সপরিজনে এবং প্রেমানন্দে বাসায় ফিরে এলেন। বাসায় এসে তিনি সকল ভক্তকে বিদায় দিলেন এবং নিজে আনন্দে নাচতে থাকলেন। বিদ্যানিধি বাসায় চলে গেলেন, বিদ্যানিধি স্বরূপদামোদরের সঙ্গে থাকলেন। দুজন নিজেদের মনের কথা খোলাখুলি ভাবে বলা কওয়া করছেন। মাড় দেওয়া কাপড়ের ব্যাপারে বিদ্যানিধি স্বরূপদামোদরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দেশে কি শুদ্ধ স্মার্ত বিধির ব্যবহার আছে? তবে কেন মাড় দেওয়া কাপড় না ধুয়ে জগন্নাথকে পরানো হয়? স্বরূপদামোদর বললেন,— দেশাচারে এতে কোন দোষ হয় না। যারা শ্রুতি স্মৃতির বিধি মানেন তারাও সব ব্যাপারে বিধি অনুরূপ আচরণ করেন না। কোনটা বিধি এখানে সব সময় একভাবেই চলে আসছে। জগন্নাথের মনে যদি ইচ্ছা না থাকত তা হলে রাজাই বা নিষেধ করতেন না কেন? বিদ্যানিধি বললেন, ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বর যা ইচ্ছা করুন, ভক্তেরা কেন তা করবেন? পাণ্ডা, পাছা, বেহারা, সারাবার লোক, পাচক - এরা কেন উপবস্ত্র কাপড় পরছে? জগন্নাথদেব হলেন ঈশ্বর, তিনি সবই করতে পারেন। তবে আচরণ কি সকলেই করবে নাকি? এরা বুদ্ধিমান লোক হয়ে মাড় দেওয়া কাপড় ছুঁয়ে হাত ধোয় না কেন? কর্তৃকর্মচারী হয়েও এই বিচার না করলে তাকে অসৎ বলতে হয়, রাজাও সেই মাড়দেওয়া কাপড়ের পাগড়ী পরেন। স্বরূপদামোদর বললেন— ওড়ন-যাত্রায় এসব দোষ হয় না। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানই নীলাচলে জগন্নাথরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাই এখানে তিনি বিধি নিষেধের ততটা বাছবিচার করেন না। বিদ্যানিধি বললেন,—জগন্নাথবিগ্রহ অবশ্যই পরম ব্রহ্ম, বিধিনিষেধ না মানলেও তাঁর কোন দোষ লাগে না, এরাও কি নীলাচলে থেকে

ব্রহ্ম হয়ে গেল নাকি? এরাও বৈদিক বিধিবিধান ত্যাগ করল, সকলেই ব্রহ্মরূপ অবতার হয়ে গেল? এই সব আলোচনা করতে করতে দুই বান্ধব হাসাহাসি করে জগন্নাথের সেবকদেরও দোষী মনে করেন। ভক্তবৃন্দের স্বকীয় ভাব সকলেই জানেন না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই জানেন কার কতটা অনুরাগ আছে। কৃষ্ণ নিজেই ভক্তদের ভুল করান আবার তিনিই তা শুধরে দেন। ভগবানই বিদ্যানিধিকে ভুল করালেন আবার এখনই তিনি ভুল শুধরেও দেবেন। এই সব নানা ভাবে কৃষ্ণকথা বলতে বলতে দুজনেই নিজেদের বাসায় চলে গেলেন।

ভোজনাদি সেরে সকলেই প্রভুর কাছে এসেছেন। এসে শুয়েছেন। শ্রীচৈতন্য সবই জানেন, তিনি জগন্নাথরূপ স্বপ্নে বিদ্যানিধিকে দেখা দিলেন। জগন্নাথ রেগে গিয়ে বিদ্যানিধিকে গালে চড় মারছেন। জগন্নাথ-বলরাম দুই ভাই মিলে দুই গালে এমন জোরে চড় মারলেন যে বিদ্যানিধির গাল ফুলে গেল। বিদ্যানিধি ব্যথা পেয়ে বললেন,—কৃষ্ণ, আমাকে রক্ষা কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। বলতে বলতে তিনি কৃষ্ণের পদতলে পড়ে আবার বললেন,—তুমি কি অপরাধে আমাকে মারছ, প্রভু। প্রভু বললেন,—তোর অপরাধের অন্ত নেই। আমার এবং আমার সেবকের জাত-বিচার নেই। তুমি সব জেনেশুনে তবে কেন এই জাতনাশা জায়গায় থাকলে? নিজের বাড়িতে জাত রক্ষা কর। আমি যে ওড়নষষ্ঠীর নিয়ম করে দিয়েছি তাতেও তুমি দোষ দেখছ? আমাকে ব্রহ্মা বলে মেনে, আমার সেবকগণকে দোষী করে মাড়দেওয়া কাপড়ের জন্যে নিন্দা করছ? স্বপ্নের মধ্যে বিদ্যানিধি মহা ভয় পেয়ে প্রভুর শ্রীচরণে মাথা কুটে কাঁদতে লাগলেন। বললেন,—প্রভু, পাপিষ্ঠের সব অপরাধ ক্ষমা কর। আমি অতি অন্যায় করেছি, স্বীকার করতে কোন বাধা নেই। আমি যে মুখে তোমার ভক্তদের নিন্দা করেছি তুমি সেই মুখকেই শাস্তি দিয়েছ, তুমি আমার কল্যাণের জন্যই এসব করেছ। মুখ এবং গালের সৌভাগ্যে তোমার হাতের স্পর্শ পেলাম। আজ আমার বড়ই সৌভাগ্যের দিন। প্রভু বললেন,—তুমি ভক্ত বলেই তোমাকে শাস্তি দিলাম। স্বপ্নে প্রেমনিধিকে আশীর্বাদ করে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভাই মন্দিরে চলে গেলেন। বিদ্যানিধি স্বপ্ন থেকে জেগে গিয়ে গালের চড়ের ব্যাপারে নিজেই হাসতে লাগলেন। প্রভুর শ্রীহস্তের চড়ে গাল ফুলে গেছে দেখে প্রেমনিধি বলছেন,—ভালই হয়েছে, যেমন অপরাধ করেছি তেমনি শাস্তি পেয়েছি। প্রভু, তুমি ভালই করেছ। আমি অল্পেই বেঁচে গেলাম। এই ঘটনা থেকেই বিদ্যানিধির মহিমা বিষয়ে আন্দাজ করা যায়। প্রভু সেবককে যে কী পরিমাণ দয়া করেন তার প্রমাণ এখানে পাওয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ পুত্র প্রদ্যুম্নকেও নিজের হাতে চড় মেরে স্পর্শ করেন নি। জানকী, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রমুখ যত ঈশ্বরীগণ আছেন তাঁদের অপরাধে সাক্ষাতেই মারেন। স্বপ্নে প্রাপ্ত কৃপা-শাস্তি জাগ্রত অবস্থায় কোথাও দেখা যায় নি। স্বপ্নে শাস্তিই পাক আর টাকা-কড়িই পাক, জেগে গেলেই সব অলীক। প্রভু স্বপ্নে কাউকে শাস্তি কিংবা আশীর্বাদ করলে যদি তা জাগ্রত অবস্থায়ও বাস্তবে দেখা যায় তাঁকে সংসারের মধ্যে বড়ই ভাগ্যবান বলে মানতে হবে। অভক্তকে প্রভু স্বপ্নেও কিছু বলেন না। এই যে যবনেরা নিন্দা কিংবা হিংসা করে, এইবারে সাক্ষাতে তার ফল দেখতে পাবে। এই সব বিচার করে বুঝে নাও। তারাও স্বপ্নে অনুভব করতে চায় কিন্তু নিন্দা এবং হিংসা করে বলেই তারা স্বপ্নেও পায় না। যবনের দোষ দিলেই বা কি হবে? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও যে অপরাধ করে তার

ফল পাবে। ইহলোক ও পরলোক সব জায়গাতেই পাবে। প্রভু অভক্ত পাপিষ্ঠকে কখনো স্বপ্নেও শিক্ষা দেবেন না।

প্রভু যাঁকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করেন তিনি অবশ্যই নিজেকে মহাভাগ্যবান মনে করবেন। প্রভু যে প্রেমনিধিকে স্বপ্নে চড় মেরেছেন তা সকলেই সাক্ষাতে তাঁর গালফোলা দেখে বুঝতে পারলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সকালে উঠে দুগালে হাত বুলিয়ে দেখছেন চড়ে গাল ফুলে রয়েছে। প্রতিদিনই সকালে স্বরূপদামোদর আসেন এবং দুজন একসঙ্গে জগন্নাথ-দর্শনে যান। স্বরূপদামোদর বললেন,—রোজই তো সকালে উঠে জগন্নাথদর্শনে যাও, আজ এখনো বিছানা ছেড়ে ওঠনি কেন? বিদ্যানিধি বললেন,—ভাইটি, এখানে এসে একটু বস। সব কথাই বলব তোমাকে। স্বরূপদামোদব এসে দেখলেন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির দুই গালে চড়ের চিহ্ন রয়েছে এবং গাল দুটি ফুলে গিয়েছে। তখন স্বরূপদামোদর জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার? কি করে ব্যথা পেলে? গাল ফুলেছে কেন? বিদ্যানিধি মশাই হেসে বললেন,—কাল আমার সব সন্দেহ ঘুচে গেছে। মাড়দেওয়া কাপড়কে যে নিন্দা করেছিলাম তার শাস্তিতেই গালের এ অবস্থা হয়েছে। জগন্নাথ বলরাম স্বপ্নে এসে দু দণ্ড ধরে সমানে দু গালে চড়িয়েছেন, একটুও থামেন নি। আমাদের পোশাক-কাপড়কে তুই নিন্দা করেছিস্,—এই কথা বলে দুজনে মিলে গালে চড় মারতে লেগেছেন; হাতের আংটির ঘায়ে খুব ব্যথা পেয়েছি, ব্যথায় গাল ফুলে গেছে, ভাল মত কথা বলতে পারছি না। লজ্জায় এখন কারো সঙ্গে কথাও বলতে পারছি না। গালের ফোলা কমে গেলে বেরোতে পারব। এসব কথা তো আর সবাইকে বলা যায় না, আমি একে সৌভাগ্য বলেই মনে করি। অপরাধ অনুযায়ী ঠিক শাস্তি পেয়েছি। তা না হলে তো অন্ধকূপে পড়তে হতো। বিদ্যানিধির প্রতি জগন্নাথের স্নেহের প্রকাশ দেখে স্বরূপদামোদর অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বান্ধবের সম্পদে বান্ধব উল্লসিত হন, দু জনে পরম আনন্দে পুলকিত হচ্ছেন। স্বরূপদামোদর বললেন,—এমন অদ্ভুত দণ্ড আমি দেখিনি, শুনিও নি। প্রভু স্বপ্নে দেখা দিয়ে নিজে এসে শাস্তি দেন, এমন কথা আগে কখনো শুনি নি, কেবল তোমার জন্যেই দেখলাম।

এই ভাবে দুই বন্ধুতে মিলে দিনরাত কৃষ্ণকথা আলোচনা করে কাটিয়ে দিচ্ছেন এবং আনন্দে ভাসছেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির এমনই প্রভাব যে প্রভু-গৌরচন্দ্র তাঁকে পিতা সম্বোধন করেন। পুণ্ডরীক গঙ্গাস্নান করেন না, কারণ গঙ্গাজল পায়ে লাগাবেন না। গঙ্গাজল পান করেন এবং গঙ্গা দর্শন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই ভক্তের নাম নিয়ে পুণ্ডরীক বলে বিস্তর কাঁদেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরিতকথা শুনলে অবশ্যই তাঁর কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

৩/১২ গুণধাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় হোক, বলরাম নিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক, অদ্বৈতাদি ভক্ত হরিদাসের জয় হোক, গদাধর শ্রীবাসের জয় হোক। মথুরা নিবাসী লোকদের উদ্ধার করার জন্য মহাপ্রভু মথুরা দেখতে চলেছেন। মহাপ্রভু একদিন কৌতুক করে সার্বভৌমকে বললেন,— আমি তিনটি কাজের সুসমাধান করেও মনে শান্তি পাচ্ছি না। কি কাজ করেছি, তা তোমাকে বলছি, তুমি শুনে আমাকে উত্তর দেবে। গয়াতে গিয়েছিলাম

পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করতে, সেখানে একজন মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি তাঁর কাছে নিবেদন করেছিলাম,—প্রভু, আমাকে ভবকূপ থেকে উদ্ধার কর।'তিনি আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন, আমি তাঁর কাছে দেহ সমর্পণ করলাম। তিনি আমার কোলে পূর্ণকৃষ্ণ এনে দিলেন এবং বললেন, তুমি কৃষ্ণকে কোলে করে নিয়ে নৃত্যকীর্তন কর। তাঁর আশীর্বাদে আমি কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে আনন্দিত মনে নৃত্যকীর্তনাদি করতে লাগলাম। তবু আমার মন প্রসন্ন হয় না। এই আমার একটি।

আর একটি কাজের কথা শোন। কাটোয়োতে ইন্দ্রাণীঘাটে মহাত্মা কেশব ভারতী থাকতেন। তিনি বড় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। আমি তাঁর নাম শুনে তাঁর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তাঁর কাছে গিয়ে সিখাসূত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিযে কৌপীন ধারণ করলাম। তথাপি আমি মনে শান্তি পেলাম না।

অনেক ভেবে তাই নীলাচলে এলাম, প্রভু দেখামাত্র কোলে স্থান দিলেন। প্রভুর কৃপায় তোমার মত সঙ্গী পেলাম, তবু মনে শান্তি নেই। কি করলে শান্তি পাব তাই তোমার কাছে জানতে চাই। সার্বভৌম মহাপ্রভুর তিনটি কাজের বিষয শুনে বললেন,—প্রভু, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, তিনিই প্রিয়তম। আর কেউ কিছু নয়। এই তিনটি কাজই বাহ্যিক ব্যাপার। তাঁর কাছে সেবকই বড় প্রিয়। তাঁর প্রতিই প্রভুর ভালবাসা, তাঁকে দেখলেই তুমি আনন্দ পাবে। সার্বভৌমের মুখে এই কথা শুনে আনন্দ পেয়ে তাঁকে বললেন,—তুমি ঠিকই বলেছ। আমার পার্ষদ ভক্তগণই শ্রীকৃষ্ণকে পৃথিবীর বুকে নিয়ে এসেছেন। আমার সামনে এনেছেন। আর কেউ আছেন বলে তো আমি জানি না, তুমি জানলে বল। সার্বভৌম বললেন,—এখানে একজন ভক্ত আছেন, বড রাজকর্মচারী। তিনি সকলের মনের কথা জানেন। তাঁর নাম রায় রামানন্দ। তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রধান পাত্র। সর্বজ্ঞ শুনে বললেন প্রতাপরুদ্রকে,—রামানন্দ রাজা হবে। শুনে রাজার মন খারাপ হয়ে গেল। রামানন্দ তা বুঝতে পারলেন। তিনি তাই শীঘ্র উৎকাল ছেড়ে তৈলঙ্গদেশে চলে গেলেন। তৈলঙ্গের রাজা তখনই মারা গিয়েছিলেন। রামানন্দকে পেযে স্থানীয় লোকেরা উল্লসিত হযে উঠল। পাত্রমিত্রগণ মন্ত্রণা করে আনন্দিত মনে রামানন্দ রায়কে রাজা করলেন। রামানন্দ রায সেখানে চোদ্দ বছর রাজত্ব করে দিগ্বিজয়ী হয়ে আছেন। এই কথা শুনে প্রভু খুশি হয়ে লোকনিস্তারের জন্য দাক্ষিণাত্য যাত্রা করলেন। এদিকে রামানন্দ স্বপ্ন দেখলেন,—পনেরো দিনের পথ নীলাচলে জগন্নাথদেব রত্ন সিংহাসনে বসে আছেন, তাঁর বক্ষদেশ থেকে অতি মনোহর গৌরাঙ্গসুন্দর বেরিয়ে এলেন। রামানন্দ স্বপ্ন দেখে আনন্দিত মনে পাত্রমিত্রকে ডেকে নিয়ে বললেন,—পনের দিনের মধ্যে নীলাচলে চলে যাব। এ রকমই একটি স্বপ্ন দেখেছি। তোমরা বাইরের উদ্যানে রাজকার্য কর। আমি নির্জনে থাকব। এই পনেরো দিন আমাকে কেউ ডাকবে না। আমার এই আজ্ঞা তোমরা কেউ লঙ্ঘন ক'রো না। পূজার সামগ্রী সব জোগাড় করে দাও, আমি নিভৃতে ধ্যানে থাকব।

পাত্রমিত্রকে আদেশ করে রাজা নির্জনে বসে আছেন। পনেরো দিন পূর্ণ হয়েছে, রাজা মনে সরোবর কল্পনা করে তার মধ্যে কমল-কানন ভেবেছেন। কমলবনে নৌকা সাজিয়ে ঠাকুরানীরা বাজনা বাজাচ্ছেন। নৌকার আসনে প্রভুকে বসিয়ে তাঁরা কমলবনে নৌকা চালিয়ে দিয়েছেন। গহন কমলবনে নৌকা চলছে না। নারীগণ জয়ধ্বনি দিয়ে হরি হরি বলতে লাগলেন।

এমন সময়ে মহাপ্রভু পাত্রমিত্রদের নিয়ে তাঁর দরজায় এসে উপস্থিত হলেন এবং

জিজ্ঞাসা করলেন,—এ কার বাড়ি? পাত্রমিত্রগণ বললেন,—এটি রামানন্দ রায়ের বাড়ি। তিনি নির্জনে বসে পূজা করছেন। প্রভু বললেন,—আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই এখানে এসেছি। পাত্রমিত্রগণ বললেন,—তিনি নির্জনে আছেন, তাঁর আজ্ঞা বিনা যাওয়া নিষেধ। তুমি যদি ভেতরে যাও তাহলে বাইরের দরজা বন্ধ করে দেব। তোমাকে আমরা তাঁর ঘর দেখিয়ে দেব কিন্তু আমরা কেউ ভয়ে যাব না। প্রভু বললেন,—তাই হবে। তোমরা ভেতরের ভয়ে বাইরেই থাক। মহাপাত্রগণ বাড়ির ভিতরে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। রামানন্দের ঘরের পিঁড়ায় গৌরচন্দ্র বসলেন। কপাট ধরে প্রভু রামানন্দকে ডেকে বললেন,—নৌকা কি করে চলবে? নারীগণ কমলবনে নৌকা চালাচ্ছে। গভীর বনে নৌকা চলছে না, সকলে মিলে দুহাতে দাঁড় ধর। প্রভুর কথা শুনে রামানন্দ রায় অন্তরে বড়ই আনন্দ লাভ করলেন। দরজা খুলে দেখলেন প্রভু-গৌরচন্দ্র বসে আছেন, তাঁকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। রামানন্দ ভূমিতে পড়ে দণ্ডবৎ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। প্রভু তাঁকে কোলে নিয়ে 'হরি হরি' বলে উঠলেন। প্রভু দিব্য সিংহাসনে উঠে বসলেন, রামানন্দ তাঁর পায়ের কাছে বসলেন। রামানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম ধুইয়ে দিলেন। প্রভুর দর্শন পাবার আগ্রহে এবং প্রভুর আশীর্বাদে রামানন্দ প্রভুকে পেলেন। প্রভু বললেন,—রামানন্দ, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যই আমি এখানে এসেছি। তুমি জগন্নাথ-দর্শনে নীলাচলে চল। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। সেখানে আমরা দুজনে মিলে থাকব। রামানন্দ রায় বললেন,—আমি জগন্নাথের স্থানে অপরাধী। তাই তিনি আমাকে বনে পাঠিয়েছেন। এখন জগন্নাথ প্রসন্ন হয়ে আমাকে দুজনে মিলে দেখা দিলেন। আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমিই জগন্নাথ। তোমাকে দেখেই আমি সব পেলাম, ভবকূপ থেকে উদ্ধার হলাম। নীলাচল বাসীকে আমি নমস্কার জানাই, প্রভুকে দেখা আমার ভাগ্যে নেই। আমি রাজা প্রতাপরুদ্রের বিশ্বাসভাজন ছিলাম। সর্বজ্ঞ গুণে রাজাকে বললেন,—রামানন্দ উৎকলের রাজা হবেন। এই কথা শুনে রাজার মনে ভয় হল। আমি আশঙ্কা করলাম হয়তো তিনি আমাকে খুন করাবেন। তাই আমি ভয় পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে এলাম। তুমি অন্তর্যামী, তুমি সবই জান। প্রভু বললেন,—আমি সবই জানি। এখন আর তোমার কোন ভয় নেই। আমি প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে তোমাকে চেয়ে নেব। তুমি নীলাচলে গেলেই সব জানতে পাবে। প্রভু সেখানে পাঁচ দিন থেকে দক্ষিণে যাত্রা করলেন। রামানন্দ নীলাচলে চললেন।

তারপর প্রভু সেতুবন্ধে গেলেন। রঘুনাথ-রূপে নিজেই সেতু তৈরি করেছিলেন। সেকালের কীর্তি দেখে প্রভু নির্জনে নৃত্য করলেন। ধনুতীর্থে স্নান-তর্পণ করে রামেশ্বরে এলেন। পাঁচদিন থেকে রামেশ্বর দেখে শিব পূজা করেছিলেন। তারপর ঝারিখণ্ডের ভেতর দিয়ে এসে বৌদ্ধদের সঙ্গে দেখা হল। বৌদ্ধগণ গৌরহরিকে দেখে কোন সিদ্ধপুরুষ ভেবেছিলেন। প্রভুকে তারা ধরে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। 'ধর ধর' বলে বৌদ্ধগণ দৌড়ে এলে প্রভু ধেয়ে চললেন। সামনে এগিয়ে রাজমন্দির দেখে তাতে প্রবেশ করে সুস্থির হলেন। রাজা দেখলেন, তিনি ভয়ে পালিয়ে এসে ঢুকে পড়েছেন। রাণীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রভুকে দেখে তারা সম্মান করে বসালেন। বৌদ্ধরা রাজার কাছে এসে বলল,— একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তোমার এখানে এসেছে। তাকে ডেকে আমাদের কাছে দাও। রাজা বললেন,—বৌদ্ধরা তো কখনো এখানে আসে না! তোমরা কেন এসব বলছ? রাজার কথা শুনে বৌদ্ধরা ফিরে গেল। মহাপ্রভু সেই রাত রাজবাড়িতেই কাটালেন। রাজা লোকজন দিয়ে প্রভুকে খুব ভোর বেলায় পাঠিয়ে দিলেন। প্রভু সেখান থেকে

এসে কিছুদিন মথুরাতে ছিলেন। প্রভু পূর্বকালের জন্মস্থান দেখে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। প্রভু সেখানে সাত দিন থেকে হরিনাম করলেন। কিছুমাত্র ভিক্ষাগ্রহণ না করে কেবল দুগ্ধপান করে থাকলেন। তারপর তিনি বৃন্দাবনে গেলেন। বৃন্দাবনেও পাঁচদিন থাকলেন। সেখানে তখন লোকালয় দেবালয় কিছুই ছিল না। শ্রীগৌরাঙ্গ বনে বনে ভ্রমণ করছেন। সেখানে রূপ ও সনাতনের সঙ্গে প্রভুর দেখা হলে তিনি বললেন, তোমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই এখানে এসেছি। তোমাদের মনের কথা কাউকে প্রকাশ করবে না। কি করে তোমাদের ভজন সিদ্ধ হবে তা বলছি। শ্রীঅদ্বৈতকে আমি প্রেমভক্তি দান করেছি, তখনই আমি তোমাদের নাম রেখেছি—রূপ আর সনাতন। তোমাদের প্রতি আমার আদেশ,—পশ্চিম ভারতে তোমরা প্রেমভক্তিধর্ম প্রচার করবে। ঘরে ঘরে যাবে। সকলকে উদ্ধার করবে। আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিয়ে সঙ্কীর্তন করে ভক্তি প্রচার করছি। তোমরা এখানে মদনমোহনের সেবা প্রতিষ্ঠা কর। তিনি কংসকারাগারে রয়েছেন। সেখানে গিয়ে মদনগোপালকে নিয়ে এসে বৃন্দাবনে তাঁকে সেবাপূজা কর। তাহলেই তোমাদের ভজন সিদ্ধ হবে। সেবাধর্ম ছাড়া আর কিছু নেই। প্রভু-গৌরচন্দ্র তাঁদেরকে উপায় বলে দিলেন, তাঁরা শুনে আনন্দিত হলেন।

প্রভু সেখান থেকে প্রয়াগে এসে রাত কাটালেন। সাত দিন সেখানে থেকে ত্রিবেণী-মাধবকে দর্শন করে বললেন,—সব পেলাম। সেখান থেকে বারাণসীতে এসে বিশ্বেশ্বরকে দেখে হরিনাম করলেন। সেখানে বহু সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বেদান্তী সন্ন্যাসী। প্রভুকে তাঁরা ভাল মনে নিলেন না। ভক্তি ছাড়া তো শক্তি হয় না। সন্ন্যাসীগণকে সম্ভ্রম জ্ঞাপন করে প্রভু চলে গেলেন। প্রভুকে দেখে কেউ তেমন কিছু বললেন না। ভক্তিশূন্য লোক কষ্ট পাবেই।

প্রভু বারাণসীতে রামচন্দ্রপুরীর মঠে দু মাস থেকেছিলেন। সেখান থেকে গয়াতে এসে বিষ্ণুপদ দর্শন করে প্রণাম করলেন। আবার নীলাচলে ফিরে জগন্নাথদেবকে দর্শন করে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন।

প্রভু আঠারো বছর নীলাচলে মহা আনন্দে কাটালেন। চব্বিশ বৎসর সংসারে ছিলেন। যুবা বয়সেই সন্ন্যাসী হলেন। প্রভু অবতীর্ণ হয়ে নামসঙ্কীর্তন প্রচার করে সকলকে উদ্ধার করলেন। শ্রীনিত্যানন্দের উপরে সব সমর্পণ করে মহাপ্রভু কার্য সমাধা করে অন্তর্ধান করলেন। চৈতন্যভাগবত শুনলে সর্ব অমঙ্গল দূর হয়। অবতার শিরোমণি নিত্যানন্দকে পাষণ্ডরা জানে না, বুঝে না। পূর্ব যুগেও নিন্দক দেবাসুর-নর অনেককে শ্রীকৃষ্ণ বিনাশ করেছেন। রাক্ষস, বানর, কংস ইত্যাদি অনেকেই নিন্দক ছিল, নিত্যানন্দকেও তেমনি অনেকেই নিন্দা করে। তারা দুষ্টবুদ্ধি।

নিত্যানন্দ চৈতন্য হইল অবতীর্ণ।
এতদূরে শেষখণ্ড হইল সম্পূর্ণ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ওঁ শ্রীহরি ওঁ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু।

বর্ণানুক্রমিক পাত্রপরিচয়

অচ্যুতানন্দ॥ অদ্বৈতাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সীতাদেবীর গর্ভে জন্ম। অনেক সময় শ্রীচৈতন্য সান্নিধ্যে নীলাচলে থাকতেন। অদ্বৈতের তিরোভাবের পরে শান্তিপুরে থাকতেন। শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুরের শ্রীপাট খেতুরের উৎসবে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে সপরিকরে যোগদান করেন।

অদ্বৈতাচার্য॥ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। ১২৫ বছর বেঁচে ছিলেন জন্ম শ্রীহট্টে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। দুই স্ত্রী—সীতাদেবী, শ্রীদেবী।

অনন্ত পণ্ডিত॥ চব্বিশ পরগণার আটিসারা গ্রাম-নিবাসী।

আচার্য রত্ন॥ চন্দ্রশেখর আচার্য। মহাপ্রভুর মেসোমশাই। শচীদেবীর ভগিনী সর্বজয়া দেবীকে বিয়ে করেন।

ঈশান॥ মহাপ্রভুর গৃহসেবক। নিমাইকে কোলেপিঠে করেছেন। নির্ষ্ঠীবী।

ঈশ্বরপুরী॥ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। হালিশহরে 'চৈতন্যডোবা' এঁর জন্মভিটা। এঁর রচিত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত'।

উদ্ধারণ দত্ত॥ সুবর্ণ বনিক। পিতা শ্রীকর, মাতা ভদ্রাবতী। এখনো উদ্ধারণপুরে এঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিতাইগৌরের বিগ্রহ আছে। কাছেই তাঁর সমাধি, ভরা সংসার ও প্রচুর ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ইনি নিত্যানন্দপ্রভুর সেবক ও সঙ্গী হন।

কমলাকান্ত॥ মহাপ্রভুর সহপাঠী। মহাপ্রভু কৃপা করে এঁকে শ্রীনিত্যানন্দের ঈশ্বরত্বের কথা বুঝিয়ে দেন পুরীধামে।

কাশীনাথ পণ্ডিত॥ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে মহাপ্রভুর বিয়ের ঘটক।

কাশী মিশ্র॥ উৎকালনিবাসী ব্রাহ্মণ। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গুরু ও জগন্নাথদেবের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। কাশী মিশ্রের ভবনই বর্তমান 'রাধাকান্ত মঠ'।

কাশীশ্বর॥ জন্ম ব্রাহ্মণডাঙ্গা, যশোর। বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে গৌর-গোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করেন।

কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী॥ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। পুরীগোস্বামী নিত্যলী- য় প্রবেশকালে এঁকে এবং গোবিন্দকে শ্রীচৈতন্যের সেবা করার আজ্ঞা দিয়ে যান। ভীড়ে ইনি প্রভুর আগে থাকতেন।

কৃষ্ণদাস হোড়॥ বড়গাছি-নিবাসী ধনী ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দের বিয়ের ঘটক।

কৃষ্ণদাস॥ আকাইহাট। নিত্যানন্দের সঙ্গে পুরী থেকে গৌড়ে আসেন।

কৃষ্ণদাস কালিয়া॥ সোনাতলা, পাবনা। ভক্তিতে বাহ্যজ্ঞান হারাতেন। কাপড় ঠিক থাকত না। অন্য মতে জন্ম মামদাবাদ।

কৃষ্ণদাস॥ অদ্বৈতাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র। চৈতন্যভক্ত।

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত॥ দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাই।

কৃষ্ণদাস-শিশু॥ নিত্যানন্দপ্রভু এঁর পালক পিতা।

কৃষ্ণদাস॥ উৎকলে জন্ম। জগন্নাথদেবের স্বর্ণবেত্রধারী সেবক।

কৃষ্ণদাস॥ বৃন্দাবনবাসী, ভূগর্ভগোস্বামীর শিষ্য, প্রেমী কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণানন্দ পুরী॥ চৈতন্যপার্ষদ, মাধবেন্দ্রের শিষ্য।

কৃষ্ণানন্দ॥ নবদ্বীপবাসী, চৈতন্য এঁকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করতেন।

কৃষ্ণানন্দ॥ নবদ্বীপবাসী পরম ভক্ত রত্নগর্ভ আচার্যের পুত্র।

কেশব খাঁ॥ মাহিনগরের পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। হুসেন শাহের অমাত্য।

কেশব ভারতী॥ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত॥ মহাপ্রভুর ব্যাকরণ শিক্ষক।

গঙ্গাদাস বিপ্র॥ রাঢ়ের চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র। অন্য দুই ভাই—বিষ্ণুদাস, নন্দন।

গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী॥ পঞ্চতত্ত্বের শক্তিতত্ত্ব। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র। পিতা মাধব মিশ্র, মাতা রত্নাবতী। ভাই বানীনাথ। জন্ম চট্টগ্রামে। আকৌমার ব্রহ্মচারী।

গদাধর দাস॥ শ্রীপাট আড়িদহে। পুরীতে প্রভুর সঙ্গী, পরে নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে আসেন। কাজীকে আদেশ দান করে হরিনাম নেওয়ালেন।

গরুড় অবধূত॥ চৈতন্যপার্ষদ প্রেমিক সন্ন্যাসী।

গরুড়পণ্ডিত॥ নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। ইনি নামবলে সাপের বিষ পরিপাক করেছেন।

গোপীনাথ পণ্ডিত॥ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ। গৌড় ও পুরী যাতায়াত করতেন। ইনি মহাপ্রভুর অন্যতম স্তুতিকারক।

গোপীনাথ আচার্য॥ সার্বভৌমের ভগ্নিপতি কুলীন ব্রাহ্মণ।

গোপীনাথ সিংহ॥ কায়স্থ। মহাপ্রভুর 'অক্রূর'।

গোপীনাথ পট্টনায়ক॥ রামানন্দ রায়ের ভাই। উড়িষ্যায় আলালনাথের কাছে কেষ্টপুরে এঁর ভগ্নি মাধবী প্রতিষ্ঠিত 'রাধাগোপীনাথ' সেবিত হচ্ছেন। বংশধরদের বাসস্থান।

গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর॥ কায়স্থ। পদকর্তা। অগ্রদ্বীপে 'গোপীনাথ' প্রতিষ্ঠাতা।

গোবিন্দ দত্ত॥ বাসুদেব ও মুকুন্দের ভাই। প্রভুর আদি কীর্তনীয়া। সুখচরে 'নিতাইগৌরাঙ্গ' স্থাপিত করেন। শেষজীবনে বৃন্দাবনবাসী।

গোবিন্দ-দ্বারপাল॥ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য, মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য।

গোবিন্দানন্দ॥ মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গী নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ।

গৌরীদাস পণ্ডিত॥ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। নিত্যানন্দপ্রভুর শ্বশুর সূর্যদাস পণ্ডিতের ভাই। কালনায় গৌরনিতাইয়ের সেবা স্থাপন করেন।

চতুর্ভুজ পণ্ডিত॥ ব্রাহ্মণ। এঁর গৃহ নিত্যানন্দপ্রভুর বিলাসস্থান। এঁর পুত্র নন্দন, গঙ্গাদাস ও বিষ্ণুদাস।

চৈতন্যদাস (মুরারি পণ্ডিত)॥ ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দের গণ। বাঘের পিঠে চড়েন।

জগদানন্দ পণ্ডিত॥ ব্রাহ্মণ, কাঞ্চনপল্লী। মহাপ্রভুর জন্য গৌড় থেকে পুরীতে চন্দনাদি তেল নিয়ে গিয়েছিলেন। অভিমানী ভক্ত। মথুরায় সনাতনের কাছে ছিলেন।

জগদীশ পণ্ডিত॥ একাদশীতে নিমাই এঁর ঘরে নৈবেদ্য খেয়েছিলেন।

জগাই॥ নবদ্বীপের কোটাল, ব্রাহ্মণ। বিখ্যাত জগাই-মাধাই।

জীব॥ নবদ্বীপের রত্নগর্ভ আচার্যের পুত্র।

তপন মিশ্র॥ প্রভুর আদেশে পূর্ববঙ্গ থেকে কাশীতে গিয়ে বাস করেন। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর পিতা।

দবীরখাস॥ হুসেন শাহের মন্ত্রী, পরে শ্রীরূপ গোস্বামী।

দামোদর পণ্ডিত।। নিরপেক্ষ বিচারক। মহাপ্রভুর অনুরাগী।

দুঃখী।। শ্রীবাসের দাসী। প্রভু দুঃখ ঘুচিয়ে নাম রাখেন 'সুখী'।

দেবানন্দ পণ্ডিত।। ভাগবতের অধ্যাপক। কুলিয়া গ্রামবাসী।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত।। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। জন্ম চট্টগ্রামে। শ্রীপাট বর্ধমান জেলার শীতলগ্রামে। বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। সমাধি শীতলগ্রামে।

নন্দন আচার্য।। নবদ্বীপের চতুর্ভূজ পণ্ডিতের পুত্র। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তিন প্রভুই এঁর গৃহে অবস্থান করেছেন।

নারায়ণ।। দামোদর পণ্ডিতের ভাই। অন্য দুই ভাই,—জগন্নাথ ও শঙ্কর।

নারায়ণী।। শ্রীবাসের দাদা নলিন পণ্ডিতের কন্যা। গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মাতা। স্বামীর নাম বৈকুণ্ঠদাস বিপ্র। ইনি শিশুপুত্রকে নিয়ে মামগাছীতে বাসুদেব দত্তের দেবালয়ে পূজারিণী রূপে অবস্থান করেন।

নীলাম্বর চক্রবর্তী।। জন্ম শ্রীহট্ট। পরে নবদ্বীপের বিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত। শচীমাতার পিতা।

পদ্মাবতী।। শ্রী নিত্যানন্দের মাতা। একচক্রা, বীরভূম।

পরমানন্দ পণ্ডিত।। মহাপ্রভুর সতীর্থ। বৃন্দাবনবাসী। সনাতনের অধ্যাপক পরমানন্দ পুরী। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। পূর্বনিবাস ত্রিহুতে। পরে নীলাচলে বাস করেন। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ।

পরমানন্দ মহাপাত্র।। জগন্নাথদেবের উড়িষ্যাবাসী সেবক। মহাপ্রভুর ভক্ত।

পরমেশ্বর দাস।। ব্রাহ্মণ। দ্বাদশগোপালের অন্যতম। শ্রীপাট কেতুগ্রাম, পরে খড়দহ। মাতা জাহ্নবার আজ্ঞায় তড়া আটপুরে শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। অলৌকিক শক্তিধারী। বৈশাখী পূর্ণিমায় তিরোভাব।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার। পিতা বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী, মাতা গঙ্গাদেবী। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর দীক্ষাগুরু।

পুরন্দর আচার্য।। মহাপ্রভুর পিতার উপাধিও পুরন্দর। তাই প্রভু এঁকেও পিতা বলতেন।

পুরন্দর পণ্ডিত।। মহাপ্রভু এঁকে নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে পাঠান।

পুরুষোত্তম দাস।। সদাশিব কবিরাজের পুত্র। নিত্যানন্দের শিষ্য।

পুরুষোত্তম আচার্য।। স্বরূপ দামোদরের পূর্বাশ্রমের নাম।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী।। কাশীর অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। মহাপ্রভুর কৃপায় ইনি ভক্তি লাভ করেন।

প্রতাপরুদ্র।। উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা। মহাপ্রভুর ভক্ত। প্রভুর অপ্রকটের আট বছর পরে রাজত্বের অবসান। ভক্ত, পণ্ডিত, কবি।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র।। উৎকালবাসী ব্রাহ্মণ।

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।। মহাপ্রভু নাম দেন 'নৃসিংহানন্দ'।

ভগবান আচার্য।। পিতা শতানন্দ খাঁ হালিশহরের ব্রাহ্মণ জমিদার। ইনি খঞ্জ ছিলেন। স্বরূপদামোদরের প্রিয়পাত্র। প্রভুর আদেশে ইনি পুরী থেকে ফিরে এসে সংসারী হন। এঁরই আদেশে মাধবী দাসীর কাছে চাল চেয়ে ছোট হরিদাস বর্জনীয় হলেন। এঁর দুই পুত্র,—রমনাথ ও রঘুনাথ।

ভগবান পণ্ডিত॥ লেখক-লিপিকার।

ভাগবতাচার্য॥ মূল নাম রঘুনাথ। শ্রীপাট বরাহনগর। 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী' রচয়িতা।

মকরধ্বজ কর॥ রাঘব পণ্ডিতের শিষ্য, ঝালির বাহক। পানিহাটী নিবাসী।

মনোহর॥ ব্রাহ্মণ, নিত্যানন্দ শাখা, অন্য তিন ভাই—নারায়ণ, কৃতদাস, দেবানন্দ।

মহেশ পণ্ডিত॥ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীপাট চাকদহের পালপাড়া।

মহেশ্বর বিশারদ॥ সার্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির পিতা।

মাধব ঘোষ॥ মাধবানন্দ। বাসুদেব ও গোবিন্দের ভাই। গায়ক, পদকর্তা, কায়স্থ।

মাধব মিশ্র॥ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পিতা।

মাধবেন্দ্র পুরী॥ ঈশ্বর পুরীর গুরু। এঁর জন্য ক্ষীর চুরি করে রেমুণার গোপীনাথ 'ক্ষীরচোরা' নাম ধারণ করেন। এঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়েই গোবর্ধন-নাথ গোপাল প্রকট হন এবং স্বীয় তনু শান্ত করতে চন্দন সংগ্রহে এঁকে পুরীধামে পাঠান।

মাধাই॥ কুলীন ব্রাহ্মণ। জগাইয়ের খুড়তুতো ভাই।

মালিনী॥ শ্রীরাম পণ্ডিতের পত্নী। নিত্যানন্দ শিশুলীলায় এঁর স্তন পান করেন।

মুকুন্দ দত্ত॥ বৈদ্য, বাসুদেবের ভাই, প্রভুর সহাধ্যায়ী। জন্ম চট্টগ্রামে। সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। শ্রীপাট কাঁচড়াপাড়ায়।

মুকুন্দ সঞ্জয়॥ মহাপ্রভুর নবদ্বীপবাসী ছাত্র পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের পিতা। পুরুষোত্তমও প্রভুর ছাত্র।

মুরারি গুপ্ত॥ জন্ম শ্রীহট্ট, বৈদ্য। নবদ্বীপবাসী। প্রভুর সহপাঠী। কবিরাজ। রামভক্ত। বিখ্যাত সংস্কৃত কড়চাগ্রন্থ চৈতন্য চরিত্রের রচয়িতা।

মুরারি চৈতন্যদাস॥ ব্রাহ্মণ, সাপ ও বাঘের সঙ্গে অনায়াসে খেলতেন।

যদুনাথ কবিরাজ॥ রত্নগর্ভ আচার্যের পুত্র। ব্রাহ্মণ।

রঘুনাথ বৈদ্য॥ মহাপ্রভুর আদেশে পুরী থেকে নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে আসেন। আয়ুর্বেদের অধ্যাপক ছিলেন।

রত্নগর্ভ আচার্য॥ শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে আসেন। জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গী, ভাগবতের অধ্যাপক। তিন পুত্র—যদুনাথ কবিচন্দ্র, জীব পণ্ডিত, কৃষ্ণানন্দ।

রাঘব পণ্ডিত॥ ব্রাহ্মণ, শ্রীপাট—পানিহাটি। প্রতি বৎসর ইনি ভগ্নি দময়ন্তীর সযত্ন-নির্মিত নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ঝালি করে পুরীধামে প্রভুর জন্য নিয়ে যেতেন। এটিই বিখ্যাত 'রাঘবের ঝালি'। এখনো পানিহাটিতে এঁর ঠাকুরসেবা আছে।

রাম পণ্ডিত॥ শ্রীবাস পণ্ডিতের অনুজ। মহাপ্রভু এঁকে শ্রীবাসের সেবা করতে আদেশ করেন।

রামচন্দ্র খান॥ কায়স্থ। ছত্রভোগের শাসনকর্তা। হুসেন শাহের মৃত্যুর পর ইনি শেরশাহের অধীনে মেদিনীপুরের সুবাদার হন। ইনি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মহাপ্রভুকে নৌকায় ছত্রভোগ থেকে উড়িষ্যায় পৌঁছে দেন।

রামচন্দ্রপুরী॥ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীজীর উপেক্ষিত শিষ্য। এঁর নিন্দার জন্য মহাপ্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচ করেছিলেন।

রামদাস॥ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগর। এঁর অলৌকিক শক্তির অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। অন্য নাম—অভিরাম গোপাল।

রামানন্দ রায়॥ বিদ্যানগরের শাসনকর্তার পদ ত্যাগ করে নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গী হন। প্রভুর শেষলীলায় ইনি স্বরূপদামোদরের সঙ্গে থাকতেন। 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের রচয়িতা। ইহার পিতা পাঁচ পুত্র সহ মহাপ্রভুর শরণাগত হন।

লক্ষ্মীদেবী॥ শ্রীচৈতন্যের প্রথমা পত্নী। পাশ্চাত্য বৈদিক বল্লভাচার্যের কন্যা। প্রভুর পূর্ববঙ্গ থাকা কালে ইনি কালসর্প দংশনে অন্তর্ধান করেন।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত॥ ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট আকনা, হুগলী। মহাপ্রভু এঁর নৃত্যে আনন্দিত হতেন। এঁর সঙ্গ প্রভাবেই ভাগবতপাঠক দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন। এঁর শিষ্য গোপাল গুরু পুরীধামে মহাপ্রভুর আবাসস্থলে শ্রীরাধাকান্ত মঠ স্থাপন করেন।

বনমালী আচার্য॥ শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে মহাপ্রভুর বিয়েতে ইনি ঘটক ছিলেন।

বনমালী পণ্ডিত॥ ইনি শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রভুর হাতে সোনার লাঙ্গল দেখে উন্মত্ত হয়েছিলেন।

বলরামদাস ঠাকুর॥ ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপের নিকট দোগাছিয়াতে বাড়ি। পদকর্তা। শ্রীনিত্যানন্দের বিশেষ কৃপাপাত্র।

বল্লভ আচার্য॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পিতা।

বাণীনাথ॥ রামানন্দ রায়ের অনুজ। মহাপ্রভুর নিকটে থেকে ইনি অতিথিদের মহাপ্রসাদের বণ্টন করতেন।

বাসুদেব ঘোষ॥ কায়স্থ। বিখ্যাত পদকর্তা। নব ভাইদের মধ্যে গোবিন্দ ও মাধবই বিশেষ খ্যাত। তমলুকে শ্রীপাট স্থাপন করেন।

বিজয় দাস॥ কায়স্থ। সুন্দর হস্তাক্ষর, মহাপ্রভুর লিপিকার 'রত্নবাহু' উপাধি। মহাপ্রভুর কৃপাস্পর্শে শুক্লাম্বর-ভবনে অপূর্ব কিছু দর্শন করেন।

বিদ্যাবাচস্পতি॥ রত্নাকর। সার্বভৌমের অনুজ। গৃহাশ্রমে সনাতন গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। মহাপ্রভু বিদ্যানগরে এঁর গৃহে অবস্থান করেছিলেন।

বিশ্বরূপ॥ মহাপ্রভুর বড় ভাই। ইনি মাধবেন্দ্রপুরীতে নিজ তেজ সমর্পণ করেন। পরে এই তেজ নিত্যানন্দে সংক্রমিত হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া (লক্ষ্মী)॥ শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয়া পত্নী। সনাতন মিশ্রের কন্যা। ইনি মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সেবা করতে থাকেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কঠোর ভজন বৈষ্ণবগণের আদর্শ।

বুদ্ধিমন্ত খান॥ নবদ্বীপের জমিদার। ইনি নিজব্যয়ে প্রভুর দ্বিতীয় বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। ইনি আজন্ম চৈতন্যদেবের আজ্ঞাকারী সেবক।

বৈষ্ণবানন্দ আচার্য॥ পূর্বনাম রঘুনাথ পুরী।

ব্রহ্মানন্দ পুরী॥ শ্রীচৈতন্যকল্পতরুর মূল নবজন সন্ন্যাসীর অন্যতম।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥ ইনিও নবজন সন্ন্যাসীর অন্যতম। ইনি চর্মাম্বর ত্যাগ করে মহাপ্রভু, সন্নিধানে নীলাচলেই থেকে যান।

শঙ্কর পণ্ডিত॥ দামোদর পণ্ডিতের ভাই। মহাপ্রভুর বিরহদশায় ইনি তাঁর পদতলে শয়ন করতেন॥ ইঁহাকে মহাপ্রভুর 'পা-বালিশ' বলা হত।

শঙ্করারণ্য॥ শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম।

শচীদেবী॥ মহাপ্রভুর মাতা।

শাকর মল্লিক॥ সনাতন গোস্বামীর নবাব সরকারের পদোচিত পূর্বনাম।

শিখি মাহিতি॥ উৎকলবাসী কায়স্থ। জগন্নাথদেবের লিখনাধিকারী। মহাপ্রভুর মরমী ভক্ত।

শিবানন্দ সেনা॥ বৈদ্য। পূর্বনিবাস কুলীনগ্রামে, পরে শ্রীপাট কাঞ্চন পল্লীতে। এঁর নেতৃত্বে প্রতিবৎসর গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রায় নীলাচলে যেতেন। পুত্র,—কবিকর্ণপুর।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী॥ নবদ্বীপবাসী দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। গয়া থেকে ফিরে প্রভু এঁর গৃহে থেকেই আন্তরিক দুঃখকথা ভক্তগণকে জানান। মহাপ্রভু সাগ্রহে এঁর ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করেন।

শ্রীগর্ভ॥ নবদ্বীপে প্রভুর কীর্তনসঙ্গী শ্রীগর্ভ পণ্ডিত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ।

শ্রীধর॥ তরকারি বিক্রেতা, নবদ্বীপের দারিদ্র ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভু এঁর ভগ্ন লৌহপাত্রে জলপান করে পরম তৃপ্তিলাভ করেন।

শ্রীমান পণ্ডিত॥ নবদ্বীপে মহাপ্রভুর কীর্তনসঙ্গী দেউটিধারী।

শ্রীবাস পণ্ডিত॥ পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম ভক্ততত্ত্ব। পিতা জলধর পণ্ডিত। বৈদিক ব্রাহ্মণ। শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি এঁর ভাই। গ্রন্থকারের মাতা নারায়ণী দেবী এঁর পরলোকগত জ্যেষ্ঠভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা। মহাপ্রভু গৌড়ে এসে এঁর কুমারহট্টের বাড়িতে গিয়েছিলেন।

সদাশিব পণ্ডিত॥ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রথমে এঁর গৃহে ছিলেন। মহাপ্রভুর নবদ্বীপের কীর্তনসঙ্গী। প্রভুর অভিনয়ে এঁর উপরে কাচসজ্জার ভার ছিল।

সদাশিব কবিরাজ॥ পিতা-কংসারি সেন, পুত্র-পুরুষোত্তম, পৌত্র কানু ঠাকুর বা ঠাকুর কানাই। চারপুরুষ গৌরাঙ্গ-পার্ষদ।

সনাতন॥ রাজপণ্ডিত। ইনি পরমারাধ্যা শ্রীল বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জনক।

সনাতন॥ নবাব সরকারের শাকর মল্লিক। শ্রীরূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

সার্বভৌম॥ বাসুদেব সার্বভৌম। পুরীধামে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত। এঁকে মহাপ্রভু ষড়ভুজ মূর্তি দেখিয়েছিলেন। কন্যা ষাঠী, জামাতা অমোঘ।

সুন্দরানন্দ ঠাকুর॥ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। ইনি প্রেমোন্মাদে জল থেকে কুমীর ধরে এনেছিলেন এবং জম্বিরের গাছে কদম্বফুল ফুটিয়েছিলেন।

হরিদাস ঠাকুর॥ যশোর জেলায় সোনাই নদীর তীরে ভাটকলাগাছি গ্রামে যবনকুলে জন্ম। বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতেও ইনি নাম ত্যাগ করেন নি। মহাপ্রভু এঁকে পুরীতে নিয়ে যান। পরে সিদ্ধবকুলে বাস করেন এবং অলৌকিক ভাবে দেহত্যাগ করেন, মহাপ্রভু শব কোলে করে নৃত্য করেছেন। পুরীর সমুদ্রতীরে এঁর সমাধি-মঠ।

হাড়াই পণ্ডিত॥ হাড়ো ওঝা, মূল নাম মুকুন্দ। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পিতা। বীরভূম একচক্রা গ্রামে শ্রীপাট।

হিরণ্য॥ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দ প্রেমপ্রচারে বেরিয়ে এঁর গৃহে থাকতেন।

হিরণ্য ভাগবত॥ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। প্রভু এঁর গৃহে একাদশীতে নৈবেদ্য চেয়ে খেয়েছেন। ভাই মহেশ পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত। চাকদহে যশোড়ায় জগদীশের শ্রীপাট।

হুসেন শাহ॥ প্রথমে সুবুদ্ধি রায়ের কর্মচারী, পরে গৌড়ের বাদশাহ। মহাপ্রভুতে এঁর ঈশ্বরবুদ্ধি ছিল। সনাতন এঁর কারা থেকে পালিয়ে যান॥

পূর্বজন্মের বেদব্যাসই এই জন্মে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর,—অনেক বৈষ্ণবমহাজন এই কথা মান্য করেন। ব্রজের কুসুমাপীড় নামক কৃষ্ণসখা তাতে প্রবেশ করেছিলেন বলেও বৈষ্ণবাচার্যগণের ধারণা। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ব্রজের সখ্যভাবের উপাসক ছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ লিখতে শুরু করেন। তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন:

> অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিয়া কৌতুকে।
> চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
> নিত্যানন্দস্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে।
> সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ তিনি লিখেছেন বলে প্রামাণিকভাবে জানা যায় না। মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানী, অতীব বিনয়ী এই গৃহস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণ সন্তান সন্ন্যাসগ্রহণ না করেই সংসারে থেকেই সন্ন্যাসজীবন যাপন করেছেন।

তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীচৈতন্যের অশেষ কৃপাতেই তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি লিখেছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোন লীলাই প্রত্যক্ষ দর্শন করেন নি। তিনি শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে বিভিন্ন সূত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। কিছু উপাদন তিনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকটে পেয়েছেন। ভক্তবৃন্দের কাছে কিছু শুনেছেন। মুরারি গুপ্তের কড়চা থেকে বহু সংবাদ পেয়েছেন।

এই শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানির মহিমা অপার। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস ঠাকুব যে তত্ত্ব প্রদান করেছেন পরবর্তী চৈতন্যলীলা-লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও তা স্বীকার করেছেন। পরবর্তী বৈষ্ণবাচার্যগণ সকলেই তাঁর কথা সাদরে মান্য করেছেন। এই গ্রন্থের আরো মহিমা যে, শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা মুরারী গুপ্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন কিন্তু বৃন্দাবনদাস তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। গৌর-নিত্যানন্দের লীলাব বিস্তৃত বর্ণনা এই গ্রন্থের পূর্বে আর কোথাও এমন সুষ্ঠভাবে উল্লিখিত হয় নি।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহুল প্রচারও তার জনপ্রিয়তার এবং মহিমার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে-সময়ে ছাপাখানা ছিল না। সকলকেই গ্রন্থাদি নকল করে নিতে হত নিজেদের প্রয়োজন মত। বিশেষ আগ্রহ না হলে কেউ এমন পরিশ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য কাজে হাত দিত না। এই অবস্থাতেও এই গ্রন্থ উত্তর ভারতে বৃন্দাবনে পর্যন্ত গিয়েছিল। তার আগে এবং পরেও যে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেখানে বাঙ্গালীর বসবাস সেখানেই শ্রীচৈতন্যভাগবত—একথা প্রায় নির্দ্বিধায় বলা চলে। শ্রীচৈতন্যভাগবত বাঙ্গালীর একখানি অতি প্রিয় গ্রন্থ এবং বাংলাসাহিত্যেরও একটি শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থ।

এই গ্রন্থকে অনেকে চৈতন্যমঙ্গল নামেও ডাকেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীই বারে বারে একে 'চৈতন্যমঙ্গল' বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলেছেন:

> কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
> চৈতন্যলীলার ব্যাস—বৃন্দাবনদাস॥
> ওরে মূঢ়লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল।
> চৈতন্যমহিমা যাতে জানিবে সকল॥

মনে হয়, চৈতন্যমহিমা যে গ্রন্থে বিশেষভাবে জানা যাবে সেই কারণেই তিনি একে চৈতন্যমঙ্গল বলেছেন। এছাড়া অন্য কোন প্রমাণ তেমন পাওয়া যায় না।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে রাধাকৃষ্ণের মিলিতস্বরূপ তা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোথাও ব্যক্ত করে বলেন নি কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে সবই প্রকাশ করেছেন। মধ্যলীলায় নবম পরিচ্ছেদে শ্রীধরের উক্তিতে আছে:

রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর ভিতরে।
হেন মতে নবদ্বীপে আইলা বাহিরে॥
ভক্তি লাগি সর্বস্থানে পরাভব পাইয়া।
জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া॥

এখানে দেখা যাচ্ছে, শ্রীগৌরাঙ্গ নিজের শরীরের মধ্যে ভক্তি লুকিয়ে রেখেছেন। তাঁর ভক্তি আছে বলেই তিনি লুকোতে পেরেছেন। এই ভক্তি কৃষ্ণের নয়। ভক্তির মালিক শ্রীমতী রাধাঠাকুরানী। সুতরাং দেখা গেল শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণের মিলিতস্বরূপ।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তা চৈতন্যভাগবতে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। শৈশবে তৈর্থিক বিপ্রের নিকট, শ্রীনিত্যানন্দের কাছে ষড়্ভুজ প্রকটন, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে ষড়্ভুজ প্রদর্শন, শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে নৃসিংহরূপে দর্শন দান, শচীমাতা এবং অদ্বৈতাচার্যের নিকটে শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকটন—এমনি বহুবার তিনি নিজেকে স্বয়ং ভগবানরূপে প্রকাশিত করেছেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত জীবনীরূপে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দার্শনিকগ্রন্থরূপেই পৃথিবীব্যাপী বৈষ্ণব সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু সেই চৈতন্যচরিতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে বলেন:

নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥
সেইসব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥ * * *
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত দু'খানি গ্রন্থ একখানি অপরখানির পরিপূরক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলা ও নীলাচল-লীলা জানবার জন্য দু'খানি গ্রন্থই অবশ্য পাঠ্য।